

যমুনা

ত্রয়োদশ বর্ষ

গ্রন্থা

১,২০ ২

বৈশাখ-চৈত্র

১৩৩০.

সম্পাদক

শ্রীচাক্রচন্দ্র ঘিষ

ও

শ্রীফণীন্দ্র নাথ পাল

ভোলানাথ লাইব্রেরী

৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৯ টাকা।

বর্ষ সূচী[illegible]

যমুনা—



তাম্র
“বাস্তব”র সৌভাগ্য ।

Lakshminibati Press, Calcutta.

৭৩৫৫৫



১৩শ বর্ষ

বৈশাখ ১৩৩০

১ম সংখ্যা

পূজা

(ঐতিহাসিকগণের পেন স্তম্ভ, কাব্যচর্চা)

আজ আনন্দিয়া, শনিবার দিন, দেবীর ছুটির দিনে,
 হাড়াইলা রাণী শত লবীয়াবে পথ তরে গেছে ভিড়ে,
 নাহি ছিল আশা, প্রতিবে তনয়, দেবীবে মানত করে
 পেবেছে কুমার, কুমার হবে রাণী আগে পূজা করে,
 মঙ্গল ইতি, পুরোহিত বরে আশীষ তুলিয়া পানি,
 "সকল হউক সকল কাহনা কর লবীয়াগণী!"
 রত্নত বালায়, কনক পুষ্প, দেবীর পূজার কুম,
 পুরোহিত আজ, পুণ্ডিত চিত্ত মগ্ন করিছে জুগ।
 নিবে গেল নীল, নাহি অলে মূল, আশ্রিত ছব না আর,
 পূজকের কানে, কি যেন ফনিছে, এই কিরে পূজা তরে!

একটি বিহার, নিতা যোগায় কোমল সুখের স্রাবি,
 নব্বের গড়া, কণ্ঠন কলক, তাঁর পুতা হবে আশি !
 তার পরে চীতে, এল তিহারিনী, হুন্দরেন মন স্বপ্নে,
 কঠিন পীড়ায় পতিত তনয়, নমি করে যোড় করে,
 "ও মায়া ঠাকুর ! এই হলী মূল, ছোঁয়ায় মাথের পাথ,
 মাও মোরে দাও, আর কিছু নাই, নীহোঙ্গ করিতে তাই ।"
 'পুখারী কহিলে, "ওগো তিহারিনী, এতদিনে বুঝি নাই
 হাথের হুকোটা, হুকোথের অলে, বয়েছে মাথের ঠাই ।"

উপন্যাসে বাস্তবতা বনাম ভাবুকতা

(প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, পি-এল)

প্রসিদ্ধ অধ্যাপক William Henry Hudson সাহেব তাঁহার An Introduction to the Study of Literature পুস্তকের ৩র্থ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, আখ্যান যত বা প্রবী, চরিত্র, কথোপকথন, ঘটনার কাল ও স্থান, ঘটনাসীত, ও জীবনের দার্শনিকতত্ত্বাখ্যান উপন্যাসের উপাদান ; তবে সেযোক উপাদানটী সজ্জা পরিপূর্ণভাবে বিবৃত হয় না । এই সেযোক উপাদানটী লইয়া আমরা একটু আলোচনা করিব । নরনারীর চরিত্রের বিভিন্ন অঙ্গুষ্ঠিত-প্রদর্শন ও চরিত্র-সৃষ্টি উপন্যাসিকের দ্বারা উদ্বেত, কিন্তু ভগ্নস্তর স্রষ্ট উপন্যাসিকেরা এই কাব্য করিয়া কাজ করেন না, তাঁহারা আকারে ইঙ্গিতে অন্তঃস্থ হৃদ বা মূর্ত চারিত্র মানবস্বরূপে কিম্বদন্তি ভাবের সঙ্গ বা ছাপ (impression) দিয়া যাহ তাহা বলিতে জ্বলেন না । স্বতঃস্ফূর্ত উপন্যাস পাঠ করিয়া কণিক অনিচ্ছ পাওয়া যায় সত্য ; কিন্তু সে ভাবিতে ভাবের গভীরতা নাই—মেঘলি কোল উদ্বেত লইয়া লিখিত হয় না । বড় বড় উপন্যাস-

কোয় কিছু কেবলমাত্র মানব অঙ্গুষ্ঠিত বা জীবনের দর্শন নন ; তাঁহারা চিত্তাঙ্গীল ভাবুক । হুড্‌সন সাহেব তাই বলিয়াছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতামূলক মানব-চরিত্রের জ্ঞান, মানবের অন্তর্ভুক্ত ও উদ্বেত বুঝবার অঙ্গুষ্ঠিত, দারী ঘটনা ও সমস্তার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও তাহাদের পরিপক্ব জ্ঞান, জীবনের দার্শনিকতা বুঝাইবার পক্ষে কার্যকর হইয়া থাকে ।

এই লক্ষ্যেটী যে পর্যন্ত পথে চলে তাহাও তাহারা বুঝাইবার চেষ্টা করেন । উপন্যাসিকদিগের ইহা যৌগ ইন্দ্রেত, দৃশ্য উদ্বেত চরিত্র বসি ; কিন্তু ইহাও এখানে বলিয়া রাখা ভাল মানবচরিত্র লক্ষ্যে উপন্যাসিকের যোগ্য হাধনা থাকে, তিনি জ্ঞাতদ্বায়ে বা অভিজ্ঞদ্বায়ে তাহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঘটনা-সংঘটন ও চরিত্র অঙ্কন করিয়া থাকেন । ইহােকই আমরা জীবনের দার্শনিকতা, দার্শনিক যোগা বলিব ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহােকই Moral System, Philosophy of life, Ways of presenting a criticism of life in the

* Novels প্রকৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন।

উপন্যাসিক দুই প্রকারে ইহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন। প্রথমতঃ কল'কুলনী নাট্যকারের ন্যায় কেবল দ্বার কতকগুলি চরিত্রের সমাবেশ করিয়া জীবন-সমস্যায় সম্মুখীন করিতে পারেন। ইংরাজীতে এই পদ্ধতিকে Dramatic বা Indirect way বলা হয়, বাস্তবায় ইংরেজ নাট্যকার পছন্দ বলা হইতে পারে। এদিকল ক্ষেত্রে উপন্যাসিক জীবনের কতকগুলি ঘটনা একপ্রকারে সমাবেশ করেন, যাগাতে আদর্শ উচ্চের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ হইয়া পড়ি। তারপর তিনি চরিত্র ও জীবনের উদ্ভেদ নুতন আলোকপাতে আদর্শের নিকট উপস্থাপিত করেন এবং আখ্যানসমূহ ভিতর দিয়া দেখাইতে চান যথেষ্ট কম অবশ্রমসাধী—সংসারে পাণের কম ভোগ করিতে হইবেই হইবে।

একালে উপন্যাসিক নাট্যকারের পণ্যবলবন করিয়া জীবনের চিত্র উপস্থাপিত করেন; কিন্তু উপন্যাসিক সম্বল সরলভাবে আপনায় জীবনের সত্য—বাস্তবচরিত্রের অন্তর দৃষ্টান্ত দিতে পারেন। ইংরেজী ইংরাজীতে Direct method বলে। বাস্তবায় বাস্তবপন্থা নাম দেওয়া হইতে পারে। এই দুই পদ্ধতিকে পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যিকেরা Romance and Realism নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আদর্শ ইংরেজী 'ভাবুকতা' ও 'বাস্তবতা' নাম দিয়া। অবশ্রম সমাজ দুইটী ভাবের সম্পূর্ণ যোগাতক না হইলেও বহুদিন হইতে বাস্তবতা-ভাবায় ইংরাজ চলিয়া আসিতেছে বলিয়া আদর্শও একেজে বহাজনদিশের পথ অবলম্বন করিলাম।

সাধারণতঃ ভাবুকত বা ভাবুক উপন্যাসিকদের করণ্য আদর্শায়ন ও আদর্শ বহানু দেখিতে পাওয়া যায়; আর বস্তুর বা বাস্তব উপন্যাসিকদের বিপরীতভাবে পরোক্ষিত সত্য বর্ণন। প্রথম শ্রেণীর কথাসাহিত্যিকেরা এইরূপ ভাবে ঘটনার সাংবাদিক বর্ণন দ্বারাতে উচ্চ আদর্শের সূচনা উঠে; আর

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসিকেরা ঘটনার ও চরিত্রের বর্ণনায় বর্ণন করিয়া থাকেন—সত্যের নিকট মানসিক ভাবের ক্ষুদ্রের নিকট জীবনের লক্ষ্য। অথবা বা ঘটনা, তাহারের নিকট চরিত্র বিকাশের দ্বারা মাত্র। কেন্দ্র আদর্শ বানানোর কি ভাবে সূচনা উঠে, তাহাই উল্লেখ বর্ণন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে তাহারের অভিজ্ঞতা কুঃসাম্পদ-কল্যাণ-পন্থ। বোণারি বলেন, সমাজে বা পূর্বে ভালবাসা ও ঘৃণার বস্তু ইংরেজ লেখনীতে বস্তু প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যর ততটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসায়িক বার্থ, অর্থনৈতিক বার্থ, রাজনৈতিক বার্থ এমন কি পারিবারিক বার্থের বর্ণনায় ইহা এই শ্রেণীর সাহিত্যিক-বর্গ কুঃসাম্পদ সূচনা ভাবে সূচনা থাকে। সত্যই ইংরেজ বর্ণিতব্য বিষয়।

মনকরেক পাশ্চাত্য লেখনী এ সম্বন্ধে দ্বারা বর্ণিত্যহে, একদে আদর্শ তাহার একই আলোচনা করিয়া।

Martin Crawford লিখে তাহার—“The Novel: What it is” পুস্তক লিখিয়াছেন বস্তুর উপন্যাসিকেরা মানব চরিত্র কল্পন দ্বারা দেখাইয়া থাকেন, আর ভাবুক উপন্যাসিকেরা মানবচরিত্র কল্পন হয়। উচিত তাহারই চিত্র আদর্শন করেন। কথাতা কিন্তু ঠিক নয়। দুই শ্রেণীর লেখনী জীবনের বস্তুর দেখাইতে চান, কারণ এই উদ্ভেদগণিত না হইলে ভাবুকনল কেন কল্পনিক ঘটনার ভিতর দিয়া জীবনের সত্য বলিয়া থাকেন; উত্তরের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য পদ্ধতি লইয়া।

Henry James তাহার “The Art of Fiction” নামক প্রবন্ধে ‘চরিত্রবৃত্তক’ ও ‘ঘটনা বৃত্তক’ উপন্যাস (Novel of Character and Novel of Incident) নামক দুইটী শ্রেণী বিভাগ-করিয়া প্রাপ্তক ক্ষেত্রে অভিহিত করিয়াছেন।

জিত লক্ষ্যবিশিষ্ট যেখানে কোন চরিত্র কিংবা ঘটনার ব্যাখ্যা নির্দেশিত। আর ঘটনা, চরিত্রের নির্বচন। এ কথা Clayton Hamilton দ্বারাও উল্লিখিত। *Materials and Method of Fiction* নামক পুস্তকে বেশ বৃত্তাহীনা লিখাছেন।

Bliss Pery মহাই বলিচেন, উত্তর মতেঃ পার্থক্য বিবরণিমাঝে নয়—কেননা যে পদ্ধতিতেই, বৃত্তি হয়। একই বিবরণ ব্যক্তব্যপেক্ষ বা ভাবুকতার সাহায্যে বর্ণনা করিতে পারা যায়। উত্তর পদ্ধতির পার্থক্য বাহিরে নাই—কিন্তুই আছে। কথা-সার্থিত্যকের মনের ভিতর ইহার রাস। এ কথাঃ ব্যাখ্যা নির্বাহ করিতে হইলে জীবনের দার্শনিক সমস্যার বিচার আলোচনা করিতে হইবে।

জীবনের সত্য জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, দার্শনিক সমস্যার মীমাংসা কলাকুশলীর মত বর্ণনাকথা উত্তর ভেদে উপায়ান্তরেই কথ্য। দার্শনিক চিন্তাঃ উত্তর হইবে—অর্থাৎ লেখকেরই মতঃমতঃ হইবে হয়। তবে তা-দ্বারা জীবনের অস্তিত্ব ঘটনা, আর তাৎপর্য্যের অনাগত ভবিষ্যৎ ঘটনার চিত্র প্রদর্শন করেন।

জীবনের ঘটনা উপস্থাপিত করিতে এক-দ্বারা অন্বেষণ-পদ্ধতি (inductive method) ও তাৎপর্য্যের আন্বেষণ-প্রণালী (deductive method) অবলম্বন করিয়া থাকেন; বস্তুদ্বয় কেবলমাত্র চারোইর বক্রাঙ্গনের ক্ষুণ্ণ দেখাইয়া কান্ত করেন। কোনো অবস্থার পূর্ণতা জানুয কি তাহাে কাব্য করে তাহার একটা কান্ত ব্যাখ্য করিবার অন্য মাহুঃ ব্যাখ্যাতক আশ্রয় দেখিতে পারেন। আর একটা দিচ্চাঃ এ সত্য উপলব্ধি হইতে না পারিলে মনে পাও পারেন। আর এই সত্য ব্যাখ্যাতক বোধে হয় এক-দ্বারা প্রথমে কল্পিত ঘটনার ভিতর বিচার আশ্রয়কে লইয়া যান। তবে ঘটনাগুলি বস্তুদ্বয় সত্তা জীবনের পরীক্ষিত ঘটনার অনুকরণ করিতে তিনি চেষ্টা করিয়া থাকেন।

জীবনের ঘটনাগুলিকে অনুকরণ করিয়া তিনি যেন বলিতে চান, এতদংশ আবার পরীক্ষিত—বস্তুতঃ একটিকে আশ্রয় যখন ঘটতে দেখিবারি এবং একটিকে দেখিবারি আশ্রয় পরীক্ষিত দৃষ্টো উপলব্ধি হইয়াছি। প্রকৃত সত্যের মধ্যে একই ঘটনা হইতে তিনি সাধারণ সত্য উপলব্ধি যেন। এক একটা দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ সত্য, উক্ত পথে যাহাকে from particular to general বলে—তাহারই অনুকরণ করিয়া তিনি জীবনের সত্য বলিতে পারেন।

অপরপক্ষে তাৎপর্য্য লেখক সাধারণ সত্য প্রথমে বলিয়া বিচার দেখাইতে চান, সর্বত্র উল্লিখিত নির্ধারিত সত্য কাব্যকল্প। কি কাব্য তিনি এই সত্য উপলব্ধি হইলেন তাহা তিনি বলিয়া যেন না। তাহার কেবলমাত্র চেষ্টা দেখিতে পারেন। আর, জীবনমাত্রী কাব্য সাধারণ সত্যকে ঘটনার চিত্র বিচার পরিষ্কৃত করিতে। তাহার আশ্রয় বস্তু কাল্পনিক ঘটনার ভিতর বিচার প্রকাশ কাব্যে লিখা তিনি কোন্‌রূপ ব্যাখ্যাতকই করেন না, তিনি চিত্রা করিবার অবস্থারই পান না। সাধারণ জীবনে প্রথম ঘটনা ঘটনা যাকে তিনি তাহার একমাত্র উদ্দেশ্যে যে সত্যটি—যে কথাটি—তিনি বলিতে চান তাহারই ব্যাখ্য তাহাে জীবনমাত্রী কাব্য বলি হইল কি না। আশ্রয় উপস্থাপনের বিবেকে তাহার এক।

মহামতি দার্শনিক বেবনের পূর্ণে পাঠ্যঃ প্রথমে বস্তুদ্বয়র প্রত্যয় ছিল না। যোগ হয় কথাটি একতর তাহাে বলিলে বিচার হইবে না, প্রথমে পূর্ণ আশ্রয়বোধেরই যুগ ছিল। বিজ্ঞানের যুগের লবিত ব্যক্তব্যের যুগও আসিয়াছে।

আশ্রয় মনোমাত্র চরিত্র লক্ষণ ও বস্তুটি চারো চিত্র উপস্থাপন প্রথমে, ব্যাখ্যাতক মনোমাত্র অনুকরণ বস্তুত করার উপযোগ্যঃ একটু বেশি। বস্তুদ্বয় লেখক দ্বারা বর্ণিত করেন তাহা,

‘জীবার অন্তর্জগৎ’। সেগুলি যে সত্য চোখে
লোকের বিশেষ অনুরোধে তথ্য বাবে, আর
অন্যভাবে লোকবিশেষকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া পাঠক-
বিশেষকে এমন অমূল্য দান দিয়া রাখিয়া দিতে হয়।
অবিশ্বাসী পাঠকবিশেষকে এমন বর্ণিতব্য বিষয় সত্য
বলিয়া ধারণা না করিয়া দিতে পারিলে লোকের
কৃত্তির প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা ঘটনা উঠে না।
ক্যান্টনের ভিতর সত্য ছুটিয়া উঠিলেই যে উহা
অসম্ভব হইবে এমন কথা বলিতে পারা যায় না।
সত্যের প্রতি বতরন না পাঠকের আস্থা হইলে,
ততকাল আচার্য্যবিশেষ লোকের তাহার নিজস্ব
অভিপ্রায় হইবে না। হ্যামিটন সাহেব সত্যই
বলিয়াছেন—“We must remember always
that even though a story tells the truth,
it is still a failure unless it gets that truth
believed.” ভাবুক কথাসাহিত্যের আশ্রয়
পরিষি অবিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যিক। তাঁহারা
যে সত্যের প্রকাশনা করিলেন তাহা যেন প্রমাণিত
হয়; আশ্রয় ভাব্যের সত্য সত্য সত্য লিখিত হইলে
পাঠকবিশেষকে যতকাল অধিকতর আকৃষ্ট করিবে।
আশ্রয়পত্রী করিয়া বর্ণন করা কিছু নহল ব্যাপার
নয়।

বস্তুর উপস্থাপিকের সুবিধাও যেন আছে
অসুবিধাও কতকটা আছে। বর্ণিতব্য বিষয়গুলির
প্রমাণ যখন তিনি বিবৃত করেন, তখন পাঠকের
সেগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার সুবিধা পান।
তাঁহার উপস্থাপিত পৌকিত সত্যগুলির সহিত
পাঠকবিশেষের দৃষ্ট সত্যগুলির যদি সমতা দৃষ্ট না হয়,
তাহা হইলে পাঠকের তাঁহার কথার কিছুমাত্র
আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। যখনই লিখিত
মনে একবার আশ্রয়ের বোধ সঞ্চিত হইলে
মিথ্যা; তাহা মনে হইতে পারে। বস্তুর কথ-
সাহিত্যের উপর পাঠকের একবার অনায়াস
হইলে তাহার পক্ষে আর তাহা কিয়দংশ আনা

দুষ্কর। ভাবুক উপস্থাপিকের প্রমাণ সত্য
এত সহজে বিবর্তিত হইয়া যায় না। প্রকৃত জীবের
অধিকাংশই না হইলে ইহকাল প্রমাণ একত্র লিপ্যন্তর
ব্যাপার। এই প্রমাণের লোকবিশেষের প্রমাণ সত্য
আশ্রয় (instinct) দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু সত্য-
আশ্রয়-প্রমাণিত হইয়া থাকে যে যখনই সত্যের
প্রমাণিত হই, তাহাতে তাহার সত্যের নাহি; কিন্তু
বাস্তব-কথাসাহিত্যকে পাঠক যখন সত্যের
করেন, তখন সত্যের দ্বারা ও আশ্রয়-অনুরূপ
সাহিত্যে তাহার প্রমাণ দিয়া ফেলেন।

ভাবুক উপস্থাপিকের আশ্রয় প্রমাণ পাকা
টাই। আশ্রয় দ্বারা লিপ্যন্তর দত্তা উপস্থাপিত হওয়া
টাই, আর আশ্রয় তাহার সেই সত্যকে লিপ্যন্তর
নিকট উপস্থাপিত করা টাই। প্রমাণ টাই যখন
চরিত্র সুস্থিতির নিকটে—প্রমাণ টাই যখন চরিত্রের
বিস্তারিত অসুস্থিতির অভিজ্ঞতা হইতে দত্তা উপস্থাপিত
হইবার আশ্রয়। ভাবুক কথাসাহিত্যের
চরিত্রবল দ্বারা একান্ত প্রমাণ—প্রমাণ সত্যের
প্রতি অভিজ্ঞতা দিতা থাকে টাই। বাস্তব হিমায়ে
প্রমাণ উপস্থাপিকের অধিকাংশই একান্ত কর্তব্য।
বাস্তব উপস্থাপিকের এ সকল ভাব না থাকিলে
চলে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু ও কর্ণ যেন সকল সত্যের
সমাগম থাকে—সকল বস্তু দেখিবার ও শুনিবার ক্ষমতা
উৎসাহ থাকে চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যে তিনি
যেন বাস্তব ঘটনার চিত্র দিতে পারেন।

বাস্তব কথা সাহিত্যিক আশ্রয় পৌকিত
বিষয় ভিন্ন কোন কথায় বলিতে পারেন না।
Sir Walter Besant তাঁহার ‘The Art
of Fiction’ গ্রন্থে এইরূপ উপদেশ
দিয়াছেন—“Never to go beyond your
own experience” আশ্রয়-অনুরূপ
বাস্তবের কখনও বাইরে না। যখনই যখন
বা শুনিবে বা অসুস্থিতির ক্রিয়া, তাহাই বর্ণনা
করিবে। তাহা হইলে বস্তু বাইরেই এ প্রমাণ

লেখকদের স্বাধীনতা বড় কম। তখন ও কাল
বিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। তাত্ত্বিক কথো-
পাতিত্বকেই স্বাধীনতা কিছু বুঝ যেন। তাত্ত্বিক
লেখকদের যতজন তাঁহাদের মধ্যে প্রতি িটা
থাকে, আর যতজন তাঁহাদের এ ধারণা থাকে যে
তাঁহাদের পাঠকেরা তাঁহাদের কথাই আশ্রয়ান,
যতজন তাঁহাদেরকে প্রমাণ প্রদান উপস্থাপিত
করিতে চায় না। বস্তু। কথোপাতিত্ব
পন্থিক সত্যের দ্বারা চালিত, আর তাত্ত্বিক কথো-
পাতিত্বিক সত্যের আশ্রয়ের দ্বারা চালিত। প্রথম
শ্রেণীর লেখকদের বর্ণিতব্য বিষয় তাত্ত্বিক ঔপ-
স্থানিকদের লেখ্য হইতে বেশি পৃথক; আর
অন্যদিকে আবার তাঁহাদের নিজস্ব হইতে যে উচ্চ
আদর্শ পাই তাহা প্রথম শ্রেণীর লেখকদের নিজস্ব
হইতে পাই না। সেযোক্ত শ্রেণীর লেখকদের
মস্তিষ্কে বসন্তসি সত্য থাকিলে ততগুলি পদ তাঁহারা
নিশ্চিত পাবেন। কারণ উপস্থানে এই সত্যটাই
অতিব্যক্তি বেশিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বসন্ত
হইবে স্বাধীনতা যেখানে বস যেন। দাঁড়িও দেখান
তত যেন। তাত্ত্বিক লেখকেরা নামান্তরে, নাম
আঁতরে সত্যকে উপস্থাপিত করিতে পারেন বলিয়া
তাঁহারা নিখোঁকে আশ্রয় করিতে পারেন না।
আর যেখানেই তিনি সত্যের পদ হইতে দূরে সরিয়া
যান সেইখানেই তাঁহারা পতনটী গুরুতর হইয়া
পড়ে। অতঃপাঠকদের চক্ষুতেই এরূপ বলিয়া
প্রতিভাত হয়।

এখন অধিক দূর অগ্রসর হইলে উত্তর পদ্ধতি
যে কখন সৃষ্টি করে, তাহার বিষয় আবার একটু
আলোচনা করিব।

বসন্ত ঔপস্থানিক প্রকৃত জীবনের ঘটনাগুলির
অনুকরণ করিতে গিয়া এই গুলির দ্বারা নীমাৎ
হইয়া পড়েন এবং দুঃখটী হারাইয়া ফেলেন।
নিকটের ভবিষ্যের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য আবদ্ধ
থাকে, এবং বৈদগ্ধ্য জীবনের ঘটনাগুলির প্রতি

অধিক মনোযোগী হওয়ার এই গুলিই জীবনের মূখ্য
উদ্দেশ্য তাহারা লন। জুনিয়া যাব এই গুলি হইতে
সত্য ব্যতিরিক্ত হইবে। লক্ষ্যকে তিনি উপস্থান
জানিয়া যান। কারণ তিনি বসন্তপন্থিক বসন্ত
চিত্র অধিক করিবেন তত তাঁহার চিত্র কটোগ্রাফের
চিত্রের জায় হইবে—অর্থাৎ অনুকরণ যাই হইবে,
প্রকৃত চিত্র হইবে না। কটোগ্রাফ ও চিত্রে
সাম্যতা এই, চিত্রে চরিত্রের খুঁটিনাটি বিবরণ থাকে না,
কটোগ্রাফে তাহা থাকে। কটোগ্রাফে তৎকালের
ভাবকে বহিরা রাখে—তাঁহারা ছাপ বের যাই।
চিত্রে জীবনটী সমগ্রভাবে বেশিতে পাওয়া যায়—
কটোগ্রাফে তাহা পাওয়া যায় না। চিত্রকর ও
নকশনবীর পটুয়াতে যে প্রবেশ হই শ্রেণীর
ঔপস্থানিকদের দ্বিতীয় ভিতরও যেন প্রবেশ। বাস্তব
ঔপস্থানিকেরা জীবনটাকে সমগ্রভাবে বেশিতে
পারেন না—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপস্থানিক
করিতে পারেন না। আদর্শের উপস্থানিকতা তাহারা বুঝেন
না। আদর্শ যে বাস্তবকে নিঃশ্রিত করে সে কখনটা
তাঁহারা ব্যর্থতাই করিতে পারেন না। উদ্দেশ্য ও
মৌলিক স্থান যে কথোপাতিত্ব আছে তাহা তাঁহারা
বুঝিতে পারেন না। কখনটা পরে একটু স্পষ্ট
করিয়াই আলোচনা করিব।

পান্ডিত্যমগত বসন্ত-প্রতি একটা নূতন ধাত
প্রবাহিত হইতেছে। কোন কোন সমালোচক
এই পদ্ধতির নূতন নামকরণ করিয়াছেন
Naturalism ভোগ-নিলাপপদ্ধতি। কখনো বেশেই
ইহার জন্ম। কটোগ্রাফ-বস্তুর অতিব্যক্তি প্রতিভাই
ইহা অগ্রসরকারী লন। বাস্তব সত্যের ও পাঠের
দ্বারা ইহা অসীম চিত্র প্রকাশ করাই এ শ্রেণীর
লেখকদের মূখ্য উদ্দেশ্য। ইহার জীবনের বসন্ত
দুঃখ প্রতি পাঠকদের চিত্র ব্যক্তি করিতে
চান। এ গুলির সমগ্র বসন্ত-প্রতি করিতে পারা
যায় না। জানি, কথোপাতিত্ব নীতিগত নয়, তৎ-
সময়ের কথোপাতিত্বের দিকে চোঁটাই ত কথা বলা

উচিত। অতীত চিত্র দেখিতেও সাজী আঁচ, যদি সে সকল পাঠ করিয়া পাণের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে—
পাণের প্রতি তৃপ্তি আসে; কিন্তু সত্যকথা বলিতে
কি, করানী বৈদ্য অধিকাংশ বাস্তব গতিতাত্ত্বিক
চরিত্রের দুর্দশতা দেখাইয়া, অন্তর্ভুক্তির লোকদের
সহিত সমাপ্তকৃতি দেখাইয়া—দুর্দশচরিত্র মানবের
দুর্দশতাকে আঁর্শ করিয়া, বড় করিয়া—আমাদের
সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। সহজ দুর্দশ মানুষ পাপ-
প্রলোভনে পড়িয়া চিত্রের চাকলাবশে আশাত-
হানোয় সৌন্দর্যের ঘোষে বা ভাস-নাগর কুহকে
পড়িয়া কার্য করিতে পারে, কিন্তু ভ্রাতৃ-অভাবের
দাপকাউতে যদি সে কার্যে অজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত
হয়, সমাজ-সংঘতির যদি তাহা প্রতিফল হয়,
তাহা হইলে সে চিত্র বিষয় পরিভ্রান্ত নহে কি?
ঐ সকল চিত্র হইতে সমাজের অকল্যাণ সাধিত হয়
বলিয়া আমরা উদ্ভাবের প্রচলন চাই না। বাস্তব
বেশে এই প্রণীর কহেকলম লেখক করানী
বেশের নয় চিত্রের অসুস্থতা করিয়া কহেকলম
উপন্যাস লিখিয়াছেন। দেওলির মধ্যে অনেক
জলিতেই বিষবার ঐক্য প্রদেয় চিত্র আছে।
হয়। যে দিশু বিষবারা সংঘে দেবী-বত্ৰপিনী,
তাঁহাদের চিত্র এভাবে চিত্রিত করা কোন মতেই
উচিত নয়। অবশ্য একথা আমি বলিতেছি না যে
তাঁহাদের মধ্যে কখনও কাহারও পদাঙ্গমান নাই
যা হইতে পারে না। তবে সে চিত্র—সে দুর্দশতায়
চিত্র অঙ্কিত করিয়া কল কি? যদি অপর বিষয়কে
লিখা দিবার লজ্জা সে চিত্র অঙ্কিত হইত—তাহা
হইলে কোনরূপ দোষ যেহা চলিত না, কিন্তু
এ সকল উপন্যাসে সে পদের কোন চিত্রই দেখিতে
পাওয়া যায় না। সর্বথা সম্বন্ধ-লিপ্যার অসুস্থতা
ও তাহার বিবৃতি দেখাইবার চেষ্টাই এ সকল উপন্যাসে
দেখিতে পাওয়া যায়। সম্বন্ধবিশেষের পতনপুঙ্খের
প্রতি আশক্তি কহেকলম উপন্যাসে বিনয়ভাবে
অঙ্কিত হইয়াছে, এবং সেখান হইয়াছে ইহাতে

কিছুবার বোঝা যায়। দানী এমন মানুষ নয়, তখন
কেন স্ত্রী তাহার সম্বন্ধ ছিন্ন করিবেন না, আর যদিও
বা লোকসেবায় সন্মত থাকে, কেন না সে স্ত্রীর
তার আশ্রয় তার আশ্রয় পথে বিভ্রান্ত করিতে
পারিবে না। আমি আকারে ইন্দ্রে উপন্যাস
গুলির বক্তব্য বিষয়ের আভাষ বিশদ; কিন্তু
পাঠ্যতা করানী বেশের এই অসুস্থতা-কলমে সমাজে
যে দুর্দশতার প্রোত বহিয়া দাঁড়াবে, বা দাঁড়তে পার
তাহা কল্পনা করিয়া প্রাণ শিথরিয়া উঠিবে।

কলম বেশে এই প্রথা কতকটা অসুস্থতা হইয়াছে
সত্য; কিন্তু উত্তরদেশের প্রথার প্রভাব পার্থক্য
যেটো আছে। কলমেরই বাস্তব-লেখকতা দুর্দ-
শতার চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু
তাঁহারা কৈনস্থানেই উহাকে অসুস্থতার চিত্রিত
করিয়া সর্বত্র সন্নিবিষ্ট প্রকাশ করেন না। বাস্তব
তালো যেমন দুর্দশতা দেখা যায়, তেমনই তাঁহারা
দেখাইয়া থাকেন। তাঁহাদের স্ত্রী চিত্রিত হইলে
আমরা পিতা করি—ঐক্য দুর্দশতার বস্ত্র হইতে
কিমে রক্ষা পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ একটা কথা বলিয়া রাখি। কোন
কোন সমালোচক ইংলেন্ডে এই প্রণীর লেখক
বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার
মনে হয় তাঁহারা নরতর বেশের লেখার কথা একটু
ভাল করিয়া না-তাঁহারা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ
করিয়া থাকেন। রোমটা সেখানে বড় কঠিন
হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া স্ত্রীকিংবদ ইংলেন্ড
দেখানো হইত। তাঁহাদের যাবৎ করিয়াছিলেন।
নরওয়েয়াণীর জীবনের দুর্দশতাকে বড় করিবার
লজ্জা একটা আদর্শের অভাবে তাঁহাদের জীবনকে
নিঃশ্রুতি করিবার লজ্জা, তাঁহাদের জাতীয় জীবনের
যোগতালিক একটু রং বেশী দিয়া অঙ্কিত করিয়া-
ছেন। যে জাতীয়-সমস্যা সেখানে উঠিয়াছে,
তাঁহাদেরই একটা সমাধান করিবার চেষ্টা হয় ইংলেন্ড
করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তব বেশে সে

অন্যেই সমস্তাগুলি উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন কিছু আছে বলিয়া আশা করেন না।
 যান্ত্রিক চরিত্রের ও অন্তর্ভুক্তিই আশা অনুভব
 করিয়া থাকি। ইংলেন্ডের "নোরা"র চরিত্র লইয়া
 মাসটার রবার্ট মোস্তার বাগানী সংস্থাপন
 দেখা গিয়াছে। আবিষ্কৃত আপনাবিশ্বকে একটা
 প্রকৃত বিজ্ঞান করিয়া থাকিতে পারিতেন না।
 স্বামী বেচারীর কোনও ঘোষ না থাকা স্বত্বেও
 গৃহীত হইল পুস্তকভাষ্য ইয়া পরিচয় করিয়া
 আপনায় স্বামী প্রকৃতি-প্রেম কিংবা আশ্বাসের অসু-
 সঙ্গের কোনও অনিচ্ছিত স্বামে একাকী চিন্তা স্থান
 পাইল। হইলে স্বামী বেচারীর অস্বাভাবিক চরিত্র
 অস্বস্তি-বিবরণ হইলে কোন কথাই উঠিতে পারে
 না। প্রকৃতিমার্গে বিচরণবীর ভোগবিলাসী
 আশ্বস্তব্যস্ত পান্ডিত্য চরণ এখনও সমাজসংস্কৃতি
 কাব্যকে বলে তাহা জানেন না—তাঁহার ব্যর্থতাই
 ভগ্নিত পাইবে না। সমাজের সমাজের ভক্ত আশ্বস্ত
 হিসাব, ভাগ্যস্বীকার যে আশ্বস্ত তাহা বস্তু নয়
 পান্ডিত্য অসংস্কৃতি, ততদিন ঐক্য লেখকের
 নিকট ঐক্য চিত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু ঐ লক্ষণ
 পান্ডিত্য জেটিন ভাষায় রহিল চারিগাছ এবেশের
 মাটিতে রোপণ করিলে কল কল্পন হইবে তাহা
 সমাজ-সংস্কারের চিত্র বিবর্তিত।

ইংলেন্ডের লেখক যে কথাটা আবিষ্কারে বলিতে
 চাষিয়াছি, ঠিক সেই কথাটা কয়েকদিন পূর্বে মনো
 Charles Gray Shaw লিখিত Culture নামক
 গ্রন্থ পাঠ করিলাম। উহা নব প্রকাশিত Ency-
 clopaedia of Religion and Ethics পুস্তকে
 পণ্ডিত। গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কল যেসে টুর্পেনি
 জ্ঞানসংস্কার অর্থাৎ নবায়ন (Nitritism)
 সমাজের বিবেচ্য যুক্তি দেখিয়া করিয়াছিলেন। নরসে
 যেসে ইংলেন্ডের জ্ঞানসংস্কার ও আশ্বাস (Egolsm)
 সাহায্যে ভাষ্য-জ্ঞান সমাজ কল্যায় বস্তুপরিচয়
 ইচ্ছা করেন। আশ্বাসিকার ভাষ্য লিখিত কর্তব্য

করিবে ও পোস্তিকার ভাষ্য আশ্বাসিকার পণ্ডিত
 ছিল, ইংলেন্ড স্বামী চিত্রায় বাহা ভাষ্যকে মুক্তি-
 মানের প্রকাশী হইয়াছিলেন। বিখ্যাত কথ-
 সাহিত্যিক পোস্তিকার ছিলেন, কল্যায় বাগানী
 চিত্রায় ভাষ্য স্বামী পণ্ডিত ও মুক্তি হইতে পারে
 না। সমাজের চিত্রায় বাহ্যকে (Culture)
 আশ্বাসিকার পণ্ডে উল্লেখ পণ্ডকে Verlaino,
 Mellarmes, Haynmaus, Materlink, Swin-
 burgo প্রকাশিত করাইছেন। সমাজের পণ্ডিকার
 পণ্ডিকার চিত্রায় পণ্ডিকার বাহ্যকে দেখিতে পান
 নাই। তাই চিত্রায় আশ্বাস মানের বাহ্যকে
 অশ্বস্তিকার চিত্রায় দেখেন। প্রত্যেক সাহায্য
 মানের পণ্ডিকার অশ্বস্তিকার বাহ্যকে কল্যায়
 সাহায্যে প্রকাশ করি। চিত্রায় ইংলেন্ডের
 চিত্রায়ের উত্তরে ইংলেন্ড এই প্রত্যেকের বিকাশের
 সমাজ করিয়াছেন (In the north the
 symbolism was developed systematically
 by Ibsen)

আশ্বাসিকার কোন কোন উপস্থাপিত আশ্বাস
 পণ্ডিকার চিত্রায় অশ্বস্তিকার এখন পণ্ডিকার
 পণ্ডিকার চিত্রায় করিতেছেন যে, তাহা দেখিয়া যেন
 হয় তাহা যেন উপস্থাপনের পণ্ডিকার একটা বি-
 'পণ্ডিকার' প্রকাশ করিতে বস্তুপরিচয়।
 পণ্ডিকার যে সাহায্য নয় বা তাহাযের যে অশ্বস্তিকার
 নাই একথা আবিষ্কারে বলিতেছি না। সমাজে বস্তু-
 পণ্ডিকার নবায়নের সাহায্যকরে কল্যায় পণ্ডিকার
 তাহায বাহ্য করিয়াছেন তাহা লক্ষ্যেই পণ্ডিকার
 পণ্ডিকার দেখিয়াছি। তাহায রূপকাকীর্ণ সত্য,
 পণ্ডিকার পণ্ডিকার পণ্ডিকার পণ্ডিকার পণ্ডিকার
 হেন সে কথা ভাবিয়াছি ও জানি, তবুও তাহাযের
 যে পণ্ডিকার আছে তাহায পণ্ডিকার দেখিয়া পণ্ডিকার
 পণ্ডিকার। তবে একথা সত্য তাহায তাহাযের
 পণ্ডিকার পণ্ডিকার পণ্ডিকার পণ্ডিকার পণ্ডিকার
 দেখা করিয়াছেন, তাহাযের পণ্ডিকার বাহ্য দেখিয়া

তথিবা শাইটালেন, ঠাণ্ডা হইবে কলস্রাজ তাঁহাদের
কীমনের ঘটনা-সম্বলিত বাস্তব উপভোগ লিখিবার
অধিকারী, কিন্তু উপভোগিতব্যেরই যে এ বিধের
অধিকতা থাকিবে একথা স্বীকার করিয়া লইতে
প্রস্তুত নই, কারণ এ শ্রেণীর অনেক লেখকের
লেখার ভিত্তর পতিতাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিছু-
মাত্র সুটীয়া উঠে না। পতিতা কথটা জুলিয়া
দিলে, আর পাচজন স্রোতোৎসব, তাহারও
এতদনই বরণের স্রোতোক। পরিশেষে বলি,
‘পতিতার কীমন-কাহিনী বিবৃত করিবার পূর্বে
আমাদের পূর্বের গুরুদ্বন্দ্বীর কীমন-কাহিনী, তাঁহা-
দের গুণবৃত্তান্ত, অভ্যন্তর-অভিযোগের বিষয় বর্ণনা
করা কি অধিক প্রার্থনীয় নহ? আর সমাজের
পতীর ভিতর তাহাবিগ্ৰহে না আনিতে পারিলে—
কোন এক সম্মুখাঘের ভিতর তাহাদের প্রবেশাধি-
কার না দিলে, তাহাদের চরিত্র বর্ণন করিয়া সমাজের
যে কোন উপকার হইবে তাহাও মনে করি না।
সমাজে বৃদ্ধা হইয়া গেছে, তাহারও সমাজের
অংশবিশেষ—সমাজে তাহাদেরও একটা স্থান আছে।
সমাজ-সম্বন্ধিতর মন্ত তাহারা আত্মক উপাধান
এবং ইহা বৃদ্ধা হইয়া না দিতে পারিলে সমাজ তাহা-
বিগ্ৰহে কোনদিনই গ্রহণ করিবে না। হারপার
সমাজ গঠন করিয়া সমাজের অঙ্গস্বী করিয়া
ইহাও সমাজ-ভাবিকেরা বাহ্যকে (process of
absorption বলেন) গ্রাসাইতে পারিলে ‘পশ্চিমা-
তন্ত্রের উপভোগের উপযোগিতা আছে, নচেৎ যে
কিছুমাত্র আছে তাহা আবর্তন মনে করি না।

এতদ্বির ল্যান্সার হার বাচহর ঐতিহ্য রচয়িতা
লেন হারামহামর ‘বিত্ত বাহা’ উপন্যাসে প্রথমে
পতিতার যে সমাজ লইয়াছিলেন তাহা যে সমাজ
সমাধান করিবার চেষ্টার আশ্রিত তিনি বাপুত,
সেই পতিতার কাহিনী ভাগিলে পূর্বোক্ত উপভোগ
ভাগির লবিত সম্প্রদায়ক করা যায় না। ‘পশ্চিমা-
তন্ত্রের উপভোগিতগঠিত নবর হারপার কাহিনীর

চিত্র আছে, আর রচয়িতাবাহ উপভোগ বর্ণনা পূর্ণ
কাহিনীর চিত্র আছে। এতদ্বির পতিতার চিত্র,
পশ্চিমা নহ—আমাদেরই যোগে—আমরা বাহ্যের
সত্য রচনা করিতে পারি না, সেই আমদেরই
যোগে, রুচর পতিতাদের পাশ্চাত্য অত্যাচারে ইহারা
পতিতা। ইহাবিগ্ৰহে সমাজ হইতে বিতাড়িত করা
উচিত কি না তাহার বিচারের কার্য আমি
সমাজ-সংস্কারকদের উপর দিতে চাই, তাঁহারা
এ বিষয়ে একটু অবহিত হউন ইহাই আমার
অনুরোধ।

তাই বলি, বস্তুগত উপভোগের প্রচলন বাহ্যের
কিন্তু অস্ত্রাণ চিত্র বাহ্যের নহ। প্রসিদ্ধ কলা-
সাহিত্যিক বোঁপাণা ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—
‘The realist if he is an Artist, will seek
not to show us a vulgar photograph of
life, but to give us a more complete
striking and convincing vision of life
than the reality itself.’

অপরপক্ষে তাহাবাদী লেখকদের স্বাধীনতা
অত্যাধিক বসিয়া অনেক সময় তাঁহারা এমন
লিঙ্কাজে উপনীত হন, বাহ্য বিচারসহ নহ। অল্প
সময়ের মধ্যে সাধারণ ভাবে (General concep-
tionsএ) উপনীত হওয়ার সভ্য হইতে তাঁহারা
দূরে পড়িয়া যান। অস্ত্রী অস্বকরণীয় লেখকেরা
অধিকাংশ দলে এই দোষগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

কোন কোনও বস্তুগত কথাসাহিত্যিক তা পতিত
কথাসাহিত্যিকদিগকে বিস্তর করিয়া বলিয়া
থাকেন, তাঁহারা কল্পনামাত্রের অধিবাসী,
সত্যের দ্বার তাঁহারা বড় একটা দানেন না।
কথটা কিন্তু আশে ঠিক নহ। কথটা বুঝিতে
হইলে কথাসাহিত্যের ‘সত্য’ আর বিজ্ঞানের
‘সত্য’র পার্থক্য প্রথমেই বুঝিবার চেষ্টা করিতে
হইবে। ঐক্য বার্মানিক প্রোটে যেহি বস্তুবাদীদের
‘অবগোপনকমিত’ সাহিত্য (Imaginative

literature) মিথ্যা, কারণ উহাতে প্রকৃত ঘটনার বহন ছিল যেখানে নাও থাকে না, সেইমত হইতে কাল্পনিক সত্য ও মিথ্যা সমন্বয়ভুক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু প্রস্তোতর ভাব বোঝাইয়া বিধা বলেন, 'কাব্যের সত্য' ও 'ইতিহাসের সত্য' এক জিনিষ নয়। ঐতিহাসিক বর্ণনায় ঘটনা না বর্ণনা করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক লবণাক্ত হইতে পারেন না, কিন্তু কলাকুশলী কথাসাহিত্যিক বা ঐক্য ঘটনা বা চরিত্রের বর্ণনা না করিয়া সম্ভবপর ঘটনা বা চরিত্র অঙ্কিত করিয়া—আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া বরণ্য হন। ঐতিহাসিকের নিকট সত্য তাৎক্ষণিক, অগত্যা 'যাহা ঘটনাছে বা ঘটতেছে'; কলাবিবেক—আর্টিস্টের নিকট তাৎক্ষণিক সত্য, যাহা ঘটতে পারে। হস্তলবণ পক্ষেই কথায় বলি—For while the historian is bound down to things which have gone through the formality of taking place, the creative artist is limited only by what Aristotle called "ideal probability". In the one case truth means fidelity to what was or is; in the other fidelity what may be.

এই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া বলাবী বেটে সত্যই বলিয়াছেন, "The artist's work is real, in so far as it is always true; ideal in that it is never actual". কলাবিবেকের কার্যের প্রত্যক্ষ অনুভূত বাস্তবত্বের সহিত মিল আছে বলিয়া সত্য; আবার সর্বপ্রকারে সম্ভবপর না বলিয়া আদর্শ।

তাহা হইলেই দেখা গেল, বাস্তবতা ও ভাবুকতার যান উপভোগে আছে ও চিরকাল থাকিবে। উভয় সম্বন্ধই মানব মনের সহজ জ্ঞান (instinct) হইতে উৎপন্ন। বাস্তবতা নিকটের ও পরিচিতের সত্য করিয়াই আনন্দ লাভ করে, ভাবুকতা দূরের ও অপরিচিতের বর্ণনা করিয়া লাভ পায়। প্রত্যেক এইটুকু।

আবার যখন বস্তুগত উপভোগিকেরা যে সত্যের জ্ঞান থাকে, সে সত্যের চারিদিক তাঁহারা কিরূপে করিয়া থাকেন? চক্ষুঃশ্রাব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিভীক্য, বুদ্ধির দ্বারা ইহা সত্য অনুভূত হইয়া থাকে। যখন বিভিন্ন ব্যক্তি একই বস্তু হইতে বিভিন্নরূপ অনুভূতি পাইয়া থাকেন, তখন সত্যের সার্বজনিক মান্যকারিতা কি রূপে হইবে?

বস্তুতঃ কলাবিদ আপনাতঃ করনার সাহায্যে সমস্তই পদ্ধতি তুলিয়া থাকেন। তাহাই বস্তু উদ্ভাবক —অন্যক। মানব-জগতের অন্তর্ভুক্তি তাহা প্রকাশ পাই-বার জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্তের আশা বায় হইয়া তাঁহারা বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আবার অবিস্মরণীয় সত্য অগত্যা নাই বলিলে অসত্যিক হইবে না। অগত্যা আছে জ্ঞান—অর্থাৎ বাস্তব—আমাদের জগতঃসৃষ্টি কাল্পনিক অগত্যা। আর লেখকের কার্যই এইরূপে এই বাস্তব—এই সত্যত্বের দ্বারা বর্ণনা। বৈশিষ্ট্য সত্যই বলিয়াছেন—“And the writer's only mission is to faithfully produce this illusion by means of all the devices of art of which he is a master.” আর যদি বাস্তবই সৃষ্টি করিতে হয় তাহা হইলে আদর্শ কি বলিতে পারি না যে প্রত্যেক আদর্শ সৃষ্টি হইয়া উচিত বাস্তবের সম্মান-বহন দৃষ্ট হয়? নহ-নাহী পুণ্যের নিকে অসত্য হইবে—অগত্যা জ্ঞানতঃ বাস্তব হইবে।

উভয় সত্যের দোষভগ্ন বিভাগ করিয়া দেখা গেল। বাস্তবতার দোষকে ভাবুকতার সাহায্যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে—বাস্তবতাকে আদর্শের সাহায্যে আটের পতীর ভিতর রাখিতে হইবে, আবার আদর্শের সাহায্যে সীমান্ত অসত্য পক্ষে বাস্তবতার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। আদর্শ-জ্ঞান বা বাস্তব-জ্ঞানের ইনিয়ে ওউয়ে সম্মিলনে সমস্ত জ্ঞান হইতে বিলম্ব হইবে না।

এখন পূর্বে যে কথাটিই আদর্শ বিচার

বাব তাহার বিকে কথাসাহিত্যক্ষেত্রে অবস্থিত
বস্তু উচিত। আটের উৎপত্তি জীবন হইতে—
শিল্পীর মানসকল ইহার উৎপত্তি স্থান। শিল্পীর
কল্পনারূপে ইহা বস্তু ও পুষ্টি হয়। আবার পাঠ-
কেন্দ্র মনের উপর ইহার প্রভাব বড় কম দেখা যায়
না। জীবন যেখানে আছে— প্রাণের লাড়া যেখানে
পাওয়া যায়, সেইখানেই শিল্পীর ভাবেরও পরিচয়
লাওয়া যায়। পুরোঁই বস্তুবাদি তাব কল্পনারূপে
লিখি হইয়া মুক্তি গ্রহণ করে। যখন প্রাণ লইয়া
সংসার চলিতেছে তখন শিল্পী বা কলাবিশেষ চরি-
ত্রের পক্ষের ভিতর অবস্থান করিতে হইবে। যিনি
নতুন বস্তু আরো জীবনক চালাইতে চান, যিনি
জীবনের অসুস্থতাই ভগ্নির বিস্তৃত করিতে গিয়া ক্ষু-
ণ্ণ অসুস্থতায় পরিচয় দেন, যিনি অকলমবীণ
পট্টমার মত কেবলমাত্র নকল করেন না, পঠন কাণ্ডে

মকতা ইহার অনন্যসাধারণ, সেই শিল্পীর বাবিক যে
কত বেশী তাহার এক আর্থ তাহাও বর্ণনা করিয়া
বলিয়া দিতে হইবে। হতুগন লাভেরের আর এক
ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আবার বক্তব্য শেষ করিলাম :—
As he (novelist) deals with life, he
must deal with moral facts and ideas
everywhere involved in life; and it is
upon his moral power and insight and
upon the whole spirit and tendency of
his philosophy that the real greatness
of his work very largely depends. কথ-
সাহিত্যিকের নৈতিক শক্তি ও মতদৃষ্টি এবং তাঁহার
ধার্মিক মতবাদের উপর তাঁহার উপন্যাসের গভীর
জ্ঞান ও মহৎ নির্ভর করে।

উত্তর

এক

(ঐশ্ব্যভ্যন্তর্য সাংগ)

সংসারে চরিত্রের মতের দৃষ্টি পূর্ণরূপের বর্ণ-
নাকল্প হইতে একান্ত পারদূর। সুস্থিত বস্তুকে সং-
সারেই সে দাতার ঘরে বসিত হইল, শিল্পী দাতার
পুত্রকে যুদ্ধে ভুলে নিয়ে, তাকে দাতার অভাব
তোলাতে গেলেন, তাগা বিধাতা কিত্তি দাঁড়িপাল্লার
তরুণ তার অসুস্থের কল কল! জ্ঞানি বিধাব করতে
ভুলেন না। বহু পাত লাগে না যেতেই তার বাপও
তাকে কোল চলে গেল। সম্পদের মোতে
অসুস্থের অভাব হয় না। বিধাতা স্রোতের
মত উদ্ভাসে বেগে ছুটে এলে, তাহা অসুস্থের মধ্যেই
তার বাপের দাতা জীবনের সুখের রক্ত-চাপা স্পন্দ

যে দাতার নিয়ে খুঁজে, উড়িয়ে পুড়িয়ে, কতানশার
করে দিল। ঐশ্ব্যের বস্ত্র ভেঙ্গে এলে র দাতারের
নিষ্ঠুরতার দৃষ্টি দ্বয়ের চড়াই বেগে দিল।

সুস্থের বাকীর সুস্থে ছিল একটা পাউকীর
মোহন। সুড়া মোকামার মম্বি বিক-
মোকায়ে বলে বেগে চোখের সুস্থে এই বিকট
কণ্ঠে বেগে দিউয়ে উঠে। দাতা এই বেগে-
টার স্পন্দ অসুস্থ করে নিম্নেরে মব্বা। কিভাবে
কেনল, তাহা কেউ এই মব্বান বেগেটার বিকে
দৃষ্টি পাত করার প্রয়োজন না বেগেলে, ঐ হতভাগ্য
বেগেটাকে উপহাসী রেখে, সুড়া আপনার সুখে

প্রাণ তুলতে পারল না। আরেঁর দিকে তাকিয়ে সে মৃত্তিকে ছুঁড়িয়ে এনে নিজেও বাড়ীতে আশ্রয় নিল। সংসার সমুদ্রেও ক্ষুধিত ভরক্কে মগ্ন গার বৃষ্টি, বুড়ো মন্দির বিক্রমকে আঁকড়ে ধরে জুগে-ওগে হাঁড়াল। বাহুবলী সতীর্ণতা থেকে বুড়ো কতীর্ণমাসার সংসারে আতঙ্কিত হয়েছিল। আবেগের কটা দিন সংসারের বেনা পাওনা থেকে নিজেও মুক্ত হওয়ার জন্য বড় ছেলে ইলুকের হাতে সমস্ত তার দিয়ে সে তীর্থবর্ণনে মজা খাড়া করল।

বাগবা একটু গভীরস্থিতি বৃষ্টি বুড়োর সংসারে পেল—তার চলে যাওয়ার তার সেল। নিঃস্বার্থ ভাবে বসিয়ে বসিয়ে যেতে পরতে যেওয়ার মত উদ্বাসিত ইলুকের ছিল না। সে মৃত্তিকে বোকাবের কাঁধে লাগিয়ে দিল। একে ছেলে মনুষ্যতার ঐশ্বর্যের কোড়ে বর্জিত, বেগা মুগা ছেড়েই এই প্রাণ বোকাবের কাঁধে বেঁধে নিয়ে যাবে বসব বৃষ্টির প্রাণ হাঁকিয়ে উঠেছে এখন সে সংসার মোড়ে হাঁকিয়ে সাড়া, ঘোড়া, শোকজন বেবে মনটাকে তাকাত করে নিত। প্রাণ বুড়োর বিন কিছু না বললেও জীবনীয় ইলুক বৃষ্টিকে মার খোর জুক করল। বৃষ্টি মার খেয়েও কোন কষ্ট পেল না, নিজস্ব অঙ্গ হতে উঠলে, মারের ঘরনার মনের জুগে সে তাড়ের পুরোনো বাড়ীর বেউকার ভেতর বোঁকে যেত;—কিন্তু সে বাড়ী আর তাড়ের নয় তাই আত্মবোধ বহলে শেখান হুঁতের বড়ো খেয়ে পালিয়ে আসত। এখন ভাবে সে তিন বছর কাটিয়ে দিল এই আগাচ, যে বুড়ো মন্দির আবার আসবে। কিন্তু তিন বছর পুরণ, বুড়ো কিয়লো না। দুধিনে যে পিতার মত বেবে তাকে বিশদ হতে রক্ষা করেছিল তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে মূর্খ যেতে পারছিল না। তাই সে এত লাঞ্ছনা সহ্য করেও বুঝ বুঝ পড়েছিল।

সেদিন বন্ধনে শীতের লকল। পাতার রাত পর্বাক বোকাবের কাঁধ করে বৃষ্টির ক্রান্ত দেখে

এখনই অস্বস্তি অবসার বিস্ময়কোত্তে আরও নিয়েছিল, যে লকলে বসন তার পূব ভাংলো, তখন বুড়োর বেলে ইলুক তার খোঁজের বাইরে হাঁকিয়ে উগ্রভাবে গর্জন করছে। তাড়াতাড়ি বিদ্যায় ছেড়ে, বোর জুগে সে বাইরে এসে হাঁকিয়ে কোন কথা বলবার আগেই ইলুকের কপট হস্তের মোটা-করত চপেটাঘাত তার গুরু করে দিল।

বিনা ঘোলে এই অস্বস্তি মনটাচারে বৃষ্টির প্রাণ একেবারে বিধিয়ে উঠলো। সে বুঝে জোবে জল না দিয়েই, অস্বস্তি জোবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

হুই

অপের কোঁতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে, সে সারানিন গবে গবে শ্বুরে বেড়াগ। রাস্তা পড়ে অলংকার লকে লকেই তার জুগার উগ্রক কল্লিঙ্গ; কিন্তু অলংকার সংগ্রহের কোন উপায়ই সে দেখতে পেল না। সারানিন সে বোকাবের দার নাই; কালোই, এখন বাড়ী কিরণে অলংকারের মনে তার প্রায়ই লাভ হবে। আর কি করতেই বা পারে? লঙ্কায় ত' একটা সীমা আছে!

হতভণো বেনা লোক তার ছিল, লকলের কাছেই সে আশ্রয় বিস্ময় করে হতান হল। ইলুক ছিল সে অলংকার নামজান ববমাবেল; মৃত্তিকে আশ্রয় দিয়ে ইলুকের বিস্ময়জন হতে কেউ সাহায্য করল না। তাই তিন তিনটে দিন একরকম উপবাসী থেকেও বসন মোকের এতটুকু কল্লা সে পেল না, তখন তা: মনে প্রায়শঃ মনুষ্যলোকের গার স্থা হল। দারো দিখা, দ্রষ্টা, ভগ্নমার জাহান লাগিয়ে সংসার সমুদ্রে নিজস্বাৎ পাড়ি নিচ্ছে তাড়াই সংসারে লক—মার দারো অত্যাধিক দাকন পীড়নে বাহুবলী কল্লায় বিস্ময় হুই বোরে বোরে হাত পেতে, উপেক্ষায়, অর্ধহেণার মাদন ধারণ করতে বাধ্য হতে, নিরবের একটুকু ব্যতিক্রম

ভরে—তারাই—যজ্ঞে হীন-স্বপ্ন। তদবস্থার অস্তিত্ব
সম্বন্ধে কেউ তাকে কোনদিন লিখা দেয় নাই, তবে
মাত্রাধিক সে যে মৃত্যু-তত্ত্বাবধি বেধে আস্তে,
সেই হীনতার ভিতর দিয়ে তাবের স্তম্ভী কৰ্ত্তাকে
কল্পনা করে তার উপরস্থ সূরির কোন আশা ছিল
না। সঙ্গারের এই অবিচার অত্যাচারের বিচার
করতে গিয়ে মনের আন্তর্যে সে বিবেককে এমনই
বদ্ধ করে ফেলল, যে তার একটুকু অধি পণ্যের সে
মুখে পেল না।। লং, অলং বিবেচনা করবার
পাক্ত তার ছিল না। তাই সে অসংকেই বরণ
করে নিল।

কষ্টের আগীর তীব্র তাড়নায় সে রাকার সোকের
পকেট নাহতে চেষ্টা করল, হুতিবাহার অকৃত্যকার্য
হবে সে তার অপূর্ণত্ব প্রাপ্তকে কষ্টের ক'রে আর
একবার চেষ্টা করল, কিন্তু লম্বা-পের দর্শিত
শোণিত বাণী—যা তার শিরায় উপনীতায় বইছিল,
এক মুহূর্ত্তে তা বিস্তারী করে তার হৃদয়-ভেদে ঘায়ে
মাঝা কুটুবে লাগল। পকেট হাত পুড়ে দিয়ে
আবার তার মর্জীত কৈশে উঠল, তাড়াতাড়ি হাত
বের করে নিতেই—পকেটের বাটাকা তার হাতে
উঠে, এসেছিল—কন্ কন্ করে সাতার হুড়িরে
পড়ল। তার পাবের তলার বিপর্যয়ক উপে উঠলো,
সে পালাতে পারল না। ধরা পড়ে আধালন্তের
বিচারে তার হৃদয়ের বেলপল।

বেলখানায় গিয়ে প্রথম দিন ক'রে—হুংবে,
ও স্বপায় সূর্যের বেহ এল মন ভেঙ্গে পড়েছিল।
কিন্তু সে এখন বেধল যে ইচ্ছাকৃত বাস্তব হাড় ভাঙা
বাটুনী এবং নিখাস্তরো চেয়ে এখানে এগে পতি-
অবের বিনম্রের যে স্বর্গের নিখাস কেনে বৈজের,
তখন সে মনের গুহেই দিন কাটাতে লাগল
বিশেষতঃ সে আরও বেধল, যে এখানকার সব
খীন—সবাই অস্বাভাবিক। পৃথিবীর নিখাস অত্যাচারে
কত হতে আশ্ব ব্রহ্ম করতাই বেন তারা বেল-
খানাকে নিরাপদ বেদে, আবর্জনার মত সংসারে

স্থখ্যাতি অখ্যাতি হতে হুংবে মরে থাকতে নির্মিয়ে
আত্মকুড়েই আশ্রয় নিরেছে। তাবের বেন প্রাণ
নেই—অসুস্থতা নেই—নিখাস, কারণ অখ্যাতি—
মোহকে তারা মূল্যহীন। সে আরও লক্ষ্য
করল, যারা সংসারের হুকু বনে অত্যাচার, অবি-
চারে বেলখানায় কবীর স্তম্ভী করতে, সেই সব শঠ
ভক্ত প্রায়কদের একজনও এখানে নেই। এইখানের
আবরণে তাবের স্বরণস্মৃতি এমনভাবে লুকিয়ে
রেখেছে যে খুঁজে বার করবার মত মোক
এখনও লক্ষ্যই নাই—তাবের কবেদ করে সাতবার
বেলখানা এখনও ঠেঁয় হয় নাই। তারাই
হুনিয়ার বক্তৃতা-কর্ত্তা—তারাই অপর্যবের বিচার
ক'রে দুর্লভকে বেগে পুড়ে—আগনারে নিরাপদ
করতে।

তিনি

হুঁদান পরে হুতি নিঃস্বপন, অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক
লগাটে কলংক স্বপ্ন নিয়ে বেগ হতে বেরিয়ে এল।
বেলখানী আলমী সে, তাকে কে আশ্রয় দেবে ?
অনেক ভেবে ভিত্তে সে স্থির করল সে স্রোতের
মুখেই যা ভেগে যাবে—যেখানে নিয়ে যায়—যাক্।

এখন বিন বেল থেকে বোরবে এসেই সে হু
দিন মনের পকেট মারল। সারাবিন সন্ধ্যার
চাওলিক পুরে যেতিয়ে লগায় সব সে স্রাভ হয়ে
সাতার ঘরের একটা রোয়াকের ওপর বসে
জাবছিল,—এই রকম ক'রেই কি সে উদ্ধার মত
লক্ষ্যপূত হয়ে ছুটে যেতাবে? এই কি মীনে
যাওনের প্রকৃত পথ? চিত্তের স্রোত এখন তার বর্জ্য
কর্ত্তায় ভরে উঠলো, তখন সে সূর্যের তেতর অদৃশ্য
স্বপ্না অস্বপন ক'রে সেই ঘোষাকের ওপরই ভরে
পড়ল। গুহুরের একটা কবের এলোমেলো জীব-
কাজে তার চক্ষু তেজ পেল, সে চেয়ে বেধল সে
একটা ময়ের মোকামের গুহুরে বসে আছে। চট্
করে তার দৃষ্টিতে তেতর একটা বস্তুকা বেগা

টুকে মধ্যস্থিত বিবেচনা গোলদাল করে দিল।
মোকামের লুপ্তবোধ তিচ্ছ ঠেলে দৃষ্টি ভেতরে ঢুকে,
ট্যাক থেকে একটা টাকার বের করে, এক খোঁজ
হঁদ নিয়ে একখানা ভাড়া বেতের গুণ বসল। মন
সে জীবনে আর কোনদিন স্পর্শও করেনি, কিন্তু
সেদিন সে বুকের আশা নিভাতে সেই বি আশ্রয়
পান করতে লাগল।

যখন তার পুত্র ভাঙলো তখন াত অনেক,
শতবৎ তার শরীর দেশার আচ্ছন্ন, কুখ্য তুচ্ছ
আনন্দান করছিল। পানের একটা পলিতে
খোলায় বর থেকে হাতের নিবৃত্ততা শুক করে
তখনও হাতে হাতে লুপ্তিত পানের বেলুয়ে চিৎ
কর পোনা বাজিল। নিম্নের অবস্থা দেখে তার
কাজা পাঞ্জিল, বানিকজন হাটুর ভেতর মাথা জুঁজ
মলে থেকে সে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কতজন সে সেই অবস্থার ছিল তা জানে না,
হঠাৎ তার কর্মসূচি সে চমকে উঠে থাক তুলে
যেবল, একজন লোক তার লুপ্তবোধ ধাঁড়িয়ে।
তাকে তাকাতো ঘেঁষে নোকটা বসল “কেয়া হুয়া
বেটা—কোটা কারে?” এমন দিষ্ট সজ্ঞান দৃষ্টি
অনেকদিন পোনে নাই, তাই জাবাব দিতে গিয়ে
তার বর্জ্যবোধ হয়ে সে কেঁদে ফেলল। সাধনার
বাক্যে লুপ্ত করে নোকটা দৃষ্টির অবস্থার কথা শুনে
পুনরায় বসল “কুছ তর নেই বেটা—ধাওয়া সাধ
চলো।”

সামুদ্রকে দৃষ্টি একটুও বিচাল করতে না, তবু
এই নোকটার ঘেঁষা আচ্ছাদনে সে মোহিত হই।
দিনা ব্যাক্যযারে তার হাত বের চলল।

জমীর শুভার নাম জানেনা হেন লোক পুত্র
অন্নই আছে। এক সময় এই জমীর বা পুলিনের
চক্রে বিজীবিলা ছিল। এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে
জন্মের ভেদ করলেও তার প্রাণ পূর্ণের মতনই
অপ্রতিবর্ত আছে। অমৃতের পতি, দৃষ্টিতে সেই
জমীর বা আচ্ছাদন এনে ফেলল।

লোকে জমীরকে বাঁধের মত ভা করলেও দৃষ্টি
কিন্তু এই নোকটার ভেতর এমন কোন ভাষার
জিনিস দেখতে পেল না। শিশুর মত লগল—
হেঁস, ধম্মা, মায়া ভরা অস্ত্যকরণ কি করে যে
সামুদ্রের কাছে বিজীবিলা হয়ে দাঁড়ায় তা দৃষ্টি
বুঝতে পারত না।

দৃষ্টিতে আশ্রয় দেখার জমীরের যে কোন
দাঁড় ছিল না তা নয়। দৃষ্টির সবল বেহ তার
ব্যবসারের পক্ষে খুবই লোভনীয়। কিন্তু মালের
শরাস অতিবাহিত হতে লাগল, জমীর প্রাণ ধরে
দৃষ্টিতে মলের আর লকলের মত ঈশ্বর কার্যে
নিয়োজিত করতে পারল না। দৃষ্টির হৃদয় চোঁচা
বক্ষণ চোঁচা—তাকে দৃষ্টি বহুর আবেশের একটা
মুখ মনে করিয়ে দিল। যে মুখখানা মলের মত
সুটে উঠে নিখুঁত সংসারের বিবিন্যাসে শুকিয়ে
গিয়েছিল। আর তার প্রতিশোধ দিতে কবিরের
বক্ষ উবার বুকখানা একদিন প্রাণের ঘন-ঘটার
আচ্ছন্ন হয়ে সংসারের ব্রহ্মে ভুৎ তুলেছিল। সে
তুচ্ছানে কত মত মুখের মুখ পাখানের বৃকে কাঁচকে
পড়ে জুঁড়ে হয়ে গিয়েছে—তবু একদিনের তরুণ
জমীরের বৃকে একটা রেখাপাতও করিতে পারেনি।
সেই জমীরের প্রাণে দৃষ্টি নতুন করে একটা পরি-
বর্তনের তুচ্ছান তুলেছিল। বিশ বছর পরে দৃষ্টি
দেখে জমীরের সেই অক্ষমতারে মৃত, শিশু-পুত্রের
কথা মনে পড়ত। তাই সে প্রাণ ধরে দৃষ্টি
শুভার বলবৃত্ত করতে না পেরে তাকে পুত্রের মতন
পালন করতে মনস্থ করেছিল।

জমীরের কিন্তু এ ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত টিকল না।
বিদ্যারাজ শুভার মলে বাস করে, অমৃতের মধ্যেই
দৃষ্টির পরিবর্তন দেখা দিল। অমৃতে বসিত হলেও
ভগবান তাকে সবল বেহ দিচ্ছিলেন। তাই
শক্তির সহায়তায় মলের ভেতর দৃষ্টি সে নাম
করে ফেলল।

চাঁর

করীওলায় বুড়ার চেলে ইলুক, বোতানবার
 রপেত, বহমান্দোতে বড় কম ছিল না। শুভার
 মলে মীম না লেখালেগ, লোকে তাকে একজন
 শাক্তা শুভা বলেই জানত। বড় শালোয়ায় যলগ
 ইলুকের নাম ডাক ছিল; তবে তার এই খ্যাতির
 একটা বর্ষ হয়েছিল জমিরের কাছে—সে চিরদিনই
 জমিরের ঈর্ষা করত। জমিরের শক্তির সঙ্গে পেয়ে
 না উঠলেও—যুগে সে কোন দিনই জমিরের কাছে
 ছোট হত না; বরং তাকে অপসন্ন করবার চেষ্টা
 করত। ইলুকের এই বাস্তবত্বের ভক্ত-জমিরের
 মনের সঙ্গে বরাবরই দ্বার মনের একটা বেঘোরণী
 চলে আসছিল।

মুন্নি যখন কখন থেকে বেঁচিরে এলে জমিরের
 আশ্রয় নিল এবং জমিরের স্নিহাপাত হয়ে উঠল,
 তখন তার যুগ-যুগ্মতায় বেবে হিংসার টঙ্কফে
 মনের ছাই চাপা রাগের আগুনটা বিগল তেলে
 আল উঠে—জমির ও মুন্নির সর্বনাশে ক্রতঘর হল।

অন্নবিনের মধ্যে জমিরের শিকার, কুড়িতে
 মুন্নিরও পুং নাম হতে লাগল। সেই সময়ে একদিন
 মুন্নির একটা বড় ‘দল’ (বাঁদীতে) ইলুক
 বস্তুর সহিত জমিরকে আহ্বান করল—তা। সঙ্গে
 কুঁড় করত। ইলুককে চিরদিনই জমির দুগা
 করত, তাই অল্প দিনের মত সে দিনও তাড়াতাড়ি
 গাঙ্গি হেসে তাকে বসতে বলাব, ইলুক জমিরকে
 অস্ত্র তাবার গাল দিয়ে উঠল। ইলুক গাল
 বেঁধেই জমির কিছুই বলল না। তার মনের ব্যাধি
 সকলে প্রথম হয়ে উঠল বটে, তবে ইলুকের সঙ্গে
 কুঁড়ি লড়তে কেউ সাহস করল না। গুপ্তাদের
 অপমানের মুন্নিও রাগে দুগছিল, যখন বেঘল মলের
 কেউ ইলুকের সঙ্গে লড়তে এগলো না, তখন সে
 মলের ভেতর থেকে লাঞ্ছিত পড়ে জমিরের স্রুণে
 ঠাকিয়ে গলে উঠল “ওতাবানী”—

মুন্নির এগিয়ে আসতে বেবে ঘেঁষে জমিরের
 যুগ্মতায় বসতে উঠে হয়ে উঠল, দুগাত দিয়ে তাকে
 যুগ্মে চেপে ধরে জমির ভীষনের সর্ব প্রথম বিন
 নিজেই আক্রিয়া, আলনার হাতে মুন্নিরকে পড়িয়ে
 দিয়ে তার যুগ্ম চাপড়ে বলল,—“কীতা” রহো
 বাছা!”—

ওতাবানী আশ্রয় এবং বর্ষকনের জেছনি
 মাঝার করে মুন্নি সিংহ শিকার মতন কুঁড়ি আঁকড়ার
 লাঞ্ছিত পড়ে ইলুককে চেপে ধল।

যে মুন্নি একদিন ইলুকের অসুস্থতার ওপর নির্ভর
 করে জীবন ব্যয় করে, যাকে সে একদিন জুজু।
 বেলালের মত দুগা দিয়ে মলেছে—তাকে প্রতিধ্বি
 বেবে ইলুক কোঁবে আশ্রয় হল। সর্বজন করে
 উঠে সে মুন্নির ওপর তার বিন্দুগবে চাপিয়ে দিতে
 তাকে শুঁড়ো করে দিতে গেল। যখন দ্বিগুণ মুন্নি
 আশ্রয় বলে আশ্রয়কা করল,—ইলুক পড়
 ছোঁতেও তাকে পড়া করতে পারল না। ইলুক
 আশ্রয়ে সমস্ত শক্তিতে মুন্নির মাটির তেঁতর চেপে
 ধল—সার্বিক থেকে লগ্নাহুত) একটা শাক্তা
 সমস্ত আশ্রয় ওপর জড়িয়ে পড়ল—মুন্নি ব্যর্থ-ব্যর্থ।
 মুন্নির নিবের আরবে পেয়ে, ইলুক আত্মহত
 গল্লীত মুন্নিতে জমিরের দিকে তাকিয়ে আশ্রয়কা
 অবনোবানী হয়ে চিৎকার করে উঠল।

ইলুকের এই অগাধবাসতা মুন্নির দৃশ্যবৃত্তি
 এড়াতে পারল না। যে যুগ্মে ইলুক চীৎকার
 করে উঠল, সেই যুগ্মেই মুন্নি তার সমস্ত শক্তি এক
 করে ইলুককে আক্রমণ করল। অতর্কিত আক্রমণে
 ইলুকের মুন্নি শিথিল হয়ে গেল; যে আর নিজে
 সামলাতে পারল না। চারিদিকের আশ্রয়লীর
 মাঝে চক্ষের নিমিষে মুন্নি ইলুককে পরাভিত করে
 ধল।

জমির বাঁ আশ্রয়ে আশ্রয়তা হয়ে মুন্নির
 জড়িয়ে ধল। মূলেই খালার লজ্জিত মুন্নিরকে,
 জমিরের দল কাঁধে করে নিয়ে “চলুন—কাজ সেই

ভাবের স্বরূপ। করেছে। লক্ষ্যের স্থান জ্ঞানে ইহুক আঁকি ধরে, আত্মগোপন করে ভেঁদে ভেঁদে নিশে পড়ে কোথা সে অস্ত হয়ে গেল— কেউ আর তাকে দেখতে পেল না।

পাঁচ

পরাঙ্কের যদি মানুষের লাঞ্ছনা না হয়—তবে সে আরও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। মূর্তির কাছে পরাঙ্কিত হয়ে লক্ষিত হওয়া বুকের কথা—মনে মনে ইহুক লগ্ন করল, বেদন করেই হোক অপমানের প্রতিশোধ নেবে। হাসি তার মূর্তির চেহেহে কবিরের ভগ্নরই পড়েছিল বেঁধে—কারণ সেই হচ্ছে এর মূল।

দ্বিতীয় ইহুকের আবেগ মিলল। ইহুকের বোকাবোনের সমুদ্র ঘিরে মগধিমে বাঁধার তত্ত্ব। ভয়ঙ্কর সকলে কবির যখন নাওরান পড়তে মগধিমে বাঁধিল, তখন তাকে একলা বেধে ইহুকের লজ্জা মন কেশে ধাক্কা। বোকাবোনের পাঁচ ছ'জন লোককে নিয়ে সে কবিরকে আক্রমণ করল। অতর্কিত আক্রমণে কবির প্রবলটা কাঁচ হয়ে পড়লো, ব্যাণ্ডার বৃত্তে তার বেঁধে দেয়া হল না। সাঁধের চাষাবোনা কোথায় বেঁধে, তাড়াহাড়া কবির নিজেই লগ্নে নিয়ে—ইহুকের গলা টিপে ধরল। মনিষের লাজনা বেধে বলের লবাই এক লগ্নে পড়ল কবিরের ভগ্নর। কবির যখন বৃত্তে বে ডুখ আত্মরূপ করলে চলবে না, তখন একজনের হাতের একখানা লাঠি কেড়ে নিয়ে ইহুকের মাথা লগ্ন করে নাড়া—চতুর্ ইহুক নিজেই আক্রমণ বেধে টপ করে বসে পড়ল। কবিরের সেই প্রচণ্ড লাঠির বা অপর একজনের মাথার পড়ে কিন্নিকি ঘিরে রক্ত ছুটে বেরল—লোকটা হতচেহনা হয়ে পড়ে গেল।

চারিধিকের 'পুন' 'পুন' রব শুনে কবির আশ্রয় অবস্থা বৃত্তে গেরে পালাতে গিরে বেধল—তাকে

পুলিমে ঘিরে ফেলেছে। পালাবার চেষ্টা নিষ্ফল মনে করে, সে পুলিমে হাতে আত্মরূপ করল।

আত্মগোপনে কবিরের মনোবল উৎসাহ। আত্মকিত লোকটা হালপাতায়ে দাড়া গিরেছিল। পুনী মাঝরা, তার কবির দাড়া বন্যাবেগে। মূর্তির এবং বলের লোকের সংগ্রহ চেষ্টাচেষ্টে কিছু হল না। বাইকোটের চূড়ান্ত বিচারে কবিরের বাৎসরিক বীণাঙ্কর হল।

বেলগানার নিয়ে বাঁধার মত কবিরকে বাইরে নিয়ে এলে কবির বেধল, মূর্তি পাখরের মূর্তির মতন ধাক্কায়ে আছে—কিন্তু, নিশ্চয়! মূর্তির কাছে শেখ বিহার নিজে কবির মূর্তিকে বুক ঘিরে ছুটোখের অস্ত্রধারার তাক মগ্নক শিক্ত করে দিল। মূর্তি কণা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু—অস্ত্র তার কঠিন করে দিল—লগ্নে বাৎসরিক মত কীভাবে লাগল।

কবির ধাতে ধাত চেপে বলল "বেটা, আমার যা কিছু রইল সব তোরা। এ বাঁধা ছেড়ে দি— আর—আর—ইহুককে কণা করি—"

"কণা তুমি করতে পারি ওস্তাবেজী—মূর্তি কণা করতে জানে না। এ বাঁধা চাড়ে—যে আর একদিন আর মূর্তি—ভক্তার মূর্তি ধরে—তার পর হব সংসার—নর লাগর পার"—কণা কটা বসেই,— কবির কিছু বলবার আগেই মূর্তি কবির মত ছুটে বেরিয়ে গেল।

ছয়

কবিরের বীণাঙ্করে মূর্তি তার কণা লগ্নিতর মালিক হল বটে—কিন্তু, প্রাণে তার এক মুহূর্তের তরেও লাগি ছিল না। বিহারের কবিরের দাড়া, কবিরের দাড়া, ইহুকের অত্যাচার তার মনকে উত্থাপ করে তুলত—ইহুককে কণা করবার কথা মনে হলো সে যিগু হয়ে উঠত।

কবিরের কণা লগ্নিতর মূর্তি দ্বারা—পতীৎ দ্বারা—বিনিমে বিতে লাগল। মন কণের তেতর

দিয়ে দুরি তার মনকে নোহাতে চেঁচা করল, কিন্তু মন তার প্রতিশোধ নিতে বিশ্রোহী হয়ে বীড়িত। ইহুকে কমা করতে সে নিজেই মনকে অনেক হুঁকমকে খোজাতে গেল, কবিরের দুর্ধণ্য মনের কের উদয় হয়ে তার সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি ওলট পাগল করে দিত। যে কবির রাস্তার আবর্জনার মধ্যে থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে সন্তানের মতন আবার রেখেছিল সেই পিতৃহৃদয় ওস্তাদলী ইহুকের চক্রে পড়ে কোথায়—কোন সাগরের পারে নিহতী কঠোর নির্বাসন ভোগ করছে! এর মত হাতী ইহুক! সেই তার বুকে আত্মন লাগিয়েছে, তাকে কমা করবে সে। ওস্তাদলীর আশ ছিল, তিনি ইহুককে কমা করতে পারেন, কিন্তু তার আশ কৈ? এতটুকু বেলা থেকে 'বা' দিয়ে দিয়ে মানুষ তার বুকের কোষল তরিক্তলা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে—সে তার আর জোড়া লাগবে না। মানুষকে কমা করবার মত শক্তি তার নেই। আশাস্তর প্রতিশোধ আশাত—সেই সে শিকা করেছে।

তারপর দুরি ওপর দিকে হাত তুলে বলল,—
খোবা তুমি বহি থাক আনার শক্তি বাও—ওস্তাদের ঋণ শোধ করতে হাও! তীব্র প্রতিজ্ঞা করে দুরি নিজেই পিটরে উঠল। চিত্তার থাকল উৎসে তার আবার শিখা ছিল না—কেপা সুস্থদের মত আনিশি লক্ষ্যেই অসহ্য সে ছুটে বেরাঙ্গিল।

সাত

সাত এফটা বেছে গেছে। মিস্ত্রাহীন দুরি বিদ্বানীর ওপর বসে—চিত্তাভারে অবনত। বাইরে কুল, কুল করে বৃষ্টি পড়ছিল, দেখলো রাস্তার পাচ অককার তেল করে বিদ্বান মাস্তে মাস্তে তাড়বলীলা করছিল। দুরিরও কুলের মাঝে সমস্ত-বিকল্পের একতরু বসে ব্যাঙ্গিল, ডোব দিয়ে বিদ্বান বহি ছুটছিল। বিদ্বানীর ওপর কুল করে সে বসে থাকতে পারল না, রাস্তার ধারের জানালাটা খুলে,

বাইরের ত্রিসিত আশ পাগের আশার বেগল, রাস্তা অনুসৃত। বহুদূর দূরী বার—কেউ নেই আর ভেতর। অনেকক্ষণ পরে একখানা ভাড়াটে সাতী রাস্তার তল তেলে অতিক্রমে ছুটে গেল, খোড়া হুঁচী তিলে আবহাওয়া হয়ে পড়েছে—তবুও বালক কাবুত দারছে। বেগে দুরির বুকের ভেতর বহুতর করে উঠল, সাতায়ে জানালা বন্ধ করে, সে ধরেই ভেতর উত্তেজিত ভাবে পাখচারি করতে লাগল। সাধবার চেষ্টা তাকে আরও বেশিই তুলছিল। একটা আগের সখাবান করবার আগে লক্ষ্য আর এগে তার, বহিষ্ট বিকৃত করে বিন।

ইহুকের বাড়ীর সুস্থেব এগে সে মনকে বীড়াল। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিস্তার ঘাঘরত স্পর্শে সব অচেতন। আত লমকেই লম্বা বরলা খুলে সে বাড়ীর ভেতর এবেল করল। তৈলদানী আরোপ দ্বিট দ্বিট করে অসছিল, সেই সম্পষ্টতার দুরি বেগল, ইহুক আপাব মনক চারির ঢেকে যুগুচ্ছে। আরও গ্রোণ সে ধরে আর কেউ নেই—এক। ইহুক। নিহিতের বুক ছুরি বগাতে দুরির বীর জ্বর একবার তেল হয়ে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই দুর্দল মনের ওপর পাবারচার চাপিয়ে—সে তার শেনীতলাকে লব্ব করে নিল। সে মনে মনে ভাবল, খুনীর আবার খণ্ডাখণ্ড কি? পাল সুখা কি? ইহুক কি বর্ণের দিকে চেয়ে ছিল—বদন তার ওস্তাদলীকে দিখায় জালে ধকিয়েছিলো। তবে সেই বা কেন সাতু অজায়ের বিচার করো! সে আজ অকৃত ওস্তা, তার জ্বর নেই—লম্বা, মায়, লম্বা কিছুই নেই। প্রতিশোধ নিতে এগেছে—প্রতিশোধ সে নেবেই।

কাপড়ের ভেতর থেকে সে ছুরি বার করে ইহুকের ওপর লক্ষ্য করে বরল, বুক গোপুণ ছোঁয়া পিণাসাভূরের পানীর বর্ণনের মত আনবে লক্ষ্য বন্ধ করে উঠল, যুগেই দুরির হাত ওপরে ঊর্ধ্ব—লম্বা নিহিতের বুক মথ্যে ছুটে গেল।

অসুট লম্বা ক'রে আত্মজিত মোকটা লবন

চট্টকটু করতে লাগল তখন প্রাণের সীম অলোক
আঁধারে সুপ্রি বা বেবল তাকে তার সঙ্গিনীর পর
দ্রষ্ট করে কৈশে সাগা অব ধামে জিনে উঠল। কি
সঙ্গিনী!—ইহুকের বসলে কাকে খুন করেছে!
যে একদিন তাকে আঁধার ঘিরে অনাচারের হাত
থেকে বাঁচিয়েছিল—সেই কটীওয়ালা মহিষ বুড়াকে
সে খুন করেছে।

তাড়াহাড়ি সে কটীওয়ালা বুড়াকে টেনে লুপতে
গেল, এখনও যদি কোন আশা থাকে। কিন্তু সব
শেষ। নিম্নের প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ
স্বপ্ন করে বুড়ো চিরবিদায় নিয়েছে। সুপ্রি কি
মনে করে বুড়ার বুক থেকে ছুঁচোনা তুলে নিল,
তলকে তলকে আঁহত স্থান দিয়ে তখনও তাই এক
বেকুজিল। সুপ্রির মনে হল সেই রক্তজ্যোত যেন
তাকে ভাসিয়ে নিয়ে বেতে ছুটে আগসে—সে যে
সব দিগে এসেছিল সেইখান দিয়ে ছুটে গেরিয়ে
যেল।

আট

খুনের পর সাতদিন সাতরাত্রি কেটে গেছে।
সুপ্রির চক্রে নিম্ন। নেই,—আঁধারে আবৃত নেই—
অন্ধু চিত্রা আঁধা চিত্রা। বুড়ের সেই রক্তমাথা
যেহ, সেই অমৃত যেননাভগ্ন আঁঠু
নাথ, সেই অমৃত বহুবার চট্টকটানি তার
চোখের ওপর সর্গদ্বাই ভেঙ্গে আসছিল। কি
কাবে সে—কিছুই স্থির করতে পারছিল না।
অজ্ঞানের কথা না শুনে সে প্রতিশোধ নিজে গির্ঘে-
ছিল—খুব প্রতিশোধ নিয়েছে। ইহুকের বুক
ছুরি ক্লান্তে গিয়ে সে নিম্নের বুক ছুরি বেয়েছে।
তখনও তার বিশ্বাস ছিল না, মানুষকে সে বৃণ
করবে—আজ আজ—সে খুনি, প্রাণের তারে মরুর
দোর দিয়ে লুঁবির আছে। হাতের রক্তের ছাপ
স্বপ্নের করে ঘুরে বেগলে, মনের দুর্গলং। সহজবার
যাঠোয় নাগদেও খোঁজতে পারছে না, বড় গলা করে
একদিন সে বলেছিল যে প্রাণের তার করে না—
প্রাণের দায় নেই। আজ তার নিম্নের কাছেই

নিম্নকে বোঝি জেনে লজ্জার বৃণার আঁধারতা
করতে ইচ্ছা করছে। কানীর তার সে খেন্নি করছে
না বহু বর্ষাহত হচ্ছে সে বুড়োর খুনের অপরাধী
হ'তে। উঃ এ পরাধর তাকে লজ্জা লজ্জা উত্তাপ
করে তুলবে।

স্বপ্নিত্তার তারাক্রান্ত হয়ে সুপ্রি যখন আঁধারতা
হয়ে পড়েছিল তখন সে বেবল, কে একজন তার
সুখে এসে থাকিবে বললে, “আঁধার ডাকছে।—
আঁধার হয়ে সুপ্রি নিভাণ। করল—কে তুমি?”

“আমি? জিনতে পারছ না? সাতদিন
অন্ধময় বিনয় করে যার সাহায্য চেয়েছ, তার স্বপ্ন-
বৃষ্টি বেধে জিনতে পারছ না—আঁধার! বিশেষ
চিত্তার-অন্ধুরিত হয়ে এখন জ্বালান হয়ে পড়েছ?
খুনের কোনও লজ্জা রহনি,—তোমার কেউ লম্বের
করে নি; তবে তার কেন? ওঠ—গাইয়ে যাও—
ইহুকে খুন করে ওজাবের স্বপ্ন শোধ কর।
তবে না মানুষ—তবে না কথা। যাও—কোন তার
নেই, আমি সাহায্য করব।—বিশিষ্ট সুপ্রি কিছুই
বুঝতে পারল না, স্বপ্ন মনে করে সে হঠাৎ চোখ
সমুদ্রে তাকিয়ে বেবল, তখনও লোকটা স্থির
ভাবে তার সুখে বীড়িয়ে রয়েছে। তবে কি বস্তু
না। রক্ত হয়ে সুপ্রি কি বলতে গেল, কিন্তু আঁড়ই
মিছা একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না।
সুপ্রিকে চুপ করে বসে থাকতে বেধে আগন্তুক
পুনরায় বলল,—“এখনও তার—এখনও ভাবছ!
এখন সত্যি সত্যি, কেউ টের পাবে না—ওঠ—ইহুকে
যে বুকুচ্ছে—তার বুক প্রতিধ্বনিত ছুঁচি বসিয়ে
যাও সে। সেদিন একটা তুল হয়েছিল বলে
ভাবছ? আজ আমি সব ঘেরিয়ে দেব—ওল।
ওজাবের কথা মনে কর, কোনও গায়েব পাবে কি
নির্ঘাতন সে ভোগ করছে মনে কর—নিম্নের
প্রতিজ্ঞার কথা মনে কর—”

“কে তুমি সত্যতান—আঁধার নরকের পথে জেনে
নিম্নে থাকিস্—”

কে তুই—

“হা—হা—ভিন্নতে পেরেছ, আজ সমতান বলে
রাগ করছ, কিন্তু এই সংসারকেই এতদিন ইষ্ট
কর মত যুক্ত পুসে রেখেছিলে। এই সমতানই
পথের ধুলো থেকে রাস্তার ঐশ্বর্যে। তোমার বসি-
য়েছে—আবার ইচ্ছা করলে, এই সমতানই তোমার
জিয়ারী করতে পারে। বিবেকের ভর করছ!
বিবেক আবার কি? কিছু নেই—হুনিয়া সম-
তানের, সমতানেরই থাকবে।”

মহাবিশ্বের সমস্ত স্রষ্টা যেমন প্রাণপণ শক্তিতে
আপনাকে নিরূপণ করতে বিশিষ্ট স্নেহে বৃত্ত করে,
সুত্রি মনের ভক্ত। যেমন প্রাণপণে ঠেলে ঠেলে
চেষ্টা করে বলে উঠল, ‘দূর হ’! চাইনা হোর
সাধায়া!—কি সর্বনাশই আমার করেছিল’—
আগন্তকের দিকে উত্তেজিত তাকে ছুটে যেতেই—
তার চোখের স্রষ্টা কে যেন বাস পরল। টেনে
ছিল, বিব্রতভাবে তার চারদিকে ঘুরে উঠল—সে
সজাৱীন হয়ে বেস্তের উপর চলে পড়ল।

যখন বুদ্ধি ভাবল, তখন প্রত্যন্তের আলোকে
নিখ উজ্জল হয়ে উঠেছে। তীর মেখার মত তখনও
তারি সর্বশরীর অসাব্যপূর্ণ। গত রাত্রেই কথা মনে
করে সে ঘরের ঘরটা পরীক্ষা করে ফেল—যেমন
সে বন্ধ করে রেখেছিল, তেমনিই রয়েছে।

তবে কি সব স্বপ্ন। তবে কি পানী মনের
বিকার! না সমতাই সমতান তাকে প্রস্তুত করতে
এসেছিল। সে কি তবে সমতাই মনে প্রাণে সম-
তানের কৃতজ্ঞ। তা যদি হয়—তবে ত’ সমতান
তাকে আত্মীয়ে এমনই প্রস্তুত করে পাগের পথে
টেনে নিয়ে যাবে। না—না—সে অসম্ভব। তাকে
বীভূতকেই হবে—সোজা হবে। স্রষ্টার কাছে
পরাজিত হলেও, সমতানের আশ্রয় সে কিছুতেই

নেবে না। অতিষ্ঠ মন শান্ত করতে সীমার সর্ব-
প্রথম দিন—সে নদীর গড়তে বসল।

নাথান শেষ বলে সে মনে সমতাই একটু
অকুসলতা অনুভব করল। যে ভগবানের নাম
করে আজ সে ছববে এত তৃপ্তি পেলে—সেই শান্তি-
মর অনামিপুত্রকে সে এতদিন আশ্রয় করেছে—
তুণ্য করেছে। এ’ তার একদিনও মনে হয় নি,
—যে স্রষ্টার তেজের ইচ্ছা আছে, তার সত্যবাদীও
সেই স্রষ্টা। ঘরের বেগালে জ্বিলের একখানা
ছবি টাঙান ছিল, সুত্রি তার স্রষ্টা পিসে বলে
উঠল,—“ওজানকী তোমার কথা না শুনে সম-
তানকে প্রভা বিয়েছি—তোমার নির্দোষ
সত্যনকে কথা কর। আজ তোমার কথাই রাখব
—জ্বিলের দর এ বাৎসা ছাড়ব। আত্মীয়ে কর
যেন তোমার সাক্ষর সমতানকে জ্ঞা করতে
পারে।”

ওজানকের উদ্দেশ্যে সেলাব করে, বাড়ীর লোকের
অজান্তলাগে সুত্রি সব ফেলে রেখে রাস্তা নিয়ে ছুটে
চলল। থানার স্রষ্টা পিসে সে একজন
কনেটবলকে দিচ্ছিল। করল, “সামোয়া বাহু
কোথায়?”

কনেটবল সুত্রির কথার উত্তর দেওয়া নিয়োজন
বোধে প্রাণ করল না। তাকে স্রষ্টাতে ঠেলে দিয়ে
সুত্রি আকিল ঘরের দিকে ছুটে গেল। প্রবর্তী
চিংকারে অজান্ত কনেটবল এবং সামোয়াবাহু ছুটে
যেখানে এসে সুত্রিকে বেঁধে, সামোয়াবাহু দিচ্ছিল।
করলেন, “কি হয়েছে—কে তুই—কি
চাস?”

সুত্রি বিব্রত মনে হয়ে বসল “পানি সুত্রি ওজা—
কী ওজা বাহুকে আনিই বুন করেছে। চাই
না কিছু—বহা দিতে এসেছি”—

গেরুয়া রঙের দেশ

(ঐনোলা দেবী)

১৩৫৫

১

এ যে গেরুয়া রঙের দেশ
অতুল ভোগে বিপুল সুখে
ত্যাগের কথা বাজছে বৃক
মুক্তিকামী শান্ত সুখে
হাত অনিবেষ
এ যে গেরুয়া রঙের দেশ

২

এ যে গেরুয়ার পাঠাবার
হাওয়া ছেড়ে বনাতিল্যাব
কুৎস তালি তর বিলাপ
কিরীট ছেড়ে চায় অটপ
ভক্তি করি সার
এ যে গেরুয়ার পাঠাবার

৩

এ যে গেরুয়া বনের কুল
বিবেক বিরাগ সোমে সোমে
শিরায় শিরায় কীপছে মনে
মৃদাঙ্কুরের সমিধ ঘোমে
আরক্ত তার কুল
এ যে গেরুয়া বনের কুল

৪

এ যে গেরুয়া গগন তল
অনীল মাছার কাঞ্চল এঁকে
নিভা জিনিষ দেহনা ঢেকে
নীলের আকাশ জনন থেকে
গেরুয়া অবিল
এ যে গেরুয়া গগন তল

৫

যেথা গেরুয়াধারী রাম
আকুবরশা, শিবাজী বৃহ
বিক্রমাবিত্য প্রোতাপ শুভ
অন্তরে চির যোক লুভ
রাহিরে রামার সাজ
যেথা গেরুয়াধারী রাম

৬

এ যে গেরুয়ার লগাতল
শুভায় শুভায় পুনে শিলায়
বন উপবন তথোপন মূলে
কোটরে কুলায় গৈকত পার
আছে তজের দল
এ যে গেরুয়ার লগাতল !

৭

যেথা গেরুয়া বদন মন !
লক্ষ্য অচিন্ত্য জৈমিক ত্যানী
বক তরি বাখা-ভাগি
যোক যেদি' জীবের লাগি
'রুড়ায় রে বদন
যেথা গেরুয়া বদন মন

৮

এ যে গেরুয়ার পাঠাবার
মোহমায়া মহা সব ভেসে যায়
তৃণ কুটী সম তরল যায়
হার কোলে শিশু হরিমায় গায়
বিভূপদ করি সার
এ যে গেরুয়ার পাঠাবার ।

বংশের কলঙ্ক

(উপন্যাস)

(ঈশ্বরোত্তরকুমার বসু)

উদ্বিগ্ন পরিচ্ছেদ

বিষয়ের সীমা

অরুণের বেশ দিন কাটতেছিল। সফল সুখের
মাসের অরুণের মনোর কোণে অত্যা ও আকাঙ্ক্ষা
কিন্তু চোখের আলো অস্বস্তি জন্মিত। কিন্তু গ্রাম
অসর সফল বিষয়ে তাহার সুখের অত্যা ছিল না।
এক সে অত্যাগত সেবা প্রকৃত ও সন্তোষিত,
তাহার উপরে এই বিষয়ের ভঙ্গিতে তাহার সুখ
স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছন্দ্যের অত্যা ছিল না। বহু
পুণ্যের ফলে সফল বহু একত্র অস্বস্তি কৃত্য ভাগ্যে
কৃত্য থাকে। সফল নিম্নের সফল প্রকৃত করিয়া
অস্বস্তি প্রকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের প্রকাশ
পাইত। তাহার উপর বহু কোঠার সফলকারে
অরুণের প্রতি একত্র অস্বস্তি বহু পড়িয়াছিল।
তাহার স্রীপুত্রের তাহার সন্তানের বহু ভাল বসিত
এক নিম্ন তাহার সফল চোখ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য
বিধানের সফল ছিল। বিশেষত কোঠারের কৃত্য
মৈথিলীর আশ্রয়বহি অরুণ একবারে বিশেষ ও
স্বচ্ছন্দ্যসীমিতার কথা জুগিয়াগিয়াছিল।

সিবা—আমোহ বহুতে কিছু দূরে একদিন অরুণ
শিকারে গিয়াছিল। সফলবিন ভাড়া ভাড়া করিয়া
শিকারের সফল মিলিত না। কিন্তু তাহার বহুতেও
অরুণের পরিচরিতা কম হয় নাই। সে বহন এক-
রূপ নির্ভর অস্বস্তি সফল সফল বসার করিয়া
অসিল, তখন একটুকু মিলিত সেবিয়া তাহার সফল
অসলার বহু বহু, বহুবিধের তাহার সফল পুরিয়া
উঠিল।

অরুণ সেবিয়া বহু একটুকু খুঁচী বা আবক্ষ্য
নাই। যেখানে যে মিলিত রাবিলে সফল, তাহার
সফলই তাহে সফল বহুতে। তাহার বহুতিল

চোখের উপর কেমন মানানসই অস্বস্তি থাকিয়া
সোতা পাইতেছে। তাহার বহু তেও কেমন,
বিলম্বিত তাহে একদিন সেবা সেবা পড়িয়াছিল,
এখন কে বহু অস্বস্তি বহু সেওপিকে বহুতানে
সফলইয়া রাবিতাছে। অসলার উপর তাহার
সোবাক পরিচরিতা কি সুখের পরিচরিতা সফল
বহুতেছে। সেখানে সুখসুখের অসলার বোনা
একবারি সুখ টাকান ছিল, এই
বহুতানি অরুণের সফল প্রকৃত ও অস্বস্তি
বহু ছিল। অরুণ সেবিয়া সেবানি টিক তাহার
বহুতানি সফল টাকান বহুতেছে। তাহার উপর
বহুতানি সেবা সুখের সফল সেবা পাইতেছে।

ইহা চোখের উপর সফল অস্বস্তি পড়িয়া “সফল,”
“সফল” করিয়া অস্বস্তি সফল তাহিতে তাহিতে অরুণ
ভাঙিল “সফল !”

সফল কোনও সফল না বিয়া চোখের সেবা ও
কিছু অস্বস্তি বহু লইয়া বহু চুপিল এক টুপের
উপর সেওপিল রাবিতা বিয়া নিম্নে ইহা চোখের
পার্শ্ব বাহু পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

অরুণ চা পান করিত করিতে হানিয়া বসিল,
“কিহে, অস্বস্তি বহু বিয়েছিল না কি ? কথা
কবি নি ? তাহলে কল অস্বস্তি শিকারে বহু,
কি বসিল ?”

সফল কোপাইতে লাগিল। অরুণ সফল তাহার
সফল বহু সুপাইতে সুপাইতে বসিল, “নিহে বহুতানি
বহু সুপাইতে সফল ? সুই সেই সফল সফল
কি করতিল বহু বহু ? অস্বস্তি, অস্বস্তি বহু
বহুতানি বহু বহু—”

আর ব্যস্তিতে চাৰিতেছে না, এখন কি সব কথা
 একাংশ করিয়া বিবেচনা করা যোয়াইতেছে। সে
 অকলসের বাড়ী গিয়া কর্তার কাছে সব বলিবে,
 আর সকলে এই কলম বলিতেছিল। তখন
 আর বাবাভি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া
 দিয়া রাখিবারে। কলম কথা কিছু যেটারকমের
 টাকা চাই। তাহা হইলে সব ঠাট্টা হইবে।
 অপর কথা, অনিবার্য বিবাহে। সবুজ ছির হইয়া
 গিয়াছে। সে বামলার বাবু তাহেই জ্ঞানিয়াছে
 যে তিনি নীতাই সরোজের সহিত অনিবার্য বিবাহ
 হিবেন।

আর কি লেখা ছিল, অকলসের পড়া হইল না।
 চিঠি থানা তাহার হাত হইতে বসিয়া পড়িল, সে
 একটা লক্ষ্যমণি কুইতে সমুখে চাৰিয়া রহিল।
 কতকাল সে এই অবস্থায় রহিল সে জানেন না, যখন
 গঙ্গা আসিয়া বাইতে ডাকিল, তখন তাহার চক্ষ
 ডাকিল। সে যখন পড়ার কঠে বলিল, “গঙ্গা,
 তোরা বেলে যা, আমার বিয়ে নেই।” বেচারী
 গঙ্গা তাহার চোখ দুখের জায় দেখিয়া ভীত হইল।
 সেই চোখদুখ হইতে যেন সমস্ত আলোক নিতিয়া
 গিয়াছে। বহুদিন আগে ভূঙ্গিগে যোগীর োখ
 দুখের যেমন চেহারা হে, ঠিক তেমনই চেহারা
 তাহার প্রভুদুখ চোখে দেখিয়া গঙ্গার আশটা
 কাঁচিয়া উঠিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল,
 অকলসের সেই কাতর স্ত্রী দেখিয়া কিছু বলিতে
 সাহস করিল না। বুদ্ধিমান গঙ্গার মুখিতে বাকি
 রহিল না, যে চিঠিতে লিখিত কোন বন্ধ সংবাদ
 আছে।

গঙ্গার ঘন চিঠিতে লিখিত বহুটা জানিবার
 লজ আতুল হইয়া উঠিল। গঙ্গা প্রভুর অলক্ষ্যে
 পত্রখানা ফুটাইয়া লইয়া পাকশালায় গিয়া পড়িয়া
 ফেলিল। পড়িতে পড়িতে তাহার চোখ দুটা
 বিস্ফারিত হইয়া পড়িল, মাথাটা গুপিয়া গেল। এ
 কি হইল! এ যে সব গোলমালে ঠেকছে, তার

বিবিস্মির মনের জাব যা, তাতে ত’ এখনকার
 বহুর কথা নয়।

গঙ্গা রাতি অকলসের ঘুড়াবনার কাটিল।
 এতে উঠিয়াই সে পুনঃ বিকারে যাইবার অতি
 প্রায় একাংশ করিল। গঙ্গা প্রায় পশিল; বিকার
 আগতি করিল; কিন্তু কলম কিছুই হইল না।

অকল কোমার চাপিয়া নীরবে বিষম বদনে
 বসিয়া রহিল। শির জাতারা তাহার এই ভাব
 দেখিয়া বিস্মিত হইল, অকলকে এমন কখনও
 তাহার্য্য জেবে যেবে নাই। অকলে মাঝিয়ার মন,
 তাহার্য্য বলিল “গাংগা, সাবধানে থাকবেন লক্ষ্যে
 লুণাণোপনি আর চেননা পালককে যোরে নাহেবের
 সব কোমার ক’রে লজনের দিকে আগতে
 যেবেছি।”

অকল কেবল কেল কেল করিয়া তাহার দিকে
 চাৰিয়া রহিল, কথটা তাহার বারশা কেজ্জে
 পৌছিল না, সে এত অজ বিবরে তদ্বয় হইয়া ছিল।
 সে বসুক ও খুঁকরী লইয়া অকলে প্রবেশ করিল।
 প্রায় ঘণ্টা ধানেক ইতস্ততঃ খুঁজিয়া অকল একটা
 বন-বিড়াল শিকার করিল এবং একটা বস্ত্রবাগকে
 লুণ করিল। আর যেন অকলের কোনও বিষয়ে
 লক্ষ্য নাই। আর যেন তাহার জীবনের কোন
 মনতা নাই, এই ভাবে সে চলিতেছে কিরিত্তেছে।
 যেখানে অকল আসিয়া পড়িয়াছে একদূরে সে
 কখনও আসে নাই, সে সাধারণতঃ নদীর তট
 লক্ষ্যেই শিকার করিয়া থাকে।

অকল কুকায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। অকল
 বসিয়া কিছুকাল জাতি হু হু করিল, কত কি ভাবিল,
 তাহার পর কুয়া কুকায় তাড়নার অধির হইয়া
 দৌকায় প্রত্যাবর্তন করিবার লজ চেষ্টা পাইল।
 কিন্তু কিছুকাল খুঁজিয়া সে কোথাও গুণ খুঁজিয়া
 পাইল না। একটা বিষয়ে সে বড় আশ্চর্য হইল।
 সে যেখানে যায়, সেইখানেই সে পক্ষাঘ্নে অতি
 লক্ষ্যেই শিকার করিয়া থাকে।

ভনিত পায়। কে এই অদৃষ্ট ভীষ্ম! যে বের
হটক, কোনও মন্য ছেড়ে যে সে ভাঙা অঙ্গুল
করিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভীষ্মে
মহাতোম হইলেও অঙ্গ সতর্ক হইল, দুই দিন তার
চলিয়া ভাণ করিয়া হঠাৎ পঞ্চাতে তাহা দেখিল,
কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

বিহ্বল গুণে এইভাবে অঙ্গের হইবার পর বনমধ্যে
অঙ্গ নদীর পল্লীর মলকোলে ভনিত পাইল;
তখন তাহার মনে বড় আশঙ্কা হইল; অঙ্গ একটা
প্রকাণ্ড ঝোপের গাছালায় লুপ্ত হইয়া সন্ধ্যা
নদী ঘেঁষিবার মাথা ঘুঁটিয়া করিল, তখন যে
বৃষ্টি তাহার মনে পড়ে পড়িত হইল, তাহাতে সে
তড়িত হইল।

কিছু দূরে নদীতটে কতকটা ঘানেক ঘন পলি-
কৃত, কিন্তু সেই ঘানটা তাহার পরিচিত নো-ঘাটা
নহে; সেই পরিচিত ঘানে একখানা কাটের ঘর
এবং সেই ঘরের পার্শ্বে বোকা কাঠের তক্তা সুশোভিত
ঘরের সন্মুখই উজ্জ্বল অগ্নি একখানা বাঁশের
চৌকির উপর বসিয়া অগ্নি মগ্নমগ্ন ঘোরে, তাহার
হাতে প্রকাণ্ড চাকু; ঘোরে লগা বাঁশের চোকে
করিয়া চতুর্বিধ অস্ত্র কোনও রূপ দুঃস্বপ্নে বস;
যেহেতু সন্ধ্যা লুগা পানি নাইক আর জ্বলন্ত
একটা চুড়িতে লগা কিবা অস্ত্র কিছু তল পলাই
গরম করিতেছে, শায় হইতে বাশ টাণ্ড হই-
তেছে; চেবনা গাঙ্গল নাক সপরি একটা আঁপ
জ্বা এতখানা পুঁকরি শান দিতেছে। ঘোরে
কৃতবরে সুখাপাণিক লক্ষ্য করিয়া কি বলি-
ছিল, লুগা ভবে ভবে কাহিন্যে এক আঁপটা
লগা দিতেছিল এবং চেবনা মুচকি মুচকি
হাসিতেছিল।

একটা বিবাহ অঙ্গের পক্ষে দূর হইল।
কারখানার তক্তা প্রায় সংখ্যার কম পড়িত।
কে ছুরি করে অথবা কোণার দাল ঢালান হই
কেনই বলিতে পারিত না। আঁপ জ্বলনের মধ্যে

এই লুভ্যারিত ঘানে জগন্নাথ মোহের আত্মনা ও
চোকা তক্তার সুগুণ দেখিয়া অঙ্গ বৃত্তি গেরি কে
এবং চোকাই দাল কোণার ঢালান হয়। কিন্তু
এমন যে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে ঘোরে
ও ঘোরে কৃতবরের মধ্যে কণোপকখন ভনিতার
নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। বলাগতন সতর্ক হইয়া সে
কোণ জ্বলনের দ্যা দিয়া অঙ্গের হইতে লাগিল
এবং দেখান হইতে উঠাঘের কথা শুনা যায় অঙ্গ
তাহাকে দেখা যায় না, এমন একটা ঘানে পিয়া
একটা ঝোপের মস্তানে দাঁড়াইয়া রহিল।

অঙ্গ ভনিল লুগা পানি বিচুড়া দিকোতে এই
ভাষের কথা বলিতেছে, “হাত ওর পদতনের মস্ত
পাকে, মারি কি করে? কারখানার বা বাগার
ওর মারতে নানা করেছ, নিশের কলার ভী
বিত্তের মানা করেছ, মারি কি করে বল দেখি?”

বৈশাখের মোহের চোখে দুটা লগাঘরের মত
লাল। সে সেই ভাঁটার মত গোল এবং রক্তের
মত লাল চোখ পাঁকাইয়া বলিল, “কেন, অগ্নি
মারতে পারিলি মি? ঘরে বা কারখানার মারতে
নানা করেছ কি লাখে? শুনিছ নাগাকে
পাইয়েছে সাধে নিজে, সাধে নিজেও এখানে
লুগা পানি আসছে। ঘরে ঘোরে মারলে, কি বিবের
কথা বলিলে জানাবেনই ধরবে যে! লগা ঘানে
আনার সঙ্গে খড়কা, তাই আনাকেই আগে ধরবে।
তার চেয়ে অগ্নি মারলে কেউ ধরতে পারবে না,
নান করবে বরাব কি বাখে ঘেরেছে।”

লুগা বলিল, “একলে যে মারি লগায়া ওরে
আগায়া।”

চেবনা রাগিয়া বলিল, “ও আঁপলা! কত
আঁপের তার দিক না, কেনন আগায়া দেখি।
বেটা দিশনি কিনা, ও লানানার পানি।”

লুগা দ্যা জ্ব হইয়া বলিল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোকা
মরব জানি রে শানি মারি। বা না, একবার-

‘হোঁচাব কাছে এসিয়ে দেখ না। ঐ ভ’ মনিব
নিঃস্বপ্নে একদিন ওরে নাড়তে, কেমন —’

কথা শেষ হইল না, ঘোরে এক লম্ফে তাহার
ঝড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া গলা টিপিয়া ধরিল।
যেদিন সে অকপের শিকলের ভয়ে পলাইয়াছিল,
সেই দিন হইতেই তাহার উপর ঘোরে ভয়ানক
রাগিয়া ছিল। এখন একটা ছুটা পাইয়া সেই
রাগটা নশ করিয়া অগ্নি উঠিল। ঘোরে তাহার
গলা টিপিয়া ধরিল। তারপর দুইজন তাহাকে
বাঁধিয়া পাঁচতলার কেনিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

অকপ আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। তাহার
পর দুই চারি লম্ফে অগ্রসর হইয়া বটুকতলে উপস্থিত
হইল। বন্ধনের ব্যতনায় বত না হউক, ভীষণ ধূলা
মাখক দুহাত কণা জাখিয়া লুণ্ণা পানি তখনও
পরিত্রাণ চিৎকার করিতেছিল। অকপকে দেখানে
যেবিদ্যমান হাফন বিশ্বরে তাহার চিৎকার বাধিয়া
গেল, স্তূত ষিটমিটে গোল চোখ দুটা বতবুর লম্বব
বিচ্ছিন্নিত হইল।

অকপ বিশ্রুত তাহাকে বন্ধনযুক্ত করিল।
লুণ্ণা পানির চোখ বিধা মল পড়িতেছিল; সে
বন্ধনযুক্ত হইয়া একবারে অকপের পাংর মাথা
সুটাইয়া পড়িল এবং তার তক্তি তাগবাগা দ্বিগ্নিত
‘বরে বার বার মাথা ঝুকিয়া বলিতে লাগিল, “আবু,
আনে।” অকপ আবার তাহা কিছু কিছু শিখিয়া-
ছিল। আবার তাহার উহার অর্থ, “বাগ, না”।
অকপ বুঝিল সে তাহাকে বলিতেছে, “তুমি বাগ,
তুমি না।”

অকপ হাসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল এবং লম্বে
লইয়া কাঠের ঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরের
সামগ্রী দেখিয়া অকপ বিস্মিত হইল। সেখানে
বোতল ও বাঁশের বেক, চেয়ার, টেবিল, বাট এক
বিছানাপত্র, বৈদ্যলগ্ন, অগ্রগত কিছুই অভাব ছিল
না। ‘লুণ্ণাঘরের সুবে সে অনেক কথা ভাবিল।
ঘোরে বন্ধন হইতে এখানে একটা আত্মনা করিয়া

রাখিয়াছে, বন্ধন হইতেই এখানে কারখানার
চোরাই কাঠ চালান হয় এবং লুকাইয়া নদীযুকে
জাহান বিধা ভেরপুরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করা হয়।

অকপ তাহাকে অস্ত্র দিল এবং লম্বে লইয়া নৌ-
খাটায় গেল। সেখানে ঘোরে আরও দুই বান
কোন্না রাখাছিল। তাহার কোন্নার চাপিতে
বাইতেছে এমন সময়ে কোণ লম্বল ভেদ করিয়া
“আবো আবো”, বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে
একটা লকন লোক নৌ-খাটার বৌদ্ধিয়া আগিল।
আবার তাহার “আবো” অর্থ “বাগি”। অকপ
আশ্চর্যকর্ণ প্রস্তুত হইয়া ঝাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য
হইয়া যেমিল সে লোকটা আর কেহ নহে, তাহা-
রই অঙ্গুষ্ঠ নিখা হাতের ধরি। অকপ তখন বুঝিল
কেন সে লকনে পন্দাতে বাহুবুর পাংর লম্ব
ভাবিয়াছিল, বুঝিল, এই অসত্য লকনোরা কিরণ
কৃতজ্ঞ ও প্রভুতত, একবার ইয়াবিককে বল
করিতে পারিলে ইহা চিত্তকাল কেনা গোলাব
হইয়া থাকে। কোন্নার খাইতে বাইতে সে লুণ্ণা
পানিরই সুবে ভাবিল হাতের কিরণে তাহাকে
সর্বনাশ করা করিয়াছে, সর্বনাশ তাহার জীব তাহা
অঙ্গুষ্ঠ করিয়াছে।

যখন অকপ বাগায় করিল, তখনও বেলা মাঝে।
বাহিরের লকল হইতে যখন সে ঘরে প্রবেশ করিতে
গেল, তখন তাহার শরৎ-ককে নারী কণ্ঠে কথা
হইতেছে ভাবিয়া বিশ্রিত হইল। ঈষৎ অগ্রসর
হইয়া দ্বাভা-পারিষো ঝাঁড়াইয়া সে ভাবিল, বৈবিন্দী
বলিতেছে, “লকা, নিছ আলুগুলো ছাড়িয়ে রাখ,
আর কীটা চিনি ঘিরে বেবে বেশ করে তেল
পাকিয়ে রাখ।”

গলা রহাই ঘর হইতে লবাব বিল, “হলটা কি
আল থেকে মাখাযো এখন বিবিন্দী?”

বৈবিন্দী একটা বাগি ব্যাচিত্তে ব্যাচিত্তে
বলিল, “না, না, ও এখনও দেহী আছে, আমি কি

নাযাবে। তুই ঠিক জানিস আসতে আজ রাত হবে?”

পলা বলিল, “ঐ বিদিশি, ঠিক রাত হবে। দাদা বাবুর মনটা ভাল সেই। সেই যে চিঠির কথা বল্লুম ঐ চিঠিটাই সজ্ঞান করেছে। আজ নৌকাব রূপ তোমার কানকেই পড়া বাবারটা পেয়েই দিন কাটবে যেনে’ বন। চিঠি এসে পর্যন্ত বাওয়া বাওয়া আছে কি?”

মৈথলী আরও কি বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বিছানা ঠিক করিয়া আলনার কাপড় শুকাইতে শুকাইতে ঠাণ্ডা তাহার বুটী দ্বার গবে পড়তে সে যেখান শিকারের খেপে দ্বারে ঠাড়াইয়া অরণ্য কুমার। এমনই তাহার হাত হইতে কাপড় চোপড় বসিয়া পড়িল, সুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, অতর্কিতভাবে থা পড়িয়া দ্বারের লজ্জা লে অতিক্রান্ত হইয়া পড়িল।

অরণ্য হাসিয়া বলিল, “ও তাই ত’ বলি, যোজ যোজ কোন ঘরে অপরা এসে এমন ক’রে ঘর লাগিয়ে দায়! এ যে ছোট বোনটী আমার লুচিখে লুচিখে একাক করছে, তা কি ক’রে জানব!”

“বাও! তোমার সঙ্গে আর কথা কব না,”—বলিয়া ক্রোধভরে বোনী ঘোলাইয়া মৈথলী চলিয়া গেল। অরণ্য হাসিতে হাসিতে হিলি চেয়ারে শুইয়া পড়িয়া থাকিল, “পলা।”

বাই দাদা বাবু বলিয়া লাড়া দিয়া পলা হাতির ধইল এবং তাহার বাবা বাবুর জুতা ঘোলা ইত্যাদি খুলিয়া দিতে দিতে বলিল, “ঐ বেশ, বিদিশি ঘরে গেল, রসটা ভাল হোতে নামাতে হবে যে। বাই একবার—”

অরণ্য তখনও হাসিতেছিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, “আরে, যেনে’ বন ওলব, তোকে তাতে হবে না। হীরে পলা, এলব লাগাই পোছাই তোমার দিক দি বিদিশি ক’রে, তুই আমার বলিল নি

কেন? বলল বুঝি তোমার নিজের কেতাবিওর কথাটা চাপা পড়ত?”

“ইহু তাই বুঝি লাগাব?” বলে—“ত আমার ও কথাটা পেট ভেলে গেছে, তা বিদিশি কি বলতে বের? মাঝার বিদিশি দিয়ে নিশা। করেছে, এই নিয়ে বিনামূল্য বাবুর সঙ্গে বিদিশি একদিন স্বপ্নটা হয়ে গেছে।”

অরণ্যের মুখ ঠাণ্ডা রক্তের ভাণে পরিণত। অরণ্যের মনে পড়িল, আজ কখনই দাদা বিনামূল্য তাহার সন্তান ভাল করিয়া কথা কহেন। সে কি এই ভক্ত? কি পাপস! যাকে সে নিজের দ্বার পেটের বোনেও দত্ত দেহের চক্রে বেধে এবং যে তাহাকে সন্তানবরের দত্ত জালিগণে ও আগের দত্ত করে, তার সঙ্গে স্বপ্নটা।

অরণ্য ভাবিল বিনামূল্যের এই ভুল ভাবিয়া দিতে হইবে।

এদিকে পলা বাবু কাপড়চোপড় আলনার শুকাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিতেছিল, “তুমি কি ভেবেছিলে দাদা বাবু, আমি এমনই ক’রে ঘর শুভিবেছি, না এমনই লব ভাল ভাল খাবার কুত বাইবেছি! সব বকিনি বিদিশি করে। জান, লাগাব, প্রথম প্রথম তোমার ঘরে আসত না, তার পর একদিন ঘরে এসে দেখে শুনে বলে কি, ‘বাগো এক ঘরের ছিটি! নিশা মাঝে খেটা আর স্বপ্ন পলা।’ এই তার পর থেকে তুমি না থাকলেই এসে সব বাড়ি বেড়াবে, লুচিখে-বাগার তৈরি করে, আমার নিজেদের বাগা হ’তেও খাবার এনে বের। তুমি শিকারে গেলে এমন ক’রে বাবারের বাজ লাগিয়ে বের কে? ঠিক দাদা বাবু, বাগি-পালের বিদিশিগির বত গো, ঠিক বাগিগিরের বিদিশি। সেও এমনই ক’রে তুমি না থাকলে তোমার ভেতামার ঘরে ঢুকে সব বেড়ে শুড়ে—”

অরণ্য উঠিয়া বলিল।

সবক আঁপের আঁপটাকে তারার প্রাণে। বড়ো কুঁড়ে ভাঙে যেবেছিল। একদিন আঁপি
সে গম্বীর ঘাত, হঠাৎ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, "কি লুকিয়ে রেখেছিল, —"
কতছিল পদ্মা, তোরা নিশ্চয় কি করেছিলো?" "পান, খাদ্য, আমার কাপড় আর চুই কুঁড়ে
এক মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই যে," বলিয়া অকণ বেণ পরিবর্তন করিয়া হাঁতমুখ
যে বল্লুখ সাধাবাহু। তেমনি বিধানাপত্য, বুইতে গেল।
তোমার কাপড়টোপড়, তোমার কেতাবপত্র সব (ক্রমশঃ)

ছৎপদ্যে

(ঐকান্দিদাস তার বি. এ. ক. পেশায়)

এই বেহতির গঁদে অত ক'না সহি	তা' ছাড়া এই দু'নের পেহের, এ কুল তামা
কোনো দিওর,	তইবে কতদিন?
হর মেহের বালাই অনেক আল সে তরুণ	কতক হবে বিবিস্ত কতক হবে
কাল সে যে বর্জ্য।	শুকুনো রসদীন।
এই বেহতির কুল পানে	পাপুড়িগুলি থাকে বরো
চামার কাঠিই হয় গোপনে,	ভরবে এ শির মাংসের ভোঁরে,
অনেক কাঠাই হস্ত আছে, অনেক কাঠাই	গড়বিহীন পেশুর কুলায়, কুলয় হবে
অব্ধে নিঃস্তর।	কনক কলেবর।

তার চোখে এই মীন সতের পরদলে

আসন রচ' রাণি;

কেহের বলহরকো নাচাইবে

তোমার আসন বানি।

এ যে সন্নিব' তাক্যানয়

বীট বা কাঁটার নেই কোন' ভয়,

বেহের পদে ভোগে পণি, বিরাম ক'র

জয়র সন্নিব' পর'।

মৌমাংসা

(গল্প)

[ঐবিজয়রত্ন মজুমদার]

রাজ্য চলে না ।

হাঁ, না দেখেন রাজবন্দী, করেন কিছ্র !

- অভিযোগ জানাতে এলে প্রমাণ বাধ্য বৃকে নিয়ে
কিরে ঘা, অভাবের কথা শোনাবে কাক, রাজার ঘোঁসাধ না। মন্ত্রী রাজ্যের নতি কোঠাতে
পারলেন না, প্রজার আকুল ক্রন্দন রাজার আসন
টলাতে পারলেন না। যা ছিল তাই হবে গেল।

হেলে মানুষ রাজা! হেলে মানুষ হলে কি
এক, রাজ্যশাসন আর একশাসনের ব্যবস্থা বেধে
রাজার পিতামহের কালের মন্ত্রীর বৃকও ধন হাত
থয়ে উঠেছিল। তাঁর অগ্রাবে এই সুবিশুদ্ধ, শাস্তি-
বিচারিত রাজ্যের যে কোন অনিষ্ট হবে না, সেইট
বৃকতে পেয়েই মন্ত্রী পরকালের দিকে চেয়ে তাঁর
নাম নিচ্ছিলেন, সে লোকে পৌঁছুতে হলে যার
নামই একমাত্র পাথরের কাঁচ করে।

বিধিবিগ্নি। হঠাৎ হয়ে গেল, অগ্ররত্নম।
রাজা শিকার করতে গিয়ে কিম্বদন্তীর দেখা
পেলেন। পেত্রীর নাকি বাপ মা নেই, তাই বোন
নেই, মাথা গোঁজবার কুঁড়ে ঘরটুকু নেই। অথচ
সে বলে তার সব ছিল। বাপ মার কোলের মতো
বেধ বিছিয়ে, তাই বোন হৃষ্টিকে হৃৎগড়ে ভড়িছে
সে তার কুঁড়ে ঘরে শুয়ে ছিল। নিস্কর হাত,
হঠাৎ পদ্মিনীর ভাবন খসল, হল ছুটল গাছ পালা
উপড়ে পড়ল, এক, বাছুর বাসুধাক কাঁধে নিয়ে
গর্জতে গর্জতে কল ছুটে এল। অথবা নিল তার
তাই-বোন হৃষ্টিকে! নীনা ভাবের আঁকড়াতে
দিয়ে ভেসে গেল। জোন্দের সঙ্গে লজ্জাম তুরে
ঘিরে এসে দেখিল, হর ভেসে গেছে, ভাঙা ঘরের

ঘাটী ঘুরে গেছে, বাখারীর কাঠামটা নড়ে আছে,
হারি নিচে থেকে দেখা দাঙিল, চাঁদখানা অর্ধু না।
যে চাঁদখানা পা নীনা বৃক চেপে ধরত, যে পাখি
বৃকো সে মাথার বিড়, সে পা-চাঁদখানার হাত বৃকোতে
বৃকোতে সে ঘুরিয়ে পড়তো!...হেলে মানুষ, বোকা
রাজা, তাই পেত্রীর কথা শুনে কেঁপে, তাকে কাঁধে
করে বাড়ী নিয়ে এলেন। মন্ত্রী কত বোঝালেন,
কত্মে বু চালালেন।

মন্ত্রী বোঝালেন, পেত্রীর প্রত্যাহার সন্ধান
হবে, রাজা হেলে বললেন—সে জিনিষটা দেখবার
তারি লগ। মন্ত্রী বললেন—রাজা যাবে, ঘন ঘন
যাবে, প্রাণ যাবে। রাজা আবার হেলে বরেন-
একসঙ্গে লাফ, চাপ নেই। মন্ত্রী ঘনন দেখলেন,
কিছুতেই কিছু হয় না, লোক নিয়ে বলে পাঠালেন,
পেত্রী নয় গটী মানুষই বটে। রাজা ইচ্ছা করলে তাঁকে
পত্রী করতে পারেন। এ কথার উত্তর এল—তা
হলে শু স্বর্ণ হাতে পাই। কিন্তু সে কিছু
বলে না!

মন্ত্রী ভাবলেন—এ ক্র ত্যাগা আপন ছুটল!
আরে বাপু, সে বলবে কি? পুরুষ মানুষ, মন্দ
দিনে—তাই কেন না বল না। বুঝিলে ঘনন ভোমের
মতো কি ছাই ভাগবাসা নাকি হেয়েরে তখন বলে
কেন, এসবারে জলপার একটা হয়ে থাক।

কিন্তু এ পরামর্শ মনে উঠল, মনেই মিলিয়ে
গেল। মন্ত্রী মহাশয় হাড়ে নর, অজ্ঞার অজ্ঞার
চটে দিয়ে ছিলেন,, স্বর্ষ-কর্ম্মে ঘন দিয়ে—“নিষ্ঠুর
হলেন। যাকে যাকে নীর্ঘখাল,” তা পেট
অভ্যাসের দোষ!

এই রকম চলছিল। কিন্তু আর চলে না। অত্যা

অভিযোগের প্রতিকার না পেয়ে আগের যেমন অবস্থা হয়ে পড়ছিল, অত্যাচারী ও তত্ববদের সাহস তেমন হ্রাস করে বেড়ে উঠেছিল। হৃদয়কার নীলা বেবাই এখন সব্বীপার হবার দাবি, তখন প্রজারাজ তম্বী তামা, হাতা-বেড়ি, ঝাঁড়ি, কুঁড়ি নিয়ে দেশান্তরে চলতে লাগল আর অপর পক্ষ নির্দোষী আর অস্বপ্ন নিয়ে গ্রাম বাড়ীর আনাচ বানাতে ব্যবসারি জুগ করে গিলে।

রাজার হোক, দুটো মস্ত্রী ত! এ রাজার পিতা পিতামহের আমলের আগল রাজাই ছিলেন, ইনি। সব খবর শেলেন। পেয়ে কাউকে কিছু না বলে এতেনা টেতেনা আইন-কাহুন ভুলে দিয়ে লাঠি হাতে হাজির হলেন একেবারে রাজারখরে।

বলেন—রাজা বার! বাইরে চল, প্রজারা কিরে আসবে।

উত্তর নেই।

বলেন—তোমার সুখ দেখতে গেলে প্রজাবের সব গ্রন্থ তামা ভুলে যাবে। এস! এস, এস।

রাজার সুখ শুভ, কথা নেই।

বলেন—আবার সেবার রাজা পক্ষে ঠাইবে, একবার এস, একবার এসে তোমার ছেলে মেয়েদের সামনে ঠাঁড়িও। একবার তাদের বুকেতে ধাঁও, তামা অভিভাবকহীন নয়, তাবের বাপ আছে, রাজা আছে! সামন্ত তোমার হাতে দেখলে আবার তোমার দৈন্তেরা হল পাবে, প্রজারা অতর পাবে। দস্তারা-রাজা ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না।

রাজা তবু—নির্বাক।

মস্ত্রী মহাশয় কীধ কীধ হয়ে বলেন—চল, চল, তোমাকে যে তোমার প্রজারা সামন্ত বলে, তাবের সে আশ্বাস ভেদে দিয়ে না—রাগসত্য চল।

রাজা কথা কইলেন, বলেন—পার্বা!

মস্ত্রী কৈলিবে চান।

এর ঘেড়ে গিয়ে সাহস বাঁচেন না। তাঁর

এর এখানে, ছেড়ে গেলে তিনিও বাঁচবেন না!

মস্ত্রী অভিযাপ বিতে মাঝিগেন, বিতেন ও দরত, পরকালের প্রচানী, পারের বাড়ীর জোঁধ গোড়া পার না, মাথার তবে উকীল গুলে চোখে দিয়ে চলে গেলেন।

খ

নীলা বলল—এতকাল যিনি দেখছেন, তাঁরই হাতে কেন সব তার দিয়ে যেন না মহারাজ!

রাজা উত্তর দিলেন—বুড় সে তার দিতে চান না। নীলা, আবার ওপর তাঁর...

রাজা হয়েছে। নয় মহারাজ!

রাজা নয় নীলা—অভিমান।

নীলা রাজার মুখের দিকে চেয়ে বিজ্ঞাপ করলে—অভিমান?

তাই, নীলা! কিন্তু তিনি আবার বিক্টা বেধেন না।

আপনার আবার কোন দিক মহারাজ?

আমি যে তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড অস্ত্র কোথাও যাওয়া ঘুরে বাস—সত্ত্ব চিন্তাও করতে পারি না। রাজাই কি নয় নীলা, আবার আগের কোন দাঁধ নেই?

নীলা নীরব। এ উচ্ছ্বাসের লগ্নে অজানিনী যে নিজেও এড়িয়ে পরছে।

রাজা বললেন—এ যে কি বুড় তা বোঝেন না। আর বুজবেন-ই বা কোথা কেঁকে। চিরকাল বকেতর ধন আগলেছেন, মরখা দিয়েছেন, ভাল-বাসার মর্ষ কি বুজবেন তিনি।

অতাপা-বুড় জীবনে রদী সুখ ঘরান করে নি। বাপ-মা যখন বঁচেছিলেন, দিয়ে করবার জন্যে বেদ করতেন, তাই, যখন তাঁরা বর্গীর্ছিলেন, মস্ত্রী দ্বন্দ্ব করা ঘুরে বেগ, স্বজির নিষেধ কেনে গজীর তাবের রাজদরবারে এলে খাতা পড়ত গুলে বসে গেলেন।

রাজা বললেন—এ দাঁড়া কথা-নীলা যে তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না, আর এক দাঁড়া যে রাজা

গেসে স্বর্ণ খোঁজ সবাই, শিতা—শিতাহ সবাই
আধাক অতিশয়্য করবেন।

কিছুতেই কি তুফল রাখা যায় না মহারাজ ?

কেনন করে বাবে নীলা। নদীর একতল
পড়তে মৃত কুলকে তেঁকে পড়তে হয়, পদ্মাপারের
যেয়ে তুমি, তা জানি না ?

নীলা নতমুখে বলেন—জানি মহারাজ !

রাজা আর কিছু না বলে' একটি বুকভাঙা বা
কেলে বলে রইলেন !

* নীলা বলে উঠলো—মহারাজ ! আমার একটি
অমুহুর্ত আছে।

অমুহুর্ত ? নীলা, তবু অমুহুর্ত !

কাল প্রাতে লতা বিগানে আপনি পোপনে
ধাকুয়েন, কিছু নতুন ভিনিষ দেখতে পাবে।

কি সে নতুন ভিনিষ—নীলা ?

এখন বল কি করে' মহারাজ ! অত্মগিনী
নিরেই জানে না।

বেশ—কখন—বল ?

প্রভাতে। নিশা-সতী এখন রাজি যখন কে
প্রথম স্বর্ণ-কিরণে পান করে ধরায় দেখা দেবেন,
নীড় ছেড়ে পান পেয়ে পাবীরা এখন বনানী ভাং
করবে, সেই সময়ে মহারাজ !

বেশ !

রাজা ক'দিন পরেই নীলার হাত ধরে হাত
বাড়িয়েছেন, আবার কিরিয়ে নিয়েছেন। আশ
ইচ্ছা ছিল, জীবন ধরনের সমস্ত সমাধান করে
নেবার, হল না, নতুন ভিনিষ কি, দেখবার
আশাও প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে হল।

গ

রাজবাড়ীর শাশের উজানে প্রভাতে পুষ্পচয়ন
করা ছিল তবু মন্ত্রী মহাপ্রভের নিত্য কর্ণের প্রধান।
সে উজান রাজার নয়, প্রকার। প্রকারের যখন
জুসময় ছিল, তারা মন্ত্রী মহাপ্রভের বাড়ীর লাগাও,
রাজবাড়ীর বস্তুবিকের বেঘাল ঘেসে এটি পড়ে

ঘিরেছিল। মন্ত্রী মহাপ্রভ পুষ্পচয়ন করবেন, সে পুষ্পের
পুষা পান, প্রাণের বেহতা !

মন্ত্রী মহাপ্রভ পুষ্পচয়ন করছিলেন, কোথা থেকে
কে বড় করণ, বড় কাতর, অর্ধশশী পলার পাড়
বাধা নিবেদন করে পান পেয়ে উঠলো ! বড়
করণ, যেন যে পাইছে তার বুকের ক্ষত-
স্থানের রক্ত পানর লগে উৎসে উঠছে, সেই
লগে তার চোখের জল নেমে বুক ভাসিয়ে বিচ্ছেদ।
মন্ত্রী মহাপ্রভ দাঁড়ালেন ; পান ভুলে দাঁড়ালেন
কিন্তু কেঁপে কেঁপে !

আপনা চোখের দৃষ্টি কোল দেখলেন, কাঁচের
কাঁচের, পাইতে পাইতে পাইতে পাগলার হাত কে
এই রিক অসুখে। চোখ চোখে আসছে, কি মৃত
সে, তা ঠিক বুঝতে পারলেন না। হুটী ঢেকর
কোল বেয়ে তর তর করে জল নেমে আসছে, বুকে
না সে, জল আপনি ধরে বাতীতে পড়ছে !

মন্ত্রী হাত বাড়িয়ে বলেন কাঁচের কেন বালা ?

মেয়েটি যে এই রামোর কোন হতভাগিনী প্রমা
মন্ত্রী মহাপ্রভ কান্না বেয়েই সেটা বুঝে নিয়েছিলেন,
তাই আবার বলেন—কি করব বল বালিকা, তারা
যে রামোর মানুষ নয়, সে রামোর প্রকার হঃস্বর
নীমা সেই।

মেয়েটির রামার ডিকার যে ডে মৌ হিং তা
বলে বোধ হ'ল না, সে যেখন দাঁড়িয়েছিল তখনই
দাঁড়িয়ে রইল।

মন্ত্রী বলেন—তবু বালিকা তোমার কি হঃস্ব
বল, আমি যদিও রাম-কার্য দেখি না, তবু তোমার
হঃস্ব, পারি যদি—বুঝ কর'। বল, জুবরী, নির্ভর
বল ! বহুকাল আমি এ রামোর কর্ণবার ছিলুম, হয়
ত তোমার কষ্ট নিবার করতে পার'।

মেয়েটি কথা বলতে পারছিল না, অক্ষর, যখন
স্রোত ধরে, বাক্য কি তখন প্রকাশ হয় ?

মন্ত্রী বড় বিব্রত হয়ে পড়লেন, কোনদিন হয়নি

বেধ ল্পর্শ করেন নি, নইলে মধনীর মত কোমল
জন্মর মুখখানি তুলে ছুঁতবে বিভেদন।

বলেন—বল, বল, কিছু বিদ্যা কর না।

যেহেঁটা সজোরে কঁপে বসে—আবার কেউ
নেই।

মহী বৃত্তলেন, অত্যাধ! বলেন—তোমার কি
প্রাণিমা বল?

অস্ত্র-রক্ত চোখ চুটিতে একথা বল মহী মরণ-ধর
আগ্নেয় ক্রুটিত মুখের বিকে চেয়ে যেহেঁটা আবার
চোখ নাখিরে নিলে।

বেধে বড় বধা ছ'ল! মহী মরণধর বলেন—
বল, বল! তোমার প্রাণিমা 'আমি' পূর্ণ করণ,
করণ, করণ। ভয় পেও না, বল।

আবার সেই কথা—আবার কেউ নেই!

মহী মরণধর কল্লিতকণ্ঠে বলেন—তোমার
বাড়ী?

নেই।

আত্মীয়-জন?

নেই।

বেশ, আবার বাড়ীতে থাকবে, আমি তোমার
আপনার জন হব।

যেহেঁটা বোঝ করি এত বেধ কীভাবে পার নি,
হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কঁপে উঠল।

মহী বলেন—আমার সঙ্গে চল!

যেহেঁটা কীংকিন, নড়ল না।

মহী বলেন—বিশ্বাস কর বাগ।

কীংকিন, বরা-বরা গঙ্গার বেহেঁটা বসে—
আপনি কি আমার ভালবাসবেন?

ভালো বাসবে। . সে কেমন ভাত খানি।

তবে বাব না। যেখানে ভালো বাগ। নেই
সেখানে বাব না, আবার সে কঁপে কঁপে।

মহী মরণধর ভাবলেন, পাবে, পাবে, একটু
আবার চাঁদর কলসেই হবে—তাকাতাকি বলেন—

বাসুকে, বাসুকে। ভালো বাসবে!

আপনার বাড়ীতে বাঁসে...

কেউ নেই। পূর গৃহ এই প্রথম তুঁবি পূর্ণ
করবে!

ভিক্রম রাজমুহূর্ত্ত প্রাপ্তি। মরণধর শুনে বেধের
লাকিরে গঠে, গ-কথা শুনে যেহেঁটা হেমদি চব্বকে
উঠে মরীর বিকে তার সেই হুঁটি চোখ তুলে চাইলে।
বৃত্তি কলের সঙ্গে যোব উঠলো, লরৎকানের
আকাশে মন তুটুত যোব বেগ দিয়ে সে চোখকে
উজ্জ্বল করে দিলো। মহী বাগ। কণ্ঠে বলেন—
চল, আবার ভাত ঘরে চাঁদের আগে কোটা বের
চল।

তবু নড়ে না সে।

মহী বৃত্তলেন—আগে কিছু বক্তব্য তার আছে।

বলেন—আমাকে বিশ্বাস কর বাগ। অতি কখন
কণ্ঠে কথা ক'টি বলে তিনি যেহেঁটা হাত মরণধর
মনো হাত বাড়ালেন।

যেহেঁটা কাঁচরতনে মাটিতে বলে পড়ে কখন
কণ্ঠে বলে উঠল—আর যে এক পা'ও আমি চলতে
পাচ্ছি না এতু!

সত্যি ত! মহী মরণধর পাগড়ার মত সেই
পা দুটির বিকে চেয়ে তন্ত্রিত হয়ে পেলেন। ও
এ যে রক্ত কেটে পড়ছে। আহা! কিছ কি করেন?
যান বাগানবিদ ত কাছে কিছু নেই। কি
করেন? কি করেন? মহী মরণধর যে ততো
পান না। বাড়ী গিয়ে যে যান বাগনের বাগছা
করে আসবেন, ততটুকু লম্বাও কি এই বাগিকা
অলঙ্কার লম্ব করতে পারবে? তার মুখ দেখলে
—বুক কেটে বাগ।

মহী মরণধর বলবে—কারে ত কোন যানবাগন
নেই। তবে এক কাজ করতে পারি, আমার
কোলে চড়তে যদি আগতি না থাকে, এল, দাঁতের
সমাধিরে তোমার আমি কঁপে করে ঘরে নিয়ে
যাই।

যেহেঁটা নিবে ত অতি কষ্ট পাচ্ছিল, তবু সে

তুমি মন্ত্রী মহাপ্রভুকে কষ্ট দিতে চাইলে না, বরং—
আপনার যে কষ্ট হবে!

না না আমার কিছু কষ্ট হবে না। অমন
হুলের সাগর মত কোণে বেহ বহুদূর পল ধরন
করে পেলো কোন কষ্ট হবে না। এল!

মালিকা তুমি ইচ্ছাকৃত করছিল যেবে মন্ত্রী
মহাপ্রভু হ'বার বিচার করে বলেন—এল!

মালিকা বলে—আমার কেবল তব হচ্ছে,
আপনার—কষ্ট হবে—।

হবে না গো, হবে না তুমি এল। মন্ত্রীট,
এল তোমাকে মূখ্য স্থানী করতে পেরেছি জানলে
আমায় সব কষ্ট মূখ্য হবে।

বলে হাত বাড়ালেই মালিকা তাঁর কোণে
উঠে পড়ল। মন্ত্রী মহাপ্রভু হুলের সান্নিধ্যকে ডান
হাতে সুলিখে ক' পা চলেছেন, চেয়ে সেখেন,
মালিকা! হাতের বন্ধন বলে যেতেই যেহেট পড়
পড় হয়ে হু'বারে তাঁর পলা লড়িয়ে ঘরলে।

মন্ত্রী বলেন—একবার, গো একবার...

যেহেট করণ দুঃরে বলে—পা যে মালীতে রাখতে
পারছি না, বড় বেধনা!

একটিবার, তখনছাড়া একবার নাই।

যেহেট কীধ কীধ হয়ে বলে—একজু, রক্ত পড়ছে!

বিলম্ব মন্ড নহ। রাজা মন্ত্রীমহাপ্রভুর বিপদ
যেবে হেলে যলেন—মন্ত্রীকে ত বড়ই বিপদে পড়তে
হয়েছে দেখি। সাহানীধন কাটবে বৃদ্ধ মনে
রহনীর...

মন্ত্রীর পলা বন্ধ হয়ে গেছলো, পৌঁচার মত বলেন,
হ্যাঁ।

রাজা যেহেটের দিকে চেয়ে বসেন—এ সব
কি মীমাংসা? মন্ত্রীমহাপ্রভুকে খোঁচা করার মত কেন
কঠোর? আচ্ছা ত উদ্ভট মত দেখি!

কথাগো! এটা আবার চেনা শুনা দেখি
যে! মন্ত্রী মহাপ্রভু হাত হু'টো পূলে বেবার' জন্ত
হাত তুললেন, সান্নিধ্য তুলে ছড়িয়ে পড়লো।
যেহেট তাঁর পলাকে পড় করে তড়িয়ে ধরে ছিল।

যেহেট বোধ করি হান্ধিল মন্ত্রী মহাপ্রভু
চোখে দেখেন নি, তবে কপার বর শুনেছিলেন,
তাইতেই বুঝলেন।

যেহেট বর্ণিল—হুমিই ত বলেছিল আমার
ওপরই হত রাগ! তোমার ঘেন্না করা! এ
ত চোখের ওপর দেখলে কত ভাববাবেন আমার
রোর পলা বেলার...

মন্ত্রীমহাপ্রভু অমনি হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলেন।
কিন্তু রে পোন হ্যাঁ হ্যাঁ, নীল: বং চপ্পো—বাজ
লকান বেলার...

মন্ত্রীমহাপ্রভু বলেন—ঠিক আমার পুপ্তর
করতে যেতে হবে।

নীলা বলে—আর থেকে পে অদিক
পিতা!

মন্ত্রী বলেন—তুমি?

বাণ মেয়েকে কোণে করে আবার ক'তে
পাটেন, আর যোবে বাপের কোন কার করতে
পারে না?

রাজা মীমাংসা করে বিশেষ, তা হয় না!

হ্যাঁ না এখন হোক। মন্ত্রী মহাপ্রভু আর একটা
মীমাংসা অভিবে করে বিশেষ! মেটা আর বলেন
কি হবে, বোঝে ত নবাই! •

ভিখারীর দান

(শ্রীযেহেন্দ্রনাথের দ্বারা)

চোখট ভোর বশন-আঁকা, অথক হয়ে ভাকিয়ে থাকি,—	হৃদ তথা ঐ দুর্জীবনে, হৃদে তোমার চরণ চলে,—
ভাকিয়ে বেন আগুন-হারা সন্ধ্যা মেঘের স্তম্ভতারা ! হেঁদনি অমল—বেদন বাহা নীল-সাহরের সুজাচা !	বসন্তের অন্তরেতে মুক্ত বেন কল্পাট, ইচ্ছে করে পাবনে তোমার গ্রাম বিহিরে ধন্য বি !
আমার প্রাণের বঁধ্যাধানে, লুকিয়ে-রাখা হুলধাপানে,	কৃষ্ণ কি আর বর্ণনা গো, বর্ণ তোমার বর্ণ না গো,
জুঁই-চামেলি উঠে জেগে নিঃশ্বাসে তোর হৃদয়ী ! বহিন বাঁধেরি শুভ্ররূপে বেদন কোটে সুজাচা !	ওহে, পূর্ণিমার মোৎসাদা এনে অগ্নিতে কে লনিযেছে, আকাশ-পাত্রেব সঁতাক পে পোনাক-চাঁদেও বনিযেছে !
তোমার অতি দুঃখ বানী, জংনে ঘোর বিচ্ছেদ আনি,—	মল্ল বাতাস, তোরে! আলো, কায়েই বা না বাসি ভালো,
কোন জনমে হারিয়ে-যাওয়া-বদলে-পোনা সজোতে । সুকের তলার নাড়ের সাক্ষা, তোমার কণার সজোতে ।	সুন্দর-কোটা আর চাঁদ-রঙা আর নীলাকাশের নীরব-শ্রী! তুমি কিন্তু সঙ্গ-পেরা, তোমার কাছে লে-সব, হিঃ

তুমি আছ বেথুর মত,

আমি চরণ-সেবী মত,

তোমার-আমার তফাৎ বেদন,—বাহীন এবং বকোতে ।

আজকে আমি এসেছি গো মন নিতে নহ—মন

দিতে !

উদ্ধার

(গল্প)

(শ্রীকবীন্দ্রনাথ পাল বি. এ.)

তখন গবে বাত সন্ধ্যা। উজীর হইয়াছে, এক
মুকনিষিদ্ধ পট্ট প্রাণ, তাহাতে কৃষ্ণ শব্দের চতুর্দশি,
অন্ধকার ছোট বড় বাতাসি সবত মুকুটানিতে
অকলে, ভাকিয়া বিকট কাল সূর্যেতে দত্ত বাড়ী-
প্রানিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে ।

বাঁড়ী ঠাকুর কাঠের সিঁদুর হইতে কয়েক

বাঁহি কেরাবী বাহির করিয়া তাঁহার পক্ষাণবৌগা
বহুবাংক কহিলেন, “বাও তো বাহা, এ ক’বানি
ঘটি থেকে তাল করে বেছে নিয়ে এল, তোমার
তো গাছা কিছু মনে থাকে না। এই মছোর
গাড়ীতে সুরেনের চার পাঁচ জন বন্ধ আগতে ।
ছাদের অলপাচার বে শুধিবে, রাখতে হবে পে

ক'ণ তো ভাবতে হয়. না ত'ও আশাকে
ত'সু ক'হিবে বিতে হবে? তুমি তো আর ক'চি
খুঁকী নও, আঠায়ে বহুতের খাড়াই যে।"

একগলা-খোমটা-ঘেয়ে যা ব'লীলিমা, নীচু হইয়া
হেঁক'মি করখানা তুলিয়া লইয়া, নীরে নীরে সে
জান ত্যাগ করিয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। উঠানে
পার হইয়াই বিচকির পুতুং, পুতুংের চারি পাশে
বড় বড় আর কাঠাল ও নারিকেল গাছ, অন্ধকারের
• দখিত বিনিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই দিকে
• চাহিতেই নীলিমার গা ছব ছব করিয়া উঠিল।
সে ভীতিজ্ঞানবশত ডাকিল, ঠাকুর কি!

পাশেই হাড়াবড়, তাহার নম্র পৈলবালা
সেখানে বসিয়া কি করিতেছিল, উত্তর দিল, "কি
তাই ব'লি দিবি?" এবং সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর হইতে
বাতির হইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলিমা অতি সুস্থেরে কহিল, "আবার একটু
দাঁড়াবে তাই ঠাকুরবি?"

পৈল জোলের ত্যাগ করিয়া কহিল, "আবার
তার পড়েছে দাঁড়াতে, আমি কেন যাব।
আবার সঙ্গে না নিয়ে একলা যাতে যাওয়া হ'জিল,
কেনন ক'ণ?"

নঃসের এই দ্বিধা অভিযানের কথার নীলিমার
হই চোখ দিয়া মল গড়াইয়া পড়িল, খোমটার
অন্ধরালে সেই আনন্দাশ্রু পৈল দেখিতে পাইল
না।

খাত্তরী ঠাকুরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া
• যোগ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "শৈলকে কি তোমার
বাপের বাড়ীর-তি পেয়েছ বাছা যে আলো
ঘরে তোমার ঘাটে দাঁড়িয়ে আসবে? হা'কে
বলতে পারনি যে পাড়া গারে 'আবার বিয়ে দিও
না।' এ কথার কোন জবাব ছিল না, নীলিমা
যে বাকানী হিন্দু ঘরের ঘরে। খেলে আসিয়া
যে ভাবে ইচ্ছা, বড় বার ইচ্ছা, তাহাকে
খাড়াই করিয়া, "বাইবে, কিন্তু খাড়াইবার

সময়ে কোন প্রঙ্গ করিবারও তাহার অধিকার
নাই।

তাহার হইয়া পৈল উত্তর দিল, "বউদিবিকে
একলা বলে লাভ কি মা, পাড়া-পায়ে আসা না
আসা তো তার ইচ্ছের উপর নির্ভর করেনি;
তোমার খোমাইকে একদিন মেঘস্তর করে এনে
তার সঙ্গে খোমো পড়া ক'রো।"

খাত্তরী ঠাকুরণ কতাকে কহিলেন "নে তুই
বাথ। আর না হয় তুই আহিল তাই তোর
উপর হুতুং চাশানো হচ্ছে, কাল যখন তুই চলে
যাবি, তখন তে ওকে সাত দ্বার হা'কতে
যাবে!"

পৈল হাসিয়া কহিল, "কেন, তুমি যাও।"

খাত্তরী বাপের খুটী চাপিয়া বহিয়া কহি-
লেন; "তোমার কথা শুনে আমার গা জলে বাথ।
আমি কি পঃর ঘরে বঃর এনেছি তার দানীকুতি
করবার জন্য।"

পৈল কহিল, "পরের ঘরে যেন না করলেই
তো সব গোল চুকে যাব মা। দানীকুতি করবার
কপাও যেন ওঠ না।"

খাত্তরী ঠাকুরণ সে কথা যেন শুকিতেই
পান নাই এমনি ভাবে কহিলেন "তুমি যাক্ত
রেকাবী ক'রানি হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছ
কেন? আমারেই না ঘেয়েতে অন্ধু চেয়ে কথা
হয়, তোমার সে কথার 'ক'ন বিলে পেরতর চলে-
বে না।"

নীলিমা এমন সময় নীরে 'নীরে বিচকির
দিকে অঙ্গুর হইবার উৎসাহ করিতেই পৈল
তাহার হাত চাপিয়া বহিয়া কহিল "আবার আমার
কেনে এতলা যাওয়া হচ্ছে? তুমি তাই বউদিবি
ভারি হুই।"

এমন সময় নীলিমার দানী মুহুর্তন্য-তোমাকে
আসিয়া দাঁড়াইয়া উঠানের দিকে চাহিয়া কহিল,
"পৈল তোমার উঠানে কি ক'জিল?"

শৈল উত্তর দিবার পূর্বেই সুরেন্দ্রের জননী কহিলেন, "তোমার বহুধা আসলে, তাই ঘটনাকে যথাযথ ঐ চাখানা তৈরীও তাড়াতাড়ি ছাট থেকে মুখে আনতে। উনি ক'রে পুঁকো, তাঁর ভয় বাক্সে। তাই তাঁর সঙ্গে হাঁড়াবার ভক্ত শৈলকে টানটানি করা হচ্ছে।"

সুরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা-শিকিত হুবক। বিপরিত-চরিত্রের প্রায় সব ক'টা পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ছাত্রমন্ডলে বিশেষ প্রখ্যাতি ও হুমায় অর্জন করিয়াছে। সম্রাট সেই বিখ্যাত্যালয়েই সে অধ্যাপকত্বে বসি হইয়াছে। অনেক বৃষ্টি করিয়া তাহাকে বেশা শ্রদ্ধা শিখিতে হইয়াছিল। শৈলজিত সম্পত্তির মধ্যে কলিকাতার নিবটপুত্রী এক প্রাচ্যে স্থান চারেক চাকার, একটা ছোট পুকুর, গোটা তরেক আম কাঠাল ও মারিকোলে পাছ। পিতা কলিকাতার এক সন্ন্যাসগরি আকিমে সম্রাট কেমনো-গিরি করিতে। তাহাতেই তাঁহার সঙ্গের এক বকম চলি। যাইত। যে বৎসর শৈলজিত বিবাহ হইল এবং সুরেন্দ্রনাথ আই. এ. পরীক্ষা দিল, সেই বৎসর তাঁহার পিতা এক দিনের মধ্যে ইহকাল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ বৃত্তি পাইলেও সঙ্গারের বড় চালাইতে এবং পরীক্ষার কী যোগাড়ের ভদ্রিমের বিবাহের স্তম শেষ করিতে তাঁহার ঘর কখনো, পুষ্কর ও বাগান বদক পড়িল। শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পর কলিকাতার এক দলীর কতাকে বিবাহ করিয়া যে মঙ্গল টাকা সে পাইল তাহাতেই বহুক লাগল করিয়া সেলাই হইল, মৌলিমার পিতা বহিঃস্থবাসু সন্তান কানিয়া কানিয়াই কেবল সুরেন্দ্রনাথের বিজ্ঞার বহর দেখিয়া নগদে ও পানের দ্বয় বাজার টাকার সন্তি তাহাকে কত বান করিয়াছিলেন।

কিন্তু কথার উত্তরে কৃতবিত্ত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ শৈলজিতের সত্যবাদন করিয়া কহিল, "শৈল জুই কখনো বাহিনী। আর শী জুইনি বা ওরকম আশ্পদ্য

নাও কেন? বালের বাজীর বাসুনা নী ভোলাতে পাঠলে ওর পরকাল যে একেবারে ক'র করে হয়ে যাবে। শৈল জুই চলে আস, আসি এখানে বাজিরে হইলাম, ও তৈরী ক'খানা বেজ কিয়ে এসে তর্পে আনি দাখ।"

মৌলিমার হাতখানি শৈলজিতের হস্তের ঘর করিয়া কানিয়া উঠিল। এবং তাহা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলে শৈল তাহা আরও শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। বহুর্ন্তে কতকের বাধা সামলাইয়া লইয়া শৈল তাহার দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাধা তুমি না এখন কলকাতা থেকে বক্তৃতা দিবে কিয়ে এসে?"

সে দিন কলিকাতার ছাত্রদের এক বড় সভা ছিল। সুরেন্দ্রনাথই সেই সভার প্রধান বক্তা ছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শ্রী-স্বাধীনতা ও নাগরিকগণের অধিকার।' সুরেন্দ্রনাথ ওকালতী ভাষার নাজিরের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়া সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর বাকবা লাভ করে এবং বাধা নাগরিকের ভোটের অধিকার লাভের বিষয়, তাহা-বের ভিত্তি ভাষার কলকাতা করিয়া তাহাদের বর্গের পক্ষ বহিরা পালি দিয়া ছাত্রমণ্ডলী ও ছোটাবিসকে হাতাইয়া তোলে। শৈলজিত তাহার দ্বারের বক্তৃতার বিষয় জানিত, তাই দ্বারকে খোঁজা দিয়া কথা বলিতে ছাড়িল না। সুরেন্দ্রনাথ হাসিল কহিল "এলিস শৈল, আমার বক্তৃতা ভনে বেলেগলা একেবারে কেপে উঠেছিল।"

শৈল আবার খোঁজা দিয়া কহিল, "তুমিও তাই বৃত্তি কেপে এসেছ বাধা?"

সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ পজীর হইয়া বেল। বহুর্ন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "হাৎ তোকে কিছু বলে না বলে, জুই কথা বগেও গণিগণি।" এই কথা বলিয়া কেলিয়া হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথের ঘনে হইল, ভগিনী রই বিবের জন্য বেড়াইতে আসিগায়ে, হঠাৎের দ্বারের তাহাকে এই ভাবে ভিতরকার কথা

ভাল হয় নাট, তাই মনে মনে লজ্জিত হইয়া, শৈল উত্তর দিবার পূর্বেই কহিল, “মতাই দেখানে যে রক্ত পয়স, আর হেলেনা চার দিক থেকে যে ভাবে দিবে ঘরেছিল তাতে বেশে বাঘারই কথা। সত্যিই বাগা বাগার পর তোকে সত্যর বল বলব এমন শৈল, তুমি ওর চাত ছেড়ে দে, রেকাবী কথানা বেলে আনুক, শিকার সময় বাধা দিতে দেই।

“তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী শৈল বাবার কথা শুনিয়া একটু হাসিল; তারপর শান্তভাবে কহিল, “দাদা নির্ভাবন কর আর শিকার বেগুন” এক মিনিট নয়। এই যদিও কোন উত্তরের অপেক্ষা না রাবি, নীলিনাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাটের দিকে চলিয়া গেল। বাটে পৌছিয়া নীলিনার হাত ধইতে রেকাবী করখানি কাড়িয়া লইয়া, তাহার হাতে কেরোসিনের আলোটা দিয়া শৈল কহিল, “তুমি তাই যেদি আগে ঘরে ঝাঁকাত, আমি রেকাবী কথখানি বেলে নিচ্ছি।”

নীলিনা কঁদ কঁদ হইয়া কহিল, “কেন তাই তুমি তোর করে আবার সঙ্গে এলে ? না হয়, তবে বাটেই রয়ে থাকতাম। ভালই হত ঠাকুরকি।”

নীলিনা ভাড়াভাড়ি ভলের দিকে দৃষ্টি করিয়া বসিল, তারপর দুই চোখ বিয়া কর কর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

(২)

বাঁহরে ১১ ও ১২র হলখোলের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ও তাহার বন্ধুত্বের লাজিতা বন্ধ-নাগীর দুঃখে থাকিয়া থাকিয়া চাঁৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল।

খোঁপেল কহিল, “আমাদের লাটতার কি অংশেতন হয়েছে, এরা নাগীর ময়ল চার না।”

রজনীকান্ত মজোর গুলগোষে উপর চলটা দ্যাক করিয়া বলিয়া উঠিল, “হুজোঙলের গদাখাতা কততে না গারলে আমাদের নাগীকাতর উদ্ধায়ে কোন উপায় হবে না।”

অদিত চাখের বাটী নিঃশব্দে করিয়া কহিল, “দুঃখ সন্তোষের উৎসাহ বেধলে বাগবিকই মনে আনন্দ হয়।”

সুরেন্দ্রনাথ কহিল, “বাগা প্রী-বাগীনতা চার না, বাগা নাগীরের তোট বেগার অঙ্গুণমুক্ত বলে মনে করে, ইচ্ছা হয় তাবের ধার চাবুক খেই।”

শক্তিপর কোন রতবে রতগোলাটা দিগিবা ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, “তোট, এই তোট, এই তোট বেবার মন্ত নাগীরা যে বিন বুঝবে, যে বিন তারা তোট বেবার মনো বলে বলে খেয়িবে পড়বে, যে বিন আমাদের এই বাগাগী লাটতা মজুর জীবন লাভ করবে।”

এমন সময় শৈলবাগের বামী রামলাল সেই ককে আলিয়া প্রবেশ করিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্ধু পনের গহিত ভাংর পরিচয় করিয়া দিয়া হাসিয়া কহিল, “হনি প্রী-বাগীনতার বিস্তারো, বেগোলের তোট বেবার অধিকার দিতে চান না।”

রামলাল তুলগোষে এক ধারে বলিয়া কহিল, “বেগ সুরেন, তুমি দিখো বলে তোমার বন্ধুদের লামনে আবার অশ্রুত কণ্ঠে চেয়ে না। তুমিই তো এখন তখন আবার ব্রৈণ বলে গাল দাও। বুঝলেন মশায়রা, ওঁর ভগিনী বাগীন ইচ্ছার চলেন বলে, উনি আবার ব্রৈণ বলে গাল দেন।”

সুরেন উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “ব্রৈণ হওয়া, আর প্রী-বাগীনতা বেগুনা কি এক মিনিট না কি ! শক্তি তুমি কি বল ?”

শক্তিপর গাভারীর আঁতন শুটাইতে শুটাইতে কহিল, “ও হুটো সম্পূর্ণ বিভিন্ন মিনিট, প্রী-বাগীনতা,—ও একটা মন্ত বড় মিনিট। রামবাবু কিছু মনে করলেন না। তোট, তোট, একমাত্র তোটের উপরই প্রী-বাগীনতা নিভা করছে। বরকাক হলো আবার প্রী তোট দিতে যাবে, তাতে বাগা বেবার আবার কোন অধিকার থাকবে না,—এই হলো, প্রী-বাগীনতা। তাই বলে আমি যদি কোন নাগী-

বন্ধু সঙ্গে বেড়াই, আর আমার জী বঁধি যান্ন
যান্ন পান্ন পান্ন বহে, তা সঙ্ঘ করা কখনো
আমি পুষ্ক:খচিত মনে করি না। সে যে করে,
সেই ত্রৈণ ।”

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রান-
লাল বলিল, “জাপানীরা সতর্কই বিদ্বান।
জাপানীরা জী বাহিনীটা যে ভাবে বোজেন, আমার
সে ভাবে বোজবার পক্তি নেই, বাকু আবার একটু
মান করতে হবে, আমি কাগড় ঢায়া ছেড়ে হাত
স্ব পুরে আসি ।”

রানলাল চলিয়া গেলেন অসিত করিল, “তোমার
ভগিনীপতি বোধ হয় রাগ করে চলে দেলেন,
জ্বেন ।”

জুয়েল্লনাথ চলিয়া কহিল, “রাগ মিনিষটা
ওর কেহে একেবারেই নেই। সাতা দিন পেটে
খুটে ভ্রাত হয়ে এসেছে, তাই একটু মিকতে গেল।
হী যে অসিত, তোমার বিয়ের কি হ’ল।”

অসিত বিচক্তির জ্বরে কহিল, “আর ও কথা
বল কেন ভাই, কোথাকার বাবার এক বন্ধু এসে
জুটেছে, বাড়ী একেবারে চ্যে ফেরে। তিন
হাজার টাকা নিয়ে তাঁকে বন্ডাবার খেকে উদ্ধার
কর্তে হবে। না, বরোত যোনে না। আমি
যেন অগাধ মাথাই উদ্ধার করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক
জাহাজে ।” সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এ কথাই সেই যে সর্গাপেক্ষা বেনী আনন্দলাভ
করিয়াছে ইহাই জানাইবার ভক্ত জুয়েল্লনাথ তাহার
গুঠে এক চপেটাঘাত করিল। অসিত উৎলাহিত
হইল। বলিতে লাগিল, “অজ্ঞাত: লগী হাজার না
শেলে আমার মিলেত নিয়ে ফিরে আসা চলবে না ।”

অসিত এখ, এ পটীকার দ্বিতীয় স্থান এবং
ভালোত পটীকার সর্গোক্ত স্থান অধিকার করিয়া
টাকা সন্ধান করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।
সাই জ্বেনে কহিল, “তা হো মিস্তাই। বস হাজার
ফেন, তুমি চপে ঘাটলে আরও দুই পাঁচ হাজার

বেনী পাবে। ওহে রজনী তোমার জী বঁধি
কি ?”

রজনী বঁধি নি খাল ফেলিয়া বলিল, “যখা পূর্ণ
তথা পরম,” একবারে নিজেই দুর্গ। কঠিন শার্দন
করে তাঁকে কিছুতেই শেখাতে পারিছি না।” বৎস
হো। কম হ’ল না। তার নিম্নের বিশেষেই যে ম
বহর। ভোট দেওয়ার অবিকার পাওয়া নারীদের
শকে যে কত বড় মিনিষ এটা আশ পর্বাণ্ড তাঁকে
থোকাতে পারিলাম না। আর হুংগের কথা বৎস
কেন ভাই! বলে কি-না ভোট নিয়ে কি হয়,
ওহে আমার হরকার: নেই ।”

জুয়েল্লনাথ সংবেদনা জানাইয়া কহিল, “ও বাপ
মার শিকার বোধ। দীতিমত শাসন করা হ’লে
আপনিই বুঝবে। পরা যদি ওদের নিজের অধিকার
নিজেই বুঝে নিতে না চায়, যেমন করে হ’ক সেটা
বুঝে দেওয়াটাই হাঙ্গে আশাযের কাম। শক্তিপর
বিস্ত ও বিঘের ঠিক আছে। নানেক শক্তিপর,
কাছেও তেমনই শক্ত ।”

শক্তিপর উৎলাহিত হইয়া কহিল, “আমার জী
চায়, আমি তার আঁদল বরে জ্বরে বৎস:খাকি।
আর আমার নারী-বন্ধু হ’লেন তেলে বেড়াই। আমি
কি ত্রৈণ যে ও সব বাড়াবাড়ি সঙ্ঘ করব। আমি
তার সঙ্গে কথা বলি বন্ধ করে বিয়েছি ।”

(৩)

মানের পর মাথা বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে নীলদা
কহিল, “তুমি ভাই কালই চলে যাবে ।”

শৈল আশ্চর্য হয়ে কহিল, “কি কর্ত্ত্ব হটবি। কাল
জ্ঞানবার, যাক মাত্র দুটো দিন থাকবে। এর মধ্যে
যে সব জুড়িয়ে গাছিয়ে নিয়ে লোম্বারাই সিদদা
রতনা হতে হবে ।”

নীলদার মুচটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। শৈল
মাগের মধ্যে জুইবার অবস্থা তিনবার আগিয়াত
বেড়াইয়া যায়, এবার সে বহু দুঃখেলে চলিয়া
সইতেছে, যখনো একবৎসরেই মধ্যে সে আগিতে

পারিবে না, নীলিমা কি বলিতে ঘাইতেন, তাহার
কষ্ট কষ্ট হইয়া আসিল।

শৈল তাহার আরও নিকটে আসিয়া ঝড়াইয়া
তাঁহার হৃদয়-হৃদয় চোখের দিকে চাহিয়া করিল, “তু-
মার ‘বোন’ দেখানে তাঁকে পাকতে হবে না।
তুমি পড়েই আসিয়া ফিরে আসবে, এগার
কিরে এগে তোমার কাছে অনেক দিন থাকবে।
তাই বউদি।”

• তার মাপ, সে অতি দীর্ঘকাল। তবুও নীলিমা
যেন মনে অনেকটা ভরসা পাইল। তার ঘেঁ-
পরাধা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়া শৈলকে চাহিয়া, “তুমি
কিছু হইবে না, তুমি কিছুর দিকে পড়িবে।
শৈল তাহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। “তুমি
কিছু হইবে না, তুমি কিছুর দিকে পড়িবে।
শৈল তাহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। “তুমি
কিছু হইবে না, তুমি কিছুর দিকে পড়িবে।

শৈল তার কণ্ঠের বাধা চাপিয়া হাসিয়া করিল,
“সে শুধু বিবেচনা করে দেখা যাবে।” এই
বলিয়া নিজের পায়ের দিয়া নীলিমার বাধা মুকাইয়া
দিলে দিলে করিল, “তুমি কিছু ভেবে না বোন।
আমি দাবায়ে এবার যেন কড়া কড়া কড়া শুনিয়া
বাব।”

নীলিমা শিরিষা উঠিয়া করিল, “তোমার পায়ে
পড়ি ঠাণ্ডা হইবে, কিছু বলা না। হঠাৎ মিষ্ট কথা যদি
কেউ বলে ঠাণ্ডা হইবে তাহলেই আমি বৈতে যাই।”

শৈল আর চোখের মল চোখ করিতে পারিল
না। অত দিনের মত অপর দিকে মূৰ তিরাইয়া
তাঁহা পোশাক পরিবর্তন চেষ্টা করিল না। আজ
নীলিমার সামনে তাহার হই চোখ দিয়া অক্ষ
উজ্জ্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

নীলিমা ভাড়াভাড়ি চোখের মল মুছিয়া আতকে
বলিয়া উঠিল, “এই বা দর্শন-দর্শন হয়েছে!”

শৈল মৃদু হইয়া করিল, “কি হয়েছে বউদি?”

নীলিমা করিল, “আজ মল তুলতে তুলে
গেলি।” এ কথা বিন শৈল মূৰ তিরাইয়া উঠিল।

পূর্বেই নীলিমা ঝড়ু ও বাবীর ঘানের মল
তুলিয়া রাখিয়াছে। বাড়িতে একটা গল আছে।
তার বেলায় একজন পোকাগা আসিয়া মূৰ তিরাইয়া
যায়, শৈল মনে করিত সে মল তুলিয়াও রাখে।

তাই নীলিমার কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া
সে করিল, “আজ যদি মল তুলে দিবে তার নি?”

নীলিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া করিল, “আজ
তুমি থেকে যে আসিবে সব মল তুলে দিবে
ঠাণ্ডা হইবে।”

শৈল ছই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া বান্ধিক
নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া করিল। একথা
তাঁহার মনে বিদ্যমান হইতেছিল না। তাহার শিক্ত
বিদ্যমান দাবা চোখের মল। এই কতি যেহেতু
বিদ্যা বাড়ীর মল মল টানাইতেছে। সে একান্তে
করিল, “তুমি বউদি একবার দাবার কাছে।
এত অবিচার তাকে কিছুতেই কর্তে দেওয়া হবে
না।”

নীলিমা বুঝিল, ইংরেজ তাহার উপর অত্যা-
চারের স্বাভাবিক পাইবে, আর কোন লাভ হইবে
না। তাই সে প্রথমটা ইংরেজ করিল, তারপর
ভাবিল যে সে নিজে এই সকল অত্যাচারের
বিষয়ে ঠাণ্ডাইবে একপক্ষ তাহার নাই; আর
একজন যদি দাবা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার
চেষ্টা করে তাহাতে সে আর দাবা দিতে পাইবে না!
অত্যাচার সহ করিবার গুণই তাহা সে লক্ষ্য করিল,
অনেক অত্যাচারই তাহা সে মূৰ তুলিয়া গল
করিতেছে। না হয় আরও কিছু করিবে।

মুহুর্তনাম বোয়াকে বলিয়া তাহার জননী
সহিত কথা বলিতেছিল, শৈল নীলিমার হাত ধরিয়া
সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল এবং কোন রকম
ভূমিকা না করিয়াই পোকাগা বলিয়া উঠিল,
“দাবা এ তোমার কি রকম ব্যবহার?”

শৈল এই আকস্মিক প্রশ্নে বিস্ময় করিয়া
ভাবিতে আরম্ভ করিয়া হইয়া করিল, “ক্যার মনে

কি কারণে অজ্ঞান বাহ্যিক করণের রে শৈল ?”

শৈল কক্ষতাবে উত্তর দিল, “এই রেলেমাত্রাযুক্ত
কিহে হোমরা সংসারে লম্বত জন টানাও।”

শ্রেয়সী হাসিয়া কহিল, “ও এই কথা, আমি
কিন্তু বুঝি কি হক্কতই অজ্ঞান কিহু করেছি। ওত
আমারই স্ত্রী, কোন্টা ওত পক্ষে ভাল, আর কোন্টা
মন্দ তা আমি খেল বুঝি এত বুঝি বলই তার
তথ্যেই মক্কলের দিক কোন্টাই আমি ঐ ব্যবস্থা
করেছি।”

শৈল বিচক্ষণ নিরাক হইয়া বহিল। হঠাৎ
তারার প্রকার মনে হইল, বেনী লেখাপড়া বিবর্তে
দিয়া হত তাহার লাবার মস্তকের বিকৃতি
ঘটিয়াছে। না হইলে এমন কথা কি করিয়া তারার
পাশে বসিতে পারেন! সে অস্তরের বেবনা কাণিয়া
কহিল, “লম্বটা কি শুনি।”

শ্রেয়সী কহিল, “নিজের অবস্থা বুঝে চলিতে
শিখিলে পরে প্রবেশ পাবে না।”

শৈল জি। করিয়া কহিল, “বউবিবিত্ত জ্ঞে
তোমার তা হ’ল খুব রহম আছে বাবা।”

জননী এতকণ চুপ করিয়াছিলেন। অস্ত
ইচ্ছা করিয়া নহে কন্যার তবে। কিন্তু আর
কৌণিক থাক। তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।
জননী বসুধাতোকে সযোজন করিয়া কহিলেন,
“এর মধ্যে বাছা একখানাকে লাভখানা করে
লাগান দেহে।”

নাতিয়া মনে লগ্ন লক্ষ্য করিয়া আলিয়াছিল।
সে জানিত এই রকমেরই কথা ভাবিতে হইবে।
অত দিন হইলে হয় ত সে চুপ করিয়া চলিয়া যাইত,
কিন্তু আজ তাহার হিচ্ছাকে লম্বত করিতে পারিল
না, যা ইচ্ছা করিয়াই কলিল না। অতি শান্ত
ভাবে সে কহিল, “কি করে বিধো করে লাগাতে
হয়, বাপুনা আমার সে রকম শিক্ষিত মেন নি।”
এই কথা বসিয়া সে ঘোরে ঘোরে গেল স্থান ত্যাগ
করিয়া গেল।

অজ্ঞান নিঃশব্দে আঁচবাঁহিত হইবার পর শ্রেয়সী
সজ্জন করিয়া কহিল, “দার মুখের ওপর উত্তর
জন্মিল, এর পাতি দিবে তবে অত কাঁক।”

শৈল হাসিয়া কহিল, “বাবা বউবিবিত্তে মারকে
চলিলে না কি ?”

শ্রেয়সী কিরিয়া ঝড়িয়াইয়া কহিল, “তুই
আমাকে জেবনিই ছোটলোক পেলি না কি যে,
মেয়েদের পায়ে হাত জুগব।”

শৈল যেমনই হাসিমুখে কহিল, “তোমরা বড়,
বড় বিদ্যানু, তোমরা লব পার, আম্মা কি পাতি যেমন
ভালি।”

শ্রেয়সী কহিল, “যে জন তোমার প্রত্যেক
কথা ভাবিয়ে দেয়,—সেই জন আর ওকে বিধে
তিনবার কেলির তিনবার তোলাব।”

শৈল বড় কাণিয়া উঠিল। বউবিবিত্ত বউ
লাগব করিবার চেষ্টা করিতে আসিয়া সে এঁকি
করিয়া বসিল। যেমন করিয়াই হউক বাবার
কোথেকে লাভ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া সে
বিনতিত হয়ে কহিল, “বাবা পাতি দিতে হয় আমার
মাত। বউবিবিত্ত জন জুলতেই যাম্বিল, আমিই
তাকে লোর করে টেনে এনেছি, তা না হ’লে ত
আর এ কাজ বাগত না।”

কর্তব্যপরাগণ শ্রেয়সীনাথের কোথের উপগব
হইল না। কঠোর পারি ছাড়া লিখা হইতে পাবে
না—ইহাই নবীর অব্যাপক শ্রেয়সীনাথ একাক
লতা বসিয়া বিবাল করিত। শৈল অনেক লম্বন
বিসর করিয়াও যখন শ্রেয়সীনাথের তাহার লম্বন
হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না তখন সে জুড় বৃহ
কহিল, “আমাকে এখনি কলকাতার পাতিয়ে দিবে
তার পর বউবিবিত্তে যে পাতি হয় মাত।”

জননী এইবার পুজকে কহিলেন, “বাবা এখনি-
কার মত বউবাঁকে লাগ কর, যখন ছোটলোকের
মেয়ে বরে এনেছি তখন ও রকম কথা আবারে
দেয় অনুত হ’বে। ধ্যারে শৈল তুই কি ভিলে

কাপড় ছাড়ি নি—নিবেশে বাহার আগে অগ্রণ
একটা বাধানই চাট, তখন ৭”

শৈল সে কথার কান না দিয়া করিল, “চূপ করে
হইলে যে বাধা উত্তর নাহা!”

সুয়েস্ত্র অনেকটা নরম হইয়া করিল, “বা ভিক্রে
কাপড়ে গাবিস্‌ নি - লুর্ডি হবে।”

(৪)

নীলিমা তখন পূর্ণ কলসীর তাহে সুইয়া পড়িয়া
ঈর্ষিয়া চুইয়া বাহার বিকে অগ্রণের হইতেছিল।
শৈল সে বিকে একবার চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ চক্
কিয়াইয়া লইয়া ক্রতপথে ঘরের ভিতর চলিয়া
গেল।

সুয়েস্ত্রনাথের কর্তব্যে ব্যাখ্যাত পড়িয়া সে ম’ন
মনে অচ্যুত অবতি বোধ করিতেছিল। এমন
সময় তাহার জননী করিলেন, “এই মল তোলা
নিবে কি আবার রোজ তম কথা শুন্‌তে হয়।
তুই বাবা মল তোলায় লোক রেখে বে।” তাহার
এই কথার তাহার কর্তব্যচূড়ি আরও তীব্রভাবে
সমাগ হইয়া উঠিল। জননীকে করিল, “মা তুমি
এ কথা এতদিন শুনিয়েছিলে তেন! ও সব আশ্পর্দা
তুমি সন্ত ক’রতে পার কিন্তু আমি কখনও সন্ত করব
না। শৈল যদি অস্তায় করে বাস করে ককক, আমি
তাকে গাতি দেবই।” এই বলিয়া সুয়েস্ত্র উত্তরের
অপেক্ষা না করিয়া রোজাক হইতে নাথিয়া
পড়িল। নীলিমা তখন সবে কলসী খালি করিয়া
আবার ঘাটের বিকে বাইতেছিল। তখন অধ্যাপক
তীক্ষণকর্তে করিল, “বাঁড়াও”।

নীলিমা বাঁড়াইল। আল পেও ঘরিয়া হইয়া
উঠিয়াছিল, করিল, “পাতির কবা বলতে এগেহ—
আনি তা শুনাছি।”

এইরূপ উত্তর শুনিবার লজ সুয়েস্ত্র একেবারেই
একত ছিল না, বীরব-প্রকাশে যুখে আক-
ষিক বাধা পাইয়া সে খতমত বাইয়া গেল। কিন্তু
নাগীর কাছে পরাধীন স্বীকার করিলে ইহা কিছু

তেই হইতে পারে না। তবে বেতন তীব্রভাবে
আগেণ প্রচার করিবার সময় করিয়া আনিয়াছিল,
তাহার আশেপাশের মধ্যে লেজপ তীব্রতা দেখা গেল
না।

“তুমি মনে দেখ,” বলিয়া নীলিমা পূর্ণ কলসী
ককে ঘাটের বিকে চলিয়া গেল। মনে নাথিয়া
কোঁতে রূপে অভিবানে মে কাঁদিয়া ফেলিল। আর
কেহ বঙ্গের তাহা: বিবাহ হইয়াছে। এই বের
বঙ্গেরের অনেক কটনা এক সঙ্গে তাহার মনের
চড়ায়ে আনিল। তাহার বিবাহিত জীবনে উক্ত
নিশ্চিত বিধান স্বামীকে কাছে নে কি পাইয়াছে,—
ইহাই সে অস্তরের মধ্যে বার বার প্রশ্ন করিতে
লাগিল। উত্তর পাইল, সন্ত কুলা, কটন শিকা ও
কঠোর শাস্তি! তাহার বানো-দেওয়া তাহার
অবিবং মঙ্গল কামনা” করিয়া তাহাকে বেদী
তৈয়ারী করিবার জন্যই যে এই বাধ্যতা করিয়াছেন!
সে মূর্ণ, নিতের ভাল গোন্ধে না তাই যে বেদ
বঙ্গের কেবলই কাঁদিয়াছে। এই রকম মন লইয়া
সে হইবার জন্য পুঁথিয়া হইয়াও ‘তাঁরা খালি
করিয়া মন আবার কলসী তরিয়া মল লইয়া
উঠিতে বাইবে তাহার শ্রান্ত স্রাত বেদ সে কাঁচ
মন করিয়া পড়ি হইয়াইল। সে কলসী শুদ্ধ-
উপুড় হইয়া মনকে ঘাটের উপর পড়িয়া গেল।
তাহার তরপ্ত হইতে কেবল মাত্র হুইয়া কথা
অতি কটে বাহির হইয়া আনিয়া, বাধা, মা!

শৈল চুইয়া আনিয়া তাহার পুণ্ডিত মতক
কোণে তুলিয়া লইতেই দেখিল তাহার সমস্ত
মন তকে লগ হইয়া উঠিয়াছে। শৈল অঙ্গ-অং-
কত কটে ডাকিল, “বউবিবি!”

নীলিমা একবার চোখ বের্‌নিয়া তাহার বিকে
চাখিয়া আবার চোখ খুলিল।

শৈল চোঁৎকার করিয়া ডাকিল, “বা উইদ্বি
এম, বউবিবি কেমন হ’বে মেল।”

নীলিমা বাধা তুলিবার চেষ্টা করিয়া কৌতুকে

কহিল, “আমি ভুল তুলে দেব তাহুঁকে।”

শৈল কোন কথা বলিতে পারিল না, দুপাইরা দুপাইরা কাঁথিতে লাগিল।

জননী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “ওরে আমার কি সর্বনাশ হ’ল বে!”

শৈলও বেহে ঘেন্না ক’রে কথোবাত করিল; সে আর সহ করিতে পারিল না। চীৎকারে কহিল, “মা পাড়াই দোকান ভাঙ কর পরে, এখন বউমিকে দেখ।”

এখন সন্ধ্যা সুরঞ্জম ছুটিতে, ছুটিতে সেখানে আসিয়া বলিয়া উঠিল, “কি হ’য়েছে মা, কি হ’য়েছে।”

জননী দুই গায়েব তলে গও তাগাইরা কহিলেন, “ঐ দেখ বাবা কি সর্বনাশ হ’য়েছে। আবার বউমার পেটে যে আবার দু’ব’লের সন্তান রয়েছে।”

শৈল বিহরিয়া উঠিল। বাবার বিকে অগস্ত হুঁতে চাহিয়া কহিল, বাবা তুমি বাহু না পড়।”

পল্লীগ্রামের ডাক্তার আসিয়া অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কোন রকমে রক্ত থামাইতে পারিল না। এখন নীলমার পিতা মাতা কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নীলমার বেগের আর সমস্ত রক্তই বাহির হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার পদীকা করিয়া শুক হুখে ঐশ্বরের ঘাবকা করিবার জন্য ব্যাপসী হাঁতকাঁইতে লাগিলেন।

নীলমার রক্তহীন শাখা হুখে হাপি হুটয়া উঠিল, কণ্ঠে কহিল, “মাঃ! মা, বাবা তোমরা এসে, — বাঁচনাশ।”

নীলমার পিতা অতি কষ্টে কুঁকের তাঁর বেবনা চাপিয়া কহিল, “তাহুঁ কি মা পেয়ে উঠবে।”

নীলমা তাহার অবশ বাহু দু’খানি বিধা তাহার পিতার গলা কড়াইয়া ধরিল।

সুরঞ্জমাবের সেদিনকার সেই ‘প্রাণাধীনতা ও নাগীনের প্রাণের অধিকার’ সম্বন্ধে বক্তৃতা উল্লেখ করিয়া কলিকাতার অনেকগুলি কামত বক্তার উদ্ধৃতিত প্রমাণ প্রাপ্য হইয়াছিল। তাহা হই, দুই তিনখানি কাগজ সমুখে রাখিয়া সুরঞ্জমাব, সেইমিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় তাহার জননী সেই খানে উপস্থিত হইয়া হাট চাট করিয়া কাঁথিতে কাঁথিতে কহিলেন, “একবার পায়ের খুঁটা বিধি আন বাবা।”

সুরঞ্জম বিবর্ণ হুখে উঠিয়া বাঁকাইল এবং জননীও অশ্রুস্রব করিয়া দুহুঁত শয্যাগারে গিয়া উপস্থিত হইল।

নীলমা তখনও পিতাভাতার সহিত কথা বলিতেছিল। শৈল পাশেই বসিয়াছিল।

সুরঞ্জম জননী খাম্বাফুল ভর্তে কহিলেন, “বোমাই সুরো এলোছে পায়ের খুঁটা বিকে।”

নীলমার পিতা িংখে বসিয়া বহিলেন। নীলমা একবার সুরঞ্জমের বিকে চাহিল, কিন্তু মায়ের খুঁটা পাইবার জন্য তাহার কোন আগ্রহ দেখা দেল না। শৈলও হাতে হাত রাখিয়া কান অবশ শব্দ শুনে কহিল, “তাই পূর্বকমে অনেক পাশ করে এসেছিলাম, এ কাজে সেই পায়ের খোঁটা আরও তারি কঠোর চোলা।” এই বলিয়া সে ঘরে ঘরে পাশ করিয়া শুইল। আনী-বেবনা পায়ের খুঁটা লইয়া আড়ালের মত বাঁকাইয়া বহিল।

ମେକାଦିନର କଥା

ସହସ୍ର ବାକ୍ସିମ୍ବେର ଜୀବନେକ ଶ୍ରାବନ ଶ୍ରାବନ ଚୈତ୍ର
 ଅମେଳା ଶ୍ରାବଣେର ଜୀବନେର ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଚୈତ୍ର
 ଚୈତ୍ର ଅମେଳ ମସିହା ଶ୍ରାବଣେର ଚୈତ୍ରେର ବିମିତ୍
 ମସିହା ଶ୍ରାବଣେର ସହସ୍ର ସହସ୍ର । ଆସନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମାତ୍ର
 "ଲୋକାଳେର ମାତ୍ର" ନାମ ସିଦ୍ଧା "ସାବିତ୍ରୀ" ସାବିତ୍ରୀମସିହା
 କରେକଜନ ଶ୍ରାବଣେ ବାକ୍ସିର ମସିହା ଶ୍ରାବଣେ କରେକଜି
 ମସିହା ଶ୍ରାବଣେ ବାକ୍ସିମ୍ବେର ମସିହା ଶ୍ରାବଣେ କରେକଜି
 କରେକଜି ବାକ୍ସି ମସିହା କରେକଜି ମସିହା ମସିହା
 କରେକଜି ।

(২) **স্বাস্থ্যসুখ**। নটরাজ অনুষ্ঠান একবার ৮-১০ ঘণ্টা মে অবস্থান কালে প্রায় ২ ঘণ্টা পর্যন্ত সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ভাষ্যরূপাণ্যেব কালং নিকটবর্তী হইলে তিনি যেখানে যে প্রায় ২ ঘণ্টা পর্যন্ত একটি লাঠির উপর তর বিহীন হইতে প্রায় ২ ঘণ্টা পর্যন্ত বহিষ্ঠ হইতেছেন। ন্যায়িক ক্রম বিজ্ঞান করিলে পণ্ডিত মহাশয় বসিলেন

महामहोपाध्याय महेशचन्द्र गायरत

বঙ্গবিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র গুপ্ত

অসাধারণ কণ্ঠব্যবৃত্তি ও বক্তব্যাদিশূন্য

ক'র সন-সীতের একজন অধ্যাপক যেন তিনি পরিচয়
 :মাইয়েছেন। জায়েজ মশায় উপর দিগেন যে
 কলিকাতা হইতে এখন উত্তরাত্তরীয়ায় পড়া
 :কিয়া কতকগুলি ঐশ্যপিতলের বাসন জর
 :কিয়া দিতে অল্পমোহ করিয়াছেন। সেই ভাষ
 :লোকটির বিবরণ অবশ্যপক্ষে মূলতঃ ভাল বাসন
 :পাওয়া যায় এবং জায়েজ মশায় পছন্দ করিয়া
 :কিয়া দিলে তিনিও কলিকাতা খুব ভালই হইবে।
 :কোনও বিশেষ জিয়া উপলক্ষে দেখিলে প্রায়তন
 :সুখের মতই দেখিলে জর করিয়া প্রায়তন করা
 :বর্ত্ত্য। অতঃপর বিঃসৃত হইয়া পুনরায় বিজ্ঞান
 :করিবেন যে একথা। য তিনি অন্যভাবে জয়েজ
 :মশায় সম্প্রদায় হইতে পাইয়েন। কিংবা কোনও
 :মাস-বিজ্ঞানকে বাসার ডাকিয়াই পছন্দ মত
 :প্রাথমিক কিনিয়া দিতে "পাইয়েন। জায়েজ
 :মশায় মিলিলে যে উত্তরাত্তরীয়া সহিত ঐশ্যর
 :কতি বহুদিনের সাদাশ পরিচয়। অতঃপি যে
 :তিনি বহু কাহাংবো না মিলিয়া জায়েজ মশায়কে
 :এইগুলি অল্পমোহ করিয়াছেন ইয়ার কারন
 :এই যে ঐশ্যর মূল বিবরণ আছে যে জায়েজ
 :মশায় যাই প্রাথমিক জর করিয়াছিলে
 :কিয়া পছন্দ করি এবং প্রাথমিক মূলতঃ হইবে।
 :কতলাকেও উপর এই কাহাংবো জর দিলে সেই
 :প্রাথমিকটির একান্ত বিবাসের অবশ্যপক্ষে করা
 :হইবে না কি ? মাত্রেই বাসন বিজ্ঞানকে ভাল
 :ইয়া প্রাথমিক বিনিলে মতে টিক পছন্দমহি
 :বিনিমিত পাইয়া হাইবেন। কিংবা অতিমাত্র মূল
 :পাইয়ে। অতঃপর মাত্রেই জর যাকার করিয়াও
 :ঐশ্যর এটি এবং উত্তরাত্তরীয়া উত্তরাত্তরীয়া কতি
 :ঐশ্যর বর্ত্ত্য যে সম্প্রদায় করিয়াই হইবে।
 :মূলতঃ জায়েজ মশায়ের এই অল্পমোহ বর্ত্ত্য
 :প্রাথমিক সম্প্রদায় করিয়া বিজ্ঞানকে মূলতঃ
 :পাইয়ে।

বাঁচার বাঁচানোর অভিযান প্রেরণসচেষ্টা অন্তত-
 লালের প্রেরণসচেষ্টা যথোপযুক্ত সহকারে পাঠ
 করিয়াছেন বা অভিনীত হইতে দ্বিধাভাবেন তাঁহারা
 অবশ্যই আছেন যে তাঁহাদের যৌন জীবনকে যে
 সকল জীবন্ত হিত প্রতিকলিত হইয়াছে সেগুলি
 অনেক হলেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে অবলম্বন করিয়া
 অতিকৃত। প্রতীচ্যে অনেক উচ্চপন্থ ব্যক্তিগণের
 সুভাষা বা খ্যাতিগুলি উচ্চপন্থের অতিকৃত করিয়া
 দ্ব্যর্থতা বা বিচিত্র হয়, ইহাতে কেহই অস্বাভাবিক
 বোধ করেন না। কিন্তু এখানে কোনও বিশিষ্ট
 ব্যক্তির উচ্চপন্থ বামপন্থের রহস্যময়তা অতিকৃত
 দেখিলে তিনি ইহাকে তাঁহার মানের হানিকর
 বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহাতে তাঁহার রহস্য-
 ময়তাবলম্বন ব্যক্তির অতাবধি বিচিত্র হয়। একবার
 অন্ততমাল তাঁহার একখানি প্রেরণ (কালাপানি)
 ভাষ্যের মাধ্যমে অতিকৃত হইয়াছে। অতিকৃতমাল আত্ম-
 বিশেষের নিকট অতিকৃতহিত্তে বলিয়াছেন যে আত্মবল
 ময়তাবলম্বন-যেই পূর্ববর্তী ভাষ্যের মাধ্যমে অতিকৃত
 হইয়াছে তাহা আত্মবলম্বন। তিনি আত্মবলম্বন মনে
 করেন না, তাহাও যেহেতু ইহা তাঁহার প্রেরণমাল
 ভাষ্যের মাধ্যমে অতিকৃত ব্যক্তিগণের বিবেচনায়
 ব্যক্তিগণের বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চ
 প্রেরণমাল অতিকৃত হইতে দেখিয়া যেহেতু ভাষ্য
 মালম্বন বাম পন্থের উচ্চ হইয়াছে অতিকৃতমাল
 করিয়াছিলেন সেহেতু তিনি ভাষ্যমতে পারিগেল যে
 ভাষ্যের মাধ্যমে রহস্যময়ন ব্যক্তি কত অধিক এবং
 তাঁহার দ্ব্যর্থ কত উচ্চ।

ମାର୍ବ ବ୍ରହ୍ମେଣ୍ଡସ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ।

কিন্তু তা হাইকোর্টের তৃত্বপূর্ণ প্রধান বিচার-
পতি স্যার বদেখজি দ্বিতীয় অতি মজল, উদ্বার ও
অস্বাভিক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। সাধু ও
ধর্মতীক ব্যক্তিত্বকে তিনি সেক্ষেত্র ভাষা লম্বা



করিতেন। নিম্নলিখিত দুইটা গল্প হইতে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকটমান হয়। প্রথম গল্পট 'সাহিত্য-সম্পাদক' রচনায় প্রকাশিত।

(১) কামাঙ্ক্ষিকতা। একবার রমেশচন্দ্র কয়েকজন বন্ধু সমিতিবাহারে গমনে যিচ্ছিলেন। ঘাটে একটা লোক আসিয়া নমস্কার করিয়া তাঁহার হুপল প্রায় বিজ্ঞাপন করিল। রমেশচন্দ্র সেই লোকটিকে কিছুতেই চিনিতে পারিলেন না। অতঃপর সেই লোকটি রমেশচন্দ্রকে পরিচিতের ভাবে সম্বোধন করিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিল। অবশেষে রমেশচন্দ্র বলিলেন "তোমাকে ত তাই আমি চিনিতে পারিতেছি না।" সে লোকটি বলিল "সে কি মহোদয়, এতকাল এক আঁকিলে কাজ করা গেল, আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?" হাইকোর্টে কত পরিচিত লোক আছে, রমেশচন্দ্র কিছুতেই কিন্তু সেই লোকটিকে پہিচায়েন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। অবশেষে সে বলিল

"এক ঘরে যে আমরা বলিয়া কাজ করিয়াছি, আমি আপনাকে পাখা টানিতাম।" রমেশচন্দ্র লক্ষ্য হানিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখন হাইকোর্টের প্রধান চৌকরপতি তাঁহার দহিত এক আঁকিলে কর্ণহুয়ে আনন্দ সরসপ্রাণ পাখাটানা বেহারার দহিত বন্ধু ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

(২) সাম্প্রতিক ব্যক্তিগণের প্রতি অসন্তোষ। হাইকোর্টের ভূতপূর্ণ প্রধান সরকারী উকীল অন্নপ্রাসাদ বন্দোপাধ্যায় মহোদয় অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ও খৃষ্টীয় বাকি ছিলেন। কবিবর রমেশচন্দ্র 'বাঁধী মাথ' নামক রচনাকবিতায় ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "পাকা হিন্দু, প্রতিদিন প্রার্থনা করত" ইত্যাদি। সেখান হইতে অন্নপ্রাসাদ কামিয়ারে গেল করিতেন। রমেশচন্দ্র কামিয়ারে অবস্থানকালে প্রায় প্রত্যহ অন্নপ্রাসাদকে ঘেঁষিতে থাকিতেন। একদিন অন্নপ্রাসাদ রমেশচন্দ্রকে বিজ্ঞাপন করিলেন "রমেশ, কামিয়ারে আসিয়া প্রত্যহ বিবেচনা করুন করিতেছ ত?" রমেশচন্দ্র

নিবৃত্তা অরুণোদয়াক্তে তৎকণাৎ উত্তরং যেন কিস্তু কথংন রমেশচন্দ্রের ভাব এইরূপ প্রত্যয় পড়ি-
 “জালা হাঁ, সেইকতই ত জেতাঃ এখানে আসি।” চম্ব দিতে পারেন ?
 হস্তদিকই সাধুদর্শন ও দেহদর্শন একই কথা (ক্রমঃ) :

শৈল-প্রগতি

(ঐশ্বর্যবানারূপ বন্দোপাখ্যায় এম, এ, বি, এল.)

খানদেহ লুপ্ত হীর হারতির মত
 কে’তুনি দাঁড়াবে আঁধে বঁধি’ মৌনব্রত,
 লুপ্ত-লুপ্তের ধ্বংসে হারিবারে দাঁড়ি’
 এ কঠোর বঁধি তুমি কর কা’ও লাগি’,
 বার লাগি’ মৌরু ধৈর্য সহি’ নিঃশব্দ
 বঁধি’ তীব্র বজ্র-ভল বাণীর উপর

হয়েছে অটল হির প্রসন্ন সত্তীর
 চিত্রপটে আঁকা যেন মুক্তি সমাধির !
 পাখান বন্ধের তব প্রভুর সত্তীর
 হরে হরে লেখা আছে অক্ষর অক্ষরে
 বসন্ত-পরাঙ্গন অঁকি পরাক্রম
 লুমহানু ইতিহাস সিদ্ধ-সামান্য,

হে লুপ্ত, হোণীবর ! সন্তোষ-সন্তোষে
 চিত্ত হোর পরে তব আগনি প্রণমে।

ভাগের পূজা

(১২)

(লেখক রায় ঐশ্বর্যবান দেব বাহার)

(পূর্ব পূজারীণঃ — (১) ঐশ্বর্যবান দেববাণী (২) ঐশ্বর্যবান বাহুরাণী, (৩) ঐশ্বর্যবান দেববাণী
 বহু, (৪) ঐশ্বর্যবান দেববাণী, (৫) ঐশ্বর্যবান দেববাণী, (৬) ঐশ্বর্যবান দেববাণী, (৭) ঐশ্বর্যবান দেববাণী
 ঐশ্বর্যবান দেববাণী, (৮) ঐশ্বর্যবান দেববাণী, (৯) ঐশ্বর্যবান দেববাণী, (১০) ঐশ্বর্যবান দেববাণী, (১১) ঐশ্বর্যবান দেববাণী, (১২) ঐশ্বর্যবান দেববাণী)

চাক্ষুশীলার কথা

বাঁকোইলির বিলম্বে একটা কথা রিতে আনুভূত
 দাঁড়ায় হৃদ কণ্ঠে, বাবা, যে দাঁড়ায় হৃদ কণ্ঠে
 দাঁড়ায়! . যিনিই হউন পলাশবার পুণিলকে বাস
 “ বল বাবাবাবা বল, তব মেঘাচ, মিউনিসিপালের
 লোক তার তরে টেঙা আনার করতে আসতে চাই

না, যদি বা আসে এমন গাণিগাণাচ খেয়ে দাঁড়
 যে আর কি বলবে। ক’দিন ধরে চোখের উপর
 বেব’হি, ভালো দেখা যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে যেহেটা কেঁদে
 কেঁদে বসতে, পেটে টান না বাজে একটি বিলুপ্ত
 কি একমুঠা তাক, বাঁকোইলির ভাতে লক্ষণেই-
 ” নেই। তবে এখন যেহেটা খুঁজলে তখন আশ্রয়ের

জুলোকে নিরে গিছে ঘরের মধ্যে ছেঁকে বেষ, সেয়েটা তখনকার মত লজ্জার খেঁচা আড়ট হ'রে চুপ করে। জুলো বেঁচে চাষ না, ঠেলে ঠেলে গঠিচ, বলে, বণ করবে হবে।

মেয়েটা ত আমার কেউই নয়, কিন্তু কি জানি আমার মন কেন কীকে তার জন্তে! জানিনে কেন অন্ধকার রাতে তার ঘরের তালি তেল বের করে দেবার ভেত্রে আমি হট্টমট্ট করে দিই!... তাকে বণ করবে শুধু আমার বুকের পাঁচরাঙা পলায়িত কীপতে থাকে। সে যখন ঘরের মধ্যে হাটাকার করে তখন আপনা থেকে আমার হ' গোঁষ বিয়ে হু হু করে গল গড়িয়ে পড়ে। বিনের বেলা হাওয়ার বেতে বসে বাড়ীর আর সব ভাড়াটে মাসীরা বন সেই মেয়েটার বক্তব্য-সকল ঘেঁষে ঘেঁষে চলে পড়ে, সে বশে এলে কলকাতা-সহরের নার-জালা বাবুদেরও কেমন করে পায়ের তোড়ার অড়িয়ে রেখে দিতে পারবে, তাইই পরামর্শ করে, আর বয়ের বেলা জানালা দিয়ে সেই কখাঙাশো শুকতে শুকতে মেয়েটা যখন চুপ করে কঁপে ওঠে, তখন আমি তাক বেতে পারি নে; আমার চুঁটো চোখই স্থাপলা হয়ে বাত, হাতের তাক হাতে থাকে, কল পড়ে হাত ভিমে যায়।

সেদিন বয়ে কেলেক্স, নাকিউলি মালী। বলে, কি হল লা চারি?

চৌক সিলে বয়স—যে তাল দিগন্ত যদি।

তাত্তেই কি ছাই গার পাবার বো আছে! সাকীরা আমার লগানবন্দীর উল্টো কথাই বলে, চটে গিয়ে মালী বলে—আজকাল বড় লোকের ঘেঁষে মজ্বল হইছিল। এ সব ত্রাস কি আর বুঝে যোচে!

তাকে চটোতে আমাদের কাকই ধাঁধ হত না; তার মন রেখে চলে পারলে বেঁচে যেতুম আমরা।

মুহ—জান না, যোগ বণ লক্ষ্যে চিবিবেছি।

স্বামীনা, মরলা, মালী সবাই বলে—তাই হবে।

হালি-সম, ইকার্কি লেছে, খাওয়াও হচ্ছে,

মেয়েটা কি করতে কে—মানে! তাত্ত যে পাখ নি, তা আরি তাল তরেই জানি। মালী, তাত্ত না দিগে শুকিয়ে শুকিয়ে বণ করবে নিজেই বলেছে! আর বিলে কি আর আমরা বেশত দেখুই না! সেই কোন্ লগালে এতটা ধামি করে ওঠেই। শুদ্ধি দিগে এলেক্স, আবার সেই সজোবেশা ত'বানা ভট্ট আর একটু শুদ্ধ বেত্রে, লারাদিনে খাব কিছু না, এক পুত্ব জলের জরে যদি বণ লেগে যবে যাব, তা'ও বেবে না!

সমা দিগে তাত্ত নান্ন না। যখন যনে হ'গ আমরা বৃদ্ধা মালীভুলো বৃদ্ধা গোত্রালে পাঁচকলির জেঁকী দিগে, কীকড়ার বাড়ি চিঘিরে তাঁত বিশক্তি, আর এই বাড়ীকই একটা ঘরে একটা কড়ি বেবে না তাত্ত না। লগ, কঁপে লুটোপুটী থাকে, এত কালের বান্ধী আমি, আমার বুকের পল বুঝে জুগতে তাক আড়ট হয়ে পেল।

মালী বলে, কি লা চারি, তাত্ত শুইনি যে! কতলো না?

তরে ভবে বয়স, মালি পা-টা কেমন করছে।

মালীও মুখ, যা তা বনে' টাট্টা করতে লাগল, আর কানাম্বীরা তাই শুনে এ ওর গায়ে চুপে পড়ে, ও তার গায়ে চলে পড়ে।

একটু পরে বয়স, মালী পোবা পাখীভলকে ত সেলালে, তোমার জলোর খবর কি?

যদি একবার সেই খেঁচের বয়সের তালাটার দিকে চেয়ে পড়ীরভাবে বলে—পোষ মানতে আর দেয়ী সেই।

আরজুম, তাত্ত বের নি, বিয়েছে চুলোর ছাই খেতে, তবু বয়স—তাত্ত থাকে খুঁচি?

মালী পড়ীর তাবে বলে—হ্যাঁ।

একজন মুখফোড় ছিল, সেই বলে—তাত্ত থাকে না পাঁচ থাকে। ওকে আবার তাত্ত বেবে' ডের ডের টাট্টা বেয়ে মজ্বল বেগক্তি, এমনটিকিড বাবার কালেও দেখুই না বাঁকা! এমন রং, এমন চ,

অনন কল্যাণেতে থাকি, গানি শিখে, চুড়িই পোতা
আবার সতীশির! যুগে আতন, যুগে আতন!

হা তপস্বিনী! এরা পারে ক'! এই খা-খা
করছে তরুণ, পুষ্করি কেটে চৌচির হয়ে থাকে,
সরসের বড় বড় গাভীরাগার ছািব থেকে আতন
উঠে পোককে পুড়িয়ে তলপে বিচ্ছেদ, এ সময়ের
যেহেটা'র যুগে আতন বিতে এদের বাবে না।
কখন করে পারে যে তা ত বুঝি নে। পেরতর
খোঁজি না-এই নাই বল, তাই বলে- আর সেয়ে
মানুষ ত, কি করে যে পারে!

সবাই যেহে, ফেয়ার খালা, হাতে নিয়ে কল-
তলাও হিচ' চলে গেল, আমি সেই-কেই বসে
রইলুম। কলতলাটা একটু খোঁজেন্নে তেতর, নেতা
কালীর ঘরের পাশ দিয়ে টালি-বাঁধা একটা গলি
হাজা থাকে, সেইটের শেষে কলতলা, এতকটা
আবার চুই টাঙা-এ, এনিক থেকে কিছু দেখা
যায় না। তবে তাপের গাশির হরষা শুনতে
পাচ্ছিলুম।

জাত আবার পাতে বেননকার তেঘন ছিল,
খোড়ার যে ভটা খেয়েছিলুম, সেই বা! তরকারিও
সব ছিল। তা-লুং, খালাত্ত ঘরের জানুণা
পলিয়ে মেয়েটাকে বিয়ে আমি! এঁটো, হোঙ্
এঁটো, জাত বড় না প্রাণ বড়! উপবাস ভাল,
না আবার ভাল! আবার তরুণ হোল, জানিনে
কি জাতের মেয়ে নে? বাসুন্টারুন যদি হয়,
এঁটো বাঁচাব? সে পাশ ত আমাকেই লাগবে।
এখনে ত এই, আবার পরের মধ্যে কি হবে কে
জানে।

কেবে একটা কিছু বীমাংসা করে' কেলগার
আগেই বাগী উঠোন থেকে বলে উঠলো, কানীর
বাঁজা বাজিল না-কি লা গারি?

বয়ে সেহে আমি!—বলে উঠে হাঁকালাম।

হুপুর বেলায় এ বাঁজী, এক পাশের, ও পাশের
গলি বাঁজী একেবারে নিশুন হয়ে যায়। আবারের

বাঁজীর বাঁজীর খেতে যা যেহে, তার পরই বাঁজাব,
যে পরা পরা মানুহ বিধিয়ে এক পাল খোঁকা,
বিধি, বেশনাই পাখা নিয়ে যে যায় সেহ এলিয়ে
তবে পড়ে। আকর সব ভবে পড়ল। দু'একজন
তলে না, তাবের লজ কাশ ছিল, ঘরে বিন 'বিলে।
আদিও খেতল লাটিগা বগলবার করে যে ঘরে
যেহেটা বড় ছিল, সেই ঘরের বাঁজাব এনে শুণুণ।
মালী বেপ'র পাখি নি, সে এর আগেই হোঁকা
বল একটিকে লকে করে নিঃসর ঘরে চুককিল।

বাঁজীটা নিবন্ধ হেই জানিগার যুগ বিয়ে বেবি,
সাঁতসেঁতে মাসীর ওপর উপুড় হয়ে বেয়ে তবে পড়ে
আছে। গায়ে কাপড় নেই, থাকেই বা কোথেকে,
লক্ষ্যক বার আগে পুড়ে আতাব হয়ে থাকে গায়ে
কাপড় পে তাবতে পারে? একতান ছুণ কঁয়ের
পাশ দিয়ে মাসিতে গুটোকে, খোলা শিটটার খুণো
মাথাবাধি—আতাব বিহেজ করেছে। হুঁতো হাত
লজ করা, তারই তেতর খুণখানা মেয়ে তবে আছে।
ভাক্সুম—বেবি!

মাক্কা পেপুম না।

আবার ভাক্সুম—ওগো জন্ম? বেবি।

হৃদয়ক করে লাফিয়ে উঠে, কাপড় চোপড়তলো
সানলে নিয়ে এবিক ওবিক চাইতে লাগল।
আমি বহু—আমি এই জানিগার।

আবার দিকে চেরে মেয়েটি আবার জবে
পড়ছিল, আমি বহু—কিছু বাবে?

সে বাক নেড়ে বলে—না।

আমি বেগ বুঝতে পাংলুম, অবিয়ে 'না'
কুছে না সে, এ বাঁজীতে, কি এ বাঁজীর লোকের
হাতে বাবে না, তাই না।

বহু—যদি থাকে ত বল, বাবার কেব খাবার
আমি।

তবু বলে—না।

আমি বহু—একটু জানিগার কাছে গয়ে
জাসিয়ে?

সে বিজ্ঞান্য করণে—কেন ?

আমি আছে আছে বলুন—কথা আছে পোন।
আমি বাঁকীটনি নই; তবে থানকো বটে। সে
জাপ ত আর ঠাণ্ডে পরিব না তাই।

এ কথাটা সত্যি বশেছিলুম; তাই বলতে
বলতে মুখ ভাঙা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মুখটা আরও কঁপে
উঠল। বলুন—উঠে এল।

তবু বোধ হয় তার ভয় ঘোটে নি, সে হী। করে
চেয়ে হইল, এল না।

আমি তার খিঁচল অস্বাভাবিক ভাবে বলুন—না
কানোর দিবা, ভাল কথা বলব।

মা-কানোর নামেও এখন সে নড়ল না, নিঃশব্দ
তপস্বী বেড়া হল। ছিঃ ছিঃ আমায়ের মুখে এত
কড় মিলি তা'ও লোকে মানতে চায় না। কি
অবস্থা জীবন! না, না, অবস্থা নয়, অবস্থা নয়, অবস্থা
হলে এ জীবন বাপন করতে পারি কখনও? কিছু
অবদানই যদি না হবে—তবে ঐ ঘেরোট মানদায়
অড়ালে থেকেও আমার লগে কথা কইতে চায় না
কেন? তার না কথা? তার? কিসের তার?
এখান থেকে আমি ওর কি কতি কবে? আর
আমি ত পৃথক মই, যেহে হাঙ্গরকে মেয়ে হাতু:বর
তাই না কিসের জন্তে? আমার মনে হল যে না,
যেহে হাঙ্গরকেও তার করতে হয় বৈ-কি! আমা-
য়ের হাঙ্গরকে তার না করে কে?

সে কিছুতেই এল না দেখে, সরে ছাড়িলুম,
যেহেট একটুখানি এগিয়ে এসে বলে—তুমি কে ?
...তার পলায়ন তার তারি কী-কী।

আমি বলুন—এই বাঁকীই এক অজ্ঞানিনী।
আমাকে তোমার ভয় নেই, সরে এল।

এল।

তা'কে সহ্যতা করে বিজ্ঞান্য করুন—বিদ্ব
পাবে ?

সে বিজ্ঞান্য করলে—কোথায় পাবে তুমি যে
আমাকে খেতে দেবে ?

আমি বলুন—সে তোমার তোমার কেন তাই!

যেবে কিনা বল, দেখ।

বলে—কিনে আনবে ?

আমি ছাড় না:লুন।

সে আমার বিজ্ঞান্য করলে—কোথায় থেকে ?

আমার আমি ছাড় নেড়ে জানালুম যে হী।

সে বলে—তুমি পথে বার হও ?

হই বৈ কি! কি পাবে বল, এখনি এনে দিচ্ছি।

বলে—বাব না কিছু। তবে—

আমি বলুন—বল না তাই!

সে বিনতিত্ব হয়ে বলে উঠলো, তুমি যদি পথে
বার হও, আমার শিশিয়ার বাঁকীতে দিয়ে একবার
বলে এস-নী, আমাকে, এজা—আর সে বলতে
পারলে না।

বিজ্ঞান্য করলুম, তোমার শিশিয়ার টিকানা
জান ?

যেহেট ছাড় নেড়ে বলে—না। একটা লক
রাটার উপর মোতাগ বাঁকী, নিচেটা তারি
অড়কার।

হালি ও পেগ, হু:ব ও হল। বলুন—ও রকম
রাটার উপর মোতাগ বাঁকী আর নিচেটা তারি
অড়কার বাঁকী এই সহরে পলাপরাচারটা আছে, ও
বলে ত জানা যাবে না ত।

ওঁর ঘেসেলে লগই জানে! তার নাম
বলুন ?

তারও ত কাজ হবে না। রাটার নাম, নিম্নে
পাড়ার নামটাও কি জান না ?

সে আকাশ থেকে পড়ে বলে—রাটার আমার
নাম কি। আর পাড়া ত আমায়ের পাড়া পাঁতেই
আছে। বলকতা সহরে আমার পাড়া কি।

বললুম, কোন আশা নেই। কিছু সে কথা
তাকে গ্রাণ হয়ে বলতে পারলুম না। কি করে
বলব তাকে সে কথা! দেখে আমার মুখের
দিকে হী করে চেয়ে আছে, বেন আমার কথা

এপর তব মনেই বাঁচিয়ে আছে। কোন্‌ এখানে
পা'লটা আমি তাকে বলব যে, তার ইচ্ছাযে
কোন আশা নেই, কোন্‌ পায়ালে বুক বেঁধে
শোনাব সে কথা ?

শে আবার তাকে কেবল বলে—এক ছায়া
আছে—

বলে কেলেঙ্কির—আর বাবা।

এক লম্বা আবার দিকে ছুটে এসে বলে—
কেন, কেন, কি হয়েছে ?

বলুন—হয় নি কিছুই। তবে—

তবে কি ?

যদি কি ! ভাবছি, কেঁবে কেলে জন্মা যিবে
হাউটা বাড়িয়ে আবার পেট-কাপড়ের কাপড়টা
চেনে করে বলে—তোমার হু'টি পায়ে পড়ি, জেবা,
আবার পিনিয়ে বয়স বাড়। তোমার হু'টি পায়ে
পড়ি, আবার বাঁচাও।

সেখ, আবারও তাই ইচ্ছে কিছ—

লম্বা চোখে কীভাবে কীভাবে বলে—তোমার
হু'টি পায়ে পড়ি, যেমন করে পার, দয়া কর দে,
দয়া কর। ভদ্রবান তোমার জাপ করবেন, দয়া
করে জেবের বয়স বাড়, এখানে থাকলে আমি
আর এক দিনও বাঁচব না, মরে যাব, তোমার হু'টি
পায়ে পড়ি, যেমন করে পার—

বলুন—আমি কিছু করতে হবে না। আমি
সেখছি। কিছু কিছু করেছি কি ?

সে কীভাবে কীভাবেই বলে—না। ঐ যেখ না
হু'দিন মুক্তি দিয়েছে, কী দিয়েছে, সব পড়ে আছে,
ছুঁতে নি।

সত্যেতে সত্যে যেবে বেবলুন—তাই বটে।

আমি হু'টো দিন, ছুটো সাতার আগ-
কিনীর পেটে একটা ভাঁড়ের দায় নি। ওঃ!

না, যেমন করে পারি, অর্থাৎ এ বাড়ীর দায়
কতে যেই। যেমন করে পারি, যে করে পারি !
আরপর ভয় অস্টেই বা থাকে, তাই হবে, এ পাপ

পুতী থেকে শুদ্ধ, দ্বাংতে থাকে শিশি না কার
নাম করছে, সেইখানে পৌঁছো, না-এর পুণিগের
হাতে পড়ে। মনে হ'ল তা হলে তাই হবে !

তাকে অতর বিবেচনা, আচ্ছা, ছুঁবি এখন
বল দে, আমি যেখছি।

মেয়েটি কতকবে বলে—যদি শে বাঁচতে যাক,
তাকে ডেকে, তাকে ডেকেই বোনা।

ক'কে ?

তার নাম—দাদা ?

তারি আশ্রয় হ'ল, মিত্রাণ করলুম, শে শে ?

শিশিরের যেনে।

কি করেন !

গৈনিক।

গৈনিক কি বো ? লড়াই করে ?

না—ছবি আঁকেন।

তবে যে বলে—গৈনিক। পট্টা বল।

তিনি বলেন, গৈনিক। মেয়ের কাজ করেন।

ও আবার কপাল। তলেকী ? তাই বল।

তিনি বয়স পেলেই আবার নিয়ে যাবেন কেন।

উঁহেই বয়স দিও।

তা যেখছি। কিছু একটা কথা লিখি করে
বল ত, শিশিরের বাড়ী থেকে ছুঁবি পাণিয়ে এসে
কেন ? কি মুখ নাহাছ যে। বলতে পারবে না ?
আচ্ছা—খা।

বলে পাণির ওপর এসে বললুম। তাংতে লাম-
লুম, করি কি ? পুণি ? ও বাবা। তবেই পা
কীপতে লাম ! দাদী টের পেলে লাম পুঁচবে
না আবার ? আর ওর কাছে পুণি ! পুণিগের
ঠা ; দাদার নাক কেটে দেহ....

আজ যে শিশির তা মনে ছিল না, লম্বা দল-
কার কড়া নড়ে উঠেই হবে পল্ল, বাবু এসেছে।
কি শিশিরে ছাপাখানার কোর শে এইখানে
আসে। বৌকে গিয়ে দরদা যুগে দিয়ে এসে।
চুতেওরে কে, কীভাবে মরনা চাখেই মুখে, থাকে

আমি মৃত্যুতে মৃত্যুতে যাই—বসন্ত কি দিদি ?

হানু আমার মা'র পেটের ভাই ! আমায়ের
হাংককে আমায়ের ঘেঁষি নি, সেবে হাংককে মনে
নাই। তবে মা'কে মনে আছে, মা'র হাংককে
আমায়ের এই ত'টি ভাই বোন ছিলেন ! মা এই
অভাগিনীর মতই এক অভাগিনী ছিলেন যোগ
করি, বাবার গরিবের ঘেঁষি নি। হানু ছাপাখানার
কমরো করে, একটা বেছে থাকে, মনিবায়ের মনি-
বারে আমার এখানে আসে, সন্ধ্যা হতেই চলে
যায়।

তা'কে বলিয়ে হাংকা করছি, সে বস্ত্র-পাঁচ
টাকা। মাইনে বাড়ল, দিদি !

জাগাই হল বাই ! একটু ভাল বা বা, শরীরটো
হাতে ভাল থাকে তাই কর।

শরীর কি আর বাগ্যার জন্তেই খাটান হয় !
বাট্‌নিটে বা পড়েছে—

জ্বায়ে হানু, তুই যে বলিস মনিব আমার ছান
জান, কাক হাংকু কই বেথতে পারে না, তা তোমার
বিকে চার না কেন ?

হানু বস্ত্র-পাঁচা দিদি, অমন মনিব হয় না।
মায়ের হানু, যেথতা। কখনো একটা কড়া কথা
তিনি উঠে যাবে। ছেলে হানু, তার ওপর কত
লোপাশকা আনেন ত, কত বড় বড় লোকের লসে
জাব, আমায় ত পুষ্টি মাহ, তবু কখনো তুই বলে
ডাকেন না। আমায়ের হাতে খেঁদী বাট্‌নি না
হয় তার জন্তে কড়া আইনও করে দিয়েছেন,
আমায়ের জোম খেঁদী পাব বলেই ত অপ্যারটাইন
বাট্‌নি।

মনিব কিছু বলে না ?

না। তা বলেই বা না কেন ? খেঁদী পাব-
মায়ের জন্তে যে বাট্‌নিটে পারে—জীকে তিনি যার
করতেই বা যাবেন কেন ? কেবল রক্তারের কাক
কাজ করবার হুকুম নাই। যেত কি-না, মনিবের
যায়।

মনিব কি হানু ?

আছে আছে। আমায়ের যেমন মনিব না,
ঊনর তেমনই মনিব আছে। সেখানেই গিয়ে পুনা
টুকো করে ?

জীওনো মনিব ?

না গো না, বেঙ্গ বেঙ্গ।

কি পুজো করে ?

অনেক, ঠাঙ্কর খেঁদতা নেই।

বোই যে বোই, প্রকই বগে জীওন।

হানু এ সবকে খেঁদী তর্ক করতে পারেন না,
বলে সে নিজেই ঠিক জানে না— তাই কথটা
মুঠিয়ে কেল্লার মতো বলে—দিদি তাঁর কান যদি
তুলিস মনিব হয়ে যাবি।

কি—বল না তুলি ?

এই—সব—এই—সব—মেয়েদের জন্তে উনিই
উদ্যোগী হয়ে একটা আশ্রম পড়ে দিয়েছেন, পরলা
ঊন নয় বটে, তবে উনিই প্রধান। তারপর সমস্ত
জাতির কচি কচি সব বিধবাসের বিয়ে—তা'র
কটা দিয়েছেন। কাবের ত এ সবই লেগেন,
তারপর কোথার বগা হ'ল, সেখানে গিয়ে বেতে
লেগেন, কোন্‌ বেগে হুঁকি হুঁকি হানু আমায়ের
টিং সেই বানে; নিম্নে কত বই লিখেছেন, কত
কাগজে সব লেখা যে তাঁর বেগের—

জ্বায়ে, হস্তভাগিনীরের আশ্রম বেন ?

বেন। তাঁর কানই সেই দিদি। তাঁদের নিজ
তবনে গিয়ে বেগেরের হাতে অন্য কোন বিকেই মন
না যায়, আর কোন লসে না যেত পারে জ্বায়ে,
তাই কত হকমের ভাল ভাল কালের ব্যবস্থা করে
য়েছেন। কাগজে ত সেই কথাই লিখেছেন।

মনে হ'ল, এই ত প্রবোধ। হানুকে কেন বলি-
না এই মেয়েটির লগছে তার মনিবকে—আমায়ের ?
বিজ্ঞানগা করুন, আজ্ঞা হানু যদি পোনে, কোন
একটি পরাবের মেয়েকে কেউ আইকে মেয়েকে

বেজা বাড়ীতেই বস, তাকে তিনি উদ্ধার করতে পারেন ?

পারেন না—আবার ! দিদি, পুলিশের সব চেয়ে যে বড় লাহেব সে কতদিন আমাদের আকিলে এসে বলে গেছে, বাবু বা বঙ্গুয়েন সে তাই করবে !

কিন্তু পুলিশের নামে আমার বৃকের রক্ত শুকিয়ে যায়। পুলিশ দিয়ে হবে না। অজ্ঞ কি উপায় হতে পারে ? নিজে যখন কিছু জেবে পেঙ্গুন না, হাযুক সব গুলে বজ্রাঘ, শুনে হাবু দাঁড়িয়ে উঠে বজ্র, দিদি, তুই ভাবিসনে, এখনও সেলে তিনি বড়ই সুখী হবেন। এখন যোগ সরি বাড়ীতেই পাব, এখনও পুরে আসি আমি। ছুট্ট বহরটা আমি দিয়ে আসি; তারপর—কি হয় সমাটা সেখ তুই !

বহুদ, তাই, তা'তে শুধু ঐ মদাই নয়, তোমার দিদির অন্তরে আরও অনেক মজা ঘটবে। তার চেয়ে এক কাজ...

হাবু বহুদ, কি কি ? সে একেবারে চুন্ মন্ করছিল।

বহুদ, আমি যদি লক্ষ্যে বেশা তাকে বাস বহুদ দিদি, তুই নিয়ে গিয়ে তোমার মনিবের কাছে বিয়ে আদতে পারবি ?

পুত্র পাগব।

তবে এক কাজ কর দিকিন। টাকা আছে পকেটে দ্বুটা। একটা দিদি বোহল বিনে আন্ দেখি।

হাবু বহুদ—হয় ?

হ্যাঁ রে ! তোমার ভয় কি ? তুই ত আর থাকিসনে।

কি হবে তুমি ?

মানিকে বাইরে চাঁদ বহুদ তবে ত ছুঁড়াকে বার করব তুই বহুদার কাছে পাকী নিয়ে থাকবি, পৌঁছে দিদি।

হাবু ডাকী হয়ে চলে গেল।

বেজা আমি, যেহ বেচে বাই, কাটকে বহা করা মেহ করা, ভালবাসা এ জীবনে কোনদিন হরকার সুখি নি, করি নি, মুনো যেমন জিনিষ বেচে, আমিও জেমন বাস যে বা চেয়েছে, তা'কে তাই নিয়েছি। বিনামূলো খরচাত কোন জিনিষ করিনি, করতে যে হয় এর আগে তা জানতুম ও না।

আজ তাই হবে সেল।

চাঁদ হ'তে মানীর দেবী হল না। চাঁদ পাড়ার টেনেই, যেহ থেকে কাপড় ছুড়ে ফেলে দিয়ে জয়ে তবে আর কথা। খোশা কাপড়ের আঁচল থেকে চাবিটি নিয়ে বহরটা গুলে বহুদ, কথা কথোনা, এল।

বহুদ—কোথার আগে বস।

আমার বুক ডিপ্ ডিপ্ করছিল, নিজে জুগিয়ে ছিল, যদাশর, বেবে পেগ, বহুদ, আমার চিন্তে পাগল না, হুপুয় বোলাব—

বহুদ—চল।

পাড়ীতে তুলে দিয়ে চাবিটি মানীর আঁচলে বোঁধে বোঁধে খোঁজলটা গালে চোলে দিয়ে জয়ে পড়লুম।

কমলেশ্বর কথা

হাংড়ার গুলের মুখে হানে উঠেছি একটা কাগজ ফেরিওরাগা ছোঁড়া হয়ে বঙ্গ "ক্রান্তি" একখানা বিনুতেই হবে। নাহোজ বাখা। এমন হিনে মোক ও বাজুব হয় ? কি করি, হুটো পরগা, বজ্র করতে হল ! কাগজখানা গুলেই দেখি, মালতী নামে একটি মেয়ে... সে বলে এসেগের মা তাহার সম্পর্কে দিদিমা। এই এসেগ বা তাহার কোন আখ্যার... সম্পর্কের নিচট...

টান থেকে নেমে ট্যাক্সি নিলুম। সম্পর্কক মোকট হলে মানুষ, দোরগে, হিপ-হিপে হুন্দর চোরাগাটি। কেকিরতে লুট্ট হয়ে মালতীকে পাড়ীতে তুলে দিলেম।

মালতী মোকটা দিয়ে উঠেছিল, আমি এসেগ বলে সম্পর্কের দিঘেছি, তাই সে ত্রান্ত। পাকী

চুটতেই বোধ করি সে চিন্তে পেরেছিল, কেঁদে উঠলো।

তখন আর তাঁকে কিছু বজান না। বজান না কেন, পারলাম না। তার সুখের বিকে চাইতে সাধা হয়ে পড়ছিল।

বাঁচি বাঁচার সাধনে নেনে ভোর করে তার হাত ধরলাম, টানতে টানতে ঘা'র সাধনে ফেলে দিয়ে বজান না! পরমা ন্যেকে পেয়েছি।

*আনন্দে না কেঁদে ফেলেন। একটু পরেই

বলেম, প্রসারকে এখনি যে বধর বিতে ধরে, সে যে বড় ব্যথা নিয়ে গেছে কখন।

বধর দিছি না। আপনি একে দেখুন।

পরমা ন্যে পড়ে থাকিল, না ধরে ফেলেন।

সেই ট্যান্ডি নিঃস? বিভ্রম-ভ্রমার পোষ্টিকিটে
সিধে একটা টেলিগ্রাফ রওনা করে বিধে আপনার
মনেই বজান-কাজিল! আদাকে বিধেও ভূমি এমন
কাচটা করিতে পাওনে! বর ভূমি! *

* স্রীমতী রেবতীলা ভৌমুরী আপাদী নামের পুত্র
জায় প্রথম করিগারেন।

বিবেকানন্দ

(অধ্যাপক শ্রীঅমৃতচরণ বিদ্যাভূষণ)

স্বামী-বিবেকানন্দের জীবন-বৈদ্য বসন্তুর আলো-
চনা করিতে পারিমাছি তাহাতে আমার মূঢ় ংশাল
হইয়াছে যে, বিশেষত্বের এই মনোভাবকে
সম্যক প্রকারে বুঝিয়াছিলেন একমাত্র বিজ্ঞ ভূমি
শ্রীশ্রীমৎপরমহংসেব, আর এই করুণা নিধানকে
নিগূঢ়ভাবে বুঝিয়াছিলেন সেই ধ্যাননিষ্ঠ বৃন্দসব
শ্রীস্বামী-বিবেকানন্দ। তত্ত্বজ্ঞানকে তাঁহার
একনিষ্ঠ বৃত্ত যেমন বোঝেন, তেমন আর কেহ
বুঝিতে পারে না—আর তিনি তির ভক্তের হৃদয়ের
সম্যক উপলব্ধি করিবার বৃত্ত আর কাহারও শক্তি
নাই। মহাপুরুষকে বুঝিবার উপায় সাধারণ
মানুষের পক্ষে সম্ভব, এ কথা বলিবার সাধন আমার
নাই। বাহির হইতে যেখাটা মহাপুরুষকে ঠিক
চেনা যায় না। মহাপুরুষকে বহিতে হইলে তাঁহার
ভিতরে—তাঁহার অন্তঃকরে প্রবেশ করিতে হইবে।
তাঁর দল করিয়া, তাঁর উপবেশের অনুবর্তী হইয়া
চলিতে চলিতেই মহাপুরুষের ভিতরের সন্ধান পাওয়া
হইবে। শুধু বাহিরের চলা কেন্দ্রা বেকিয়া অনেক
সময় মহাপুরুষ সম্বন্ধে "আমাদের জাতিই মজা।

থাকে। স্মরণীয় মাপুরুষ যে রাগের অন্তর্গত
হাহারই ভিতর দিয়া কখনোকে তাঁহার হৃদয়ের
অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বাঁচার উদ্দেশ্যে প্রাণপুষ্পাঞ্জলি লইয়া তত্ত্বজ্ঞাত
হৃদয়ে তাক আনয়্য এখানে সম্মতে হইবারি, তিনি
শ্রীস্বামী-বিবেকানন্দ—মহাপ্রাণ মহাপুরুষ।
স্বামী-বিবেকানন্দ স্বামী ছিলেন। স্বামী হওয়া বড় সহজ
নয়। বাঁচার স্বামী তাঁহার। সত্য সত্যই যে, মন,
বাক্যের উপর বাঁধি করিয়া আধিপত্য করিয়া
প্রকৃতিক সম্পূর্ণ বশে রাখিয়া থাকেন। তাই শাস্ত্র
নিপুণগণ বলিয়া থাকেন—“বাহ্যতঃ বৃত্ত বেগোদৌ ন
স্বামীত্যভিধীয়তে।” আদি সাধারণ মানুষ—সাধারণ
মানুষের মত বাহিরের ব্যাপার লইয়াই আনি সন্ত
যত। স্বামী বিবেকানন্দের সন্যাসভের সৌভাগ্য
আমার তেমন মতে নাই। তাঁর ভিতরের সন্ধান
কিছু রাধি না। তবে আনি বাঁধির হইতে তাঁহার
বহুত্ব বেধিবার প্রয়াস পাইয়াছি আপনাদের নিকট
অকপটভাবে স্মৃতি-তাহাই নিবেদন করিব।
স্বামী বিবেকানন্দ সূত্র সূত্র আদর্শ দিয়া যুগের

এ দেশের, লোকের ও দেশের উন্নতির জন্য, তাঁহার-
তার পঠনে, বক্তব্যে ও লিখিতের নবনব প্রবেশনে
ওঁহার বিকসোবনী প্রতিভার বিকাশে কি কত
শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সে সবই আলোচনা
করিবার অবকাশ এখানে নাই। আমি বাকী
বিবেকানন্দের পুস্তক ওঁহার বিদগ্ধ চিন্তায় অনাবিল
বিখোবার বর্ণনাত্মক ভঙ্গ—বর্ণ বিখ্যার বক্তব্য
যাঙ্গ সমস্ত ভারতকে এক অজ্ঞেয় বস্তুতে সম্বত
করিবার তিনি যে উদ্যোগী নক্তি সজ্জা করিয়া-
ছেন তাঁহার মস্ত—মীন পতিত ষাতিবিশের
অভ্যুদয়ে ওঁহার লক্ষ্যস্রাব প্রবাহ ও চোঁতার মস্ত—
সমস্ত অঙ্গের নিকট তিনি যে অস্বাভাব্যে বেগান্ত
মত প্রচার করিয়া, মত সমস্ত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'
যেণবানীকে স্বতঃ অন্তরন পূরক ভারতপোষ
বেগান্ত মতকে অঙ্গসৌর্য করিয়া তুলিয়াছেন
তাঁহার মস্ত—আর ওঁহার পূজা করি—তিনি
হরিতের প্রত্যেক বস্তু করিয়া লইয়া হরিতের
সমেশী হইয়াছিলেন বলিয়া—ব্যবহের ক্রম
ওঁহার দ্বয়ের পরেই পরেই বহুতর করিয়া—
তাঁহার সঙ্গে কাঁথিয়া তাঁহার ক্রমশঃ লাগব
করিবার এক বহুপন্থিক হইয়াছিলেন বলিয়া;
মস্ত নারায়ণের বিধিমতে সেবার মস্ত যে
সেবা বর্ণের আচরণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া
গিয়াছেন তাহা চারিপদ বর্ষ পূর্বে একদিন মধ্য
অগস্ত্য কালোরে ঠাকুর জীওঁতন্যাবেব লিখে
দীর্ঘতিন্মুখেশ কোণীনমায় পরিচয় করিয়া
ভারতের ঘরে ঘরে সাক্ষরভেদে করিয়া
গিয়াছেন; কালপ্রভাবে সেই সমাজের পাখত
সাক্ষরতীন পরম ধর্ম মলিন ও প্রাণহীন হইয়া
আদিয়াছিল, সেই সভ্য ও প্রেমধর্মের পুনরুত্থানের
সংঘর্ষে লইয়া এই মহাপুত্র্য নবীনভাবে নবীন
উৎসর্গে বর্তমান নব্য শিক্ষাভাবিনী অগস্ত্য
অস্বাভাবিক করিবার মস্ত জ্ঞান ও প্রেমের বিদগ্ধ-
কেশন একত্ব করিয়া মস্তের এক প্রান্ত হইতে

অপর প্রান্তে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন। যখন
মহাপুত্র্যের আভির্ভাব হয় তখন ওঁহাকে চিনিতে
ও বহির্ভুক্ত করে অতি অস্বাভাবিক; তবে তিনি যে
পদম পদ্য ও কলাপের বীজবপন করিয়া গিয়া,
তাঁহাই কালক্রমে অকৃত্রিম, বর্জিত ও মুকুণ্ডিত হইয়া
তাঁহার অপর্যায় ও অস্বাভাবিক মৌল্যে বিবর্তনকে
মাতাইয়া তোলে—মুত্ৰাভিক্ত মনবানী তখন সেই
অজ্ঞাতপূর্ণ মহাপুত্র্যের মস্তিষ্ক আশ্রিত হইয়া
অনন্ত-মস্তানে ওঁহার বিদগ্ধ তেজের অশ্রুত হইলে
বাঁকে এবং ওঁহারই মনোগানে আশ্রিত হইলে
স্বাধিক ও লক্ষ্য বলিয়া জান করে।

মাতিনিমিত্ত ধর্ম একদিন ভারতের সত্যের
প্রচারের অস্ত্রায় দিল, তাহা জীওঁতন্যাবে
নাম বজের প্রতিষ্ঠাতা জীওঁহিরাণ ঠাকুরের
অভ্যুদয়ে ও আলৌকিক উপায়ে নাম প্রচার
যাঙ্গ অপর্যায়িত হইয়াছিল। সেই অস্ত্রের
নির্ম্মন নীতির মূলে পুনরাব কুঠায়াস করিয়া
কাষবস্ত্র, তিলক মস্তক-প্রস্তর জীবরত্ন
নাম শিক্তি সমাবে ভারতের মস্তিষ্ক বোস্তবর্ষ
জাতিবর্ষনির্ভিগ্নে অগস্ত্যে ও অকিত্য প্রচার
করিয়াগিয়াছেন এবং উচ্চশিক্ষিত ও পাশ্চাত্য
মস্ত্যায় আবেশে মস্ত হইয়া ও মস্ত্যানী সন্তানমর্ষ
নিবে আচরণ করিয়া অগস্ত্যে পবিত্র প্রেমবর্ষ
নিখাইয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময় প্রাকৃত শিক্তির
আলোকে আলোকিত শিক্তি সন্তানবর্ষের অস্ত্র,
অভিযোগ ও অকাত্মা বিবেকানন্দ নিবে বিশেষ
অপুত্র্য করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানমুত্রে ওকবেবের
কৃপায় ভবিষ্যৎ বর্ষলবনের চিত্র মস্ত্যকণে
বেথিয়া মস্তের হিতের জন্য বোস্তবর্ষকে
তক্তি বর্ষের মস্তিষ্ক নিখাইয়া নিখাইয়া মস্ত
করিয়া আনবেব উপবেশী করিয়া দিয়া
“বিবেকানন্দ” নাম সার্থক করিয়াছেন। মস্তবর্ষের
মস্তবর্ষ জীওঁতন্যাবেব জীওঁহালীর্ষ “দীর্ঘ বর্ষ।
নামে কতি” এই অঙ্গবপন নীতির প্রচার বেস্তবে

পক্ষিত সম্রাট যে হুই ও দ্বিতীয় জন হওয়া সম্ভব
ভাটায়ই মৃত্যু সাধারণ আদ্যা এই মহাপুরুষের
মিষ্ট পাইতেছি। আদ্যা হুইই হুইর কণ ও
কণকীবনকে নিজেদের জীবনের সহিত নিশাইয়া
লইতে পারিল ততই আদ্যের প্রকৃত কল্যাণ ও
জগতের প্রকৃত প্রেম ধর্মের প্রচারপক্ষে অসুশ্রীণ
করা হইবে। হইতে পারে, যাহা আচার ও ব্যবহারে
এই মহাপুরুষের নিজ জীবনে ও তৎসম্পন্ন পিতা-
কৃষ্ণের জীবনের সহিত ঐক্যপ্রবর্তিত বিত্ত
বৈক্য সাধারণের আচরণ ও অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য
পার্থক্য হইয়াছে—কিন্তু আদ্যা দ্বিতীয়কে যেহেতু
পাইতেছি উভয় সম্রাটাই তাগব্রতগারী জগজ্জীবের
কল্যাণার্থক। উভয়বিকারী সাধকগণের
সাগরের উদ্দেশ্য একই এবং সিদ্ধান্তও একই
প্রকার। ঐশ্বর্য বাহী বিবেকানন্দ অসুশ্রীণগণের
পবিত্র জীবনে জ্ঞান ও দেহাবর্জিত ভাবের পত্রিত্ব
হইয়াছে। পক্ষাতরে ঐশ্বর্য মহাপ্রভুর পিতাপুত্রিণা
ও অনুশ্রীণগণের বিত্ত চিত্তে তক্তির অস্বাধি
সৌভ্য ও জীবনিত্যনার প্রকৃত কল্যাণচরণ ও
ত্যাগবর্জিত চূড়ান্ততর পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে।

যেহেতু যে আকারে পণ্ডিতবগুনীর পণ্ডিত্য
ও ধর্মজ্ঞান সাধক ব্যক্তিরা হুইই হুই ভাটায়নার
একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়াছিল এবং তাহার বিত্ত
অন্যোপায়িক যত কালক্রমে অস্ত্রাচারে আকর্ষিত
হইয়া হুইয়াছিল, সেইমত বাহী বিবেকানন্দ
পুনঃসংস্কার পূর্ণ চিত্তচরিত্রময়ের প্রচার করিয়া
বরণ্য হইয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত মতবাদের
ভাষার পরিণয় ও সংস্কৃতভাষার কথার যেহেতু
পাই। উক্ত ইংরেজি পণ্ডিত পাক্ষাত্যধর্মের
স্বপ্নভিত্ত বাহী বিবেকানন্দ সেই, যোগ্যত্বধর্মের
মুগ্ধতাকে সাধু ও পণ্ডিত প্রাণল,
মরণ ও মরণশীল বালা ও ইংরেজি ভাষার
অভিযুক্ত করিয়া পূর্ণপ্রচারিত ধর্মেরই পৌষকতা
করিয়াছেন। তাঁহার অধিকার হুইই ভাটায় করিয়া

পাই করিলে সম্রাট যেহেতু পাইইন যে যোগ্যত্ব
ও পাক্ষাত্য ধর্মের অস্ত্রাচারে মরণের মৃত্যু
ধর্মনিষ্ঠ তত্ত্বা অস্ত্রনিষ্ঠ বিপুলি যেহেতু বিপুলি
হইতে হয়। তাঁহার হেতু পণ্ডিত্য ভাষার মৃত্যু
মৃত্যু বিপুলি ও বিপুলি ভাষারিত মৃত্যু
হইয়াছে। এই মহাপুরুষ আদ্য পুরুষ। ইহা। আদ্য
ও উপদেশ হইতে বিপুলি ও অসিত হইলে তৎসু-
ধর্মগণের পতনের মৃত্যুনাও অসিত হইল, যেহেতু,
তাঁহার হাতি ও কর্তব্য মৃত্যু ও মৃত্যু। মৃত্যু
আবহমানকাল প্রস্তুতি একটানা নৌতিক ধর্মবর্জিত
বিকৃত এবং মৃত্যুনাও বিপুলি বাহ্যিক। মৃত্যু-
ভনের মৃত্যু। আবহমানের বিকৃত বোরবর্জিত বোর-
পুরুষের অসুশ্রীণ হইয়া জীবন সংগ্রামে অসুশ্রীণ
হইতে পারিলে, আদ্য জীবন পণ্ডিত হইতে পারিলে।
তাঁহার বিদ্বতি হুইলে তাঁহারের বা কিছু সম্রাট
নষ্ট হইয়া যায়। জগতের কল্যাণ না হইয়া
অন্য অসুশ্রীণের কাণ্ড হইবে।

আদিকার এই পুণ্যার্থে আদ্যা যেন তাঁহার
পক্ষির বগাবার অধিকার হইয়া মৃত্যু প্রাতি
অধিকারিত মৃত্যু বাহ্যিক মৃত্যু মরণ চিত্তে পাই
—তাঁহার ভাষা মরণ হইয়া মরণকে প্রেমের
হেতু বাহ্যিক পাই—তৎকালে মরণ বিবর্তিত
হইয়া ভাষা মরণ উচ্চনীতি ভাষা—এক
মানববংশের বাহ্যিক মরণকে আপন করিয়া পণ্ডিতে
পারি। তিনি যে জ্ঞানের বস্তুর আদ্য দ্বিতীয়
পিতাছেন তাহাধর্ম আদ্যের অজ্ঞানত্বকার যে
চিত্তের বিপুলিত হইয়া বাহ্যিক আদ্যের ভাষা
পাণ্ডা জগতকে প্রবীকৃত করিয়া মরণ বিবর্তিত
ভাষা যে উৎকর্ষ উৎসাহিত করিয়া দ্বিতীয় তাহা-
ধর্ম যেন নীরল বালাগী জগতের মরণ হইয়া বাহ্যিক
আদ্য সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে মরণ করিতেছি
— বাহ্যিক। যে পক্ষি মরণ করিয়া বালাগী যেন
তাঁহকে জিনি প্রবর্তিত করিয়া, সেই তেরা নিনা-
বাধিত ভিত্তিত মরণ প্রাণ বহান দ্বিতীয়:

এই বানী যেন আশ্বাসের কর্ণধ্বরে সতত কণ্ঠে থাকে সেই শক্তি যেন আশ্বাসের জীবনে চিরকাল কার্যকরী থাকে—সেই শক্তি বলে আশ্রয় যেন শক্তির হইয়া যেশ্বর ও মনোর কার্য করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারি। আশ্বাসের চিত্তবৃত্তির জড়তা যেন আশ্বাসের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। কপের প্রতি যেন আশ্বাসের অবিরল নিষ্ঠা থাকে। তাঁহার 'ভাবোত্তর কথা' যেন আশ্রয় না জুলিয়া যাই—রাখিতে রাখিতে যেন তাঁহারাই ভাব জোর নাহি অজুগাধিত হইয়া নববলে বনীরমু হইয়া জগতের মতো অগ্রসর হইতে পারি—আর তারিত বানী ক' তিন যে কেমন চক্রে বেঁধিয়াছিলাম সেই

যেসের চক্রে বেঁধিতে পারি—আশ্বাসকে আপন করিয়া কর্ণ-কণ্ঠে একমন একপ্রাণ হইয়া যত্নপর হইতে পারি—তিনি যেমন বেশীতাকে পুষা করিয়া স্বয়ং বৃত্ত হইয়াছেন, আশ্রয়ই সেইজন্য বেশ-মাতার কল্যাণতায় হইয়া তাঁহারই পুষার জীবন উপলব্ধি করিয়া বৃত্ত হইতে পারি—তাঁহার সেই বাণী যেন রাখিতে হইবে 'বনের উন্নতি না হইলে বেণের উন্নতি সম্ভবপর নয়।' বানীরির অপেক্ষ করণা বলে আশ্রয় যেন জ্ঞান ও ভক্তির দুপলং রসপাণ করিয়া দরিদ্র মাতারপের সেবা করিবার উপায় পাও হইতে পারি। *

* বক্ত বাণীক মনোবাসনায় লেখক কর্তৃক পণ্ডিত।

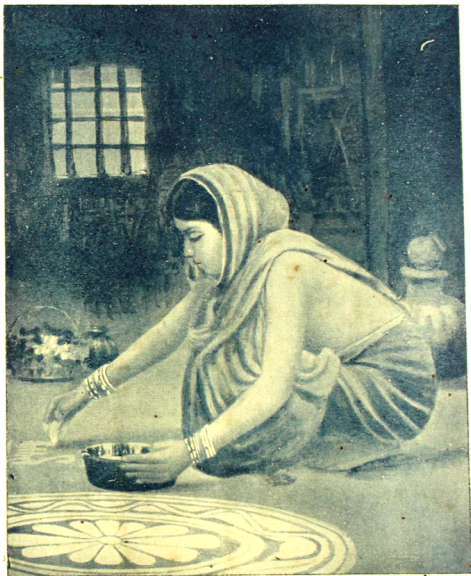
শোক সংবাদ

মনোজ্ঞমোহন বহু

১৯০৮ চনাব দিঃ ১৩ মনোজ্ঞমোহন বাবু নষ্টবাণী করিয়া পাইবার ভক্ত আশ্রয়তাঃ দিয়াছিলেন এবং সেই বানীই মাতা পিরাছেন। যে কখনো বাস্তুচিহ্ন তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন সে কখনোই বস্তুচিহ্ন রসায়নে দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইতেছে। গেলসি পাঠ করিলে তাঁহার মানব চরিত্রের যে অতিজ্ঞা ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা করিয়া দিলে দিবার কথতা তাঁহার অসীম ছিল। তাঁহার লেখনীতে লক্ষ্যবৃত্তি যেন ছুটত। তাঁহার দোক লক্ষ্য আশ্রয়পক্ষে আশ্রয় প্রবণের আন্তরিক লক্ষ্যবৃত্তি জ্ঞান করিতেছি

বিমলা দাস

বনীর লক্ষ্যবৃত্তি যাহা লক্ষ্যবৃত্তির পক্ষা বিমলা দাসের লক্ষ্যবৃত্তি বনীর লেখিতাপের ভিতর একমন নিশিচুপনী জ্ঞানবাহিনী লেখিকা হইয়া আশ্রয় অকালে হারাইল। জগতের নানাব্যানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন "নরকবে জ্ঞান" ও তাঁহার মনোবাসনায় জ্ঞান বাহিনী তাহার লক্ষ্য। তাঁহার লিখিত শক্তি অসাধারণ ও বহিঃপ্রবর্তনী মনোবাসনায় ছিল। জগতের তাঁহার পরিভ্রমণের লক্ষ্যনা বিন হইয়া আশ্রয়ের আন্তরিক কামনা।



আলপনা



১৩শ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

২য় সংখ্যা

প্রাচীন সাহিত্যে ত্রীকূক্ষ

অধ্যাপক শ্রী অমলাচরণ বিদ্যাহূদয়

যেহে ত্রীকূক্ষ শব্দের উল্লেখ করিতে পারা যায় তাহে বটে, কিন্তু ত্রীকূক্ষ শব্দে বসে কোন পদার্থকে কোথায় রাখা করা হইবার, তাহা বিচার করিতে হইবে। স্বর্গের ১০ম মণ্ডলের ২৪ স্থানের ৪ম স্থানে এক ত্রীকূক্ষের কথা আছে—কিন্তু সেখানে নিকটী পক্ষী অর্থে ত্রীকূক্ষ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

অপর্যাপ্ত বাহ্যমাত্রের পদার্থের ত্রীকূক্ষ ইতিবা

অনতিদূর।

কল্পনি ব্যতীত পদার্থ নিকট পূরবেত্তব্যবিত্তে

অপর্যাপ্তে

অপর্যাপ্তের (১১২২) এবং সাধারণ আবেগের (১১২৭) দুই স্থানে এই অর্থেই ত্রীকূক্ষের উল্লেখ

আছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় সাহিত্যে (৪—২৩৪), (৬:১৩১) ও শতপথব্রাহ্মণে (১১:৪১), ৩—২১:৮) বার অর্ধে ত্রীকূক্ষের উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন কোন ব্যাখ্যা ভাষ্যের উল্লিখিত মন্তিক দ্বারা এই সমস্ত স্থানের ত্রীকূক্ষকে বুঝি করিয়া তুলিয়াছেন। স্বর্গের ১০ম মণ্ডলের ২৪ স্থানের ৪ম স্থানের ত্রীকূক্ষ। ইনি ৩য় ও ৪র্থ কূক্ষ আশ্রয়কে ত্রীকূক্ষ বলায় পরিচয় দিয়াছেন।

আমি বা ত্রীকূক্ষ অর্থিন বহুত বাজিলোবধু।

মন্ত: পোষ্য পীতয়ে।

পূর্ণাং কতিতুর্ভা ত্রীকূক্ষা স্বর্গতো নতঃ।

মন্ত: পোষ্য পীতয়ে।

অনুজ্ঞা-কাণ্ড বলেন, এই কৃষ্ণ আভিরাম
অর্থাৎ অ'ভিরাম বাস্তব। ৮ম মঙ্গলের ৮৯ শ্লোকের
মুচ্যিত্তা কৃষ্ণের পুর 'কাকি' বা বিবক। অর্থাৎ
১ম মঙ্গলে: ১১৬ শ্লোকের ২৩ শ্লোক কৃষ্ণ নব্বইতে
বৈবিক বাস্তব অনুসারে 'কৃষ্ণ' পদ গিচ্ছ
হইয়াছে। ঐ মঙ্গলের ১১৭ শ্লোকের ৭ শ্লোক
কৃষ্ণ আচে। শুদ্ধ হুইটী এই—

‘দ্বন্দ্ব্যতে অসতে কৃষ্ণায় বজ্রহতে নানত্যা নতীতি:।
পশ্চৎ ন নষ্টমিব মর্শনায় বিকাসং মনুবিষকারঃ’
‘দ্বন্দ্বং নষ্টা অসতে কৃষ্ণায় বিকাসং মনুবিষকারঃ।
যোমোহি চিৎশিষ্টবৎ হস্তোপে নতিং তুর্জয়ঃ

অধিনাধনজঃ। ৭

এই চুই শ্লোক অধিবর বিকাশকে বিবক
কৃষ্ণের নিকট অর্পণ করিতেছেন। প্রত্যয় কৃষ্ণ
বিকাশের পিতামহ হইতেছেন। এই কৃষ্ণ এবং
কৌবিত্তকী ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ আভিরাম—তবে ইনি আভিরাম করিয়া।
ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ আভিরাম—তবে ইনি আভিরাম করিয়া।
ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ আভিরাম—তবে ইনি আভিরাম করিয়া।

ব্রাহ্মণা উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন—

‘অত্বে এতৎ যোর আভিরাম: কৃষ্ণায় দেবভী-
পুত্রায় উষ্মা উবাচ আপিগমঃ এত স বজ্রঃ।
সৌম্যবোদাধায়েতৎ অত্রঃ প্রতিপত্তেত অকিতমসি,
অচ্যুতমসি, অগোপ্যমিতমসি।’

অতঃপর আভিরামবস্তীর যোর দেবভীপুত্র কৃষ্ণকে
সম্বোধন করিয়া বলিছেন—‘আর তিনিও পিণ্ডা-
পুত্র হইলেন। তুমি মঙ্গলকালে এই তিনটি মন্ত্রের
আমায় লইবে—এই তিনটি হইতেছে তুমি অকিত,
তুমি অচ্যুত, তুমি অগোপ্যমিত,’ তাহাচার অর্থ
করিয়াছেন—স এবং ব্রোহ্মণ্ডজবিদ্ব অম্বোদাধাঃ
মঙ্গলকালে এতমন্ত্রের অতিপত্তেত অগোপ্যমিতঃ।
অগোপ্যমিতঃ অগোপ্য মঃপিতঃ সত্যক্ তদ্রুতক
সত্য তৎ অগি।

• কৃষ্ণবস্ত্রের তৈজসবীর আভিরাম ও কৃষ্ণের

উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কৃষ্ণকে পুরুষবস্ত্রের
নাম উপযোজিত হই দেখিতে পাওয়া যায়।
কোথাও বা তিনি পুরুষবস্ত্রের বজ্রপুরুষ, এরূপ
আভাস পাওয়া যায়

পুর্নোন্নিষিত এতুতলি আনোচনা করিয়া, কৃষ্ণ
সবন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা এই—

যেবর্ষিত কৃষ্ণ বলিলে, উহার অর্থিক কিছু
পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যে কয় বার কৃষ্ণের
উল্লেখ আছে, তাহাতে কৃষ্ণ বলিতে শুধি যায়
বুঝায়। হ'তিন বান হুড়ি মর্শন কৃষ্ণ শুধি বলিয়াই
পরিচিত। অতঃপর বিশদ্রুত কৃষ্ণ পদম পুরুষ
বলিয়া উক্ত বহিঃছেন বলিয়া বিশদ্রুতের তাহা-
করদপ মনে করিয়া থাকেন। বিশদ্রুত (১০১১)
বলিতেছেন—‘কৃষ্ণ বিকো। বাহুবৎ দ্যৌকেন
নমন্ত তে’। শুধু, কৌবিত্তকী ব্রাহ্মণ, ও ব্রাহ্মণা
উপনিষদে কৃষ্ণকে আভিরাম আখ্যা দিয়াছেন।
পার্মিত্র ৩।১২৬ শ্লোকের পদসম্পর্কে কৃষ্ণের উল্লেখ
আছে। ৩।১২৬ শ্লোকে পদসম্পর্কে কার্কাষণ ও
রাণাষণ শ্রেণী নিপাতিতঃ কৃষ্ণ ও রণ পদ বেওয়া
হইয়াছে। হ:অকৃষ্ণ গোপাল তাণ্ডারকার মঃপদ
বিশেষ হুঁত যাঃ এলম্বতে আনোচনা করিয়া যাহা
নিখিয়াছেন তাহা এই—কার্কাষণ ও রাণাষণ, এ
হুইটী বলির শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গোত্রবান।
এই গোত্রের কিংবদন্তী কিকিং পরবর্তিতালে
বৌদ্ধবিশেষ বধ্যও অপরজাত হিল না। কেন না,
বৌদ্ধগণ বিশ্ববিশ্বের আধ্যাতিকার অনেক স্থলেই
অদ্বুত বিবৃতি প্রদান করিলেও কিংবদন্তী বিদ্যাঃ
তাহাবিশেষের গ্রন্থ হইতেও কখন কখন হুঁ একটা
ভণ্ডের কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থে ‘কৃষ্ণ’
এই নামটী ‘কংস’ পরিণত হইয়াছে। পঞ্চাঙ্গা-
মারে কৃষ্ণ ও কংস অভিন্ন। বৌদ্ধবিশেষ নামক
বৌদ্ধগ্রন্থে (৩।১২৩) কহায়েন শ্রেণী ও কংস শুধির
নাম আছে। ‘উক্কো গো কংসো ইনি অধোনি’
বৌদ্ধবিশেষের এই কংস কংসের শুধি হইতেও

শাসন। তবে তিনি আশা করে কৃষ্ণ কি না, তখন
সম্বন্ধ কোন প্রমাণ নাই। ঘটনাতক কৃষ্ণের যে
কাহিনী আছে, তাহা যে বিস্তৃত আকারে আশা করে
কৃষ্ণেরই কাহিনী, তৎসম্বন্ধে কোন সম্ভাবনা নাই।
কোনকালেও দেখা যায়, এই সম্ভাবনা সাধারণের
পূর্ব গ্রহণ ছিল। ইহাও দেখা যায়, এই সম্ভাবনা
সম্বন্ধে বাস্তবিক ও বসন্তের নাম আছে। কৃষ্ণ
বসন্তের সময় কৃষ্ণ নাম ছিলেন [বসন্তের
অভিধান-বিজ্ঞান, পৃ: ১২৪, অক্ষয় বসন্ত, পৃ: ১০-
১৪, ৬৭-৮২] আর এই কৃষ্ণের দ্বারাও বা
দ্বারাও সনিত সম্বন্ধ ও নিম্নলিখিত ইহাও। পরবর্তী
কালে তিনি দ্বারাও ভীষণ হইলেন এবং তাঁহার
বংশের দেবতা, যোহিনী, বসন্ত ও জলকুমার
পূর্বেও তাঁহার আশ্রয় হইলেন। দেখা যায়ও, কৃষ্ণ
বসন্তের সময় কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইল।

এই সম্বন্ধে কথারীত জাতকের তাৎপার্য
নির্দেশ করিয়া কৃষ্ণকে গোত্রনাম বলিয়াছেন।
সুতরাং দেখা যায়ও, যে, কার্ণাট গোত্র
ব্রাহ্মণের অভিধানে কৃষ্ণের নাম। তাঁর পর
চাণ্যোপনিষদের দেবতা-পুত্র কৃষ্ণ এই নাম।
ইনি আশ্রিত যে গোত্র, তাঁর দ্বারা। যদি কৃষ্ণ
আশ্রিত হন, আর এইরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, তাহা
হইলে কৃষ্ণের নামেও তাঁর নাম যে, কৃষ্ণ যে
কৃষ্ণ, তৎসম্বন্ধেও প্রমাণ বা কিংবদন্তী প্রমাণের
সম্মত হইতে পারে। কৃষ্ণের উপনিষদের
সম্মত পণ্ডিত চর্চিয়াছেন—সেই সময়ে কার্ণাট নামে
গোত্রও ব্রাহ্মণ্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণসম্বন্ধে লইয়া
কার্ণাট—এই সময়ে কৃষ্ণের নামে তিনি আশ্রিত
কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণ গোত্রের স্থাপনিত বা প্রবর্তা।
যখন বাস্তবিক পরমপুত্র পদার্থ হইয়া উঠিলেন,
তখন হইতেই এই কিংবদন্তী যে কৃষ্ণের সনিত
বাস্তবিকের অভিধানে স্থাপন করিয়াছে। কৃষ্ণ ও
বাস্তবিক যখন অভিধানে ইহাও পেল, তখন পূর্ব ও
বাস্তবিকের দ্বারাও দ্বারাও কৃষ্ণের নামেও

হইয়া পেল। তাঁরও কৃষ্ণেরই দ্বারাও কৃষ্ণ
নামের কারণ কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন।
কার্ণাট গোত্র যে কেবল বসন্তেরই নামের
ব্রাহ্মণ গোত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা নয়,
সম্ভাবনায় ২০০ অধিক ইহা পার্শ্ববর্তী নামের
বৃত্ত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি
কার্ণাট গোত্র ব্রাহ্মণ গোত্রই হইল, তাহা হইলে
কৃষ্ণেরই দ্বারাও কৃষ্ণেরই নাম? আশাও
হইতে পারে (১২-১৪) যে কৃষ্ণের নামেও
গোত্র কৃষ্ণের নামেও কৃষ্ণের নামেও

তবে তাঁরও কৃষ্ণের নামেও একটি নতুন
আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, কৃষ্ণের নামেও
এবং তৎ পূর্বপুরুষের নামেও তাঁরও
নামেও পণ্ডিত দ্বারা (৫৫০) নামেও
জাতক) কৃষ্ণেরও পূর্বপুরুষের নামেও
পূর্বেও, জৈনগোত্রের নামেও নামেও
দ্বারাও। ঘটনাতক একটি উপাধানে
উপাধানেও পণ্ডিত দ্বারা যে, কৃষ্ণের একটি
তিনিই ছিলেন, তাঁর নাম দেবগোত্র। সম্ভবতঃ
কেন, নিম্নলিখিত দেবগোত্র নামের এই ব্রাহ্মণ
দ্বারাও। ইহাও দ্বারাও নামেও উপাধানে। বসন্ত
দেব কৃষ্ণের উপাধানেও পণ্ডিত হইলেন, তাহা ইহা
পেল না। বাহাও হইল, ইহাও হইল পূর্বেও
বাস্তবিক ও বসন্তের। এইই পূর্বেও অসম্ভব
ও তাঁর পত্নী সম্ভোগার নামেও পণ্ডিত দ্বারাও
হইল। সম্ভোগা দেবগোত্রের নামেও ছিলেন। সম্ভোগা
দ্বারাও নিম্নলিখিত সম্ভোগের নামেও। অসম্ভব
দ্বারাও পণ্ডিতের নামেও নিম্নলিখিত—অসম্ভব ও কৃষ্ণ
দ্বারাও পণ্ডিতের নামেও নিম্নলিখিত পূর্ব জাতকে
বৃত্ত। বাহাও পণ্ডিত দ্বারাও, সম্ভোগের নামেও
নাম পাইলেন। বাহাও হইল, এই জাতকের
কাহাণীতে বাস্তবিকের নামেও দ্বারাও
কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ। ইহাও তৎসম্বন্ধেও পণ্ডিত
পূর্বেও দ্বারাও। তিনি বলেন—এবং কৃষ্ণের

বাহুবল্যেব জীবার গোজানবে কত্রিত্তি হইবে।
 কাটন, বাহুবল্যেব কণ্ঠের গোজানবে হইবে। অর্থাৎ
 এ বিশেষ বাহুবল্যেবই ক্রকের প্রকৃত নাম। তাহা
 পোতলায় কার্কাচন ঘোড়ের বলিয়া তিনি কক।
 মহাপ্রভু প্রভাকের তাহার এই কণার প্রকৃত
 বৈধিত্য পাওয়া যায়। এখানে বাহুবল্যেব
 কণ্ঠের পতীর নাম বহুবল্যেব বলিয়া। আর
 বাহুবল্যেব কণ্ঠ কণ্ঠের গোজান। বাহুবল্যেব
 কনসন অর্থে তিনি বাহুবল্যেবই ক্রকত নাম বলিয়া
 কণ্ঠের গোজান বহিরাগত। অন্য পূর্বে
 বাহি পাণিনির উল্লিখিত কার্কাচন ঘোড়ের কণ্ঠ
 বা পুত্রেয়িতের গোত্রই ইহা থাক। কত্রি-
 বিধের এইজন্য কবি পুরুপুরুবদন মানস,
 নাহি ঐশ না পৌত্রবদ হইবেন। ইহা নিধের
 নাম এক কত্রি বান হইবে। কত্রি ক্রকের
 পার্শ্ব্য স্থিত করিয়া দেবন, তবে ক ক্রকের
 গোত্র ও পুরুপুরুবদনের নামের দ্বারা এজন্য
 ক্রকের উল্লেখ করিত হইয়া থাকে। বহি ক্রকের
 গোত্র নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে
 বলা হইতে পারে যে, বাহুবল্যেব কার্কাচন ঘোড়ের
 ক্রকের হইলেন। বহিও এটা ক্রকের ও পার্শ্ব্য
 গোত্র। ক্রক ক্রকের ক্রক নামের এই প্রমাণ-
 ক্রক প্রমাণযোগ্য বহিও সেই ক্রকের উল্লেখ করি-
 ল। এই ক্রক নামে বহুবল্যেব পরিচিত হইয়া
 এজন্য ক্রকের বিজ্ঞান ও অধ্যাপনা
 জীবারে ব্যাপ্যিত হইয়াছে। তাহাও ক্রকের
 মতে বহুবল্যেব ক্রকের বিজ্ঞান ও অধ্যাপনা
 করিয়াছে। ক্রকের নামের কারণ তাহাই হই
 পান্সে বাহুবল্যেবই ক্রক হইতে কত্রি বলিয়া ক্রি-
 ত হইয়াছেন। ক্রকের প্রমাণের পর ক্রকের নামের
 ক্রকের বৈধিত্য পাই। ক্রকের নামের ক্রক
 ক্রকের হইল। একথা ক্রকের ক্রকের
 উপায় নাই। অথচ ক্রকের ক্রকের নাম ইহা
 ক্রকের হইল। ক্রকের, ক্রকের নাম হইতে ক্রকের

ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে

ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে

ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে

ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে

ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে

ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে

ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে

ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে
 ক্রকের নামের ক্রকের নাম হইতে

এইরূপ বিদ্যুৎপূরণও তাঁহাকে হই এত দূরে
অংশবস্তুর বিলম্ব বিদ্রুত করিয়াছেন। তাঁহাকে
মৌকে 'আলেন' তৃতীয়ত পাঠ পাইয়া চীৎকার
আংশের সহিত অর্থ অজ্ঞান আলোচনার
সহিত অগ্রণ অর্থ করিয়াছেন। যাহা হউক,
মহাতারের কৃষ্ণ কিছু বড়ই জটিল। মহাতারের
দান্য হানে কৃষ্ণ নানাতাবে চিত্রিত হইয়াছেন।
উপবন্যতার দার্শনিক আলো কৃষ্ণকে বিদ্যুৎ
অংশের দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু
মহাতারের অজ্ঞান হানে কোথাও বা তাঁহার
উপবন্যকে নানীকৃত করা হইয়াছে, কোথাও বা
উপবন্য সন্ধি বা একবারে অস্বীকৃত হইয়াছে।
অধিকাংশ দূরে কৃষ্ণকে দেখা প্রকৃতিরূপে ধরা
করা হইয়াছে—উপবন্য যেন তাঁহাকে আলো
আলোচিত হয় নাই। এই অর্থে Wilson,
Lassen, Schroeder, প্রকৃতি ইন্দ্রপৌর
পঙ্কিতগণ যেন করেন, দুইবিধ প্রকৃতি কৃষ্ণকে
তিনি দর্শন্য মানুষের ভূমিকাই অভিনয় করিয়াছেন
—কোথাও বেকতারের পরিচয় যেন নাই। তাঁহার
যলেন, বহু সারথ্যে বা পক্ষ-বিন্যাসে—তাঁহার
আলৌকিক শক্তির পরিচয় কোথাও নাই।

মহাতারের বহু হানেই দেখিতে পাওয়া যায়
যে, কৃষ্ণ মহাবেবকে পূর্ণাঙ্গীনা করিয়া তাঁহার
লজ্জা বিধান করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে
বিবাহ বর লাভ করিতেছেন। মহাবেবের নিকট
হইতে বহু অস্ত্রও প্রাপ্ত হইতেছেন।

অনেক দূরেই কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণ এক বল
হইয়াছে। কাহারও কাহারও অজ্ঞান, যেন
ঋষি কৃষ্ণের ঋষির স্মৃতি—মহাতারের স্মৃতি
পূর্ণ হয় নাই। বারং, মহাতারের কৃষ্ণ ঋষি
নারায়ণরূপেও পঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে,
লজ্জা বহুঃ আলোচন এই স্মৃতি হইতেই মহাতারের
এই বিবাহের দৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ঋষি
নারায়ণ বলিলেও কোথাও তিনি মহাতারের,

নারায়ণ নাক্ষত্ররূপে অস্তিত্ব হয় নাই। যখন তিনি
ঋষি নারায়ণ, তখন তিনি স্মৃতির পর দ্বন্দ্ব বহিরা
ভাবিত থাকিয়া অস্তিত্বের পর পরিচয় বিচারে ন।
যখন তিনি পাণ্ডবের দল ছিলেন, তখন তিনি
যাক্ষিককে অস্তিত্ব করিয়া পিতৃপালকে বহু
করিয়াছিলেন। মহাতারের দেখিতে পাওয়া যায়
যে, পিতৃপাল, দুর্যোজন, অর্থ ও পলা কৃষ্ণের
শ্রেষ্ঠ বীর্য করে নাই। কিন্তু অগ্নি কৃষ্ণের
নারায়ণ মৌর্যের কোনরূপে দূর করে নাই।

মহাতারের নারায়ণের দ্বারা বাস্তব-কৃষ্ণের
কথা আছে, কিন্তু, পোপাল কৃষ্ণের কথা কিছুই
নাই। তেবল এই মাত্র নির্ণিত আছে যে, কং-
নিম্নবনের কৃষ্ণ অর্থের ইয়াছিলেন। মৌর্যের
তাঁহার কৃষ্ণ বাস্তবীকৃত করা কিছুই নাই। কিন্তু
আলোচনার বিষয় এই যে, ইতিহাস (মৌর্য ৪৮৭৮—
৪৮৭৮), বাহুপূরণ (২৭ অং—১০০১২২ মৌর্য),
ও তাঁহার পূরণে (২৭) নির্ণিত আছে যে, কৃষ্ণ
মৌর্যের যে দল অস্ত্র আলোচনা, তাঁহাদের
বহুরূপ এ.এ. কং আলোচন অর্থ অর্থের ইয়া-
ছিলেন।

মহাতারের সত্যবর্ষ (৪ অং) পিতৃপাল
কৃষ্ণের প্রভাবের কথা বলিতে বলিতে পূর্ণাবি-
বহুর কথা বহিরাহীন। কিন্তু তাঁহা যখন কৃষ্ণের
প্রণালীর কথা বহিরাহীন (৪ অং), তখন একবারও
পূর্ণাবি বহুর কথা বলেন নাই।

পূর্ণ আলোচনার তাঁহারকারের ইয়াই নৃতন
আলোচনার পরিচয় বিচার। তিনি 'পৌর্য' নামের
হেতু নির্ণয় করিয়া কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা
করিয়াছেন। আলোচনা লেখকের দ্বারা
নির্ধারিত করিয়া দিতেছি।

উপবন্যতার ও মহাতারের অজ্ঞান আলোচনা
"পৌর্য" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এটা পূ-
প্রাচীন নাম। পৌর্যের ৩১২০০ পূর্বের বার্ষিক,
যাহা ইয়া নির্ণায়িত হয়। যদি কৃষ্ণের পৌর্য-

বিশেষ সজ্জিত লক্ষ্মী খাতার কল্প তাঁহার গোবিন্দ নাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গোবিন্দ নামের ব্যুৎপত্তিসত্তা সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাকবিভক্তের আশির্গর্ভে নিবিষ্ট আছে যে, কৃষ্ণ বস্ত্র আকারে জল আন্দোলন করিয়া জলে পৃথিবী উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ হইয়াছে (অঃ ২১-২২)। আবার শাস্তি-পুর্কে দেখা যায় (৩৪২ অঃ ৭০)—বাহুবল বলিতেছেন—যেবঙ্গ আমাকে গোবিন্দ বলে, যেহেতু আমি পুর্কে নষ্ট পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিয়াছিলাম এবং ভরাঙ্গী হিলায়। এই ব্যাপারও গোবিন্দ নামের কারণ হইতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ ‘গোবিন্দ’ বাগ্য ভাবে গোপবৃদ্ধ উজ্জ্বলকর্তা-রূপে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, পরে বাহুবল-কৃষ্ণ দেখাবিধে বলিয়া পুজিত হইলে তিনি ‘গোবিন্দ’ নামে প্রাপ্ত হ’ল। তেলিনিসবন ইন্দ্রের অপর ৫৬টী নাম ছিল—ইহাও পরে বাহুবল-কৃষ্ণের উপর আসিয়া পড়ে।

কবি ভাস চাঁপকায় প্রায় সমকালবর্তী। শ্রীকৃষ্ণ কাশীপ্রদান অবসোযোগ, শ্রীকৃষ্ণ সারস্বতজন হার প্রকৃতি পঙ্কিমঙ্গল বর্ণন ভাষা প্রদানিত হইয়াছে। ইহার হৃদে নাটকে শ্রীকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, নন্দ, যাদবগণ প্রকৃতির উল্লেখ আছে। ভাসও গোপাল-কৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন। ভাসের কাব্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, গোপাল কৃষ্ণ হুঃ পুঃ পঙ্কম পতা-কীর্তন পুণ্ডিত হইতেন। ইহার পর পদ্মজলির মগ-দায়া বাহুবল কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। পাদি-নিয়ম ১৩২৬ সূত্রের কাব্যায়ন বার্ষিক করিয়াছেন, আখ্যান্যং কংসদঘাটী কৃষ্ণপ্রকৃতিপ্রোথ্যাপত্যঃ প্রকৃতং কংসকৃৎ। ইহাইই মহাভাষ্য করিয়া পদ্মজলি বর্ণিয়াছেন—

“জয়বির বর্জমানকগতা বৃদ্ধা তাম্রমুণ্ডিতাঃ
প্রতিবোঃ সারিকৃত্যং পুণ্ডোহুসবনং সত্যাব্যতে
হুঃকংসকর্তা। ইত্যন্ত হি ভগ্ন্যদিত্য উচ্যেতি।

ইহা হুঃ কংস বর্জমানকগতা কংসঃ বর্তমানি বসিঃ
বহুভূতীতি চিত্তেতৎ কংসে চিত্তেতৎ ৫ বসো।
অত্রাপি বৃদ্ধা ভবন্। যে ভাববঃ সৌত্রিকা
নাইবতঃ প্রত্যকঃ কংসঃ বাগ্ধতি প্রোগাৎ ৫ বসিঃ
বহুভূতীতি। চিত্তেতৎ ভবন্। চিত্তেতৎ সৌত্রিকা
নিপতিতাক্ত প্রোগা বৃত্তঃ কংসদ্য ৫ কৃষ্ণা ৫।
প্রতিবোঃ কংসঃ বহু পঙ্কগ্রনবাত্মঃ লক্ষ্যতে।
ভেপি বি তেভ্যাম্ উৎপত্তি প্রকৃত্যাবিনাশাদুদ্ভীর্ণা-
চকংগাঃ সঠো বৃদ্ধিবিশ্বান্ প্রকাশ্যতি। আশ্রয়
সত্যঃ। স্যানিভা বৃত্তঃ। কেচিৎ কংসতত্তা
ভবতি কেচিন্ বাহুবলবৎকংসঃ। বর্ণনামঃ অশ্বপি
পুণ্ডিত। কেচিৎকংসহুঃভবতি কেচিৎ রক্তহুঃ।
বৈরাগ্যঃ অশ্বপি গোকে লক্ষ্যতে। পঙ্ক হনাত্তে
কংসঃ। পঙ্ক স্যানিভাতে কংসঃ। কিং পতেঃ
হন্তঃ কংস ইতি।

মহাভাষ্যে এই উক্তি হইতে চারিটী বিষয়
প্রদানিত হইতেছে।

১। কংসের দুঃখের কথা এবং বসির বহুভাঃ
কথা পঙ্কজলির সময়ে জনগণের লক্ষ্যেই আনিত।
ইহাদের কাহিনী পঙ্কজলির সময়ে প্রদানিত ছিল।

২। এই আখ্যায়িকায় কৃষ্ণ বা বাহুবলকে
কংসদঘাটকারী বলিয়া উক্ত আছে।

৩। গোপালিক ঘটনা অবলম্বনে যেমন অভিনয়
হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সমস্ত আখ্যায়িকা লইয়া
নাটকভিনয় হইত।

৪। কৃষ্ণের হস্তে কংসের মৃত্যু পঙ্কজলির
সময়ে মগপ্রাচীর ঘটনা বলিয়া বিবিত ছিল।

৫। ১১১ সূত্রের মহাভাষ্যে একটি প্রকৃত্যাব্যয়ন
প্রদত্ত হইয়াছে—“এখান কংসঃ কিল বাহুবলঃ”
পূর্বসূত্রের অস্মরতি হইতে বুঝা যায় যে, এই ঘটনা
পঙ্কজলির সময়ে সাধারণে জানিত, ইহা অতি
প্রাচীন। বস্তুর সময়ে কংসও এ ঘটনা ঘটি নাই।

৬। ১৩৬ সূত্রের ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়
যে, মাতুল কংসের সহিত কৃষ্ণের পটাব ছিল না।

“অগাধবীভূতঃ কংসঃ।”

হায়াবক পুত্রভাষ্যে বলিতেছে, সত্বর্ণের সাধাৰ্য্যে
কৃষ্ণের বল তুচ্ছ পাঠ্যে ব্যাকৃত।—“সত্বর্ণমিতিয়স্য
বলং কৃষ্ণাৎ বর্জ্যতাম্।” ইত্যং বইতে বুঝা যায় যে,
সত্বর্ণ গুণের নিকট সত্বর্ণ ছিল।

অত্বে যে কৃষ্ণ আধ্যাতিকায় এতজন বিশিষ্ট
সারক চিত্রেন, তাহার—(৪, ৩৫৪) অত্বেবর্ণা,
অত্বেবর্ণা, বাত্বেবর্ণা, বাত্বেবর্ণা—
বইতে বেশ বোঝা যায়।

৪৩৫৮ পুত্রভাষ্যে পতন্তি বোঝাইছেন
যে, বাত্বেবর্ণা যে অত্বেবর্ণা চিত্রেন, তা নয়; তিনি
বেদকায়ণে পুণ্ডিত বইতেন। পুত্রভাষ্যে বোঝ

বিশেষ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে কৃষ্ণ কথ্য
আছে। সেই কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ কথ্য বাত্বেবর্ণা কৃষ্ণ।
এই গ্রন্থখানি যে পুত্র ভাষ্যের পুণ্ডিত গ্রন্থ, তাৎপৰ্য্যে
কোনই সন্দেহ নাই। পলিওগ্রাফের ১১ অং
কৃষ্ণ কথ্য আছে। পুণ্ডিতগণের পুত্র ১৪
পতন্তিও ১৫। ইত্যং কৃষ্ণের নাম আছে। ০

০ এটি একটি সংগ্রহ গ্রন্থ। কথ্যকী গ্রন্থ
বইতে উপস্থান সংগ্রহ করিয়া ইহা লিখিত। এ সংগ্রহ
আদি বহু উপস্থান সংগ্রহ করিয়া, স্থানভেদে পুত্রভাষ্যে
ইহাতে পরিবেশিত হইল না। তাহাতে ১০, ১১, ১২
করিবার ইচ্ছা হইল।—লেখক।

সার্থক চিত্র

(গাথা)

(ঐযাহিনী হস্তন পেন গুপ্ত, কাব্যভাষ্য)

পাথরে কাটিয়ে গড়িছে মূর্তি, মোহিত চিত্তবর,
নিপুণ শিল্পী বলিছে লবাই, প্রখ্যাতি হবে অর।
মনে ভাবে বুঝা, যেখানে যা আছে সেজন্যে মূর্ত্ত বহু,
বেশিঃ গড়িবে যেমনটী বরা অর্থ করিবে কত।
গড়িবে কে বাগানপলী গয়া, শিল্পী অগ্রঃ বুঝি,
উৎকলে চলে সাধুর বেঁচেতে অগতঃ পুরী।
ছতল বর্ণী কাম্বোজে চুটে, বেঁচেতে তথায় পোতা,
তাহার বৃত্ত গড়িয়া জুলিবে মানবের মনোযোগে।
পঁরছিল হবে, কাম্বোজে বুঝা, সেদিন ধনীর ঘরে,
হতেছে বিবাহ, খুঁজুংগায়ে, উৎসব উঠে তরে।
বিবাহ সতীর এককোণে বসি, মোহিত আকিছে হৃদি,
অন্তর কনের, পাথরে গড়িয়া প্রচুর লভি।
ঘরে কিরি বুঝা, পাথর কাটিয়ে প্রথমে গড়িল নয়,
বাৎসল্য মূল্যে চাছিল বেঁচেতে, তেমন উঠেই বহ।
“যেবার আহার বুঝিবে কবঃ” কাণ্ডা কাণ্ডা চিত্তে
কাম্বোজে পুণ্ডিত চলে বুঝা, হৃদির মূল্য নিতে।
এদিকে তথায় গেছে কতদিন সেই বরংগু লাখে,
সমুদ্র স্বপনে নিতি নয় জীবে, বেশিছে দিবস রাতে।

সে যমু বিলম্বে, বিধাতার পানে উঠিল নৃত্তি ধরে,
 মৌচ হ'ল মাথা বয়েত শিতাত, অকুণ্ঠীনা যমু ধরে।
 পুতে ভাঙ্কিয়া কহিল তনয়, যমু চিরদিন তরে,
 আশাহ পুত্রেতে পাবেনা পবিত্রে, পাঠাবে বাপের ঘরে।
 বিধাতের নিশে, দুঃখময় কত অজ্ঞের বিনিময়,
 নিশির দিক্কা, কোমল ম'লমী মনে ম'লমী রূপে।
 জনকের ঘাত বিরহী ঘেছে, লম্বা লইল শেখের
 সখ মেঘক, কয় যোগে তার মুখা ঘরিল কোণে।
 একদিন বালা প্রভাতে উঠিয়া শিরের ঘেঁষিল
 ক'ল কীকিয়া মনে গো প্রভু প্রেরিত দিবল হামো।
 বৃদ্ধ হুতলে বাঙ্কীম পত্নী যে পাশাপাশে পড়া,
 বেবতা তাহার ঘেঁষিল ঘরি আঁজকে বিবেকে ধর:
 পাশাপাশে পুত্রের একমনে, বালা, ছল চন্দন করে,
 ঘেঁষিতে ঘেঁষিতে নবীন যাহো, সৌন্দর্যের উঠে তরে।
 উই শেখ কথা কান্দাও ঘেঁষে, পতি তার ছুটে আসে,
 সার্বক পুত্র তক্তি দাঁড়ান, আপন বেবতা পাশে।
 প্রচুর অর্থ নিতে চাহে ঘনি, ঘোষিত চাহে না আর,
 শিল্প সাধনা, চরেছে লক্ষণ, পূর্ণ জীবন তার।

কবির গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

(পূর্ণ প্রকাশিতঃ পর)

(ভ্রাতৃচন্দ্র দত্ত এন্ড এ, বি এল)

বিবাহ-বিবাহ বিবাহ সামাজিক নাটক "পাতি
 কি নাতি"র পালনের যুগে কবির গিরিশচন্দ্র
 ঘোষ হুজু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "প্রাধাণ্য বাবু,
 বিবাহের কতক বিবাহ সংস্কার কবির যোগে
 তা—পাতি কি নাতি?" এ প্রশ্নের উত্তর লক্ষ
 সরল ভাবে তিনি দেন নাই। পুরাতনসময় গিরিশ-
 চন্দ্র বিবাহ-বিবাহের একটা সুকল ঘোষাইয়া এতৎক
 একটা সামাজিক সমস্যা সমাধান করিতে চান
 ঘোষিয়া, যবে নির্দোষ আশ্রয় উপস্থিত হয়।
 বিবাহের সমস্যা সমাধান করিয়া উচিত—বিবাহবান

পরিচয় করা কর্তব্য; কঠোর ত্র্যমণী অবলম্বন
 করিতে পারিলে, তাহাদের পক্ষে যে সকল সমস্যা
 এ কথা কেবলই অসম্ভব করিবেন না। ইহার
 মত পাতের অনুবাদ-বাক্য উদ্ধার করিতে হইবে
 না—পাতের ঘোষাই বিবাহ এ সকল কথার উত্তর
 করার আবশ্যকতা নাই। আলোচ্য বিবাহ-
 বিবাহের বিবাহ সেওয়া উচিত কি না? উহা পাতি
 কি নাতি? ত্র্যমণীর বিবাহের আদর্শ যে সমাজ
 তাহা নৃত্তি আর ব্যাধি কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে
 হইবে না; কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে

য, বাল-বিবাহ রমণীজন-মূলত অস্বীকৃত আছে ;
 পারিপার্শ্বিক আত্মীয়গণকে তোষণের রত বেশিমা
 দ্বয়ের তাহার যে চাকলা, উত্তীর্ণ পাতে না, একথা ও
 ত জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। অবশ্য
 সৎসম ও স্পষ্টকার দ্বারা ভাবনকে কতকটা নিরস্তিত
 করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু কোন যুক্তির বলে,
 কোন অনুশাসনের সমীচীনতার বলিতে পারা যায়
 যে, যদি বাল-বিবাহ ইঙ্গ্রিচরিতার্থ করিবার জর
 যাত্র হয়, তবে তাহার বিবাহ দেওয়া অস্বীকৃত ?
 আবার ইহাও ত দেখিতে পাওয়া যায় যাকালী
 জাতিটা দিন দিন বেঙ্গল প্রদেশের নিকট ক্ষুদ্র অঙ্গ-
 সম হইতেছে, তাহাতে যোগ হয় অস্বীকৃত ভাবেতে
 জাতিটার চিহ্ন, ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইয়া বাইবে।
 অবশ্য আমি বিশ্বাস করাই বলিতেছি। এ অবস্থায়
 কি জাতির কর্তব্য নয় তাহাতে এত বড় জাতিটা
 বাঁচিধা থাকে—অস্ত্রের প্রসার সাহায্যে যুদ্ধি পায়।
 ইচ্ছা করিয়া বাল-বিবাহের উৎসাহিকা শক্তি হরণ
 করিবার প্রয়াসী হওয়া কোন মতেই উচিত নয়।
 অবশ্য আমার বক্তব্য এই যে, যে বাল-বিবাহ সংস্কার
 থাকিয়া সংসারে চলিতে চান, তাহার বিবাহ দেওয়া
 উচিত নয়—যিনি পতি দেখেতার ধ্যানে রত থাকিয়া
 যৌবন জীব সংসারে থাকিতে চান তিনি আনাধের
 মত্কা। আনাধের স্বর্গকণ্ড ও সংসারটাকে এইরূপ
 বিবাহের এখনও বাস্তবিক মত মত্কে ধারণ করিয়া
 রাখিয়াছেন। কিন্তু যে বিবাহের দ্বয়ে চাকলা
 দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিবাহ দেওয়া সর্বতো-
 ভাবে কর্তব্য। বিবাহের বিবাহ না দিবার ফলে
 অনেক ফলে যে ক্ষণ-হতা হই, তাহার বিবাহ
 অনেকই জর বিত্তর আনেন। সর্গস্ব-জীবনের এই
 সকল কঠোর চিকিৎসা হওয়া কি বাস্তবিক নয় ?
 অবশ্য একথা আমি বলি না যে, বিবাহ হইলেই
 তাহার চরিত্র নষ্ট হইবে, আর সম্বন্ধ থাকিলে তাহার
 পরশুকাহ্নিক হইতে পারে না। তবে বাল-
 বিবাহের চরিত্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক একথা

অস্বীকার করিবার উপায় নাই, আর প্রাক্তর
 সম্ভারও পরশুকাহ্নিকের সম্ভাবনা নয়। ইঙ্গ্রিচর
 জীব প্রথম রিপু আর নাই বলিলে অস্বীকার হয় না।
 এই মনোস্তম্ব ইঙ্গ্রিচর চরিত্র হইয়া নানান
 স্থানে সম্বন্ধ করিয়া থাকে। জু পুণ্ডরিক বিগা-
 লাগ করিলে যদি ইঙ্গ্রিচর সম্বন্ধ করা হইত, তাহা
 হইলে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের তিত্ত মত্কাই
 বিতেজি চরিত্রবান্ দেখিতে পাইতাম; কিন্তু
 তাহাদের মিত্তরও চরিত্র-অন্য নৈর চুড়িত ত বিগম
 নয়। থাক্ সে কথা। বিবাহ-বিবাহের কীর
 যে সর্বত্র অস্বীকৃত তাহাও ত বলিতে পারা যায়
 না। অবশ্য কল বেশিমা কামোব বিবাহ করা
 সমীচীন নয়। তথাপি কথটা তুলিলাম এইরূপ
 যে গিরিশচন্দ্র একটা চরিত্র চিত্রণ করিয়া—একটা
 বিবাহ-বিবাহেরে সূক্ষণ দেখাইয়া, ও অপর একটা
 বিবাহের চরিত্র অন্তর চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতে
 চান—আনাধের কবিরের ব্যবস্থা থাকিবে ? বিশ্ব
 কবির অনেক—তাহাদের মত ও বিতন্ত্র। তাহাদের
 কোন মতটা যে প্রবর্ত্ত, আর কোনটা স্বর্গীয়
 তাহাও কে বলিয়া নিবেন। স্পন্দনের সকল ব্যবস্থা
 সর্বত্র সমান ভাবে প্রযুক্ত হয় না। তবে মাত্রই কোন
 পথে চলিবে। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সামাজিক
 বিবিধাবস্থাও যে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত এ
 কথাও কে অস্বীকার করিবে ? আর বাল-বিবাহ-
 বিবাহ যে শাস্ত্রমত তাহা সুকোপার বিদ্যাসাগর
 মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন। এ প্রমাণ আচার ও
 সমাজ-মত এখনও হয় নাই তাহা স্বীকার্য, কিন্তু
 যে কয়েকটা বিবাহ হইয়াছে তাহা হইতে যে সূক্ষণ
 কলিহাছে তাহাও ত বলিতে পারা যায় না। ব্রাহ্ম-
 সমাজের তিত্তর বিবাহ-বিবাহের প্রকল আচার
 অনেক ফলে প্রচলিত করিয়াছি। সুখ বা শান্তি
 মানসিক অর্থ। নানা কারণে মানসিক অবস্থার
 বিপর্যয় ঘটে। সেই কারণেই অস্বীকৃত হইয়া চিত্তা
 না করিলে—তল করিয়া পরীক্ষাও না না করিলে

ব্রহ্মচারিণী থাকিবে না। একি একটা কথার মত কথা। সমাজে পরপুত্রবধূরা হয়নী যে নাই তাহা বলিতে পারি না—বেঙ্গের নারীমণ্ডলে তদাভিনিমিত্ত রূপকৌশলীও অনেক আছে, তাই বলিয়া কি ব্রহ্মচারিণী নাই। সঙ্গল বাণবিধবাই যে বিবাহ করিবে এমন কথাও নাই। তবে ব্রহ্মচারিণী থাকিবে না কেন? উক্ত আনন্দের অনুভব কর। সন্তানের সঙ্গে সন্তান সাধা বাগ্মীর মত? ব্রহ্মচারিণীর মধ্যে হ্রাস শাইবে বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি না। ধার্ম্য ব্রহ্মচারিণী হইয়া জীবন বাপন করিতে চান, কেহই তাঁহাঙ্গিকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন না। হিন্দু সমাজের গঠন থাকিবে না একখাটাও দিক আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। সু-বর্ণাশ্রমসারে বাল্য কালে সমাজের গঠন পরিবর্তিত হইয়াছে ও হইবে। হিন্দু সমাজে বিচিত্র মতের সমন্বয় যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন আর আর কোন সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিচিত্র বর্ণাশ্রমবর্গ লোকদিগের আচার-ব্যবহারকে গ্রহণ করিয়া উন্নয়ন দেখাইতে, হিন্দু সমাজ ভিন্ন কোন সমাজ আর পারিরাছে? বাহিরের খাতি-প্রতিখাতি মধ্য করিয়া সমাজ যখন ভাঙিয়া চূর্ণবায় হইয়াছে—হিন্দু সমাজ যখন একদিন ধরিয়া বর্তমান আছে, তখন কি বাণ-বিধবার বিবাহ হইলেই সমাজটা ধূব হইয়া পাইবে? কথাটা কল্পনার ও আমরা ধারণা করিতে পারি না।

একদিনের দিন লক্ষ্য-বিধবা প্রত্যেকে তাহার মাতা এক কোঠা গল দিলেন না দেখিয়া, প্রমত্ত বাণ ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তাই নির্মলার কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—‘তুমি তোমার শাকড়ীর মত নির্ভূষ। চকের উপর ঘেঁষে ঘেঁষে অবস্থা দেখে। যদি টাক্ষা সেগে মরে তোমাদের বর্ণ, এক কোঠা গল দিতে নিবেধ, একি তোমার শাকড়ীর শাকড়ের?’

বেশ তোমাদের বর্ণ তোমরা নিয়ে থাক, এ প্রত্যেক মধ্য আমি যোক চোক দেখেই পাওয়া না।’

তাৎপর্য কৃত-প্রতিজ্ঞ প্রমত্ত বাণ চরিত্রহীন মত খেঁচা দিতে কণা প্রবাহার বিবাহ দিলেন। ইচ্ছা ছিল তাৎপর্যকে বিলাত হইতে লেখা পড়া শিখাইয়া দান করিবেন।

তাৎপর্য ইচ্ছা কলহভী হইয়া নাই। বিলাত-কেন্দ্রী খেঁচা হতে প্রবলা নির্ধাঙ্গিত হইল। সমাজের ঘোড়াই দিয়া পড়াকে মত খাইতে ও পরপুত্রবধূর কাছে যে বলিতে বলিল। এ সঙ্গল কারো অন্তর্য্য প্রবলা কিছুতেই চাকী চাইতে না; মর্দনই তাগকে ‘ভজন’ বলিয়া দেখি দিক্ত করিত। ‘আত্ম’বিশ্ব অত্যাচার। তাৎপর্য উপর চপ্পতে লাগিল। খেঁচা খিলাসে, ইহন তোমারিয়ার ভিন্ন প্রবাহার পুনো দ্বিগি দিক্ত করিতে হইল—শিক্তবৃহ হইতে আলোচ অর্ধ সন্ধ্যায় তাগকে দিতে হইল; কিন্তু যে একবার বিশাল-প্রোভে বা তাগান দেয় অত্যা-অভিযোগের দিকে, তখন তাহার আর চুই পড়ে না। সেবে প্রজ্ঞা খেঁচা পড়ার নিকট প্রস্তাব করিল, হই শিখার নিকট হইতে অর্ধ লইয়া আইল, না হই বহু বাহুর সহিত মুখা করিয়া, পরো বিজ্ঞ করিয়া অর্ধ লইয়া আইল। অর্ধ তাহার চাই। যে কোন উপায়ে অর্ধ আনিত হইবে। সেবেই প্রস্তাব তুলিয়া প্রবলা শিখার উত্তর। অনেক অনুমত বিনয় করিয়া বর্ণপত্রী কর্তব্য তাগকে বুঝাইবার চোঁ করিল, ‘কিন্তু চোঁ না গেলে বর্ণের কাছিনো’, অসত্য অর্ধের বহু শিক্তবৃহ তাগকে বাইতে হইল, দুর্জিনোচ মাঝতাকে শিখা বিহার মত তাহার শিখা অর্ধ সাধা করিতে চাইলেন না। রিক্তহস্তে গৃহে করিতে আনিত দেখিয়া খেঁচা তাগকে বাগান বাড়ীতে বাইতে বলিল। প্রবলা যখন সে কার কর্পাস করিল না, তখন খেজাঘাতে মর্দিত করিয়া খেঁচা তাগকে গৃহে বাইতে বহিষ্ঠত করিয়া দিল। তাহার একটা নীলা আছে। বসই নীলা অতি তবুই

যাওয়ার নিম্নোক্তের অজ্ঞান, গুণা সৌন্দর্য ইটল বলে
 জীবন সন্ধান করিবার জন্য প্রেমধা কৃতসঙ্কল্প হইয়া
 চলিতে লাগিল। পথে মিলনের মধ্যে তাহাকে
 পড়িতে হইয়াছিল এবং বর্ষান্ত্র জুড়া। রহস্যময় কৃষ্ণার
 উদ্ভাস লাভ করিয়া তাহাইই অজ্ঞানের দীপ্ত হই।
 তাহাইই নিখট হইতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া
 নুতন জীবন প্রেমধা পাইয়াছিল। সে সুখিয়ারছিল
 তৎকালেই সংসারে মরিচ-নিষাধের সৌন্দর্য জীবন
 উদ্ভাস করাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। হৃদয় ও
 পাশ-প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যের কারণে সে সমস্ত
 বিধা ত্যাগ করিতে লাগিল। আশাও জীবনে
 দাঁড়িও আশাও ফেরিতে পাইল।

এঁরকে নানাতর দানসিক ইংরাজী ও সাধা-
 যিক পীড়নে ও খেঁচীর ও কুশলবোধিনীর বাৎসরে
 নির্মল চিত্র ডাবপ্রবণ প্রায় কুমারের মস্তক শিক্ত
 হইতে গেল।

একদিন পানল রথন প্রেরণ বাবুকে বরন বেথা-
ইয়া গুহার বৈবাহিক প্রাধাণল বাবুকে বলিয়াছিল,
“আপনি প্রেরণ বাবুকে বাকী নিয়ে যান” শুধন তিনি
কারণ বিজ্ঞাস ক ইয়াছিলেন? উত্তরে পানল
বুঝিয়াছিল, “বশাধ, সংসারে এলে ছুধ ভাংবে কো
সকলেই হয়।” উত্তরে আবার তিনি সোৎসাহে
বলিয়া উঠিলেন,—এহে হর? হেলে মেয়ে
ভামাই হয়ে,—এক মেয়ে কলকিনি, এক মেয়ে
তিথারীরা তাহালে ভিকারিনী—কোভারীরা আহালতে
সাকী হ’য়ে দীকার—জবিতল হ’য়ে প্রীর
দুতা,—সাকার হাতদালি নিয়ে হোলো গায়ে ধূপ
মেহ,—বারী পমেরন ক’য়েছে তাহা পত অলেকা
যেহ জ্ঞান করে,—সহাপ্রকৃতির চলে নত ছুয়ে
পুনঃ পুনঃ আখাত করে,—হাপিতের প্রতি বিষম
একাল ক’রে আলনায়েক হার্ষিক বলে পরিচর
মের,—হাতে হাতকড়ি,—বিল পুস্তবুতে বর্জরে
টেনে আনে,—যুনে অলবাদ মেহ,—এক ভীয়ে
কি এত হয়? উত্তরে পানল তাহাকে বলিয়াছিল—

‘চট্টা! কখন অশ্রু জড়ায় নাত হা। আবার
 ধরতে, হৃদয়নির হয়েচে, আপনায় ও হবে।
 তুমিবারের চরণে আশ্রয়-পদ্যে কখন। তিনি
 শান্তিযাত্রা অজ্ঞান শান্তি বিধেয়। জ্ঞানপথ কখন
 তুলি কিন্তু এসে প্রবৃত্তি জড়ায় আশ্রয় করিল না।
 তিনি বিহীন হইয়া বলিলেন, আশ্রয় হাও হাও।
 তখন অনন্তোপায় হইয়া তাহার ঐক্যবাহিককে
 পাশে বলিলেন,—‘বহাণর ওর তার যুক্তিতে পাছ
 না, আপনি সত্যক থাকবেন।’ শব্দ অতঃপর
 সত্যকর বিবাহিত হইয়া উভয়। জ্ঞানাতা যেন—
 যাহাযে উদ্ভাষন ব্যতির ককে অতঃপর জ্ঞানবাহিনীকে
 হরমণি যখন বুঝাইতে চট্টা করিতেছিল, সত্য
 চরণের কারণ প্রকাশিত লাভ। দিব্য—তাহাকে
 জেল খাটাইবার দক্ষর মনের যথা যথা কোন যতেই
 উচিত নয়, কারণ লাভা যোগ্য কর্তা। তখন,
 যাহা নয়। তারপর হরমণি বলিল,—‘পরে
 আমিই করা নয় না—আপনার আমিই করা।
 তুমিবারের এখন নিহত নয় হা,—যে পরের হিংসা
 করা। যে যন থেকে পারহিংসা ছাড়ে,—সমস্ত তার
 ক্ষয় থাকে না, হিংস্রক জন্মও তার হিংসা করে না,
 জ্বর স্পর্শ থাকে ধ্বংস করে না। তুমি যন থেকে
 হিংসা হবে হেতে নিয়ে তুমিবারের মঙ্গলর রাজ্যে
 কামরনোবাকে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে, তাতে
 হা, আপনায় মঙ্গল হ’বে, তুমিবারের উপায় মঙ্গল
 নষ্ট হ’বে যেহ যন নির্ণয় হ’বে, তার নির্ণয় চরণ
 রহন পায়ে। পান পোনে হা,—

গীত ।

ଅମଳକ ଓ ଅମଳାସ ଉଦ୍ଧାର ।

ସାଧା ତାହା ଦିଲେ ଯାଏ ସାଧା ଶୀତ ।

যাওয়া পেয়েছে গ্রামে, গ্রামে ব'লে গ্রামনাথ জানে

চাঁদ্রে ব্যক্তিগত জীবন বহন গানে :

যেহে বিদ্যে কি নিবে জালা,

ଆଜିରୁ ଆମା ବୁଦ୍ଧିର ଚାନ୍ଦି ୨

निद्रावशेष सुप्तः कथम्, उग्रीदेव एवैव भवति.

কোমল কমল স্তম্ভিমে দাও,

তার লুণা হবে না খারব'

দীপ্ত শেষে ভবনি চন্ডিকা ফেল। প্রকাশের
এটি বিবরণেই কিছুতেই তিন ভুবনমোহিনী মন
হইতে "হুয়" করিতে পারিতেছিল না। বানীর
বক্তৃতি মন হইয়া সেই তাহাকে বিশেষে অনি-
য়াক্ষেপে। অসুস্থতায় যখন গর্ভের সজ্জা হয়, তখন
সে তাহাকে কত ভজনবিনয় করিয়াছে; বিবাহ
কালে কত বসে সে মুক্ত হইতে পারে—
"ভবন মোহন ত হস্ত সজ্জা বাহার পদে অব্যাহত
ভায়ে খিনাইয়া নিয়া সে সিংহ হইতাকে, সেই
প্রকাশ্যে তাহাকে বিবাহ করিয়া কি সমাজে
নিকট তাহার উন্নত মর্যাদা, আবার উন্নত করাইতে
পারিত না। তাহা হইলে কি তাহাকে সমাজের
নিকট উপহাস/শ্লথ হইতে হইত—না তাহার আপ-
নার গর্ভের সজ্জনকে পনের কাছে মন্থন করিতে
হইতে হইত। এইরূপ মানসিক অবস্থায় যখন
প্রকাশকে ভুবনলে শোকাইবার ইচ্ছা তাহার
হইতেছিল, সেই সময় সঙ্গালয়ের খটী হতে প্রসন্ন-
কুমার প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া ভুবন-
মোহিনী স্ববৎস উপস্থিত হইল। সে বলিল,
'বাবা, বাবা তোমার ঘেমে আবার তব হচ্ছে!'।
প্রসন্ন। তব তো হবেই,—তোমার ঘম যে আমি।
ভুবন। বাবা—বাবা,—আমার মেয়ে না!

প্রসন্ন। কলকিনী, এখনো তোর ষাঁটবার সাধ।
এখনো বৈঠে থেকে পৃথিবী কলকিত বহুবি।
এখনো বৈঠে থাকতে চাপ্ত তোর মনে অশ্রু-
ভাল হয় না? মনে করে যেন, তোর আচরণ
যেবে লিখেই প্রকাশ্যে বিবে বিবেদিত। তোর
আচরণেই প্রমাণ শুভাসের তড়িতা গ'য়েছে,
চতালের চাবুত খোর তাহার বেরিয়েছে, নিঃ-
শব্দ হয়ে তাহার পড়েছিল, তোর আচরণেই তোর
মাতৃব্যথা মনেছে তোর আচরণেই তোর বাপের
বাখার কলকিত যোঁতা, কলকিত বসিতে সজ্জা

ভ'রে গেছে, নীচ লোকে উপহাস করে, মেয়ে
পায়ে খুলা দেয়, হাততালি দে নেচে নেচে ছড়া
কাটা। তোর আচরণেই আম হাতকড়ি গ'য়েছে,
তোর আচরণেই আমার পবিত্র কুলবধূক চতালে
শ্লথ করেছে, শিশাচিনীতে টোনে এনেছে।—না
এ পৃথিবীতে তোর ও থাকি উচিত নয়, আমারও
থাকি উচিত নয়।

ভুবনমোহিনী মার্কণ্ডা চারিমে প্রসন্নকুমার
বলিলেন, 'সুতাই তোমার মার্কণ্ডা।' উত্তরে ভুবন
বলিল,—'বাবা—বাবা, যদি যেহে কেন্দ্রে, পাথের
দুলা মাত্র, একবার ভুবন বলে ডাকো, মরবার
মহর তেনে বাই যে ভূমি আমার মার্কণ্ডা করেছে',
তারপর প্রসন্নকুমার প্রসন্ন ভুবনমোহিনীকে পুনঃ
পুনঃ ছুরিকাঘাত করিয়া বলিল,—'গগনস্বয়ং
যদি বৈঠে থাকিস—পাঁচ,—আমি তোরে পাণ
ক'রেছি। তব বা—ভুবন বলে ডাকি গো,—
ভুবন—ভুবন—আমার ভুবন, বা আমার! না
তবুতে গেলি নি! চল, তোর সঙ্গে বাই! তুই
যেলে বাবু,—একলা বেতে পারবি নি!' এই
বলিয়া নিজ বক্ষে যেখনি ছুরিকাঘাত করিতে
হাইবে, অমনি প্রকাশ্যে আনিয়া ছুরিকা কাড়িয়া
লইয়া তাহার বুক ছুরিকাঘাত করিতে অশ্রু-
করিল। কিন্তু তাহার সে অশ্রুতোষ রক্তিত হইল না।
প্রসন্নকুমার তাহাকে বলিলেন, 'না ভূমি জীবিত
থাকো, তোমার কারোও কল মেখো। সুতাকে
শান্তি হয়, কতাকে শান্তি বিবাহ মজ্জ হওয়া
ক'রেছি। আশ্চর্য্যতা করবার চেষ্টা ক'রেছিলুম,
ভূমি ছোঁরা বেড়ে নিজে, কিন্তু আর ছোঁরা
প্রয়োজন নাই, আমি এই পাণবেহ বেতে অন্যতালে
বেরিয়ে বেতে পার্শ্ববাণ।' তারপর অশ্রুপাণনে
বর্জিত প্রকাশ্যে আপনার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ
করিয়া আশ্চর্য্যতা করিল। সুতর পূর্বে সে বলিয়া-
ছিল, 'ভুবন, যদি তুই জীবিত থাকো, পোনো,—'
আমি তোমার কাছে পাণ চাইতে এগেছিলাম;

আমি যারের বক্তৃতা শুধু শুনামি ক'রেছি।
যা যা পাগল, তুমি আমার সতর্ক করেছিলে, আমি
মনের দ্বারা বুঝি নাই; তেবেছিলা আমার মনের
বল আছে, সুপথগামী হবো না। বন্ধুর বিবাস
ভক্ত-ক'রুণা না। আমার মন, অস্বাভাবিক বদান,
যা হুঃখ বলা নাই। আমার মৃত্যুতেও আমার অসু-
খাশানল নির্মাণ হচ্ছে না। পাগল তুমি সাধু আনার
মাথায় পা দাঁড়।' পাগল তাহাকে হঠাৎ বদ-
বোধকে ডাকিতে বলিলে, 'বদান' কথটা উচ্চারণ
করিয়া যাই তাহার প্রাণবানু বহির্গত হইত। সে।
প্রকাশের শেষ কথা বক্তা: ভিতর যে মতা হই-
য়াছে, তাহার প্রতি অবহিত হইতে সতলতেই
আমরা অনুভব করি। পাগল উ-র অতিরিক্ত
বিশ্বাস স্থানল কথা কোন মতেই উচিত নয়।
মানব যে কতকটা অস্বাভাবিক হইতে কিছুমাত্র
তুল নাই। প্রকাশের মৃত্যুর পূর্বেই প্রাণবানু
মৃত্যু হয়। এতগুলি মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু একসঙ্গে
ঘটিলে, যেখানে পাড়া যায় না। এই মৃত্যুবিরোধক
মৃত্যু ঐক্য ট্রাঙ্কটির মতই হইয়াছে।

হরমণি ও পাগলের জীবন জীবন-সেবা উৎসর্গ-
কৃত। পাগলই তাহার নাম। হরমণি কিন্তু
তাঁহা জানিত না। নামের আকর্ষণিক মৃত্যুর
পর তাহার উপর অস্বাভাবিক হ্রাসের মত পড়িল।
স্বাধীন ভুক্তি অস্বাভাবিক ক'রুণা তাহাকে জীবন ধারণ
করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বিপদ তাহাকে ছাড়িল
না। জীবনের পুত্রের মতর বাজিতে একদিন পাড়িল।
হরমণিকে দেখিতে পাইল। হরমণি তাহাকে
ধরিয়া টানটান করিতে লাগিল। কথার বলে
যেখানে বাধের ভর সেখানেই সত্য। হরমণি
না জানিয়াই তাহার পুত্রের মতর বাজিতে কাঁদা-
হরণ করিয়াছিল। ঘটনাটা কিন্তু সকলে দেখিতে
পাইয়া স্বাধীনকে তাড়াইয়া দিল। এখন স্বাধীনভাবে
জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজিয়া গেল। সকলেই তাহার
বোধ্যবিশ, কারণ সে যে অস্বাভাবিক। এখন তাহার

কাঁদা জীবনের আত্মবোধ ও হৃদয় ভাব যোঃন
ভক্ত সে মন:প্রাণ নিঃস্বাসিত করিল। মন বসিয়া
সে মনের ভাব বুঝিত—যেখানে মন দ্বিগত
অন্যথাকে দেখিতে পাইত—স্বাভাবিক বাহ্যিক
করিয়া দিত, তাহাতেই সে কোল বিত—স্বাভাবিক
করিত। স্বাভাবিকের পাত্রি বারি পেরতে তাপিতের
হৃদয় দুঃখ করিত। স্বাভাবিক বাহ্যিক মোটা পথে চলে
তাহার মন হরমণির হৃদয় সর্বদাই ব্যগ্র হিগ।
স্বাধীন না বুঝিলে, মতর ভিত্তিতে পারে না, তাই সে
বাধিতের ব্যপার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিত এবং
তাঁহা ধীরে ধীরে মন প্রাণপণে বহু করিত।
জীবনমোহিতের মন যখন প্রথম পাগলের দিকে অগ্রসর
হইতে উপক্রম করিল, তখন হরমণির মুখে আনন্দ
ভ্রমিতে পাই,—'বিলাল ত বিদ্যবার মন, অবিদ্যাবিতা
মুখতীর ও মন। সত্য মন বিদ্যাকে তাগ ক'রতে
হয়। মোড়া বিলাসই মন মন ভেদে আনে যা।
তাই মা সত্যই সতর্ক থাকি—(অপ্রাণের) ঘের
কোনোকে কালকণ্ঠে মোড়া রাখি। যোগীর
গুণস্বাভাবিক দেখা—এই সব দেখাই। আমি
যার নামের আশ্রয় নাই, বিলাস বর্জিত হ'বে অন্যথ
সেবাই তার আশ্রয়। অন্যত্র তাহাকে বলিতে
কনি,—'তোমার এই মোহিত মন, এই মন,
তোমার তো একা বাক্য তাগ দেখায় না। একটা
থেকে না যা, কালকের এই কথাটা নিগো, কোনো
মা, মোড়া কলির মুক্তি বিদ্যার উপরেই বেশী,
যেহা মন সেজে কলির চোরা বিদ্যার সর্বনাশ
ক'রতে চারিটিকে করে! এই মাতৃবই যেহেতু
আর এই মাতৃবই মা কলির চোরা।' এক মতবে
অস্বাভাবিক বর্জিত প্রমাণকে হরমণি উপলব্ধি বিদ্যা
বিস্ময়িত,—'কেন না মৃত্যু? আমি তেবেছিলা
ম'রুণো, তারপর মৃত্যু মন যে কি হ'বে ম'রুণো
কেন? মতমিন বিতং অস্বাভাবিক মন অন্যথার
সেবা ক'রুণো।' তারপর জীবনমোহিত মন
আজি এত মোহিত বিদ্যার উপক্রম করিতেছিল।

তখন তাহাকে বলিতে তিনি,—‘এ কি! কি সৰ্ব্ব-
নাশ করিতে য’লো? আশ্চর্য্য! ক’বে? কেন
ক’লো? পাশ ক’রে থাক, পাশকাণ্ডে পাশের
প্রোক্ষিত হয় না। আশ্চর্য্য! অপর্য্যাপ্ত হই
মহাপাতক ক’রো না! যা করেছ, ভাবনা ক’লা-
সিদ্ধ,—তার কাছে মাপ চাও। মাজুঘ ঘূর্ণন, তিনি
জানেন, তিনি মাপ করবেন। তুমি আজীবন তাঁর
কাছ ক’রে। সন্তান হই কতি কি? আমি নিজে
মালিন পালন ক’রো। তুমি সং করো ক’রে
কৃত্যার্থের প্রোক্ষিত ক’রে। এখনো দেখ আছে,
অধিক কাছ ক’ন্তে পারবে। আপনায় অবস্থায়
অন্ত অভ্যাসিনীর অবস্থা বুঝবে। তাহের তুমি
আশ্রয় হ’বে, তুমি তার কঠোরা, তৎপরের কপায়
তোমার অশান্ত হইবে শান্ত হবে। আমি যা,
তোমার বিধায় কথা বলছি। যে নিরাশ্রয় তাহে
তিনি আশ্রয় যেন; যে ভাগিন, তার তিনি ভাগ
হয় কখন।’ এত বড় আশার কথা যিনি আশ-
বিস্ময়ে শোনাইতে পারেন তাঁহার নিকট আমিও
কৃতজ্ঞ।

হরমণির প্রতিষ্ঠিত অনাথ-আশ্রম স্নাতকভাবে
গোলাইবার অল্প পাশল অর্থ সাহায্য করিতে।
নানাজল বিপদভাগ হইতে মুক্ত হইয়া ব্যবসা করিয়া
পাশল কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী হইয়া-
সিগেন; কিন্তু তিনি বনবেশে পাশলের যত
ধাকিতেই ভাল বাসিতেন, তাহে এই বেবে দীনের
হাযের কথা সর্ব্বদাই তাহার মনে পড়িত, এত
তাহেরে হ্রঃ হ্রঃ করিবার অল্প তাহাৎ প্রাণ আত্ম
হইত। পাশলের চরিত্র পূর্বেই কতকটা আলোচিত
হইয়াছে। একাশকে সংগে আনিবার অল্প
তিনি বড় চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার
জানপট উপদেশ বাণী তাহার আশংকা হই
পেবে কিন্তু একাশ আপনায় স্নেহ বৃদ্ধিতে পারিষা-
ছিল। তাঁহাকে প্রেরণহুয্যকেও উপদেশ দিতে
তিনি,—‘এ সংগে স্নান করিবার কথা—কান্

কগো। কান্ধুকে পথের মালা জুগে আপনায় মালা
নিহে বিব্রত হই।’ বাস্তবিকই পথের মালা হই
বিশেষ যত পাতি পাওয়া যায় তত পাতি আর
কিছুতেই পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার হস্ত হইতে
আপনাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা মাঝে মাঝে।

শান্ত মায়াহত চিত্ত হরমণির হৃদয়ের চাক্ষু-
কেনন মনে একদিন দেখা মিলাছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের
ষট্ঠপর্ভায়ে তাহার স্বপ্নতাত্ত্বিক হইতে জানিতে পারা
যায়,—‘একে দেখে আমার মনে নানা তাহের উদয়
হই কেন? কে—এ? এ কি কোন ছদ্মবেশী
দেবতা?’ তাহাকে নিঃশব্দিত স্থান পারিগেও জ্ঞান
পাশলের বিবেকে যে তাহার একটা টান আছে তাহা
যেন বৃদ্ধিতে পায়া যায়।

গীত।

‘যদি ধরি যেন মনে হইবে যেন, যদিও তাহায়ে নারি
যেবা দিবে যার আপনি লুপ্তায়,
আঁখি ভরে আগে বারি হ
বাগ্নী কত মানসে ভালে,
বিধানি কিরি তাহারই দানে,
অবশে ছবি—আবেশে—
পথে বিকাইতে চাহি তারি হ
তারি পানে প্রাণ টানে,
যান জানে—তারে আপন বলিয়া জানে,
কিহিতে দে ন্যুতে আপন পাশের,
কেঁপে বলে আবারি হ’

অথবা এ টান ইঞ্জিরের জড়না হই—সহন
জানের কল। উচ্চ আবেশের টান—আপন করি-
বার চেষ্টা—আশ্রয় সন্ধানের ইচ্ছার নানাতর।
পক্ষ অঙ্কের তৃতীয় পর্ভায়ে পাশল ও হরমণি উভয়ের
নবো যে কথোপকথন হইয়াছিল—তাঁহা আমরা
এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া উত্তরে চরিত্রের আর একটু
আলোচনা করিব।

হই। পাশল বিদ্রোহ, কি য’বে বর্ণিত হইবে যদ্য

পাগল। আর কি ব'ল্‌গো—যাকে যাকে মরি আর
চম্‌কাই, তা তো ভুলেছ।

হর। তুমি প্রথম কি করে মলে।

পাগল। সে হাঁসপাতালে।

হর। বলো—বলো—হাঁসপাতালে কেন গিয়েছিলে?
পাগল। একসলা মলে ঝাঁড়িয়েছিলাম,—সাঁপের
বিতে গিয়ে ছুঁবে গেলুম।

হর। একসলা মলে ঝাঁড়িয়েছিলে কেন?

পাগল। ঝাঁড়াখো না, বে ক'রলুম বে।

হর। বে ক'রল কি?

পাগল। কি আর, বে ক'রলুম।

হর। একসলা, মল কি?

পাগল। আরকাল বে দিন পড়েছে, বে ক'রলেই
একসলা মলে ঝাঁড়তে হয়।

হর। তোমার স্ত্রী আছে?

পাগল। সে বিবধা হয়েছে।

হরমণির জীবনের ঘটনার সহিত একা ঘেঁষতে
পাইয়া সেখানেই মিথ্যাণ্য করিল—‘সে কি?
বলো, বলো—’

পাগল। আমি একলা মলে ঝাঁড়িয়েছিলাম—
ভেবেছিলাম হাত খানে গিয়ে ছুঁব বিধে তার মস্ত
মানিক তুল্‌গো। মানিক তুল্‌গুম, তাকে
হেবার মস্ত আনুছিলাম,—এমন সময়ে বেঁচ
হাঁসপাতালে বয়েছি; মরে পাগল হ'রে
চম্‌লুম।

সূর্য হইতে বোন্‌ অজ্ঞাত শক্তির বলে হরমণি
পাথরের বিকে আঁকুট বইয়াছিল, এখন তাহার
দানীর অকূটের সহিত পাথরের অকূটের সমতা
সেঁখিয়া তাহার পথের বারণ করিয়া আঁকুটে মিথ্যাণ্য
করিল, ‘বলো—বলো—তুমি কে?’

ভাব-বিজ্ঞানের নিকট পাগল আর আত্মগোপন
কহিতে পারিল না, উত্তরে বলিল,—‘হরমণি আর
বায়ু ত কম নাই,—এখন আর অস্ত্রপথ ত নাই—
তবে আর কেন মিথ্যাণ্য ক'র?’

ভাষের আধিকা এবং হরমণি তাহার বাগধা-
বশিষ্টা প্রাপ্ত বইয়া কেবলমাত্র ‘প্রকৃ ইংরেজি’
বলিয়াই মুছিয়া গেল। মুছিয়া ভাবিলে পাগল
তাৎক্ষণিক মুছাইয়া বলিল,—‘হরমণি, হরমণি—কেন
আত্মগোপন ক'র? আত্মগোপন পথে চণ্ডী, ঘি
টিক বেতে পাতি, স্বর্গের উপরে যোগার স্বাৰ্থপূত
মহাপুত্ৰবর্ণের স্থান, সেবার ভাষের পথসেবা
ক'বার মস্ত তপস্বী আনারের নিখুঁত ক'ব'বন।
মির হও, তোমার কাজ শেষ করো।’ লম্বাঘের
জীবের শব্দ ইং কয় ভাগ স্বাকার নয়—সমুর্বে
মস্তা দানীর পত্তা—অপর পক্ষে জীবের নিকট আত্ম
দানীর উপস্থিত; কিন্তু মিলনের আশা—বৈধিক
মজ্ঞাপনালগ্না বিশুদ্ধন দেওয়া বড় সম্ভ
যাপার নয়। সমুর্বে স্বচ্ছ মলিয়া প্রেম-তরমিণী
প্রাণবিক্রা; কিন্তু উত্তরে তাহার নির্মল মলিল
আত্ম পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে
পারিলে না, ইহা অপেক্ষা পরিচালকের বিবর
আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু পাগল, হরমণির
নিকট যে বিরাট আত্ম উপস্থাপিত করিয়াছে,
তাঁহার আত্মবশী শক্তিতে এবং পারমিতিক
মস্তের মস্ত বৈধিক ও ইহকালের ম্বণে অবগোণে
ভাগ করিল। পতি বেবতার নিকট গে চাইল,
—‘পারের খুলা হও, আমি পথির হই।’

পাগল। তুমি পথিকা,—তোমার পথিকা
মেনেই পথার ঘাট থেকে তোমার এনেছিলাম।
তোমার অগতমক পরতের বেবের মত তেলে
গিয়েছে, তোমার নির্মল ম্যোতিতে আবার ম্বণ
উজ্জল। হাও কাল করো,—কর্মজনে অবকাশ
তো নাই, যে কথাবার্তা ক'বে?’

বাগবিকই ভারতবর্ষ কর্মজীবী। কর্মীরা
এখানে আপনাদের স্বাৰ্থকে—প্রেম, ভাস্কর্য্য প্রকৃতি
কৃতিনিচয়কে মত সম্বন্ধে বলি বিতে পারেন, অত
বেবের গোচরতা মত সম্বন্ধে পারেন না। কহিল এ
পেথের ঐ মদান আত্মবে অমুদ্রাপিত বইয়া মত

পত্নী জগতের দেবার প্রাণ নিয়োজিত করিয়া
গিয়াছেন। সহস্র চক্ষুলা রমণীর স্বপ্নে যদি
অধিকতর চাকলা উপস্থিত হয়, তাই আর অধিক
সময় যায় না করিয়া কথটা বলিয়াই পাগল সেখানে
বইতে কলিয়া গেল। সমস্ত বিশ্বাসই গিরিশচন্দ্রে যে
বাস্তব চিত্র (realistic) এক্ষণে অতনু করিয়াছেন,
তাঁহা বড়ই উপভোগ্য।

জগন্নি ও পাগল জগতের উপকারের জন্য তাঁহা-
দের প্রাণ-নিয়োজিত করিয়াছিল। জগতের
পাণী তালীর চূর্ণ লুপ্ত করিবার জন্য তাঁহারা
সর্বস্বদাই ব্যয়। মানব মনে বিবেক যেতন সংপথে
ব্যক্তিরা কার্য করিতে উপদেশ দেয়, তাঁহারাও
ঠিক সেইরূপ জ্ঞাত মানবকে পতনের পথে, ধ্রুকের
পথে লইয়া বাইবার জন্য সর্বস্বদা ব্যয়। ইংরেজীতে
হাথকে (Ministering angel) বলে ইংরাজ ঠিক
সেই ভেনীর লোক। বাথকের হুণ্ডে কাতর
হইয়া জাতিগর্ভ নির্ধিক্ষেপে ইংরাজ সকলকেই
আশ্রয় দিয়া থাকেন। সেবা-বর্ধের প্রতিষ্ঠান লক্ষ
ইংরাজ বহুপত্রিকার। পাগল কথ করিবার জন্য
পাগল লাগিয়াছিল। তিনি একজন বড় সওয়াগর।
সাব্যস্ত লাভ লবণী বিক্রয় করিয়া আপনায় বুদ্ধিগণে
ও সন্ততার ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং
মহিষ্মনায়াগণের দেবার সেই অর্থের সঞ্চয় করিয়া
লক্ষ হইয়াছিলেন।

কবির গিরিশচন্দ্র পাণ্ডিত্য জগতের Found-
ling home, Nursing home বা Maternity
home প্রভৃতি যে সকল অশ্রুতান আছে তাহাদের
অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এ নাটকে করিয়া-
ছেন। সুখের বিষয় প্রাণ পোষার নবদীপ দায়ে
'মাতৃমন্দির' নামে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত
হইয়াছে। আশা করি বাবালার জেলায় জেলায়
এইরূপ আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হউক। জ্ঞাত রমণীর
পক্ষে জগৎগ্রন্থ করিয়াছে বলিয়া জাতকের কোন
দোষ ত নাই। তাহাদের শিক্ষার প্রতি অবহিত

হওয়া সকলের কর্তব্য। সমাজে মুহূর্ত্তকালে হাথকে
তাঁহারা জীবিকা অর্জন করিতে পারে তাহাদের
বাধ্য করা উচিত।

সুপথগামী রমণী মিশের প্রীতি ও সমাজের যে
একটা দারিদ্র আছে তাহা অস্বীকার করিবার
উপায় নাই। তাহাদের সবচেয়ে হাথ করা কর্তব্য
তাহা পূর্ণেই আশ্রয় বিনিয়োগ।

কবির বিদ্যুৎ কেঁপেবের মন বিদ্যুৎই আনোন্ডা
নাটকে যেয়াইয়াছেন। ইংরেজকে সমাজের
স্থপিত জীব করিয়া অধিত করিয়াছেন। তাহার
কথার বলি,—

‘আব্, বিদ্যাতী’ আব্, বিনী জা

যো আঁদলা নাচেন কৌবন,

তাঁনি তাই ল্যাগ খেন বেই,

এইটো তো ভুল বিখ্যাতার।’

ইঞ্জির দাপ দিঃ বাবুর লখনা চিরন্তনের আনোন্ডা
না করিয়া, কেবলমাত্র ভ্রাম্যদাস বাবুর উপদেশ
যাহা তাহার জীবনকে অগণন চ্যলিত করিয়াছিল
তাঁহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শুধু সুখের
কথার দিঃ বাবুর জীবনের পরিবর্তন
বোধ হয় সাধিত হইত না, যদি না তাহার
মনেও ভ্রাম্যদাস বাবু অধ্যাতিকভাবে
পরিণামে করিবার উপায় করিয়া দিতেন। কবী
এই—‘দিঃ বাবু তোমার টাকা নাও। তুমি এক-
জন মাত্রপক্ষ লোকের ছেলে—একবারে অগণনকে
দিয়েছোঁ? এই অগণ কার্যে যে সব টাকা ব্যয়
কর,—এতে সমস্ত সমস্ত লোকের জীবন রক্ষা
করতে পারবে। কিন্তু তোমার অগণ্য কি যেহে
—মেশের চক্ষু—বড় বাবুদের ছেলের এ সব
প্রবৃত্তি হ’লে অসংখ্য বিধবা খেতে পায়—বহু
বালক স্কুল প’ড়তে পায়,—যেহে বাগিচা বিতানে
অনেক বেকার লোকের অন্তর সন্ধান হয়। কিন্তু
কি বিভবনা, এ সংপ্রবৃত্তি বিরল। সংপ্রবৃত্তি
পরিবর্তে তোমার মত অনেকেরই পতন প্রবল হয়।’

এইবার আশ্রয় অন্যত্র চরিত্রের সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব। শুভরত দুর্গ প্রাচীনা। বাহুবল ঠকাইয়া ভীষ্মকাজ্ঞান করে, কিছু ভাণ্ডার ভরী চিত্তবলীর চরিত্র লক্ষ্য। চিত্তবলী প্রহরার 'জগদগি' নৃত্যন লক্ষ্যে আসে।

প্রহরারূপের বিবাহ পুত্রবৎ নির্মাণা কিন্তু সমাজের আদর্শ বিবাহ-লক্ষ্যগণিত। বাগদৌ ললারকে ইহাটাই স্বামিন্য ক'রয়া চাখিয়াছেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বাস-বিবাহ মুক্তিদায়িত্ব স্বামী তাহার ইষ্ট বৈবাহ্য। তিনি নতীর হইয়া উপস্থিত বাহুবল আর নাই বাহুবল তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁর প্রত্যাক দেবা শুধু মনে মনে দেবা এই চাই দেবার তিতর লক্ষ্য। কিছু নাই। বিলাস-যুক্তিগত পুত্রবৎ হেঁচিয়া যখন তাহার বস্তুরের প্রাণ কী-বিদ্যাহীন, তখন নির্মাণ তাহাকে বলিয়াছিল,—'কেন বাবা জুনি আনুল হয়েছ ? আমি বাটার বড় বউ,—আমার সমসার, আমি এখন সমসার ক'রো, আমি স্বরকরা বস্তার ক'রো, মেওরকে বেধ'রো, আইমুঙো ননকে বেধ'রো, কোদাধের বেধ'রো, এখন আমি কোদাধের বউ বউ একজো। চাকর লোকজনকে বেধ'রো, এই কাজ আমার ইষ্টবৈবাহ্য আমার ঘিরে পেছেন। আমার তিনি পরব ক'রতে সুখিয়ে আছেন—বেধা বিচ্ছেদ না, বেধ'ছেন আমি তাঁর বনের বস্তন কাম ক'রতে পারি কি না। যে দিন আমার কাম ছুরোবে, যেদিন আমি কাম হ'বো,—সেই দিন তিনি আমার আদর করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।' এই বিবাহ আদর্শ কিন্তু তাহতের নিমিত্ত।

কিন্তু বিবাহের এই আদর্শ যে কোন কারণেই হউক অনেক পরিস্থিতিতে নির্মিত হইয়াছে এবং সমাজে যে তাহাধের বহু কেহ কেহ দৃষ্টান্তের প্রোত প্রোত 'করিতেছেন না, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সকলের প্রত্যেক-কালে বলিতে

পারা যায় যে, বিবাহ-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইয়া বাহুবল এবং ইহা যখন পাত্র ও নীতি সমস্ত তখন কেবলমাত্র বস্ত্রের ইষ্টে এ আচার যে কোন কারণে বহু ইহা-হীন বলিয়া এখনও যে বহু থাকিবে তাহাও কোনও মুক্তিদায়িত্ব কাণ্ডে বৈধা যায় না। অল্পবৃত্তির বিক ইষ্টেও বৈধিতে পেনে বাস-বিবাহের প্রতি যে কঠোর ব্যবহার করা হয় তাহা প্রহর বাহুবল ব্যবহার বলিতে পেনে 'বালিকা হস্ত্য' নহে ত কি ?

বাস-বিবাহের বিবাহ প্রচলিত হউক আর নাই হউক তাহা লইয়া অধিক আলোচনা করিতে চারি না। বহু প্রাচীন আচার ব্যবহার বিশ্বস্তির পক্ষে সুপ্রমাণিত হইয়াছে, আবার অনেক নতুন আচার প্রচলিত হইয়াছে। এ আচারও যখন ন্যায় মুক্তিদায়িত্ব তখন সমাজে চলিবে বলিয়া আশাধের বিশ্বাস।

কনজুতি বস্ত্রের গরিপক্ষে আদ্যবিরগকে কবি-কল্পের কথার পুনরুক্তি করিয়া যে শিক্ষা বিদ্যাহেঁদে তাহার দিকে অগ্রহিত হইয়া সকলেরই কর্তব্য—

"অবলা জনের দ্বাতি

রকা পাও অনেক হুতনে"

নাচার অবিচার লইয়া আদ্যকাল বেশ একটু আশোপন চলিতেছে—তাঁহারা তাঁহাদের জায় অধিকার পান তাহাতে কতি নাই; বহু ঐক্য পাইতে যেখানে আদ্য অত্যন্ত লুপ্ত হইবে। আর তাহারা ঐহা-বস্ত্রের জায় তাহাধের কামসকল দ্বা-পদ্যের সমুদ্রে বস্ত্রাবধান হইতেছেন, তাহাধের অধরা ভাবিয়া আদ্য চিন্তিত। কিন্তু আশাধের যে তাঁহাধের উপর একটা কর্তব্য আছে সেটাও ত জুলিলে চলিবে না—আশাধের তলে কর্তব্যগাধনে পদ্যাবহ হইলে প্রত্যাহার আছে। 'অবলা জনের দ্বাতি (বর্ষ) রকা পাও যে অনেক হুতনে' এটা বহু সত্য কথা। যদি প্রহরবাহু বা তাহার পত্নী সমাজে বিবাহ করা জুবনোবিনীর প্রতি কাম করিয়া হু

প্রজাপতির দৌত্য

(বড় গল্প)

[ঐশ্বর্যসুন্দর গল্প]

(১)

“না না, এই উঠছি” বলিয়া সে বিছানা হইতে

উঠিয়া পড়িল।

অতি প্রত্যুষে বাসা হইতে বাহির হইয়া
বিগ্রহের প্রান্ত চরণে ও অঙ্গুলি-চিত্রে রমণে যখন
বাগার আসিয়া পৌছিল, তখন তাহার মা ঘরে
চুকিয়া বৃহৎ বসনার ঘরে বলিলেন, “এতটা বেলা
দৰ্জাত বন্ধের বাগার বাগার ঘরে না বেড়িয়ে
সকাল সকাল নিয়ে খেতে নিলে ভাল হয় না?”

যায় কথার উত্তরে কোন জবাব দাতা না দিয়া
সে বলিল, “না, ভগ্নে আর্জ সকালে এসেছিল।”

বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন, “কই তাতে ত
আজ দু’দিন ঘরে বেধে পাই নি। তুই সব বন্ধুর
বাগা বেড়িয়ে এলি আজ তার বাগার একবারও
যেতে পারলি না! আজ্ঞা, রমণ, তুই দিনকে
দিন কি রকমের হোঁচর ঘাঙিন বুলু ত?”

“তাঁহার এত কথাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া,
“বনে বনে সে ভাবিতে লাগিল; তাইত তখন কেন
আজ দু’দিন হোল আসছে না। সে কি তবে
আমাদের উপর রাগ করেছেই আসছে না, না, আজ
কোন কারণ আছে!”

ভাতাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, তাহার বা
বলিলেন, “বিকাল নাগাদ তার শুকানে গিয়ে
একবার খোঁজ নিয়ে আসিস, আর বলে আসিস
সে কেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে। দু’দিন
হোল তার কোন সন্ধান না পেয়ে বনটা
বড়ই খারাপ ঘোরে আছে।” এই বলিয়া কিরতু
গিয়া। পুনরায় কিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “আর
“তারে থাকিস্ সে বাগা, কঠ, উঠে নিয়ে খেতে নে
— আর কত বেলা কোঁরাব বলু ত?”

ঘরের বাহির হইয়াবাগার চাকর আসিয়া তাহার
হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠি দেখিয়া তাহার
মাথা ব্যস্ত-কণ্ঠে মিছামিছা করিলেন, “কায়
চিঠি রে?”

“মাঝার চিঠি।”

“কোথা থেকে এল? অনেকদিন হোল
দেখতের কোন খবর পাই নি!” বলিয়া তিনি
উৎকণ্ঠ-চিত্রে সংবাদের আশায় রমণের মুখের
বিকে চাখিয়া রহিলেন।

রমণের চিঠি পড়া শেষ হইয়া গেল, পুনরায়
তিনি বলিলেন, “কে লিখেছে, বুলু না?”

রমণ বলিল, “বন্ধুদ্বারা থেকে বোধিদি আমা-
দের যেতে লিখেছেন; সেখানে একটা প্রকাণ্ড
অদ্ভুত বোলা বসে তাই বেধে তে।” কথা শুনে
সোহাগের নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বলিলেন,—

“তবে তারা সব ভাল আছে—কেন রে? তা
হেঁত, তুই আর তখন না হয় গিয়ে দেখে আর
না?”

“হাই বাব” বলিয়া সে ঘরের অন্ধ নীচে নামিয়া
গেল।

সবুজ বিনটা ভগ্নের প্রভাকার কাটাইয়া
হিরাও যখন তাহার আলিবার কোন লক্ষ্যই দেখা
গেল না; তখন সে তাহার খোঁজে বেস গিয়া
উপস্থিত হইল। নীচে দ্বারকেও দেখিতে না
পাইয়া, উপরে উঠিয়া দেখিল, তাহার ঘরের বন্ধু
ঈশ্বর সুন্দর। সে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে চুকিয়া

বেশিল, তপেন সামনের দারাদ্বার বসিয়া একমনে
 স্তন স্তন করিয়া কি যেন একটা পান গাহিতেছে।
 সে তাহার পক্ষান্তে দাঁড়াইয়া রত্নোজ্জ্বলবস্ত্রের দেই
 চিরশ্রমিষ্ণু মধুর পানটি স্তনিতে পাইল। পানটি
 একবার গাঁওয়া হইয়া গেল, তাহাতে তৃপ্তি হইল
 • না বেশি, পুনরায় সে অত্যন্ত তপনের সহিত
 আবার সেই পানটাই বসিল,—

“আবার নিতি স্তন কিরে এল,

আবার চিরস্থঃখ কিরে এল,

• আবার লব স্তনস্থঃখ-স্বপ্ন বন অন্তরে কিরে এল।”

পানটি যখন ক্রমশঃ কল্লপ, কল্লপভর, কল্লপতম
 হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন রমণ আর আশ্র-সোপান
 করিতে না পারিয়া তড়িৎ প্রতিতে তাহার নিকটে
 উপস্থিত হইয়া ব্যগ্র-কণ্ঠে বলিল, “তাই কার
 প্রতীকার তুমি তোমার ভূমিত তাপিত-স্বপ্ন লইয়া
 বসিয়া আছ। কে তোমার দেহজন—যার বস্ত্র
 তোমার এত ব্যাকুলতা?” কথাটা বলিয়া অদম্য
 রমণে তাহাকে চমকিত করিয়া তুলিল।

হঠাৎ স্বরের মধ্যে অসুনিপাত হইলে লোক
 যেমন সঙ্গীত চকল ও তক্ত হইয়া উঠে, তেমন
 রমণের কথাতে তপেন ও তরুণ হইয়া উঠিল।
 সে তখন ঈষৎ জড়িত-কণ্ঠে বলিল, “কতক্ষণ হোল
 এগেল হে—এতক্ষণ ডাকনি কেন?”

যাহ নিশ্চিত হুয়ে রমণ বলিল, “তুমি এতক্ষণ
 কি তোমাকে ছিলে যে তোমার জ্ঞান?”

“কেন, আমি কি সমাধিগ্রস্ত হোয়ে ছিলাম
 না কি যে?” বলিয়া মিথ্যাসু-বৃত্তিতে চাহিয়া
 রহিল।

“আমি মাকে গিয়া তোমার কথা বোলে দেব।”
 এই বলিয়া সে বরাণসিনিকে উক্ত হালির গোলে
 কানিত করিয়া তুলিল।

“বা, বা, আর থাকে বাকি নঃ—আমার শরীরটা
 ভাল ছিল না, তাই...”

“শরীর ভাল না থাকার লক্ষণ বুঝি এই?”

“না, না, এমন রমণের আশ্রমে গাইছিলাম—
 এত কি কোন বোধ আছে?”

“না, বোধ আবার কি—তবে এই চ’দিন আশ্র-
 মের বাসার থাকনি কেন? এও কি শরীর ভাল
 না থাকার কারণ না কি?”

“বাস্তবিকই আমার শরীর ব্যাধাণ ছিল।”
 বলিয়া সে রমণের দিকে চাহিল।

“এর বিচার আর আমি কি কোরু—যার
 কাণ্ডে গেলেই সব ঠিক হবে।” বলিয়া তাহাকে
 তোর করিয়া উঠাইয়া লইয়া, দ্বন্দ্বনে স্রমণে বারিহ
 হইল।

তারপর তাহারাই দুই বহুতে সাক্ষাৎসং শেষ
 করিয়া বাসার ফিরিল। রমণের মেঘময়ী মাতা
 তপেনকে • অসুযোগের ঘরে বলিলেন, “বাবা
 তপেন, এই ক’দিনের মধ্যে তোমাকে এক বারও
 দেখতে পাই নি, তোমার শরীর ভাল আছে ত?”

এই কথাটার কি উত্তর দিবে তপেন তাহা
 বিব্রত করিতে না পারিয়া, নীরব হইয়া রহিল।
 তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, রমণ মুহু হাসিয়া
 বলিল, “যার এমন সুস্থ লগল শরীর, তার আবার
 জ্বর হবে—জ্বরের সাধ্য কি যে তপেনের কাছে
 এগোয় না?”

রমণের কথা শুনিয়া তাহার মার গা-টা ছম
 ছম করে উঠিলো; এবটু জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, “বা
 বাবা, তাকে আর বিরক্ত কোরিস্ না। কি এমন
 ওর শরীর তুই দেখ’ছিস্ যে স্বপ্ন—তখন সময়—
 অলময় অলম কোরে বলিস্?”

মুহু হাসিয়া রমণ বলিল, “তপেনের এই শরীর
 যদি না কিছুই না হয়; তবে আমাদের এই শরীর
 নেই যোগেই চলে?”

“বাবা তপেন, তোমাদের জ্ঞান আমি চা শুধারী
 কোরে রেখে নিষেধি—যাই নিষে আদি!”
 বলিয়া তিনি চা আনিবার জন্ত রাত্র্যবয়ের দিকে
 চলিয়া গেলেন।

কি ঘোমতী ও মহিমঘোমতী এই রমণের মা !
তপেন অনেকদিন বলিয়া বলিয়া ভাবিবারে—ইনি
হামবী না দেবী !

হুইতনের হাতে প্রথম পহন হুই কাপ, তা নিয়া
মকুব তুলে বলিলেন, “বাবা তপেন, আমা দে-মা
চিটি লিখেছেন তোমাদের সেখানে যেতে।”

তপেন রমণের হাকে মা বলিয়া ডাকিত।
সে হঠাৎবল্লভ কণ্ঠে কহিল, “কি লম্বা মা ?”

“সেখানে কি একটা বেলা বোস্বে তাই বেধ-
বার লজ্জা।”

“তা বেশ চ, চল না যে র বৃৎ—একদিন যাওয়া
যাক্।” এই বলিয়া সে তাঁহার দিকে চাহিল।

রমণ কহিল, “আমার কি, আমি সব সময়ই
যেতে প্রস্তুত।”

“আমি ও কোন অপ্রস্তুত।”

এমন সময় রমণের মাতা বলিলেন, “তা হোল
কালই যা না কেন রমণ সকালের ট্রেনে।” এই
বলিয়া তিনি বাবার আনিবার লজ্জা গৃহের মধ্যে
চলিয়া গেলেন।

রমণ—বলিল, “তবে কালই যাওয়া দিচ্-
কেন ?”

“নিশ্চয়ই” বলিয়া সে দর আনীত বাবার
খালায় মন দিল।

(২)

নির্দিষ্ট দিনে হুই বস্তুতে রৈখনে আনিয়া যেবিল,
হেলেনে অসন্তুষ্ট ভনতা। এই যেবিয়া ক্ষুর মনে
রমণ বলিল, “এই ভীড়ে যাওয়া একেবারে
অসম্ভব।”

১২জনের কথা শুনিয়া তপেন উগ্রকণ্ঠে বলিল,
“অসম্ভবকে সম্ভব কোরে নিতে হবে ?” এই
বলিয়া সে বিপুল জনসংখ্যার দিকে নিষেধের ভক্ত
যেবিয়া গেল।

তপেনের অগাধ উৎসাহ যেবিয়া রমণে কিংকং
সাহস প্রাণিল বটে, কিন্তু অনেক-প্রাণে সে তাহাকে

নির্ভর করিতে পারিল না। তাহার কথাই কোন
মডড হুবে না বুঝিয়া, রমণ বলিল, “তপেন,
তুমি গিয়ে তবে টিকিট কোরে নিয়ে এগ ত তাই
আমার ধারা ও সব হবে না।”

সেও তখনই মনিবকে খড়্গাটর দিকে দৃষ্টিপাত
করিয়া বলিল, “আর ত যেহী করা চলে না—
টিকিটটা কোরেই আনি।” এই বলিয়া জনতার
মধ্যে সে ঢুকিয়া গেল।

রমণ আর কি করিবে, সে একটি স্ট্রিক্‌চেনের,
উপর বলিয়া বাত্মীরিপের আত্মলতা দেখিতে
লাগিল। যখন সে উহাতে উল্লস হইয়া আছে, এমন
সময় হঠাৎ বর্ষাভক্ত কলসেরে হাঁকাইতে হাঁকাইতে
তপেন আনিয়া বলিল “রমণ, ওঠ, আর যেহী করা
চলে না। আমা দ্বান পাওয়া বড়ই কষ্টকর রে।”
এই বলিয়া সে তীরবেগে মিনিবল্লভ সব কাষের
উপর কেলিয়া উর্ধ্ববাসে দৌড় দিল।

রৈখনের স্ট্রিক্‌চেনে মনিত করিয়া তাহার হুই
বস্তুতে কোন রকমে একটি পাকীর মধ্যে ঢুকিয়া
হাক ছাড়িয়া ঝাঁড়িল। নিজেদের অত্যাশংক্য
মিনিবল্লভ লইয়া বাকি সব জুড়াইতে জুড়াইতে
তপেন পাকীর পরে বলিল “বারকের এই দিনে
কি রকমে যে কাণ্ডোড়ার কর্তে হুই, তা
যেবিল ত ?”

উত্তরে রমণ বলিল, “একথা ঠিক যে তুমি না
খাক্লে আর আমাধের বাত্মাই হোত না।” এ
লজ্জা তোমাকে বজ্জবান।

পুনরায় তপেন বলিল, “তোমার মত পলকা
পাকীর নিয়ে কোন কঠিন কাল করা চলে না।
পাকীরকে কত ভোয়ালে রাখতে হয়, তার তুমি কি
জান্বে বল ?” এই বলিয়া সে সর্বোৎসাহমনে
তাহার দিকে চাহিল।

যথা সময় পাকী বাত্মী সজার লইয়া ছাড়িয়া
দিল।

পাকী আনিয়া যখন একটি ছোট রৈখনে

লাগিল, তখন জটিল বুদ্ধ ভরলোক এক চতুর্দশ বৎসর অনিশ্চায়িত্বের কিশোরীর হাতে সপথকে বহিরা বলিলেন, “সবু, এদিকে আর—এই গাড়ীতে যাওয়া আছে।” এই বসিরা যে গাড়ীটা গায়ে নিয়ে গিয়েছেন, তাহার সমুখের আসিয়া বাজির হয়েছেন।

আরোহীকে আসিতে দেখিয়া, গাড়ীর একজন আরোহী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “এ গাড়ীতে যান নেই বন্দার, অত গাড়ীতে যান।”

এই কথা শুনিয়া বুদ্ধট হতান হইয়া গড়িলেন। কোন উপায় নাই দেখিয়া তখন কলপ-কণ্ঠে বলিলেন, “একটু স্থান বিন বন্দার—আর ও সময় নাই যে অত গাড়ীতে গিয়ে উঠব।”

“না বন্দার, এখন ও গাড়ী ছাড়তে বিলম্ব আছে, অত গাড়ীতে যেন।” এই বলিয়া সেই আরোহীটি ঘেঁটু বন্দার স্থান বালি ছিল, সেই স্থানে নিম্নের দেহভার এলাইয়া বসিল।

যখন এই প্রকারের কথা বার্তা চলিতেছিল, হঠাৎ তখন তপনের দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল। সে তাকাতাকি গাড়ীর বরষার নিকটে আসিয়া বুদ্ধকে বলিল “ওকে নিয়ে আসনি এই গাড়ীতে উঠুন। এখানে অনেক জায়গা আছে।”

একটি অপরিচিত যুগলের মূখে ফেরে আসিলান তুমি, বুদ্ধাট্ট দৃঢ়বৃত্তিতে তপনের কিকে চাখিয়া কহিলেন, “বাবা, আমাদের মত কি স্থান হবে? উনি যে বোলছিলেন, এ গাড়ীতে স্থান নেই—তবে কি কোরে স্থান হবে বাবা?”

স্থান নাই তুমি তপন সেই আরোহীটির প্রতি অজ্ঞা করে চাখিয়া তাহাকে বলিল, “বন্দার! আপনি উঠুন ও; তারপর জায়গা খায়ে কি নেই, তা’ আমি বুঝব।” তারপর রমেনকে ডাক দিয়া সে বলিল, “শুধু নীচে গিয়ে জিনিষগুলি তুলে দাও—গাড়ী ছাড়তে আর বেশী বেলা নেই।” এই বলিয়া রমেনকে কোর করিয়াই গাড়ী হইতে নামাইয়া বসিল।

সরসুকে ইচ্ছাকৃত করিতে দেখিয়া, তপন অসভ্য নিচ্ছেই নীচে নামিয়া দিয়া সেই অপরিচিত কিশোরীর এবং বুদ্ধের হাত ধরিয়া অতি দ্রুতের সহিত গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া বসিল। এত গোচরের মাঝে এক অপরিচিত লোক আসিয়া সরসু হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া নেওয়াতে, তাহার গা লজ্জার কাঁটা দিয়া উঠিল। সে তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—কি লজ্জার কথা।

গাড়ীর একপাশে সরসুকে অব্যবহন ঝাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার বাবাবন্দার আনন্দোৎসাহ দ্রুতকরণে বলিলেন, “দিনি এখন লজ্জা করবার সময় নয়। ওঁরা যদি আর এই বিপাকে পড়েন, তা’ হলে সে গাড়ীবিলাই। কি কষ্টেই আমাদের ঘেঁটে বস বেধি?” এই বলিয়া তিনি সেই অপরিচিত যুগলকে কণ্ঠের ক্ষিপ্রতা দেখিতে দেখিতে মুদ্র হইয়া গেলেন।

যখন একে একে সমস্ত জিনিষগুলি গাড়ীতে তোলা শেষ হইয়া গেল, তখন গাড়ীতে উঠিয়া তাহারপক্ষে একপাশে ঝাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সন্ধ্যার বলিল, “এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন—ওঁরকে গিয়ে বসুন না?” এই বলিয়া সে একবার নিবোধ। মধ্যে সেই সুখেসুখেবলা ঝাড়াবনত যুগল সরসুকে বিচ চাখিয়া হইল।

তপনের কথা শুনিয়া বুদ্ধট সরসুকে পঃব্যবন করিয়া কহিলেন, “সরসু, চন্দ্রনা—ঐদিকেই বাই।” বলিয়া বাইবার জন্ত উঠিয়া ঝাড়াইলেন।

বাসাবন্দারের কথাও সরসু মন্ত্র কণ্ঠে বলিল, “ওদিকে বাবার বরষার কি দামাবন্দার,—আমরা ত এখানে বেশ আছি; বিছাখিছি ওঁদের কষ্ট দেওয়া কেন?”

সরসু কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, “উনি যখন বোলছেন, তখন আর যেতে বাধ্য কি? সরসু—চল।” এই বলিয়া তিনি একপা একপা করিয়া অঙ্গুর হইতে লাগিলেন।

সংস্কৃত নড়িতে চড়িতে না বেঁধিয়া, তপেন আগ্রহের সহিত করিল, “আগনি ঐখানে গিবে বোল্‌বেন চলুন—ধাঁড়িয়ে আর ততক্ষণ থাক্‌বেন বলুন ত ? আর বেঁধে কোথায় না চলুন ।”

পরমাত্মার সাহিত অবশ্যে কথা কহিতে বেঁধিয়া, পাক্কীত যথো অস্ত্রাভ্যাসা হুঁকি হুঁকি চাণ্ডিতে লাগিল, এই বেঁধিয়া তপেন তাহারে নিজে আঁজার দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্তরিক্তে বুঝ কিরাইয়া লইল ।

(৩)

বে স্নেহপাটায় বসিয়াছিল । সেইখানে বসিয়া পড়িয়া সন্ন্যাস বাগ্যবাহ্যর তপেনকে উদ্বেগ করিয়া বলিলেন, “আগনারা এখন বোস্‌বেন কোথায় বলুন ত । আমরা দুইজনে ত আগনারের সব ব্যাপার বখন ভোরে বসেছি ?” এই বলিয়া তিনি যেন একটু হুঙ্কিত হইয়া উঠিলেন ।

অনুবোধের দ্বারে তপেন তখন বলিল, “আগনি আমাদের ঠাকুরবাবার বদলী আগনি যদি ঐ রকম কোন্‌কোন, তবে আমরা আর এ পাক্কীতে থাক্‌ব না, নেমে অস্ত্র পাক্কীতে গিয়ে উঠব ?”

তপনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধটি এককাল হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা বাবা, তবে আমি আর কিছু বোল্‌ব না, এই চূপ্‌ কোরলাম ।”

সন্ন্যাস তখন বাগ্যবাহ্যর নিকটে সরিয়া গিয়া তাহার কানে কানে বৃহৎ স্বরে বলিল, “ওঁদের বলুন না কেন এই ঘানেই বোস্‌তে, ব্যাপার ত অনেক আছে । অন্তরিক্ত ওঁরা আমাদের ভক্ত ধাঁড়িয়ে থাক্‌বেন ?” এই কয়েকটি কথা বাগ্যবাহ্যরকে বলিয়া কেশরা তাহার স্তম্ভর মুখের উপর হস্তিনার হইয়া উঠিল ।

তখন তিনি তপনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “যে সন্ন্যাস ইচ্ছা যে তোমরা দুইজনেই বোস্—তাহার ত অসুখটি হবে না ; এই ত সন্ন্যাস

পাশে কত ব্যাপার রয়েছে ।” বিধি এদিকে একটু সরে আস ।”

“আমরা ত এতক্ষণ বোসে বোসেই আগনি ।” এই বসিয়া নীরব হইয়া পুনরায় তপেন হাসিল, “আগনারা দেখছি আমাদের না বলিয়ে চাড়াবেন না । তবে রবেন, সে একটু না হয় বলা থাক্ ।” তপেন নিজে গিয়া সন্ন্যাস পার্শ্বে বসিয়া পড়িল ।

তপেন সন্ন্যাস পার্শ্বে বসিয়া তাহার চুলের বিভিন্ন প্রকৃতি, কাপড়ের উল্লুখ শব্দ, অঙ্গভাষার সহ নিষ্কণ এককি অসুখ কহিতে লাগিল তাহার যোগ হইতে লাগিল সে যেন তার প্রাণের বৃদ্ধ মধুর স্পন্দন ও স্তম্ভিত পাইতেছে । কিছুকাল এই ভাবে কাটিয়া গেলে, সে বৃদ্ধের দিকে বুঝ কিরাইয়া দৃষ্টিপাত করিল, “বাবা মহাশয় আগনারা কোথায় থাকেন ?”

বৃদ্ধ এই বুকের পরকে আগনার করিবার ক্রমতা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আমরা বাব বাবা বর্ধমান ।”

সমিধয়ে তপেন বলিল, “আমরা ত হান্ধি বর্ধমানে—বর্ধমানের কোন স্থানে আগনারা থাকেন ?”

বৃদ্ধটি নিজের পশ্চাৎস্থান বলিলে, “তপেন রবেনের দিকে বুঝ কিরাইয়া দৃষ্টিপাত করিল, “চায়ে রবেন, বাবার বাসার কি বুঝ নিকটে ?”

তপনের কথার উত্তর দিয়া, রবেন বৃদ্ধের দিকে কিরিয়া করিল, “এদখাবার বাসার—তিনি আগনার কে হন ?”

“এদখ আমার তাইগো হয় বাবা ।”

“এদখাবার বাসা আমাদের বাসার খুবই নিকটে থাক্‌বে বাবার পেনেই সব আনতে পার্‌ব । এই বলিয়া সে বৃদ্ধ হাসিয়া অন্তরিক্তে বুঝ কিরাইল ।

পুনরায় তপেন দৃষ্টিপাত করিল, “আগনি কি বর্ধমানে বৈদ্যতে থাক্‌ছেন ?”

“না বাবা, এখানে বৈদ্যতার সব আর নেই—

সে সব সাধ কোন্‌দিন বুকে দিয়েছে।" এই বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কাপড়ের আঁত দিয়া চক্ষুকে মুছিয়া লইলেন।

"বুকেব এই কথা শুনিয়া তপনের মন সকাউপেণ হইয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, না আমি কত অকৃত্রিম বেবনা আমি এই বুকেব কবাকীর্ণ বুকের পাখরের মধ্যে লুকাইত আছি। সে তাঁহাকে আর কিছু প্রশ্ন না করিয়া বাড়িরে ফিরে চাহিয়া রহিল।

সকলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বুকেউ বলিতে লাগিলেন; যখন আমার একবার পুত্র ও পুত্রবধূ অতলে আমাকে খোক-কাপরে তালিহা চাচিয়া দেল—তখন সন্তান বদল তিন বদল। এই পিতৃ-মাতৃদ্বারা বানিকাকে লইয়া যখন ভাষা হাতে করিয়া আসিলাম, তখন আর সঙ্গারে মন বসিল না। ভাবিয়াছিল—সম্মুখে আর বিবাহ না বিয়া কবনের অবশিষ্ট তাল আমার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাকে রাখিব। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। সম্মুখিনে যিনে চক্করকার ভায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পরিশেষে নিজের প্রম এবং প্রকৃতির লোভা বৃত্তিতে পারিয়া আমি আর কাল বিলম্ব করিলাম না। চারিত্রিকে দ্বারের ভিত্ত অঙ্গুলতান করিতে লাগিলাম অথনখে বোমার পর লাইয়া বন্ধবানে বাইরেছি।

এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার মুখকাটা কথাগুলি পাকীর ভিতর রহিয়া রহিয়া কীদিয়া বেড়াইতে লাগিল। রমেশ ও তপন নির্ভীকের মত কেবল শুনি।

(৪)

বর্ধমান আসিতে আর বেশী দেরী নাই দেখিয়া, রমেশ মৌনতা ভাঙিয়া বলিল, "তপনে এইবার নামতে হবে; পোছপাছ করা থাকুক।"

রমেশের কথা শুনিয়া বুকেউ বিজ্ঞান করিলেন,

"হ্যাঁ বাবা, এবারে কি বর্ধমান?"

"এটার পরেই বর্ধমান ট্রেন—এখনও দেরী

আছে—তাঁহাড়াই কল্লার কোন্‌ দরকার নেই। ট্রেন এবে আধরাই……" বলিয়াই রমেশ পানিয়া পেল।

রমেশের কথা শুনিয়া, সম্মুখিনে মনিসম্বর স্তব্ধতা করিয়া বসে উঠিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া তপন মনিসম্বরে লবিক বলিয়া উঠিল, "এখনও দেরী আছে—আপনি অত ভাবছেন কেন? আমেরা থাকতে কি আপনার জিনিষ সব পড়ে থাকবে?" বলিয়া তালিয়া ফেলিল।

"না বাবা, এটা কি একটা কথাই কুলা হোন" এই বলিয়া বুকেউ জাপ খুলিয়া একবার তালিয়া লইয়া, তারপর উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তৎকাল তোমাদের সঙ্গে রইলুম অত তোমাদের কোন পরিচয়" লবিক নেওয়া হোল না। কি লজ্জার কথা! বুকেউ মাহুদ কিনা "সব সময় সব কথা মনে থাকে না।"

রমেশ তালিয়া ফেলিল, "আমার এই বন্ধুটার নাম শ্রীতপেন্দ্রকুমার বহু এম, এ। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উচ্চশিক্ষিত।" এই পণ্ডিত বলিয়া সে বেবন আরো বলিতে বাইবে, এমন সময় তপন উঠিয়া গিয়া তাহাকে একটি মুঠ খাটা দিয়া বলিল, "আর তোমার বেশী বাক্যে বোঝতে হবে না—ভের হোয়েছে, একটু শব্দ।"

তপনের এই পরিচয় শহিয়া বুকেউ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার পায়ের ছাড়া খুলাইতে খুলাইতে বলিলেন, "এহা, বহু তোমার পরিত্রাণী, মা কথাটা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু মলমল হইয়া উঠিল।

বুকের দিকে তাকাইয়া তপন করিল, "টনি ও আমার মধ্যে আপনার কাছে সাত কাহণ বোঝেন, কিন্তু আমার বন্ধুটিও পড়ে ফেলনা যান না, ইংল্যান্ড-সাহিত্যে এম, এ, ললিকার প্রথম স্থান অবিকার করেছে!"

বুই বন্ধুর লবিনেব পরিচয় পাইয়া বুকেউ আনন্দে

ক'লে' ভইয়া বসুন্ধর-পরে বসিলেন, "দাদা, আশীর্বাদ
তোরাহি, তোমরা চিরকালী'র হও। এই বকবের
শি'কস্ত না' হোলে' কি এমন প্রকার স্বভাব হয়?"

কথার কথাই কখন যে গাড়ী বর্ধমান ষ্টেশনের
প্রটেক্টরের মধ্যে আসিয়া চুকিয়াছে, সে খেয়াল
ভাঙাবের একেবারেই ছিল না। সন্তুকে উদ্ভূত
কথিতে দেখিয়া তপেন সন্নিহিত করিল, "এটা
কোন ষ্টেশন রয়েল?"

বাহিরে তাকাইয়াই রয়েল ঈজ কর্তে বলিয়া
উঠিল, "এর বর্ধমানই বটে। তপেন নীত্রির নীত্রির
ঠে—সব গোয়া—সব গোড়া।"

কুড়ট' বিহব লক্ষিত হইয়া বসিলেন, "বেশ দাদা,
ক'লে'র পাজির শোকে এখন তোমাদের কি অবস্থা?"
৬৪ বলিয়া হোঃ হোঃ করিয়া তিনি, দাদিয়া
উঠিলেন।

তপেন উত্তরে বলিল, "গাড়ী এখানে অনেককাল
থামে, সেজন্য আপনাদের কোন ভাবনা নেই।"

গাড়ী আসিয়া প্রটেক্টরে লাগিলেই, তপেন
হঠাৎকৈ বলিল, "তুমি সব জিনিষ পত্র দাদাবাবার
একাংশ কর—আমি এমেন্ট এক এক কোরে
লুণ্ঠাই।

"না দাদা, তোমরা আর তত সাহায্য করিবে;
আমিই বীর প্রহর সব নাশিবে নিজি।" বলিয়া
কুড়ট' চুল করিলে, সন্তু নিবেশের জিনিষ তুলিব
, তপেন তাহার হৃদ হইতে পুঁটুনিটা ছিন্‌দাইয়া
লইয়া, একপাশে ভাঙা বাঁহিয়া দিয়া বসিল,
"আপনাতা এখন মানুষ—বেশ্‌ছন ত কি বকবের
ভীড়!"

দাদিয়ারকৈ অস্ত্রের সাহায্যে নামিতে দেখিয়া,
সন্তু নিজে কি করিয়া নাশিবে, এই ভাবিয়া স
চিন্তিত হইয়া পড়িল। রবে আর অত কোন
উপায় বুঝিয়া না পাওয়া যেমন নিজেই গাড়ী
হইতে নামিতে দাঁড়াবে; এমন সময় তাহার দাদা
দেখিয়া তাহাকে সাহায্য করার কত আগ্রহ

হইবে; তপেন দাদা দিয়া বলিয়া উঠিল আপনি
আর থাকেন না—আমিই ওঁকে নাশিবে বিজ্ঞ।"
এই বলিয়া তপেন অগ্রসর হইয়া সন্তু'র ঘূর্ণানিলিত
বাহুলতাকে ঘরিয়া বীর বীরে গাড়ী হইতে নামাইয়া
দিয়া দিচ্‌ত কর্তে নিজায়া করিল, "আপনার কোন
কষ্ট হয়নি ত?"

সন্তু'র উত্তর শুনিবার অত তাহার তৃপ্তি কর
ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র একটা
'না' শব্দ শুনিয়া গুপ্ত হইতে পারিল না।

সে যে সন্তু'র নিকট হইতে এইটুকু কথা
শ্রুতানী হইয়াছিল, তাহা মনে। সে মনে মনে
কল্পনা করিয়াছিল, সন্তু প্রানের তাহার জববের
বক্তব্য তাহাকে জ্ঞাপন করিব, কিন্তু তাহার সে
আশা মিটিল না।

একে একে সমস্ত জিনিষ পত্র গাড়ী হইতে
নামাইয়া লইয়া ব্যঙ্গ-কর্তে রয়েল বলিল, "একটু
ভীড় করুক তপেন, তারপর যাওয়া থাকে।"

ক্রমেক্রমে লোকের ভীড় কমিয়া গেলে,
চাফিউ স্ত্রী'র মাথার জিনিষগুলি চাপটায়া দিয়া,
তাহারা সকলে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া বাড়াইল।

পাশেই গাড়ীর আশ্রয়ণ হইতে ছুটি গাড়ী
ঠিক করিয়া আসিয়া। তপেন কুড়কে উদ্দেশ্য করিয়া
কহিল, "মানুষ এখন গাড়ীতে উঠুন।"

কুড় গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, সন্তু দ্বার-
পাতিতে অগ্রসর হইয়া একবার তপেনের দিকে
প্রশান্ত-বৃষ্টিতে চাহিয়া, গাড়ীতে গিয়া কোন রকমে
উঠিয়া বসিল।

তপেন গাড়ীর নিকটে অগ্রসর হইয়া বিদায়
চাহিলে কুড় সুখ বাড়াইয়া সহজসুখে নিজায়া
বসিলেন, "কবে আমাদের দাদা'র আসিবে দাদা?"

ধিক দূরীতে সন্তু'র দিকে চাহিয়া তপেন কহিল,
"যে দিন আপনি যেতে বোলবেন, সেই দিনই
আমরা যাব।"

এই কথা শুনিয়া ঠাণ্ডা স্তম্ভে বসে মাথা তুলি'ত

হাইবে, ঠিক সেই সময়ে তপেনের দ্বিগুণ আশ্রয়
প্রদান করি। তাহার উপর ভর্য বেবিয়া, লংঘন করি
লক্ষিত হইয়া পড়িল।

অতঃপর ভববন্ধা বেবিয়া তপেন তাহাকে

উদ্দেশ্য করিয়া করিল, "তবে, আপনি ক'র
বোলেছেন না?"

তখনই তপিয়া লংঘন করি লক্ষিত হইয়া
ইষ্টিল। সে তৎক্ষণাতঃ আত্ম হইয়া পড়িল।
নিজের হইয়া বসিল।

(আশ্রয়ী বসে লক্ষ্য পায়)

কৈফিয়ৎ

(Emerson)

(ঈশ্বরালিঙ্গন প্রাপ্তি, এ)

(১)

তোমো না আমার নেহাৎ দাখিল হুনে,
বনে বনে আমি কেবলি বেড়াই বলি,
হেলোনা হেলোনা সত্য বাগাড়ে হুনে,
মিছে কিচি নাক মনসে অগি পলি।
ভাকেন আমার বনের বেহতা রানি
তোমোমেরি লগি বনের বাহতা আমি।

(২)

দ্বিগুণ নাক লগি বলিয়া আকোতো হুঁড়ে
ব্রহ্ম নহী ভায়ে কেবলি বেড়াই বলি
অতি বেদনানি চলে' বাহ হাই উড়ে
আমি সীমা হতে ব্রহ্মাই বাহ না চলি;
আমার বাহতার একটি করিয়া ভাগ
আমার লিখিয়া লিখিতে হয় হারা।

(৩)

বহা না আমার পরিজ্ঞান বহ,
অলপ হুঁড়ে এক ভাগদানি বলি

তোমো বলি এতে কি হইবে ফল?

বিশেষ লগিয়া এক হুঁড়ে কনি

ফল না ইহাও পুত্রে মেরি গড়া

এতি লগি কুট ভাগেতিয়া তরা।

(৪)

হেন হুঁড়ে নাই বাহতার মর্গ কোমে

গুঁড়ে হস্ত কিছু না বিদ্যে করে।

হেন পাখী নাই যে না পুটে ফলে গোমে

হস্তায় বাহতা মনের জড়িত তরে।

হেন পাখী নাই যে না কিছুতে বসে

আপন একটি ইতিহাস নাহি ঘোমে।

(৫)

কলস কলসে ভায়ে ভায়ে লুং বহ

বলবের লিখে তোমো'কুমির বাহা,

একটি কলস তোমো কাটাগা লতা,

আর একটি যে লুং করি আমি।

একটি পুষ্টিতে পুষ্টিত করে' লই,

সোনায় কলস জড়িত উঠে আই।

বংশের কলঙ্ক

(সীমন্তোৎসবের বন্ধ)

বিশেষজ্ঞ শক্তিচন্দ্র

অমিনার সিদ্ধান্ত

সরোজ বাবা তা ক'রতেনি তাহাই বল। বাবাকে একদিন কালীশঙ্কর বাবু কাণে অকপের কলঙ্কের কথা তুলিল এবং তার বেবাইল-ব-তিমি ব'লি তাঁহার কোনও একটা বাছিতে তাঁহার "গৌড়" ও "গৌড়ের জননীকে" থাকিতে যেন ও দাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া কেন, তবেই মঙ্গল, নচেৎ বাপার আশাপত্ত পর্যন্ত পড়াইবে।

কালীশঙ্কর বাবু হতভম্ব হইলেন। প্রথমে বাপারটা হাশিমা উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাবাজীর উক্তবাক্যের চড়া কথা শুনিয়া প্রকৃতই ভীত হইলেন। বাবাজীকে বিদায় করিয়া বলিলেন বটে, কিন্তু মন অত্যন্ত চিন্তাকূণ হইয়া রহিল।

কালীশঙ্কর বাবু সরোজকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, সরোজ বহুদেব স্নানক হইলেও অনেক পরিণত বয়স লোক অপেক্ষা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। সরোজকে তিনি বাবাজীর কথা বলিলেন এবং কি করা উচিত ভিজ্ঞালা করিলেন। সরোজ মধ্য হুড়িলে পড়িল। সে তাঁহার কুকাইল বটে যে, বাবাজী যেটা ছোটলোক পাঞ্জী, এর কথা সব মিথ্যা, অকল কখনও এমন কাম করিতে পারে না, ইত্যাদি, তাহাশি বাবাজীর কথা মিথ্যা ইহা প্রমাণ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারিল না। সর্বোচ্চ কুকাইল, বাবাজীকে আগাততঃ কিছু টাকা দিয়া থাকে তাহাই উচিত, তাহার পর অকল কিছিয়া অগিলে কোকাপাড়া করা বাইবে; তবে আগাততঃ এ বিষয়ে লেবালিবি করিয়া অকলকে ব্যত করিবার আবশ্যক, নাই; ব্যত করিলে সে যে

কাওটা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিবাহে, সেটা নষ্ট হইয়া বাইবে; তবেসেইও এই মত।

বংশের নাম স্তম্ভিবাচার কালীশঙ্কর বাবু চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ক'র মত?"

সরোজ বলিল, "বংশের? কেন, বংশের জ্ঞান ক'রাই বসেছে?"

কালীশঙ্কর বাবু বলিলেন, "না, তা বলাই না, তা বলাই না, তবে বংশে বংশে, তাই কেমন সম্বন্ধ হয়। বাবু, তোমার কথামতই এখন কাজ করি, তার পর মক্স এলে বা হয় করা বাবে। বৃদ্ধি এতে লাগকে প্রায় বেগুয়া হজে, তবে উপায় নাই।"

সরোজের মনটা ই কথা শুনিয়া অবিবেচন একটু সম্বোধন হইয়া রহিল। বংশের কথা ও বাজীর কোমলি এমন ভাবে বলিলেন কেন? বাপার কি? একখানা চিঠি লইয়া সে অবদরিত নাড়াজা করাতে লাগিল, আর এই কথা যেন তোড়াপাড়া করিতে লাগিল। একবার অকুট হয়ে বলিল, "বাই বেবি, আমিলাকে একবার দেখাই, যদি সে কিছু বুঝতে পারে।"

অমিনা বাসানে একটা কুন্ডের ভিতর প্রোথ-বেথিতে বসিয়া পড়িতেছে, অমর প্রবৃত্তি এই সংগ্রহ অবদর হইয়া সরোজ ক্রটিগণবিক্রমে তাহার উপস্থিত হইয়া বসিল অমিনা কুন্ডর হইয়া একখানা পত্র পাঠ করিতেছে। সরোজের পায়ে দাড়া পাইয়া অমিনা চিঠিখানা সুকাইয়া কেমিয়া উঠিয়া থাকিয়া। সরোজ বলিল, "এই যে অমিনা, আমি তোমাকেই বুঝিলাম। বেশ বেশি, এই গল্পখানার মর্ম বুঝতে পার কি না?" এই কথা বলিয়া সরোজ আসের উপর বসিয়া পড়িল।

পত্রখানি হাতে লইয়াই অনিবার্য সুখখানি
হালা হইয়া উঠিল, সেখানি অল্প লিখিয়াছে।
পত্রখানি এই :—

আই সরোজ,

এতক্ষণ একটা সুখের বন্ধুকে দিলে কি কিছু
কতি হ'ত? অগ্নয়ের কাছে এ সুখের ধর আসে
গেতে হ'ল, এই সুখ : থাক, সুখী হও তাই,
তপস্বান যে অমূল্য দান তোমার বিচ্ছেদ, তপস্বী
হবে লোকে তা পায় না। বন্ধুর আন্তরিক দয়া-
ভূতি কেনো। বেশী লেখবার সময় হ'ল না।

ইতি তোমার কৃতজ্ঞা

অল্প।

অ'নন্না চিঠিখানি দুই তিন বার পাঠ করিল,
বিশ্বয়ে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।
অগ্নয়ের সে সুস্থবৎ বলিল, "এখানি আবার কানে
ছবিন তাৎপবে সরোজনা? পরে ভাল ক'রে পড়ে
জ্ঞাপ্য হেবো।"

সরোজ এগিয়া বলিল, "এখানি তোমাকে
একবারেই দিলুম। বার মাথা হুত্ব কিছুই
বুজলুম না, তা যেনে কল কি।" এইবার সরোজ
হঠাৎ গভীর হইয়া বলিল, "নাহ তোমার সঙ্গে
আবার খোলাখুলি কিছু কথা আছে বলেই ঐ
চিঠির ছুতো করে এসেছি। আশা করি আবার
কথাটা মন দিবে তখনে।"

অনিলা ভাটিকিতমনে সরোজের বিকে
মিজাপু হইয়া তাকাইয়া রহিল। সরোজ ঘরে ঘরে
বলিল, "অনিলা, তোমাকে আমি এর আগে
ম্যাপ আর কটোর সঙ্গে অল্পের চিঠি কৌলন
ক'রে বিরোধিলুম কেন জানে?"

অনিলা থাক হেট করিয়া পাতের আঙ্গুলে মালি
খুঁটিতে লাগিল। সরোজ বলিয়া বাইকে লাগিল,
"বিরোধিলুম, আমি তোমার মন আনতে গের-
দিলুম ব'লে।"

সরোজ আবার খুঁটিত পারিগ,

কি বুদ্ধিমত্তা, কুশি প্রশিক্ষিতা, নিজের ভাগ স্ব-
বোধবার তোমার যখনে ক্ষমতা হেবেই বলেই
মনে করি। সুতরাং নিতান্ত লিখাশীল। তরল চিত্ত
বালিকার মত লজ্জা করে নিজের ভাবিগ্ন মনো-
পথে কাটা দিয়ে না, এই আবার অসুখো।

অনিলা অশ্রুটখরে বলিল, "কি বল' সরোজনা,
কিছুই ত' বুঝতে পারছি না।"

সরোজ বলিল, "একে একে সব বোঝাবি।
প্রথমেই বলে রাখছি, তোমার পক্ষে বড় তপস্বী
সমস্তার সময় এসেছে। এ সময়ে বালিকা স্মৃতি
লজ্জা করলে সব বিকে মারি হবে। সেখ, অল্প
আর তোমার পরামর্শের প্রতি মনের তাগ কি, তা
আমি জেনেছি।"

অনিলা একবারে মালিতে সুখ লুকাইল।
সরোজ আবার বলিতে লাগিল, "কিছু তোমাদের
চক্ষনেরই ঘোর বিপদ উপস্থিত। কি জানি কে
অল্পের নামে গোপনে নিষাদবাব ক'রে কালা-
বান্ধু মন ভাবিয়েছে। তাই কালাবান্ধু অল্পের
উপর ভাগ ক'রে তোমাদের চক্ষনের সজ্ঞান করতে
একত হ.২০২, তিনি তোমাকে রমেশের হাতে
বেধেন ব'লে ছিঁড় করেছেন।"

অনিলা চমকাইয়া উঠিল, তাহার মুখে সোখ
একটা থাক' সুখ ও অবজার তার মুটুয়া উঠিল।
সরোজ লজ্জা হইল, বলিল, "আমি তাঁকে নিরস্ত
কইবার এক চেষ্টা চেষ্টা করছি, কিন্তু সব বিফল
হয়েছে। তিনি এখিনেই ছিন্নপ্রজিহ্ব। তাই
বগ্জিলুম, এগিয়ে একটু দূর হ'তে হবে। আচ্ছা,
সে এসবের কোথায় অসানা অনেকো বিবেচন করলে
প'ড়ে যাবে, মাঝখা দেবার তাকে দেউ নেহ,
সে জানেই তার আশা তরঙ্গ সব লিপ্ত হ'য়েছে,
এসবের বহি লজ্জা ছাড়তে না পার, তাকে একটা
আশা দিতে না পার, তা হ'লে তোমাদের দুটা
জীবনই ভেঁকেলের এক নষ্ট হয়ে যাবে। বল তাকে
নিষেধ দিহ?"

অনিলা কোন কথা ক'রল না, কেলে বসভাষার হইতে একবারি পত্র বাহির করিয়া সরোজের হাতে দিল। সরোজ বিম্বিত হইয়া পড়িতে পারিল না—

সিখাস মিল, শড়িলা, আগাম।

সেহের ভগিনী অনিলা,

গোবর এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত বিম্বিত ও চমকিত হইবে; কিন্তু সবাই বিম্বিত হইবার কিছুই নাই। তোমার আবার ডাক্ষ সাফা না আলাপ না থাকিলেও আমি তোমার সাগ দ্বিন সাত চৌধের সম্মানে দেখিতেছি। তাই, দম-কম্বুয়ে ধীরে নিঃশব্দেই সরোজমা ভগিনী ছলম, না হইলে তোমার বিকে, এই মন টানে কেন? মোন, তোমার কর্তব্য দেখার কামতের আশা দিয়া যে কি সুখী, কর্তব্যের, তাগা বসিতে পারি না। তুমি আর অপতপ, ধ্যান জ্ঞান, ইত্যাদি প্রাণের দেহের অধিক, সেই পুরুষজ্ঞেয় দেখার কতক ভাব তুমিই আবার বিচ্ছিন্ন, ইচ্ছাতে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

কিন্তু তাই, তুমি সাগা না করিলে আমার মোতা ত' সম্পূর্ণ কামত করিতে না। সগার কথার আশায়ে বুঝিবার, তুমি তাঁহাকে ভাল-বাস, কিন্তু তিনি ত' তাহা কিছুই জানেন না। সর্গদা বুঝিতে পারি তিনি সাগার অগ্রব অসুস্থত করেন, আর সেই অগ্রবে সাগর যখন জ্বরে পোষণ করেন। কাজ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হন, তাহাতে তাহাতে উদ্ভাসের মত একবিভে চলিয়া যান। কখনও মাহ ঘরিতে কখনও বা নিকায়ে গিয়া অনেক সময়ে করিতে চেষ্টা পান। ভগিনীর মেহ দিয়া অ বি গেই সম্ভাব পুণ্যইব কিস্তে?

স্মৃতি আর এক গুস্তীনার কাহন হইয়াছে। তোমাদের কখনো কখন না কে আছে, সে তাঁকে একবারি চিঠি লিখেছে। সত্য হউক বা মিথ্যা

হউক, সে মিথ্যাকে যে সরোজের সহিত জোবার বিবাহ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এটা কি সত্য? এই খবর পাইয়া তিনি একবারে বেগার মত চমক-হেন। আদে মন্তে থাকে নিকায়ে বাইতেন, এখন মোটেই ঘরে থাকিতে চান না, প্রত্যহ নিকায়ে যান। স্মৃতিতে পাই, এখন একবারে জীবনে সম্ভাবিত হইয়া জগনের মধ্যে বেচান।

আর কিছু বলি না। যদি বসার্থ ভালবাস, তাহা হইলে যেমন করিয়া হউক তাঁহাকে জানায় যে এই বিবাহের কথা মিথ্যা, তুমি তাঁহার যে 'নিলা' আজ কাহাই আছে। কতদিন ভবিষ্যতি, তাঁহাকে ঘূমের খোরে 'নিলা' বলিয়া ডাকিতে। তুমি কি তাঁহাকে সেই 'নিলা' থাকিবে না?

ভগিনী, তুমি কত ভাবাবতী, তাহা গোবর বুঝিতে না। ভগবানের আশার দ্বারা যে অমূল্য জ্ঞানের সর্গদা যান এহেন অধিকারিণী হইয়া, তাহার জ্ঞানার জগতের মঙ্গল সম্পাদি হুজ। েই মান কি তুমি মোলায় কাহাইবে? আশীর্বাদ করি, এমন গুস্তীনা যেমন তোমার না হব।

ইতি তোমার বসলাকারিণী

সেহের ভগিনী বৈখিণী।

[এতটুকু পুঙ্খবস্তু কোঠায়ের কাজ]

পত্র দেখ করিয়া সরোজ অধিক ভবিত ও দীর্ঘত হইল। পড়ে বীরে বীরে বলিল, "আমি একটু একটু লেখের করেছিগু। কিন্তু কখনো এত দীর্ঘ তাঁত জানতুম না।"

অনিলা "আমি অনেক দিন থেকেই জানি।" সরোজ বলিল, "তা হলে এই বিবাহের বিষয়ে কখনোই কারো-নি ংশই আছে। বস অনিলা, কখনো লসে বিবাহের মত দেখে না।"

অনিলায় সস্তী: সুব আদর সস্তী: তাব দায়ব চলিল। সে সরোজের সুখের পানে পূর্ণহৃদয়ে ডাকাইয়া দীর্ঘ সস্তী:রম্বরে বলিল, "তোমার কোন কখনক বিভাটাই হবে না, সরোজমা।" অনিলা দীর্ঘ

পার্বকেশে ঘাট চলিয়া গেল সোণের মধ্যস্থি
হস্তিতা নারী মুক্তি দেখা বিস্তৃত প্রান্তর হইয়া
গাড়াইয়া রাখিল।

এক বংশতি পরিচ্ছেদ

মৈথিলীর শেষ বাসি

অরুণ বিনায়ককে তাহা দেখিতে পাইল না।
আজ কয় দিন হইতেই সে বিনায়কের সম্ভাব্য
ধুতটী পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছে। পূর্ণের প্রাণ
বিনায়ক তাহাকে দেখিলে আর ত্রেনন হাসিয়া
সজ্জ্বল করে না। তাই বিনায়কের প্রতি একটা
বোকা পাড়া করিয়া তাহাকে দাড়া করিতে অরুণ
বাক হইয়া উঠিল।

আজিও বয় অরুণ বিনায়ককে দেখিতে না
পাইয়া জিজ্ঞাসাবাদে আসিল, বিনায়ক কাজ
করিতে করিতে উত্তীর্ণা বাগর দিয়াছে। অরুণ বাক
হইয়া, বলিল, “কি হয়েছে তথায় লিখা বিনায়ক
অজ্ঞান করেছে?”

বিনায়ক তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া
ডুইল। অরুণ তথানি তাহার মধ্যপার্শ্বে গাড়া-
ইয়া সঘোরে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দেখিতে গেল;
বিনায়ক সবলে তাহার হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।
অরুণ বিম্বিত হইল বটে, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইল না, সে
বরাং হাসিতে হাসিতে চাহবদানা টানিয়া ফেলিয়া
দিয়া বিনায়কের হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া
বলিল, “নাও, নাও, পূর্ব অঙ্গন করেছে, চল
দেখ একটু কাজ করিলে বা নাহি করিলে! কুকেমি
করেই শরীরটা খেলে।”

বিনায়ক তাহা শুনিতেবিল। সে বলিল,
ঘাট আর দূর দেখাতে হবে না।”

অরুণ ভবিত হইল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল,
“বিনায়ক, তাই, তুমি কি জল বিখাল করেছে বুঝতে
পারছি না। আমারে খুলে বল, আমি তোমার
বন্ধু, আমি তোমার ওই, যদি আমার দ্বারা তোমার

হঃন দুব চক, আমি তা জানি নিজে জোড়না।”
অরুণ আশ্রয়তর বিনায়কের হাত ছুঁই দুই হাতে
ধরিয়া ফেলিল।

বিনায়ক চকু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে
স্বাভাৱে বলিল, “করবে? সতি বলছ কবে? তুমি
পাড়া দাঁড়া দেখা। কখনও বল না তা জানি।
তাই জিজ্ঞাসা করছি, বা বল, তাই করবে?”

“নিশ্চয়ই করবে।”

“তা হলে এখন থেকে কাঁচ ছেড়ে চল ঘাট,
আবার আমার ঘেঁষে পাতি আসতে দাও, আমার
মৈথিলীকে আমার দিগন্তের দাঁড়া।”

অরুণ উত্তেজিত হয়ে বলিল, “বিনায়ক, বিনায়ক
পাশ্চল্যের মত কি বলছ? মৈথিলী? মৈথিলী যে
আমার কোট পোশাক, আমি যে আর দাঁড়া, আমি যে
তাকে গাড়াইবার মত ভালবাসি। তুমি কি এই
মন্তব্য আমার উপর রাখ কেঁওৎ? হিঃ হিঃ!”

“না, না, এখন থেকে তোমার চল যেতে হবে,
না হলে মৈথিলী পাতি পাবে না, আমি পাতি পাব
না।”

অরুণ এইবার বধ্যবর্ধি উত্তেজিত হইল। সে
ক্রোধেরে বলিল, “বেব, আমি বাব না, অনেক লক্ষ
করেছি, কিন্তু আর কোংবা না। আমার ল
হচ্ছে তাই বল, আমি লক্ষ করে বাব, কিন্তু মিথ্যা।
সেই মন্তব্য বাসিতার মধ্যে বা তা বলছ কেন? সে
আমার দাঁড় পোশাক ভাঙের মত ভালবাসে, বর করে
তুমি কেন লক্ষেরে বেনার উজ্জ্বল হয়ে বা না তাই
বলছ।”

“ও, এই দেখ, তার কথা বলতেই পাবে
লগেছে। তুমি তও, মিথ্যে, তোর একটা কথা
মতি না। তুমি মৈথিলীকে কেড়ে নিবি কেবে-
হিল? এখান থেকে না, তার আসে তাকে পূর্ব
করে বাব।” বিনায়ক এসটা প্রকাশ্যে দৌড়—মস্তি
ফুলনা লইয়া অরুণকে ধারিবার তরিতে গাড়াইয়া
হইল, তাহার চোখ মুখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া
শক্তিতে লাগিল।

উৎসেই যমুনাতেই একটা কোমল বাতলতা
অকস্মেৎ বক্ষ্যেই কথিতা যমুনা বক্ষ্যেই বত অকস্মেৎ
শিখ হইতে আচ্ছাদিত করিয়া বহিল; চন্দ্রী চকচক
ময়ন ভীতিবাক্য কাতর দৃষ্টিতে অকস্মেৎ যমুনাকে
ত'কাইল এবং পরমুহুর্তেই সেই দৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়া
বিনায়কের উপর নিপতিত হইল, সেই দৃষ্টিতে যুগা,
অবজা ও ক্রোধের চিত্র স্পষ্টই একত্রিত হইয়া
উঠিল।

অকস্মেৎ বিনায়কের শিখর অপসারিত হইতে
না হইতে বৈশিণী কঠোরস্বরে বিনায়কে বলিল,
“বাগ, এখনই কাজে বাগ, না হলে বাগকে যেন
তোমার জীবন খেঁচায়।” বাগ, এখনও দাঁড়িয়ে
রইলে যে?” বৈশিণী তখন অকস্মেৎ দাঁড়িয়া
একটু তল্লাতে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহার
সরুজ ঘর ঘর করিয়া ঝাঁপিতেছিল। বিনায়ক
ক্রোধে বর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অকস্মেৎ বৈশিণী নীরব হইয়া রইল। পেষে
অকস্মেৎ বৈশিণীর একখানি হাত ধরিয়া বলিল,
“বৈশিণী, ভাবছ কি? পাগলটার কথা শোন কেন?
তাঁকে জুতে বেরাচ্ছে। চল—”

বৈশিণী তাহার কথা শেব হইতে না বিয়া যাত্রা
ভাবে বলিল, “আমার একটা অমৃতোষ রাখবে?
এখান থেকে এখনই চলে যাও। আমার মাথা
বাগ, এখানে আর একদিনও থেকো না, ‘জল বা।
কাজ বড়, না আশ্রয় বড়? বল, বাবে, বল?”

অকস্মেৎ হাসিয়া বলিল, “আপনার তবে মালাতে
হবে? এ আপনাদের মাথা আমি বড় রাখি না—”

বৈশিণী শুভ সুখে বলিল—“তুমি না রাখতে
পার, কিন্তু তোমার প্রতীকার কত আশা ক’রে
একজন বলকাতার রেখে। অমৃতোষ তোমার
মিলাত সুখ চেয়েও ত’ তোমার মাথাখান হওয়া
উচিত।”

বাগ সেই মুহুর্তে অকস্মেৎ তাহার আকাশটা
ভাঙিয়া পড়িত, খোঁচ হর তাড়াত্তেও অকস্মেৎ এত চম-

কিত হইত না। নিলা! তাহার নিলা! নিলায়
কথা বৈশিণী জানিল কি প্রকারে? গলা ত’
তাহার অস্তরের তলা জানে না, গলায় নিষ্ঠা জানে
ত’ লজ্জা নহে। তবে কি হইল! বিস্ময়ে অকস্মেৎ
অন্যতাল গুহ হইয়া বহিল। পরে একটা সৌন্দর্য
মাগ কচিয়া বলিল, “বৈশিণী, খোঁচটা আবার,
সে লব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। কোথা হ’তে কি করে
তুমি এ সব জানলে জানি না। তবে যখন যেনেছ,
তখন বলছি শোন, এ অমৃতোষ আর বেশে কিছু
থাক না।”

বৈশিণী উত্তেজিত স্বরে বলিল, “বাগে না?
আমিও বলছি শোন, তুমি নিষ্ঠার কিংবে থাকে,
আবার স্নেহের সুখ বেগবে। এ বসি, মিথো হর,
তা হলে জানবে বর্ষ মিথো অগ্নি মিথো, দিন রাত
মিথো।”

অকস্মেৎ বৈশিণীর উত্তেজনার ভাব বৈশিণী উদ্ভ-
রেস্তর বিশিষ্ট হইতে দাখিল, বলিল, “কখন ক’রে
এ আশা বিচ্ছ জানি নি, কিন্তু তোমার কথা শুনে
আবার যেন যেন আশার আলো বেগতে পাচ্ছি।”

বৈশিণী এককণে কৌণ হাসি হাসিয়া বলিল,
“বা বলছি, তা কখন মিথো হবে না। আমার
ঘরের মধ্যে কে যেন এসে বলে বিচ্ছেদ, তুমি যা
শুনেছ তা ভুল, তোমার নিলা তোমারই সুখ চেয়ে
আছে, এটা তুমি ঠিক জেনো।”

বৈশিণী আর দাঁড়াইল না, বীর পাখি:কলে
অকস্মেৎ দিকে চলিয়া গেল। অকস্মেৎ বিশিষ্ট ও
ভাঙিত হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল।

তারপর অকস্মেৎ একদিন বাহু ধরিতে
বসিয়াছিল। একটা কলসেবে সে মৌক্তিত হইয়া দ্বিপ
কেনিয়া বিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল! সে বৈশিণী, লুখা
পাশি চেননা পাগলকে গলা টিপিয়া তাড়াইয়া
লইয়া আসিতেছে এবং দ্বাত্তম দ্বিগ এটা যেস্তর
হুঁকি বিয়া চেননাৎক লপাশি বারিতে মাঠিতে,
অগ্রসর হইতেছে। অকস্মেৎ মিথো তাহার

চেমনাকে উৎপীড়ন করিতে বিহত হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বলা, আমি চেমনা ঘোড়ের বাগার বসিয়া কোঠারের মেঝেতে চুপি করিয়া লইয়া বাইবার পরামর্শ আঁটিতেছিল, যোরে তাহাকে “আবু”র ঘর হইতে পিছু ও বন্ধু চুপি করিয়া আনিতে বলিতেছিল, লুৎর পাণি ঘোড়ের ঘরের বেড়ার পানে লুকাইয়া সব কথা শুনিয়াছে। সেই তিন দিনের মধ্যে চেমনা তাহার গালক মলমল লুইয়া গায়ে কোঠারের বাঁকী চড়াই হইবে, এইরূপ ঘির হইয়াছে। লুৎর সেইমত চেমনার সব পত্রিত্যাগ করে নাট, অল্পকণ তাহার উপর নম্র রাখিয়া ছিল এবং বাস্তব ঘিরিকে “আবু”র ঘর ত্যাগ কর্তব্য এখানে পাঠাইয়া দিয়াছিল। “আবু” যখন মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সময়ে চেমনা লুকাইয়া তাহার বাগার বন্ধু চুপি করিতে দিয়াছিল। তাই তাহাকে ঘরীয়া আনা হইয়াছে।

অল্প দুই মাস চেমনার বিকে ঘুগার দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিল এবং চেমনাকে লুকা করিয়া কোণতরে বলিল, “আজ এই দুই মাসে নই পার হ’রে বেশে চলে যাও। এখানে আজ সন্ধ্যার পরে তোমার যদি দেখতে পাই, তা হ’লে তোমার কুহুদের মত কলি ক’রে মারিব, মেনে রেখো।”

ঐক সেই সময়ে ঘোরে ঘটনাবলে উপস্থিত হইল। কোণে জ্ঞান হারা হইয়া বস্ত্র বহিষের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “আবার চাকরকে তাড়ানোর জুনি কে? ও বাবে না, ও করখানার চাকর নয়।”

অল্প বলিল, “করখানার সম্পর্কে চোর বহ-মায়েল লোক রাখবার কোন দেখাপড়া নেই।”

ঘোরে নাসিকা স্ক্রীকিত করিয়া বলিল, “আনি বস্ত্র বিন থাকবে, আবার চাকরকে তাড়ানোর ক?”

অল্প ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “আর তোমাকেই যদি আজ তাড়িয়ে দিই?”

ঘোরে বাগে ছুটিয়া বলিয়া উঠিল, “ইন্স লগা-চোড়া কতক দেখ।” যেন বহু মিনি এলেন আর কি।

“মনিব ত’ বটেই; মনিবও যিনি, মনিবের ছেলের তিনি” এই কথা কবী হঠাৎ কোবল কানিনী কর্তে উচ্চারিত হইল। সবলে চমকিত হইয়া লুকাতে চাহিয়া যেখান বৈধিনী একটা ঘরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া বাঁকাইয়া আছে।

“মনিবের ছেলে? কে পে?”—ঘোরে বিশ্বাস বিচারিত নৈয়ে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

বৈধিনী ছই একপন অগ্রগর হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “এই যে তোমার লাস্বে বাঁড়িলে রয়েছেন দেখতে পাছ না?”

অল্প প্রবলতা হস্ততপ হইয়া সিঁদাছিল। “এই বাব বলিল, ‘মা: বৈধিনী, কি যে বাতা বল! বাব।’

বৈধিনী তাহার কথার জবাব না দিয়া বীর সজীর হয়ে বলিল, “তোমরা শোন। বাবে তোমরা প্রবুর নিম্নক তথ্যক কর্তব্যের ব’লে জান, তিনি প্রবুর একমাত্র সন্তান, এই কারখানার ভারী মালিক, প্রবুর সমস্ত বিষয় আপদের মালিক, তিনি কেবল কর্তব্যের মেয়ে লুকিয়ে এগে কাজ দেখেই। সুতরাং ঘোরে! মেনে রাখ আর এক গাধি বেশ পার্শ্ব করলে তোমাদের মলম হবে না।”

“এটা মনিব? মনিব? সাধেব যে শিশুর আসছে—” এই কথা বলিতে বলিতে ঘোরে হঠাৎ স্তম্ভ পদে কারখানার বিকে ঢলিয়া পেল। অল্পের ইমিতে আবরণ্যত স্থান ত্যাগ করিল।

অল্প ডাকিল, “বৈধিনী!”

অল্পমবনোদয় হর্বোর পানে তাড়াইয়া বৈধিনী বলিল, “কি বলছে? ক’ন না?”

অল্প কপট কোণের ত্যাগ করিয়া বলিল, “আবার ভাব করে কথা কইছ না, আনি মনিব?”

“সত্যিই ত’ ক’নবা, তুমি মনিব।”

নৌদুর্ঘটমিণীরা দু'বে চোখে একবার দেখে হাসি
 ছুটল উঠল, সে অতিশয় স্বপ্নে বলিল, "এসেছে
 তোমার পেলুস না। প্রাণাধিক, আশীর্বাদ কর,
 কেন এক কক্ষান্তরে তোমার পাই। কই বাবা কই,
 বা কই? তাঁর দব এসেছেন? সকলকেই প্রণাম
 করছি। এ কি! চারিখিক আবার হ'বে আসছে
 কেন? আমি যে কিছুই বেগুতে পারছি না, এই যে
 তোমার সুখ, এই যে তোমার চোখ। এগ, আরও

গরে এস, আমার মাঝার তোমার পায়ে
 দুশো দাঁড়—

স্বপ্ন-প্রতিভা ঢলিয়া পড়িল। অস্ত্রকণ্ঠদুটি
 অকপের বেষ ক্রন্দনের খেপে খর খ। করিয়া কাঁপিতে
 লাগিল। গহীর পদনগের ক্রন্দনে আকাশ খেদিয়া
 ছাইয়া গেল। বৃদ্ধ কোঠাঘরে দম্পতী বধন ল'য়ে
 অকপের নাথ বহিরা তাকিল, তখন অকপের চেতনা
 হইল। [ক্রন্দনঃ]

কবে

(শ্রীদীনা দেবী)

কবে আমার কালের বোকা
 নামিরে মেঝে তোমার পায়ে?
 কবে আমি চ'লবো মোকা
 এড়িয়ে বীকা পথের ভায়ে।
 গলে গাঁথা মোর মালা বানি,
 বেধ হ'বে কোন কুন্তল আনি',
 ক'বে আমার দিলবে ছুঁনি
 দুজু হবো সকল হারে।
 গানের মালা ধরনা যে দেখে,
 তোমার গলায় কুলাই না বেশ

বতই পাখি দুয়ার কুন্তল
 রয় যে সূতা অনেক প'ড়ে।
 কোন বলন্তের অপধে কুলে
 মালায় গাঁথা সূতার কুলে—
 —দিলিরে বিয়ে মালা তোমার
 গড়িরে বেণো গলায় পরে;
 কবে আমার গহন হ'বে,
 ও সুখ চেয়ে রইতে ভবে
 কাজের শেষে কখন ল'বে
 আমার এ কার তোমার কারে?

দানপত্র

(গল্প)

(১)

(শ্রীকীর্ণনাথ পাল)

বৈশ্যবের অপরাজ; সূর্য্যোদয়ের আর সে কল্পনুটি
 নাই। প্রাণের আকাশের কোণে ছিন্ন বেধ
 - পূজীকৃত হইবার আয়োজনে ইবৎ ফেল। বাতাস
 সুর প্রদ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবানীপুরের

এক গৃহ-প্রান্তে তরল অধ্যাপক অক্ষয়নার কি
 একখানি পুস্তক পড়িতে পড়িতে পাখগায়ী করিয়া
 বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার গল্লবদ্বার
 স্নাতু-পুর প্রবীণ কোথা হইতে দেখানে ছুটিল

আসিয়া বলিয়া উঠিল, "কাকাবাবু, পেচাটাটা পেড়ে
নাও না?"

বুড়োত অকণক্ষমার হই হইতে মূখ তুলিয়া
পাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পেচাটাটা পেড়ে
ত। দাঁড়া দিচ্ছি পেড়ে।"

স্বশীসের অনন্য হেমলতা বাৎসব বলিয়া
তরকারি কুট্টেছিলেন, তকে আসিয়া দাঁড়াইয়া
হাতোচ্চল মূখে বলিলেন, "ঠাকুরপো তোমার
এখনও হেমলতাবুই গেল না? স্বশীপ বলিলে আর
তুমি এখনই পাছে গিয়ে উঠেছ। তোমার একজন
ছান যদি দেখে ত কি বলে?"

অকণক্ষমার পেচাটাটি হাতে করিয়া সাহ
হইতে নামিয়া স্বশীপকে দিয়া কহিলেন, "দেখলেই
বা, তাগা তাপের শুকতে বেশ চেনে, কতদিন
তাদের সঙ্গে করে বাগানে বেড়াতে গিয়ে তাপের
পাছ থেকে কত কি পেড়ে বিয়েছি।"

হেমলতা বলিলেন, "তির্যকালটা এখনই করেই
কাটায়ে ঠাকুরপো।"

অকণক্ষমার দখলভব গজীর হইবার চেষ্টা করিয়া
বলিলেন, "কি করব বৌদিদি, তোমরা ত আর
গিয়ে থাকবা দেখে না।"

হেমলতা তাঁহার মূখের দিকে চাহিতেই তিনি
হাসিয়া কেলিলেন। সে হাসির অর্থ হেমলতা
বুঝিলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাকিতে ছিলেন
না। বিবাহের কথা উত্থাপন করিবার এই ত
অবসান। প্রহুসমূহে বলিলেন, "তোমার দাবা ত
তোমার বিরর জতে বাত হ'বে পড়েছেন। তুমি
পাছে বৈকে বল, এই তাঁর তর, তা হ'লে আমি
তাকে এখনই বলে আসি।"

অকণক্ষমার হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কপেছ
না কি বৌদিদি। তোমার সঙ্গে দেখি তাহা
করাই স্বকমার হ'য়েছে।"

হেমলতা বলিলেন, "যদি তোমার ত কথা
কলতি না। তাকে গিয়ে এখনই বলি।"

অকণক্ষমার ছই হাত মোড় করিয়া বলিলেন,
"তকে কর বৌদিদি।"

হেমলতা বলিলেন, "বা রে, তুমি কি আইবুড়া
কারিক হ'বে থাকবে না কি, না তা কিছুতেই
হবে না।"

অকণক্ষমার বিনতিভঙ্গ্য দৃষ্টে তাঁহার দিকে
চাহিয়া বলিলেন, "বেশ আছি বৌদিদি, সব করে
কেন একটা বোঝা বহে:ত দাব।"

হেমলতা বলিলেন, "গলাবে থাকে:ত বেলে
এ রকম বোঝা ো বহে:তেই হয় ঠাকুরপো, না
হ'লে সংসার বে অসল হ'বে যাবে। এখন ত
তোমার আর আপত্তি করবার কিছু নেই। নিজের
তোমারের টাকার এই বাড়ী কিনেছ—বাড়ের
কিছু টাকার জবেছে। এখন যদি তোমার সন্নি
হবেন, তাকে ত আর বাওয়া পরার কষ্ট পেতে
হবে না।"

অকণক্ষমার বলিলেন, "এ কথা তোমার না হয়
মনেই নিশান, তাই বলে কোথাকার এক পরের
ঘরে এসে থাকবা হাকানা দাবাবে বৌদিদি।"

হেমলতা হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো তুমি ত
কম লোক নও। তোমার পেটে পেটে এক।
পুরিয়ে কিরবে আনাকেই কথা বোনান হ'ল,
আমিত ত পরের ঘরে—আমি তোমাদের বাড়ী
এসে থাকানা বাহিয়ে:তি এই ত কথা। কিন্তু
আমিও তোমার সংসারে ছাটি না, কি থাকনা
বাহিয়ে:তি তা আমার বলতে হ'বে।"

অকণক্ষমার ছেলোমাসের মত ঘোঁসে:ক বরে
বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যে আমার বৌদিদি! তুমি
কেন পরের ঘরে হ'তে যাবে।"

হেমলতার ছই চোখ বাপা:কল হইয়া উঠিল।
শিঙর মত দলল এই ঠাকুরপোটি যে তাঁহাকে
কত বানি তক্তি লজ্জা করে তাগা তাঁহার অববিত
ছিল না। চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন, "গলা
তাই আর অন্যত কর না। তোমার দাবার

তারি ইচ্ছা তোমার বিধে কেন। আর আমিই বা একলা কতদিন সন্ধ্যার ঘাড়ে করে থাকিব। আমার ভূরি একটু বিকতে গেবে না।

অরুণসুন্দার বলিলেন, “নতুন লোক বাড়ীতে আসলে তোমার কান যে আরও চক্চকিৎ বেড়ে যাবে বৌদিদি। বা খেটুকু সময় পাছি তখন যে একেখানেই বিকতে পাবে না। তোমার সাহায্য করবার লোকের অভাব কি তুমি যা হকুম করবে আমি তাই করবো। আমি তরকারি কুটে তানি, হাংতে তানি। এই বেশ আমি তোমার তরকারি কুটে দিচ্ছি।”

হেমলতা বলিলেন, “তুমি যে এ সব কার পার তা আমি পূর্ণ জানি। কিন্তু, ও কথার আমার ভোলাতে পারবে না।” একটু ঘাঁড়িয়া বলিলেন, “আমার আমেন তোমার বিধে করতে হবে।”

অরুণসুন্দার বৌদিদির লিখের পুলা মাথার লইয়া বলিলেন, “তোমার আবেশ যখন তখন ত আর অস্বস্তি করতে পারি না।”

হেমলতাও তাহা জানিতেন, তাই আশ্চর্য্য হইলেন না। তাঁহার কোমল মুখখানি অশুর্ল মিষ্টতা ভরিয়া উঠিল। তিনি প্রাণ ভরিয়া বেগকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলেন।

তিত্বকর্ণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর অরুণসুন্দার বলিলেন, “কিছু বৌদিদি তোমার এ আবেশ, সন্দের এম, এ পাশ করা—”

তাঁহার সুবের কথা কাড়িয়া লইয়া হেমলতা বলিলেন, “তার এমন চার বছর বেকী, তখন ত তুমি কুড়া হ'বে বাবে ঠাকুরপো, তোমার মেয়ে বেবে কে তানি?”

অরুণসুন্দার হাসিয়া বলিলেন, “বালাসামেনে আমার মেয়ে পাওয়ার তাবনা। যদি সস্তর বছরের কুড়ার বিধে হ'তে পারে আর আমার বিধে হবে না বৌদিদি।”

হেমলতা বলিলেন, “তা যা বলে ঠাকুরপো

আমাদের এই অভাগা বেগের বেগেবেই এমনই অবস্থাই হ'য়েছে। পরবার অভাবে মেয়ের বিধে দিতেই পাবে না—কালেই—”

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অরুণসুন্দার বলিলেন, “অত্যাগ বটে, অত্যাগ বটে। আমার যদি বেবেবেই সস্তর চোখে দেখতাম তা হ'লে শত অভাবের মধ্যেও কখনও আমাঃ বোল সস্তর বছরের একটা বেবেকে সস্তর বছরের কুড়ার ঘাড়ে দিতাম না। বেবেবেই যে আমার পল্লব্রহ্ম বলে মনে করি।”

(২)

অরুণের বিবাহ হইয়া গেল। নববধূ লইয়া গৃহে কিরিবার পর হেমলতা তাঁহাকে লিখাণা করিলেন, “কেন, বউ পছন্দ হ'ল?”

অরুণ হাসিয়া বলিলেন, “পছন্দ হবে না কেন, প্রথমেই সর্ব্বলোভ হয়ে খোঁরা, তারপর টিকোলে নাক, আঁক'বিশুত নয়নদুগল, জোড়া ভুত, পাতলা ঠোঁট। এতেও অপছন্দ হবে বৌদিদি।”

নববধূ কাকনমালা লতাই পথ্য লুপ্ত। অরুণসুন্দার তাহার রূপের যে বর্ণনা করিলেন, তাহা বৎসামাত্র অতিরঞ্জিত হইলেও, তাহাকে মিথ্যা বলা চলে না।

হেমলতাও দায়া সুব চোখ হাসিতে ভরিয়া বলিলেন, “তা আমার কাছে রূপের বর্ণনা করা মিথ্যে—যে শুকলে খুনীতে ভরে উঠবে তার কাছেতে আরও বেশী ক'রে বর্ণনা কর। এমন স্বভাব বাড়ী কেমন দেখলে বল?”

অরুণসুন্দার বলিলেন, “বেশ বেশমান। আমাদের চেয়ে ঢের বড় বাড়ী, অনেকগুলো ঘর এবং অনেকগুলো হাড়ি।”

হেমলতা নিম্নর প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “অনেকগুলো হাড়ি কি রকম?”

অরুণসুন্দার হাসিয়া বলিলেন, “তা বুঝি জান

না বৌদিদি। আবার খুঁজিয়া পাঁচ ভাই, তাঁদের পাঁচটি আলাদা হাঁকি, এক রাত্রির পর পাঁচ খাত্তরী পাঁচটা উজ্জ্বল হইলেন।”

হেমলতা বলিলেন, “ওহা দেখি গো! এমন লাভ! এঁর মধ্যে এক খবর পেলে কোথাক্কে ঠাকুরগো?”

অক্ষয়কুমার বলিলেন, “গোয়েন্দাখিদি শিখতে হ’য়েছে বৌদিদি। তুমি বুঝি জান না, গুজপরি কতুতে গেলে বাত্বে বাত্বে গোয়েন্দাখিদি দেখবার ব্যবস্থা হয়।”

হেমলতা হাসিয়া বলিলেন, “তা জানা ছিল না ঠাকুরগো,—তবে তুমি যে একজন পাচ গোয়েন্দা তা বেশ বুঝতে পারি।”

অক্ষয় কহিলেন, “এখনও ঠিক পারি, গোয়েন্দাদের চোখ কান কি ইকম সতর্ক তাঁত তুমি জান না বৌদিদি, আর সকালে যদি বিয়ের আবেই পাঁচ হাঁড়ির পাঁচ লক্ষ আবার কানে গেছে, কোন্ খাত্তরী-ঠাকুরগো তা বলতে পারি নি, তবে যে কোন এক খাত্তরী-ঠাকুরগো যে সবেক চাপা কর্তব্য তা আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি—তিনি হুঃখ এবং রাগ করে বলছিলেন, আর সকালেই হাঁকি টেলতে হবে জানলে তাগ কে খেটে মরতে যেতো। বৌদিদি—” বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিয়া হঠাৎ বামিয়া পেলেন।

তাঁহার এই সংসারানভিজ দেবদেবী কোথায় বাখা এবং কোথায় আনন্দের তাহা বুঝিয়া হেমলতা হঃখ ও শাইলেন খুলীও হইলেন।

(৩)

সুন্দর্য্যার ভাবে কাকন বামীকে প্রশ্ন করিল, “তুমি কত মহিমে পাও।”

অক্ষয়কুমার আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “তিনশ টাকা।”

কাকন কহিল, “এই যে শুদ্ধাঙ্গ পাঁচশ টাকা হোজগার কর।”

অক্ষয় কহিলেন, “হোজগার করি বটে, তবে শুদ্ধ কলেক্ট গুজপরি দরে নয়।”

কাকনমালা কহিল, “এত টাকা কি কর?”

অক্ষয়কুমারের ভাবি হাসি পাইল। ইহা যে ছেলেরাভূবো সঙ্গ কৌতুহলবানিত প্রশ্ন হাঁকা আর কিছুই নহে তাহাই তিনি মনে করিলেন, হাসিয়া বলিলেন, “বৌদিদিকে দি। তিনি কি করেন, তিনিই জানেন।”

কাকনমালা অন্তর বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল, “তোমার বৌদিদি টাকাকাল্লা নিয়ে কি করেন, তাঁর কোন খোঁজ কর না।”

অক্ষয়র মুখের হাসি হঠাৎ বিলিয়া গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া তিনি বলিলেন, “খোঁজ আর কি করব, বৌদিদি যা ভাল বোঝেন তাই করেন।”

কাকনমালা মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল, তাহার অধ্যাপক হোজগারে বামীট প্রকাশ নিষেধ। তাই প্রদত্ত হইয়া প্রকাশ্যে কহিল, “তা এ ইকম কলেক্ট চলে না।”

অক্ষয়কুমার শুক হইয়া রহিলেন। প্রথম পরিচয়ের দিনই এমি কথা! এই অপ্রত্যাশিত কিনারা প্রশ্ন প্রশ্ন করিবার সাধ ও অবিকার কোণা হইতে কেমন করিয়া পাইল? নিশ্চয়ই তাহাকে কেহ শিখাইয়া দিয়াছে। ব্যতিত অন্তরে তিনি উত্তর কহিলেন, “এতদিন যখন গেলতে তখন পরেও চলে।”

কাকন ও লবন্ধে আর কেনি প্রশ্ন করিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর কাকন আবার জিজ্ঞাসা করিল, “এ বাঙালী কোথায় না?”

অক্ষয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “জানি না, বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা কর।”

কাকনের মনও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এ দুঃসংবাদ আবার জা’র নিকট হইতে জানিয়া গইতে হইবে। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পয়সিন আদি প্রভৃতি কতের বাহির হইয়া আসিয়া অরণ বেঁধেলেন, যেমনতা উঠান পরিষ্কার করাইতেছেন। সেবহের সুখের দিকে চাহিয়া মূহ হাসিয়া কহিলেন, “কাল সারারাত্ত বৃষ্টি হুটী চোখের পাতা এক হয়নি ঠাকুরপো ?”

অরণ জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “অমন রূপের ঘনি সান্নেয়ে যেথো কি চোখ বোকা যায় বৌদিদি ?”

হেমলতা বলিলেন, “তা যা বকেচ ঠাকুরপো, যেন মস্তাও কতিয়া, সতিহি ও সুখের পানে চেয়ে আর চোখ কিরাতে ইচ্ছে হয় না।”

অরণকুমার সহজভাবে পরিচাল্য করিয়া বলিলেন, “তবু ত তুমি যেহেমাভূত।”

হেমলতা পরিহাসে ধোঁয়া দিয়া বলিলেন, “তাও আবারই চোখ টুকুর ব্যর, তোমার ত কথাই নেই; অজ্ঞা ঠাকুরপো কাল সারারাত্ত কি শুধু ঐ সুখের পানে চেয়ে রইলে, না কথাবার্তা কিছু হ’ল ?”

অরণকুমার কহিলেন, “চুল করে চেয়ে থাকবার জো কি বৌদিদি,—আমার ত ইচ্ছে ছিল নিশেঘে চেয়ে থাকি, তা থাকতে বেচে কে ?”

হেমলতা আশ্রয়ভরে বলিলেন, “সারারাত্ত ঘরে কি কথা হ’ল ঠাকুরপো ?”

অরণ কহিলেন, “সে অনেক কথা বৌদিদি, কত যোগসার করি, টাকা কাকে দি, তার কাছে থেকে পাই পয়সার ফ্লাব নেওয়া হয় কিনা, এ বাড়ীখানা আমার কি না—আরও কত বলব ?”

সেবহের কণ্ঠস্বর হেমলতা কুন্ডিলেন যে ঐ সব জ্ঞেয় তাঁহার সঙ্গনিব সেবর অন্তরে থাপা পাইয়াছে। অরণ হাসি তানামার মধ্যে তাহা চাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা নৈরপরাধা হেমলতার কাছে তাহা থা পড়িয়া গেল। অরণের নিকট নিজের মনোভাব গোপন করিয়া তিনি বলিলেন, “সে ত আমার বত ন’বহরের যেহেটা আসে নি যে কোন কিছু বোঝ নেবে না। বড়

হ’য়েছে, তার বুদ্ধিবৃত্তি হ’য়েছে, তার চাটে পড়ল, সে কি ধরায় লোক তার বোঝ নেবে না ? নিজেই নিমিষ বাটাই করে নেবে না ঠাকুরপো ? নিশ্চয়ই নেবে, তাই ত আমি চাই।”

অরণকুমার হঠাৎ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “না চেয়ে এখন আর উল্লাহ কি বৌদিদি ? তখনই বন্দেছিলাম না পরের ঘেরে এনে হালধা বাঁধিয়ে না, তা ত শুনলে না। মাদলাকে পারলেই ভাল আমার কি।”

হেমলতার মনের কোণে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা ছায়া ফেলিয়া গেল।

যদি তিনেক পরে নিমন্ত্রণ করা করিতে গিয়া অরণকুমার বেঁধিলেন, তাঁহার আর ছই তাহারা-তাই আসিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার আর ছই বস্ত্রের আনাঠাও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আহ্বানের সময় অরণকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনজন একত্রে বাইবেন। তাহেই বাধা হইয়া এতখানে তিনজনের আহার্য্য সাজাইয়া দেওয়া হইল। পাতের দিকে চাহিয়াই অরণের কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। বাহারের বালার সমুখে হেঁট হইয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু ব্যস্তভাবে হাত দিলেন না। সকলে আহ্বানের বস্ত্র গীড়ানীড় করিতে লাগিলে তিনি আঙে আঙে বলিলেন, “আবার অগ্রহ করতে আমি কিছু বাব না। আপনারা যেনে রইলেন কেন ? যান। বাওয়া শেষ না হওয়া অর্থাৎ আমি উঠি না।”

আহার শেষ হইয়া গেলে, তিনি বলিলেন, “আবার শরীরাটা ভারি ব্যাথা বোধ হচ্ছে আমি বাড়ী চললাম।” শান্তভাবে বস্ত্র বাস্তকীর অনুরোধ একাইয়া তিনি গৃহে ক্রিয়লেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া একবারে সারাদেশের

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বৌদি, নিশে পেয়েছ, শিশুটির ভাত দাও।”

মেঘলতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন “জুনি কোথায় ছিলে এতকণ, ঠাকুরপো, খজরবাড়ী যাওনি?”

অরুণজুয়ার বাস্তব হইয়া কহিলেন, “শিশুখিলার বৌদি, এখন কি খেতে খেবে দাও।”

মেঘলতা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কিপ্রহরে ঘেঘরের তক্ত ভাত বাড়িয়া দিলেন। আহার শেষ হইলে মিজালা করিলেন, “তোমার বে শেখানেন খাওয়া ও খাবার নেভর জিন ঠাকুরপো, জুনি যে বড় চলে এলে?”

অরুণ জুয়ার কহিলেন, “বলুটে নেই কি করব বৌদি?”

মেঘলতা অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, “কি করব?”

অরুণ জুয়ার তারি প্রশ্ন কহিলেন, “বৌদি খাওয়াটাই কি দলদলে সব চেয়ে বড় মিলিয়া?”

মেঘলতা আগ্রহভাবে কহিলেন, “কি হয়েছে ঠাকুরপো?”

অরুণ কহিলেন, “আমার আর দুই বছরের আমাইয়েরও আর নিমন্ত্রণ হইছিল—একসকল খেতে বসলাম তিনজননের পাতে তিন সন্ধ্যা খাবার তা কি খাওয়া যায়। জুনিই বস না বৌদি?”

ভাষার উদার আগ্রহ-জন্ম ঘেঘর যে অন্তরে কতখানি আঘাত পাইয়া সুখের বাণীর ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন তাহা মেঘলতা পরিপূর্ণ জ্ঞানে স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। এ একসকল আর তিনি আগ্রহের হইতে দিলেন না। তিনি কি বলিলেন সংগারে এত নিষ্ঠা নৈমিত্তিক অতি দাখিলে ঘটনা? যখন ঘাঘের পেটে এক তাই মোটা হাঁকাইয়া তারতাপ খাইয়া বিলাসের মধ্যে আকর্ষিত নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ঠিক তাহাই চোখে সন্মুখে—অরুণ এক

তাই বা তিনি কতকগুলি মোটা মোটা ফেল ঘেঘর লইয়া অগ্রভাবে পশ্চাভাবে অর্ধাধারে অর্ধ—উপর হইয়া ছুখে ঘেঘরের মধ্যে গিয়া যাবে, তখন অসহায় তারতাপ অঙ্গুণেরে জানাভাবের পূর্ব্ব সাহায্যের যাবনা এত কিছুই নহে! এ দাখিলে করবঃবই বা এমনি চোখ পড়ে!

দান পুরের পরে নৃত্য। শূ কাকনবালা স্তম্ভিত ভাবে আধা ঘণ করিতে আসিল।

মেঘলতা তৎকারি স্টুডেটসেন, কাকনবালা ভাষার পাণে বসিয়াছিল। অরুণ এককোণে চুড়ি হাতে করিয়া দেখানে দানিমা উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “যে মিকি বৌদি-কি রকম চুড়ি, জোয়ার লক্ষ্য হয়?”

মেঘলতা হাত সুইয়া চুড়ি করিয়া লইয়া শূ-ইয়া কিয়াইয়া বেহিয়া কহিলেন, “তবৎকার চুড়ি ও। তারি স্মরণ প্যাটার্ন জুবার হাতে মনে বে আস?” এই বলিয়া ঘেঘরের মুখের বিকে ঢাছিয়া দাঁড়িয়েন, তারপর কহিলেন, “কবে গড়তে যিবে তা ত আমাকে একবার বলুন না ঠাকুরপো?”

অরুণ জুয়ার ঘেন অগত্যাশ্চর্য্য হইয়াছেন—এমনই ভাব বেহায়া কহিলেন, “বা রে, দল কবাই তোমার বলুতে হো বৌদি এখন দাখ কবা ত কোন দাখঃলেশখি?”

কাকনবালা একটু নতিয়া চটিয়া বসিয়া হানিকিয়া বৃষ্টিতে আধার সুখের বিকে কটাকে ঢাছিয়া লইল।

নববয়স এই চকিত বৃষ্টিগত মেঘলতার চক্ষু একাইল না। অন্তরের নিস্তৃত আগ্রহে তিনি যে আঘাত পাইলেন তাহা আশ্চর্য্যে গোপন করিয়া দানিমা কহিলেন, “তাটি ক কবা ঠাকুরপো, এখন তোমার বে বলবার লোক হইবেছে।”

কিন্তু অরুণজুয়ারের কাছে মেঘলতার গোপন

যাখা হয় পড়িয়া পেল! নৌদিদি যে কি মজ
 তাঁহাকে ভুল সুস্থিলেন, এই কথা যেন করিয়া
 তিনিও ছুবে পাইলেন। ইহারই মধ্যে কি তিনি
 নৌদিদির নিকট হইতে এতখানি ঘুরে চলিয়া
 দিয়াছেন, আভিমান করিয়া অকণ করিলেন,
 “নৌদিদি, এর টাকা কোথায় পেলাম, কত পরস
 পদল কিছুই ত জিজ্ঞাসা করলে না?”

নিজের হৃৎকলতা ও চাকল্যের উক্ত লক্ষিত্য
 হইয়া যেমনতা করিলেন, “জিজ্ঞাস করবার সময়
 দিলে কৈ ঠাকুরপো! তুমিই ত আগে সে কথা
 বলে কৈলেন। এত কথ লাগেনি। চারশ লাফে
 চার শ টাকা ত হবেই!”

অকণকুমার করিলেন, “আর লাফে চার শ
 টাকা লেগেছে!” পরীক্ষক হ’য়ে যে টাকাটা পাই
 না, এবার আর তোমার তা দিই নি নৌদিদি!
 তাই বিয়ে এ চুক্তি পড়িয়ে এনেছি। জানি বন্ধুনি
 যেতে হ’বে!”

যেমনতা বেবনার ঘর গোপন করিতে না
 পারিয়া করিলেন, “তুমি যথ করে একঝোড়া চুক্তি
 পড়িয়ে এনেছ, তার সঙ্গে তোমার দুটো কথা
 বস্বে, এমন কথা তুমি যেন স্থান দিলে ঠাকুরপো!”

অকণকুমার হাসিয়া করিলেন, “তা মিথি মিথি বই
 কি নৌদিদি। তুমি বস্বে না, তিন মতা কর?”

যেমনতা জোর বিধা করিলেন, “বকব না,
 বকব না, বকব না!”

অকণ চট হাসি হাসিয়া করিলেন, “তিন মতা
 করেছ, আর কিছু বকবার উপার নেই!” তার
 পর নৌদিদির একেবারে নিকটে বসিয়া পড়িয়া
 করিলেন, “বাও আমার চুক্তি!”

যেমনতা তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য
 হইয়া ছুঁড় কথগাতি তাঁহার হাতে ধিলেন।

অকণকুমার ক্রমিক গাভীরের পরিত করিলেন,
 “যেদি একবার তোমার হাতখানা!” এই খানিয়া
 জোর করিয়া নৌদিদির হাতে চুক্তি কথগাতি

পরহীরা বিধা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া
 করিলেন, “কেমন জব্ব, তিন মতা করিয়ে
 মিথি মিথি!”

যেমনতা আর চোখের জল যোব করিতে
 পারিলেন না। তাঁহার অন্তর অশ্রুপূর্ণ মোমন ও
 আশ্চর্যান্বিত করিয়া উঠিল।

(৯)

অকণকুমার তাহার এক বসন্তের বেগমীর
 কাটা খানিতে না পারিয়া নির্ধর ভাবে এড়া
 করিতেছিল। যেমনতা ছুটিয়া আনিয়া তাঁহাকে
 কোলে তুলিয়া লইয়া করিলেন, “হি এমন করে
 ছেলেকে মারে?”

কাকন ভীষণভাবে বসিয়া উঠিল, “নিজের
 ছেলেকে শাসন করবার অধিকারও যে আমার
 নেই? তা জানতান না, খাট হ’য়েছে বিবি?”

যেমনতা ছেলে কোলে করিয়া কাঠের স্তম্ভের মত
 বির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ সময় কথা যে
 শুনিতে হইবে তাহা যে তাঁহার বসন্তের অপোচর
 ছিল। বহুদিন পরে আর তাঁহার যে দেয় কণা
 কয়ট তাঁহার চোখের মধ্যে স্তম্ভের বিধা উঠিল, —
 ‘কোথাকার এক পরের বেবে! এমন হাসিয়া
 বাধাবে নৌদিদি!’

অকণকুমার তখন গৃহে ছিলেন না। ক্রিয়য়া
 আনিলে লনও তাঁহাকে এই ঘটনার কথা বিবৃত
 করিয়া বলিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া
 অকণ করিলেন, “তোমার বেবনৌদিদি ত কিছু
 অজ্ঞার কণে নি। ঠিকই হ’য়েছে!” লনও সুরবনে
 চলিয়া গেল।

বিন কতক পরে কাকন যেমনতাকে করিল,
 “ওবে ত জানই বিবি, তা কি কিছু টিগ আছে।
 চাইলে অবনই পঁচিশটা টাকা। যেহ করে দিলে।
 টাকা কি খোলাস তুচ্ছ যে এমনই করে ছড়িয়ে
 দিতে হয়। তুমিদের বাবা কণেকের ত কোন
 অজ্ঞাব যেদিনা, তদুৎ এ পঁচিশ টাকার বাবা

কেনা কেন ? পথের টাকাতা বলে কি এতটুকু
মহন থাকতে নেই ?

বেদনতার সাতবেশ বার বার করিয়া কানিয়া
উঠিল। তাঁহার মাথা পুড়িতে লাগিল। তিনি
চোখে অন্ধকার দেখিলেন। মনে হইল যেন
‘তাঁহার পাতের নোচে হইতে পৃথিবী ধীরে ধীরে
সরিয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যা বড়ের মত সেখানে উপস্থিত হইয়া
বলিয়া উঠিল, “চাৰি কে’ল হাও বৌদিদি।”

‘অৰুণকুমার যে তাহাযের পক্ষান্তে আশিয়া
ধাড়াইয়াছিলেন, তাহা কে’ল লক্ষ্য করে নাই।
এইবার তিনি সম্মুখে আশিয়া করিলেন, “তা বিহে
হবে বৈকি। চিরকাল কি পথের হাত তোলা
হ’য়ে থাকবে না কি ? শুভু চাৰি কে’ল দিলে হবে
না, চুড়ি ক’লাহিও খুলে হাও বৌদিদি।”

কাকনমালা চাৰি হুড়াইতে হুড়াইতে কহিল,
“খানি কি চুড়ি চেপেচি না কি ?”

অৰুণকুমার কহিলেন, “চেপেচি, এত বড় মিথো
কথাটা কি ক’রে বলি, কিন্তু আবার ও ত একটা
কর্তব্য আছে।”

কাকনমালা ভ্রমিত জোখ অঞ্চাল করিয়া
কহিল, “তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।” এই বলিয়া
চাৰি আঁচলে বাঁধিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা ফুৎফুটে কহিল, “জুদি এখনই শ্রৈণ
হ’য়েচি বৈজায়া।”

অৰুণকুমার শান্তভাবে কহিলেন, “হ্যাঁ হ’য়েচি,
তাতে এখন কোন অপরাধ কথা হয় নি।” বেদনতা
ততক্ষণ চুড়ি ক’লাহি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অৰুণকুমার কোন কথা না বলিয়া চুড়ি ক’-
লাহি দিয়া পতীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,
“এই নাও, পর, না, না তোমার কোন কথা শুন
না। পরতেই হবে, তোমার ও হাতে খুব চমৎকার
লগাবে।”

কাকনমালায় খাঁসি হুয়ের বিকে একবার

চাৰিয়া দেখিল। সে যুগে কোন জোখ বা বিকল্পিত
এতটুকু চিক্ নাই।

ক’কন খুশী হইয়া চুড়ি পরিতে পরিতে ব্রেক-
ফাস্ট চক্কো স্বাকীর দিকে চাৰিয়া হাসিয়া কহিল,
“হাও, তুমি তা’রি এত শুধে, খিখি কি মনে করবেন
বল ত ?”

অৰুণ কহিলেন, “কে কি মনে করবে তাহতে
গেল কি দামার চোনা।” খানিক পরে ব্যাখ্যায়ের
শিয়া করিলেন, “বৌদিদি আর খেতে যাবে না ?”
আহাঃ আর খনিয়া করিলেন, “চেপে খেব বৌদিদি
চুড়ি কেনন খানিয়েচি, তোমার হাতে ও খানাবে
কেন ?”

বেদনতার হাৰ’মাৰ হাসি কৌতুক করিয়াঃ
শ্রুতি বা উৎসাহ ছিল না। সন্তোষমুখে তিনি
কহিলেন, “তখনই ত তোমারি বনেছিয়াম ঠাকুরপো
হার হাতে খানাবে তাকে হাও, তু’র ত আবার
কথা শুনে না। তা হ’লে—”

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অৰুণ
বলিয়া উঠিলেন, “তোমার ইচ্ছেটা কি বৌদিদি
আম আবার খেতে বেঁচে না।”

বেদনতা তাড়াতাড়ি অঞ্চল চক্কু মুছিয়া
কহিলেন, “আর এতটু নাহেঁহে তোলা বি
ঠাকুরপো।”

অৰুণকুমার হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, “আর
একটু কি বৌদিদি ! নাহেঁহে তোলা যে এখনও
মোটাই বাও নি, শুখ খানিকটা ভাল বিহেচি যে ?”

বেদনতা সম্মিত হইয়া নাহেঁহে তোলা আনিতে
গেলেন।

পরদিন কিসের ছুটী ছিল। সংস্কারোত্তি-বিখ্য-
রর মাখনলাল জামাতা অৰুণকুমারকে ডাকিয়া
এই বলকপটতা পূর্ণ সংস্কার মথতে সাহসর্গ উপবেশ
আদান করিতেছিলেন। মাখনলাল কহিলেন,
“বাড়ী খানার মলিনপত্র তোমার নামে হ’য়েছে সে
কথা ঠিক, কিন্তু তোমারি এখন এক অগ্রে আছ তবু

তোমার ভাইরাও যে সমান ভাগ পাবে। অতিনই
যে এই ভরসা।”

অরুণ কুমার ঘোঁড়াবো করিলেন, “আইন
আমার জানা ছিল না। এখন আমার কি করতে
হবে বলুন?”

মামনলাল উৎসাহ করে করিলেন, “নিশ্চয়না
আমার মোহর নামে করে বাণ, তা হ’লে যৌথ হক
কোন গোল থাকবে না।”

অরুণকুমার এ-প্রস্তাবের উপদেশ লাভ করি-
বার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন।
কহিলেন, “ভিলে একবারে গোল মিটে যায়, তাই
বলুন, সেই বাণ্ডাই আমি চহু।”

মামনলাল বিশেষ ধূমী হইয়া করিলেন, “তোমার
ভাইদের মতো যদি নিঃস্বার্থে নিতে পার যে এ বাড়ী
তোমার সোহাগারের টাকার হ’লেই তাহের কোন
হানিকরো নেই, তা হ’লে আর কোন গোল থাকে
না! কিন্তু ভায়া কি তা পিবে যেবে?”

অরুণ ইতস্তিত হইয়া করিলেন, “নিশ্চয়ই লিখে
দেবে। আর আমার ভাইরা সে সবেরই নয়!”

মামনলাল হাসিয়া করিলেন, “এইবার বুঝতে
পারিবে।”

অরুণকুমার বিচক্ষণ নিঃশব্দে মামনলালের
মুখের দিকে চাৰিয়া রহিলেন। তারপর
ঘোঁড়াবো করিলেন, “কোন দিন সংসার করিনি
কাজেই আমি ঠিক করিবেলুতে জানি না। আমার
আর কি বাধ্য করতে হ’বে বলে বিন, কেননা—
বা করতে হবে একবারে? ক’রে কেহতে চাই।”

মুগ্ধ হাস্য মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।
একটু পরে বলিলেন, “সত্যমুখপেকী হ’লে বাণ্ডাটা
বাঁধেই বইত, আমার মোহর শুধু মোহেই এইবার—”

অরুণকুমার আশ্চর্য হইয়া করিলেন, “বেশ ত,
আমি বাণ থেকে বাধীন ভাবে বাণবান ব্যবস্থা
ক’রে দেব। আমায় অপরাধের দাও থেকে
রক্ত পাই।

মামনলাল যে কথাটা এতক্ষণ লুপ্ত করিয়া
বলিতে পারেন নাই, প্রথমেই বুঝি। তাহা বিনয়
করিয়া কহিলেন, “বেশ বাণ্ডাটা, আমি জানি
তোমার বাণা বৌদিমিকে ভূমি বিশেষ তুলি। লজ্জা
কর, তাঁরও তোমার অস্ত্র-বেশ দেখান, এই ব্যবস্থা
শিখ বাড়ীতে পুরক ভাবে থাকাই বাধীন। তা
হলে মতলে মতাবে থাকিতে পারবে।”

অরুণ কুমার করিলেন, “আমনারের বাধীন
ব্যবস্থা ক’রে দেব।”

এত সহজে যে কারোঁকার হইবে, এ কথা
কাকনের শিতা ভাবিতে পারেন নাই। তাই আমা-
তার প্রযুক্তি কত মনে মনে ভাববানের উদ্দেশ্যে
যায় আর প্রথম করিয়া নিজের কস্তা ও তাঁহার
পুত্রাধিনিকে অত্যন্ত ভাবাবতী কল্পনা করিয়া পদ-
পদ হইয়া উঠিলেন। ভাবাইয়ের আধারের বিশেষ-
রূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ভিতরে হাইগেন,
এমন সময় একপক্ষে উঠিতে দেখিয়া মহা ব্যস্ত
ভাবে করিলেন, “এ কি বাণ, এখনই উঠে যে।
না যেহে কি বাণ্ডা হক।”

অরুণ কুমার ঘোঁড়াবো করিলেন, “আমি আমার
মাগ করতে হবে। এর বিধিত না করে আমি
কল ল্পর্শ করব না।”

এই ত চাই! উচ্চ বিকৃত ব্যক্তির সহিত
সংবাদ লোকের এইখানেই ত তৎকাল। তাহা
যেটিকে কর্তব্য বিনা একবার মনে করিবে, তাহা
পালন করিবে। আমাতার অন্তরে এই কর্তব্যবুদ্ধি
আগে করিয়া বিচার ক্রিয়ণ যে তাঁহার কস্তার এবং
তাঁহার নিজের এই কথা পুরক করিয়া তাঁহার বুক
ফাট ফাট হইয়া উঠিল। তিনি মুখে ব্যস্ত কয়েক
মামনলালকে আধার করিবার কত অজ্ঞান করিলেন
যেটুকু আমাতার সে অজ্ঞানতা এড়াইয়া চলিয়া
গেল, তিনি মনে মনে পুণাই হইলেন।

এবারের স্তম্ভমুখের দিকে চাৰিয়া উৎকণ্ঠিত
হইয়া আমাতার করিলেন, “এত বেশি অবদান কোমার

ছিলে ঠাকুর পো, তিনটে যে বেতে গেছে বাগা তব
নি ?”

অন্নপূর্ণার কহিলেন, “একটা বিশেষ কাজে
যাতি ছিলাম, সে কাজ দেখনা করা পর্যন্ত এ বাড়ীতে
আর কিছু বাব না নৌবিহি।”

হেমলতা নির্ভীক খিয়ে তাঁহার মুখের দিকে
চাহিয়া কহিলেন। একপ কথা বলিবার অর্থ কি !
অন্য কাহিন্যকার চালচলন শু কথ্য বলিবার
জন্য এবং অন্নপূর্ণার পত্রকলাকার ব্যবহারের
“অন্ন করিয়া শব্দিত হইয়া হেমলতা কহিলেন তাঁহার
সামর্থ্য এইখানে কর্তন সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে
ইবার সুনা শু কহিলেন হইতেই দেখা দিয়াছে। এখন
জগৎ বর্ততে বা বিলম্ব। সত্যে সত্যে মনে পড়িল,
তাঁহার দেহের অকৃত্রিম হইয়াছেন। আজ তাঁহার
এ কি হইল। যেহেতু অকৃত্রিম হইয়াছেন এতকণ
তিনি চূর্ণ করিয়া বসিয়া আছেন। অন্নপূর্ণার
মধ্যে হট কট করিতে করিতে তিনি ডাকিলেন,
“ঠাকুর পো।”

অন্নপূর্ণার হিড় কণ্ঠে কহিলেন, “কি নৌ
বিহি ?”

হেমলতা কহিলেন, “বাধে চল।”

অন্নপূর্ণার দুই হাত মোড় করিয়া কহিলেন,
“আজ আমার আর বেতে বল না নৌবিহি।

হেমলতা চোখের জল মুছিয়া কহিলেন, “বেশ
খোঁষো না। উপোস করেই থাক, কিছু এটা মেন
ঠাকুরপো, উপোস করে থাকতে যে তুমিই তেমন
পার, তাম্র আমিও পারি। যোগ করি তাই
তোমার ইচ্ছে।” এই বলিয়া তিনি রাগাধারের দিকে
চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণার অন্নপূর্ণার হিড় হইয়া দাঁড়াই।
যাকিয়া রাগাধার উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “সত্যিই
আমার বেতে দেখে না নৌবিহি ?”

হেমলতা উত্তর মুখে কহিলেন, “তাতে বেতে
যে কখন বেতে বসে-আজ ঠাকুর পো।”

(৮)

সত্যার সময় অন্নপূর্ণার দান। এ সময়কে দিয়া
বাড়ী সম্বন্ধে হইয়াছিল পূর্ণক ছাড়পত্র ‘দান’।
নইলেন।”

দান। নিম্নোক্ত দিবিয়া দিলেন, কিছু সময়
দিবিয়া দিয়া কহিলেন “দানকে দেখকাল এমনই
করে পথে বসালে যে-দান।”

অন্নপূর্ণার কহিলেন, “নিজের বিবাহ সম্প্রতি
কৃত্রিম নিজে সেলে কে পলে বসল না বসল, তার শু
বহর মেওয়া চলে না ভাই।”

সময় আর কিছু না বলিয়া বস্তুতঃ দে দান
তাপে কহিয়া গেল।

হেমলতা অন্নপূর্ণার পুত্রটিকে বুকের মধ্যে ঢালিয়া
দিয়া দান করিতেছিলেন। কাকনমালা বহর
হইতে বাতির হইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া
দেখ করিয়া কহিল, “দান ও দানকে অন্নপূর্ণার কেন
দিবি, শুতে আর আটকে পাবে না।”

হেমলতা কাকনের পুত্রটিকে তোর করিয়া
বুকের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া অন্নপূর্ণার পতীর আবারে
দেখনা সামান্যতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণার দেখে কথ্য কানে গেল। বজ্রাঘাতের
স্বায় তিনি কাঁড়ট হইয়া দাঁড়াইলেন। বহুর পরে
টলিতে টলিতে নৌবিহির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া
কহিলেন, “দান। পাল্লা বাড়ী ঠিক করে
এসেছি কালই দেখানে উঠে যেতে হবে—এ
বাড়ীতে আর দান হবে না।”

হেমলতা হিড় হইয়া কহিলেন, “দেই কাল
ঠাকুরপো, কাল সকালেই দেখানে উঠে দান, আদিত
তোমার দেই কথা বসতে বাজিল। আমি দান
করি তুমি হবে থাক।”

কাকন জ্বর দান। দান। দান। দান। দান। দান।
“এ আদিত দান, আদিত দান। দান।”

উদ্যোগের স্বায় অন্নপূর্ণার পতীর দিকে হুটুয়া

সেলেন,—সামা! উই পা শিড়াইয়া গিয়া বরজা
করিয়া কোন বকনে ঠাড়াইয়া রাখিলেন।

এমন সময় 'বা বাকুন' বলিয়া অকণ্ঠস্বরের
শব্দ শুনেলেন আশিরা ঠাড়াইলেন।

অকণ্ঠস্বরের নিকট চাহিয়া প্রাণপণে নিজেকে
সংযত করিয়া লইয়া করিলেন, "এই যে আপনি
এলেছেন। তাগই হ'য়েছে। আপনাবা বাড়ী
আমি ঠিক করেছি, বানপত্রও দেখা হ'য়ে গেছে।
আপনার সামনে সকলকে ডাকিয়ে এনে এখনই
সব গোল চুকিয়ে দেব। এই বিন দালা আর
আবার ছোট ভাইয়ের সই-করা দিল। পড়ে
বেশুন তারা লিখে দিয়েছে এ বাড়িতে তাদের
কোন দাবী থাকে নেই।"

হাখনলাল কান্না ঠাইবার উপর চোখ
দুলাইতে দুলাইতে প্রসন্নভাবে করিলেন, "ঠা
বাবা—"

যাহা বলিবার ভক্ত হাখনলাল জুঝকা
কান্নাভেঙিলেন, তারা বুঝিতে অকণ্ঠস্বরের বিলম্ব
হইল না, তিনি বাবা বিয়া করিলেন, "বা করতে
হবে, তা সকে সকে করে ফেলাই ভাল। আমি
আমি বেরী করতে পারি না। বানপত্রবান এখনই
নিরে আসছি।"

হেমনলা অকণ্ঠস্বরের পুত্রীকে তেমনই তবে
বুকের সঙ্গে চাপিয়া বসিয়া পাখাণ স্তম্ভিত হইত
হইয়া সেইখানেই ঠাড়াইয়া রাখিলেন। কাকনমাগার
সেই অতি কঠোর নির্দয় বিজ্ঞ—"এ আশীর্বাদ
না অভিশাপ বিধি।" সেলের মত তাঁহার কণ্ঠে
বাজিয়াছিল। সে কঠিন আঘাত সামলাইবার মত
শক্তি তাঁহার ছিল না। যে যেবরকে তিনি শিশু-
কাল হইতে পুত্রাধিক ঘেঁষে লাগনপালন করিয়া
আনিয়াছেন, যে দেবর তাঁহাকে অকৃত্রিম তক্তি
প্রকার 'পুণাঙ্গি' বিদ্যা অনুশীলনের ভাৱ পুঁজা করিয়া-
ছেন, সেই যেবরকে তিনি অভিশাপ দিবেন!

তা ভগবান্ এ কথাও তাঁহাকে জ্ঞাতে হইল।
ইহাও পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইল না কেন! এই
বাখাণ দাঃও তাঁহার মনে লড়িল এখনই তাঁহাকে
দাবী-পুত্রের হাত ধরিয়া এ গৃহত্যাগ করিতে
হইবে। তিনি মনে মনে অন্তর্ধ্যাতীকে ডাকিয়া
বসিতে লাগিলেন—"ঠাকুর এ মঙ্গল বিধান, এ
মঙ্গল বিধান", না হইলে তাঁহাকে হাত আরও কি
নিষাকণ কথা জ্ঞিতে হইবে।

অকণ্ঠস্বরের বানপত্রবানি চাড়ে করিয়া দেখাঃ
আশিরা উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাবা ও মন-
কেও তিনি মনে করিয়া আনিলেন।

বানপত্রবানি শব্দের হাতে দিয়া অকণ্ঠ
করিলেন, "পড়ে বেশুন, আপনিত্র সাক্ষী রইলেন।"
কাকনের পিতা কিছু আশ্চর্য হইয়া দাব-
পত্রবানির হই এক হস্ত পড়িতেই তাঁহার মুখ লক্ষণ
কালি হইয়া গেল।

অকণ্ঠস্বরের তাঁহার বিবর্ত মুখের নিকট চাহিয়া
করিলেন, "এ বাড়ী বৌবিসির, আপনাবা ঘেরা
জন্ত আপনাবা বাড়ী ত্যাগ করে যেনেছি, আপনি
এখনই তাকে দেখানে নিয়ে যান। আমি তার
সমস্ত বস্তুপত্র দেব, আর একহস্ত এ বাড়ীতে তার
স্থান হবে না।"

কাকনমাগা ঘরের পাশে ঠাড়াইয়া কান্নাভে-
ছিল, তাহার নিকট চাহিয়া অকণ্ঠ বলিয়া উঠিলেন,
"ও চুড়ি পরতে তোমার হাত কেটে গেল না।
খোল, দীপ্তিগির বৌবিসির চুড়ি খোল।"

মনও তাঁহাকে উই হাতে জড়াইয়া বসিয়া
বাপকণ্ঠকণ্ঠে করিল, "অঃদাঃ বেনবাঃ কি
করচ।"

অকণ্ঠস্বরের নিকটে ছাড়াইয়া লইয়া হেমনলাল
পায়ের উপর পড়িয়া অকণ্ঠপ্রাণপ্রাণ কণ্ঠে দিয়া
উঠিলেন, "বৌবি তোমার বাড়ীতে আশ্রয় স্থান
দিও।"

ভাগের পূজা

(১৩)

[পেশিকা—ঐশ্বর্যশীলা চৌধুরাণী]

(পূর্ণ পূজারীসং :—ঈশ্বরী বৈদ্যনাথ বৈদ্যনাথ (২) শ্রীমত বিজয়র বসুনাথ (৩) শ্রীমতী সরসীনাথ বসু : (৪) শ্রীমত বিজয়চন্দ্র চৌধুরী এম-এ, (৫) শ্রীমতী চাক্রালা বসু, (৬) শ্রীমত অমরনাথ বসু, (৭) শ্রীমতী সীতামণী, (৮) শ্রীমত আনন্দনাথ চক্রবর্তী (৯) শ্রীমতী প্রভাবতী বসু (১০) শ্রীমত বৈদ্যনাথ বসু (১১) শ্রীমতী বিজয়লালা বসু, (১২) শ্রীমত বসু বসুনাথ)

কন্যার কথা

জন্মি, টেলিগ্রাফ লম্বা লম্বা পূব ভূত
পৌছে যায়, আবার কখনো-কখনো বিষম বৈরাগ্য
হয়। কয়েকটি ঘটনা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ
করিছি, চিঠি আর টেলিগ্রাফ আর একই সঙ্গে
এসেছে, যদিও তার ভেতর দশজন নাম বেশী করে
কেন্দ্রীয় হয়েছিল। তবে সাধারণতঃ এতকর হয়
না, হুগলার চিঠি আর বেড়ালার টেলিগ্রামের
পার্থক্য অনেক, আকাশ আর পাতাল—যতখানি !
কিন্তু সমস্ত বিনটা তেটে গেল, তবুও প্রসন্নতা
এলো না, এতে আমার "তার" গুণেই অবিশ্বাস
হচ্ছিল। অফটন যেটা, অফটন যেটা, গেলো ৫৫ ও
বা আদ্যের নিজেই যেটে গেল। মনে করতেনও
আবার যা মনে আসত তাকে জালা করে উঠেছিল।
আমি কোথায় সারাদিন গোকটাকে বাড়ী ঢেকে
মুখেই উত্তানক আশ্চর্য্যাবৃত করে দেবার কল্পনা
করে কাণ দুটোকে লম্বা হরবার কড়ার ওপর
বাড়ী করে রেখেছি, আর লে-কি-না আসবে না ?
এম তেরে হাপসোব আর কিলে হতে পারে ?

টেলিগ্রামে মৌ কথ্য লিখনি, বার্নি লিখেছি,
জেল এম, বড় বড়কার, মা উৎকলি !

মনে মনে সমস্ত স্মরণ কবাকী আলোচনা
করিছি, আর তার পরে প্রদানের অবস্থাটা যে কি
রকমের হবে তা'ও মনে মনে কতকটা কল্পনা

করে কেলেছি। আমার বিশ্বাস 'তার' পেশে পে
তারি থেকে যাবে, তার পর আর্দ্র-পাতাল,
বর্ষ, দর্শ হাতেরে-কিছুই বুঝতে না পেরে দুই দুই
করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বে। পেশের চিত্রা
যে তার কি হবে সে তা জানাই আছে। তারপর
একখানা ট্যাঙ্ক ধরে হাওয়া করে উড়ে এসে শুকনো
হরবারে ঝড়াবে, আমার একটি লাব আছে,
নিজের হাতে হরবারি খুঁজে নিয়ে একবার প্রদানের
শেষপর্য্যন্ত মুখখানি দেখে, আর একবার 'প্রদান',
দানটা এনেছে—'পোনবার পর তার মুখখানি
কেনন হয়—যেখোঁ নিশ্চিত হয়।

সত্যি নিশ্চিত হয়! মা'র মুখ বেবে বুঝতে
পেরিছি, পরমায়োকে পাওয়া না যেতে তাঁকে বড়
উদ্বিগ্ন না দেখছি, এখন যেন তাঁকে অনেক বেশী
উদ্বিগ্ন দেখছি। আমার এই ম-টার স্বভাব এত
দৃঢ়, এত শক্তির দেখেই যেখোঁ মাহুণ তাঁর পাশে
এলে ঝড়াক, তাঁর মনের কথাটা ধরেতে পারবে
না। অথচ সে মনে যে কত উচ্চ, কত মহান, কত
পবিত্র—তা'ও কেলেছি। সেই অনেকদিন আগে,
যেদিন অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর এই মাহী-
মুষ্টিতে কলিভায়ে প্রোথিত। দৃষ্টান্তে নিম্নাঙ্ক
শ্রীমত আমার বুকের বিকে অনিবার্য চাইতে
যেখোঁমুখ, সেদিন, সে মুহুর্তে পত্তর লবণের মাহুণ
বড় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। পাখারপের মতো

অসামান্য, বৈশিষ্ট্য যেরূপে আমার অন্তরের সু-স্বপ্নের
জ্বলন্ত সান্নিধ্যের বীণার শব্দে মুগ্ধ লাগে মতই মাথা
জড়তে লাগে 'বহু' ছিল। তাঁর চোখে তখনকার
সঙ্গে এমন একটা কঠোরতা ছিল তাঁর চিত্ত
অপেক্ষা করে তুলে, তাঁর আন্তরিকতার
কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে এমন এক উজ্জ্বল আভা বিকশিত
হত যে, একবারে যে দেখে, তাকে কিছুক্ষণের
অন্তর্যমের সেই লাভাভিঃ বলে বলে অভিহিত
কেন। আমাকেও হতেছিল। আমিও একে-
ছিলুম, আর আপনাতঃ মনে বলেছিলাম। এমনট
আর বেশি-নি।

লাল ফাগুনের চতু-বহুতম বীণা বাজে,
ততক্ষণের মত সুখ থাকতে পারে, সুখ থাকে তাঁর
পড়াই না। বৈশিষ্ট্য, বীণা বাজলে তাঁর মস্তিষ্ক
কৃত্তি আবার জেগে ওঠে। ততক্ষণ পরে, ঠিক
জামিনা, আমারও মস্তিষ্ক জেগে পিয়েছিলো।
আমাকে যে কেউ বোঝায় করতে পারেন—এ
কথা মনে হতে মিতকেই আমার কথা হতে লাগল।
বীণা বেয়ে পিয়েছিল, হয় বা, তা, যেখানকার
সেইখানে পড়েছিল। বড়ো অসুস্থ, সঙ্গীর
মধ্যে আসলেই আবার সেই পত্ন স্তম্ভিতা মাথা তুলে
বিকল্প-পক্ষে চিত্তবিশিষ্ট পথে বার বার ভেঙে প
বাঁকিয়ে বসে। অনেকদিন ধরে চলেছিল, আমার
সঙ্গে আর দেহ 'বাঁদ' স্তম্ভিতার সঙ্গে।
নিম্নের পড়াতে মেরে নিতে আমি প্রস্তুত
ছিলুম কিন্তু বাবা আপন কারণ বোঝবার
কোন চেষ্টা না করেই কলকাতা বলে পড়াভয়ের
বিচার করবে, তাই সে সুখ ভেবেই আমি পড়াভয়
দীকার করতে পারিনি। সবার চাইতে বোনো তা
আমার ছিল, বুড়ো ম'শরকে। বুড়োমশরকের বাপ
মাকোন কালে কোন বেলে কেউ ছিলেন কি-না
জানি-না, বুড়ো মশার সন্তা কথা বলতে বাপের
কোয়ার যে একদিন করতেন না তা তিনি কখন করে
দশবারের বার দীকার করেন। আর তাঁর দর্ভ-

বাগিনী মার' সখ্যে তাঁর বাগিনী, বাজে চোখে
দেখিনি, তাঁকে জানিও-না। উদাহরণ স্বরূপ বুড়ো
বলেন উৎসাহে পূর্ণবৈদ্য মান্তে তাঁর পূর্ণ ইচ্ছা
নেই, তবে পাঠ্যপাঠ্য পুস্তক বিতে প্রায়ই পাঠ্যপুস্তক।
লাভনিকা বাহু তিনি যেভাবে করে' জ্ঞাতেন।
বুড়ো হয়েছেন তা, যে বোনো লম্বা উচ্চ, তখন
—বাহুপতনের শব্দে পাঠ্য পাঠ্য দীকার কিকিৎ।
প্রসারের মা'কে 'মা' জ্ঞান বলেছিলেন, বুড়ো
কোণিল কাকের বাপের স্বপ্নে বাহু স্বপ্ন, তখন
বাহুস্বই স্বপ্ন, তাঁর পদা বার করে না। মা বল, তাঁকে
কতি নেই, বোনো মা পোড়ের একটাই স্বপ্ন। পে
মা যদি একবার মেরে—বতঃ।

আর অমল! অমল বলে, ঠিক তাই উঠে।
বলে—মা এই নবো আবার মা! এই পূর্ণ বতঃ বাপের
স্বপ্নে—আমার মা! এই মা' চরণার পাঠ্য—
মা, যে বাগিনী' পরে বাগিনী আদি পৌ' আবার মা!
পড়াগীর মত মর্জ্জাখারী পাঠ্য মত মর্জ্জাখারী বৈশিষ্ট্য,
বিধা কান্তিতে এসবিন আবার স্বপ্নে চুপে না'বের
পরিচয় জানিয়ে বলে। বলে—এই মা, কল, এই
মা। তাইরে তাঁর আবার, লক্ষ্যের মা—
এই!

অমল যেদিন আমার চোখের সমুখে মাঝের
ছবিটা মুঠের তুলেছিলে, আমার ম'শরকে;
আমার মেনিনের অংশটা কতক পরিমাণে কল
ভাষা সমুদ্র পোড়ের মতই নিখিখিক হারিয়ে টাল
মাটাল করছিল। কাছে কল আছে স্বপ্ন, বোনা
মাঝে না, লাগতেও পারছি নে, আমার অকুলে
ভাগতেও পারছি নে। ঠিক এখনই বাবা ম'শরকে
আমি মশারের মার' অস্ত্রোত্তম অস্ত্রপাশে টেলে কল
কলকাতায় পেছলুম, আবার স্বপ্নপাশের মত বোনা
মাঝের কতক বেলে কিয়ে আসতে বাবা, উদাহরণ স্বরূপ,
বাহুতর অমল আমাকে ডাক দিলে।

ম'শরকে আমায় আমাকে ছেড়ে গিয়ে
পেল, কোথা পেল, তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম,

অমল তার হাতবস্ত্র বুলিয়ে আঁধাকে নতুন করে গড়েছিল। তাৎপর্য—কতদিন কত রাত্রি নিজেও ভাবনের অতীত দিনগুলো আঁলোচনা করেছি ততই বুঝতে পেরেছি, অমল যদি আঁধার এ নৃশন পথের চালক হয়, তবে সে পথের পথ প্রেরণক একজন * আছেন। সেজন আঁধার সেই মা! তিনি প্রদ্যোতের গর্ভাধারিনি জননী বলেও আঁধাকে গভীরে সন্ধান বসেই যিনি প্রেরণ করেছিলেন। তিনি প্রথম অন্ধার পথ জঘন্যতাকে সমুদায়ের আঁধার দিয়ে চেতনা আঁধাতে চেয়েছিলেন; প্রথম যিনি আঁধাকে মৃত্যু কাঁড়ির মাঝে সন্ধান বলে দিয়েছিলেন! প্রথম যিনি মা'র চরণে আঁধা বলিদান দিতে আঁধার মত পায়শ্বেতও অধিকার আছে বুঝিয়েছিলেন।

প্রদ্যোতের মুখে গয়লা ঘোর হাজারের বয়স পেয়েই আমি কলকাতার ছুটে আসি নি, আমার কলকাতার আসবার সে একটা কারণ হতে পারে, হবে প্রধান নয়। প্রধান কারণ, আমি মা'কে খেতে এসেছিলাম। আমার পরিবর্তনে মা'র কি পরিবর্তন হয়েছে দেখবার দাবি যে কত প্রবল হ'য়েছিল আঁধাও অন্তরে অন্তরে তা শুধু জানে এই জঘন্যটাই!

মা'র পরিবর্তন হয় নি। যা ত নয়, যা যেন আঁধার হিমালয় পুষ্ণ। কত বসন্ত, কত বৃষ্টি, কত জুবুস্প, কত প্রলয়, হবে গেছে, কিছুমাত্র পরিবর্তন নেই—অচল, অটল, অপরিবর্তনীয়।

যে অব্যবিল বেহ হাজা সেই প্রথম যিনেই আঁধার পরে এসে পড়েছিল, আন ও বেদনামুখ, তাই আছে। এটা বেবে আমি খুঁজি হয়েছিলাম। হাজার হোক, চাঁদবিনের পণ্ডিত বেবে কি আর তার আঁধার হয়? অভিমানে বুক হুলে উঠলো, আঁধাকের কবল মে, তাঁর প্রদ্যোতের চেয়ে কোন আঁলে বাটো নয়, আঁল বেশের স্পষ্টতানবের সংস্পর্শ * তরুণ মাগমাটি বুয়ে বাটি পোনা বেরিয়ে পড়েছে, তা কেনেও যিনি তার প্রদ্যোত নানা পাওনা না যেন,

তাঁর প্রদ্যোতের উজ্জ্বলতার প্রতিপ্রভা পাঠে না বাঁকে যে আঁধার থাকবে। আমি ত ঠিকই কংকেসেটলন এমন কতাবেরের উত্তর আমি দিয়ে যাব। আর সে উত্তর থাকে বেশ কংকি মর্মে যা বেবে, তাও করে যাব। আমি এবের বাঁড়ীতে জল প্রেরণও কংকি আঁধার কর্তব্য ছিল সাঁঝাও করা, করেছি, তাও বেশী আর নয়।

অব্যোহ, সূর্য্যবাস্তিক যে—সে আঁধার কত তাহ তাৎপত্ পাও! কৃষ্ণমুগু ত সূর্য্যবাস্তিক যে কি, তার কংকি কতবানি সে তা বুঝে কেমন করে! সে না বুঝে, সূর্য্যবাস্তিক অম্বার নন, পানী তাপী সকলের ওপরই যে তাঁর সন্ধান কর্তব্য, তা থেকে বকিত সে জলো না, কাঁধেই তাকে না সোঁতার অম্বার তানই* সূর্য্যবাস্তিক নয়। এটা আমি বুঝলাম মা'র বুকের একটা কবার।

গয়লা ঘোঁ সূর্য্যবাস্তিক মা'র কোলে যাবা যাবে যেন সেই খেদার বয়েগ অভিজ্ঞতা বদ্বিল, গারি বলে একটু মেবে কেমন কংকেস বাটবে তার ভাইকে দিয়ে* প্রকৃতির বড় বাবু কাঁছে পাঠিয়ে দিয়েছিল, বড় বাবু তাকে বেবে, গারির ভাইয়ের মুখে তার কথা শুনেই যা বলে ডেকে বাঁড়ীর চেতন নিয়ে গিয়ে নিজের বেবে পরিচয় যিনে, তাৎপর্য ক'বিন তাঁর আঁধার বাঁড়ীর লগাই তাকে কত বসন্ত রেখেছিলেন, কিন্তু কাউকে তিনি কোন প্রেরণ করতে যেন নি, নিজেও করেন নি, কেবল এসবিন বৎ- ছিলেন মা মালতী, আঁধার কাপে একটা বিজ্ঞানন দিয়ে বেঁজা হয়েছ, ত্রিণ চমিন হাজার লোকের হাতে আঁধার কাপে যাব, তাঁদের মতো তোমার কোন আঁধার যদি বেবেতে পান, তিনি নিস্তর এনে তোমাকে নিয়ে যাবেন, আর যদিও তাঁদের বৃষ্টি না পড়ে কি কোনো কারণে তাঁরা তোমাকে না নিতে আসেন, এই তা তোমার দর হয়েছে বা, এই যা এই পথ আপনাই পোক, এবের নিয়েও কি তুমি থাকতে পারবে না!

কদিন তেটে গেল, তেটে এসে না দেখে, তিনি একদিন বাবার সমস্ত জালভাঙে ভেঙে যত্নে—তুমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বাঁধতে জান না বরং তোমার অসম্মান করা হবে, না, আমার ইচ্ছা একদিন তুমি কোঁবে আমাদের বাড়িরে হাও।

গরলা বোঁকে লগ্নল, বড় বাবু বয়েন, তেলো না মা, আমার ভাত বাবে। সে ভাতনা নেই। আমায় দ্রাছ, ভাত আমারের কোথাও বাই না, ভাতো না, ঠিক থাকে।—কিছুতে ছাড়লেন না, সেরিত চপুসবো। বা জামিনুয় হেঁদেতি, পরিভোব হবে বোঁবে কত আনৌকীক করলেন, আমতাও বেতে বসেতি, এমন সময় চালিদুখে এসে যত্নে—মা-মালতী, প্রকৃতির বিজ্ঞানে কার হরেক, তোমার আজীর এসেছেন, নাম হরেন—কমল।

গরলা বোঁকে মতাননে নীবে হতে দেখে না যত্নে—এল মা, লজ্জা কি! তার পর?

শিদিমা আমার ভর হয়েছিল...

বল-মা বল!

ভারপর—তোমার নাম করলেন! তোমার বাড়ী কখনে...

সে খাবল। থাকীটা আমার বৃত্তে পারলুম। মা বয়েন—মালতী কমলকে দেখে তোমার ভর হয়েছিল, হবারই কথা, তুমি ভাতো না—কমল সে কমল নেই! বর্ষকমল হয়ে গেছে। কমল এসেছে আমার ছুই ছেলে। এদের রেখে যেতে পারিলে আমার কোন হুংবই থাকবে না।

হাতে অবোধ বৃষ্টি! তোমার অভিমানের ত এই পর্যায়! মায়ের হাতেই একটা পপদের ছবি টাকানো দেখেছিলুম সেখা ছিল—

চপুস বড়পি বহু কুমারী ববনো না!

তাও কি কখনো দেখা হয়?

মা বোধ করি মমতার গাড়ীর ববর নিয়েছেন। আমারই মনে তাবনার অভ্যস্তি না, 'তা.' পেয়েও প্রসন্ন কেবল আশুভে না, মায়ের ভাবনা যে কত কী তা আর জানি নে, না, বুদ্ধিমে।

রাত হয়ে গেল। অন্ধকারে হাতে করে রানোর করণ খুঁজে বেড়াতে লাগলুম, কোন্‌টা প্রাসাদের আগমনের স্থান হতে পারে। তারপর কমলাই এক লক্ষেরও অধিক বার 'করলুম কিন্তু কোনটাই মঙ্গুত হল না। 'মা উৎকণ্ঠিত'—এ খবরের চেয়ে প্রাসাদের কাছে বেনী মূল্যবান খবর যে কিছু থাকতেও পারে না, সেটা খুব ভাল জানিতুম বলেই হুঁতাবনা হ'তে লাগল। লোকের মনের খবর আমি জানি নে, আমার নিজের কথা বলতে পারি, প্রাসাদের লব্ধে হুঁতাবনা আমার মনে স্থায়ী হতে চাইল না! শোকে বলে বটে আপনাদের লোকের ভক্তে অয়েই হুঁতাবনার উৎস হয় কিন্তু আমার তা হয় নি।

খুব মনের জোর নিয়েই তাই কাজে বিধানা বেগার আগে মায়ের বসতে শেরেছিলুম, আমার মনে হচ্ছে, টেলিগ্রাফ পৌঁছোয় নি মা!

মা—তা হ'বে—বলে চলে গেলেন।

আমি বিধানার স্তরে স্তরে ভাবতে লাগলুম, কি আমি চাই? উত্তর হল, গরলা বোঁকে মূখী করতাই আমি চাই। প্রের—তা কেমন করে হবে? উত্তর—প্রদ্যবেক সে ভাল বেলেছে, সেটা ত আর চারোই অতানা নেই, তার সঙ্গে বিধে হলেই মূখী হবে।

অসম্মান বিবাহ আইনতঃ অসম্মত নয়। তবে সমাজতঃ অসম্মত হতে পারে। কিন্তু সে সমাজ, প্রাণকীর্ণ ঘড়ের সমাজ! সে সমাজে আন্তরিকত নেই, অহুঁত নেই, কেবল আবেগের লব্ধের ভেতরটা কঠোর-কঠোর কববেলের মত অসম্মত পুত্র খোলায় ঠেকেছে। মাহুর যে, তার প্রাণ আছে, তার কাছে এ সমাজের দান খুব বেনী নয়, সে অনারসেই এমন সমাজের সত্যের বাহিরে আগতে পারে, এসে বেঁচে যায়ও।

আমি নিজে জানি নে। তবে আমার না-মানার করণ এ নয় যে শুধু গোকাচার পূর্ণ সমাজকে আমি অলঙ্কার চোখে দেখি যেন। তা মোটেই

নয়! আমার মা-মানার একমাত্র কারণ, আমি
প্রাণে করি-নে। কিলের সমাজ ও? কেন সমাজ!
কি কাজ করেছে? তার কতটুকু উপকারে
লাগে?

- প্রশ্নটি মানে, তবে তার মানার মধ্যেও মানিকটা
• বৈচিত্র্য আছে। সমাজে থাকে বলে সে মানে না,
এই খোশটার ভেতর খাঁপ পুরে আবার তাকে
একদিন পূর্ণ করবে এই আশার সমাজকে সে মানে
অন্তর রক্ষা করে চলতে চায়। কিন্তু তা করলে তার
চলবে না। আমি তাঁকে দিয়ে নতুন সমাজ
পড়াব। আমার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ সহায় হবে, পরগা
মো,—হালতী!

অলম্বণ বিবাহ করে প্রলাপ এক ঘরে হয়, আমি
পিয়ে তাকে হৃৎকরে করব। আর এ পূর্ণি আজও
কমলচন্দ্র করতে পারে যে দখলে সে, আর প্রলাপ
থাকবে, সে সমাজ একঘরে নয়, সত্যকরে, সংস্কারের
হবে পড়তে প্রস্তুত হবে না।

প্রসাদের কথা।

অনলের হাতে টেলিগ্রাম থামা দিয়ে বহুদ, তাই
কিছু বুঝতে পারছে?

অলম্ব অনেকদিন লাল কাগজখানার চোখ রেখে
চল করে বলে রইল, তারপর গভীরভাবে বলে উঠল
—তোমার যাওয়া উচিত, প্রলাপ।

উচিত ত, কিন্তু বাই কি করে বল। এখানে-ও
ত কাজ কম নেই।

অলম্ব বলে-তা আর কি করা হবে বল। একটা
বিশেষ কিছু না ঘটলে আর কমল চক্করী তার করতে
না, এটা বুঝে ত?

অন-মনে গেটা যে পী বুঝছিলুম তা নয় কিন্তু
কাজ ও ছিল সেদিন আশাবের অনেক।
সে দিন আবার দেশের সমস্ত চাষীকে
মাঠে বসিয়ে হতে বলে এসেছি। তাদের
নিম্নে আশাবের একটাও মত কাণের ধন্যতা করতে

হবে। আশাবের বেশ কয়েক পাটের চাষ উঠিয়ে দিয়ে
হান, তুলো এ সবের চাষ তাবের দিয়ে করতে
চাই। প্রথমে তাবের কিছুতেই রাজী করা যায়
নি। ঘরে ঘরে পিয়ে দেখেছি, প্রত্যেক-কে আশাবা
বুঝিয়েছি, অমুনয়, বিনয়, কিছুতেই কিছু হয় নি।
তার তাবের পিতৃ শিতাবহবের ওপর খুব লজ্জাবান
তীর্থ যে কাজ করে গেরেব, তার তা'ত করবেই,
তার কম বেশী একটু করবে না, করলে তাবের
তীব্র অশ্রদ্ধা করা হবে এই তাবের মত। তার
ওপর স্বাধের লজ্জাবান যেখানে অধিক, সে পথ
ছাড়ানো ও ত সহজ নয়। তাই এখন তাবের
আশাবা আশাবা মত করতে কিছুতেই পাগল খেল
না, তখন আশাবা তাবের লক্ষ্যকে বড় হুঁইয়ের
মাঠে বসিয়ে হতে বলে এসেছিলাম যেখানে আশাবা
তাবের বুঝিয়ে দিতে চাই; পাটে আর তুল্য প্রত্যেক
কি আর কতখানি।

পাটের বীজ বোণবার সময় এসে পড়েছে,
আলফল মধ্যেই সবাই খাব বুঝে কেবুবে, এমন
একদিন এখান থেকে চলে গেলে কল যে কি বিভ্রান্ত
তা খুব ভাল করে জানি বলেই কমল চক্করী তার
পেরেও ছুটতে পারি নে। আবার মা উৎকণ্ঠিত
হবেন ও পারের শক্তি হারিয়ে যেন আছে। আমি
আমি জানি, মা আমার মা-খাবার কারণ জানলে
কখনই আমার উপর বিরক্ত বা খুব হবেন না। কিন্তু
গেটা অনেকবার উপাই বা কি! 'তার' করে হবে?
'তাই' অবজাই এখনই পৌছে যাবে, মার ভাবনা ও
আর থাকবে না, কিন্তু—কিন্তু—তা'তের আমার
মনের ব্যাভুলতা নিবারণিত হবে কি?

কমলের তাবের কি দরকার, তার কোন উদ্বেগ
না থাকলে ও আমি বুঝতে পারছিলাম, অত্যাধিনী
মান্তীকে পারা যায় নি, তাই হতে মা উৎকণ্ঠিত,
সেই জন্যই আমার আশাবা! কমল পারবে নি
নি তাকে বুঝে বার করতে, পারবে সমস্তই ছিল।
কিন্তু আপন স্বাধ বাক্যে ছিল বসেই অত্যাধিনী

ফলনা করে আমি অন্তরে সুখের আকাংক্ষাই অনুভব করছিলাম। কখন অনেক ধরনের প্রবাস, অর্থহীন, শোকজনিত তার যথেষ্ট। তার চেষ্টার সত্যিই মাল তীতে রহত আদর। ক্রিরে পাব, এট আশাপাতিতে আমি অন্তরের হারি সিকনে জাগিয়ে রেখেছিলাম, কনলের তার পেয়েই আমার সে আশাপাতি সন্মিলিত হয়ে গেলে।

তাকে ক্রিরে না পাওয়ার যে প্রবণ—অন্তর করে আমার ভেগে উঠলো। এই বলে মনকে প্রবোধ দিলুম, আমার কোন হাত নেই।

কিন্তু এ প্রবোধ ত মন মনতে চায় না। সে যে বাস্তবায়িত তরঙ্গিত মতই খেরে যেতে চায়, সেইখানে সেই ক্রিয়াকে অর্পণে স্থানে যেখানে অভ্যাসিনী মালতী আপন-ভারা বিস্তারিত হয়ে পড়ে আছে। দুটি মননে তার মত কাণ্ডাইছে।

অমল এ-নব জন্মিত না, আমি তাকে না বলে পারিলাম না। ব'লে খেন বৃদ্ধ খালি হয়ে গেল।

অমল বলে—আমি এদের হাতে পায়ে ধরে একটু দিনের সময় চেয়ে নেব, তুমি একদিন পুরে এস।

আমি বল্লাম, তাই অন্ত বড় সহরে কোণায় সে আছে, একদিনে কি তাকে খুঁজে পাব।

অমল বলে—পাবে, পাবে, নিশ্চয় পাবে। আমি বল্লাম—পাবে।

আমাদের মধ্যে অমল ছিল, মতাবাদী বহি। তাকে আমার ভালবাসতুম, প্রাণ কষ্টতুম, তর্কিত করতুম। তাই তার কথা শুনে সত্যিই আমার মনে হল, হারত পাব। কিন্তু তার একদিনের অস্তিত্ব জন্ম যে বিকল হয়ে গেছিল, তাও ত জানি না, সে কথাও বল্লাম।

তখন অমল বলে—সেদিন তুমি তাকে খুঁজে-

কিলে বটে প্রাণ, কিন্তু এখন কবে জীবিত হয়ে যাকনি।

খুঁজি নি?

না। সেদিন তুমি মালতীকেই খুঁজিত যেখানেছিলে, তোনার মালতীকে খুঁজিত যাও নি, সেলে পেতে।

অমল...

শোন! জাহাজে বকনা তর না, এই মালতীকে তোমার চাই। আমার মতে তুমি এখনই কলকাতা চলে যাও। গিয়ে মালতীকে খুঁজে বের কর। তারপর...

অমল এক মিনিট বেগে বলে—প্রাণ, যেখান কাঁধ করতে জাহাজ চাই, সে জাহাজই অল্প কোণায় থাকে পড়ে থাকে, তা হলে দেশের কাঁধ করতে কেমন করে তাই। মোহাই প্রাণ। জাহাজকে উপবাসী রেখে দেশের কাঁধ করতে নেমে দিখ্যা পড়গ্রহ কর না। আমার কথা শোন প্রাণ, আমিই চলে যাও।

আমার মাথার ডেডের তখন কি-বে হজিল, আমিই জানি নে। কোন কথাই হির ভাবে ধারণা করতে পার্লাম না, বল্লাম—ভেবে দেখি অমল।

অমল বলে—ভাবতে সময় লাগে, সময় চিরদিন বিধান-মাতক।

কিন্তু মা'র মত ত জানি নে যা।

তার পরকার নেই। যা যে প্রাণ। সত্যানের যা কি সত্যানের মতের বিরোধী হতে পারেন।

বল্লাম—তাৎ'লে কাঁধ মকালেই ধাব।

অমল বাড় নেড়ে চলে গেল, রাত তখন ১২টা ১০

* প্রীত্বী প্রীতিপ্রসন্ন প্রাণী নামের পুত্রের জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

বিষয়বুদ্ধি ।

[ঐতিহাসিক বক্তব্য]

ঐশোপনিষদে আছে, "সবস্তই ঐশ্বর্যমহ, ইগা অংগত ইহা বিষয় বুদ্ধি ভাগ কর ।" বাস্তবিক এই বিষয়বুদ্ধি ভাগের মূল কারণ, বাহিরের বোধ কাটানো আশাযের বস্ত কাটবে, ততই ভিতরের শক্তি বর্ধিত হইবে । আত্মশক্তিতে আশ্রয় নির্গণ আত্মবল সংযোগ করিতে পারি ।

ঐতিহাসিক উপনিষদে আছে, "তপত্তা বাগা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর, তপত্তাই ব্রহ্ম ।" আবার কোষীতকী উপনিষদে আছে, "বাহ্যকে জান, আদি ইহাই মাহুদের পক্ষে সর্বাঙ্গেকা কল্যাণক মনে করি যে সে আশাকে জানিবে," মাহুদের মধ্যে এই যে তপত্তাভুক্ত আশিগার ইচ্ছাও অব্যবসায়, ইহাই যদি তপত্তা হয়, বা ব্রহ্মগাত্যর চেষ্টা হয় এবং সমস্তই যদি ঐশ্বর্য হইত বলিয়া ধারণা করিবার মনন শক্তি লাভের জন্য আশ্রয় ব্যাকুল হই, তবে বিষয়বুদ্ধি সত্য সত্যই কতকগুলি আশাযের বিষুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ।

বিষয়ের সহ হইতে কালের অর্থাৎ কামনার কল্প । কাল হইতে জ্ঞেয়, লোক হইতে বোধ, বোধ হইতে দৃষ্টি বিজ্ঞান, দৃষ্টিজ্ঞান হইতে বুদ্ধি লাগ, বুদ্ধিলাগ হইতে জ্ঞান আত্মজ্ঞানী । সীতীর এই যথার্থ বাণীর প্রচারের মূল বিষয়ও কামনার সমালোচনা । মন ও বিষয় আশাযের ইন্দ্রিয় প্রাণ বিষয়ঃ কর্তৃক কর্তৃক । এই মনই যখন আত্ম বিষয়ে কামী, তখনকার বিষয়বুদ্ধি আশাযের আত্মশক্তিতে উৎকৃষ্ট করে । এই মনই যখন যদি বিষয়ে কামী, তখনই মন হইতে কাল আশাযের জ্ঞানের পথে লইয়া যায় । তখন সমস্তই যে ঐশ্বর্যমহ, এ ধারণা আর আশাযের থাকে না । তপত্তা যে ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে জানাই যে উগ্রতি বা মুক্তির কারণ, সে কথাও আর মনের মধ্যে স্থায়ী হয়না । আশাযের বিষয়বুদ্ধি আশাযের পাইয়া মনে । বিষয়বুদ্ধি

বলিতে তখন আশাযের বহিঃবিষয়ের বিচারই মুক্তি ইহাই বিষয় ভোগের স্মৃতিতে আশ্রিত করে ।

মনোবর্ণপণে বুদ্ধির বিশেষ বিকাশ মনন ব্যাঘ্র প্রথম, আশ্রয় তখন ভাগের বিষয়বুদ্ধি বড় প্রণয়না করি । বিষয় যদি সমাজের, ব্যক্তির বা পরিবারের বুদ্ধি, অবসার ও আশ্রয়ের অগ্রসূত হয়, তবে বিষয়বুদ্ধি বড় পাক বলিয়া মনে হয় । কিন্তু পাক কথায় আশ্রয়িক পাক । এক ব্যক্তির পকে বাহ্য অগ্রসূত, অস্তের পকে তাহা প্রতিকূল । মুক্তির যে সমাজে বা পরিবারে বস্ত সমাজ ব্যক্তির প্রতিকূল অস্বাভাবিক, সে সমাজে বা পরিবারে বিষয়বুদ্ধি বিস্তারিত তত পারিবার গঠিত কল পারিবারে পাক যেমন পাকিয়া যায়না, কলই জরিয়া পড়ে, অস্বাভাবিক পারিবারে কি হয়, তাহা সকলেই জানেন । সে স্বতন্ত্র পদ্ধতির ফলে সমাজায়ণের বড় বড় পাক ভগ্ন ও লক্ষণ কর্মকণের সমস্ত বোঝা বহিয়া সকলে মরিয়া যায় ।

কিন্তু এই কল বিধানিহিত স্বতন্ত্র না পড়িলে বিষয় বুদ্ধির বড় প্রণয়না হয় । সমাজের তত্ত্ব যে স্বতন্ত্রি বাহ, তাত বিষয় বুদ্ধি পাকাকি কাঁচা, প্রসিদ্ধ পোকেব হইলে তার জন্য কামী লেখা হয়, যশের, সমাজের, বা ব্যক্তির হইলে তার জন্য ইতিহাস লেখা হয় । এই চেষ্টাও বহুদিন হইতে চলিয়াছে, কিন্তু বিষয় বুদ্ধির দৃষ্টি লাগিয়া আশ্রয় পথের কোথ বিতে পায়েন নাই ।

অস্বাভাবিক বিষয় বুদ্ধি না হইলে বিচার বুদ্ধি নাকি বোটেই থাকে না । পাক বুদ্ধির লোক কর্তৃক না হইলে পরিবার উৎকর্ষ যায়, মনন অস্বাভাবিক হয়, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পোষ্যক হয় । স্বাভাবিক বিষয়বুদ্ধির ও ব্যবহার্যকীয় বিষয়বুদ্ধির বিচারের সাধারণ নাম মৌল্যমণি । সমস্ত মৌল্যমণি শাস্ত্রের মূলে এই বিষয়বুদ্ধি । সমস্ত ব্যক্তির উৎকর্ষ প্রভনের মূলে এই বিষয়বুদ্ধি ।

এই বিষয়বুদ্ধির শিকার কেহই বিশ্ববিশ্বাসের। সমাজতন্ত্রণ বিশ্ব বিশ্বাসেরে এটো শিকার শেষ পরীক্ষা গৃহীত হয়। সকল দেশেই ইহা সাধারণ কথা। অথচ কি সচিবের ও বিজ্ঞানের বিশ্ববিশ্বাসের, কি সমাজের বিশ্ব-বিশ্বাসের কোথাও ও বিষয়বুদ্ধির পাক করা জ্বলিলে উপনিবেশ ও সৌভাগ্য পক্ষে বিরোধ না ঘটয়া থাকিতে পারে না, এমন কথাও অনেক বলেন।

করানী পণ্ডিত কথো বলিয়াছেন, “সমাজের সমস্তই আমাদের অবনতি ও অসংগতন আরম্ভ হয়, আগলে আমরা আঁহবেই লোক ‘খারাপ নহ’” বিষয়বুদ্ধির বিশ্ববিশ্বাসের জ্বালা তখন একদিন না একদিন মিছিত হইবেই। টলষ্টয় বলিয়াছেন, “মানুষ আঁহণের চর, মীন হয় সমাজের ও ব্যক্তির অত্যাচারে।” বিজ্ঞান পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বংশ-সুস্থ হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পেন্নেই হাট দিন অল্পে ও পুরুষকারকে পরস্পর লাভের বলিয়া এই বিজ্ঞানের মধ্যেই লাভ বিচারেন। মানামতে বিষয়বুদ্ধি কটন ও হুয়েরায় হইয়াছে। মানুষ যোগে বিষয়বুদ্ধির হারিয়া একত্র নিয়ান হইয়াছে, যেখানে অল্পেই মানিয়া হুয়ের মিন কটা পুণিয়া পিতায়ে। যেখানে বিষয়বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা, বা ক্রিয়ার আশাও পোষণ করিয়াছে, যেখানে পুরুষকার আশাও আশা মিন কাটায়া, লাফলার অফারে স্তিত হইয়া বিষয়বুদ্ধির বয়েটে তারিক করিয়াছে।

হেন্সেল, শোপারের। উপনিবেশ মন ও বিশ্ব লইয়া খাটিয়া আমাদের উপনিবেশের সঙ্গে আমাদের বিষয়বুদ্ধিতে আরও ভালোপাড় করিয়া বিচারেন। ইয়ার্দন বলিয়াছেন, “বিষয়বুদ্ধির বাহ্যিকী জ্ঞানে নয় কোপলে।” আগল কথা, বিষয় ও বুদ্ধির মূল মিলনে ব্যক্তির প্রণো কোপলেও বটে, জ্ঞানের বটে।

কোপলে জানী হওয়া যায় না এমন কথা

নয়। অগ্রস্ত জ্ঞানী হইতে না পারিলেও বিজ্ঞানের জ্ঞানই নান বণ: লাভ লভ্য হইতে পারে। জ্ঞান ও জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়া জ্ঞানী ও কথো কোপল হইতে না পারিলে মাননীতির জ্ঞক বিচার প্রত্যয় অনেকটা কথিয়া হাইত। আবার কথা এই যে, যথার্থ জ্ঞানী বিনা সাধু বলিয়া, কথো বলিয়া, ধর্মমচারক বলিয়া ধারাবের শুধু প্রসিদ্ধি আছে, একটা জাতিই ধর্ম, সদাচার, ধারাবের কথ ও জ্ঞানের পরিপতি; তাঁরা ছিলেন সাধা মলম—কোপল তাদের থাকিলে ক্ষেত্রিত্ব বিশ্ব হইতেন না, বিজ্ঞানী জীবিত হইতেন না। উপনিবেশের জীবনময় জ্ঞান তাঁদের বিশ্ব বুদ্ধিতে বাববার পরায়ন করাইয়া তাপবর্গে তাঁদেরে বীকিত করাইয়াছেন। তাই নিঃসের ওষধ হুয়ে, টোলের মধ্য বিখাই তাঁরা মন্বন্তর পাইয়াছিলেন। তপস্যা যে ব্রহ্ম, হুয়ে বরণ যে ব্রহ্ম হুয়েরে তপস্যা ও তাঁদেরে ভিত্তি বিষয়বুদ্ধি তাহা স্বীকার করে কই। ধার্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁরা ত্যাপী হুয়ে। বিষয়বুদ্ধিও যেমন তাঁদের নাই, সন্তোষের ইচ্ছাও তেমন তাঁদের নাই। কামিনী ও কাকনের সঙ্গে পলাপলি করিলে বিষয়-বুদ্ধি বোড়ে, আর দলাপলি কারণে ত্যাপের মধ্যেই থাকিত হইতে হয়। কিন্তু প্রবৃত্তি পর নিবৃত্তি। বিষয়বুদ্ধি হিলাব নিকালের মাধ্যমার পর বইন কামিনী কাকনে বৈরাগ্য। বৈরাগ্যই যদি বিষয়ে অগ্রসার হইল, তবে বিষয় বলিলে জ্ঞান করিয়া বলাবার সঙ্গে রাগিনীর জুইই বাতবার জ্বলিতে হয়।

বিষয় বুদ্ধি আঁহতে সন্তোষের কথা। এই সমগ্র বিষয়ে লজ্জার মূলে যেমন বিষয় বুদ্ধি, বিষয় বুদ্ধির মূলেও তেমন সন্তোষ। জ্ঞিত ত্যাপ বর্গে বীকিত নয়, সদাচার ত্যাপবর্গে বীকিত নয়। যদি কামিনী ও কাকনের বিষয় বুদ্ধি মানুষের মনে না থাকিত, মানুষ জ্ঞাত ও সমগ্র পঙ্কিত না। বিষয়-বুদ্ধি ত্যাপ সাধন সাপেক্ষ, সন্তোষও লজ্জার অবস্থা। কিন্তু আঁহল ত্যাপবর্গে বীকিত মানুষের

আম্ভার মীমাংসা করিতে বাইবা পূর্ণ ভঙ্গ, বাশাহু-
ক্রম প্রকৃতি বীকৃত হইয়াছে। শুকদেব গোবিন্দ
ইতিহাস লইয়া বিবর বৃদ্ধির হিসাব চলিবে না।
বলিয়া ভোমারী তানীকে তিরস্কার করে, ভোমারী
ভোমারীর সন্ন্যাসানের অস্ত্র তাবের মর্পকের
শূণ্যে বিতরণ করে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই
যে, এই উপায়ে সকল বেবে, সকল বেবে,
সকল সমাবে বিবর বৃদ্ধির পাকা হিসাব

বন্দই বেবন কটিক না কেন, আহার কাটিয়া
সিদ্ধান্তে। কিন্তু সমাজ বা জাতির মন এই যে,
বেব পণ্ডার সমাজের বা জাতির জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির বিবর
বৃদ্ধির বাবিরেই বাস্তুবকে শাস্তির অধ্যায়ত আম্ভার
কথা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। সকল বেবে উদ্ভূত-
বব অর বৃত্ত। সকল বেবের তানী, ভোমারী-কম্বাই
আম্ভারী, বিবতরী।

প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ

(গল্প)

(প্রিয়মতস্যার লরকার)

ছেলেটির দুখবানি ছিল কতলি আদর মত—
পৌক ঘোড়টি এমন ক'রে ছাঁটা খেন বেবে মনে
বর নাকের নীচে হুটো চামড়িকে জুলছে—চোখে
কাঁদি নংএর মত গোল গোল হুটো চশমা—চুল
এমন ভাবে ছাঁটা, আঁর তার পা'ট বেবন—তাতে
দুব থেকে বেবলে মনে বর বেব মাথাটা একটা
তাগুয়ে ভাল।

কান্তনে হাওয়া কলকাতার রাত্তার ধুগো উড়িবে
তার মাঝে এল ম্পর্ক'রে কি একটা অলস শিংগ
আগাছিন্ন, খাঁটার মধ্যে থেকে লানের বাড়ীর
ঝোঁকিলের গন্ধমতান কি একটা হবির দুর্জনা
তার আগুকে কাতর বতহিল—রমণীমোহন দীর্ঘখাস
ফেলে অক্ষুটবরে হাতুড়ি চলতে চলতে বল্ল—হাং,
জগ-মৌঘন আহার বুঝাই গেল।

যেতে যেতে একটা গমির বোড়ে এসে দুয়গত
বীণাজ্ঞানিবং অলসার কলকাতার স্মৃতিজ্ঞানিবং
একটা গুয়ের জ্যোত ভেলে এসে তার কানের ভিতর
বিধে মনমে গিয়ে পল্লো। মন আগ্ন দস্তর মত
সকে সকে জ্বাল হয়ে উঠলো। একটি বোঁতা
বাড়ীর জানালার পাশে শিয়ানো বামিরে গলা
ছেড়ে এক বিরহ-বিধুতা বিশোণী গান গাইছিল।
জানালার পর্দাবানি বাতাসের হাকার এক একবার

ম'রে ধরে—কিন্তু এমন গুরে না যাতে পরিষ্কার
রূপ চোখে পড়ে।

“ভরী ভোমার পাগর নীরে
আমি কিরি জীরে জীরে

ঐই হ'ল না তোমার পোনার নাথ গো।”

এই দুট লাইন পেয়েই গান শেষ হ'বে গেল।
রমণীমোহন মনে মনে ঠাওরালেন—ঐ মেয়েটা
নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসে। সে যে ছেলের হারে
সকালে বিকেলে বাড়ির থাকে—কলেজ'খণ্ডার
মহর গাড়ী থেকে ঐ মেয়েটা তাকে নিশ্চয়ই বেবে
ভালবেগেছে। তাই আগ কান্তনের বাসজী সম্ভার
তাকে চুঠাব বেথতে পেয়ে অস্থবোধ ক'রে এই দুটা
লাইন পেয়েছে।

১১৭ নম্বর চতুর্থদে ঠাকুরের লেন—এই
টিকানাটা দেখে নিয়ে রমণী মৌঘনকার মত বাড়ী
কিরলো। গিয়ে মনে ভাবল যেহেটাকে সাধনা
নিয়ে একখানা চিঠি দিবি—কিন্তু তার বাঁ দা যদি
খুলে দেখে এট ভরে লিখনো না। মতলব ঠাওরাল
দেই বাসিকবানার একটা কামনিক চিঠি ছাপিয়ে
বেওয়া থাক। ওরা যে বকম fashionable ভাবে
ঐ পত্রিকা নিশ্চয়ই তাবের বাড়ী যাব চিঠিবানি
এইঃ—

১১ নব্বই নব্বইনিনে লেন,
কলিকাতা।

প্রিয়তম,

তোমার-নব্বই একা-একা জন্মেতে তাস্তে
বেধাধ চলেছিলার তামি না—আজ কিছু তোমার
জন্মেতে তাকে আমার আবার ক্রিতে রয়েছে।
আমি দুকতে পেরেছি তপতে অন্তঃ একট
কণ্ডিও আমার কত ভালবাসে। তুমি যে পান গেবে
তানিয়ে আমার শেপার নাই তোমার টাই হয়
নি—তাই কত যারা পেরেছে। আমি তোমার
খুঁতে পাই, নি—তাই সাপের-নীরে আমি তরো-বাঁশি
নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—তুমি যে তরোতে টাই চাও
তেনে আজ আমার দিনের পর দিন তরো বাওয়া
সার্থক হয়েছে। তোমার মতান্ত আরও স্পষ্ট ক'রে
জানতে পারলে এক তরোতে ছইয়নের তাহার
বন্দোবস্ত নীচু-পরি করতে পারতাম। ইতি—

তোমার মিলনাকঙ্কণী
সুবিদ্যে রাবে।

হাসিক পত্রিকার একটা পত্রের ভিতর এই
চিঠিখানা পাড়ে লতিকার বুক আশা আশঙ্কায় দুট
দুট কঁপতে লাগলো। সুবিদ্যে সে এক ভাল-
বাসে, কিন্তু সে কোনও দিনই লতিকার প্রতি
অবজ্ঞার দৃষ্টি বাতীত আর কিছুই বের নাই! বিভা
যুঁজু তপে শুনে যে প্রথম বর্ণনাই তার স্বপ্নের
বেশত হ'য়ে বেগেছিল, এত ভাগ্য কি হস্তাঙ্গিনী
লতিকার হবে যে তাকে এমন ক'রে ঠাণ্ডা তেঁকে
কোলে নেবে। লতিকা এই হাসিকপত্রেই একটা
মেমারো পর লিখে তার ভিতর এই সংবিশ্ব চিঠিখানা
দিল,—

১১ নব্বই চৌধান ঠাকুরের পলি
কলিকাতা।

প্রিয়তম,

তুমি যে এ অভাগিনীস প্রতি কোনও দিন

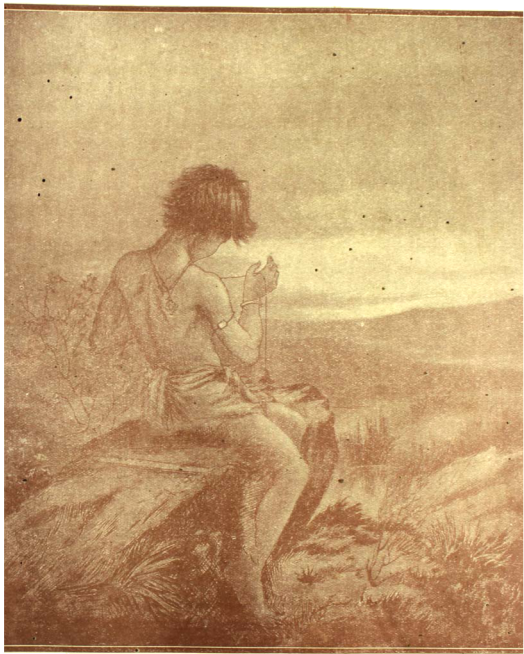
মুখ তুলে চাইবে এ স্বপ্নের ভাবিনি। তোমার
চপে আমার জীবন পুণ্ডক উপহার দেবার সজাব-
নার আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে এ পুণ্ড পাড়ে তা'
কি জানাও। তুমি বিলম্ব কেনে নও বলে বাঁশ
যা তিছুতেই তোমার সখতে হাতী হবেন না। এই
মাসে ১৪ই তারিখে হাওড়া ট্রেনে পাঞ্জাব মেনের
একখানা গেজেট জ্ঞান বিহারি গাভীতে আমি
মধুপুর বওনা হবে। তুমি বর্ধমানে এসে এই
গাভীখানা খুঁজে নিয়ে উঠবে। আমি একাই
খাকবো—যাতি বন্ধ কতা থাকবে। তারপর রুমের
ঘেখানে ইচ্ছা বওনা দেওয়া হবে। ইতি

তোমারই
করলিনী

১৪ই তারিখে বর্ধমানে ধর্মাবির্ধি গাভীতে
রুমখোয়ান দিয়ে উপস্থিত। লতিকার মাতে আরে
তাকে কান্ডে টেনে নিয়ে কত ঘেঁষে কত কথা
বলতে লাগলো—রমণী তো আমার, এ ঘেঁষে
পাশল মাঝি—এ আমার কার কথা বলে? সে
বুদ্ধিমানের মত চুপ ক'রে সেগ—কিন্তু কি এতটা
অজ্ঞাত বিপদ সজাবনার তার স্বত্বকম্প হ'তে
লাগলো। রাত অনেক হ'য়ে এল—শোওয়ার
অন্ত অতুরোণ ক'রে লতিকা বিছানা পাতে আলো
জালতে সেগ। রমণী তাবলো চপে গাভী থেকে
খাপ দিই—এ আমার কি বিপদ! আলো ঘেলেই
লতিকার মুখ চুপ ক'রে সেগ। সুবিদ্যে বনে ক'রে
সে এ কা'কে বোটালা?

অজ্ঞাত পরিচয়ের সেই প্রথম সুরগাত হতেই
সেই অপরিচিতের সবেই তার জীবনের গ্রহি বন্ধন
বিষাতার ইচ্ছা ব'লে লতিকে গ্রহণ করতে হ'লো।

সুবিদ্যে রমণীই বন্ধ ছিল—পরে সফল কথা
বনে সুবিদ্যের আর হাসি ধরে না—কিন্তু
লতিকাকে মাঝখান থেকে গেয়ে রমণী খুবই সুখী
হয়েছিল এবং তাকে সুখ করতেও পেরেছিল।





১৩শ বর্ষ

আষাঢ়, ১৩৩০

৩য় সংখ্যা

শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ

(অধ্যাপক শ্রীঅনুলাদ্রণ বিক্রান্তন)

সমবেত সাহিত্যসৈন্য ও সাহিত্যসুহাগী বন্ধুগণ !

আজ আমাদের বড় শুভ দিন। বাস্তবিক
বৈকুণ্ঠীর্ণ শ্রীঅষ্টোত্তাশোড়শী লীলাভূমি শান্তিপুরে
বহুবানীত পূনোপচার লইয়া তাহার তত্ত্ব প্রদীপ্তনী
সমবেত। এই শুভাশুভানে যোগদান করিবার
সৌভাগ্য লাভের অবিকার্য পাইয়া আমি কৃতার্থ
হইয়াছি। তারপর বর্তমান সাহিত্য-সম্মিলনের
উদ্বোধনকারিণী আমাদের প্রাণ অধোগ্য ব্যক্তিকে এই
লক্ষ্যমিত ও দৌরব্যবহিত পথে বরণ করিয়া আপনা-
দের উদ্বাহরণ ও যথাহুতবহারা যে পরিচয় বিদ্যাহেন,
তাহা একাপ করিবার মত ভাষা আমার নাই।

এইওপ সাহিত্য-সম্মিলনে নেতৃত্ব করিবার মত শক্তি
আবার নাই জানিবার ফেন যে আপনাদের সাধর
আজ্ঞান পিরোধার্থ্য করিয়াছি—তৈকিরতে এই মাত্র
বলিব—বৈক্য-তর্জবাসীতের অনন্তোদ উৎপাদনের
সামর্থ্য বা সাধর বৈক্য-দ্বাদ্ধবাদের নাই।

আজ আমরা দেখেনে সম্মিলিত হইয়াছি, তাহা
অতি প্রাচীন হান। কত প্রাচীন, তা বলিতে পারি
না। এক সময়ে যে স্থানটী জন্মগ্রহণ ছিল, তার অনেক
নিদর্শন পাওয়া য়াচ্ছে। এবার এক সময়ে যে
ইহা একতী সম্মিলিত হইয়া নগর ছিল, তারোও
এমন আছে। এখনও সময় ছিল, এখন

শান্তিপুত্র এগারো সাধারণ লক্ষী। আবার এখন
ইংল্যান্ডে গিয়ে সফল হয়ে বড় সন্তান।
শান্তিপুত্রের পাঁচটি ছাত্রের মধ্যেও বানিতে পাড়া
যায় না। যতটুকু জানিতে পাড়া গিয়াছে, তাহাতে
শান্তিপুত্র নামের একটা ছাত্র বানিয়া বাঁধে করিতে
পাড়া যায়।

নেপালেও শান্তিপুত্রের বেশ একটু
খ্যাতি লভ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। এখন নেপালের
নাম প্রথমে শোনা যায়, তখন সে দেশ নেওয়ারের
হাতে ছিল। মহারাজা অশোক নেপালে যৌদ্ধধর্ম
প্রচার করাইয়াছিলেন। সে সময় ভারতীয় প্রভাব
শক্তিশালী ছিল। ত্রিভুজ ও বাজুলায় লিখিত
নেপালের সংবাদের আদ্যম অধ্যায়ানামা
ছিল। সুতরাং তখনকার পক্ষে বাজুলাদেশের
অনেক ভাব ঐ দেশে সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব
নয়। নেপালে প্রাপ্ত সস্ত্রম নতকের এক বিশা-
লিন্দিত সাতটি শৈব, ছয়টি বৌদ্ধ এবং চারিটি
বৈষ্ণবসংস্কারের মন্দির পাওয়া যায়। ইহার পর
বর্তমান নেপাল আশ্রয় প্রাপ্তরা কক্ষ করিতে
লাগিয়াছিল। একাধিক নতকে বাঘলক্ষ্মীর
বহির্ভাগ চিত্রকর্ম হইতে নেপালে দিয়া নিকেদের
ধর্মপ্রচার করে। কিন্তু বৌদ্ধ সকল নেপালীই
ইহাদের ভক্তি করিত। সম্ভবতঃ ইহার পর বঙ্গের
পূর্বে বর্তমান শান্তিপুত্র বেখানে, সেইখানে ও তাহার
চারিদিকে এক রাজ্য ছিলেন। তাঁর নাম প্রাপ্ত-
বেব মহাশোণাখ্যে পণ্ডিত শ্রীমুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
মহাশয় প্রচণ্ডভাবে লক্ষ্যে নেপালে প্রচলিত পুরাণ
কথার সংবাদ প্রেরণ প্রচার করেন। শাস্ত্রী
মহাশয়ের কথা এই—“অনেক সময় মনে হয়, নেপাল
আগে যৌবন হয় বাংলাদেশই উপনিবেশ ছিল।
ইতিহাসে পড়া যায় না, কিন্তু অনেক পুরাণ
কথা আছে। একটা কথা এই যে, বঙ্গদেশ
শান্তিপুত্র নামে এক নগর ছিল। ভারত-দিকে
সুদূর ছিল, একদিকে যাত্রা কষ্ট ছিল। সেখানে

কচুয়া নদীর এক রাজ্য ছিলেন। তিনি রাজ্য
ভাণ্ডার করিয়া নিছাচাড়া হইলে তাঁহার নাম হয়
শান্তিপুত্র। তিনি বেপালে দিয়া সন্তুষ্ট
প্রকাশ করেন। এখন স্বতন্ত্রকৃত নেপালী,
তিব্বতী ও মালদ্বীপ বৌদ্ধধর্মের প্রধান অধিকারী।”

অনেকে এই প্রাচীন সংবাদটী না জানিয়া
শান্তিপুত্র নামের কারণ ভ্রান্তভাবে কল্পনা করিয়া-
ছেন। কেহ বলেন, শান্তিপুত্রের দুই ভ্রাতৃ উত্তরে
বাংলায় গিয়া নামে এক বেড়াচাড়া থাকিতেন;
তাঁর নামেই শান্তিপুত্র। এ শান্তি বুনি ঐ মহাশয়ের
পিতার চেহেড়া ছোট। কানেই এর নামে নাম
হওয়া অসম্ভব।

বৃহৎসং-বিশ্ব-বক্তব্যের শান্তিপুত্র ও বরুণার
মধ্যবর্তী স্থানে গয়া পার হইয়া মধ্যযুগের বিকে
যাত্রা করিয়াছিলেন। বাঘল নতকে বঙ্গদেশকর্তা
রাজা গঙ্গেশ্বর সময়ে শান্তিপুত্র নামের অতিথের
ক্রমাগত পাওয়া যায়। তখনও নাম ছিল
শান্তিপুত্র। ঐ মহাশয় প্রচুর কীর্তিকালে শান্তিপুত্র
সহর এক কালিদাস লিখেন ছিল। কালিদাসের
জন্মের সাধারণ নামে এই সহর নামন করিত। শোনা
যায়, সুগল শাসকেরা এক সময়ে শান্তিপুত্রের চূর্ণ
নির্মাণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধের আশ্রয় ওয়ালি
সুতরাগত, সারাগত ও তৌলানীর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ
করিয়াছেন। একবার শাহ শান্তিপুত্রের পণ্ডিত
সোমসুন্দরী সুতরাগত নির্মাণ এক পুস্তককে এই
নগর বেলাত যেন। ভারতের শান্তিপুত্র নবীরা-
দিশতিপুত্রের হস্তগত হয়।

নবীরাবিশিষ্ট কল্পনারের সময়েও শান্তিপুত্র
অগম্যভাবে সুদূর বঙ্গের লক্ষ্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই
শান্তিপুত্র হইতে যেদলক পাউণ্ডের সুদূর বঙ্গ প্রতি
বঙ্গের বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ হইত।

পূর্বে শান্তিপুত্রের প্রধান বেশ ছিল। তাঁর
নামে প্রাচীন ও বাজুলায় যথেষ্ট ইতিহাস। বাজুলায়
সময় হইতে শান্তিপুত্র পবিত্র তীর্থে পরিণত

হইয়াছে। এক সময়ে এখানে খুব সংস্কৃত ভাষাও
হইত। চতুর্থাঙ্গী টোলও যথেষ্ট ছিল।

শান্তিপুত্র অনেক পুরাণ জিনিস আছে।
এখনকার যোগদান, পাড়ার প্রাচীন মন্দির,
ঐশ্বৰ্য্যের সময় ১১১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরমুৎখান
অর্জুণ স্থাপিত। রাজা হিমকুজের হাজার গোল্ড-
টামের মন্দির ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত। আমি
শান্তিপুত্রের ইতিহাস অগ্ৰহাণ্ডিতে খানি নাই।
এখানে আলিবাখি, আপনাবের লাঠাচো অনেক
জিনিস শুনিতে ও শিখিতে। শান্তিপুত্র অনেকদিন
হুইতে শিকার কেন্দ্র ছিল। বহুকাল হইতে শান্তিপুত্র
ও নবাবী অজ্ঞেয় বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাচীনকালের
কথা চাড়াইয়া বিশেষ আধুনিক যুগে সাহিত্য-
স্থলীতে শান্তিপুত্রের সৌরভ বড় কম নয়। এখানে
হইতে মানিক ও সাম্প্রতিক বাহির হইয়াছে।
কায়, অলম্বার, মর্শন, সাহিত্যে এরেশের কৃতিত্বও
যথেষ্ট। যে দেশের পণ্ডিত সেখানেই ভট্টাচার্য্য
অতি প্রবল স্থাপনিক এই বটলম্বের টীকা প্রণয়ন
করিতে পারেন, সে দেশের সর্গ করিবার নাই কি ?
তবে ইহা সত্যতঃ সত্য। বঙ্গসাহিত্যের লেখক
আশোনাগাল সোখানী, বিহারীলাল সোখানী, লাল-
মোহন বিজ্ঞানি প্রভৃতির নাম সর্বজনবিদিত।
হেনোয়ারিলাল সোখানী, কলকাতাবাস বন্যোপাধ্যায়
মোহাম্মদ হক এই সব সাহিত্যিক শান্তিপুত্রের
অলম্বার। কত নাম করিব- অস্তাব্দীনা সৃষ্টিত
সত্যপতি মহাপ্রাণ ও কবি মোহাম্মদ হক সাহেব বহু
সাহিত্যিকের নামের তালিকা বিবাহেন। সাহিত্য-
সেবার শান্তিপুত্রের কৃতিত্ব বুঝাইতে হইলে একটা
খবর প্রবন্ধ লিখিতে হয়। তাহায়েই সে দিকে
আমি আর কিছু বলিতে চেষ্টা করিব না।

আজ শান্তিপুত্র-সাহিত্য-সম্মিলন। এ সম্মিলন
সাহিত্যকেই উপলক্ষ্য করিয়া। এ সম্মিলনে কিছু
'বলিতে হইলে সর্বাঙ্গে সাহিত্যের কথাই বলিতে
হয়। সাহিত্য বলিলে আমরা কি বুঝি ? সাহিত্য

স্বামী আমরা প্রথম পাঠ্য সামগ্র্যের সীমাবদ্ধ।
এ সাহিত্যের অর্থ কি, তাগা উত্তর দেওয়া যায় না।
বিশেষতঃ একজন প্রাচীন চিন্তাবিদ। ইনি
সাহিত্যের বেশ বহুবিধ একটা ধর্ম কথিত করেন।
হিতের গতি, অঙ্গের গতি বাচ্য বর্ণনায়, তাহাই
সাহিত্য। সাহিত্যের বাহা সাহ, তাহাই সাহিত্য।
সুহৃৎ দেখা হইতেছে, বাহাতে সমাজের কল্যাণ
হয়, তাহাই সাহিত্য। এই সাহিত্য জাতির উন্নতির
মানবত। তেজ সাহিত্য তেজ্যে বিষয়ে কিছু
উন্নতি করিয়াছে, সেই জাতির জাতীয় সাহিত্য
হইতে ভাগ প্রমাণিত হইবে। সাহিত্য গৃহের ও
জাতির জীবনীশক্তি। উন্নত জাতিবাহেরই গির্জা
সাহিত্য আছে। জাতি সুপ্রাচীন কাল হইতে
কতপ্রকারের কত প্রচেষ্টার ফলে, কত প্রকারের
প্রতিঘাতে সভ্য নাজি, ক্রুতা ও দৌরব্যস্ত
সামাজিক পরীতে আচ্ছন্ন হইয়াছে, পিণ্ডিত সাহিত্য
ছাড়াও তাহার প্রাণ সমাজে বর্তমান রহিয়াছে।
সমাজের উত্তরী, ইতর ভ্রম, ধনী হইতে ইগোরে
সকল রকম কর্মপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানপ্রচেষ্টার মধ্যে
এজের সাহিত্য বর্তমান রহিয়াছে। সে সাহিত্য
এখনও হয় নাই, কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমাজগত হইয়া
আছে। প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত
মানুষের সমস্ত লক্ষ্য করিলে, পরীক্ষা করিলে,
ভাষার, ভাবে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে এই
এজের সাহিত্যের এক কলা কৌশল বলা পড়ে, এত
ক্লম ও অস্বস্তির সভ্য হুপাইয়াছে প্রচেষ্টা হয় যে,
সুখ তাহার বিনয় আলোচনা করিলেই এগার
সাহিত্যের অনেকাংশ সর্গসম্বন্ধ করিয়া পড়ে।
মানুষের পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি, প্রতিভা ও বুদ্ধি
এই সাহিত্যকে পক্ষে সমস্ত বংশের হারা পড়িতেছে,
তাঁহা তাহাতে পেরে বিস্তৃত না হইয়া জাতি
পাড়া যায় না। অসত্য জাতির পিণ্ডিত সাহিত্য
খুব কমই আছে; অনেক জাতির প্রাচুর্য বা দৌরব্যস্ত
সাহিত্যই বর্তমান।

লিখিত সাহিত্য জাতির উন্নতির ইতিহাসের একাধিক বাহ্যি আয়ত্ত্ব স্থাপিত কথিত্য। এই হিসাবে বৈদিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য, আধা আনর্ধ্য সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, ভারতে ভাষ্যবহিষ্ঠিত জাতির সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনা করিবার বিষয়। বিশ্ব-সাহিত্যও এই হিসাবে আলোচনার বিষয়।

সাম্প্রতিক ও প্রাকৃত সাহিত্যের বিকাশের ধারার অন্তর্গত পথে প্রাকৃত সাহিত্যেই একাংশিত বাস্তব সাহিত্যের সৃষ্টি হইল, তাহা ভাষ্যবহিষ্ঠিত পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিপাক করে আলোচনা করিতে হইবে। বাস্তব সাহিত্যের পরিপূষ্টির সহিত বৈদিক সাহিত্যের সৃষ্টি সংঘট। বৈদিক সাহিত্যের ভ্রমবিভাগের পর বাস্তব সাহিত্য আদ্য কইটুকু পরিপূর্ণ হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। বাস্তব সাহিত্যেই উন্নতিপ্রবাহী জাতি, বাস্তব সাহিত্যের গতি, ক্রিতি ও পরিণতি লক্ষ্য করিলে তাহা বিশেষরূপে স্মৃতিতে পাই যায়। নবজাতি ও নতুন সভ্যতা গড়িয়া উঠবার সময় ধীরে ধীরে যে সভ্যতার ইতিহাস রচিত হয়, সেই সভ্যতার ইতিহাস সাহিত্যের আশ্রয়। স্বাভাবিক ও স্বদেশিক মনে ও চরিত্রে, রাষ্ট্র ও সমাজে প্রেরিত করিয়া তোলাও সাহিত্যের কাণ্ড। আবার জাতির কর্তব্যের পরিচয়ের নামও সাহিত্য। প্রবাস্যক সাহিত্য উদ্ভবস্থল সাহিত্য, প্রবাস্যক সাহিত্য সভ্যতার ধারার ইতিহাস মাত্র। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যকলা প্রকৃতির রহস্যময় সৃষ্টি, ইহা ইহা করিয়া সৃষ্টি করা যায় না। সাহিত্যে এই কলার আবির্ভাব চিরন্তন, কিন্তু ইহার আদর্শ সম্বল সমর সমান নহে। এখনকার সাহিত্য-কলা-কৌশলের স্তূপল নির্মাণ লেখ্য পর কলাকৌশলকে বহনও প্রকাশ্য করেন, বহনও বা নিশা বহন। ইহার অর্থ কলার শাস্ত্র সৃষ্টির আলোচনা-মূলক

এই নিশা বা প্রকাশ্য নহে, ইহা আদর্শমূলক আলোচনার পরিপূর্ণতা। সাহিত্যে এখন সাক্ষ্যের প্রভাব রসবস্তুর ছাড়াইয়া চলিয়াছে, এখনও কেহ কেহ মনে করেন; কিন্তু সাহিত্যে মতেস্ব প্রভাব, সাক্ষ্যের সমালোচনার প্রভাব বর্তমান সাক্ষ্যেই রসবস্তুর উপেক্ষা করিয়া, অজ্ঞা করিয়া সাহিত্য বাস্তব সাক্ষ্যে পাবে না, ইহাও নিশ্চিত। সাহিত্য রসবস্তুর বস্তু, সাহিত্যিক এই স্তূপকার সিদ্ধ তপস্বী; সিদ্ধ তপস্বী হইয়া সাহিত্যের বস্তুজীব মঙ্গলকাম হওয়া যায় না। এই হিসাবে সাহিত্যিকের বাস্তব যে কত বেশী, তাহা বলিয়া বুঝান সম্ভব নহে। সাহিত্যের বাস্তবিকি, তাহা সাহিত্যিককে সৃষ্টিতে হইবে। যা তা লিখিয়া সাহিত্য-লেখকের কাকি দিয়া জাতিকে পশু অবস্থায় করিয়া তুলিলে প্রত্যাহার আছে।

মানিক, মানিক, মানিক, বৈদিক, মানিক পত্রাদি:ত দেশের শিক্তি লোকের জ্ঞানমূল্য মিষ্টবে, কর্তব্য বা ভাবে, ইহাই মানিক। মানিক পত্রের পর ও কথিত্য, উপজ্ঞান ও ভ্রমকর্মাদি বর্তমান সাহিত্যের প্রাণ ইহা উত্তীর্ণ, তাহাই হইয়াছে। যে দিক দিয়া দেশের প্রাণের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সেই দিক দিয়াই দেশকে ভাগাইয়া তোলা সাহিত্যিকের দক্ষ। কিন্তু না মানিক বর্ষ বেশ তন্ত্রাভিষ্ঠিত—নিষ্ঠিত—ভোগোপাত বা ভোগো-প্রভ ইহা পক্ষে, তাহা তো সাহিত্যের স্তূপকন নহে।

আজকাল উপজ্ঞান নাটকে রানি রানি আদর্শ সাক্ষ্য হইতেছে। সাহিত্যের সাধনা করিতে হইবে, এই অজ্ঞাতে তাহার শিষ্ট লভের স্তূপ নতুন নতুন পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। সাধনা করিতে হইলেই যে, সৃষ্টিভুক্ত আদর্শমূলক বস্তুতে হইবে, এ কথা কে বলিবে? সাহিত্যের বাস্তব সাহিত্যিকের বাস্তব হওয়া উচিত। বাস্তব লিখিব, তাহাই লিখিব, তাহাই, রসবস্তুর পর মতো

প্রচার করিব, ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত কথা নয়। প্রকাশক বা পুস্তকবিক্রেতারও ব্যক্তিগত আদর্শ। কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যক্তিগত স্বার্থের অনর্থক অর্থ সকল সময়ে ব্যক্তিগত দেয় না। প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতার উভয়েই সাহিত্যের আদর্শবান বাচে, সুতরাং সাহিত্যের প্রচার ঘণ্টা হয়। কারণ, সুতরাং সাহিত্যিক তখন সত্যের কাকিতে অত্যন্ত হয়, অর্থভাবে ব্যবসায়ের অর্থপ্রাপ্ত প্রকাশ্য সাহিত্যের ব্যক্তিগত স্বার্থের বোঝা আর নষ্টে প্রভাব হয় না। প্রকাশকের বোঝা উচিত, খাটি সাহিত্যকে বাছিয়া লওয়া, খাটি সাহিত্যিকের উচিত, প্রকাশককে সব পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু ইহা কথার কথা মাত্র। কখন ইহাতে ঘণ্টা কাজ হয় না বলাইই এককাল-সমিতি, এক-বিবেচনা সমিতি নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাহিত্যে নিষ্ঠার অভাবে জাতির অধঃপতন হয়, সাহিত্যে পড়াশুনার পথের জাতির শক্তি ও বাহ্য নষ্ট হইয়া যায়। অসুস্থরূপে খাবলখনসুস্থ কবিরা যায়। সাহিত্য অসুস্থরূপে নহে—সাহিত্য করণ। ইহা জাতির শক্তি সামর্থ্যের সূত্র পরিচয়।

সাহিত্যে নীতি, সাহিত্যে বাস্তবতা, সাহিত্যে সমান স্বকণ, স্বার্থস্বপ্ন, এই সকল কথা নুতন নহে। সাহিত্যে যাহাকে impulse: বলে, তাহা বাস্তব নয়, আদর্শও নয়, নীতি তো নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু প্রকৃতির ইহা যে ব্যক্তিগত স্বার্থ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই impulse কখনো ছোট, কিন্তু প্রভাব বড় ঘণ্টা। কোন সাহিত্যে কোন ধূপে কোন মনে ইহার প্রতিফলিত হইতে পাওয়া যায় নাই, তাহা অনুসন্ধান করিলেও মিলিবে না। এই যে কলার জ্ঞান তর্ক, বাস্তবতার জ্ঞান তর্ক, ইহার মধ্যে যেটুকু impulse সেইটুকু সত্যই মৌলিক, বাস্তবিক খাটি। সাহিত্যে নীতি ধর্মের বোঝাই দিয়াও তাহার স্থান দিতেই হইবে।

এখন বিজ্ঞানের দৃষ্টি—সুতরাং সাহিত্যের প্রকাশক ও প্রকাশক, প্রকাশনা ও বস্তুর পন্থা হইতে

পাথে বটে কিন্তু পন্থা বেওয়ার মালিক বাহার্য, তাহার পক্ষে ইহাতে পানিই চাইবে। এইজন্য এখন এই বিজ্ঞানদৃষ্টি বিজ্ঞানের সমর্থন প্রয়োজন বিশ্বসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বিভাগও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যেখানে বিভাগের আলোচনার জাতি সত্যবিত্ত হইবে, যেখানে জ্ঞানীরা দূর হইবে, সেই সেই বিভাগের আলোচনা নিষ্ঠার প্রয়োজন। শিল্প সাহিত্য, কৃষি-সাহিত্য, বাণিজ্য-সাহিত্যের পরিপূর্ণ বস্তুসাহিত্যের ঘণ্টা হয় নাই। অর্থাৎ সত্যসম্মত বস্তুবিধ এখন নিঃস্বের মেল, এখানে বিশ্বের সকল জাতির অর্থ আছে, নাই শুধু বাস্তবীকরণ।

শিক্ষার সাহিত্যের পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু যে শিক্ষার চাকুরি করিবার স্পৃহা সাহিত্যে উঠে, অল্প অল্প কোন পথ দেখিবার দল হইতে হয় না, শক্তি থাকে না, সে শিক্ষার ক্রিয় সাহিত্যের ইতিহাস ভবিষ্যতে লিখিত হইতে পারে, তাহাও আলোচনার বিষয়। জাতির জীবিত নষ্ট হইলে জাতীয় সাহিত্যও পঙ্গুপাশে পড়ে। তবে জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপ থাকে না, অল্প সাহিত্যের অংশ নাই হইয়া পড়ে। পরে অল্প সাহিত্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, বহুদিন পরে তার আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতি হইয়া পড়ে।

সাহিত্যে অসুস্থরূপেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু অসুস্থরূপকেও নিজস্ব জাতীয় প্রকৃতির অনুসরণ করিতে হইবে, অসুস্থরূপেরও করণ করিয়া হইতে হইবে। জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে ইহাকে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে রাখিতে হইবে। অল্পের সাহায্য হইলে অল্পের কোষের প্রসঙ্গ সাধন শক্তি হইবে না। তখন সাহিত্যও জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

দ্রষ্টব্য বর্ণনাত্মক মনোবোধ্য আদর্শ অক্ষয় সত্যের মধ্যস্থ যে দিন চৈত্র-সাহিত্য-সম্মতনের অভিভাষণে আলোচ্য-প্রসিদ্ধ, নানাবিধ ব্যক্তি

কবিতা, কবিতা এই ভাবিত রকার ভক্ত
বলিয়াছিলেন—সাহিত্যে ব্যাকরণের বিধিগুলি
আলোচিত হওয়া আবশ্যিক, সে দিন তিনি রচনা
সাহিত্যের এক নতুন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।
সে দিন তিনি এই কথা বলিয়া যে অনেকের নিকট
উপদেশামূলক হন নাই, তাহা বলিলে সত্যের
অপলপ করা হয়; কিন্তু তিনি যে কত বড়
একটা সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।
তাঁহা চিন্তার সাহায্যে আমরা বেশ বুঝিতে পারি।
ভাবিত অগ্রিম ব্যক্তির অগ্রিমের উপর নির্ভর
করে। ইচ্ছাশক্তির মন মূহ ও সবল, তাঁহারাই
নব নবোদ্বেগমালিনী বুদ্ধিগণে সাহিত্যকে রম্যমান
করিয়া সজীবিত করিয়া থাকেন। বেহেশত বাস্তবের
মিকে তিনি অবস্থিত হইতে বলিয়া যে প্রভুত
উপকার করিয়াছেন, তাহা ভাবিত কখনও বিস্মৃত
হইবে না। সাহিত্যের প্রতি একটা নতুন পথ-
প্রদর্শকরূপে তিনি বাঙালীর নিকট চিরকাল
বরণ্য থাকিবেন। তাঁহার পূর্বে এই মন লেখক
মালবক-সাহিত্য-সম্মিলনের অভিযোগে মনসিক
স্বাভাবিক্যের প্রভুত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।
সে আজ নব বন বন্যস্রের কথা। তারপর যে দিন
‘সাহিত্য-সম্মিলন’ বহুজ্ঞানোদয় সিংহ মাসের দ্বিতীয়
অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক সম্মেলনের ‘সাহিত্য’-পক্ষে
‘সাহিত্যে ব্যাকরণ’ নামক প্রবন্ধ ব্যাকরণিক
ভাবে প্রকাশ করিতে পারিলেন, তখন প্রাণে
বড় আনন্দ হইল। আমি অনেক সময় ভাবিয়া
যাচ্ছি, আপাত-মনোঃ প্রভৃতির দোষের কারণ
সবুজ জ্বরের উদ্ভাটন কি ব্যক্তি-সাহিত্যের প্রতি
নির্ভরিত করিবে? জ্বরের বিষয়, সিংহ মাসের
স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্য-
ভাষন হইয়াছেন। তাঁহার এই দুঃসাহসের পরিচয়
দেখিয়া অনেক সদুদ্বেগম মর্মান্বিত হইয়াছেন মত।
কথাসাহিত্যের তিনি যে একজন বোম্বা নন,
এ কথা বলিতেও তাঁহার কুপ্তি হন নাই। তাঁহার

অনবদ্য মূল্য উপভোগ ‘সাহিত্য’-এ লেখক তিনি
কিনা, এ সম্বন্ধেও কেও কেও সম্মতি। তারপর
আমার প্রবন্ধ বড় সুসাহিত্যিক কিতাব-
ঠানুর মাহাত্ম্য তাঁহার নব প্রকাশিত ‘সাহিত্য ও
সাহিত্য’ আটের প্রবন্ধ অতিবাক্যে কিতাব, সে
সম্বন্ধে বিবাহিত আলোচনা করিয়াছেন।

আট বলিয়া নতুন কিছু নাই। যে তাৎপা-
রিত্য মূহুর ও শোভন, বাহা মনোবের কল্যাণপ্রদ
এবং বাহা মাহাত্ম্য বাহিষ রকার পরিণামক, তাহাই
আটের পত্তির ভিতর চিরকাল থাকিবে।

এখন আমি সত্যের সত্য যে কথায় আপ-
নাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই, তাহা আর
কিছু নয়—সিদ্ধ ও সাহিত্যে বাহাত্ম্য ভাবিত মনো
বিস্তারক হয়, তাহার সৌন্দর্য ও উপাধি নির্ধারণ করা
সকল সাহিত্যিকেরই কর্তব্য বলিয়া মনে করি।
কথায় এতটুকু খুসিয়া বলা বরকার। আমি
আপনার নিকট পটোমাহি বুদ্ধিপ্রদোষিত হইয়া
এ কথা বলিতেছি না। আমার অন্তরঙ্গ বক্তব্যকে
আমার সম্বন্ধে এ বিষয়ে লক্ষণেই এক রকম
বলিবেন যে, বাহা বুদ্ধি বাহাকে বলে, তাহা
আমার আট নাই। ব্যক্তিগত পথ পথ দুই
বিবাহিত ‘হা অর হা অর’ করিয়া জুড় অরব্রের
উপাধি করিবার প্রভুত্ব কারে ও অকালে খুসিয়া
বেড়াইতেছে—তাঁহাদের সত্য শক্তি ব্যক্তি
করিতেছে; অর চিন্তা করিবার সুযোগ সুবিধা
বা অবদর তাঁহাদের নাই। নিম্নের ও পরিবাহ-
বর্গের চিত্তবিনোদন করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই,
তাঁহারা অপরের চিত্তবিনোদন করিবার প্রভু
সম্মানিতের দৃষ্টি করিবে কি করিয়া? বিশেষতঃ
বাঙালী সমাজের মধ্যবিত্ত গুরুত্বপূর্ণ বাহা আব-
মান কাল সমাজের যেকোন রূপে রহিয়াছেন,
তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা নিত্য শোভন
হইয়াছে বলিলে অসত্যিক হয় না। সমাজে নতুন
ভাবের প্রেরণা বনীয়াগণে। তাঁহারা বিধা

আমিরাছেন—অনেক কালে তারা না বিশেষ তীক্ষ্ণাচারে
যে ভাবপ্রচারণের সমাধা করিয়াছেন, সে বিশেষ
কিছুমান সন্দেহ করিবার নাই। চর্চাল ক্ষেত্রবৎ
লইয়া নবীর-মাত্র যেতল অলম্ব্য, দুর্বল মধ্যবিত্ত
গৃহস্থ লইয়া সমাজ-জীবন বান করায় শ্রেয়স্কর
অলম্ব্য। এ দেশের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বাহ্যিক
আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই একবারে আমায়
এ কথা বারবারী বীকার করিবেন। সমাজকে
স্বত্ব ও সফল দেখিতে চাহিলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ
আর্থিক স্বচ্ছন্দতা আনয়ন করিতে চাইবে।
যৎসমী মধ্যবিত্ত গৃহস্থই ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের
আগন্তের এক সহায়তা করিয়া, সামাজিক বন্যভাণ্ডার
চিত্রকালই পূর্ণ করিয়া আমিরাছেন। যেখানে
পাওয়া যায়, ঐতীন মূলেও বৈষ্ণবদিকে কর্তব্যপ্রণা
বিচারেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। আর কোম্পানীর
অমলগত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্তি-
লাভ করিয়া সমাজের জীবনীশক্তিকে অক্ষুণ্ণ
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কালি না, কোন্‌ বৈষম্যে
বক্তার ভাষিত ভিতর ব্যবসায়িকতা বুদ্ধি
অস্তিত্ব হইয়া কেবল চাকুরী বৃত্তিমাত্র সফল
হইয়াছে। ভাষিত বা ওকালতি ব্যবসায় কেন-
বিশেষে ধনান্ধ হইয়া থাকে দয়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
উহাতে জাতীয় ধনান্ধের পথ স্থগত হয় না;
এক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ অপর ব্যক্তির
নিকট ব্যতীত করিয়া থাকে দয়া। ব্যবসা-
বাণিজ্যে অপর দেশের অর্থ বশেষে আনিতে পারা
যায়। অর্থ থাকিলেই যে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি
লাভ করিতে পারা যায়, এ কথা অলম্ব্যেই বসিতে
পারি না। অগতঃ সফল কার্যই শিক্ষামূলক।
ব্যবসা-বাণিজ্যে অপরদের বৃত্তির ভায় শিক্ষা-
লাপেক, এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।
যৎসমী মূলে এই শিক্ষার অভাবে অনেক মূলধন যে
অন্যথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন।
আমাদের শিক্ষা-বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য বিবেচ

নিকার যাবৎ বড় একটা বৈষ্ণব পাওয়া যায়
না। বিব-বিজ্ঞানগণের শিক্ষিততা বিবেচনায়
এখনও উন্নয়ন স্থান হয় নাই। ইহার জন্য প্র-
করণের কিছুই নাই। Technical education
বিষয় পরচর্চা পূর্ব বেনী। অর্থাৎ বসিয়াই
আমাদের বিব-বিজ্ঞানগণ Technical education
শিক্ষিততা বিবেচনায় যাবৎ এখনও স্থান পায় নাই।
অর্থের স্বচ্ছন্দতা হইলে বিব-বিজ্ঞানগণের কর্তব্যের
যে এ বিষয় মনোযোগী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ
নাই। তবে এ শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে উচ্চ শিক্ষার
মূলে কুঠিপ্রাচ্যত হইবে, একজন মনে করা ভুল।
যিনি এ শিক্ষা প্রবর্তন; দৃষ্টেই হইবেন তিনি
সমাজের কল্যাণ করিবেন। ২৩ বৎসর শিক্ষকতা-
কার্য নিম্নত্ব থাকিয়া একটা কথা প্রাণে প্রাণে
উপলব্ধি করিয়াছি। উচ্চ শিক্ষিত মূল্যবিশেষ
অর্থবিশেষ পথ দরদ না হওয়ায় ভয় চিত্তাশ্রম
ভাবুক প্রাণ অকালে মৌল হইয়া থাকেছে দেখিয়া
দুঃখিত হইয়াছি। উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া
প্রাণের কথা বিস্ময় ভাষ্যের যখন মানব নিকট
উপদেশ চাপ—পথ নির্দেশ করিয়া বিস্তারিত
তখন ব্যস্তবিকই প্রাণে অত্যন্ত ব্যতীত অলম্ব্য
কর্তব্য। কিলের গুরু মাধ্যম—হৃদয়ের মানবিক
ও বৈদিক উন্নতি বস্তুই যে আবহা বাবা, তাহা
তো নয়। বিব-বিজ্ঞান সমাজে বাহ্যে তাহারা
অর্থ উপার্জন করিয়া, পরবশ না হইয়া, বাণিজ্য-
কার্য করিতে পারে, অতঃপক্ষে আর্থিক স্বচ্ছন্দতা
জন্য অস্ত্রের গলপ্রাণ বাহ্যে না হইয়া, সমাজকে
ভারপ্রাপ্ত না করে, সে বিবেচনা আমাদের অগতঃ
হওয়া উচিত নবকিছু বৈষ্ণবেই স্থাপত্য বি-
ভেদে, তাহা বৈষ্ণবেপ্রতি মধ্যমাত্র তর মধ্যপ্রা-
নবীর অর্থ স্থাপত্য পশ্চিমেই ইন্টিউইট
প্রতিষ্ঠান হইতে বেশ বৃদ্ধিতে পারা যায়। এই
প্রতিষ্ঠানের মধ্যম Captain Petavel ব্যাবহারিক
কাণ্ডকলাপ শিবিয়া, বাহ্যেই ব্যতীত অর্থবিশেষ

পরে সুমন বধ, তাহার চোঁটা করিয়া আঘাতের
 বস্ত্রবাসি হইয়াছেন। আঘাত জানি, অনেক
 সখাবিত ঘরের ছেলেরা বাহারা উক্ত শিকাগত
 করিবার সুবিধা ও সুযোগ পাব নাই, অথবা
 যাহাদের হৃদি সেজন্য প্রথম নঃ, তাহারা এই
 বিজ্ঞানস্বরূপে লিখ্য লাভ করিয়া অর্থপাণ্ডা
 করিয়া সম্মানে সমাহরণ্য নিরীহ করিতেছে।
 বস্ত্রবাসিনী নৃতনের বিবোধী—পুতান-প্রীতি
 বস্ত্রবাসিনী অধিবাসিনী। আঘাতের দেপের
 পুতান উক্তি—“অধিবাসিনী তাহার নৃতন।
 ততঃ সুপেশ্যে সত্যম্”—ইহার বিকটচরণের জন্ত
 আমি জাতীয় অর্থপদের কথা বলি নাই। সুপে
 সুপে অদুর্ভাগ্যের ব্যাপারবিশেষে অধিবাসিনী।
 এখন আঘাতের ব্যাধি প্রকটন তাহার উপায়
 লক্ষ্যন করিতেই হইবে। অর্থপদের জন্ত নৃতন
 নৃতন পদ্ধতি অদুর্ভাগ্য হইত, ইহাই আমাঃ আত্মিক
 কামনা। বস্ত্রবাসিনী হৃদয়বিশেষে সুপে ও সাধ
 পেশ্যে চাই; কারণ, প্রাচীনকালে হইতে অগ্নি
 এই সত্য উপনীত হইয়াছে যে, সত্য বোধই সুপে
 ঘনের আধার। সত্যের ব্যাধির উপর যখন
 ঘনের ব্যাধি নির্ভর করে, তখন যে সুপে ব্যাধিতে
 হইবে। যেহেতু সুপে ও সত্য ব্যাধিতে হইলে
 অধিবাসিনীর প্রকটন। এই ভীষণ জীবন-
 সংগ্রামের দিনে অধিবাসিনীর ব্যাধি করা বড়
 সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই আমার মনে চক, অর্থপদের উপায় চিন্তা করিয়া, সাহিত্যিকের
 প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে তাহাদের
 অভিজ্ঞতা-স্বত্ব উপায়গুলি শোভন-সুন্দর করিয়া
 বিবৃত করা উচিত। এই কার্যে অগ্রগতি হইতে
 হইলে প্রথমে ক্ষেত্র প্রকট করিতে হইবে।
 বস্ত্রবাসিনী পুতান-প্রীতিপরাধন মনটা ব্যাধিতে
 এইজন্য নৃতন পথে চলিতে পারে, তাহাও চোঁটা
 সর্বাঙ্গে করিতে হইবে। নৃতনের সাক্ষ্যতা
 বস্ত্রবাসিনী মন নথিবে না। নৃতনকে পুতানের
 তিত্ত দিয়া পাইয়া, ব্যাধিতে হইবে, নৃতন কৃতকার্য

হইবার সম্ভাবনা নয়। তারপর বীচ বশন করিতে
 হইবে। অর্থ এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়
 যে, প্রত্যেক গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র বস্তুদের
 চোঁটা করিবে। যে কোন একটা চরিত্র একপাত্রে
 অতি হস্তা উচিত, তাহাতে “নৃত্ত বস্ত্রবাসিনী
 তুলা” — চিত্র না থাকে, তাহাতে সম্ভাব্য ও জাতির
 অতিরিক্ত ব্যাধি ব্যাধি ব্যাধি যে অর্থপদের
 আঘাত, তাহার প্রতি পোকে আঘাত থাকে,
 এবং অর্থপদের সহিত ব্যাধিতে অর্থের সম্ভাব্য
 হয় তাহার চিত্র পাশাপাশি দেখান হয়।
 যেসকল বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয়, আধুনিক
 মুদ্রাবিশেষে প্রতি এই ব্যাধি প্রবাহিত হওয়া
 উচিত। অর্থ এ কথাও অর্থ রচনা হইবে,
 অর্থপদের ব্যাধি রচনা করিবার ইচ্ছা একটা
 উপায় আছে। আর উপায়কে একই পদ্ধতি পথ
 বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না। সত্যপদের
 ব্যাধি বস্তুবস্ত্রেই একই জীবনের উৎসাহ
 বলিয়া গণ্য করিয়া, অর্থের প্রতি আত্মিকপ্রীতি
 দেখাইয়াছেন, তাহাদের মৈত্রিক অবনতি বোধ
 আনয়ন পিকা করাও উচিত।

চরিত্রের অদুর্ভাগ্যের সুপে ও চিত্রবাসিনী সাহিত্যের
 মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষ ও মনীষীদের মধ্যে
 পার্থক্য এই যে, মনীষীগণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বড় দৃষ্টি
 ধরিয়া কলিতে পারেন, সাধারণ লোক তাহা
 তত দৃষ্টি পারে না। মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য
 তাহারা মনীষীগণে ধরিয়া ফেলিয়া, সহস্রবিধ
 অনিচ্ছা-স্বপ্ন-ভুলিকার নানা বর্ণে রচিত করিয়া,
 আঘাতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। আর
 একজন লোক চিত্র আটের সাহায্যে একজন তাহা
 প্রকাশ করেন, তাহাতে পাঠকের মনে ব্যাধি হইয়া
 যায় যে, জীবনের এই সত্য তো আমি ঘরিতে পারি
 নাই। আট তাহাই ব্যাধি অস্ত্রের মনে সম্ভাব্য
 ও সম্ভাব্যতার উদ্দেশ্য করিতে পারে। সেখান
 ও পাঠকের তাহা সম্ভাব্য আটের সাহায্যেই হইয়া

থাকে। অবিকল্প কলাবিশেষ তুলিকাৰ সজ্জিত চিত্র এমন সুন্দর ও আভাবিক হয়, যাঃ হইতে মানবচিত্ত সৰ্বদে আনন্দ নুতন অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়া থাকি। রসবন্ধ হইতে আনন্দ কেবল অসুস্থতিলম্বই যেমন করিয়া আসি না—নাটকের বলসঞ্চিতও প্রবেশ করি, সেইরূপ উপজ্ঞানের চরিত্র পাঠ করিয়া আনন্দ অসুস্থতিলম্বই পাই না, মানব চরিত্র সৰ্বদে নুতন তথ্য ও জ্ঞান লাভ করি।

এখানে একটা কথা উল্লিখিত লাগে, চরিত্র বিশ্লেষণ ও চরিত্রের ক্ষুদ্র নৈ বসন সাহিত্যের উদ্দেশ্য, তখন আটের স্থান কোথায়? অবশ্য আটের অবশ্যবর্তনীয়। এটি সাক্ষ্যে কথাসার এইরূপ উত্তর দেওয়া হইতে পারে—মানব মৌলিকতার উপাসক। সুন্দরের ধারণা বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়ের উপর ও বস্তুতঃ সঙ্গীত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সত্য, কিন্তু অঙ্গগতির ভিতর চরিত্র বিশ্লেষণ বা চরিত্র সূত্র সূক্ষ্মভাবে করা সম্ভব নয়। আদর্শ, জীবনকে সর্বদা যে পরিচালিত করে না, তাঃ তো আনন্দ দেখিতে পাই। এইরূপ আটের আবশ্যকতা। কলাবিন্দু বা আর্টিষ্ট, আনন্দের সমুদ্রে চরিত্রের সেই অংশটুকু ধরিয়া থাকেন যা সেই অংশটুকু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন যাঃ পাঠকবিশেষের মনের উপর কার্য করে—অসুস্থতিলম্ব উৎসাহ করিয়া যিঃ সৰ্বদা হয়। তাই প্রত্যেক পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলিয়াছেন—“All art is selection”। সে বিন লবঙ্গকানিত “Authorship” পুস্তকের তুলিকাৰ ঠিক এই কথাটাই পড়িলাম—“The patience of a reader or an audience is limited, and therefore a plain straightforward story exactly as it happened in real life, is quite impossible. The true artist can by instinct and training know which characteristics and which incidents and which words to select to

bring about the greatest emotional appeal.”

চরিত্রের অসুস্থতিলম্ব বা ঘটনাঃ ক্রিষ্টি-সম্পন্নিত নটক বা উপজ্ঞান প্রকৃত সাহিত্য-লবঙ্গকানিত নঃ। সমই সাহিত্যের প্রাণ। যঃ সৃষ্টি করিতে না পারিলে সাহিত্যে কৃতকার্য হইতে পারে নাঃ। “Authorship” এর লেখক সত্যই বলিয়াছেন—

“A dull, unemotional book or play, without interesting characters doing interesting things, is a failure both artistically and financially.”
যাঃ বিবর্তই চরিত্রের অভিব্যক্তি ও ঘটনার নুতনত্ব মানব-মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আর ইহা করিতে না পারিলেও রসমুষ্টি হয় না। রস না থাকিলে আনন্দও পাওয়া যায় না। কলাবিশেষ কোনলের উপর এই রসমুষ্টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সমগ্র জীবনকে যে লেখক আনন্দের সমুদ্রে উপস্থাপিত করেন, তিনি আর্টিষ্ট নহেন, তিনি নকলনীষ, পট্টা বা photographer। আর্টিষ্ট তিনিই, যিনি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ঘটনা বা অসুস্থতিলম্ব অঙ্গ পরিপূর্ণের ভিতর জুটাইয়া তুলিতে পারেন।

তাই বসিতেছিল, অসুস্থতিলম্ব সূক্ষ্মভাবে এতঃ চরিত্র আঁকিত হয়ঃ উচিত, যাঃতে মানবসমুদ্রে আনন্দ সাহিত্য হইতে নির্ভাঙ্গন না দিঃ—আর যখনঃসেই সবে সবে আনন্দের সন্ধানঃসেই চিত্রঃ যাঃতে জুটয়া গেল, সে বিক্রেতঃ লভ্য রাখা কর্তব্য। অন্যতর অন্যতর চরিত্র ও অসুস্থতিলম্ব চরিত্রের সহিত প্রকৃত পূর্ণোক্ত রূপে চরিত্র যে বিন যাইবে না, তাঃ বলিয়া তো আনন্দের মান হয় না। আদি আপনাদের জ্ঞান যখন সাহিত্যিকদের নিকট কথটা উত্থাপন করিলাম যাঃ। বিবর্তীরা আপনাদের হওয়া বাস্তবী বলিয়া প্রাণের আবেগে এত কথা বলিলাম। আপনাদের বুদ্ধিগণে এতঃ চরিত্র আঁকিত হইতে পারে, যদ্যপি সূক্ষ্মসাহিত্যের শোভাঃ

বহুত হইবে, সৎ সৎ সমাজ ও জাতির ভিতর
আপের লক্ষ্যের দর্শিতে লাগিয়া যাইবে। এরূপ নীতি
করা কি দায় না।

বর্তমান বাস্তব সাহিত্য যে প্রকারে চলিয়াছে,
তাহাতে দেখা যায়, কথ্য-সাহিত্যই প্রধান স্থান
অধিকার করিয়াছে। এই কথ্য-সাহিত্য (প্রথম
দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, Realism (বস্তু-
তত্ত্ব) কথ্য-সাহিত্যের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার
করিয়াছে। এখন যিনিই বস্তু, উপকরণ বা নীতিক
লিখিবেন, তিনি যদি Realism এর মতো আপনাকে
জানাইবা বলিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার
লেখার কোন কোন স্থানই থাকে না। Ibsenism,
Shawism এই প্রকার লেখকদের যেন অস্বীকার
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বস্তুতত্ত্ব কথ্য, ইংরেজীর
সাহিত্যে তাহা কিরূপ আশোচিত হইয়া থাকে,
আমরা তাহা জানি না। বিদেশের ঘোরে আমরা
এত দূর হইয়া যাই যে, ভারতের বা বাস্তবিক
সমাজ যে বিলাতের সমাজ নয়, তাহা একেবারে
ভুলিয়া যাই। যে আকাশ বাতাসের মধ্যে বিলাতের
সাহিত্যিক তাহার ভাবগম্যতাকে পরিপূর্ণ করিয়াছে,
আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে তাহারের অন্তর্ভুক্ত,
কি প্রতিফলন, তাহা একবারও আমরা ভাবিয়া
নেই। কথ্যটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা
হইল। তাই বিলাতের বস্তুতত্ত্ববাদের উপকরণ
সমাজ চিত্র কথ্য বলি।

দাপ্তরিক যখন সংস্কার আন্দোলন ও উৎপাদনে
ব্যতিব্যত হয়, তখন দাপ্তরিক মনোমধ্যে এক কল্লিত
রক্ত স্রুতি বঁধিয়া, স্বদেশের আশা ছুড়াইবার চেষ্টা
করে। এইভাবে করনা ও প্রতিনিবৃত্তক অনেক
উপকরণের স্রুতি হয়। আবার অনেক সময় দাপ্তরিক
ব্যতিরিক্ত অনেক মনের মত স্রুতির ঘেঁষিতে না
পারিয়া, এক কল্লিত বর্ষাভাষা মনোভেদে স্রুতি
করিয়া ফেলে। এরূপ নীতিবাদের সাধকের চেষ্টাও
অনেক কখনো উপকরণের স্রুতি হয়। কিন্তু

বস্তুতত্ত্ববাদের ঐক্য উপকরণে পরিপূর্ণ হইতে
পারে না। দৌলতা ও বাহা কিছু সত্য, সংই
অপত্তে থাকে। অগতঃ তাই নাই, তাহা সত্যও
নয়, এমত তাহার কোন স্বার্থ অতিব্যত নাই।
অগতঃ তাহা আছে, তাহা হইতেই আদ্যমিতক পরিপূর্ণ
হইতে হইবে। বাহা কল্লিত, তাহাই বিলম্ব;
বাহা স্বার্থ ও স্বতন্ত্র, তাহা হইতেই প্রকৃত চিত্র-
ভাবিতা হয়, তাহা হইতেই দাপ্তরিক মানব-সমাজের উন্নতি
ও মঙ্গল হয়।

বস্তুতত্ত্ব আদ্যমিতক কিছু তাহা, তাহা আদ্যমিত
স্বার্থ বা প্রকৃতি হইতেই পাই। আদ্যমিত মনের
সত্যের প্রকৃত অর্থ-সত্য হইলেও তাহা আদ্যমিত
হইতে পারে, স্রুতিও তাহা হইতে যে সাহিত্য স্রুতি
হয় তাহাতে সত্যের মঙ্গল সাধন না করিয়া তাহা
অস্বপ্নের নিদান হইতে পারে। সেই কারণে
অনেকের মত, আদ্যমিত সাহিত্য ও উপকরণে ব্যতিরিক্ত
অর্থ ও আদ্যমিত স্বার্থ চিত্র প্রতিফলিত হওয়া
উচিত। Sir Walter Scott এর উপন্যাস সম্বন্ধে
বিদেশের স্বার্থ চিত্র অতিব্যত করিয়াছে; অর্জন
ভিত্তিক নীতিও সেই তাহা প্রতিফলিত। Dickens
এই তাহা প্রমাণিত হইয়া, সত্যের
সর্বনিম্নতম মানব-চিত্র চিত্রাঙ্কনের পক্ষপাতী
হওয়াছিলেন। উৎকর্ষ সাধনার ব্যয়ভাগে করণ
ভিত্তি এই তাহা প্রমাণিত হইয়া তাহা বিদেশের
সাহিত্যে বস্তুতত্ত্ববাদের প্রতিফলিত করিতে আদ্যমিত
করেন।

অকারণে Balzac এর ভিত্তিক এই যে, উপকরণ
ইতিহাসেরই দাপ্তরিক বিশেষ হওয়া উচিত। উপ-
করণকে একান্তরূপে ইতিহাস বা ইতিহাসেরই
সম্বন্ধভাব হইতে হইবে।

বস্তুতত্ত্ববাদের মতে এই ব্যতিরিক্ত অর্থ
আদ্যমিত কোনও অর্থ নাই, স্রুতিও অর্থ কোনও
অপ্রকৃত অর্থের করণের সহিত আদ্যমিত স্রুতি
আদ্যমিত কোনও অর্থ নাই। আদ্যমিত আদ্যমিত

পরাভূত হইয়া যে, কোন এক অপ্রাকৃত ভগবতের
কল্পনা করি, তাহা আশাযের চর্যলভ্য। আমরা
পরিচয় ও অধ্যবসায় লক্ষ্যের আশাযের উদ্দেশ্যে
লাভন করিতে পারি। বুদ্ধি, পরিচয় ও অধ্যবসায়
অবলম্বনপূর্বক আশায স্বপ্ন স্বকর্ষ্য লাভন
করিতে সমর্থ হই, তখনই আমরা প্রকৃত
জ্ঞানের আশাযন করিতে পারি। ভগবতঃ প্রত্যক্ষ,
পরাভূত ও অশান্তি আছে বলিয়া কাতর হইলে
চলিবে না। পরিচয় ও অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও বস
সম্বন্ধে এই সকল চর্যতে অধ্যাবসায় লাভ করাই
মুখ্যতঃ, এবং মুখ্যতঃই প্রকৃত জ্ঞান ও জীবনের
সার্থকতা। de Foë Robinson Crusoe'তে
এই ভাবটী বিশেষভাবে প্রতিকলিত হইয়াছে। এই
ভাবের উপজালাকে realistic উপজাল বল।

Realistic উপজালে conventionalism,
idealism বা sentimentalism প্রজ্ঞার প্রাপ্ত
হয় না। বাহ্য সত্য, বাহ্য হইবার, বাহ্য সাধ্য
তঃহা লইয়াই realistic উপজালের কার্যবার।

আমরা বিশ্বাস করি এই ব্যক্ত ভগবতের মূলে
এক জ্ঞানদয়, চৈতন্যময় পুরুষ আছেন। এই ভগবতের
কার্যকারণপরম্পরা তাঁহারই ইচ্ছার অধীন। কিন্তু
এই ভগবৎকে তিনি অশক্তনীর নিয়ম-মুখ্যতার অধীন
করিয়া রাখিয়াছেন। লক্ষ্য বাস্তবাব্যবহারী বিশেষ
লক্ষ্য সেই ইচ্ছাব্যব ও চৈতন্যময় পুরুষ নহেন। বস-
বাস্তবাব্যবহারী বিশেষ লক্ষ্য বস্তুবাস্তবাব্যবহার
সম্পর্কিত অশক্তনীর নিয়ম-মুখ্যতার প্রতি Foë
ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য আছে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার
অশক্তনীর নিয়ম-মুখ্যতার ব্যতিক্রম করেন না।
তাঁহার উপজালের নারক Crusoe বিশেষের সমস্ত
স্বকর্ষ্য বস্তু পরিচয়, বুদ্ধি ও অধ্যবসায় অবলম্বন,
পূর্বক সকল প্রকার অপ্রতিযোগিতা লুপ্তিয়ার পূর্ণিত
করেন, কিন্তু বিশুদ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া
ইচ্ছারক লক্ষ্য করেন। অপ্রাকৃতভাবে ইচ্ছার কখনও
Crusoe'ক বিশুদ্ধ করেন নাই। মানব-

জীবনের প্রকৃত চিত্তরূপ আলোচনা করিলে কখনই
কোন মানবের জন্য তাঁহাকে অশক্তনীর নিয়ম লক্ষ্য
করিতে দেখা যায় না; যদি কেহ মানবচৈতন্যের
পদ্ধতিতে প্রেম ও কল্যাণের ইচ্ছার দ্বারা উপলব্ধ
করিতে চৌতাল্যবান হন, তিনি তাঁহাকে অশক্ত
হইতেও যাক্তে রক্তবস্ত্রে উপলব্ধ করেন।

Realistic উপন্যাসিকবিশেষের মধ্যে থ্যাচার
চরমতঃ, তাঁহা বিশেষ উপন্যাসে অনেক সময়ে একটা
মোহ আনিয়া পড়ে। তাঁহার দ্বারা ও জীবনের মাত্র
একটা দিক্ দেখেন, আর একটা দিক্ যে আছে,
তাঁহার প্রতি তাঁহার উদাহরণ। মানুষ আশ্রয়
ভাবে অশক্তিকে দেখি। থাকে, ভগবতের লক্ষ্য
দিক্ দেখিবার দৃষ্টিতেই কখনও নাহি। যদি মানব-
জীবনের ঠিক কটোটা লক্ষ্য হয়, এবং তাহাই
অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লেখা যায়, তবে সেই
উপন্যাসে মানুষের বস্তু একটা বিশেষ লাভ হয় না।
যিনি ঠিক কটোটা লক্ষ্যই লক্ষ্য, তিনি প্রকৃত
চিত্তরক বলিয়া পরিচয়িত হইতে পারেন না।
প্রকৃত চিত্তরক তিনি থ্যাচার তুলনায় লক্ষ্যের চিত্ত
প্রতিকলিত হয়। অশক্তের লক্ষ্যে লক্ষ্য ভগবতের
সৌন্দর্য্য সংরক্ষিত; প্রকৃত চরমতঃ realistic
উপন্যাসিকের দ্বারা বস্তুতঃ। তাঁহার তাঁহা-
বিশেষ উপন্যাসে, জীবনের স্বাধীন চিত্ত বিশেষিত
করিয়া কৃতকার্য হইবার প্রয়াস পান এবং তাঁহার
মতে থ্যাচার জীবনের আশ্রয় সৌন্দর্য্য চিত্ত
করিতে পারেন তাঁহারই চিত্তরক—তাঁহার
বিশেষজ্ঞের মতে জীবনের একটা দিক্ মুখ্যতঃ
রূপে দেখাইয়া থাকেন।

Thackeray বলিয়াছিল, মানব কটোটা
মাত্র বলিয়া কিছুই নাই। মানব হইতে শুধু
আছে, তাহা বিরাট মানব বস্তু, তাহারই মানব
স্বাধীন বর্ণনা করি। Thackeray এই কথা
Balzac'র মূখে আরও শোনা পাও।

Balzac, Thackeray'রই সমসাময়িক। তিনি

সভ্যজগতে উপন্যাসের পক্ষে এক নূতন পটপট্র অন্বেষণ করেন। উপন্যাস তাঁহার কাছে 'human document'।

যাত্রার জগৎ ও জীবনের সহিত যাত্রার জগৎ ও জীবনের যথাযথ প্রতিচ্ছবি আরেক বিভিন্নতা আছে। যাত্রার জগতে যে প্রাণটা আছে, তাহার যথাযথ প্রতিচ্ছবিতে সে প্রাণটা থাকে না। প্রতিচ্ছবিতে প্রাণপ্রতিচ্ছবি করিতে হইলে লেখক বা চিত্রকরকে আপনায় প্রাণ বিহা তাহারকে অনুপ্রাণিত করিতে হয়। লেখক বা চিত্রকের অন্তর্ভুক্তি না থাকিলে সে বিষয়ে তাঁহার প্রাণ কাণ হইয়া পড়ে। Coleridge এর কথায় বলিতে পারা যায়, তাঁহার সমগ্রবিষয়ের মৌলিক মৌলিকতা এবং উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারিণের লোকসুহৃৎজনকতা নীতাই প্রাণপ্রাণ। Dickens এই কারণেই বেশী দিন লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই। 'জি যদি বাহিরের বস্তুর যথাযথ অনুমিতি হয়, তাহা হইলে সে চিত্রের প্রতিচ্ছবি হইবে অনুপ্রাণিত বেশী দিন থাকিতে পারে না।

সাহিত্যে তাৎপার্যের (idealism) প্রতিচ্ছবি বস্তুরাত্ম্যবাদের (realism) প্রতিচ্ছবি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাৎপার্যের আতিশয্যের প্রতিবাদস্বরূপ Jane Austen তাঁহার যাত্ৰাকৌশল . জীবনচিত্র উপজালে প্রতিফলিত করিতে আরম্ভ করেন, এবং এই শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী সাহিত্যে ফরাসী প্রভাব ততপ্রোত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অনেক সুখ্যাতি উপভোগ্য পুণ্ডরিক যাত্রাবাদী হইয়া পড়েন। স্পেন-দেশে Pereda পঞ্চদশবর্ষক হন, এবং Juan Valera, Emilia. Pardo Bazan এবং Valdes সেই পথ অনুসরণ করেন, ইতালিতে Fogazzaro, Mathilde Serao এবং Scandinvia Bjornsen এবং

Strindburg এটো মধ্যভাগের ভাবুক হইয়া ইংরেজী সাহিত্যে পুণ্ডরিক প্রবর্তিত করেন।

অন্য কবির ব্যাপার কিছু নয়। ১৭২২ খ্রিঃ অব্দে প্রথম কব উপজাল বাহির হয়। ইহার কিছুকাল পরে কবে Gogol এর আবির্ভাব হয়। ইনি প্রাচীণ জগতের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ফরাসী প্রভাব ইংরেজী সাহিত্যে এক প্রকার পুণ্ডরিক প্রবর্তিত করিয়াছিল, কিন্তু human document এর Goncourt's এর পূর্বেই Gogol এর প্রাণ প্রবর্তিত হয়। Turgeneff, Dostoyevski এবং Tolstoi তাঁহারের বংশে ও বংশের বাহিরে বিলম্ব প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার বংশের নিম্নতরের লোকের জীবনের মর্ম উন্মোচন করিবার ক্ষমতা ও তাহারের বিভিন্ন আত্মমান-জ্ঞান উন্মোচন করিবার ক্ষমতা বেড়েই গিয়াছে, তাহা তাঁহারের পূর্বে আর কেহ কখন করেন নাই বলিয়া আশ্চর্য্য বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহারের উপজালের প্রভাবের আরও একটা মৌলিকতার কারণ এই যে, তাহারা তাঁহারের পুত্রকে দুঃখপীড়িত মানব-মধ্যস্থের প্রতি সঙ্গীভূতি ও দয়া বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

কার্পানী, ক্রাজ ও কব হইতে ইংরেজি বস্তুরাত্ম্যবাদ প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু কার্পানী বেশ বস্তুরাত্ম্যবাদের উপভুক্ত কেন নহে। Idealism আত্মমানজাতির বস্তুভাব। Max Kretzer কার্পানীর একজন প্রধান realist, কিন্তু Supernaturalism তাঁহাকে ছাড়ে নাই। Hauptmann কার্পানীর একজন বস্তুরাত্ম্যবাদী বা বস্তুরাত্ম্যবাদী। কিন্তু তিনি ইংরেজি বস্তুরাত্ম্যবাদের অভ্যন্তরে মৌলিক আত্মজ্ঞান সত্যের সত্যের সাহায্যে, এবং ইংরেজি বস্তুরাত্ম্যবাদের তাঁহার ভূমিকা সাধন করিতে পারে না।

Gustave Flaubertএর Madame Bovary হইতেই, ক্যান্টোনাধিত্যে বাস্তবতার সূত্রপাত হয়। Flaubert ১৮৫৬ খ্রিঃ আঃ সাহিত্য-সাধনার জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮৫৬ খ্রিঃ আঃ তাঁহার Madame Bovary প্রকাশিত হয়। এই উপক্ৰান্তের চরিত্র-চিত্রণ অতি চমৎকার এবং ইহার অবিকালে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বাস্তব জীবন হইতে গৃহীত। বসাব-বাসী Emile Zola একজন অধিকারী সত্যচিহ্নকর। তিনি Flaubertএর Madame Bovary উপক্ৰান্তের প্রত্যয়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু Zola বসাববাসী হইলেও রোমান্সের প্রতি তাঁহার বোঁক ছিল।

Zola পরে M. M. Edmond ও Jules de Goncourt বসাববাস অবলম্বন করেন। তাঁহার পর Alphonse Daudetএর আধিষ্ঠান হয়। ইনি Zola ও Goncourts উভয়েরই প্রত্যয়ে পড়িয়াছিলেন।

Monpassant, Flaubertএর ছাত্র। ইনিও একজন বসাববাসী। ইহার কাছে বাস্তব লগ্ন ও কল্পনা একই। ইহার রচনাও নৈতিক বিরুদ্ধ নয়। চোখে দাড়া যেহেতু, তাহাই তিনি লিখিতেন।

যেহেতু যে ও জাতিতে যে রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও তাব তির ভিন্ন প্রকার। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও তাব বিভিন্ন হইয়া থাকে। লগ্নতের সব জিনিষই আচার বদলার, আচার বদলার না কেবল সত্য। সত্য সকল অবস্থার একত্রপাই থাকে। লগ্নতের সবই পরিবর্তনশীল—আমাদের প্রকৃতি ও প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল মানব-প্রকৃতির মূলে এমন একটা কিছু আছে বাস্তব কখন কোন পরিবর্তন হয় না। তাহারই সত্য সত্যের লগ্ন। আমরা যেহেতু পাই, সত্য সকল মেলে সকল জাতিতে এক।

সাহিত্য সেই সত্যকে তাঁহার প্রকৃত অবস্থা হইতে ঘুটাইয়া বাহির করে। সাহিত্যের কাজ সত্যকে প্রকাশ করা। যে সাহিত্য তাহা না করে, তাহা প্রকৃত সাহিত্য নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দেশাচার এবং ক্রটিও বিভিন্ন। দেশাচার ও ক্রটিকে সম্পূর্ণরূপে অনুগমন করিলে, সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সাহিত্য লোক-শিক্ষার উপায়স্বরূপ, সুতরাং যে জাতির সাহিত্যে প্রাণ না লাগে, সে জাতির সাহিত্যে জাতির উন্নতি হইতে পারে না। অনেক সময়ে আমরা দেখি, উপক্ৰাস ও নাটক, জল্পশাধারণের ক্রটির অনুবর্তন করে। যাবদা হিসাবে সেই উপক্ৰাস ও নাটক ভাল হইলেও আসল কাজে ভাল হইতে পারে না। উপক্ৰাস ও নাটক সাহিত্যের লক্ষ্য। সুতরাং যতদূর জটির অনুবর্তন করিয়া কেবল লোকস্বস্তি করাই উপক্ৰাস ও নাটকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। লোকশিক্ষার ভার বাহ্যর উপর, তাহার লক্ষ্য সময়ে লোকক্রটির অনুবর্তন করিলে চলিবে না। যাহুদের মনের মতন কথা না বলিলে, যাহুদের লগ্নই হইবে না; সুতরাং লক্ষ্য সময়ে সাধারণের মনের মতন কথা বলিতে হইবে, এই ভাব সেবাণ করিয়া যদি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যায়, তাহা হইলে সাহিত্যের উন্নতি হওয়া মূলে থাক, অবশ্যই হইয়া থাকে। প্রকৃত কবি, চিত্রকর ও উপক্ৰাসিক যে দৃষ্টিতে লগ্নকে দেখেন, সাধারণ লোক সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। সাধারণ লোক প্রকৃতির প্রত্যয়ের লগ্নতী। দেশাচারও আদ্যের ক্রটিকে বিদগ্ধন করে। যে যে দেশাচারে প্রত্যয়, সে তাহার বিপরীত আচরণ লক্ষ্য করে না। কিন্তু সাহিত্যিকের একটা দায়িত্ব আছে। সাহিত্যিক খুঁট সত্যটী তাঁহার সেবার প্রতিফলিত করিবেন—যাহা লক্ষ্য মেলে লক্ষ্য জাতিতে এক। যাহা মানব-প্রকৃতির সত্য ও বাস্তবিক সূত্র, তাহাই প্রকৃত সাধারণী।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার বাটা-প্রতিভা

(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(இதற்கு விட, அ, வி அ)

স্বীয় কায়-স্থায় অক্লিষ্ট বস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্যব-
 হার জীবী বিচারক সাধারণের মিত্র মহোদয়ের
 উৎসাহে গির্জাপক্ষে 'বলিমান' নাটক রচনা করেন।
 হকিন্স স্কটের কাব্য সমাজের—তথা বর্তমান হিন্দু
 সমাজের বহুদুঃখের ফলে মহাবিশ্ব গুরুত্বের কি
 সর্বনাশ হইতেছে তাণ্ডা করিবর উদ্যোগ আদ্যাদি
 প্রোক্তভাষ্যে স্থান তুলিবার চিত্রিত করিয়া আদ্য-
 বেষ নরন সত্যকে ধরিয়াছেন। কল্পিত বিবাহে যে কল্প-
 বলিমানের নামান্তর, তাহা তিনি এমন প্রকৃতভাবে
 কল্পন-সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নাটক-
 খানি পাঠ করিয়া বা নাটকের অভিনয় দেখিয়া
 অল্প সংকল্প করা যায় না। পণ প্রথা লাইগা বাগানীর
 সমাজ-তাবিকেরা বহুদিন ধরিয়া চিত্তা করিতেছেন ;
 লম্বকের যেকণ্ড বস্ত্র মহাবিশ্ব গুরুত্বের হক।
 করিবার চেষ্টাও অনেক উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে ;
 করিবরক কেবলী প্ৰাঃ স্বঃ কাব্য সমাজের পক্ষে
 বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য তাহা আনানিগকে স্মৃতি
 করিয়া-বলিয়া বিধাছেন ; কিন্তু মানুষ স্বাধীন ;
 স্বাধী বি-ধীন বেত্তা সহজ ব্যাপার নহে। বহুদিন না
 আদ্য আবার আদ্যের স্বয়ী প্রচলিত প্রাচীন ব্রাহ্ম-
 বিবাহের প্রকৃত আদর্শ বুঝি।—বহুদিন না আদ্য
 তত্ত্ব বিজ্ঞের যোগ্য জ্ঞানসম্বন্ধ করিয়া, পুঙ্খকন্যা
 কিংবা করিয়া পরস্পারসম্বন্ধ করিতে বিবর্ত
 হইবে—এক কথাই বলিতে গেলে বহুদিন না
 আদ্য। প্রকৃত মানুষ হইবে,—পরের অর্ধের
 প্রতি সোপানবৃত্তিতে চাখিয়া না থাকিবে, ততদিন
 আদ্যের মনন হইতে পারে না। দুই কণাটী
 খিরণপক্ষ প্রকৃতভাবে বুঝাইয়াছেন ; কিন্তু নাটক-

'হানি' 'করানো'। হওয়ায় হাত। একই ধর্মী স্বকম
 মাত্র হইয়াছে চিরিত্তে। ভিত্তর স্বাভাবিকতার বৈশি
 স্যব লক্ষ্য হই।। বিবর্তনের মর্ম: প্রকৃতি বিনিময়ের
 ভিত্তি বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিকতায় লক্ষ্য হইতে। এই ক্ষমতা
 এখনও বৃহৎ হইল না।। 'হানি' না হইবে, 'কি' তাহা
 এই প্রথা বাস্তবিক বৈশিষ্ট্য বৃহৎ হইবে।

ককণাথর হস্ত তিনটি কনাধাঃপ্রভ পুংস্ব ভব-
লোক, সাধা। চাক্ষুশী কথিতা তেন্দ্রঃপ সঙ্গাৎবাহা
নির্মাণ করিয়া থাকেন। ই তিনটি কনা দ্বিঃপঃসাভে
তাঃহাঃপঃ সাঃহাঃপঃ ও পুংস্ব নলিন। ককণাথের
মুখ দিবা পিঃপঃপ্রভ প্রবঃহেই একটা বড় সহ। কনা
বঃহেইরাছেন। কণাটা এই, 'হাঃ, হাঃ, হাঃ বকল
প্রকৃতি কঃহেই সঃহে বিঃহাঃপ্রভা চগন হঃ, তা হঃপে
বঃহে হঃ অঃনেকটা জুঃবিঃ চঃ। ষঃহঃ লঃহাঃ তা
কি বঃহেই ? হঃহঃহঃ সঃহাঃ বঃহেই, জাঃহঃ হাঃ, বঃ
কনা উঃহাঃপঃ হঃপে নঃক পুঃকঃহাঃ । বঃহাঃবিক চাঃহি
জোঃহাঃ কঃহেই হঃহাঃ বিঃহাঃ-প্রভা প্রঃহাঃহি হঃহঃ
বিঃহাঃহে পুঃহাঃহাঃ বা পঃহাঃ হে, একটু বঃহঃ হঃহঃ, এ
কঃহাঃ হুঃকঃহঃপ্রভ প্রঃহাঃহাঃ কঃহেই কঃহেই পঃহিঃ
বঃহেই না। প্রঃহাঃহঃ হাঃহেই পুঃহাঃহাঃ চাঃহি জোঃহাঃ
কঃহাঃহে হুঃহঃ হাঃহাঃহঃ। ঐতিহাসিক এঃহাঃ
সঃহাঃ হিঃহেহে। হাঃ ও কঃহাঃহঃ বঃহাঃহাঃ, পঃহাঃহাঃহাঃ
হঃহাঃহাঃহাঃ হঃহাঃহাঃ প্রঃহাঃহি কঃহাঃহঃ হঃহঃ হে,
জাঃহাঃহাঃ পুঃহঃ হাঃহাঃ পঃহাঃহাঃ, এঃহাঃ তাঃহাঃহে
জাঃহাঃহাঃ হাঃহাঃ হাঃহাঃ এঃহাঃ কঃহাঃ হুঃকঃহঃপ্রভ
নঃ ? হঃহঃহঃ হাঃহাঃ হঃহঃ, 'বঃহাঃহাঃ' ১৩১১
লালে রচিত হঃহাঃহে। ১৩১২ বঃহাঃহঃ পুঃহঃ চাঃহি
জোঃহাঃহাঃ হাঃহাঃহাঃ কঃহাঃ হঃহাঃহেই কঃহেই পঃহাঃহঃ

নাই। বঙ্গের ও পশ্চিম রাষ্ট্রের ভিতর তখন মাত্র
এই এক স্থলে একত্র সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল।
পূর্বে যে একত্র সম্বন্ধে সংস্থাপিত হয় নাই, তাহা নহে
কিন্তু সমাবেশে অগ্রগতি থাকার বন্ধনীয় কারণ-
সমাজ সম্বন্ধে ইহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।
যদিও রাষ্ট্র সমাজ বহুদিন হইতে অত্র সমাজের
লোককে অস্বাভাবিক প্রহর করিয়া Process of
absorption দ্বারা বন্ধন রাষ্ট্র করিয়া গিয়াছিল,
তাহার ইতিহাস অনেকই জানেন। সুদীর্ঘ
আলোচনা করিলে এতখানি স্বাধীন সমাজেই স্বাধীন
করিবেন। অত্যাচারি একথা বলি না যদিও রাষ্ট্র
সমাজ অন্য সমাজ অপেক্ষা অধিকতর উদার, কিন্তু
সুদীর্ঘ এই আলোচনা করিয়া যাহা বুদ্ধিমানি তাহাই
লিখিলাম। এই লক্ষ্যেই বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সময়ে
সভাসমিতিও অনেক হইয়াছিল, এখনও মনে থাকে
যে একটা সভাসমিতিতে 'ঐ বিষয়' প্রচার উদ্দেশ্যে
সাধন করা যে একান্ত আবশ্যিক তাহাও স্মরণে
পাই। অনেক উদ্ভাসনীয় বৃদ্ধকে লক্ষ্য প্রচার
বিক্ষেপে আশ্রয়ী তাহার বক্তৃতা করিতেও
অনিচ্ছা; আবার তাহারিগণকে কাগজপত্র
অর্থ-লাভের ব্যাপারে তাহারের প্রতিবাদেই সমা-
জ করিতেও বোধহয় হিম্মত 'লাভকুন' বলায়
রাখিবার জন্য, যেহেতু বিবাহে বস্ত্র বসাইবার জন্য
যাহাং তাহাও সভাসমিতিতে গীতবাহ্য বক্তৃতা
করিয়া হাততালি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহারের
পুঞ্জের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উঠিলে
তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "আমার ছেলের এখন যে
দেবার সময় নয়," কিন্তু তাহাবই, গিরিগঞ্জের
কথার বলি, পোপনে 'বটক পাঠিয়ে খুঁজছেন,
কে যেন বিশ হাজার টাকা ছাড়বে।'

কল্যাণের প্রথম কল্যাণ সহিত বোধহয় বোধন
মিলের স্তম্ভ পরিণত সম্ভব হইয়া গেল। ব'হা
বিবাহ কথা ছিল বিবাহে কল্যাণ সমাজেই
বিদ্যমান, অধিক্ত পোপনে তাহার পত্নী

একজন্ম বহু স্থানের দ্বারা বিবাহিতেন। কিন্তু
ঐতিহাসিক মাতৃকিনোর মন পাইলেন না, তাহার বৃহৎ
সম্পত্তির দ্বারা বাল্যের সমাজের দ্বারা মনে তাহাকে
কোমর বসিতে তাঁহাকে কুণ্ঠিত হইল না। বিবাহ-
সভা হইতে বহু ভূমিকা গইয়া যায় যেখানে পাঠক
উদ্দেশ্যেই বহুভাষ্য কল্যাণকে কল্যাণ অর্থক
কিতে হইল। 'মেয়েটার মেয়েটা বহু ব'হা' তাহা
কল্যাণের পুত্র বিতে রাষ্ট্র হইলেন। এইখানে
গিরিগঞ্জ পত্নীর 'মেয়েটা পাঠনা যেন বহু
বহু' প্রস্তাব উদ্দেশ্যে কল্যাণের পুত্র বলাইয়াছেন,
—'কি জানি যেখানে যেহেতু, সেখানে যে
মেয়ে পাঠ হয় নাই।' যেহেতু কল্যাণ আনন্দ
কোমর নয়, তাহাও কুণ্ঠিত পাই না।
বাল্যের পুত্রেরা মাল্যকাল যেহেতু উপায় সমাজ-
জ্ঞান চাপাইয়া বিবাহ ব্যাপার অর্থকলন না করিলেও,
নির্জিকার-গিতে অর্থপার্জন করিয়া অবদর
সমাজেই সমাজ আশ্রয় পাইবার যে প্রায়
হইয়াছেন, তাহা যিনি চক্ষুস্থান তিনিই দেখিতে
পাইবেন; আর বহুভাষ্য যে কল্যাণ গ্রহণ কর
লগ্নায়িত তাহাও সভা। 'মেয়ে কল্যাণ' হইলেই
যে সমাজটা চলিবে না কেন তাহা তাহা
বিষয়। বোধ হয় এই 'কল্যাণ-গিরিগঞ্জ' সমাজের
এখনও কার্যেই হয় নাই বলিয়া গিরিগঞ্জ
কল্যাণের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু কল্যাণের
মন মহত জানের বহুভাষ্য হইয়া তাহাকে
কল্যাণ বলিয়া বিবাহিত। কেহো কল্যাণের
বহুভাষ্য যেন ভূমিকা বোধিত করা করটা বলিয়া
কল্যাণ। বক্তৃতা হইল, তাহার চিত্র গিরিগঞ্জ
কল্যাণ তাহে বহুভাষ্য করিয়াছেন। বাল্যের
কল্যাণের কি ভূমিকা বক্তৃতা বোধিত
যেহেতু, তাহা বলিলে সমাজের অপমান করা হয়।
বক্তৃতা প্রবেশ করিতে না করিতেই বোধিত

মাতা পাতী বুনে বউয়ের সুব মেখে ডুক্কে কেঁদে উঠিলেন। চাঁৎকার কঠিরা বলিয়া উঠিলেন, 'কোথাকার ঠা বরত পুটে কুড়লীও বাঁশলীও ঘেঁষেছে' তিনি ঘরে তুলিলেন। বৃত্ত বাখীর নামে—'কর্তা কোথা গেলে গো—এতবার এনে বেশ গো' হোখার মোচিতাও ভোঁধ ভোঁক্স ভিবেয় করেছে, বলিয়া চাঁৎকার করিলেন। এরপ, কোরে পিতামাতার নিকট হইতে সস্ত্র আনিতা কত তাহাণ শাস্ত্রীও কখনই ভাল বাঁসিতে পারে না। এই কারণে কত গৃহস্থের ঘরে যে অপাতি আঁশিষায়ে তাহা বর্ণনা করা যায় না। অল্প কামি কেবলমাত্র শাস্ত্রীর ঘোষে যে বালালীর লালার ছায়বার হইয়া থাকে, তাহা বলিবেছি না, বহুও যে শাস্ত্রীর প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে অথবা মন বাহ্যের কয়েতদ্বারাও সত্য; পরকে আপন করিতে হইলে তত্তার মত খুঁজে না বেশিলে কৃতকার্য হওয়া যায় না—দহাঙ্গুষ্ঠিত না হোখাইল আশ পাওয়া যায় না একখাটা জুলিল ত চণিলে না। এনিতে তাঁহার স্বপনর পূজও, গিরিশ-চন্দ্রের ক্তির কথাও বলি,—'বাগতি দিবা পেনেছে, মাসের সুব মেখে নি।' অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া কলমায় বড় হুগে বলিয়া উঠিয়াছিল, "ওঃ, অমন বাঁশলীর নিষাদে বালালার মনে যায় না—বিশ্বনাথ হইল—ঘেঁষের বাপ বিধ বেয়ে মরে না—মেথেকে স্তন বিয়ে মারে না?" বালালার ঘে যে ভায়েবারে হাইতেছে, তাহার একটা কারণ যে বালিকার বাববার নিষাদে তাহা খুব লজা। বতদিন বালালার হইতে এই স্ত্রপনর কলম না পুটিয়ে—বতদিন রত্নীর চোখের লজ পড়া না পুট হইবে—বতদিন বালালীর স্ত্র নাই! গৃহস্থের ঘরে কত আশ পাওয়াই স্ত্র এম এম পুট হইতেছে। এরপ হইবার কারণ আর কিছুই নহ—বিবাহের সময় অর্থ দিয়া কত বিক্রয়! অর্থের বিনিময়েও স্ত্রপাজ পাওয়াই দ্রষ্ট হইয়া

গড়াইয়াছে। অর্থশালী মোক্তারের নিকট প্রাই এই বস্তুযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। কতর জামুর মতিত অমর কবি বেংগলনাথের 'দ্বিভা মঙ্গল' আবার বনর বালালার ঘরে বর শ্রীত চাইবে, তখনই বালালার হৃদয় আঁশিষে। কিত গিরিশচন্দ্র বেবে যে বইটা পব নির্দেশ করিয়া ছেন, তাহা ত কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ঐরূপ করা তাপুত্বগার কাব্য—'ভারের উমর রাম কবে কুঁবে ভাত খাওয়া' মত কাব্য করা একই রকম। বিব বাইবা বিববার আবশ্যকতা কিত জীবন-প্রদ কবিবার কথটা কাগরও নাই। 'আমাদের বেবে, আমরও মগাশাপ বলিয়া পয়া। এ লজা পুটে বিনা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ববার তিনি যে পব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অধিকতর সুকৃষ্টর বলিয়া আমাদের মনে হয়। পাবলি মোক্তার নিকট, তাহার উপর অসুস্থিত অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া ও তাহার সুবে "বাঁধের যাবা মাই জানে, ভাগিরে বিবে শোনার চানে" শুনিয়া কলমায়ের পত্রকে বলিয়াছিলেন—'গিগি, বালিকার প্রতি এমন অত্যাচার হয়, ববি অন্য কোন ভাত শোনে, বিখান কহবে না। কিতু প্রত্যেক ঘরে বর বালিকার এমপ খরগা পাব। ঘের আইবুড়া তাপতে ঘোষ কি? ভাত খাও, কুঁরীয়া হবে? হলেই বা! মারা, অন্যভাবে বব-বরণা কত নির্দোষী বালিকা লজ করে?' বেংগল আইবুড়া রাশিবার ঘোষ কিছুই নাই; কিত লজ লজ কন্যাকে সন্ত দিলা বিতে হইবে, কাৰ্য্যানিতে লজ খাটতে অতিবাহিত হয়, মন চিত্তার বিকে মন বাইবার বাহাতে তাহারা অশ্রু না পাবে তাহার প্রতি লজা রাশিতে হইবে। কুঁরীয়া হইবে কেন? আর ববি দিলা পাইবার কুঁরীয়া হই ইজিরের জাফনা। জাতি বর্ষ বিপক্ষন ঘে— তাহা হইলে কি করিতেই বা পারা যায়। পয়া

•

•

পুত্রব সন্তি হইলী হীরাশাল বহুত কস্তার বিবাহ
হিতে এতজন ছিৎ তথোচ্চিলেন। কথটা
কিশোরের ভাগে পৌত্তরিয়া হাজ সে বালের
সুদুখেই হাংক বলিল,—‘আমি হীরাশাল বহুত
কামি স্তি, আমি কস্তা বহুত মেয়ে বে কস্তা।’

বনস্ত্রাম। তুই কস্তার মেয়ে বে কস্তি কি রে ?
নগদ শকাব হাজার টাকা, পুরী মস্তান মেয়ে আমি
সবক করেছি সব ঠিক ঠাক—আমি পাকা বেবে
আসনা, তুই কি বলিস ?

কিশোর। বাবা, আমাদের বে বংশ—আমাদের
বে বংশ গৌরব—আমি বে বংশের সন্তান—আমি
সেই বংশধর্যাদা-বস্ত কথা করেছি,—আপনি অদত
কল্পেন না।

বনস্ত্রাম। আঁ।

কিশোর। বাবা, আপনি জগৎপুত্র মকরম-
বোবের সন্তান। আপনার এক পুত্র, সেই পুত্র
আপনি বিক্রি কল্পেন ? আমাদের বংশে কবে হীন
কাজ হ’য়েছে বলুন যে—আমাকে হীন প্রকৃতি ল’রে
টাকা নিয়ে বে কল্পে বল্পেন ? এই জন্মেই কি বস্ত
করে আমাকে হাহুত করেছে ? এই জন্মেই কি
আমাকে আদর্শ পুত্র বলে পরিচয় দেন ? আমাকে
কি এই হীন কার্য কল্পে বস্ত ? আমার বিবাহ
দিয়ে কুলধর্ম কল্পেন। কুলধর্ম ক’রে কুল-
লক্ষী আমে, আপনি পুত্রকে বেচেন ? আপনি
দেশের কুলজ্ঞার বস্তঃ এ কথা ব’লেছেন।

লক্ষিত পুত্রের কি ভাবে শিতাকে কথা বলিতে
হয় দেখুন। বালের বোবের লজ বালের বুদ্ধি বাহা
নয়, বেশের কুলজ্ঞারের কলে বুদ্ধিটা সোমা
পবে চলে নাই। তারার তাহার জননী বন
লক্ষীহাড়া বরের মেয়ে আনিতে কিছুতেই রাজী
হইলেন না, তখন অত্যাচার-পোড়িত ভবী ভাবিনীর
বশ্য তাহাকে মনে করাইয়া দিয়া কিশোর বলিল,—
‘ভাবিনীর বশ্য বেবে তোমার মনে হচ্ছে না যে,
তোমার ঐ তুমি হাতে হস্তি ছুঁই যে নিয়ে এলে

রাজরানী করে তাৎবে ? তোমার ভাবিনীর কষ্ট
মনে করে, অন্য মেয়ের মার মনঃকষ্ট মনে নাহা।
একজনেরও হাতে সেই লাজ কষ্ট মিশ্রণ কল্পে
পাতো, সেই জন্মে জগৎবাহের কাছে পার্শ্বা কলো,
তোমার পুত্র এতজনও মেয়ে বে ল’ব না মনে
ক’রে ; মেয়ের বেতে যেমন আনন্ড, যেমন উৎসব—
মেয়ের বেতে তেমনি আনন্ড, তেমনি উৎসব
কল্প।……পুত্র কারো তোমার পেটের
সন্তানক বাধা বিস্ত না। বাধা যদি অদত করেন,
তুমি বাগাতে বোকাও।’

কপালপি বনস্ত্রাম বাহু প্রাণন্দ্য কিল,
তথাপি সাংসারিক লোকের বস্ত জিনি পুত্র
বলিলেন :—‘ভাবিনীর বস্তে কস্তপলি বিবেচ
জানো ?—পেটলি তুমিও না ?’

উত্তরে কিশোর বলিল,—‘বাবা, কি কথা বল-
ছেন ? ভাবিনীর বস্তের পাড়ন করেছে ব’ল
আপনি আর একজনকে পাড়ন কল্পেন ? এই
গোবে লম্বা উৎসব হাংক, বড়বর মেম্বার হাংক,
গৃহস্থ ককির হাংক, বালিকা হাংক, কন্ডার
কন্ড বোর অংকল বলে লগা হচ্ছে। বাবা, আপনি
আদর্শ দেখিয়ে লোককে লিকা বেন যে, পুত্রের
বিবাহ, আদর্শ সন্তান বিস্ত নয় ! পুত্রের পুত্র,
বংশের বস্ত, লিত অলিকারী। সেই পুত্রঃ হাংক
তার হাংকবের সন্তানদের হাংক হ’বে ?—এ কি
সাধারণ পরিচয়ের বিষয় ! এই হুপ্রবর্তে বস্ত কল
আচার, বাবাবার, লকলই নষ্ট হচ্ছে। আপনি বার
ভাগ করে লম্বাক্তে শিবা দিন ;—পারি বোবা-
রীতি পুত্রঃ সাংসারন কলন। জননী রাজলক্ষী
কথাটার সত্যতা বেন বৃক্সে পাংলেন ; কিন্তু
নাহা লুগত লুগলতার বস্তে কতকটা কাকন-তোলি
স্তের আভমানে বলিলেন,—‘হীংরে, বেই অংকো—
বেন লরকাটা ? কি ব’লছেন ?’

কিশোর। বা, আমাদের বংশে কুলীনের কস্তা
এনেই কুলধর্ম হয়েছে,—লম্বাপুর কস্তা এনেই কুল-

কর্ম হইবে—কোন স্থানই যশের স্রোত। যদি
কল্যাণীয় কল্যাণের বর্ষ হইবে যাতে, তাহা
যাহে পুনঃ স্থাপন করুন। আলমি জামেন, আল-
নার পুত্র তাঁর কাছে কত বনী ? তাঁর উপদেশেই
আমি পড়া শুনার মন হই, এইমত এতদিনে একটা
ভুল হইতাম।

এই বৃত্তি স্তরের বিরুদ্ধে উচ্চাধিকৃত পিতা
আর দাদারইতে পারিলেন না। উপযুক্ত পুত্রের
পিতা বলিয়া তিনি যেন যেন সর্ব অসুখ
করিলেন। তারপর প্রানের আবেগে বলিলেন,—
'বাংলা কিশোর, আমি তোমার বাপ নই, তুমি
আমার শিক্ষাগ্রাহক, তুমি যা ভাল বোঝো করো,
যা যার কল্যাণে বলা স্বাভাবিক,—তোমার কপার
আমি কুলপ্রার্থনা করি।'

শিক্ষিত পুত্রের বেগুন-আরণ্যক-শেস্ত, সেইজন্য
আচরণই কিশোরের ঘেঁষা আমরা প্রাণে বদ-
পরিচালিত আনন্দ পাই। এজন্য কেহে উচ্চাধিকৃত
কিশোর যখন প্রকৃতির তাকনাতে অথবা সাধু উদ্দেশ্য
প্রণোদিত হইয়া পিতাদাতার অমতে বিবাহ
করিত তখন হইলে গৃহের শান্তি যে নষ্ট হইত,
তাঁরা আর কাগকেই প্রিয় করিয়া বলিতে
হইতেন না।

বিবাহিত-কোন কোনদিনই কিশোরী বামীর
ভালবাসা পায় নাই। যব ও বেড়াঙ্গক আমো, গভীর
প্রতি কোনদিনই ভাল ব্যবহার করে নাই।
মাতার অনুষ্ঠিত অভিযান্ত্রিকের প্রতিবাদও সে কখনও
করে নাই—করিয়াছে কেবলমাত্র পত্নীর নিকট
হইতে অর্থাৎ। পুত্র-চরিত্রা কিশোরী বামীকে
যেত্যাগানে নিজেতে পুত্রা করিয়াছে—দল
অভ্যাসের বেতনের দান বাংলা মাথার পাঁচের
হইয়াছে। যত্নের গুণ হইতে বিভাঙ্কিত হইয়া
বামীর পুত্রের অধিনি সমস্যাগত করিয়াছে।
কিশোরীর চরিত্র পরে আমরা একই বিস্তৃতভাবে
আলোচনা করিব। কল্যাণের, দ্বিতীয় কল্যাণ

বিশ্ববীর্য একটা মোহন্যের পাত্রেয় সহিত বিবাহ
হিলেন। বিবাহের একবৎসরের পর দুঃখপান
হঠাৎ সেলেন। বিশ্ববীর্য সপ্তাধিকার ভাষা
বাড়ী হইতে পূর্ব করিয়া বিদ। পিতার বাটতে
আমিরা পিতার নিকট সম্মান্যভাবে পাইন না।
সত্তা বিবাহ বিশ্ববীর্য অসুখের জ্ঞান ঈশ্বর কর্মের
কল্যাণের পুত্রের জীবিত হইল। দ্বিতীয় কল্যাণ
সুখের পর হইতেই কল্যাণের দ্বিতীয় বিবাহ
আরম্ভ হইল। কল্যাণের শোভার সুখেরে যখন
কল্যাণের অধির এবং দান যখন পাতা সেল
তখন কিশোরকে কল্যাণের বলিয়াছিল,—'বাংলা
কিশোর করো না, বিশ্ব হ'ব হই কি। বাটা
কলে তুংহে কেন জান ? স্থান্য তুংহে।
পতিমোনা চটি প্রভের লগ আবার কাছে এসেছিল,
আমি ছাউ যেতে বলেছি। আমিই দেখে শুনে
বে বিবেচনাম, আমিই ওয়াদী রোগীর হাতে
নিষেধিলুম, বিবাহ হ'বে কেন বিবেচনাম, বিবাহ
হবে বাড়ী এসে, ছাউ নিতে সেলুম,—সম্মানকে
ছাউ নিতে সেলুম ! সম্মান হওয়া কল্যাণ' আম-
সমানিতে কল্যাণের লগ তখন পূর্ণ। বেনারসে
লাজিত, সর্বত্র হইয়া শিক্ষিত জাতিয়া করিয়া
প্রবাহ কল্যাণের অস্তিত্বেরে লক্ষ্যিত—দ্বিতীয়
কল্যাণ বৈবাহিক শোভার সুখ দেখি। মাহু যে
বিত্তমতীক হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

এমিকে আবার ছোট বেরে জ্যোতিষীর
বিবাহযোগা। যব হইতেছে, যেখা কল্যাণ
চিহ্নিত। কল্যাণের মাতার নিকট ভাবিনী তাহার দাম
কিশোরের সহিত জ্যোতির বিবাহ লগ লইয়া
উপস্থিত। এই অসম্মানিত লগেরে কবা ভাবিনী
বিস্মিত লগেরে পানন সনকে কিছুতেই বুঝতে
পারিতেছিলেন না যে কবাটা দত্ত। কবাটা
দত্ত বলিয়াই তাহার মনে হইল। এমিকে বদ
কল্যাণের মিত্রের 'স্বাধীনত্ব কল্যাণের' অসম্মানিত
কল্যাণের কল্যাণের কল্যাণের লগ দেখি

স্বয়ং হইল। লালসাবি চরিতার্থ করিবার মত
হুই হুইবার অকৃতকাণ্ড হইয়া তৃতীয় কণ্ঠার সহিত
তাঁহার বিবাহ দিবস অকৃতকাণ্ড হইয়া গেল।
করিয়া বহিরা বসিল। একবারে কণ্ঠের পুত্র। অতঃ-
ধোগ বেগুনে ঠিক একটা লেখাপড়া করিয়া কণ্ঠ-
ময়ের নিকট হইবে। বিবাহের চুক্তি লালসাবি করিয়া
লগল। চুক্তিটা দ্বারাতে পাঁচাপাচি ধর তার
মত সে উকীলকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল।
অতঃপাচি তার লোক দেখাইয়া ও প্রথম কণ্ঠার সহিত
কণ্ঠ করিবার ইশার নির্দেশ করিয়া দিলেও
কণ্ঠমাত্র কণ্ঠা দেখাওনে বলিয়া কণ্ঠমাত্র এখন
দ্বিতীয় কণ্ঠার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে কণ্ঠার
করেন নাই, তখন সে কণ্ঠাছিল লোকটা খাঁচী-
কণ্ঠার হস্তে। তারপর সে তাঁহার বাঁকে
বলিয়াছিল,—‘বাবা, বাঁচী-কণ্ঠার তো কিরিয়ে
যেবেই, নগর চাকিতে কণ্ঠকণ্ঠ করো না। ওর
বাঁকে খুঁচী হাৎলে ও আবার একটু ভালবাসবে।
খুঁচী না হইলে এই বাঁচী কণ্ঠার পানে কিরিয়ে
চাবে না।’ পরের মধ্যে কণ্ঠমাত্র এখন বিকৃত
অবস্থার কণ্ঠা তিনি চুক্তি-তে লিখ করেন; এক
কণ্ঠাট বাবু ও তাঁহার উকীল তাহাকে ৫০০০
টাকা দেন। এই ঘটনার পরে কণ্ঠমাত্র বাঁচীকে
আদিলে পক্ষী লগল। কণ্ঠমাত্রের সহিত ঘোড়ার
বিবাহের কথা তাহাকে জানাইলেন। আরও
বলিলেন কণ্ঠাই কণ্ঠকণ্ঠের গারে লগল দিতে
চান। এখন তুমি কণ্ঠমাত্রবাবুর সঙ্গে ঠিক
করিয়া এস বলিয়া অতঃধোগ করিলেন। উত্তরে
কণ্ঠমাত্র বলিলেন,—‘আর ঠিক কি? বেশ
তো—বেশ তো! ভাড়াভাড়ি বে—ভাড়াভাড়ি
বে! ও কণ্ঠমাত্র ভাড়াভাড়ি বে’ হয়েছে, নাইয়েই
উৎসর্গ করে বলিমান দিচ্ছে। একটা বলি
চাই—একটা বলি চাই।’ একটা বলি চাই—
একটা বলি চাই—কণ্ঠাই তাঁহার স্বয়ং হইতে
কণ্ঠকণ্ঠার বাহির হইতে লাগিল। ইহাই ভাবিতে

ভাবিতে তাঁহার কণ্ঠের বহির্ভাগ আবার বিকৃত হইল।
বহুবার ঐ কথাই তাঁহার স্বয়ং হইতে শুনা যাইতে
লাগিল। বিবাহ সন্নিহিত উকীলের সহিত কণ্ঠার
কণ্ঠমাত্রের ঠিককণ্ঠার আদিলে উপস্থিত হইলেন।
সর্বজন সম্মুখে বলিলেন,—‘তুমি না বড় লালসাবি
মোক, তোমার না বড় কণ্ঠার ঠিক? বেশ
যেহেত বে’র সময় শুনেছি—বড় কণ্ঠমাত্রের বেশ-
ছিলে যে, কণ্ঠমাত্রের সঙ্গে বে’ বে’ না! টাকা
চাওনা বহুদিলে, ‘কণ্ঠা বিক্রেতা, এতে সর্বজন
মত—লগলিবারে বহি তাও কণ্ঠার!’ এখন ত
কিগি কণ্ঠার ঠিক দেখছি। তুমি লালসাবি যেহেত
আর একজনকে সঙ্গে বে’ বিক্রেতা? তোমার কণ্ঠজান
নাই—লালসাবি নাই? তোমার যেহে অন্য পক্ষে
পক্ষের ঐ কণ্ঠা হইবে—তানো? স্বয়ং পক্ষে
কণ্ঠা কণ্ঠা? কণ্ঠমাত্রের পক্ষা কণ্ঠমাত্রবাবু
এ কণ্ঠার উত্তর বলিল। কি? কণ্ঠা বিক্রেতা
কণ্ঠমাত্র কণ্ঠমাত্রবাবুকে বাঁচী হস্তের হাৎতে বলিয়া
বলিলেন, আমি উহাদের পক্ষি মিটাইতেছি
আলসাবে ভাবিতে হইবে না। এখন
কণ্ঠাট দিলে সেখানে আদিলে বলিল, ‘এসেছি,
বে’ কণ্ঠে আমি নি, আমার আকণ্ঠ হয়েছে
বাবা! কণ্ঠমাত্রবাবু আমি পূর্ব পূরি, তুমি বে
কণ্ঠা। বাবা! আমি ভালবাসি, তোমার ক
বলছি, কণ্ঠমাত্রবাবুর বেহে বেহে আমি আমি
একজনকে হইবে দেখি! দেখেছো ত, বাঁচী থেকে
বেহেই নি, ইহার কণ্ঠমাত্রের সঙ্গে দেখা করি নি,
বাগানে যাই নি। বাবা কণ্ঠমাত্রবাবুর সঙ্গে
আদিলে করে বে’ বিহে কণ্ঠে করে গেলো।’ উত্তরে
কণ্ঠাট তাহাকে বহির্ভাগ করিতে বাগন করিয়া
কণ্ঠমাত্রকে ‘আইন আঁকে’ বলিয়া ভর দেখাইতে
লাগিলেন। কণ্ঠাট তাহাকে তখন বলিল,—
‘আর আইন কি কণ্ঠে বাবা? আমি ত বে
কণ্ঠে নাহি, তোমার আইন ত কণ্ঠে না।
বাবা, কণ্ঠমাত্রবাবুকে বেশ, আমার তোমার কণ্ঠমাত্র

বেগাটা তেলের ঘেঁষা। ককণাময়বাবুর ঘেঁষে যে দেখছি, তা হ'লে বাবা পেড়াশ্চিৎ ক'রে না, তা হ'লে সে পল্লিনী মেয়েকে তোমার এই স্তব্ধের গোঁড়া তেলের সতে বে' মিতে চাইতে না।' তারপর সে তার বাবাকে বলিল, 'বাবা, আঘোর করে যে ঘেঁষে বাঁড়া। না দেখতে পার বাঁড়ী বাঁড়া, আমি কিশোরবাবুর সঙ্গে জোটপাট ঘেঁষে এগি ঠাণ্ডা ক'রে যাই।' জগন্নাথবাবু যখন দেখিলেন—টাকাগুলি মারা যায়, তখন তিনি যমজ্ঞামবাবুকে বলিলেন, 'বাঁড়ী বালাস করে দিয়েছি, সাত হাজার টাকার বোনা দিয়েছি, পাঁচ হাজার টাকার নগর নোট সহ ক'রে দিয়েছি।' উত্তরে যমজ্ঞামবাবু বলিলেন, 'সর্বস্বত্ব তত নিয়াজেন স্তম্ভভুক্ত হিন্দব কারিয়া বসুদ, আমি দিতেছি।' অথবা ভক্তলোককে এত টাকা দায়ী হইতেকে যেখা হুগলি বলিয়া উঠিল,—'বাবা, একবার চান্নাভুক্তি ছাড়ো! অনেকের গলায় লা দিয়েছ, তোমার কুঁকো খোঁর ত্রোণ হবে না বাবা। এসব বাবিনাগর্য ছেড়ে বাও।' তারপর কিশোর বাবুকে সে লাজুলের বলিল, কিশোরবাবু, আমার একটি মিনতি, এটা তোমার র'বুতেই হ'বে। এই তেল হুড়াটি, এই হুটী এখাতিং, এই হুটী ব্রেনলেট জু'ম যথাক্রমে তোমার ক্রীকে পারবে দিয়ে একবার ঝাঁড়াবে, আমি একবার তোমাদের দুজনের লেখ'খা।' কিশোরবাবু, তোমার ক্রীকে ভালবেসে আমি ছিনিয়া আর একটকে দেখছি। আমার মনে মনো নাই—কোণটি আমার মার পেটের বোন! কিশোরবাবু, আমার কথা রাখবে ত? হুলাটাবের বলিবার ভাবি যেখা ও তাহার সর্কিত্ত্ব কল্পরোম লবণ করিয়া কিশোর বাবু কুজিলেন—সে একতই অঙ্গুষ্ঠ। লালপার ঢকে যে তাহার ভানীপত্রীকে দেখিয়া আনিয়াছে, সে এখন তাগকে মার পেটের বোন বলিয়া অভিহিত করিতে পারিয়াছে, তখন একত

প্রেমের অনলে লালসা তাতার তপ্পিত্ত্ব হইয়া গিয়াছে। এই বিবাদের মনবত্তী হেঁচা উত্তরে কিশোরবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ ভাই! জু'মি এমন মনব আখা,—য'মি জামতেং, না।' প্রাণের আবেগে তখন হুলাল বশিষ্ঠ! কেশিল, 'পাল্লি—পাল্লি, ঘেঁষে যা, তোব পড়া জুলি নি।' আর লানো নেই, আখার প্রাণ ঘন ঘরে গিয়েছে।' স্থপিত চিত্তে যুবক হুলাটাব তোরিত নিকট হইতে যে লা? উপস্থিতির করিয়াছিল তাহার কপে সে নুতন কোন পাইয়াছে—সে কুজিতে, 'প্রাণ পেলে প্রাণ ছুটায়—যেহ পেলে মর! 'দরবা' দরব চাখ, প্রাণ :দর প্রাণ চাখ, তার পাঁচে মারির দেহের কবর নাই।' সে আরও গিখাছিল প্রেমের লালার একমাত্র ঐক্য—'আপনাকে তাগিয়া বেগা, পরের মুখে সুখী হওয়া।' তাই সে এমন আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিল।

নাটকের শেষ সর্ভাঙ্কের বিবাদের 'চৈ' দেখিলে যা পাঠ করিলে অক্ষ সঃবৎ করিতে পারা যায় না। যান গোয়াংবৎ। ককণাময় এমন কিক্ত্ব অবতায় ন'ন। তিনি দঃভক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনোস্ত্রিক ব্যপিত। তাহার মনোঃর মনো পঃভ হাখার টাকার নোট তখনও তাহার হাতে। যেগুলিকে তিনি ছুড়িয়া ফেলিয়া তাবিলেন, 'এই যে এখনো গোপক-চিত্র রয়েছে। জালো-তোরের তার পবিত্র স্থান। এই নির্জন স্থানই মানসস্থানী কীর্তন বিসর্জন বিহার পুতুল স্থান। তাই পরে পরে অক্ষ বন্ধন করিয়া জুলিয়া গড়িলেন। ককণাময়গত ককণাময়ের গোচরী পরিণাম দেখিয়া যমজ্ঞামবাবু সহিত একবারো মকলেই বলিলেন,—'লানোদে পবিত্রের ককণার পিতার এই পরিণাম। ঘরে ঘরে এই গোচরী অবস্থা। কোথাও পুত্রপুত্র আত্মত্যাগ, কোথাও ককণার পরিভাষা। প্রতি গুণে বরিত্তা। সতলের চক্রে উপর এই গোচরী বৃত্ত গুণে পুঃ নিত। বিহাজমান!—তর্পাণি আদ্যা পুত্রের স্তব।

বিবাহের কল্লাহ পিতাকে পীড়ন কর্তে পলায়ন
হইল। পবিত্র উষা, আশাধের সমাধের এক
অমৃত ভীতি—সমস্তে এক নূতন রসো! বাস্তবিক
কল্লাহ প্রাণমান নয়—বিশ্বমান! পিতৃপুত্রের
দাম্পত্য বৎসর পূর্ণে এত বলিমানের চিত্র উজ্জ্বল
আশাধের সমকাল্যবিত্তি—সে জগৎ বিবর্তক
চিত্র যাহিত করে নাই এমন প্রাণ নৈবেদ্যে পাওয়া
যায় না। বহির্জনের চিত্রে: ভিতর বহুটা যে পাতি
হইয়াছে তাহা স্বীকার করি, ভাতিটাই মঙ্গলের
কল্লাহ বিবাহের প্রকৃত হিন্দু বিবাহরূপে পুনঃ
প্রতিষ্ঠা করিবার বহু তিনি একটু বেশী প্রতিষ্ঠা
হইত। ফলসিদ্ধান্ত—কিন্তু এই সামাজিক সমস্যার
সমাধান কল্লাহ আমরা কি করিয়াছি। এই বিবাহ
পন প্রথার প্রতিষ্ঠা: কল্লাহ আমরা কি করিয়াছি।
সোমসত্তার অকালমৃত্যুতে ও আশাধের আশা
বিকলপ্রায় করি নাই। ভাবপ্রবণতার দোহাই
দিয়া অনেক দোষ: তাহা দিয়াছেন। কল্লাহ
চিত্র যেকিছুমাত্র তাহা নাই, তাহাও অস্বীকার করি
না। তাহা পি সত্যের অঙ্গুরোবে বলি: হইবে—
সুখী ভাতিত আশাধ বৎসর পি সত্যে হইবে এই
প্রাতিষ্ঠান পরিবর্তন করিতেই হইবে—কল্লাহ
কল্লাহের দিন কি সুখ হইবে না।

পাক্ষাত্য-রূপে বিবাহ-সম্বন্ধে কল্লাহ যোক্তর
লোচনা হইতেছে। অনেক মনোবৈদ্য এখন এক-
ভাষায় স্বীকার করেন নারীর ও মাতৃ:র বিকাশই
বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে বর্ষ হইয়া
বিবাহ না হয়, তাহা হইলে নরনারী প্রকৃত হইবে
কোথা হইতে? সঙ্গম নিষার বনবতী হইয়া নর-
নারী বৌ-সম্মিলন হইবেই হইবে। অর্থাৎ প্রেমের
বন্ধা বহিলে দেশে ভগবন্ত্য হইবে। কল্লাহ পুত্রের
সামাজিক অবস্থা পোচনীয় হইবে—আহা! আশাধ
পিতৃপুত্রের তাহার অস্বীকার হইবে না, কল্লাহ
কে কল্লাহ ভয়পাত তাহা লইয়া যোক্তর
বিবাহ চলিতে থাকিবে। আর অত্যাচার

স্বীকৃত, মানসিক ও শারীরিক গুরুত্ব হইয়া নিষ্ঠ
হইতে সুখ মঙ্গল কেহ ও মন বিশেষ প্রকার পাওয়া
একজন অসম্ভব। আশাধ অত্যাচার তাড়নাত্ত প্রকৃত
শিক্ষাধারের সুযোগ ও সুবিধা না পাওয়া তাড়নাত্ত
বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হয় না। তাই মেয়ের বনবতী
হইতে বহুতর হয় তাহার চৌকি কল্লাহ পুত্রের
উচিত। পিতৃপুত্র প্রাণোক্তকের দায়িত্ব অর্থাৎ
যে চাইতে পারে তাহার একটু দায়িত্ব
দিয়াছেন। যোক্তরীয় সুখ আশাধ তিনি,—
‘কেন বিবাহী কল্লাহ? আমি সত্যের চাপাণে,
আমি যোক্তা বৃত্তে নিবেদি। মেঘ পাহের আশাধ
হইতে কল্লাহ কেন দিবেছেন, তিনি আমা ক’রে
যোক্তার যোক্তা, আমি যিবে যোক্তে আট যোক্তা
করে যোক্তা বৃত্তে পারি। যিবি, তোমার তুম
কি? মেঘ তোমার কল্লাহ পোচন। কল্লাহ কল্লাহ
কেন? আমরা হই যোক্তে মেঘের কল্লাহ
চাপাণে পারি না।’ বাস্তবিকই যুগ-যুগের
প্রচলন হইলে ও উৎপন্ন প্রাণমি বিস্তার করিবার
সুবিধা থাকিলে অর্থাৎ বিবাহ প্রাণোক্তের ও
মহাবিশ্ব যুগ-যুগের অনেকটা বহুল অর্থাৎ হইতে
পারিবে।

পনপ্রকার বৃণ কল্লাহ:যাত কল্লাহ পুত্রেরই
কল্লাহ। কিন্তু একটা কথা এখানে তাবিহার
আছে বলিয়া আশাধের নে হয়, ‘কল্লাহ’ ও কল্লাহ
মেয়ের বিবাহ কি করিয়া হইবে? পাক্ষাত্য শিক্ষার
কল্লাহ আমরা এখন রূপের পুত্র। প্রাণমান
পোচনা দেশে রূপমানবতী কল্লাহ বিবাহযোগ্য
কল্লাহ পাওয়া যায়। অনেক ‘কল্লাহ’ মেয়ের টাকা
দিয়া বিবাহ হইয়াছে সত্য। টাকার গোতে অনেক
পাত্র বা পাত্রের পিতা বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছেন,
পরে স্বস্তরের অর্থ হস্তগত করিয়া পুত্র কল্লাহ
প্রতি নির্দিষ্ট ব্যবহার করিতে—প্রাণমি তাড়নায়
পুনরায় বিবাহ করিতে অর্থাৎ কল্লাহ চিত্রিত
কল্লাহর কল্লাহ বেস্তাণে সে পাত্র পাত্রকে আশাধ

প্রাণে করিতে, ঘেঁষিয়াছি। হু এক গানে বসন্তদন্ত
অর্ধে বিলাত দিগা উচ্চ শিকিত হইয়া বিলাতী
বহিঃস্থ শাবিত্র্যের কাঁচা। বসন্তের দণ্ড পত্নীর
প্রতি কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহার
বেঁচিয়া দণ্ডায়িত হইয়াছি। কিন্তু এতখানি ঠিক
নয় জগৎ ক' দিন হন জুলাইয়া রাখিতে পারে।
বহন জগৎ জগৎ জোড়ার জাতি খেল। জগৎ চোখের
মেশ মিটাইতে পারে—জাগরণ তথা মিটাইতে পারে
না। তাহা পারে জগৎ। জগৎর বশে পর আপন
হয়। এই জগৎ দ্বারাতে বাস্তবিকের মধ্যেই প্রতিফল
প্রকৃত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চেয়ে
করা উচিত। দেখাওনি লিখিতে হ'লেও জগৎ বহন
হইতে মেয়ে হুঁহা পাথ তাহার বিকেল হুঁহা রাখিতে
আমরা কতক গণিতাধারা ও অভিভাবকনির্ভর
অজুরোধ করি। আশাধের আদর্শ—'রক্তন
চৌপদী, সেবার গাভারা'। প্রাণজীবের রক্তন কার
কাটা এখন বাস্তব বেশ হইতে উঠিয়া বাহ্যেতেছে।
উৎকলবালী ব্রাহ্মণের আধিক্যে বসন্ত গৃহস্থী
দেয় এই কার্য প্রাণ করিয়াছেন বা করিতেছেন।

আমাদের পরিভ্রমিত অনেক গুণে পান না বসিয়া
চাও করিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে চোটেলেব
চাওয়া প্রাণ করিয়া অনেকেরই হুঁহা বসাইয়া
আলেন। মেয়েদের পাতপ্রণালী লম্বা দিক দান
করা গাভী কর্তব্য বসিয়া যেন করি। অর্ধগামী
লোকদের গৃহস্থীদেরও বাসী পুত্র করা। চিত্র
বিনোদনের জন্ত যথেষ্ট যথেষ্ট বসন করা আশ্রয়।
তাঁই বসিতেছিলাম কতদিনকে ও বিধে পিতা
বেঁচিয়া কর্তব্য। গাভারন বিভাবিত্য কথায় আমি
বিশেষ ভাবে বসিয়াই না তা'বিয়া, কেবল বসন
না করন আমি উৎকল লক্ষণাভী নহি। শিকিত
হুঁহেয়া শিকিত কতদিনকে বিচার করিয়া জগৎ
যে ব্যত হইবেন তাহাতে অজুরোধ সন্দেহ নাই।
প্রতি বসন্তের বাসিন্দারা আধিক্যে হুঁহেই গাভারন
শিকায় পাইতেছেন। তথাপি বসিয়া রাখা ভাল,
গাভারন শিকার বহন প্রচলন লক্ষণাভিত্য কতক
চিত্রর রঙা বাজীয়া। চৌকচিক্যালী নিষ্ঠুর
জুহু অলেক্য বসন্ত, জুহুদের কে লক্ষণাভী
নয় ? (ক্রমবধ)

গুপ্ত দাঁন

(শ্রী প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল)

নহ জু'ন অচেতন নিলামের জগৎ,
নীলাম্বর বেবস্তার জু'নও ব-জগৎ।
বারিহের নীলে জব পাখাণে: দেহ,
অস্তুরে অস্তুরে বারিহে বাকু-দেহ;
সরগিচা বনজু'নি বহে বসন নহী
কেহ না থাকিত—জু'নি না থাকিতে ঘরি।

নিজা পরিপূর্ণ বন যিট কল হু'ল,
তব ঘেহ-উপহার আছে তার জু'ল।
আপনি যোগন থাকি' বৈজ্ঞ-আধরণে
অযোগ্যে খর কর নানি লাভরণে।
হে লক্ষিত, লক্ষ্যগামী ওহে বহায়েশী।
আপনারে রাখ নিজা পরার্থে নিয়োগি

হানে রিক্ত, ঘেহে শিক্ত অস্তুর তোমার;
হে ঘেহ চরণে দাঁন করে নবদাঁচ।

মুখের মত

(চিত্র)

(ঐতিহাসিক পর্বা)

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে। অন্ধর খাতা-পত্র শুড়াইয়া বোকান বন্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় রাঘব সেখানে আগিয়া বিরক্তিপূর্ণ কর্তে বলিয়া উঠিল, “দাদু! পচিশটা টাকা যেত?”

অন্ধর হাসিয়া কহিল, “এবার পচিশ টাকার উঠবে বুঝি?”

রাঘব কপালের ঘাম মুছিয়া কহিল, “এর বলিস্ কেন তাই, দাদু! যেন রাঘব বোঝাল। কিছুতেই ওর হাঁ বোঝে না। এমন বাড়ী বজ্জাত দাদু ত কোথাও যেবিনি।”

অন্ধর কহিল, “ও তোকে খেলাফ, এটা বুঝতে পারিস্ নি।”

রাঘব কহিল, “তা আর বুঝি না, হাড়ে হাড়ে বুঝছি।”

অন্ধর কহিল, “তা যদি বুঝতিস্ তা হ’লে আর ঐ দালতী দাদু! মোব হাড়াতিস্ নি। টাকা কেলবি, যেখানে খুসী দাখি।”

রাঘব কহিল, “বনে ত তাই করি, কিন্তু পের অবধি গেরে উঠি কই। যোগ তাই টাকা টাকা ক’রে দে যে কাজটা কতে, তাতে একবারে শিতি আগে যায়, ইচ্ছে হয় আচ্ছা করে ছুঁবা কদিরে চলে দাদি, এই দেখনা প্রায় এক বছর ধরে ওর কাছে থাকি—কত টাকা দিয়েছি তা ত তুই জানিস্—আজ টাকা আনতে কুমে গেছি—কাল নিয়ে আস্গ, তা দাদু! কিছুতেই বিখাল হ’ল না।

অন্ধর কহিল, “তুই ওকে ছেড়ে দে। তা হ’লে দেখবি ওর তের ভাঙবে।”

রাঘব কহিল, “তুই জানিস্ নি, ওর তের সবলে ভাঙবে না। যে তাই টাকা ক’টা। তুই ত দেখেচিস্, টাকা হাতে গেলে সে একেবারে অস্ত্র দানব! তখন ও’রা লাগি দানবের সে একটা কথা বলবে না।”

অন্ধর হাসিয়া কহিল, “একেবারে পাগা খুন ধাবদাওয়া।” এই বলিয়া দাদু হইতে পচিশটা টাকা বাহির করিয়া রাঘবকে প্রদান করিল।

রাঘব টাকা কবুট দখিয়াগে রাখিয়া কহিল, “দাদু! সব চেয়ে বড় স্ত্রণ বে সে নিমকহায়াব নয়। আমার কাছে থেকে টাকা বেহার পর যদি কেউ তাকে ভবলও দিতে চায়, তা হ’লেও সে কিছুতেই নিমক হায়াবি করবে না।”

অন্ধর কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিল।

(২)

মাস দুয়েক পরে পাঁচ ছাত্র-বিন অবিস্রাজ্য বর্ণনের ফলে, উত্তর বঙ্গ জুঝিল। কত জননী সন্তানকে বুকের মধ্যে আত্মনিয়া রাখিয়া আকর্ষ ললপান করিয়া মুত্য়াকে বরণ করিয়া লইল। গর বাড়ুর ঘর, বাড়ী, ছেলে, বুড়ো কত যে মরিগ, কে তাহার লংখা নির্ণয় করিবে! বাহালা কোন রকমে বাঁচিয়া গেল, তাহালা তিলে তিলে বড় হইয়া ধরিবার অস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বাড়াইল। তাহাদের চারিদিকে পরম আত্মহরণের পড়া সব ভাগিতে লাগিল। দাদা জীবিত হান নাই, এক স্বপ্না আরাধা নাই।

[illegible]

কিছু এই বিচার জেনের বক্তব্যের আশ্রয়
 চেষ্টা করে থাকার নব-নাগর প্রাণ আঁত ধড়িতির
 মুখে কীরিয়া উঠিল। কালকাতার রূপে ধনে
 ধনে মানুষ ভিড়ার জুলাই কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া
 পড়িল! ওগো পুংবানো, তোমরা এক মুঠি চান
 চান হাত, হেঁচা হাফুচা হাত, তোমাদের উত্তর
 দেশের স্রোত ভর-নিরাগ। অন্য-স্বারে উল্লস। তাহারা এ
 অবস্থায় তোমাদের কলবার সুখপেক্ষা হইয়া বিচা-
 ইয়া আছে—ওগো হাত, যে হাত পা হাত। তার
 পর কলিকাতার পোক অথবা হইয়া আর এক

নূন স্তম্ভ বেশি। যে প্রেক্ষিত বসিমা প্রতিনি
 বৃত্ত সমাক্ষেপ ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিরা স্পষ্ট বোধের
 মধ্যেও কঠিন, চট্টাৎ জাতিরা বলে বলে ডিকার
 ক্রিষ্টাণে করে করে হারপে ব্যতিরিক্ত হঠাৎ পড়িল।
 "ওহো ডিকা হাও মো, ডিকা হাও মো" বসিমা
 গুরুতর ব্যত্রে ব্যত্রে ক্রিষ্টে লাগিল।

(c)

নীতিবাদের দরজার খিল খিলি বারানবার
 শেনি চোখের মলিন বিন্যাস। হস্ত
 একখানি আঁধার কোণে বসে পড়ি মনে-
 যোগের দহিত কি একখানি ঘটন বার্ষিক এই
 পাঠ করিতেছিল। অন্ধের চোখের টেবিলে, গায়
 হই কড়া, হাথব ও অক্ষরকে এই চোখের অঙ্গের
 বিন্যাস হাঙ্গি মনে বানী মাতাইয়া তুলিতেছিল।
 হস্ত এক একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া আবার
 গ্রেহে গ্রেহে লম্বিত করিতেছিল।

এখন সময় পতিতা রমণীর মল পান পারিত
পারিতে হরচন্দ্রের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।
হরচন্দ্র কেদারা ছাড়িয়া তড়িৎবেগে লাকাইয়া
উঠিলেন। কস্তাবের বিকে চাহিয়া অস্তরাবে
কহিলেন, "শ্রী ককবো এবেণ কর। হুদীতি,
হুদীতি! দেশের দাক্ষিণ্য সর্বনাশ। ওঃ ওঃ!
ত্রিকার স্থল আছে তর-গৃহদেহ দ্বারে পতিতা রমণী!
উদ্বাহের উগ্র বিলাক নিধানে যে সময় গৃহ কম্পিত
হইয়া গেল। পুণ্ডিত, পুণ্ডিত, পুণ্ডিতকে বিধা-
এ কলুষ নিগাধ করিতে হইবে। না হইলে
পরিণতবয়স্ক যুবকদের মনোহাণ যে হরণ করিয়া
লইবে। হায় রে যুবকবৃন্দ! তোমাদের মত যে
আবার প্রাণ কীৰিয়া কীৰিয়া উঠিবে। ত্রিকা
পার হাতে পতিতার দাক্ষিণ্য হুদনা, দরদর রক্ষা
কর।"

ସାଧ୍ୟ ଓ ଅବହାଳେ ଯତ୍ନ କରିବା ହେଉ ସ୍ବାର୍ଥୀ ଓ
 ନାର୍ଦ୍ଦେଶ କଳେ ମିଶ୍ରା ଆହ୍ୱାନୋପନ କରିବା ମତିତାର
 କଳାସିତ ପୁଣି ହେତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାତ୍ର କରିବା

হঠাৎ একদিকে স্থব কিয়দাঁধা নিঃশব্দ হোথ
কমিয়া চন্দ্র বুঝিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর
ঊর্ধ্বাঙ্গ বাটার সম্মুখে তাৎক্ষণিক দাঁড়াইয়া বামাকর্ষে
বোল করতালের সহিত গীত হইতে লাগিল।

“বৃত্তান্তীড়িত, ভাগ্যভাঙিত
কত না বহুবাণী
উপাধ বিহীন, কীর্ষে নিশিধিন
আতুল পাখারে ভাণি।
অঙ্গে নারি বাল
গেতে গৃহধাম

নিবাস বৃক ভলে গো!”
“অত্র বিনা দায় কিয় ভিন্ন তার।
স্নিগ্ধমন হারা কেঁবে কেঁবে সারা
কি বশা তাবের দুর গো!”

• • • • •
পীঠ সাধা বাহা কর বোনে দান,
এ দানে দৌন পাবে পরিব্রাজ,
তোমাদেরই নামে করি লয় গান
ধারে ধারে আঁক ফিঁরি গো।
ভিখারীঃ তরে ভিখারী এসেছে
হে—মাতা করুণা কর গো।”

পাখিতে পাখিতে যখন সেই পতিতা রমণীর
চল ক্রমে ঘুরে চলিয়া গেল, তখন হঠাৎ আবার
আরাম কেদারার আদিয়া অবলম্বনের চক্ষা করি-
লেন। ঊর্ধ্বাঙ্গ বৃত্ততা কত্কাধর ঘর হইতে বাহির
হইয়া আসিয়া অক্ষর ও রাগবের সহিত চাঘের
টেপে লম্বকাইয়া বসিল।

হঠাৎ যখন যখন দীর্ঘনিঃশব্দ ফেলিয়া বলিতে
লাগিলেন, “ও হো গো যেনের কি ভুঁকিন!” সঙ্গে
সঙ্গে কেকেক কাধড় দিরা চাঘের পেয়ালায় চূড়ক
দাখিয়া গলা তিলাইয়া লইলেন।

রাগব ও অক্ষর দুইভাষনের সহিত সুহৃদু হৃদয়
বিনিময় করিতে করিতে কবেক পেয়ালা চা ও
অনেকগুলি কেক ও মিষ্টানের লম্বাধার করিতে

লাগিল। তখনও ঘুর হইতে সেই গীতধ্বনি তাহ-
দের কর্ণে আদিয়া সবেশ করিতেছিল।

“ভিখারীর তরে ভিখারী এসেছে
হে, মাতা করুণা কর গো।”

এক কড়া উত্তীরা শিতার পাশে দাঁড়াইয়া
মিহি গুরে কহিল, “আর এক পেয়ালা আর চুটো
সন্দেশ বিই বাবা।”

হঠাৎ হঠাৎভাবে কত্কাধর বিকে চাখিয়া
কহিলেন, “নাও দাখাও, গলা একেবারে শুকিয়ে
উঠেছে। ও হো গো যেনের কি ভুঁকিন!”

খানিক পরে কারখানাকিক হাসিগা অক্ষর ও
রাগব উভয়ে উদ্ভীষ্টা পড়িল।

(৪)

গলে বাহির হইয়া রাগব কহিল, “মানতীর
গলা পেলাম বলে যেন হ’ল। পেও কি এ দলে
থেরিয়েছে নাকি।”

অক্ষর কহিল, “বেকতে পাইরে—তারি মরা
পেয়েছে, লগ্নাকো লগ্না লাভ, তার ওপর নিম্নের
স্বপ্ন-বোধনের বিজ্ঞাপন। আর গিয়ে বেবুঃ ওবব
ঘরে লোক ধরবে না।”

রাজে বখাসময়ে মানতীর গৃহ উপস্থিত হইয়া
রাগব দেখিল, মানতী মস্তার মত লম্বাঘ উপর
পড়িয়া আছে। তাহার পদমাংস পে একবব
কিরিয়াও দেখিয়া না। রথ্য খাটেও উপর বসিয়া
মানতীর বেহুখানি ধরিয়া লম্বাকোরে মাতা গিয়েই
মানতী অতিকটে মুখ কিয়দাঁধা কহিল, “মানার
আম মাক করতে হবে ভাই। পেই করব গোঃ
যেহি পব চলা অভ্যাণ সেই, তাব ওর পিঁচ
খটো থরে, টোঁতা—বরীয়া যেন আর বইতে না।”

কালও মানতী লম্বাঘতা করিয়া তাহার নিম্ন
হইতে আরও ঠাই টাকা বোঁ দাখার করিয়া
লইয়াছে—রাগব পে কখা ভোগে নাই। এটি
টাকা যখন পে দিয়াছে তখন পে মানতীকে কিছ-
তেই অব্যাহতি দিবে না। সে স্থব শুধু আবার

করিবার তত্ত্ব সূচকভিত্তিক হইয়া কহিল, “ও কথা শুনিচি না। বউ, হারমোনিয়াম নিয়ে বস। চম্ ক করতে দিয়েছিল কেন?”

মালতী কিছু না বলিয়া মুখ কিনিয়া শুইল।

এমন সময় ঘোষণা সেই কবে প্রবেশ করিয়া কহিল, “আজ আর আমি হাঁথিতে পার্ছি না—সমস্ত বেহীটা যেন তেজে পড়ে। আজ আমার হুজি খেতে বিত্ত দিদি।”

মালতী কহিল, “কুমীকে ভেকে বলে যে, হোতার চাল যেন ঐ সঙ্গে নেয়।”

রাধব নিজস্ব করিয়া কহিল, “আজ যে একে-বারে কলহক হ’য়ে পড়েচ বৈশি।”

মালতী কোন উত্তর দিল না।

ঘোষণা করিল, “ওস দিদি, আজ চরিত্রতত্ত্বের দলের সংগ্রহকে কল অর্থাৎ বাকীর ভেতর নিয়ে বসিয়ে অনেক খাবার খাইয়েছে।”

রাধব হাসিয়া কহিল, “তোমাদের বৈশি আজ গোয়াবারো। কথিটা এটো ভাল। ক’দিন চালাবে? বউকে এমন গরের মধ্যে তোমাদেরও প্রাণ কেঁদে ওঠে! কত চম্ হই জান।”

তাঁহার উত্তরে মালতী শুধু হীর্ষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। রাধব কিছু অস্তর বলে নি। সে নিজের অন্তরের মধ্যে বার বার প্রহ করিতে লাগিল—তাহারা জনগোষ্ঠের বিরুদ্ধে করিয়া কলের সংগ্রহ করে বলিয়া কি তাহাদের প্রাণে মার্য্য দয়ারও স্থান নাই। গুমহীন, অপ্রাণীকৃত, অসম্পন্নকৃত নরনারী, শিশুদের প্রাণে কি সত্যই তাহাদের প্রাণ কীভাবে না? উত্তর পাইল, তা যদি না জানিত, তাহা হইলে তাহা কি করিয়া নিজের মনস্তাত্ত্বিক হাত করিয়া, প্রত্যেক কখনো বউ দিয়া উদ্ভাস

কুলি কীভাবে করিয়া গবে গবে বৃত্তি বেকাটিল। মালতী অন্তরের মধ্যে অন্ততপূর্ণ আশার অন্ততন করিল।

রাধব তাহাকে চুপ করিয়া গড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অবিরত হইয়া বলিয়া উঠিল, “নাও চের চম্, যেখান হ’য়েছে, এখন ওঠ।”

মালতী অন্তরিক্তে তেমনই ভাবে মুখ কিনিয়া কহিল, “তোমরা আমারের চেহের অবন।”

রাধব কহিল, “ভাত আজ বসেই। হাতে টাকা পেয়েচ কি না।”

মালতী আলিঙ্গা উঠিয়া কহিল, “কি টাকা দেখাচ্চিস্ জুই—মাগ্না দিল। আমরা শরীর কেটে বসেচি, আমরা টাকার জন্তে জাহি না, কীরে নিয়ে যা তোর টাকা।” এই বলিয়া ছাটল হইতে চাবি খুঁপিয়া ঘোষণার বিকে ছুঁকিয়া দিয়া কহিল, “ঐ বাজে টাকা। আছে, যে ত হবার করে সুখী—টাকা দেখাতে এসেছে।”

রাধবও ছাড়িয়াই পাত্ৰ নবহ, কহিল, “হ্যাঁয়ে হাঁ, আজ ত টাকা কেলে দিবিই। আজ কলি াদি করে অনেক টাকা সোৎসার করচিস্ কি না।”

“কি বলি মুখোপাড়া” বলিয়া মালতী ঘেঁষের কষ্ট কুঁচো তীরের মত সোজা হইয়া উঠিয়া বলিল।

রাধব কহিল, “আজ ডিকের নাম করে কত টাকা সরাগি তাই জিজ্ঞাস করছিলাম।”

মালতী উজ্জ্বল বেশে শু বিশ্রুত বসনে বাট হইতে মাটিতে নামিয়া পড়িয়া! বরষ কোণ হইতে কাটা গাছটি তুলিয়া লইয়া রাধবের সম্মুখে বসিয়া কহিল, “এই তোর কথার উত্তর, ভাল চান্ ত এখনও বের বসুণি—না, হ’লে এই খ্যাতি ঘেঁষে ঐ মুখোপাড়া খেঁচলে দেব, পাঁজি, ইত্যদি।”

দেবতার স্বপ্ন

(পাখা)

(ঐযাহিনীরজন সেন গুপ্ত, কাব্যতীর্থ)

পুরোহিত আসি, করিল রাজ্যের, এবার দাক্ষিণ্য দিতে,
ঠাকুর আদারে দিয়তে স্বপ্ন, সোণাই হইবে দিতে ।
ঈশ্বর হান্দিয়া কহে মহারাজ, দিতে হবে কি উপায় ?
পূজা বিধি বিনা ঘা-বের মান, দেবতা এবে কি পায় !
পূজারি কহিতে, “তুমি মহারাজ মোড়লোপচারে তার
পূজা পদ্ধতি, যোড়ন লগা, যোড়ন ঈতারি আর—
যোড়ন কলসী, বোলখানা থাল, মোড় যোড়ন খাল,
দক্ষিণা বের, আর কাল নেই, বাড়ারে পূজার মান ।”
“সব ঠিক হবে”—কহে মহারাজ, পূজারি চলিল আরে,
ঈতের কাপড়ে তাকার গুণ, রাজার উঠিল ভরে,
পূজার দিবলে যেনে পুরোহিত, দুখীনে পত পত
ঈতে কাঁপে তলু, রাজবাড়ী চলে সলিল অবাধ মত ।
বিস্মিত অঁগি, ষড়িক্ বেষে, মণ্ডামান নিক করে,
মোতের কাপড় ভাকি মৌনজনে মানসে ঘের ধরে ।
জাকাল ভরিয়া উঠিলে আশীষ, “জয় জয় মহারাজ,
দুহস্ত নীতে, দাক্ষিণ্য দাতনা, তু চাইলে তু’ম আয় ।”
পূজারি চাখিয়া কহে মহারাজ, “জায়ে পুরোহিত অঁগি,
পূজা উপহার লইতে আগনি, দেবতা এসেছে নামি ;
নিখিল ভুবনে আমার ঠাকুর, তরপুর হ’য়ে আছে,
ধনীত দুহারে, আশীষ পইচা। মৌনবেশে ঘন বাচে,
দুখীর নয়নে তাঁহার অঙ্গ, ধনী মুখে তাঁর তালি,
সাবুর পুণ্য, তাঁহার আলোক, ধরা তাঁর সুধামাণি ।
যে স্বপ্নম তোমা দিবেছে ঠাকুর, সে স্বপ্নম দিছে নয়.
মৌনের বৈকুণ্ঠে বাখা বাজে বুক, সে যে দেব মহামহ ।
তল চন্দনে, তোমার পূজার দেবতা আছেন জাগি,
বাও পুরোহিত, পূজা গিয়া তাঁরে, আশীষ লইব মাগি ।”

বংশের কলঙ্ক

(ঐশভোজকুমার বসু)

অনিয়মশক্তি শব্দিতচ্ছন্দ

কানৌশঙ্করের সর্বনাশ

“হাঁহে হাংগন, আমার যা রক্তো না কি
এসেছেন তুই তোথায় তিনি?” কানৌশঙ্কর
বাবু গাড়ী চাইতে নামিরাই এই কথা বলিমাকে
চিৎকার করিলেন। সেদিন তাঁহার বাড়িতে
কয়েকজন এসেছে, তাই তিনি প্রবাসের
উদ্দেশ্যে ক্রান্তি অসমাপ্ত থাকে আনিতে বালিশের
ঘোঁড়ার পাঠাইয়াছিলেন।

হাংগন ওভার জুড়ায় গতি গাড়ী চাইতে
বাড়ির নামায়ে নামাইতে বলিল, “আজ্ঞে দিদিমনি
তুই অনেকক্ষণ এসেছেন।” নিজের কান সেরে
তিনি যোগ দর একজন উপরটা পরিষ্কার করতে
গেছেন।

কানৌশঙ্কর বাবু চৈতন্যবান প্রবেশ করিয়া
দেখিলেন, ঘরের ঐ ক্রিয়া দিয়াছে। সমস্ত
সাজ সজ্জান বাড়িভাড়া হইয়াছে, সব যেন স্বতন্ত্র
‘তকতক’ করিতেছে। কুলের সন্ধ্যা এমন চমৎকার
হইয়াছে যে দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কানৌশঙ্কর
মঙ্গল হস্ত স্পর্শে ঘরটিতে নবজীবন সঞ্চারিত হই-
য়াছে তাহা বুঝিতে কানৌশঙ্করের বাকি থাকিল
না। পরমানেয় তাঁহার জ্বর পূর্ণ হইল। তিনি
অনিলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অনিলা আনিয়া বলিল, “কোনমদি, ডাকছিলে
কেন?”

“ডাকছিলুম, আমার বাকি দেখাও এলে।
হাঁ বা, সব যোগাড় পেয়েছে, না কিছু আ-
বাকি আছে? এদিকে কতদূর কি হোলো?
আমি সাহেব যদি এখানে থাকত, তা হলে আমার

মাথের চাকের চাই একখানা ভরকারি খেতে পেত।
সাহেব আমায়ের দেখী ভরকারি খেতে বড়
ভালগালে। হাঁ, দেখ মা, মাথের কচুড়ি দিগাড়াটা
জুড়ি নিবের চাকের ভরতে পার যদি বড় ভর-
সে, তা বাহুনা যাঃই বড়ক তোমার মত হবে না।”

“হাঁ কঠোম’ব, সাহেব দিগা পেছেন কেন?”

“ঐ যে আমায়ের আসামের নতুন কাগজার
ভাগের সবচেয়ে ভালরকম সব বন্দোবস্ত করতে।
সাহেব এখানকার কান সেরে দিগালে দিলে যাবে।
পড়ন্ত সাহেবের ওখানে পৌঁছাবার কথা। সাহেব
পৌঁছে অল্পকি ছেড়ে যাবে। হাঁ ভাল কথা,
ঐ টেবিলের টানার ভিতরে একখানা চিঠি আছে
নিরে এসো তুই মা।”

অনিলা চিঠিখানি আনিয়া দিল। কানৌশঙ্কর
বাবু বলিলেন, “খাক, ওখানা পড়তে ইচ্ছে কর
পড়, ওতে আসামের শব্দবোধের কত আশ্চর্য কথা
আছে। ওখানা অল্প লিখেছে—”

এই সময়ে এতটা দানী আনিয়া বলিল, “বড়বাবু,
জ্বন মেয়েলোক দেখা করতে চান, তাহা নিচে
গিনীমার কাছে বলে আদে—”

কানৌশঙ্কর বাবু খৌতুৎখোজা হইয়া বলি-
লেন, “কীলোক? আমার সঙ্গে দেখা করতে
চান? কিছু চান যদি, বাইরে লজ্জার মশা হইলে
বলগে না দেখে’খন।”

“না বড়বাবু, তাহা কিছু চান না; তাহা
বলছে, তোমার সঙ্গে দেখা করার পরকালে, তাহা
কি সময়ে খেতে যোগাবে?”

“না, তাহা এইখানে পাঠিয়ে দাও।”

বিভূষণ পথে দাঁড়ী তটীয়া স্রোতাক্রমে যত
পৌণ্ডর্য বিধা চলিয়া যেন। উদ্যোগে মধ্যে
বয়োভোজী জীবৎ অবশেষে কপাল চাকিয়া যায়
সাজিয়া আঁখি দাড়াইল, অশ্রু একবারে
দীর্ঘাভঙ্গি যাদের ব্যতিরিক্ত জীবৎ অতৃপ্তভাবে
দাড়াইল, উহার বৃক্কের উপর একটী অতি কোমল
শিখ ছিল।

কালীশঙ্কর বাবু বিম্বিত হইয়া ভিজ্ঞানিলেন,
“কি চাও বাবু তোমরা?”

• বয়োভোজী অশ্রুভঙ্গী জীবৎ টানিয়া যেন কত
জড়জড় হইয়া যুগ্মবরে বলিল, “বাবা, তুমি আমাদের
বহুল শাসনের রাগা বাবা, শরীর দুঃখী তোমার
কাছে এসে কখনও শুখ হাতে করে যাব না।
আমার মাথার বত চুল বাবা তত —”

“থাক, কি করতে হবে বল। আমার মাথা
তোমাদের যদি কিছু উপকার হয়, উচিত হলে
নিশ্চয়ই করব।”

দুঃখী বলিল, “আমরা তোমার কাছে বিচার
চাই বাবা।”

“বিচার? কিসের বিচার?”

জেষ্ঠা দ্বীপের ফ্রেড হইতে শিউড়ীকে জুগিয়া
গইয়া হাতের উপর নাচাইতে নাচাইতে বলতে
লাগিল, “এই ছেলে, এই সোনার টাং ছেলে,
সোনার শাপিকটীতে নিঃস্রী বাবা বত গুণগোলে
পড়েছি।”

“তাঁ’ আদি তার কি করা?”

“তুমিই তাঁ’ বাবা করবে, নইলে কে করবে?
যেখ যেখ এর সুশাসনে তাকিকে, তোমার আপনার
জন কি না?”

“আমার আপনার জন? কি পাগলের বত
বলছে?”

জীলোকটী বাবাকীর মুক্তি-অলী। সে বলিয়া
হাইতে লাগিল রানার নাতি হেথের বাছার
কপালে বিখ্যাত পুঙ্খ দুঃখ লিখেছেন, তাই

না আবার হুঁতের থেকে বাড়া বাত্মন ভঞ্জে।
আমার জাম ত’ বাবু, আমি এই পলির মুক্তি-
ওলী, খোকার বাপ জীবনেই খোকার মাকে
যেখ আশায়ে গিয়েছে। এখানে থাকতে যৌন
বাবাকীর ঠেকে খোব-খোব বিস্ত, তার পরে
আশায বেতে ঐ সে বেহেত বাবু রমেশ না কি,
তেনার হাতে দিয়ে থরত বিস্ত থো। কেন,
বাবাকী সব তাঁ’ বলে দেখে বাবু। তা, আর
কদিন হবে ঐ রমেশ সুখশোভা বড় আশাতন
করছে বাবু। বলে গি, ঐ বাবা হেঁড়ে উঠে না
গেলে ভাল কেটে উঠিয়ে দেবে। বল, এ পাড়ার
থাকতে বেবে না। বাবু, কি অপরাধ করেছে,
বাবু বলত?”

দাখানিয়া ভাল বাত্মন কানোপার বাত্মন রমেশ
হইতেছিল। তিনি কি খলবেন তাঁ’বিয়া পাইতে-
ছিলেন না। কিছু অনিলা সে বাত্মন পটীত নহে,
মুক্তি-ওলী কথা শুনিয়া ফ্রেড ও দুঃখী হাজার
আপন-অন্তক জুগিয়া হাইতেছিল। সে ব্যক্তি
যের নিজাখা করিল, “রমেশ বাবু সঙ্গে তোমাদের
চটাচটী হ’ল কবে থেকে গা?” বলিয়াই অনিলা
লক্ষ্যার দুখ রানার করিয়া বেঠানার চেয়ারের
শিখান লুকাইল।

মুক্তি-ওলী প্রায় তিনটা প্রায়বটী হুতব হইয়া
গিয়াছিল। কিছু সে শাকা খেলোয়াড় মোক,
মহলে অপ্রতিভ বা অপ্রতিভ হইবার নহে। সেও
দুঃখীযথো আপনাকে লানলাইয়া গইয়া বলিল,
“তুমি কে গা বাছা, তোমার গকে —”

এইবার কালীশঙ্কর বাবু কথা কহিবার প্রয়াস
পাইলেন। তিনি উত্তেজিতবরে বলিলেন, “উনি
কে? উনি আমার মা লক্ষ্মী, উনি যা বলবেন,
যে বাবু ক’রে বেবেন, আমি তাঁ’তেই শব্দত হব।”

মুক্তি-ওলী অমনই নহয় হইয়া বলিল, “হঁ, মা,
তুমিই বল তাঁ’ মা, এই শরীর বেঠানী ছেলের হাত
যের কোমার যাবে! এই অনাথ শিশু কি অপরাধ

কয়েক বা চল ঘেঁষি ? এর কি লাগে পাঁচি রহ
বল ঘেঁষি ?” মুক্তি-অন্য অতঃপর অবগতমনবতী
সুবতীকে কি যেন ইঙ্গিত করিল।

সুবতী গিরিবালা গে বহল কাঁচা হইলেন
খেলোয়াড় নিবাস্ত কন্ন নহে। তবুও অনিলায়
সমুখে কথা কহিতে তাহার কেমন বাধাবাধ
ঠেকিতে লাগিল। গিরিবালা বলি বলি করিয়াও
একবার অনিলায় সুবের নিকে চাহিয়া নীরব
হইল। অনিলা তীব্র কৃষ্ণিত তাহার নিকে চাহিয়া
চাহল। তাহার মন তাহাকে বলিয়া বিন, মুক্তি-
অন্য বাণী বলিতেছে তাহার স্টের মিতা।
কালীশঙ্কর বাবু কাতর কৃষ্ণিত তাহার নিকে চাহিয়া,
জিজ্ঞাসিলেন, “সবত’ কনলে না। এখন তোমার
উপরেই তার বিজি, বা বর্তব্য তাই বল।”

অনিলা এখার লক্ষ্যর সুখ লুকাইল না, সে
সুখের কালীশঙ্করের কানে কানে কি বলিল।
কালীশঙ্করের সুখ মর্ধ্যবস্তুর হইয়া উঠিল, তিনি
মুক্তি-অন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “বেশ, আর
আবার বাড়ীতে একটা কাজ আছে, আমি তাতে
বাস্তব আছি, আর এ সকল কথার বিচার হতে পারে
না। এর পর একদিন অবসর যত সব শুনে বা
কর্তব্য স্থির করব। এখন তোমরা যেতে পার।”

মুক্তি-অন্য অনিলায় নিকে তীব্র কটকট নিক্ষেপ
করিয়া বলিল, “বেশ বাবু, আর আমরা বাই কোথা,
বাই কি ? গরিকে যে ঘেঁষ বাড়ীর রমেন বাবু
লাঠি নিয়ে বসে আছে।”

অনিলা আবার কালীশঙ্কর বাবুকে হুপি হুপি
কি বলিল। কালীশঙ্কর বাবু বলিলেন, “আবার
না বলছেন, রমেনবাবু আপাততঃ তোমাদের ঘাটে
কিছু না বলে, তার ব্যস্ততা করা হবে। আর
তোমাদের মত না বাক আপাততঃ তিকার মত
তোমাদের কিছু বেওয়া হবে, যেমন অস্ত্র
হিসাবকে বেওয়া হয়। তোমরা এখন যাও।”

মুক্তি-অন্য উত্তেজিতভাবে বলিল, “এই বিচার

হ’ল ? তোমার ছেলে আশ্রম থেকে রমেনবাবুকে
যে চিঠি লিখেছে সেই চিঠিই প’কে বেখনা। ঘেঁষ
বাড়ীর বাবুদের জিজ্ঞাসা কর না, এ পাড়ার যাবে
তাবে জিজ্ঞাসা কর না, যে ভাতার চিকিৎসা
করেছিল তাকে জিজ্ঞাসা কর না, কে না জানে ?
আর বিচারের বা হুকুমার কি বাবু ? আমি
প্রমাণ, বাবাকাই প্রমাণ, আমাদের কাছেই ত’
ছ’ড়িক এনে রাখলে দো। বলে বিচার ! হাঁ !”

কালীশঙ্কর বাবুকে লবাব বিতে হইল না,
অনিলা সুবাবাস্তব কৃষ্ণিতে উহার নিকে চাহিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, “আমরা থেকে রমেনবাবুর নামে
যে চিঠি এসেছে তার লেখা তোমরা জানলে কি
ক’রে, রমেনবাবু কি তার চিঠি তোমাদের দেখিয়ে
যেড়ান ? তোমাদের সব মিথ্যা।”

গিরিবালা পূর্ণ হইতেই অনিলায় উপর জুড়
হুঁচুচিল। বিপদেতে সে রমেনের সুখে অনিলায়
কথা শুনিয়াছিল এবং তাহার বিষয়ে সকল কথা
জানিত; কেবল জানিত না, অনিলায় প্রতি
রমেনের সোভের কথা। আর সে রমেনের
নিকটই শুনিয়া গিয়াছিল যে অনিলা এইখানে
আসিবে। কৌপনে অনিলাকে অকপের পাণের
কথা শুনাইয়া বিচার উৎসে রমেনই তাহাতিপকে
এখানে পাঠাইয়াছিল। এখন অনিলায় সুখে
কটোর লেখা শুনিয়া গিরিবালা ভেলে বেতনে
জিয়া উঠিল। অধিকন্ত অনিলায় অসাব্যস্ত রূপ,
অতুল ঐশ্বর্য এবং ভবিষ্যৎ সুখ-মৌভাগ্যের কথা
মনে পড়িবামাত্র তাহার মূত্র জ্বরে হিংসানল
জিয়া উঠিল। সে ঝড়াইয়া উঠিয়া অবগত
কেনিয়া বিয়া ভাবন কৃষ্ণিতে যেন অনিলাকে বধ
করিয়া বলিল, “রমেনবাবুর চিঠি পড়ি না পড়ি
তাতে তোমার কি ? পরীষ হুঁচু আমরা এমনি,
এই ছেলের মত হুকুমার করতে, তাও তোমার
সংল না ? রূপের বাহার রূপ শুনেও তোমাদের
বদা হয় না, উঠে তাহালা করছ, বেয়া করছ ?”

এই সময়ে রামদত্তর বাবু লগোমনাথ ও অধিক
স্বাধীনক লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন,
ঐশ্বর্য হাতে একখানা পত্র। “কি হে কালি,
অমর, কোথায় গিয়ে পৌঁছে গেল গল্প জুড়লেই না
কথা বলে/কেনন? এমিকে যে নিম্নস্থের বাবু
—” নির্দিষ্ট উত্তরে উত্তরে রামদত্তর বাবু এই
কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কক্ষের
দ্বারদ্বারিণী স্ত্রীলোক দুটিকে দেখিয়া থমকিয়া
থাকিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, “এরা কারা?
কি, চার?”

সকলে ঘরের ভিতরে আসিলেন। সুচি-অমর ও
তখন পরিচালনা রত হাঁড় ইয়া উঠিয়াছিল। সে
নিম্নস্থের আখ্যায়িক হই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল,
“এই যে বাবুনা সব এলেন। তোমরাই বিচার
কর তু’, কি অসুখের এই হৃদয়ের ব্যাধি লাগি
লাগে, এই ভয়ঙ্কর মোক্ষের ঘেরে কষ্ট পাও, রাত্রি বাবু
হলে তুলিয়ে ভালিয়ে এর কুস্তির খার করলে
এখন খোর গোবের তরে চাল কেটে বালা বেক
উঠিয়ে দিতে চাই। তোমরাই বিচার কর পাচ মন।”

রামদত্তর বাবু স্বপ্ন পড়ির হইল। তিনি কক্ষের
দোরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “এসব কি, কালি?”

কালীদত্তর বাবু পড়িরভাবে জবাব দিলেন,
“না খেদ, বা শুনছ তাই, এর বেশী আমিও ত’
কিছু জানি নি।”

রামদত্তর বাবু বলিলেন, “তার মানে তোমার
অক্ষরের কীর্তি ত’ ও ত’ শুনে শুনে কাল
কালপালো হবে দেখে, মজুন কোন কথা আছে?”

কালীদত্তর বাবু কোন কথা বলিবার পুর্বেই
সরোজ অঙ্গুর হইয়া বলিল, “পালনাত্মক অঙ্গুর
ক’রে একটু চুপ করুন, স্ত্রীলোকটার কথাই
আমিই দিচ্ছি। এখন বাবা বাপার যে ঘটবে, তা
আমি অনেকদিন থেকেই মনে করি আসছি। হা
স্বা স্বা, তুমি বলছ তুমি বিচার চাও, বেশ আমি
ওঁদের হ’রে বিচার ক’রে দিচ্ছি। কি তোমার

নাশিন, তা বুঝেছি। তোমরা নাশিন করছ
একজনের মানে, স্ত্রীলোক তোমরা এক পক্ষ আর
সেই একজন আর এক পক্ষ। বিচারের সময় হই
লকট উপস্থিত থাকি চাই। তোমরা এক পক্ষ
উপস্থিত আছ, কিন্তু অন্য পক্ষ উপস্থিত নাই;
সুতরাং তার অসুশাসিততাই কি ক’রে বিচার
হবে পারে?”

কালীদত্তর বাবু স্বপ্ন দেখে ও স্ত্রীলোকের চিত্ত
প্রকট হইল, স্ত্রীলোক যে এমন সুন্দর রূপে এই
জটিল কথার বীজাণু করিবে, তাহা তিনি আশা
করেন নাই। অনিবার্য চোখে স্বপ্নে লোভে কৃতজ্ঞতা
হুট। উঠল। রমণীয়া কিন্তু বাক্য বিরক্ত ও
অসুখ হইল। সুচি-অমর স্ত্রীলোকের করিয়া বলিল,
“সে থাকলো না থাকলো তাতে কি এনে গেল?
এখন ত’ সব রয়েছে, তা ত’ আর উড়িয়ে দিতে
পারবে না। খোর গোবের তরে সুচি এখন ঐ
সব ছুতো তুলছো?”

পরিচালনা রূপে আভ্যন্তরীণ হইয়া সুচি-অমর হাত
খানা টানিয়া বলিল, “আর না, চলে যাই। আর
হলে তার বাড়িতে বলে এত অসুখান! আচ্ছা,
আমালত আছে সেইখানে বিচার হবে।”

সরোজ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, “বেশ তাই
কোয়ো।”

সুচি-অমর সুখখানা পাণ্ডুরূপে ধারণ করিল, সে
দেখিল যে অতিমমতা ও মন ছাপাইয়া গিয়াছে, তাই
সে তাড়াতাড়ি বলিল, “না বাবু, এর কথা শোনে
কেন? ছেলে মাল্লুখ, রাসের মাথা কি বলতে
কি বলছে। আমালত করবে, না ওর মাথা
করবে। তুমি ও যেমন বাবু, স্ত্রীলোক ছাড়া আবার,
তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই ব্যবস্থা করে দাও।
হাতে তোমাদের মনোবাবু আবারের চাল কেটে
উঠিয়ে না দেহ, আর এই অনাচারী সুবেলা হুঁতু
খেতে পার, তার ব্যবস্থা করে দাও, এর বেশী
আমরা এখন কিছু চাই নি। মনোবাবুকে আগের

থেকে টাকা পাঠাচ্ছে, সে টাকাও খেবে না, আবার বলে কি বাপ ছেড়ে যাও, না হ'লে তুমি কতবে বলে তার দেখাচ্ছে। অন্যথা যেহেতু মাতৃদুঃসঙ্গ এখনই ঘাটা ক'রা কি ভাল হচ্ছে, না এত খোকার বাপ এখনে যা'ক'লে কেউ এখনই করে তার দেখাতে পারত তোমরাই বল না বাবু।”

কালীশঙ্করের মনটা এইবার একটু নরম হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, “আজ্ঞা যাও এখন তোমার, যাও এরপর তোমাদের কথা বিচার কর। এখন যাতে তোমাদের উপর কোনও জোর ও ক-শক্তি না হয় তা তোমাদের বিশেষ ক্ষমতা না হয়, তার ব্যবস্থা করা যাবে। হাঙ্গর আসামে চিঠি লিখে সব ক'লে শুনে যা উচিত হাই করবে। এখন যাও।”

হুটি-মল্লী ও গিরিবালা চলিয়া গেল, যত্নের ভিতর কিছুকণ হাল্কা নীরবতা বিস্তার করিল। পরে রামদত্ত বাবু সজোরকরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রমেশের কথা ওয়া কি বসছিল?”

কালীশঙ্কর বাবু বলিলেন, “যা বসছিল, তা ও' শুনেছ। ওয়া বলছে, রমেশ ওদের অকপের পাঠানে খোজা শোখা'তে টাকা দিচ্ছে না, উ'টে ও'দের বাসা থেকে ডাকাবার চেষ্টা করছে।”

সরোজ হঠাৎ বলিল, “কেন, হ'মার কি মাথা ব্যথা এতে?”

রামদত্ত বলিলেন, “যা'বা'যা কেন? ঠিকই সে করেছে। কেনে শুনে ত' সে পালের প্রসন্ন হিতে পারে না।

কালীশঙ্কর বাবু ব্যস্ত কর্তে বলিলেন, “জা হ'লে তুমি অকপের সোঁষ বেনে নিছ?”

রামদত্ত বাবু হাকের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “না বেনে করি কি? সোঁষেই যদি হবে, তা হ'লে মাসে মাসে খোরগোষের টাকা পাঠাবে কেন?”

কালীশঙ্কর বাবু ক্রোধ কলিত্ত করে বলিলেন, “সে অমন কতদিকে কত টাকা দিয়ে থাকে তার

খবর রাখ না, কেবল তার ছাগ ধরেই খেয়াল।”

রামদত্ত বাবু বৈরাগ্য হইলেন। তিনিও লগান ওজনে বলিলেন, “তুমি ও অল্প হ'লে অবশ্য কেনে যুসুক্ষ হ'লে রপত শুদ্ধু তাই, তা ত' নয়। তোমার হেলের ওয় ডের, তাই বাগোয়, ঐ-ক্রিতি জুগে আবার খেয়েকে তার হাতে গোণো না হ'লে দ্বির করেছি।”

কালীশঙ্কর বিমিত্তর গুতিত হইয়া বলিলেন, “প্রু, কি বলছ? সব জানে'র কেন? এখানে ছেলে-পুলেতা চলেছে জুগে খেছে কি?”

রামদত্ত বাবু বলিলেন, “না জুগে হাই নি। তাগই হয়েছে, ওদের স'মনে ক'বাটা উঠেছে, ও'রা' সেখ নীমা'লো হবে থাক। তোমরাই বল, নিগা এখন আর ছেলে মাদ্রুগটা নয়, লন বৃত্তে গি'য়েছে। বেশ, তা হলে সব কথা বুলাবুই বলা ভাল। দেখ যা, ছেলে বেলা'র তোমার যা অকপের মদ্য'বার আগে আ'মাদের মদ্য'বার মধ্যে আ'মাদের ছেলে মেয়ে হ'লে তা'দের বিয়ে দেখার কথা হয়েছিল। উনি সেই দ্বারী বিয়ে এখন তোমার ঘ'রে বই করে নিতে চান। কিন্তু আ'বি ও'র ছেলের হাতে তোমার বিতে চাই নি। কেন, তা হুটি প্রালোকের ক'বাতেই খোঁষ হয় বুঝতে পেরেছ। আমি সরোজকেই তোমার উপযুক্ত পাছ হ'লে মন' করছিলাম। কিন্তু সজো'ল তোমার স'হো'বার মত মেয়ে হ'লে আপত্তি ক'রতে য'নের বা'দ'না পু'রী করতে পারি নি। এখন দ্বির করেছি, রমেশের হাতেই যো'বো। রমেশও মদ্য' ছেলে নয়। ব'রই মদ্য' হ'ক, তা বলে কালির ছেলে'র চেয়ে মদ্য' হ'তে পারে না।”

সরোজ আর পারিল না, বাবা বিয়া গিলি, “আপনি কি বলছেন?”

এই সময়ে জু'ল রাম দত্ত বাবু'র হ'ত ব'রতে এ'ক থানা প'জ মেয়ে'র উপর পাড়'য়া গেল। স'নি'র সেখানে জু'ড়াই'য়া লই'য়া তাঁহার হাতে বিল। হা'ব-

সন্ধ্যের গুটি পাতের উপর পড়িবামাত্র তিনি অশ্রু-
ভিত্ত হইয়া বলিলেন, “বাহ, দেখেছ, বাকে তর্ক
করতে করতে চিঠির কল্য ভুলেই গেছি। দেখ ত’
কলি, এখানে ঘাইরে এসে পড়েছিল, কোথায়
পিওন কলটার ডেলিভারিতে নিয়ে গেছে, শিলারের
ছাপ রয়েছে।”

“শিলারের ছাপ ? ঠিক দেখি। তা হ’লে
সাহেব লিখেছে—” কালীশঙ্কর বাবু এই কথা বলিয়া
পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। “কিছু চিঠি পড়িতে
চুকিতে তাঁহার ঘরের তাব অন্ধ আকার ধারণ
করিল, হাকপ উৎকর্ষা ও উৎসর্গের চিত্র যুখে
প্রকটিত হইয়া উঠিল।

লম্বাও সতয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “কি, কি, কি
হয়েছে ? অমন করছেন কেন ? অল্প ভাল
আছে ত’ ? কোন মন সংবোধ আছে না
কি ?”

কালীশঙ্করবাবু পত্রখানি সত্যোক্তের হাতে দিয়া
হইয়াতে চকু আচ্ছাদন করিয়া কেবলমাত্র বলি-
লেন, “পড়”

সত্যোক্ত প্রকৃত্তে পড়িতে লাগিল :—

শিলার

বিলম্বিত হোটেল।

প্রায় কালীশঙ্কর,

অত্যন্ত মন সংবোধ পাইয়া আমি এই মুহূর্ত্তেই
লিখাল মিলে যাত্রা করিতেছি। সেখানে
শৌছিয়াই তোমার অঙ্গের সূক্ষণ সংবোধ দিব।

চটনাটা এই যে লিখা মতীর অপর পার্শ্ব
“লক্ষ আবহাওয়া চকল হইয়া পুঠি পাঠ আরম্ভ
করিয়াছে, দ্যাক্তার পোটিকাল অফিসার শিলার
কে অফিসে এই সংবোধ পাঠাইয়াছেন। তিনি
তুমিহারায়ে লিখাল মিলের উপর শালমেরা চকল
হইয়াছিল, তাই তিনি সেখানে বসিয়া নিশ্চিন্ত
পাশ পাঠাইয়াছেন সেখানে কি হইয়াছে না হই-

যাছে, তাহার সংবোধ তিনি এখনও পান নাই।
আমি এখনই শিলার হইতে সেখানে যাত্রা করিতেছি।
কালী, কোনও ভয় করিও না। আমার বিশ্বাস,
অল্প মন সংবোধই আছে। সে নিকে ভাল, তৎক্ষণ
তাৎক্ষণ মন সংবোধ করিয়া থাকেন। তবে
শুধীতে আশঙ্কিত হইতেন। নিতাই ঘটতেছে।
তাঁহার মন মন্থরা প্রস্তুত থাক। আশাধর কর্তব্য।
কেবল এটুকু বোধিত হইবে, আমার আশাধর
কর্তব্য পালন করিয়া ঘাইতেছি কি না।

লিখা আবে এমি শৌছিয়াই তোমার ঘর
দিব, কোনও ভিত্তা করিও না। বড় যাত্রা। ইতি

তোমার বর্ষধ

আখ্যান কেতেছি।

পত্র তুমিবা লক্ষণেই নীচবা। তামলমণ্ডল
যুখে সত্যোক্ত চিত্তায়েবা সূচিয়া উঠিল। তিনি যেন
আশানাকেই লক্ষণেই যুগে বসিয়া অম্বান
করিলেন, তাই নিতান্ত অসত্যোক্ত ভায় তামলমণ্ডল
অম্বান হইয়া কালীশঙ্করবাবু হাত হস্তা করিয়া
বলিলেন, “কালী, তাই, কেন এত কতর-ছে।
মামুষ মাত্রা তামল আবেত্তা স মিলের উপর
চকল হইবে, এতেই না ভয় ? কিন্তু তা হলে
মামুষই বা অম্বান আগে থাকতে ধরে নেবে কেন ?
আমার বিশ্বাস, অল্প নিশ্চয়ই ভাগ আছে। তার
আর যা বোধ থাক, সে যে সাহসী, শক্তিমান আর
আশঙ্কিত মন, তাতে আর লক্ষণ নেই। চিঠি
দ্বিন আগে লিখে, তা হলে এতক্ষণ নিশ্চয়ই
দিয়েছি লিখা মিলে শৌছিতে। বোধ হইয়াছে
সেখানে থেকে বসে পাঠাবে।”

তামলমণ্ডল কথার শেষ হইতে না হইতেই
“বাবু, তার এগেছে একখানা,”—দালান হইতে
একজন খানদালা এই কথা বলিল। সত্যোক্ত, “তার
ঠিক, কি তার, দেখি—বসিয়া এক লক্ষণ যার
সামান্যে উপস্থিত হইয়া তাহাতে লক্ষণ।

রামসদয় বাবু অভিক্রমে বলিতে সমর্থ হইলেন,
“কি তার, পক্ষ বেধি।”

সংযোজ পড়িতে পারিল না, সে রামসদয়বাবুকে
ভাবিখানি দিয়া বলিল, “আপনি পড়ুন।” সে এক
খানা চোখের বগিমা পড়িল।

রামসদয়বাবু পড়িতে লাগিলেন :—

নিখাঃ স মিল।

কালি, মন বুঢ় কর, মড় মন সংযাং। তোমার
পুত্র বীরের মত পড়ের কত জীবন বর্শ দিচ্ছো!
তানি, পিতার পক্ষ এ সংযাং কি ভয়তর, কেন না,
আমার পুত্র না বাবিলের আদি অল্পকণে পুত্রের
মত ভাল বাসিতাম। কিন্তু লক্ষ্যবানের ব্যবহার
উপর আমাকেও কোনও হাত নাই। যে পুত্র-
সিঙ্গে র্তার অসংখ্য স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাকে
রক্ষা করিবার জন্য যেচ্ছাং আপনকে জুহুজান
করিয়া বিশেষতঃ সুখে লক্ষ্যের আগে স্থাপাইয়া পড়ে
এক হাঙ্গিতে হাঙ্গিতে জীবন অর্জিত যের, আমা-
রের বেলে পালাকে আশ্রয় দাখুব জানে লক্ষ্যে
পূর্ণা করে। তোমার ভাগ্যে সেইজন্য আশ্রয় পুত্র
পুত্রপে পাইবার সুযোগ ঘটাইয়াছিল। ইহাও
অধিক কিছু বলিতে পারি না। আমি কোঠায়ে
পরিবারকে এক সপাকে সঙ্গে লইয়া বাইতেছি।

তোমার খাখার বাবী আবার কেনেডি

সাব্যস্ত স্ত্রীপতনের পক্ষ হয় কক্ষে এখনই
লীরবতা বিস্তার করিতেছিল। কালী লভর নিচ্চল
নিচ্চল পুত্রপের মত চোখে বগিমা পলকলীন
বুজিতে লক্ষ্যের বাহিরে চাইয়াছিলেন। সর্বোত্তম
সুখ প্যাক্তর্য আগে করিয়াছিল। রামসদয় বাবু
কক্ষকতে পত্র পাঠ করিতেছিলেন, পাঠকালে তাঁহার
কণ্ঠের কণ্ঠিত হইতেছিল।

অনিলা এতক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া তার
জানিতেছিল। ক্রমিতে ক্রমিতে সে কালীলভের
চোখের হাতলতা আপনপ পড়িতে চাপিয়া ধরিয়া
হান। তাঁহার চোখে জল ছিল না, কিন্তু সারা

জ্বর ব্যাপিয়া তাঁহার লক্ষ্যমুগ্ন বহিতেছিল। তাঁহার
এক একবার মনে হইতেছিল বৃষ্টি তাঁহার জ্বর
জেদিয়া একটা জীবন চীৎকারে লক্ষ্যে দেখিনো ভাইয়া
যাং। তাই সে মনের উপরে আপনপ পড়ি নিখো-
মিত করিয়া বুক ভরা কাঁদা চাপিয়া রাখিল।
একবার তাঁহার মনে হইল, সব যন্ত্র। সে ভাবিল,
তার অঙ্গে নাট, সাধেব কিছু দেখে নাই, সে কেবল
মনে মনে এই ভয়ের কথা ভাবিয়া দিখা কই পাই-
তেছে। আবার লক্ষ্যমুগ্নেই তাঁহার মাথাটা খুঁজিয়া
যেল, সে দেখিল, না সবই ত' সত্য। এই যে তাঁহার
পিতার হস্তে সেই সর্বমুখে তার, এই যে সংযোজ
লক্ষ্যের চোখের জলে লক্ষ্যল জালিয়া বাইতেছে,
সে লক্ষ্যের মত ছুঁলিয়া লুইয়া কাঁপিতেছে, এই
যে তাঁহার কোঠাবনি কাঠের মত খুঁষা দৃষ্টিতে
আকাশের বিকে চাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার
চোখেও ত' তাঁহার মত এক কোটা জল নাই।
হবে কি সব সত্য ?

অনিলা কখনকাল অউচর্যের মত চারিদিকে
কোণ কোণ চাইয়া রহিল, বৃষ্টি পড়েই তাঁহার ঐশ
ছাপাইয়া উঠিল। সে ক্রমিল তাঁহার পিতা কালী-
লভর বাবুর পিঠের উপর হাত রাখিয়া আত্ম কণ্ঠে
বলিতেছেন, “কালি, তাই, জল বাইরে বাই।”

অনিলাই ক্ষুদ্র জ্বরে তখন কোথা হইতে অদ্রুত
বল আসিয়া। সে হস্ত সততে লক্ষ্যকণে লক্ষ্যের
বাহিরে বাইতে বলিল। রামসদয় জানিতেন, তাঁহার
বলিকা কলার ন্যায় জ্বরতে আর কেও কালী
লভরকে লোকে লাগু করিতে পারিবে না, তাই
তিনি সেই নির্দোষ মত সংযোজ ও আদরকে লইয়া
বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তখন অনিলা দুপাল বাগলতার কালীলভের
প্রাণ বেটন করিয়া তাঁহার লোকা ছুঁলের উপর
কোবল লক্ষ্যে রাখা করিয়া লক্ষ্যের কণ্ঠে জাকিল,
“বাবা।”

কালীলভের মোহ হ্র হইল, তিনি সেই ডাকে

চমকিতা উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার
অকণ্ঠস্বর কিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে শিক্তপদোদন
করিতেছে। তাঁহার বকেট পড়ত—তাঁহার স্বপ্নো-
দন পূত্র কি সত্য সত্যই কিরিয়া আসিল ? প্রবৃত্তিবাঞ্ছা
বৃদ্ধি উদ্ভীত কিরিয়া কানৌনকর পার্শ্ব অনিগ্ৰহণাত্মক
দেখিতে পাইলেন। অমনই তাঁহার বকপত্রের ত্রেন
কহিলা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল, আর

তখনই কানৌনকর গট ঠাঠে সুখ প্রতিধা শুভ্রা
পড়িলেন, তাঁহার জন্মের জন্মট কান্নার ইং
সাজিয়া গেল। যে পোকে কান্না নাট, সে পোকে
হৃৎকর মোহন, অথবা উদ্বাস পূর্ণগন্ধ। তাই
যখন কানৌনকরের দেহ খাকিয়া থাকিলা কান্নার
বেগে কানিগা উঠিতে লাগিল, তখন অনিগ্ৰহণাত্মক
পোকে ও কবকিৎ সাধনা পাইল। ক্রমশঃ

অশীম

(শ্রীমতী গতিকান্দিনী)

অশীমের নামে গতিকান্দিনী
অশীমে মিশিতে চলেছি ছুটি,
যাহা কিছু গের সব বিচ্ছেদ প্রথ,
এ' সুখ-স্বপন ঘাবে গো টুটি'।
স্ব' স্ব' স্ব' ছুটিছে তটিনী
গতিকে অশীম সাগর-কোণে;
দিন বন ছাড় সব চলে যায়
অশীম অংকিতে মিশিবে ব'লে।

উপগেহনকারি অশীম আকাশ
অশীম জলবি মিত্র রথ,
সকল অশীম ছাড়ে উড়ে,
হে অশীম তুমি কতপায়,
কখনো স্ব' নাই যদি শেষ
যদিও তোমার অন্তরীণ,
পূর্ণানন্দ গতি ও জ্ঞান—
হে অশীম তব আজাদীন্য

সুখ ও শান্তি

(রূপক)

(শ্রীমতীমঞ্জরী কাম্যনিবি, বি, এ)

আমায় উইট মস্তান—সুখ ও শান্তি। ওজ্জ্বল
আকারগত লক্ষণে যোব হু চিনিতে পারিবেন, সুখ
আমায় পূত্র আর কভার নাম শান্তি। সুখ বহলে
বড়, বলিষ্ঠ ও উচ্চতরতায়। আর শান্তি বহলে
ছোট, ক্ষুদ্রকায় ও নম্র প্রকৃতি। সুখের অনেক
সদৌ। সে সর্বদা সন্মোহের নিবে আমোদপ্রমোদে

যাত্র। আর শান্তি সে কখনও বেগী মোহের সঙ্গে
মিশে না। মোহে ঘোরভাবে আপন কর্তব্য করিয়া
যায়। কিন্তু এত অমল সত্ত্বের তাই বেগী সে
ভাব। সুখ সধাসময়ই সত্ত্বের চরিত্রা প্রসঙ্গের
তরী শান্তির নিগতে সন্মোহই নয়। শান্তির কেমন
একটা আশ্রয় তপ আছে, আতা বহই জ্ঞানো-

কৌণ্ড হ'য়ে আশ্রয় না কেন, এক নিমিষে তাহাকে
জল করিয়া দিতে পারে। সাধারণ মানুষের জ্ঞান
আমিও আমার ছোট ঘরে শান্তিকে একটু বেশী
তালবাসি আর তার গুণ পনার আশি বৃদ্ধ।

আমার শান্তি উপর ভাষা বড় বেশী। আমার
বেশন কিছুই বদলানো নাই। তাই শান্তি
করিয়েই দ্বিধা। বসল তাহার অপরিণত।
পতীকে ঘেঁষে ব'লে যে সে নিরন্তর, কিন্তু
তাতে তার একটু হাংস নাই। সবাই প্রকৃতমুখী
সবাই হাতমুখী। আমি শান্তিকে নিয়েই একপ্রকার
কীটে আছি। তাব'হি বসল যখন তার পরিণত
এ'বে তখন ত তা'কে পড়েই ঘরে দিতে হবে—
এ'কে ছেড়ে থাকতে হ'বে—তখন আমার কি বলা
হ'বে। এইটা সময় সময় বেশই জাতি। আর
চোখের জলে বুক ভাসাই। শান্তিকে পাক্রম করি
কি? বস্তুবাদবগণ কি বলেন? যদিও আমি
তার গুণবৃত্ত, কিন্তু পরিচয়ের নিরলসতা হুঁতকা
ব'লে তেহ তা'কে গ্রহণ করি কি? পিতৃপিতৃদাদী
উপার্জনশীল দুরকসপ পতীকে ঘেঁষে গুণপনার
দিকে লক্ষ্য করেন কি?

যাই হোক শান্তি ক্রমে বড় হইতে লাগিল।
তার গুণপনা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। জল
সাধারণ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বিবাহের বয়স
টানিয়া আনিল। আমি বড়ই 'বিরত হইলাম।
বিবাহ তাবনা উপস্থিত হইল, একদিকে শান্তিকে
পাক্রম করিবার অনিচ্ছা, আবার দ্বারে লাগিত
পালিত করিয়া তা'কে সর্বদা কাছে রাখিবার
ইচ্ছা, আর অজ্ঞাতক বিবাহের বয়স অতিক্রম
করিলে শোকে কি বলিবে? তাবনা ক্রমে বাড়িতে
হ'ল। একদিন কথার কথার বিবাহের কথা
হ'ল। উদ্বেজ, শান্তির মনের তাবটা

তানিয়া নাই। শান্তি বলিল, "বাবা, আমার
মত সেরে না। ঐরা কার তিনিই কর্ণেই।
আপনি অনর্থক তাবনা পতী নষ্ট কর্ণেই না।
তিনি বজলম্বর, তার উপরে নির্ভর করুন।"

কথাটা বেশ মনে লাগিল। সেই দিন
হ'তে আমার তাবনা অনেকটা কদাইগাম।
আবার পূর্ণের জ্ঞান আশা ও গাহনে দু'ফ
বাবিলাস। দুই তিন বৎসর চলিয়া গেল। শেষে
এক মাতৃশিশুহীন যুগল শান্তির পারিগ্রহণে
হইল। যুগলটি বেশ সুখ, বীণ ও উপার্জনশীল,
মনে করিলাম, ঐরা এই সব গুণে উপস্থাপিত
করিয়াছেন। ইহা পরিচায়ক করা কর্তব্য নয়।
আর তাবাইটিকে নিমেষে ঘরে রাখিয়া দিলেই
বেয়েকে ঘুরে পাঠাইবার তাবনা থাকিবে না।
জানাইয়ের সঙ্গে বিশ্রুত বিশ্রুত সুখ ও ভাল হ'বে
উঠবে। বলিতে জুলিয়াছি, জানাই জুয়ের চেয়ে ২০
বৎসরের বড়। নাম প্রজ্ঞান, আমি এই বিবাহেরই
আয়োজন করিলাম।

যাই হউক, বিবাহ হইয়া গেল। হবারে আমি
নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার মনের উদ্বেজ জুয়ের
বর্তন পরিবর্তিত হইতে লাগিল। সে ক্রমে তাপ
হইয়া উঠিল। সে সন্ধ্যারে পাতিবারা হুতাইতে
লাগিল। কিছুদিন পরে শান্তি এক সুখগা করা
প্রদত্ত করিল। নাথ বাবা হইল—শুভ। দাবো
ক্রোধে লাগিত লাগিত ও ব'র্জিত ইয়া ও ক্রমে সে
সকলের মনোব্রতন করিতে লাগিল। সুখ,
শান্তি, জ্ঞান ও সুতির অপূর্ণ মিলনে সন্ধ্যার
বক মনন কানন হইয়া উঠিল। তাবিতাম, প্রপ-
তক যে মনন-কাননের সৃষ্টি করিয়াছে—তা'হা বড়ই
অদ্ভুত ও মনোহর। পাঠকবর্গ, মনে রাখিবেন—
আমার নামই 'প্রপ'।

রহস্য উন্মোচন

(গল্প)

(শ্রীলীলা দেবী)

(১)

মাঝ রাত্রে প্রভু নীত। ঘন কুলাশায় চাট-
দিক আঘাত। আকাশ বেগাজিত, রৌদ্রের আশ
সুস্বাদিত। মাতে মাখে পল্লা পল্লা কুটীঃ
পদ সজ ও গিজিল। পত্র পুত্র ককালো তীর
বীর বের লইয়া নীতের বন্দনে বাতাল হইতে
পরিভ্রম সাইবার লজ মৌন ভাবে চাটখাছিল।

সুদূর শরীতে একবাশি কুহ কুটীরের বেড়া
বাধিরে দাঁড়াইয়া একটা সুবত্তী রমনী, একবার
দ্বিধ আকাশের প্রতি চাহিয়া যেখিল এবং
বুজিতে পারিল যে মেঘের আকাশ এখন পরিভার
ভাবে না। রমনীর দেহ সুগঠিত হইলেও অতিশয়
কৌণ এবং সুব পাণ্ডুর। এই রাক্ষস নীতের
উৎসূহ প্রথম বস্ত্র তাহার অঙ্গে ছিল না। একটা
লাগা পাইন—বহিঃ পরিভার তত্ত্ব তাহার পরিধানে
শোভা পাইছিল। রমনী একটা কুহ পিত্তকে
অতি সাবধানে ঘোটা প্রথম বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া
কোমের ভিতর রাখিয়া বাতাল সেবিত্তেছিল
তাহার ঠাণ্ডা লাগিতেছে কি না। লিঙীত
অত্যন্ত কৌণ, তাহার তত্ত্ব সুগঠান ও নীলাঙ্গ। কু
টী দ্বারা কাপড়ের ভিতর হাতে সেবা ঘাইতেছিল।
শিখর ঐ চক্ষু দুটা ঠিক তাহার মাতার মত
বসিতে—সেইরূপ একটা অকথিত ভাষা ও তার
ব্যক্ত। রমনী আপন মনে বলিতেছিল “তারের
আমার বাহা! যদি মনকে শক্ত করে, তাকে
একলা কেলে কত করতে বেতে পারতাম,
তাহলে খুঁজে পেতে এটা কাম পেলেও পেতে
পারতাম।

এখন আর উপায় নেই, এখন যে রকমকেই

উপধানে দিন কাটাতে হবে! আর যদি আমি
আর জিলাবের মধ্যে এই কুহ বোড়কীতে বা
আছে তাই হুতরে খেতে কেলি তাহলে কি রকমদয়
জীবর আধাধের শান্তি যেনে? না তা যেনে না
গেব কহ! আমার বাহা আমার মেঘদয় শিটা—
তিনি যদি আর বেঁচে থাকতেন! তিনিও যে
চলে গেলেন! বাহা আমার দেবী বলে লম্বাখন
করতেন, তিনি যদি আর আমার এ কঠ বেবতন
তাগলে নিচর তীর কাছে ফর্মে বাগর
অনুযাতি বিতেন! জীবর তীর আশ্বাসে পাতি
বিন্!

রমনী এক গুরুত্বের লজ নীরব হইল—পার
নীতের একটা বন্ধুতা বাতালে তাহার সুবপিত্তে
যেননা লাগিয়াছিল।

লম্বাখনের প্রতি করণ কুটীতে চাহিয়া আমার
দে বলিতে লাগিল—তোকে হত্যা করতে যে এ লগ
কটে বাহ—তোরা যেনাই যে এ কার কিছুতেই
ক’রেতে পারছি না, না বলে অনেক আগেই এ বস্ত্র
থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতুম। তা যদি পারতুম
তা হলে চিনি এখন আমার ব’লেই যে আধাধের
বিবাহ—সিখা বিবাহ হ’লে, তবনি আমি এ
প্রাণ তীর পনতলে ত্যাগ করতুম—কিন্তু হুই যে
তখন আমার পেতে—তাই যে কাম পারিনি—
লম্বাখনের চাটখুশ মেঘদয় শোভে—তাকে ঝড়িরে
রাখবার মধ্যে লম্বাখুশের অবাঞ্চিত প্রেরণ
দে কাম পারিনি! যেনের জীবন প্রবের লজ
তাঁরা কেন অকালে বাহা যান? আর
আমাদের মত অভ্যাসিনীরাই বা কেন বেঁচে থাকে?
জীবনের এ কি রকম বিচার? আর এই বা কি

বকস নিরস বে আশা-ব এমন অস্বাভাব কোলেছে
সে লুপে কীমন তাইতো, সকলের সম্মান প্রদায়
এই হ'লে সাধারণ সমাজত্বিত ভোগ করছে,
আর আমি—আমি নির্দোষী ক'রে আর
সদায় থেকে তাড়িত—নাহিত—লজ্জার বাধা
ভুলতে পারি না—পেটের ক্ষিধা মিটাবার
অঙ্গে একটী পরমা নেই—অন্যভাবে ক'রতে
ব'লেছি—সঙ্গে সঙ্গে চেপেটায়ও প্রত্যা—কি
—না—আমি পতিতা!—হায় আমি যে কোন
পাশই করিনি সে! হে ঈশ্বর এই কি তোমার
অনুগ্রহ—এই কি তোমার দ্বাক বিচার? আমার
সে অনুকম্পে বাতালে কাঁপিয়া উঠিল এবং শিশুর
স্নাত স্নিগ্ধ মুখের ঐকি চাহিয়া ব'সতে লাগিল—
হাই হ'লু আশ্চর্য্য ক'রতে পারবনা। যেমন
ক'রেই হ'লু তোকে বাচাতে চাই! হাই ঘেঁষি, ঘনি
করে চাষাঘের আঙনের কাছে একটু ক'সতে
যেয়।

যখন নিরস্তর কোন শুভ কার্য্য আশুক ঘটী-
অনি হইতেছিল তখন রমণী সঘরে পৌছিল। রমণী
ভাবিল আজ সে একবার নিরস্তর হাইয়া পাত্তী
সংহেদের সহিত দেখা করিবে, তিনি যদি কথা করেন
তা হ'লে আর সে ছেলের নামকরণটা করাইয়া
সহবে। ছেলের পিতার নামে বহিঃ তার দাবী
নাই— তা নাই থাকুক—সে তার নিজের নামের
নামেই ছেলের নাম রাখিবে—সে নামটী
যেমন পছন্দ—এই শিশুও যে তেমনই শুভ ও
নির্দোষী! আমিও একদিন ইষ্টপূর্ণ নিৰ্গল হিলাস
ঈশ্বর তাহা জানেন! রমণী ঘরে ঘরে
নিরস্তর উপস্থিত হইল—কিন্তু একি!
নিরস্তর এক সমারোহে এত উৎসব কিসের? হুতক
বুঝতীর বল লুপের বেশ লুপার সজ্জা হইয়া পাকী
হইতে নামিতেছে, এত পাকীর ভিতরই যা কোন?
একখানি সজ্জিত গাড়ী হইতে একটী লুপারী তরুণী
অদন্তরূপ করিল, তাহার কন্ড লুপের লেপ্ নির্মিত এবং

তাহার কোণে নবু লুপের শুভ্র আঁধার তার পার্শ্বে
কে?

“হে ঈশ্বর এও আমার দেখতে হ'ল!” কৌশলী
মালতীমুখিত নুকে করিয়াই অচেতন হইয়া পড়িয়া
গেল। যার পায়ে উপর মেসীর বেদ দুইটি
পড়িল সেই লোকটীই বিয়ের বর আশ্বাস র'ম্পে!
আশ্বাস র'ম্পে তখন হস্তব হইয়া মেসীর লজ্জা-
হীন মুখের বিচে একটুই চাহিয়া রহিল—আর
তাহার মুখের উপর একটা সূত্রার জীবন তাব হুটিয়া
উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহা নববধূর হাতে রাখা হাত-
খানিক কাঁপিয়া উঠিল। নববধূ ভাবিল “আবার
হাতের অস্ত্র:স্তর! এত কোমল তাই তিনি একটুতেই
এত বাধা দেবেহেন!”

নিরস্তর হাইয়া শুভ পরিণয় কার্য্যের সময়ও
আশ্বাস পর পর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহা
মনে হইতেছিল—যেন তাহারের বিবাহের সময়
একটা অপরীতী আশ্বাস আকর্ষণ হইয়াছিল—
সেই অপরীতী আশ্বাস পাণ্ডু মুখ, বিকায়িত নয়ন,
ও শোশালী শেলের শুভ্র, তখনও সে দেখিতে
পাইল! “যখন তাহারা গিয়া হইতে গুহে কিরিল
তখন নববধূ হাতীকে বলিল “আশ্বাস, আমা-
র বিবাহের দিনে হইয়া নব্বু চিত্র দেখা গেল—প্রথমত:
অন্ত রৌদ্র হই নাই, দ্বিতীয়ত: সেই তথাকথিত চুখি
দোনা রমণী—তার জীবনের ধোব ধর চুখবধ ইতিহাস
আছে, তার মুখ ক্রমাগত আমার মনে পড়ছে, তার
চুখ আঙতে ইচ্ছে করে!” পরী যে মেসীর জীবনের
বিলম্ব অজ্ঞাত আছে ইহা লুপটি ভাবিতে পারিয়া
আশ্বাস র'ম্পে মনে মনে ঈশ্বরকে বক্তব্য দিল,
এবং আশ্বাসে দেহাৎপে কথার হাসিতে লুপাইয়া দে
মেসিনের চুখবধ খেলা খোঁকে মনে আনিত অপর
ছিল না। কিন্তু তার খোঁও লুপিবধ পাছে নহে,
আশ্বাস পর দিন সে বলিল, “বাহা! সেই কতি
ছেলেটির কথা মনে হ'লে ক্রোধান্ত কীম্ব গঠে।
আহা খেচারা কি চুখী! জুনি যখন বেড়িয়ে

কিন্তু সেই সময় যদি তাহের একটু দেরি এলো—
তুমি ত ডাক্তার অনায়াসেই ক'র চেলোয় ডিক-
শনার ক'রেতে পারো।" ডাক্তার রাম্বে এ কথা
উত্তর না দিয়া বাহ্যতে সে কথা জোর দেন হঠাৎ দূর
করিতে পারেন, এই ছোট্টর অস্ত্র প্রসঙ্গের আসে।
তোমার ধোঁগ মিলেন ?

এই বিবাহের এক বৎসর পরে—একদিন বেই
রাজে ডাক্তার রাম্বের ডাক আসিল। ডাক্তার
এখনে অস্ত্র রাতে বাইরে অনাবৃতি প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু তাহার কোমলদল, লতগ্রন্থ কাঠের
শরী তাহাকে বাইবার রক্ত শীতান্ধী করিল।
দৈব হুর্নিশাকে ঠিক সেই রাতে— তাহার স্ত্রী
নৈদীর প্রথম বেধনা উপস্থিত হইল।

ডাক্তার রাম্বেকে অংশেবে এমন সুন্দর আত্মা
পূর্ণ পক্ষ কক্ষ ছাড়িয়া এই মাঝ মাঝের রাতে বহু
মহা বাতাসের মধ্যে বাইতে রাজী হইতে হইল।
তিনি নৈদীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কিন্তু তোমার
যেহে এখন কি আমার বাওয়া উচিত ? যদি তোমার
যেহী অল্প হয় তখন এত রাতে একটা তুমি কি
ক'রবে ?" যথার্থভাবে নৈদীনিজের প্রথম বেধনার
কথা জিজ্ঞাস্য অবসার বলিল— "ঃ ! তাতে
কিছু হবে না ! তুমি দরিদ্রের উপকার ক'র
জানিলে আমার বেধনার মধ্যেও আনন্দ হবে।"
ডাক্তার রাম্বে লতাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন
"নৈদী ! তুমি স্বর্গের দেবী !"

ডাক্তার রাম্বে একটা অর্ধ স্তর স্ত্রীকে
পৌছিয়া ভালো নির্দিষ্ট দিয়া উঠিতে উঠিতে
উপর হইতে অনেকগুলি কঠোর একদল স্তনিত
পাইলেন। একটা রমণী বাতি দেখাইয়া তাহাকে
ঘরে গিয়া বাইতে বাইতে বলিল "ডাক্তার ! তুমি
এত ঘোড়তে এলে ! বেচারী শিশুর যে এখন
শেষ অবস্থা, আর তো উপায় নেই !" ডাক্তার
ঘরে বাইরা দেখিলেন একটা বিশিষ্ট রমণী মন্থে
বলিয়া আছে, তাহার ক্রোড়ে একটা শিশু বোঝ

হইল স্তন ! তাহাকে দেখিয়া রমণী চীৎকার
করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—তিনি শিশুর পায়ে হাত
দিয়া দেখিলেন, তাহার পুর্কই তাহার স্তন
হইয়াছে ! তিনি তখন বলিলেন "মাঝে একটু
আগে যবর মিলেই হ'ত—এখন তো আর উপায়
নেই—বড়ই গুণের বিষ !" এই কথাই সেই
কোন রমণীর কণ্ঠ হইতে আবার একটা আশ্চর্য
বাহির হইয়া আসিল, সে গুণে ও রাগে কাঁপিতে
কাঁপিতে বৃদ্ধদেব বলিয়া উঠিল "তুমি এগের—কে
তোমার যবর মিলে ? যা হ'ক ঠিক হ'য়েছে, ইংরেজ
তোমার পাঠের বিষয়েছেন নিজেদের ঘেলের স্তন
দেখতে ! ঐ সে—তোমারই ফলে অনায়াসে
উপবাসে হ'য়েছে—উপবাসে ! যেন সারাদিন
এই কথা তোমার কাছে বাজে—তুমি যখন সুস্থ
উপাসের খাণ্ডি যাবে, আর কোমল পথার পথ
ক'রবে তখন এই কথা ভেবে। তোমার নরক
যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে—কারণ যতক্ষণ ইং
আছেন ততক্ষণ পাপের শাস্তি লাগেই !" বলিয়া
শোকোত্তর জননী স্তন বেলক লম্বাঘন করিয়া
বলিতে লাগিল "তুই ভোর অবিশ্বাসী শিশুকে
একটাবারও দেখতে গেলিনে ! শিশুর বেহ
জানতে পারিনি ! কিন্তু মাতের দেহ যে তোকে
তা বুঝে দেখনি, কেনন ক'রে সেই মাঝে হেঁচে
তুই চলে গেলি—আবার যে আর তুই ছাড়া কেউ
নেই—আমি যে আমার মন পেলি।" আশ্চর্য
রাম্বে প্রস্তরস্থির মত দাঁড়াইয়াছিলেন, রমণীর
বাক্য স্রোত তাহার বাক্যে পরিণত করিয়া দিয়াছিল,
যখন তিনি কতকটা প্রকৃতি হইলেন তখন
কতকগুলি টাকা ও মোট রমণীর কাছে রাখিয়া
বলিলেন "শিশুর অসুস্থতা কিহা সম্পন্ন কর।" তাহার
পর আর লক্ষের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এই
রমণী শাপল হ'য়েছে—শাপল—শাপল—ওর কথা
তোমরা শুনে না" বলিতে বলিতে তিনি কাপুরুষের

ভরি ছুটি চাচিমা পোশাক। তখন তাঁরই অস্ত্রে
নিঃকর শাপকারী অগ্নি কথিয়া তুলিল স্তম্ভ উত্তীর্ণ—
তাঁরকে যে সোকে কত গানি দিতেছে ও পাড়ীর
কাছে কত লোক জমায়েছে তাহা তাঁরই কানে
ও চোখে পড়িয়াও পড়িল না। তাঁরই চোখের
জুয়ে তখন কেবলই সেই স্তম্ভ পিত্তর সুবচনি
জানিয়া উত্তীর্ণেছিল। আবার নবন হইল যদি
নেলী জানিতে পারে, না নেলী জানিতে পারিবে না
—এ হৃৎকটা কিসের রক্ত? বাতী পৌছিয়াবার
একজন স্ত্রী আসিয়া বলিল “শ্রুতী বড়ই
অসুস্থ! আদি এই দাত্র আপনাকে ডাকিতে
বাইতেছিলুম।” ডাক্তার রাস্তার দ্বার কাছে বাইরা
যেখিলেন তাহার অবস্থা বড়ই খারাপ, আঁও
কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসক আগিলেন কিন্তু
কোন কল হইল না—সত্যাত পিত্তর বিকে চাঁহিয়া
নেলী বলিল “প্রবৃত্ত।” এই পিত্ত আনালের বড়
আবরণের ও বড় আনালের তিনিব! এই তোমার
সত্যনা মেবে।” স্ত্রীর পূর্ণ উপর বিকে একবার
হাত চাঁহিয়া একটা কি দেখিয়া নেলী ভয়ানক ভয়
পাইল এবং সেই ভয়ের চিত্র মুখে খাঁকিতে খাঁকিতেই
নেলীর স্ত্রী হইল।

যখন তাহাকে সমাধি করা হইল তখন সন্ধ্যা-
সেই দেখি তাহার আত্মা নৌকাকে নই করিয়া
সুখে উপর সেই আশ্রয় চিত্র ছুটিয়া তথিহাছে।
কিছুদিন পরে একদিন ডাক্তার রাস্তার দ্বার
যনে হইল যে পিত্ত আনালের বরিহাছে সেই কি
নেলীকে স্ত্রীর সম্বন্ধে দেখা দিয়াছিল—সে কি তাহার
জীবনের সম্বন্ধে গোপন কথা নেলীকে বলিয়াছিল?
তাই কি নেলীর মুখে অমন কঃর চিত্র দেখ অবধি
সুস্থিতে পারা যেন না? ডাক্তার রাস্তার সর্বদা
কাটা বিরা উঠিল! তাহা—নেলী এতদিনে
তাঁর গোপনীর কথা সবই জানিতে পারিয়াছে—
তার তো গোপন করিবার উপায় নাই—যেখানে সে
দিয়াছে সেখানে পাশে গোপন করা যায় না! এখন
নেলীর সর্বদা চিত্র তাহার গোপন পানের রক্ত
ভা করিয়া বহুই বুঝতে চগিয়া দিয়াছে। আর
সেই রক্ত উন্মোচনে আবরণ পুত্র নর পাশটা তাঁরই
কক্ষের সপ্তদে, স্বপ্নের অস্ত্রস্থলে মিনরাত বিভাবিকা
আঁকিয়া তাক-নৃত্য করিতে করিতে বিকট অট-
হাতে তাঁরকে কেপাইয়া তুলিবার যোগাড় না
করিয়া চেতাই দিবে না স্ত্রী।

• ইংরেজি হইতে অনূদিত।

পথের পথিক

[জীবিত প্রথম পর্ব বি. এ]

জানি না এ পূর জীবন পথের কোথা আরম্ভ হোবার শেষ,
চলি অবিদ্যায় এপন বহিরা এ চলার নাই বিদ্যায় লেগ।
চাতিবিকে মাঠ করে দু'খু দু'খু—তারি পারে বেরি স্রাবল রেব,
সেবা হতে কোন্ তরুণ রবির দিগন্ত কিংম দিতেছে রেবা।
সুখ সুখ যদি কি বিপুল টানে সে আলোর খোঁজে চলেছি ছুট,
পথের স্রাবি স্রাবল বলি—পত স্রাব-বাব হোবার টুট।
এ পথে চলিতে কত অচেনার খট্টে মনুত স্রাবি স্রাবি,
কত অচেনার হল জানাজানি স্বপ্নে স্বপ্নে কি-বিনিবহ।

স্বকুটী হানিয়া কেহ গেল চলি, কারো মাথের হল কণিক বেথা,
কেহ গেল চলি বুদ্ধগ হানিয়া গড়াপেতে আঁকি স্মৃতির রেখা ।
বন্ধু বলিয়া পথের পথিকে কেহ নিল টানি আশ্রয় করে,
স্বশীতল ঘনু পয়শ হানিয়া সকল বেথনা নিমেষে ধরে ।
কত বিরহীর ঘাবিত নিশান্ আন্দোলিত হিয়া পড়িল পুটে,
কত আঁধার হল কত টলমল আঁধার এ ঘোর মরম পুটে ।
লয়ে সব স্মৃতি চলিয়াছি নিশি কে জানে কারো অশেষ টানে,
জানি না এ চলা হবে হবে শেষ—বাঁড়া যে কোথা কেই বা জানে !

শীলভদ্র

[ঐতিহাসিকতার রায় চৌধুরী সি, এ]

প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়ান্ চংক্ চির যমিনামস্তিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মহাপুরুষের চরিত্র-বলে বলিয়া সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র, বেদ ও ব্যাকরণ একত্রে বিধবে শিখা লাভ করিয়াছিলেন, যিনি বাঙ্গালীর দৌরব-স্থান ছিলেন এবং সম-সাময়িক ভারতের পণ্ডিত সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ, সুখী ও বরোণ্য বলিয়া সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়া ছিলেন । তাঁহার নাম আল বিস্তুতির তথ্যের সর্কে লুপ্ত কাণ হইয়া পিয়াছে ।

বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে হুয়ান্ চংক্ বগবতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশী ছিলেন । সে সময়ে নালন্দায় ভারতের সার্বকোষ বিজ্ঞানীরা পঠি-পঠিত হইত । এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সমগ্রবিশ্বের পথে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এই বাংলা দেশেরই একজন ব্রাহ্মণ । তাঁহার নাম ছিল শীলভদ্র । ইনি সমস্তটের জৈনিক অন্তঃস্থের পুত্র । আবালা তাঁহার বিজ্ঞানিকতার প্রতি প্রচণ্ড অস্বাভাব ছিল । এই অস্বাভাব বশে তিনি সমগ্র ভারতে পণ্ডাটন করেন এবং ত্রিংশৎ বৎসরকাল নালন্দা বিদ্যায় ঔপ-নীত হন । এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম স্বর্ণশাল নালন্দার

সমগ্র বিশ্বের পথে বি-যুক্ত ছিলেন । শীলভদ্র তাঁহার নিবাস প্রবেশ করিয়া অভ্যাস কাল মধ্যে শুক্ল সঙ্ঘিৎ বিদ্যার অধিকারী হইলেন ।

তৎকালে জৈনিক বিদ্যোভর্য পণ্ডিত মগধরাজের নিকট ধর্মশাস্ত্রের সঙ্ঘিৎ তর্কবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রস্তাব করেন । সঙ্ঘের মহিমা অস্বাভাব্য রূপে উদ্ভোজিত মহামতি ধর্মশাল রাজার আশ্রানে সম্বৃত হইলেন । বাজা কবিবার পূর্বে শীলভদ্র এই বিশৃঙ্গ দায়িত্ব বহন করেন করিবার সঙ্ঘ শুক্ল নিকট সাতুনের আবেশ প্রার্থনা করিলেন ।

শুক্ল অস্বাভাব্য মহিমা শীলভদ্র বহন তর্কবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার মানসে সত্তা মতপে উপস্থিত হইলেন, পণ্ডিত তখন মহাশয় বদনে নিম্নোক্ত করিলেন “এই বালক আমার সঙ্ঘিৎ তর্কবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে?” কেবল এ বর্ণ তাঁহার সঙ্গদ্বারা হইল । তর্কের প্রান্তরেই তিনি বৃত্তিলেন এ যুক্তি সামান্য নহে । শীলভদ্রের অস্বাভাব্য বৃত্তি বশত ও কুট প্রেরণ সম্যক উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া তিনি ব্যক্তি বৃত্তি বিরক্ত হইলেন এবং মত্তপ পরিভাগ্য করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

শীলভদ্রের অন্তিম পাণ্ডিত্য ও সুনির্গুণ তর্ক

কৃষ্ণভট্টের পশ্চিম পাইয়া যখন রাজ্য তাঁহাকে পূর্ব-
ভাগে বসল একটি নগর প্রদান করিলেন। সর্গভাষী
শীলভট্ট বলিলেন “আমি প্রভুত্বা প্রাণে করিবাছি,
অর্থ আবার নিশ্চয়োত্তম।” রাজা উত্তর করিলেন,
“কৃষ্ণ মহিষা ২০দিন হইল তিথোচিত হইয়াছে।
যদি আমরাজ্যে গরু পূজা না করি, তাহা হইলে
সকল বধা হইবে না। অতএব অশুভ্রম করিয়া
আমার এই পান প্রাণে করণ।”

সমস্ত বিরাগী শীলভট্ট নগরটি রাজ্য প্রদান করিয়া
প্রাণে করিয়া তাহার রাজ্য হইতে একটি অশুভ্রম
সম্ভাষণ নিশ্চয় করিলেন।

কি বর্ষ, কি বিভা, কি জ্ঞান, সর্গ প্রত্যয়েই
শীল ভট্ট বোধ কোবিদ হস্তীকে পত্রা করিয়া-
ছিলেন। তিনি যখনযখন পুস্তক প্রদান করিয়া
দিয়াছেন। এই সকল পুস্তক সহস্র, সহস্র ভাষায়
নিবন্ধিত ও অদৌষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ।

যখন চাঙ শীলভট্টকে বিশেষরূপে সজ্জা করি-
লেন এবং তাহার কণাভূষণী ছিলেন।

কনোজ স্তম্ভের মহাভারত বর্ণবর্ধন ও অস্ত্রাভ
রাজভারত শীলভট্টকে বিশেষ সজ্জা প্রদান
করিতেন।

যখনচাঙ, শীলভট্টের ঘেংলাঙে নিজে লিখ-
লেন অশুভ্রমীত জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারি
প্রাণে যে বর্ষ ও বিদ্যা লাভে সমর্থ হইয়াছেন
ইহা সর্গভাষী কীকার করিতেন। তিনি তাঁহাকে
যে-তার মায় তজ্জি করিতেন।

কাম্বীরের প্রদান পণ্ডিতহস্তী যে সকল
চট্টল বিদ্যেতে সমর্থানে অসমর্থ হইয়াছিলেন, শীল
ভট্ট সে সকল বিনী আদ্যালেই বীমাংসা করিয়া-
ছিলেন। মহারাজা বোধ হইলে তিনি বাবতীর
বোধপ্রম অধ্যয়ন ও আভ্যন্ত করিয়াছিলেন। স্রাঙ্গ-
পনের বর্ণপ্রম পাঠেই কিছু তাহার বৈশিষ্ট্য হ্রাসিত
হয়। বহু পানিনি অধ্যয়ন করিয়া প্রায়শ্চা;

যখন চাঙকে তৎকালে প্রাপ্ত সপ্তম চীকার সমিত
উহা অসীত করাইয়া ছিলেন। পানিনি বাতীর
যখন চাঙকে তিনি বৈদ্য শিক্ষা দান করেন।

ঔষধী তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইল।
যখনচাঙের বিশেষ পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার বিদ্যুৎ হইয়া
বোধ কোবিদগণ যখন তাঁহাকে এখানে চিহ্ন প্রদান
হইতে আশ্রয় প্রদান করেন, শীলভট্ট যখন বলিয়া-
ছিলেন, “বিশাল চীন সাম্রাজ্যে যখন চাঙের বোধ
বর্ষ প্রচার করা উচিত। যখনচাঙ চীন দেশে
গমন করিলে তাহার বোধ বর্ষের উন্নতি সাধিত
হইবে, কিন্তু এখানে অধ্যয়ন করিলে কোনট লাভ
হইবে না। অতএব আপনারা উহার গমনের
সজ্জা হইবেন না।”

আবার যখন কুমার রাজ্য তাহার বর্ষা যখন-
চাঙকে কাঞ্চনপে পদার্থপের লভ্য পুংপুং অশ্রয়
করেন তখন যখনচাঙ অসমর্থ হওয়াতে শীলভট্ট
বলিয়াছিলেন, “কাম্বীরে অস্ত্রাবি বোধবর্ষ মহিষা
প্রচারিত হয় নাই। উহার সবিশেষ প্রচলন ও
প্রতিষ্ঠার নিবন্ধ যখনচাঙের কাম্বীর গমন
আবশ্যক। শীলভট্ট যে কাম্বীর হৃদয় ও অশ্র-
মিত ছিলেন তাহাও এই বিষয় হইতে প্রমাণিত
হয়।

অশ্রম শাস্ত্রজ পণ্ডিতপ্রণয় শীলভট্টের সমিত
নালন্দা বিদ্য বিদ্যালয়ের নাম বিশেষরূপে সার্থক।
নালন্দার কথা বলিতে গেলেই শীলভট্টের কথা
মনে আসে। আজ নালন্দার মনোহর সৌভাগ্য
বিদ্যালয় পুণে পরিণত হইয়াছে সত্য কিন্তু অতীতের
অশ্রম যে পরিমিত পাণ্ডিত্যের দাক্ষ্য প্রদান
করিতেছে তাহা জগতের ইতিহাসে অতদূর
ঐতিহ্য প্রদান পত্রাভ্যাসে নালন্দার যে বৈশিষ্ট্য ও
বৈভব হ্রাসিত হইয়াছে তাহা শীলভট্টের অশ্র-
মতার মনোহর ছোট ও অশ্রয় ছিল।

ভাগের পূজা

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন যোব বি. এ.]

(পূর্বে পূজারীপন :- শ্রীমতী শৈলমালা যোবমারা (২) শ্রীমত বিজয়রত্ন বসুবমার; (৩) শ্রীমতী সরসীমালা বসু (৪) শ্রীমত বিপলতি চৌধুরী এম.এ., (৫) শ্রীমতী চক্ৰবর্তী বসু, (৬) শ্রীমত বসুভদ্রবাসী সেন, (৭) শ্রীমতী লীলা দেবী, (৮) শ্রীমত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (৯) শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী (১০) শ্রীমত শৈলমালা বুখোপাধ্যায় (১১) শ্রীমতী বিদ্যমালা দেবী, (১২) মায় শ্রীমত মল্লবাসী সেন বামাদেব, (১৩) শ্রীমতী শ্রেণীমালা চৌধুরাণী।

অমলের কণা

* আলোর স্বলঙ্ঘন পৃথিবীর বুকে লুটাইয়া পড়ে তখন চতুর্দিকে একটা আগরণের কোণারল সৃষ্টি করে। তেমনি যেনে কোন এক ভক্ত স্তুত্বেরে এমনি একটা আলোর স্বলঙ্ঘন আসিয়া যেনময় চেষ্টার উজ্জ্বল আগাইয়া তোলে।

এমনি একটা স্রোত আসিয়া যখন প্রবল-দুঃসারে আঘাত করিল, অমনি আবার কল্ল অর্পণ যুক্ত হইয়া সেল। সে আত্মল প্রবাহে নিরন্তর নিঃশেষ করিয়া িলাইয়া বিলাস। যনে হইল, যে স্তম্ভকণের প্রতীক্য করিতেছিল তাহাকে একদিনে লাভ করিগাছি। আমি প্রাণ টাংলা তাহাকে বরণ করিয়া লইলাম।

প্রথমে খুবই উৎসাহের সহিত কণ-স্রোতে বহিয়া ঘাইতে লাগিলাম। একটা প্রেরণা আসিয়া আমার প্রবল-স্তম্ভের সবগুলি তারকে অব্যক্ত মধুর সুরে সঙ্গায় করিয়া তুলিল। কিন্তু কলিকাতার বক্তৃতার উজ্জ্বল আলি সুর হারাঁইয়া ফেলিলাম। আমার যোগেন বীণার সবগুলি তার একসঙ্গে ‘বর্ষ-কণ’ করিয়া সংসা নীরব হইয়া পড়িল। তাংরা আমাকে স্তম্ভই আনাইয়া দিল—যেখানে স্রোত-কেই নেতা সাহিব্যার স্মৃষ্টি আছে কিন্তু নীতিজ্ঞান নাই। ব্যক্তিব্যের শৌর্য গড়িবার প্রচেষ্টা আছে কিন্তু মায়াবের প্রতি মায়াবের স্বাভাবিক শ্রীতি দেখাইবার আগ্রহ নাই; বিরাট বর্ষ-বস্ত্র তুলিয়া সকলকে চমকিত করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ

সমস্তাৎ লকলকে বুকে টানিয়া লইবার মত ভাবনা নাই—সেখানে আমার মিলনের সুর ঢাকিতে পারিবে না। আমি আশাহত হইয়া বসিয়া পড়িলাম।

সেই রুদিনে যখন বিজ্ঞানচিত্তে বুদ্ধিগা বেড়াইতে ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন কল্লের সঙ্গে পথে দেখা হইয়া গেল। কল্ল আমার সমগামী। তারার সঠিত আমার আচার-ব্যবহারের, রীতি-নীতির অনেক প্রভেদ, তবু তাকে আমি চিরদিনই কেন জানি না বড়ই ভালবাসি। পৃথিবীকে এমন অনেক শোক আছে যাহাদের সঙ্গে জীবনে কোন কাজেই মিল হয় না অথচ আভ্যন্তর প্রাণে প্রাণে বেশ নিল ব্যক্তিগা যায়। কেন এমন হয় জানি না। কবিগা বসিয়া থাকেন—এটা নাকি নড়ীরা টান। তা ঘাই হউক—কল্লের সঙ্গে আমার তাবটী মিল এমনি একটা রৌর্যে যেরে লুকেচুঁরির মত আব-ছায়া বকবের। প্রাণের কাছে অনেক প্রহ করিগা এরা কোন কৈকল্যে খুঁজিয়া পাই নাই।

কল্লের সঙ্গে অনেক দিন পরে আমার দৃঠন করিয়া মিলিতে আরম্ভ করিগাছি। দেখিলাম এ সময়ের মধ্যে উহার অনেক পরিবর্তন হইগাছে। উজ্জ্বল লালসার প্রবাহে সে অবাধে নিরন্তর ঢালিয়া দিগাছে, তবু প্রাণটা একেবারে অতল গল্লেরে হারা-ইয়া যাবে নাই। এই পল্ল-স্রোতের তিত্তর হইতে জ্বাধের উজ্জ্বল বসন্তী বিকাশলাভ করিগার-কল্প সংগ্রাম করিতেছে। কল্লের প্রবল-কল্ল একদিন

অপূর্ণ জীতে বিকশিত হইবেই—কোন প্রতিজ্ঞা
শ্রোতাই তাহাকে যথ্য করিয়া রাখিতে পারিবে
না। আমি ঠিক করিলাম যদি কালের প্রতি আমার
প্রত্যুতই দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে উহাকে অবগতন
হইতে বাটাইয়া তুলিতে হইবে। প্রলোভনের বাহুর
এই কলিকাতার লেনিহান্ গ্রাস, আর তরুণ মস্তিষ্ক
চরুককারী, সুন্দরী বিন্যাস 'বু' কাঁটির কংস হইতে
কমলকে রক্ষা করিতে চাইবেই। আমি কমলের
সহিত নিবিড়ভাবে মিশিতে লাগিলাম। নিজের
মনটাও ভখন কলিকাতা হইতে পলাইবার পথ
খুঁজিতেছিল। আমি কমলকে লইয়া তাহাশের
পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলাম। দিন কয়েক পরে
বুড়ো আশিয়া দেখা দিল। 'কি আপল! যে হাওয়ার
তবে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম সে হাড়ি আবার
আশিয়া জুটিয়াছে। মণ্ডাভাবনা পড়িলাম।

খুড়োটি যে সে শত্রু নন। তিনি শুধু কমলের
মাথাটি গুপ্ত করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, আমার এই
নীচ মাথাটির উপরও তার বেশ গোলুণ দৃষ্টি
আছে। সেদিনের কথাতেই এর পরিচয় পাওয়া
গিয়াছে। আমাকে বলিতেছিল—“বাথানী, পাড়া
গাঁ বলে একে বেড়া করো না। এখানে এমন
অনেক মাল আছে যা দেখলে মাথা ঘুলিয়ে যাবে—
পাটবার ভিগ্‌বাঙে বেয়ে পড়বে। মাল ত না
যেন আমার খোজা—কেল গাই-বাই ভাব।
ভাগিন্স এরা কলকাতার বার নি। এরা এখানে আছে
বলেই ত তোমাদের মত এমন দৌলীদ্বারাও একটু
আবরত বেধাতে পারি।” তার পর বার কয়েক
বুড়ো চাপড়াইয়া দৌলীর সহিত বলিল—“বুড়ো বলে
তবে না যে একেবারেই পছন্দ বেধে
নেই। কমল আমার পাকা গুহী—সে জিনিষ
জেনে। খুড়োর নামেই বাথানী অজান। এই
বলিয়া বুড়ো আনন্দে হাসিয়া কেবল এবং
সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার খোঃ-খোঃ করিয়া
কানপতেও বাধা করিল না। খুড়োর কথা

তিনিও ক্রোধে আমার সমস্ত ধর্ম উল্টাই
উঠিল। কিছুতেই বন্দাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি-
লাম না। জোর দলদ বলিলাম—“নাথানি বুড়ো!
কেন যদি তোমার মূর্খ এ সব কথা শুনি, কিছু
টেনে ছিড়ে ফেলবে। কোন কমলই বাটারে পারবে
না।” আমার গোঁয়ার-খোঁচের চেহারা দেখিয়া
সেই যে খুড়ো পলাইল আর লগ্নার আর তাহার
খোঁচটি নাই। ভগবান্ কখন ও পাপমুখ যেন আনা-
ধের আব বোধিতে না হয়।

কোনদিন লাকাত্ত ভাবে পল্লীর সাথে পরিচয়
হিল না। পল্লীর কত যত্ন। চিত্র কল্পনা করিয়া
এখানে আনিয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম বুড়ো হইতেই
জিনিষটাকে ভাগ বেধার। কমলার ছবির সহিত
বাত্ত চিত্র অনেক সময়ই বড় ঠেংবা দাঁত।
কত আশা করিয়া পল্লীর ফ্রেডে কাঁপাইয়া পড়ি-
ছিলাম। কিছু বতই দিন বাইতেছে ততই নিঃশব্দ
হইয়া পড়িতেছি। ঘর ত পূর্ণে এ পল্লী যত্ন
উৎস ছিল কিন্তু আর সে মূর্তি স্বপ্ন। তাহার
অস্তর সখিয়া গুল্লিলত সজীত আসে না—বাধা
আসে তাহা বেবনার বাঁহাটার আর নৈরাম্যের
ক্রন্দন। ভাবিয়াছিলাম এ স্বপ্নে আমার মাথু-
ধীরে প্রাণের পড়িবার চেষ্টা করিব। কিন্তু সে
আকাংক্ষা-সুখ আমার নির্মূল হইয়া গিয়াছে।
এখানে আর ঘাই লাভুক লাভুক নাই। বাহাটা
আরে বাহাটা আরোই মাত্রের প্রোত-মুষ্টি। এ
স্বপ্নের অবিপর্জি-নিজীব নিষ্কণ সবারঙ্গলা একটা
পাখান মুষ্টি। তাহার গলায় ছ'পারি মুতা, কপলে
প্রোত উঁক, (লোকে বলে চটা নাকি কৌল)য়ের
ময় চীকা), বাহার আঁঠা দিবা লাপানো একটা
টিকি। প্রোত মুষ্টিগুলি নির্জীবনে যুগ যুগ ধরিয়া
ইহার পুণ্ডা করিয়া আসিতেছে। এ পুণ্ডার তাহা
ধের জ্ঞাপ্তি নাই—ইহা ছাড়া যে আরও অনেক
করণীয় তাল আছে তাহা তাহাও খোঁকার করিতে
• চায় না। সবারের মধ্যেই পুণ্ডা অসামান্য কান

করিতে এদের নিষ্পত্তি কঠিন নাই। পর নিম্নাং ইহাদের পরম আনন্দ। বৈদিক এক হাজার বার মাল টপকাইবার লগ্নে লগ্নে নিবন্ধ হই হাজার বার। পর নিম্না না করিলে সে দিনটাই বার্ষিক বার।

এখানে আদিয়াই একটা লোকের লগ্নে বড়ই জাব হইয়াছে। সে প্রসাদ। কদমলর ঘুবে প্রসাদেব দার অনেক কথা শুনিয়াছি এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে বার বার প্রশংসা করিয়াছি। প্রসাদের সমস্ত দেহ জ্যোতিষের চোখ দুটি বেঁধিয়াই মনে করিয়াছিলেন এ একটা বাহুবল মত বাহুবল। নিবিড় ভাবে পরিচিত হওয়ার পরে বেঁধিলাম এর বেঁধটা যেমন লম্বল—মনটা তেমন লম্বল নহে। এক কোণের একটা লম্বল হইয়া গিয়াছে। মালতী তাহাকে ঘূর্ণিবেগে ঘুরাইতেছে। প্রসাদ মালতীকে লাভ করিতে চাহে। মালতীর রূপের মোহান্তি হই প্রসাদের চোখ দুটি লম্বল হইয়া গিয়াছে। প্রসাদের ঘুবে অনেকবার মালতীর রূপের কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার স্তম্ভের পরিচয় তেমন কিছু পাই নাই। এই রূপই প্রসাদকে লাভ করিয়াছে—প্রসাদ মরিয়াছে। মাহুগ, কত বড় ভগ্ন,—সে নিবন্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে দিবার্থকে সত্য বলিয়া চানাইতে—আত্মাকে প্রবন্ধনা করিতে একটুহুগ কুঠাখোঁচ করে না। প্রসাদ প্রেমিক লাগিতে চাহে কিন্তু এ যে প্রেম নহে, রূপের তৃষ্ণা; ও কথা সে কিছুতেই স্বীকার করিবে না। প্রেমিক হইতে হইলে যে আত্মবানের লজ্জা—যে লগ্নের মরকার তাহা এই লগ্নের কবচনের আছে? এখানে প্রেমের অর্থ—লগ্নসার উদ্ধার প্রবাহ—দৌরনের নিবন্ধ অভিমান।

মালতীর কথা

প্রসাদবাহুকে আগতে ‘তার’ কথা হইয়াছে। উৎকর্ষায় বাহবার ভাবি এই বৃত্তি তিনি আশ্রয়েন। আত্মকে বেঁধিয়া কি ভাবিবেন—কি ভিজাল

করিবেন, এই সব নানা চিন্তা-আশ্রয় মনটাকে জ্বলি করিতে লাগিল। বাস্তব আশ্রয় প্রবাহে প্রসাদবাহুকে না বেঁধিয়া বড়ই মনিয়া গিয়াছিলেন। তাহাকে বেঁধিবার ভক্ত আশ্রি হইল। আহুগ, আত্মকে বেঁধিবার ভক্ত কি তিনিও তেমনই আহুগ? আশ্রয় জ্বলি পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন। বহু ভগ্ন বৃত্তি-হেমন তাহাই করিয়াছেন। তবু কেন আশ্রি না অভিমান আশ্রয় বৃত্তি। জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কেনই বা জ্বলি দাঁড়া, আর কেনই বা এই শান্তি? আশ্রয় উপর বৃত্তি একটা বিতৃষ্ণা আশ্রিয়াছে। হেবল বা তাই। তিনি ত জানেন না আশ্রি কি চক্রে তাঁকে বেঁধিয়াছি। ভগ্নবান্ বলিয়া বহি কেষ্ট থাকেন তবে তিনিই আশ্রয় কাছের জ্যোতিষ ভগ্নবান্। একটা লগ্নের আত্মজ্ঞা নাহে নাহে মনের কোণে উৎকর্ষিত হইতেছে। না না তা কিছুতেই হইতে দিব না। আশ্রি তাঁকে ল্পর্শ করিব না। আশ্রয় বেঁধবার লগ্নে কলহের ছায়া দিয়া তাঁকে কখনই জ্বলি হইতে দিব না। আশ্রয় বেঁধবার লগ্নের্থা নষ্ট করিব না। আশ্রয় নারী জ্বলি হইতে হইতে মন করিব—আশ্রি হইতে হইবে। সাত-পাঁচ বড় ভাটিতেছি এমন সময় বাহিরের মজার বা পাড়ল—লগ্নে লগ্নে ভক্ত আশ্রি—‘না, আশ্রি এসেছি। মজার খোঁচ।’ এ’ও প্রশংসা বাহুই কর্তব্য। অভ্যাস পুঙ্কে আশ্রয় জ্বলি ভরিয়া গেল। শিশুর আশ্রিয়া হইল। খুঁচা বিলেন। জানাসার ফাঁক দিয়া বেঁধিলাম প্রসাদ বাহুই বটে।

মুগ্ধ বেদার লগ্নের বাহু বাহু। দেখ হইলে আশ্রি আশ্রয় বহু বলিয়া পান লাভিতেছিলেন। এমন সময় বীরে বীরে প্রসাদবাহু বহু টুকিলেন। আশ্রি ভাগ করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিলাম না। একটা ভক্তি প্রবাহ আশ্রয় সমস্ত বেঁধেনে কি ভীষণ কল্প জ্বলিয়া দিল। মনে হইতেছিল তিনি বহি এখন চলিয়া যান তাহা

হইলেই ঠাঠি। কেহ যদি ঘেঁষা কেনে, কি উপায় হইবে ?

তিনি ভাবিলেন—“মানসি!” আবার কণ্ঠ-
গোষ হইয়া আসিতেছিল—মাড়ি বিতে পারিলাম
না। তিনি আবার বলিলেন—“মানসি, তোমাকে
একটা কথা জিজ্ঞাস্য করব।” আমি বড় কঠোর
সম্বোধন করি। উত্তর দিলাম—“বলুন।”
তিনি কাম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—“তুমি কেন এ বাড়ী
ছেড়ে চলে গিয়েছিলে সব বুঝি। আমি অনেক
জোরে ঘেঁষছি তোমাকে না গেলে আমার সমস্ত
জীবন ব্যর্থ হবে। বল দাও তুমি আমার
হবে,” আমি বিব্রিত হই উঠিলাম। কিছুক্ষণ
মনের সঙ্গে তুলস লগ্নায় চলি। আত্মসংযম
তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলাম তৎক্ষণাৎ আমার
বস্ত্র বহন করিবার শক্তি হার, আমার চেহারা
দুর্দশতার দ্বারা হইতে রক্ষা কর। আমি ঘরী
হইলাম। এক নিম্নোক্ত বলিয়া কহিলাম—“না না,
তা হবে না—কখনো হবে না।” এই বলিয়া
সেখান হইতে ছুটিয়া পাশের ঘরে আসিলাম। ঘর
হইল, এক মুহূর্তে আমার চক্ষুঃ স্পন্দিত হইতে সমস্ত
আলোক যেন নিভিয়া গিয়াছে—সেই অন্ধকারের
ভিতরে পৃথিবীটা আমাকে লইয়া পৌঁ-পৌঁ করিয়া
ঘুরিতেছে। আমি হিরণ্যাক্ষিত পারিলাম না।
শান্তিতে পুটাইয়া পড়িলাম।

প্রসারের দ্বারা কথা

প্রথম আসিয়াছে। মালতীকে পুত্রিয়া
পাত্যাস্তে সে খুঁই ছনী হইয়াছে। কদম বলিতে-
ছিল—“প্রথম দ্বারা সঙ্গে মালতীর বিয়ে হ'লে
কেনন হই।” আমি কখনো কখনো মনে

বলিলাম—“হিঃ কদম, এল বলতে নেই।”
কদমের মনে হঠাৎ কেন এ কথাটা আসিল?
প্রথম কি কদমকে কিছু বলিয়াছে? কদমকে
জিজ্ঞাস্য করিতে পারেন হইল না। তব, কি
অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া বসি। মুনাম কি
জানেন না যে আমার কত পৌরুষের ঘন। আমি
চাই প্রথম একটা মাহুকের দ্য মাহুকের হইয়া
তারার মাহুকের মাহুকের কদম।

সন্তানকে ঘেঁষি দ্বিতীয় কি জননী-দ্বারা
নিশ্চিত থাকিবে? না তাহা নয়। দ্বিতীয়
হইলে তাহাকে কঠোর হইয়া সন্তানকে দুর্দশতার
দ্বারা হইতেও রক্ষা করিতে হইবে।

প্রথমকে সকল কথা পুত্রিয়াই জিজ্ঞাস্য করিব।
না-না চিত্রা করিয়া একদিন প্রথমকে একা
ভাবিয়া জিজ্ঞাস্য করিলাম—“প্রথম, এল কি
তুমি?” প্রথম আমার পা দুটো জড়াইয়া ধরিয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“না, আমার দুঃখ,—
আমার অপরাধ,—আমার দুর্দশতাকে এভাবে
কহি কথা কর।” পুত্রের দরদ্র কোণের দ্বারা
তাহা দ্বারা ধরিয়া কহিল। আমি হিরণ্যাক্ষিত
পারিলাম না। কোন কথা বলিবার দ্য শক্তি
তখন ছিল না। দ্বারা সমস্ত দ্বারা করিয়া
অন্ধ্র প্রবন ধরিয়া গেল। প্রথমকে বুক টানিয়া
লইয়া মাতা-পুত্র কতকাল কাঁদিয়াছি আমি না,
হঠাৎ চাহিয়া দেখি আনাগার মেলি ধরিয়া মালতী
কাঁদিতেছে। ছুটিয়া গিয়া মালতীকে জড়াইয়া
ধরিলাম। সে আমার বুক দুজনে হইয়া পুটাইয়া
পড়িল। *

(ক্রমশঃ)

• আপনোমানে জীবন্তী প্রভাবী সেরা সহস্র
পুত্র তাম প্রব করিয়াছেন।

গান

[ভিত্তি—গোষ্ঠা]

(রাই সাহেব ঐক্যসঙ্গীত রচিত)

মান অশ্রুমান হুটো সমান,

কবে আবার হবে শিব !

জীবন মরণ, তোমার চরণ,

সঙ্গে হবে মৃত-জীব ।

হেমাংসের সব মূর্তি হবে, অস্তর বোধ আর না করিবে

হৃৎ-সঙ্গ-সমান হবে, শত্রু-বিত্তে সমান ঐক্য ।

সদানন্দে মনের হৃৎ, যোদ্ধা ভোগানার ব'ল্য মূর্তি,

শাপশূণ্য সব বাবে চুকে লক্ষ্য-দেবে ঐক্য ।

টল-না না আর কাদের বাণে, মৃত হা রাখে-অশ্রু-সে-

নাচবে হৃৎ-হরিনামে, এই কর যে সবাপি-ক্য ।

প্রজাপতির দোতা

(বড় গল্প)

[ঐক্যসঙ্গীতের পেন]

(৫)

বাঁধা হ'ল—সংস্কারের মনে একটা মত বোঝা

টেনে গেল ।

তপেনকে এক দৃষ্টে গাড়ীর বিকে চাহিয়া

শ্রীকৃষ্ণের দেখিয়া, রমণ বিজ্ঞপ্তি করেছিল, “এত-

কিন পর্ষদ গাড়ীর মধ্যে সঙ্গের পাশে বসে এলে

তাত্ত্বিক কি তোমার আশের কথা ঘটিল না ?” এই

বলিয়া সে তাহার হাত ধরিয়া একটু মৃদু রকমের

টান দিল ।

রমণের কথাই তপেন অত্যন্ত লক্ষিত হইয়া

সুখ কিরীয়াই গইয়া করিল, “রমণ, কি চমৎকার

ঐ বাবাবশ্যের বগাবট—কি শ্রী-খোলা আপন-

তোলা মাহুট ; লক্ষ্যের মাঝে আপনি মত বোঝে

পকে । এই বলিয়া সে বিশ্রাম বিস্তুত নেজে তাহার

বিকে চাহিল ।

“এই কথা শুনিয়া রমণ করিল, “সে কথা

বাঁধা-কই ঠিক, এমন লাবণিয়া মাহুট এ মূর্তি

সুখই হয় হলে কিম্ব তাই একটা কথা বলিতে

হবে—এই কথাই তপেন মৃদু হাসিয়া কারণ,

“রমণ, তুমিও দেখি পালন হোলে । এ পাখার

দ্বন্দ্বের দাপল-না তাই, তোমার অপটো-কিছু-

মাত্র মত নাই ।” এই বলিয়া সে সেই স্থানটিকে

হাসির উচ্চারণে সুখের করিয়া তুলিল ।

রমণ আরো একটু কৌতুক করিয়া করিল,

“তা, তুমি বাই বস না কেন, এ কথা বাক্যের

কিছু হইবে যে মত-সংস্কারকে একটু মিলিত

করিয়া দিয়াছে—”

তপেন কিংবা উত্তেজিত হইয়াই করিল, “হান,

একজন কবিতা বসে দি-হে-ন, “A Woman's

love however erring must always be a

holy and beautiful thing, for its essence

it is the desire not for her own but

for another's joy. এ কথাই উপর তুমি কি
বোলেতে চাও—বল তু এই কথা বলিয়া সে নিম্নের
বোলে জায তাহার বিকে চাহিয়া রহিল।

তপেনের এই নজির শুনিয়া, রমেন অসহ্য
আন্তরিকতা সহ্য করেন। তখন সে মনে মনে
ভাবিতে লাগিল—এই অসহ্যের মধ্যেই এক
ভাবান্তর—এত পত্নী প্রেম!

তাহাকে নিকটস্থ থাকিতে দেখিয়া তপেন তখন
বুঝ হাসিয়া কহিল, “কই যে আর যে কোন কথাই
বোলছ না?”

“কি কি বোলব তাই? তোমার নজির
তুমিই শুধু বোলেছ। তুমি যে একজন এখন
প্রেমের সাজা অসহ্য হোলে—তা’ত আগে জান-
তাম না। এক মিনিটে নজির নিকট অসহ্যের
পের গোপন কথাটা এখন আত্মকোত্তর শিখ
নিহেছ, তখন তোমার সঙ্গে কবে তুলনা। আজ
তপেন, তুমি কি বোলেনে গোপনে হইবেগো সাধনা
আরও কোরে বিবেচন না কি?”

তপেন কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন চিত্ত কহিল, “আর
অসাহসে—এখন ভালই ভাল বাসাব চলা।”

কৌতুক করিয়া রমেন কহিল, “এখন এত
অসহ্য বোলে চোলে কেন—তোমার জতাই ত
এত বেশী? আর একটু বিড়িয়ে বিড়িয়ে লম্বা
কথা ভাব, তা হোলে অতি শীঘ্রই বাসব পৌছান
হবে।”

“হা, হা, আর বেশী বলি না—এখন চল
দেখি।” এই বলিয়া সে রমেনকে টানিয়া লইয়া
গাড়ীর মধ্যে বসাইয়া দিল।

কিছুকাল গাড়ীর মধ্যে চুপচাপ করিয়া কাটিয়া
গেল, রমেন গাড়ীর মধ্যে কহিল, “তপেন, তোমাকে
একটা কথা বিজ্ঞাপন কর।” আজ্ঞা, লম্বা কৈ কি
তুমি নতাই ভাল বেলেছ।”

রমেনের কথা শুনিয়া তপেনের মূখ ক্যাঁকানে
হইয়া উঠিল। সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল

আরপর মুহূর্ত্তে সে কহিল, “রমেন, লম্বা কৈ নতাই
আমি হেঁহা চক্রে দেখেছি।” তাহার সেই লম্বা
ভাব, লম্বা বিলম্বিত চাহনি, বেহের অসহ্য সাধনা
ও লম্বা স্বভাব আবার চক্রে অতি প্রখর দেখেছে।
“তাই আমি তাহাকে দেখে বুঝেছি।” এই বলিয়া
সে রমেনের বিকে লম্বাইয়া চাহিয়া রহিল।

তপেনের বক্তব্য শেষ হইলে রমেন ঈর্ষ হাসিয়া
কহিল, “সত্য ই লম্বা লম্বা যে সব ভূমির কথা
তুমি বল; তা অনেকাংশেই সত্য। আমি
কোনদিন তাই তাহাকে কঠোর সমালোচনা
করিতে দেখি নাই।”

“কেন, আমি কি তাহার লম্বা কোন প্রকা-
রের সমালোচনা করি, তাহার কি এই সব ভূমি
নাই?”

“এই আদি বলছি না, কিন্তু.....”

“কি কৈ?”

“এখন আর কোন কথা বলব না,—বাসাব চল
তাঁদের সব লম্বা, এই বলিয়া রমেন চুপ করিল।”

রমেনের চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তপেন
আর কোন কথা না বলিয়া রাস্তার জনতার বিকে
চাহিয়া রহিল।

গাড়ীর বহরমার সাধনে গাড়ী হাসিয়া থাকিয়া
যাত্রা, তাহাও হইবলম্বা থাকি হইতে নামিয়া
পড়িল। গাড়ীঘরের প্রাণা বিটাইয়া বিটাই, রমেন
অতঃপর গাড়ীর মধ্যে চুপচাপ উঠতে থাক
লি, “বৌদি—ও বৌদি।”

রমেনের বৌদির ঘরের কাগজে যত ছিলেন
বলিয়া, বাহিরের ভাঙে তুমিতে পান নাই, হঠাৎ
অসহ্যের “বৌদি” ভাঙ কাগজে গাড়ীতে তিনি
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “বৌদি” বলিয়া ভাঙ
দিল কে?”

এই বলিয়া তিনি যেমন ঘর হইতে বাহির হই-
বেন, অসহ্য রমেন ঠাঙ্গুগোলে সাধনে দেখিয়া,
অসহ্য আন্তরিকতা হইয়া কহিলেন, “কি রকম

ঠাকুরপো, চিঠি পত্র না দিয়েই চঠাৎ যে আদা হ'ল?" একটু কি চিঠি লেখবারও কুৎসং লাগে নি। চিঠি সেলে টেপনে গাড়ী রাখবার ব্যবস্থা করা হত?"

বৌদিদি কথা শুনিয়া রমেন করিল, "চিঠি আর কি লিখবে বৌদি। আদার পুত্রবান্দ্য, যখন আদারের খোঁশ হবে—তখনই আদার বেরিয়ে পড়বে। আদার ত আর তোমাদের মতন সগল লাগেল নই যে আবার পূর্বে যান-বাহনের ব্যবস্থা হবে?"

"হ্যাঁগো হ্যাঁ, আর বেশী বোকুতে হবে না। আমি যদি আসবার জন্য চিঠি না লিখতাম, তা হোলে তোমরা যে আসতে, সে আবার বিলম্ব হ'লো আছে।" এই বলিয়া সুহৃৎ হাসিয়া পুনরায় কহিলেন, "তুমি কি একলা এলে—ন আর কেউ সঙ্গে এসেছে ঠাকুরপো?"

"না—বৌদি একলা তেন—তখনকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।"

"কই তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না? আচ্ছা! মাপ্রু তুমি তা। ঠাকুরপো তাঁকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে এস? সে কি মনে করবে বল তা?"

রমেন ব্যস্ত গতিতে বাহিরে আসিয়া ফেলিল, তখনই নিমিষভিত্তিরে বাগানের মধ্যে পাচচারি করিয়া ফেড়াইতেছে।

তাক্যে অতন্নক ভাবে বেড়াইতে দেখিয়া রমেন সাহসে কথা বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিল। খাঙ্ক কিরাইয়া তখন বলিল, "নাও, নাও, আর অত খাঙ্ক বোকুতে হবে না। তুমি কি সব সময়েই ছেলে মাপ্রুদি কোরবে—বৌদিদি শুনে কি মনে কোরবে?" বলত?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এই চুপ বোঝেনে। বৌদিদি তোমাকে ডাকছেন—বাড়ীর মধ্যে ত আর গরমু নেই যে ভিতরে আসতে বাধ্য?" এই কথা

বলিয়া সে অল্প দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া গেল।

তখন তখন ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "রমেন তোমার কি কোন কাণ্ডাস্ত নেই—যখন তখনই পরের ঘেরের নাম করে ঠাট্টা করুতে হ'বে।" তখনকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া রমেন চৌকুড়তর করিল, "প. নু. ত পরের ঘেরে নহ, সে যে আদারের আগমার জন—প্রতিবেদী!"

"তিনি তোমাদের প্রতিবেদী হোতে পারেন—তাকে আদার কি? পরের ঘেরে আমার কাছে সব সময়েই পরের ঘের?"

তখনকে হাসে গাইয়া রমেন করিল, "যদি তাই-ই হয়, তাহা তুমি সাহসে ভাবে মস্তগুণ করে হ'লে কেন—তিনি ত পরের ঘের? ওহে তখন—Love is ever blind."

সে সময় চঠাৎ দেখানে রমেনের বৌদিদি আসিয়া কহিলেন, "খাঙ্ক! রমেন ঠাকুরপো, তুমি যে তখন ঠাকুরপোকে ডাকতে আসলে—তা এই আসলে আর সেই আসলে। তোমাদের কথা কি আর হুরোবে না—গাড়ীতে আরে আরে কত লোকের সঙ্গে কত কথা বোললে—তবুও কথা কি কুৎসং নি। বাড়ীর মধ্যে এলে হাত মুখ ধোও—জলটা ঝাও তাগর বত গার কথা বলে।"

বৌদিদির কথা শুনিয়া তাহার দুইরনেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। তখন মনে মনে ভাবিবে লাগিল—বৌদিদি যদি আমাদের সব কথা শুনিয়া থাকেন? কি লজ্জার কথা!

বৌদিদির আবেগ মত তাহার বাড়ীর মধ্যে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া, পুনঃ পুনঃ ভীষণ জল গলান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বসিল, তাহারের বৌদিদি আসিয়া রমেনকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "খাঙ্ক! যাঁহোক ঠাকুরপো, এদিক একবারও কি পা মাড়াতে নেই, চোখের আড়ান হোলে কি সবই ভুলে যেতে হয়?"

রমেন তাহার বৌদিবির কথাই রচনা দিয়া
বিত্তি-মুদ্র রচনা করিল, “এলু ন ভৌদি-আর
একবার বলুন; তোম একটু হুটুট।”

রমেনকে বাধা দিয়া তপেন কহিল, “রমেন,
তুমি একটু থাম—বৌদিবির বিবরণ আলা আপে
সজ্জ করি—তারপর তোর।”

এইরূপে কিছুকাল চক্ৰ-চক্রাবে কাটয়া গেলে,
তপেন বৌদিবির নিকট বিবাহ লইয়া বলিল “আমি
একটু বিজ্ঞানের কল্ল চন্দ্রাম। বাবার সময় তাঁকে
দিলু—বুঝিল?”

এই বলিয়া সে বাউতে উত্তত হইল, রমেনের
বৌদিবি ‘ব্যক্ত-সংস্কার’ে কহিলেন, “অনেক দিন
পরে দেখা হোল—একটু বসন্ত-বসন্ত বল্বে না,
বিজ্ঞানের কল্ল চন্দ্রাম। বেল ও ঠাকুরপো, তুমি ও
আপে একতম ছিলে না—বদি কষ্ট হই তবে যাও।”

রমেন এই কথার উপর কোর দিয়া কহিল,
“বৌদি, তপেনের আর সেদিন বেই—পূর্বে বা
বেবেছিলে! এখন শরীর খারাপের আশঙ্কা কোরে
আবারের বাগার ও আসেই না—যদি বলে বলে
নিজেরে তার মানস স্মরণের সঙ্গে আসাপ করে
বুঝলেন?”

“হ্যাঁ ঠাকুরপো, তোমার মানসস্মরণটা কে
ভালতে পারি না। সে কি আবারের পাড়ার
সেই আশঙ্কায় বেয়েট না কি? এ আবার কোন
কেন্দ্র নান?” কথাটা বলিয়া কহিয়া তিনি রমেনের
দিকে বিশ্বাস হুকু বৃত্তিতে চাহিয়া রহিলেন।

“বৌদিবি, আপান ঠাকুরে চিন্তে পারবেন না।”
এই বলিয়া রমেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তপেন এতদূর পণ্ডিত সম্ভীরভাবে রমেনের
কথা শুনিতেছিল—আর এখন পাড়ার চাপিয়া
চাপিতে পারিল না, তখন হো হো করিয়া হাসিয়া
উঠিয়া রমেনের পৃষ্ঠে সজোরে একটা কিল বসাইয়া
বলিল, “এটা তোমার বিরাট আততায় বিরাট
মৌজুক।”

বৌদিবির দিকে মুখ ফিরাইয়া তপেন কহিল,
“বৌদি, রমেনের কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?”

“বিশ্বাস না করবারই বা কি কারণ আছে
ঠাকুরপো? এখন তোমাদের মনের মধ্যে-কত
রকমের বক্তোম ছবি তামুছে—মন ও জোড়ামের
নেহাৎ এখন কাজ নহ?” এই বলিয়া তিনি মুখ
টিপিয়া হাসিলেন।

তপেন বৌদিবির মুখ হইতে এই প্রশ্নের
কথা শুনিয়া ঈর্ষ্য হাসিয়া বলিল “তবে আপনিও
বেবেছি রমেনের দিকে চলে পড়লেন।”

“কি করি—হঠাৎের ধর্মই এই।” বলি।
তিনি তাহারে বসিতে বলিয়া কাঁধা-স্তরে চলিয়া
গেলেন।

তপেনও বাগানে একটু বেড়াতে চন্দ্রাম। বলিয়া
রমেনের কাঁধ থেকে চলিয়া গেল।

তারের আহার শেষ হইয়া গেলে, নানা কথার
বাজি অবিক হইয়া বাউতেছে দেখিয়া, তপেন
তথা হৈতে উঠিয়া নিজেই গানে আগিয়া শুইয়া
পড়িল। সাধ্যবিনয়ের পরিভ্রমের কলে সে অচিরেই
নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িল।

রমেনকে নির্জনে পাইয়া তাহার বৌদিবি
বিশ্বাসঘটক কর্তে কহিলেন, “হ্যাঁ ঠাকুরপো, তপেন
ঠাকুরপোর মানসস্মরণী কি বাস্তবিক কোন
মেয়ে?”

রমেন একপাল হাসিয়া কহিল, “ওটা একটা
কাল্পনিক নাম বৌদিবি, মানসস্মরণী আগার কোন
মেয়ে বাহুবের নাম হয় না কি?”

“তবে যে তুমি মানসস্মরণী
বেপাচ্ছিলে?”

“ও একটা কথার কথা।”

কিছুকাল একথা সে কথা হইবার পর, রমেনের
বৌদিবি কহিলেন, “তুমি যে তপেন ঠাকুরপোকে
সঙ্গে নিয়ে এলেছ, বড় ভাল কাম করেছে
ঠাকুরপো।”

উৎসুক নেত্রি বৌদিধির দিকে চাহিয়া রমেন
বিস্ময় করিলেন, “কেন বৌদিধি—কি হয়েছে?”

সে দিন দুপুর বেলায় আমাঘের প্রতিবেশী
অন্য ভাড়াহের স্ত্রী আমাঘের বাগিচা বেড়াতে
এসে একথা সেখান পূর বলেন, “বিনি, আমাঘ
বুড়পুতরের এক মেয়ে আছে তার বনি একটা ভাল
সবুজ ফোড়ি করে দিতে পার, তা’ হলে বড়ই
ভাল হয়। উনি ত কত বোকাবুনি করছেন,
কেন বাগিচা হুঁতোর কোরে উঠতে পারছেন না।
কিও বা কোন দানে হুঁতোর চক, তারা এমন সব
চেয়ে বলে, যা দিতে আমাঘা কিছুতেই পারি না।”

আমাঘ বাবুর নাম শুনিয়া “রমেন উৎসাহের
সঙ্গে বলিয়া উঠিল, “বৌদিধি ঠিকই হয়েছে—
ভাড়াহ বাবুর বোনের নাম বুঝি সরস্বতী?”

স্বয়ং হাতে সরস্বতী নাম শুনিয়া সম্মুখের তিনি
কহিলেন, “তুমি কি ক’রে তার নাম জানলে
ঠাকুরগো—তারা বুঝি আর এল?”

স্বয়ং হাসিয়া রমেন কহিল, “এক সঙ্গে, এক
পাড়ীতে যে আমাঘা এলায় বৌদিধি।”

“তা হলে তাহের সঙ্গে পাড়ীর মধ্যে হুঁতোর
স্বয়ং আলাপ সালাপ হয়েছে—দেইও তার নাম
জানতে পেরেছ।”

“তুমি আলাপ হয় নি বৌদিধি—এমন কি তার
মনের পরিচয় পর্যন্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তুমি
আমাঘের জাব কি?” এই বলিয়া রমেন বেশ
একটু হাসিয়া উঠিল।

“এখানে যা দিতে না দিতেই তার মনের পরি-
চয় পর্যন্ত নেওয়া হোয়ে গেছে, বেশ ভাল,
এমন তোমাঘের মধ্যে একজন না হয় অপরকে কোরে
পরিচয়টা কোরে নীও না কেন ঠাকুরগো?”

“সে ত হয় ত হোয়ে যেতে পারে—সেজন্য আর
ভাবনা কি—তুমি যাঘের এমন বৌদিধি হয়েছ।”

“অত কথা আমি শুনেই চাই না;—এখন
পাড়ীর মধ্যে তার মনের পরিচয় কি রকম পেলো

তাই বল।” এই বলিয়া তিনি উত্তরের আশা
রমেনের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমেন সবিস্ময়ে বাহা বাহা বলিতেছিল ভাবা
বলিল। সব কথা শুনিয়া তাহার বৌদিধি করি-
লেন “তখন ঠাকুরগো তা হোলে সরস্বতী
আজুই কোরে পড়েছে কেন?”

“তুমি আজুই হয়েছে—একথা বলিল ঠিক
হয়ে না, তার মনের গোপন পরিচয়টা পর্যন্ত সব
জেনে নিচ্ছে, সে যে কত বড় লম্বা তা’ আমাঘ
আগে জানতাম না—”

“ও বাবা, তোমাঘের খেটে পেটে বুঝি এইখ
বেলে। তুমি তুমি তখন ঠাকুরগো’র বোঝা দিলে
চলবে কেন, তুমিই যে এর মধ্যে নেই, একথাই
বা কি কোরে বিখ্যাত করি?”

“না বৌদিধি, সত্য বলছি আমি ওদের ভিতর
নেই।” কথাটা বলিয়া সে কিন্তু অলস রকমের
সত্যের হইয়া উঠিল।

“যার মধ্যে এত বড় লম্বা, সে যে কিলে কম
তা’ বুঝতে পারি নি।” এই বলিয়া কিছু করিয়া
তিনি একটু হাসিলেন।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া রমেন তাহার বৌদি-
ধিকে বলিল, “এত বড় লম্বা এখন কি করা কর্তব্য।”

“ক’র সঙ্গে—তোমার সঙ্গে না তখন ঠাকুর-
গোর সঙ্গে?”

“আমার সঙ্গে সরস্বতী—অসম্ভব, সে যে আমাঘের
বোন বৌদিধি?” বলিয়া রই হাত সরিয়া দেন।

“এর বেলে কেন চলবে ঠাকুরগো, একদিন
না একদিন ও কাম ত করতেই হবে, এখন না যে
কোরে ফেল। একটু নীরব থাকি। তারপর তিনি
বলিলেন, “আজা ঠাকুরগো, সবুজ বেগু তখন
ঠাকুরগো কি কিছু বোঝিছিল?”

রমেন সালসার বসিতে গেলিল, “সরস্বতী এখন
শ্রেন থেকে চলে পেল, তখন একটা বড়
রকমের হীরালাস ফেলিছিল। তা থেকেই আমি
বুঝলাম তখন সবুজ তা’বেলে ফেলিছে।”

হঠাৎ কথারি জ্ঞানে তাহার বৌদিহি ভাল চিনিয়া বলিলেন, “এতটা পৰ্য্যন্ত হোতে দিয়েছে তবে আর কি কিছু সত্যি বলছি তাই ঠাকুরগো, তোমার কপাল আম থেকে পড়ল।”

“কি রকম?”

“আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার সঙ্গে সন্তান বিবাহ দিই; তা যদি তপেন ঠাকুরগো সন্তান হয়; তা হলে ত পুত্রই ভাল হয়। কুলে, শোলে, বিঘার, রাশে ও জুগে তপেন ঠাকুরগো সন্তান উপযুক্ত। আর তিনি ত আমাদের আপনাই জন।” এই বলিয়া তিনি আরও কিছু বুজিতে বাইবেন, এমন সময় হঠাৎ কথার মাকলানে বলিয়া কেলিলেন, “সেইসকল বৃত্তি আপনি আমাদের এখানে আসতে দিখাইছিলেন, তাই না বৌদিহি?”

“কতকটা তাইই বৌদিহি?”

তাৎপৰ্য্য নথ্য হইতে বাহিরে আসিয়া স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, “আর কতকগুলি কথোপকথন করিয়ে—সত্য যে অনেক হয়ে গিয়েছে।”

এই বলিয়া সেখান নথ্য ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই বৌদিহি বলিলেন, “আজ্ঞা হুই একদিন তপেনের ঘরের তাইটা দেখা দরকার; তারপর অন্য বাক্য স্ত্রীকে না হয় বলা যায়েখন।”

“সেই ভাল বৌদিহি—একটু মজা করা যাক তপেনকে নিয়ে।” এই বলিয়া রবেন উঠিয়া পড়িল।

(৮)

যেথাক্তে যেথাক্তে আরও দুই চারি দিন কাটিয়া গেল। ঈশ্বরের মধ্যে যে সকল ঈশ্বর্য স্থান ছিল তাহাও আর শেষ হইয়া আসিল।

একদিন রবেনের বৌদিহি রবেনকে ধরিয়া বলিল, “আজ্ঞা ঠাকুরগো, তোমার দেখলেই কি সকলের দেখা দেখা হোতে গেল বৃত্তি—আর আমরা হেঁচকীরা যে আরও ইচ্ছা আটক রয়েছে—আমাদের

কি একদিনও ওসব দেখার শান হয় না? তোমরা পুরুষ মানুষ হিজুক জাত—মিলেজা ভালমন্দ দেখে—আমাদের দেখার হচ্ছে—সেই।”

বৌদিহির কথার উত্তরে সে বলিল, “কেন ত বৌদিহি, চলুন না একদিন সকলে মিলে দেখা যেনে আসি।”

তারপর অনেক বাহায্যবাদের পর দ্বিহা হইল যে, কাল বিকল বেলায় পাড়ার সকলকে লইয়া যেনা যেথাক্তে যাওয়া হইবে।

পাড়ার মধ্যে এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়াতে, পাড়ার মেয়েজা সব মলে মলে রবেনের বৌদিহির নিজস্ব আসিয়া যেনা যেথাক্তে বাইবে বলিয়া বহিয়া বলিল।

পরদিন বিপ্রহর এক এক করিয়া যেরের হল আসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের কাথাবাড়ী বাড়ীট ঘুর হইয়া উঠিল। রবেন তাহার বৌদিহিকে ডাকিয়া কহিলেন, “এই পল্টন নিয়ে আমাদের যেতে হলে ত আমি দেখি?”

হঠাৎ বৌদিহি বৃহৎ হাসিয়া কহিলেন, “তুমি যদি একলা না পার ঠাকুরগো—তবে তোমার হুকুমকে লক্ষ্যকরী কর না কেন?”

“না, বৌদিহি, তার ব্যান তল করা ঠিক নয়।”

“কেন, তিনি কি এখনও সন্তান ধ্যানে মগ্ন নাকি?”

“বোধ হয় সেই রকম।” বলিয়া রবেন তপেনকে বুজিতে আসিয়া যেমিল, তপেন বিদ্যায় বিপুল মেহতার এমাইয়া মিহা শুদ্ধ দ্বিত করিয়া শুইয়া আছে। তাহাকে ঈশ্বর অবতার শুইয়া থাকিতে দেখিয়া, রবেন হস্ত করিয়া কহিল, “ওহে তপেন, একবার চোখ মেল।”

তৎপরে থাকিয়াই সে জবাব দিল, “কি দর তাই হল—তারপর দেখা যায়েখন।”

“আজ্ঞা, জ্ঞাত পরে মাঝে মাঝে একবার—তার পর সব বসি।” এই বলিয়া কোর করিয়া তাহাকে, বিদ্যায় হুইতে উঠাইয়া দিল।

“কোথা যেতে হবে আগে বল নভেৎ ‘পারমেশ্বর
ন রক্ষা’নি”।

অসম্ভব রমণকে সব কথা পুলিশা বলিতে
হইল। বৌদিবির নাম শুনিয়া তখনে আর কোন
একবার বিক্ষোভ না করিয়া কাগজ ছাড়িলেন পেল।

পাড়ার মেয়েরা বিভিন্ন বয়সে জুয়েন যখন
একে একে আসিতে লাগিল, তখন চঠাৎ তাহাদের
মধ্যে সতর্ক মতন কারাকে খেঁচিতে পাইয়া,
তপনের বেহের শিগা-উপনিষাদগুলির উপর নিয়া
বিদ্রাঘ খেলিয়া পেল। সে মনে মনে ভাবিতে
লাগিল—এই কি সেই পূর্ণপরিচিতি সত্বে—না
অন্তরক?

তখন তাহার মনে পড়িল সেই বৃদ্ধ বাগদামায়ে
কথা। তিনি না বলিয়াছিলেন—তাহার এক
ভাইপো এখনকার ডাক্তার। তবে তিনি নিশ্চই
এই পাড়ার অতি নিকটেই থাকেন—তা’ হ’বেও
বা।

এই একবার ভাবিতে ভাবিতে অসম্ভব হইয়া
পড়িল, রমণ তাহাকে খাড়া বিদ্রাঘ করিল, “তল না
হে—সবাই যে একতর।”

রমণের কথার তপন একবার সেই বৃদ্ধ
রমণী বাহিনীর দিকে অশ্রু ছুটি করিয়া বলিল,
“এ যে একটা একান্ত রেজিমেট!”

রমণ অধু “হু” বলিয়া চুপ করিয়া পেল।

(৯)

ভাষাটা বেশার পৌছিয়া খেলিল, ভিতরে ও
বাহিরে অসম্ভব। জনতা; ভিতরে ঢোকে কাঠার
সাধ। এতগুলিকে লইয়া একেবারে ভিতরে
এবেশ করা অসম্ভব তাহারা তপনের সহিত পরামর্শ
করিয়া রমণ দ্বির করিল যে এক এক করিয়া এবেশ
করাই সুচিত্রত। কিন্তু কে যে এই বৃদ্ধকে
অগ্রসর হইবে তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।

যখন রমণ ও তপনের মধ্যে বাগদামায়ে চলিতে
ছিল, সেই সময় রমণের বৌদিবি আসিয়া কহিলেন,

“এত ঘেরী কোন্‌র কেন ঠাকুরপো। ওঁকে কিরতে
যে রাত গোয়ে দাওবে?”

বৌদিবির কথা শুনিয়া রমণ কহিল, “বাদি
বলি এই ভোঁড়ের মধ্যে এত এক কোরে ভোঁড়াই
টিক, এক লকে বেঁচে বড়ই কষ্টকর হ’বে।”

রমণের ভুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া তাহার বৌদিবি
কহিলেন, “এ কথা মঙ্গল নয়, ঠাকুরপো, তবে না হয়
তাই হোক।” বলি। তিনি তপনের দিকে
তাকাইলেন।

বৌদিবির মতলব বুঝিতে পারিয়া তপন কহিল,
“যা নিয়ে আম বেহে সন্তুড়া, বৌদিবি, আগনি এনে
সব তা কাপিয়ে দিলেন।”

“কি রকম রমণ ঠাকুরপো—তাহাদের আবার
কি মংলা হিল?” বলিয়া তিনি নিজের ভুক্তিতে
তাহার প্রতি গাঢ়া রহিলেন।

রমণ বৌদিবিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “তপন
শেষে স্তম্ভিত, তাই ওকে বোঝাঙ্গমান তুমিই লে-
লারের ভারটা নাও—কিন্তু বৌদিবি, নিতে
সম্মত। এখন যদি তুমি বুঝে-হুঁতর কিছু
বোঝতে পার।”

তখন অতি সজোরে কহিল, “তোমাকে ত
বেউ plead কোন্‌র বলিলে,—বৌদিবি থাকে
বোলবেন সেই কাবে;—সে তুমিই হও আর আমিই
হই না কেন?”

রমণ হাসিয়া কহিল, “বেশে বৌদিবি,
তপনের কিছু সম্পূর্ণ ইচ্ছা—তবে—” বলিয়া সে
মধ্যস্থে থাকিয়া পেল।

“তবে আবার কি—বৌদিবি is the best
judge.” বলিয়া সে বিষমধর্মে বৌদিবির দিকে
তাকাইয়া রহিল—কলঙ্কের লজ।

মলের মধ্যে হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল,
“নিশি, তুমি যদি তাঁর তর্কের বিচারই কোন্‌বে,
তবে আমরা দেখব কি?”

এই কথা শুনিয়া রমণের বৌদিবি তপনের

উদ্দেশ্য করিয়া তাহাদের, “তপেন ঠাকুরপো, তুমিই না হব চাকরের ভারটা নাও।”

“কেন বৌদিদি, রমেন বুঝি কেবল তোমার-মালি কোরবে।” বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

তাহার কথা শুনিবান্না রমেন করিল, আজ তাই তুমি ভারটা নাও—অন্তদিন আমি—এই তিন সত্যি কোবুঁ।”

তাঁহাদের মধ্যে আপোষে যখন সব নিষ্পত্তি হইয়া গেল, তখন তপেন এক একজনকে হাত ধরিয়া সেই বিপুল জনস্রোতের দখা দিয়া অতি নিম্ন জাবে চলিতে লাগিল।

যখন সেই ট্রেনে দুই বকরীর মত জটিল তরুণীর সমন্বয় আসিল, তখন তপেন যেন কেমন একটু সম্মুখিত হইয়া পড়িল। সে যেন যেন হৃদয়ের উপর বিহ্বল হইয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই রমেন ও বৌদিদির এই কার্যসিদ্ধি—নইলে এমন করায় তাৎপর্য কি?

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া, রমেনের বৌদিদি হাসিয়া করিলেন, “সেই ঠাকুরপো, পনের ঘেয়েকে সাংঘাতনে নিয়ে বেগ—ওর সমস্ত ভার তোমার উপরেই হইল।” এই বলিয়া তপনের আগন্তে অকস্মেৎ সে প্রান্তে দুই চাকরী লইয়া হাসির বেশ সুসংঘত করিয়া লইলেন।

কথাটা শুনিয়া তরুণীর মুখমণ্ডল হ্রস্ব হইয়া উঠিল।

বৌদিদির মুখ হইতে এই হৃদয়ের কথা বাহির হওয়াতে তপনের স্নেহের দূর হইয়া গেল। তাহার মাঝার মধ্যে কিছু কিছু করিয়া উঠিল। সে যেন মনে ভাবিতে লাগিল—এই রূপসী তরুনীই তা’রেন সরসুই।”

সে একবার মনে করিল, লম্বার মাথা খাইয়া তরুণীর আশ্রয়ভিষ্টতা লব। পরকণ্ঠেই তাবিল—ইহা অন্তঃপ্রাণিত ব্যবহার, যদি ইনি বৌদিদিকে বলিয়া দেন, তবে সুখ রাবিবার স্থান থাকবে না।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে আগুন মনে সে লব

চলিতেছিল। তাহার স্নেহে একজন আগন্তেছে, সে খেয়াল তাঁর কাছে ছিল না। লম্বা একবার জন-স্রোতের তরকে তাহার সঙ্গী একবার কোথাও ভাগিয়া গেল; সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া ফেলিল, সেই পল্লববর্তিনী তরুনী নাই। তাহার সমস্ত চিন্তাচর্চা এক নিমেষে কোথাও অস্তিত্ব হইয়া গেল।

সে আগন্তের মত চারিদিকে স্তুবিধা বেড়াইতে লাগিল। ঠাণ্ডা কিছুইর আগ্রস হইয়া দেখিল—একজন লোক ঝাড়াইয়া কি যেন বলিয়া গিয়াছিল—একজনকে এত লোককে ঝাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে স্নেহের উদয় হইল। সে তাড়াহুড়ি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল—সেই তরুনী তবু বেতনগতর দ্বারা কাঁপিতেছে।

তাহাকে ঐরূপ অবস্থার পাইয়া তপেন একটু ক্ষতি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্যগ্র-কণ্ঠে করিল, “আপনাকে না দেখতে গেলে, আমার মন বড়ই চকল হোয়ে গেল। ঐরূপে যতবান যে তিনি আপনাকে ঐসই দিলাইয়া দিলেন।”

অত্যন্ত ভীত ও অশ্লীল-কণ্ঠে সেই তরুনী করিল, “এই ভেঁড়ার মধ্যে আপনাকে না গেলে আমার বড়ই ভয় হোয়েছিল। কি ভাগিন্দু—আপনাকে সেলুদ।” এই বলিয়া সে মাথা নত করিয়া লইল।

“এমন আর লম্বা কোরুন চলে না, লীজ আমার হাত ধরুন, নইলে আমার হাড়েরে ধাবেন।” এই বলিয়া তপেন তাহার ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

তরুনীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তপেন নিজেই আগ্রস হইয়া সেই বেশপুথানা তরুণীর দুপাশ-নিবৃত্ত যাত্রণতাদী ঘরিয়া করিল, “চলুন—এইবার।”

তপনের হাতে হাত লাগিয়াই সেই তরুনীর ঘেয়ের মধ্যে পুঙ্ক সকার হইল।

দু’মেনেরই মুখে আনন্দের হাসি ফুটয়া উঠিল।



ବାହ୍ୟ-ମାହିତ୍ୟ-ମହାଶୟର ମାଣ-ସହାୟକମାନ ଉପାଧିକାରୀ— ସାଧୁ ବଡ଼େଇ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀମତ୍ କରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ର (ଶ୍ରୀମତ୍ୟ:)
 ମହାଶୟର ମାଣାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତ୍ କରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ର (ଶ୍ରୀମତ୍ୟ:) ଶ୍ରୀମତ୍ କରାଜୀବ ଶାମୀର ବିବାହାଦିକାରୀ (ମାହିତ୍ୟ:)



১৩শ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৩০

৪র্থ সংখ্যা

স্বপন-পাখীর স্মরণ

(ঐবেনেস্ত্রুহুদে রাঘ)

স্বপন-পাখী, স্বপন-পাখী, চাঁদের আলোয় নখন ঝোলো,
না শোনা কোন হরের শব্দে তপ্তা-সাগর ঢলুক ভোলো,
আগ কৈ তুমি যুবকে ভোলো ।
নীলের কোলে ছায়াপথে
চালিছোছি ঘোর মনোরম,
আগপাশে তার ছুটুচে কত তারার কুহুব খোলো খোলো,
স্বপন-পুত্রের দরজা কোখাখ, বোলো তুমি আদায় বোলো—
চাঁদের আলোয় নখন ঝোলো !

ঘটার পথে পথিক চরে চরণ তো আগ ঢলুচেনাকো,
চোরবিকে হাথ ছুটুচে আঁবি, আগার শিখির জলুচেনাকো—
ননের শুয়োটি গলুচেনাকো ।
কেবল খুশো কেবল খোঁজা,
সুখ নেই তাই শিকি পোখা !

হৃদয় তাপে তরুণতার ত্রাণের কলস ফুলে নাকো—

তোমার দাব—কল্পের আর ? কেউ তো ফুলে ফুলে নাকো,

আর যে চরণ চলে নাকো ।

বকে ছিল পানের জাবা, ঢেকে ছিল তোমার আলো,

ওঠে ছিল হাসির বাণী, প্রেম প্রীতিতে মন তুলানো—

এসেছিলাম হৃদয়ে তোমার ।

বাহ্যে যাই তরুণ কাল,

আগিয়েছিল চিত্তে আগুন,

আজকে সে-সব অতীত কথা ;—আজকে যেমি কেবল কানো—

কেবল হা-হা, কেবল ঠা-কা, কেবল আমার সব কানো !

—নিবে গেছে অক্ষয় আলো ।

জীবন্ত-এক-‘ম’র দতন-চুলটি ক’রে ব’লে আঁচি,

কল্পনারি সপকথাতে আজকে কেবল আমি বাঁচি —

স্মৃতির দাবের প্রথকে বাঁচি !

মনে মনেই হুঁচি স্বপন,

নতুন শব্দ, নতুন তপন—

ধরায় থেকেও নইকো ধরায়, আকাশ আমার কাছাকাছি,

বৃক্ষের ওপর হুলুচে স্রু স্রু-স্রুয়ের মায়াগাছি—

তাঁকেই নিয়ে বেঁচে আছি ।

স্রু-স্রুয়ের শিখর মালা কেউ নিলেনা হাতে ক’রে,

আমার হিয়ার এক ঝগে স্রুগুণি যে আছে ত’রে—

নেই অতিথি ঘরের ঘরে ।

স্বপন-পাবী, স্বপন-পাবী !

তাই তো আমি তোমার ভাষি,

আলোক-পুরের পুলক-স্রুয়ের মোহন লহর পঙ্কজ ক’রে,

যেই স্রুতে স্রু মিলিয়ে গাঁথ’ব মালা রত্নের জোরে—

টাক্টকা স্রুয়ে নতুন ক’রে ।

বৌদ্ধধর্ম ও তাহার শাখা প্রশাখা

(শ্রীমোক্ষেন্দ্র বোধ এম. এ., এ, এ, সি 'লণ্ডন')

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষে হইলেও এক্ষণে এই ধর্মের প্রচার এক্ষণে আর তত বিস্তৃত নয়— এই ধর্ম ভারত হইতে একতরপে গোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চট্টগ্রাম প্রান্তিক স্থানে এই ধর্মাবলম্বী অধিবাসীর সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে বেধিতে পাওয়া যায়। আরকাল আশাধের বেধে এই ধর্মলইয়া কিঞ্চিৎ আশাচন্দার সুস্থপাত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে চৈত্যানিহাংয়েরও স্থাপনা দেখা যাইতেছে। এখানে আশাধের বেধে বৌদ্ধধর্ম লব্ধীর পুস্তক লবণ কেবল পালি ভাষায় লিখিত বলিয়া অনেকটাই ধারণা ছিল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। বৌদ্ধধর্ম লব্ধীর লব্ধত ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লবণ ধর্মপুস্তক হইতে দুই সহস্র বৎসর পূর্বেকার ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেকটা জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারি সংখ্যার অনেক। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আপন ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত যে কত বেশ বিদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাহার বহুল নিদর্শন আছে এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ হাজার মৃতনগরে বৌদ্ধিত হইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যার কত ছিলেন তাহা নিশ্চিত জানিবার কোনরূপ উপায় না থাকিলেও তাঁহাদের উত্তর-পুত্রবিশেষের সংখ্যাবিকা দেখিয়া কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাদি প্রধানতঃ পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কিন্তু বহুল এই ধর্ম নানা-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়, যখন প্রত্যেক শ্রেণীরই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেককাল পালিতাষা যে সম্মান লইতেছিল, এক্ষণে তাহা আর লব্ধবৎ নয়; কারণ, আরকাল পূর্বে তুর্কীস্থানে যে লবণ

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম-পুস্তকাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি মৌলিক। লব্ধ, ভাব ও প্রচেষ্টার বৌদ্ধগা পালিতাষাকে পবিত্র ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে এবং এই লবণ বেধাধারী-বর্ষ ধর্মপুস্তকাদি প্রচারই এই ভাষায় লিখিত; কিন্তু তিব্বত, চীন ও জাপানের বৌদ্ধগা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থের প্রতি বিদেশভাবে আস্থান। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত লব্ধ বৌদ্ধধর্ম-পুস্তকাদি পুস্তিকার হইতে একতরপে গোপ পাইয়া নিহাছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না; কিন্তু লব্ধ-বিধ, চীন ও তিব্বত ভাষায় অনুদিত এই লবণ প্রচারি অধ্যাপন বর্তমান আছে।

এই লবণ ধর্মপুস্তক হইতে আইই নৃষিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম চই শ্রেণীতে বিভক্ত—‘হীনযান’ ও ‘মহাযান’। হীনযানগণাবর্ষের মতে বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা অলংকার লব্ধ ‘বর্ষ’ হইতে পারেন এবং তাগে সম্পূর্ণরূপে ‘নির্লব্ধ’ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু মহাযানবাবর্ষা বলিয়া থাকেন, লব্ধের লবণ মানবই বুদ্ধজ্ঞানের দ্বারা লব্ধ হইতে বুদ্ধি লাভ করিয়া নির্লব্ধ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই লব্ধ প্রাপ্ত শ্রেণীকে ‘হীনযান’ বা সূত্রবাহন বলা হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে ‘মহাযান’ বা বিশালবাহন বলা হয়। মহাযানবাবর্ষা বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন জ্ঞানের দ্বারা চেষ্টা করিলে বোধিবৎ হইয়া পূর্ণবর্ষ লইতে পারেন; এবং যে কোনও ব্যক্তি আপন আপন জ্ঞান, দ্বারা ব্যক্তিগত দ্বারা এবং বুদ্ধ-বোধি-সংঘের প্রতি ভক্তি দ্বারা নির্লব্ধ পাইতে পারেন।

পালি ধর্মপুস্তকাদিতে বুদ্ধবেধকে একজন

মহাপুরুষ বলিয়াই যেখান হইয়াছে। তিনি আপন জ্ঞানের দ্বারা অনেককে আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং 'নির্কল'ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হীনমানবাবোধিগের মধ্যে আর এক দোষী আছেন, যাহারা 'লোকোত্তরবাদী' বলিয়া পরিচিত। ইহারা বলেন যে, বুদ্ধদেব মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি একজন অজ্ঞান বা লোকোত্তর ছিলেন। কেবলমাত্র বহুযাযিগকে নির্কল দিবার ক্ষমতা বৎসর মাত্র এ পৃথিবীতে আদিয়াছিলেন। মহাপ্রাণবাহীরা আবার বলেন যে, বুদ্ধদেব বা বোধিসত্ত্ব লক্ষ্যেই যেখান, তাঁহাদের আপন আপন নির্কল কেন্দ্র মাত্র একটা গোলা মাত্র। হীনমানবাবোধী বলেন যে, পাক্য ব্রহ্মি জগ্গিবার পূর্বেও যুগে যুগে সন্ত সন্ত বোধিসত্ত্ব উদ্ভব করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাপ্রাণবাহীরা বলেন যে, সন্ত সন্ত কেন্দ্র কোটি কোটি বোধিসত্ত্ব উদ্ভব করিয়া তিরোহিত হইয়াছেন। এই নির্কল মহাপ্রাণবাহীরা কোটি কোটি বোধিসত্ত্বকে যেখান জ্ঞানে পূর্ণ করেন। এই বোধিসত্ত্বের কেন্দ্র মাত্র মানবদেহ বোধনাবে আপন আপন নির্কল উদ্ভব করিয়া যুগে যুগে পৃথিবীতে উদ্ভব করিতেছেন। ইহাঙ্গির তত্ত্ব কিয়ৎ হিন্দুগির যেখ-যেখ, যথা,—শিব, তারা প্রকৃতির উদ্ভব আছে, এবং উদ্ভাবিগেরও পূর্ণাবি হয়। এই যে মিশ্রিত ভাব, ইহা কেবল ঐ মহাপ্রাণবাহীরাই বিবাক করে। অস্ত্র হীনমানবাবোধিগের মধ্যেও বহুবিধ হিন্দুপ্রভাব যে ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু মহাপ্রাণবাহীগির মধ্যেই উদ্ভাব প্রকৃতি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

অতি প্রাচীন কালে যৌদ্ধের 'অম' বা আপন অর্থেই বিবাক করিত না। জ্ঞানের দ্বারা এই প্রাক্ত 'অম' জ্ঞানকে মন হইতে বিতাড়িত করিতে না পারিলে নির্কলদেহ অধিকারী হওয়া যায় না। (কহাই তাহাদের দাবী) ছিল। মহাপ্রাণবাহী-

গের মতে 'অম' বা আদি বলিয়া কিছুই নাই—সর্ব: পুত্রম্। ইহাঙ্গিরকেই 'পুত্রবাহী' বলা হইত। 'বিত্ত ইহাঙ্গি আবার বিজ্ঞানবাবে বিবাক করিত। হীনমানবাবোধিগের মধ্যে আর এক প্রকার 'স্বপ্ন সর্গাভিবাগী' নামে অভিহিত। ইহাঙ্গি লংঘ্য অধিক ছিলেন এবং ইহাঙ্গির লিখিত সংস্কৃত বৌদ্ধ বর্ণগ্রন্থাবি সকল প্রকার গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লিখিত হয়। ইহারা প্রত্যক্ষবাহী বা Positivist ছিলেন এবং ইহাঙ্গি প্রাক্ত গ্রন্থাবি অর্থেই বিবাক করিতেন। ইহাঙ্গির মধ্যে 'সর্গাভিবাগী', 'বর্ণগ্রন্থ', 'মহাপ্রাণ' এবং 'সন্তবাহী' নামে চারিটা শাখা ছিল। লোকোত্তরবাদিগির মধ্যে প্রাচীন শাখা 'মহাপ্রাণ' নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির বিনে অনেকগুলি স্ত্র স্ত্র সন্তবাহী সন্ত হয়। যোগাচার ও তান্ত্রিকসন্তবাহী ইহাঙ্গির মধ্যে প্রাক্ত লক্ষিত করিয়াছিল।

হীনমান, মহাপ্রাণ এবং সর্গাভিবাগিগির ধর্মগ্রন্থগুলি আরই শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; কিন্তু মহাপ্রাণগিরের গ্রন্থাবি তাহা আর অল্প সংস্কৃত। হিন্দুসন্তবাহী বা যোগবাহীগিরের গ্রন্থাবি তাহা পৈপাচী প্রাক্ত, এবং মহাপ্রাণ সন্তবাহীরা অপ্রাণ জাতি ব্যবহার করিত। এই পৈপাচী প্রাক্ত ভাষাটি কি, এখন তাহা যেখা হইক। Grierson সাহেবের মতে পৈপাচী প্রাক্ত ভাষাটি খোং হক, তক্ষীলা ও ত্রিটকতী স্থানসমূহের লিখিত ভাষা ছিল; ইহাঙ্গি লিখিত পালি সংস্কৃত অধিক। Bhandarkar মহোদয়ের মতে পালি ভাষাটি হইতোহ মগধী ভাষায় লিখিত ভাষা মাত্র। তুর্কীস্থান হইতে যে সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থি প্রাপ্ত হওয়া সিদ্ধান্তে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশগুলিই পালি বর্ণ-গ্রন্থাবিই অল্পমাত্র। অনেক সময় একই গ্রন্থ ভিন্ন নামে লিখিত পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকগুলি যুগ সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহা পালি গ্রন্থাবি

হইতে কোনও মতেই আধুনিক নহে। ৩য় ত ইহা এমনও হইতে পারে যে, সংস্কৃত এবং পালি বৌদ্ধধর্ম-ঐহতলি অপর কোনও ভাষায় লিখিত আদি ৩য় হইতে ভাষান্তরিত হইল।

কাম্বীর এবং তত্রিকটবর্তী দেশসমূহ হইতেই 'সুল সর্গাতিবাসী' মত প্রচার হইতে থাকে (Sylvain Levi, Journ. As. 1914)। 'লোকোত্তরবাসী' মত বিহার ও বিজয়গিরির মধ্যে তৎকালে যে ১৬টি দেশ ছিল—যাহাকে 'বধ্যদেশ' বলা হইত, সেই সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। ইহা সাক্ষ্যত "হাবন্ধ" এর হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত স্থবিবাহী বা খেয়বাহীদিগেরই ধর্মগ্রন্থগুলি আধুনিক পালি বৌদ্ধধর্ম এর সকল। স্থবিহেরা এবং বুদ্ধদেবের পিতা ছিলেন এবং তাঁহারা ঐ 'লিঙ্গিভেদ' মধ্যেই আপনাদের সকল ধর্মনীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অল্প পরিচয়ের ভিত্তর ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে পিতা পালি গ্রন্থগুলি কিছু নীরস হইয়া পড়িয়াছে। একান্তিতে সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি আছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি কিন্তু তরুণ নহে। চীন পণ্ডিত ইংলিস বলেন যে, সুল সর্গাতিবাসীর সহিত স্থবিবাস, মহাসিদ্ধি ও সমতীর শাখার গাঢ় সম্বন্ধ অধিক, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ধর্মপুস্তক বিভিন্ন, এবং বিভিন্ন ভাষায় লিখিত। পালি ধর্মপুস্তকগুলি বহুকালব্যধি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বহু হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ, ঐ স্থানে মহীশাসনসম উহার বহু পক্ষ ছিল। তাহার পালি ভাষায় প্রচারিত প্রচার অধিক পরিমাণে করিতে দেখা নাই এবং অনেক বিষয় দান করিয়াছিল। কিন্তু সর্গাতিবাসীদিগের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্মপুস্তকগুলি আর বিনাশের ভয়ভ-বর্ধের উত্তর পশ্চিম পথ দিয়া তুর্কীস্থান, চীন, তিব্বত ও জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয় এবং বিশ্বদিগের দ্বারাও তাহা, Indo China, এবং ভারতবর্ষাশাখার বৌদ্ধপুত্র প্রচারিত হয়।

অশ্বতের সকল ধর্ম হইতে নৌদ্বারের পার্শ্বতা এইখানে যে, বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের ভগবানে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করিতেন। তিনি বলিতেন, ঐশ্বর্যবোধে বৃথা চেষ্টা, এতদ চেষ্টার আশ্রয়তা কিছুমান নাই। মানব আচার কর্মকল হইতেই মুক্তি আশ্রয় এবং তাহা আশ্রি ব্যতীত অপর কোনও প্রকার জিহ্বারই প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই যে জীবদেহের বন্ধনস্তর ত্রৈল হইতে মুক্তি কিস্ত্রণে সম্ভবপর; তাঁহার মতে পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি আশ্রিই প্রকৃত মুক্তি এবং ঠোকা মল্লের মূল্য। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে দেখিতে গেলে, তাঁহার মতে মানব আচার ঐশ্বরিকতা কিছুই নাই—কারণ, 'অহং' বিনা কিছু নাই। কোনও বস্তুতে যখন আশ্রয় লাগিলে সেই অশ্রিত্য নাড়িতে নাড়িতে অপরাধের স্থানে গড়াইয়া পড়ে, তাহা মতে এই অপরও তরুণ ব্যাধি বা রিপুণ্য বস্তুতে প্রস্ফ-লিত। সেইজন্য কর্মকলস্তর অশ্রিণা একজন সমুদায় আচারকে ত্যাগ করিয়া অপরজন সমুদায় অস্থা গ্রহণ করিয়া পুনর্জন্মস্তর তাহাকে পৃথিবীতে আকর্ষিত করে। অশ্রিণ্যত ইহন যেমন তাহার অতিশয় মজ্জ আশ্রয়, তেমন অহমিকারও ইহন আশ্রয়। ইহন ব্যাধি যেমন অশ্রি নির্বাণিত হইয়া যায়, সেইজন্য মানববৃত্তি বা জ্ঞানের দ্বারা যখন কোনও ইহনই বাগদান বা রিপুণ্য অশ্রিণ্যাকে জোপাইবে না, তখনই তাহার দৃষ্টি এবং পুনর্জন্মের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। ইহাই মানব আচার্য বা আশ্রয় অশ্রিণ্যের "নির্জাণ"।

বুদ্ধদেবই সর্গপ্রথমে সকল ধর্মের ভিত্তি তপ-বানে বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নবধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন,—কিন্তু ওল্লঙ্গনর মানব তাহা সম্পূর্ণরূপে আত্ম করিতে পারিল না, তাই আক তাঁহারই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৌদ্ধতা তাঁহাকেই এবং ভগবান্ জ্ঞানে পূজা করিতছে। তিনি চাট্রিয়া-

হিলেন যে, হানিও জাতি চিত্রাঙ্কনিত তৎসংস্কারনা
ত দেব দেবীদিগের জ্যোতিষি পাঠ হইতে বিহত
হয় ; কিন্তু আজ তাঁহারই প্রতিষেধ কত লভ
জ্যোতিষি বিহত হইয়া তাঁহারই ধর্ম্মা কীর্ণিত
হইতেছে। তৎসবানের আলনে তাঁহাকে বসাইয়া
লভ সহস্র নরনারী পূজার অধী বিতে হই।

এই লভ হিন্দুজা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নাস্তিক-ধর্ম্ম
বলিয়া থাকেন, অথচ ঐ বুদ্ধদেবই আবার
হিন্দুদিগের মন অবতারের অস্ত্রতম অবতার।
আন্তর্ধর্ম্ম বিচার ইহাই যে, প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থাবলিতে
বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এতাদৃশি লব্ধে সোনিই উল্লেখ নাই।
তৎসবনাত এক পুত্রাণে তাঁহার লব্ধে কিকিৎ
উল্লেখ আছে। ঐশ্বরিকী তাঁহার কামাঙ্কনে
বুদ্ধদেবকে চোর আখ্যা দিয়াছেন। ঐশ্বরিকিতেও
বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধদের বংশধরোক্তি সুখ্যা আছে।

প্রাচীন কাম্যকবি কেদেঞ্জই বুদ্ধদেবকে প্রথম
অবতার বলিয়াছেন এবং আবারের বাক্যসার কবি
অথদেবও তাঁহার পানাজ্ঞাপন করিয়াছেন, অথচ এত
বড় অবতারের ধর্ম্মপুত্রকাদি লব্ধে হিন্দুদিগের
বিদ্যাল ধর্ম্মপরিচো কেন যে উল্লেখ নাই, তাঁহার
কৃষ্ণলভ কাম্য বুলিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচীন
হিন্দুদিগের কাম্যতোহি কি ইহার একমাত্র কারণ ?

* আদ্যের বিদ্যাল, প্রাচীনকালে ইয়াবিবাসী হিন্দুজা
নাস্তিক বৌদ্ধবিসেকে সুনজরে দেখিতে ন।, কিন্তু চরিত্রিক
ঐতিক বলে বলীয়ান বুদ্ধদেব জ্ঞানের বর্জিতা লইয়া বিদ্যাল
হামোয় সমস্ত দিষ্টাভিলেন বলিয়া উত্তরকালে হিন্দু-ভারত
তাঁহার মিকট লগনকে লভ লভ করিয়াছিল। হিন্দুদিগের
উত্তরতাই তাঁহাকে বসাবতারের লব্ধে লভতম অবতার
করিয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে এ ঘটনা লামায় লভ
পূর্ণের লভ।

কুমাল

(ঐশ্বরিকীজন সেন গুপ্ত বাহাদুর)

সেবার আকাশ, সেব সেব হীন বুদ্ধতর লব্ধ,
লুকনা হইল, লুকনা হ'ল, লরিবে লালুর ঠাট।
লরিব লিটাই, লুনিবের লনি চ'বিছে লর করে'
লুও লনী হ'তে, লিয়ে আসে লল লিবায়াত লর তরে'।
লোবিত লেবিত লর চ'বা লনি, লতে উটিল লরি।
লুনিব সেবার, লেল লল টাকা, লানের লালনা করি।
লনে লল লুনী, লিটাইয়ে লুনি, লিলেন ললললনি
লনল-লিনেচ, লোহাঙ্গ-লিনালা, লনক লিয়েছে লনি,
লুনিবের লছে, লেয়ে উপহার, লিটাই লিটিল লর,
লোকাটি লাহার, লেয়ে লে ললল, লুবে লালি লনি লর ;
লল লুক লাবে, লল লাবে লেচ, লল লিট-লল-লর
লিট লালচে, লিটিত লোবে, ললল-লললল।
লেতে লর লিটা, ললালে ললায়ে লোকাটি লর লাবে।

দুপুরে কদাল, জলে, ভিজাইয়া, দেখে বাঁধি তার মাংস,
 ঈতের কাপড়, না পাখিল দিতে, মিঠাই খোকারে তার,
 কদালে জড়ায়, কাটাইবে ঈত, নাহি যে উপায় আর
 নৃতন জ্বেরত, তীষণ বুড়া, উঠিছাচ্ছে ঘরে ঘরে।
 নিত্যায়ের গৃহে পশিচা দেখে, খোকারে আপলি ঘরে।
 জ্বের অস্তেতন, জ্বেরা মাঝে, কোথা দেখে কদাল খুঁজে।
 কানে তুলে দিলে, ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তবু তাহা নাহি বুঝে।
 বাছিল খোকার, ছাপি ও কাগা, আশ্বাসে ছুটোছুটি,
 ঘোনের ঘরের মাপিত রতন, ডাকতে লইল লুট।
 দূত বহুখানি পৌত করিলে, পিতার অস্ত্র করে
 কদালে জড়াতে, পুস্তকের মত, রাখিল সমাধি-পথে
 কত কঠে, কহিল নিঃশি, "এতদিন খুন্ খুন্
 আশ্বাস লভ, খেলে গেল মোহ, লাভ হইল বুঝ,
 শুভ জনমের, প্রায় উপহার, সুনিব দিলেন মোরে
 মরণের স্বপ্নমল্ল দিনে আর তাহা দিলু তোরে।
 গের নির্মল, সোনার পুতলি, গের জীবনের আলো
 দিবসের রৌদ্র, রাতের ছোছনা, সকলি করিলি কাণো।
 নন্দনে কোন্ নব পারিজাত, স্তব্ধে পড়েছে স্বপ্ন।
 তাই কি দেখতা ছেন করিল, আপন সুখার তরে।
 নাশিতে বৈজ্ঞ, করিতে বস্ত্র, যে কোলে লইল টানি
 সে যে মহাখো দেখাস্ তাচারে, ঘোনের কদালখানি।"

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-প্রতিভা

[পূর্ক প্রকাশিতের পর]

(ঐকাক্ষে মিত্র এম এ, বি এল,)

এক্ষণে অপরূপের চরিত্রের আলোচনা করিব।
 পূর্বে য একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল বলিয়া যনে
 করি। রূপট, ম বিজ্ঞের চরিত্রহীন আলোকে
 পুত্র ছলাপটাবের বৈশিষ্ট্যবান দেখিয়া বাতকিই
 স্থগা হয়। নাটকের পথ অংশ তির দেখানোই

দুগাণ্টাবকে দেখিতে পাই, সেই খানেই গিরিশ-
 চন্দ্রের অক্ষমতার পরিচয় পাই। এই চরিত্র
 প্রবণনের মত প্রতীক নাটকের গাভীরা নষ্ট করিয়া
 দিয়াছে। প্রত্যেকের স্বই করিতে গিরিশচন্দ্র কৃত-
 কার্য হন নাই। এই অপরূপ চরিত্র স্বইতে নাট-

কের সৌন্দর্য কিছুমাত্র বর্ধিত হয় নাই। কাষেহর ঘরের ছেলে পিতার সন্মুখে এমন কথাবার্তা করিতে যে পাতে, সে ধারণাও আশঙ্ক্য করিতে পারি না। তারপর জোবী আর একটা অব্যক্ত চরিত্র। আলোচ্য নাটকের চরিত্র স্মরণে জোবীর চরিত্র কিছুদূর সহায়তা করে না। পানগুলি জোবীর মুখে দিয়া গিরিশচন্দ্র গীত-শ্রবণ-শ্রবণ বাসানীর কর্ণভূমির পরিচয় করবার সহায়তা করিয়াছেন যাহ। নাটক-খানিতে আদৌ পান না থাকিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না। অবশ্য নাটকের কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না না, কলেকের অধিকাংশের পোষ হইত হইত। তদ্ব্যতিরিক্ত একবার না কি বলিয়াছেন, তাহা হইলে জোবীর দলের অভাব হইত। জোবীর সর্বত্র প্রভাবিত ছিল। যখন যেখানে আবশ্যক সেইখানেই জোবীকে দেখিতে পাওয়া যায়। হই এক বুলে কল্যাণেশ্বরী গিরিশচন্দ্র জোবীকে আত্মবিকভাবে লইয়া আসিয়াছেন সত্য, অপর বুলে আত্মবিক উপায়ে তাহাকে উপস্থিত করাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলন প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃষ্টান্তে বলনাব ও পরবর্তীতে যখন কিংবদন্তীর মূলমন্ত্রের তব লইয়া কথোপকথন করিতেছেন তখন, সেখানে জোবী এসে কথিরা তাহাদের একটা ছবি তাহাদের সন্মুখে বসিয়া দিয়া বলে,—‘যেহেতু বে বিবেকিসু ? কই কীংবদন্তি নি,—কীংবদন্তি নি ? কীংবদ-কীংবদ ?’ তারপর প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃষ্টান্তে বোধিতমোহনের অতঃপরে বহু কিংবদন্তীর সহিত তাহাকে কথোপকথন করিতে শুনি—‘নার নিকট পলায়ন করিতে উপবেশন হিতে ও শুনি—‘তবু তাহাই নয়—তাহাকে পান রাখিতে শুনি—

‘খা নো কনে আঁকি কিলে,

খাণিতে না হয় জাপ দকী।

কিনতে অন্যর ক’নের খাতকী ? ইত্যাদি’

বিবাহিত বধুর নিকট একপ্রকারে বিহনে বেধা সাক্ষ্য হওয়া সত্বেও নয়, তাহার উপর পান

পাওয়া। কিংবদন্তীর খাতকী আসিয়া তাহাকে বহু করিয়া বিলেপ সে আর একটা পান না রাখিয়া চলিয়া গেল না—‘মানী এই :—

‘খাণা খুটে পা টিপে তার ঘন পানি নাকি,

কি, তা খুনি রাখবে না কি কোন বস্ত্রবানী,

জন্মেছিল তুই সখার বালাই,

মরে পড় হতজাতি’

জোবীর চরিত্রে অল্প আত্মবিক হয় নাই, সে যে পাপল একঘটা কবির বসিয়া না বিলেপ সহরে খরিতে পড়া যায় না। বহু বহু সন্তুষ্টবিরোধ এ চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া একটু যে সোণ-ঘোপে পড়িয়েন, নিঃশব্দে বসিতে পারি তাহা। এটা ও প্রতীক-মনোবীরের লক্ষণের সহিত বিশদিত জোবীকে পান গুলি বলিবার উপায় নাই। দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃষ্টান্তে রক্তাঙ্ক ইন্দুস্পর্শের ও জোবির কথোপকথনটা ভাল হয় নাই। জোবী ইন্দুস্পর্শের বাহুর বাড়ীতে যখন যায়, তখন কিংবদন্তীর খাতকীকে ছাড়িয়া দিবার কথাটা কলিকাতার প্রকৃত জাতের না বলিয়াই অজ্ঞান বলাইলেই ভাল হইত। দৃষ্টান্ত আর অধিক উদ্ধৃত্য করিবার প্রয়োজন দেখি না। পরঃসংকাতের জোবী চরিত্র অত্যন্ত মধুর। প্রকৃত হিন্দু রমণীর জার দর্শন হবী। যদ্যপিও সে শ্রাবণের সহিত ভালবাসিত। তাহাকে বাগাইবার জন্য সে যাহা করিয়াছিল আত্মবিকই তাহা প্রাণ-প্রাণ-প্রাণ। রমানাথ যখন তাহাকে চুটি করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিল, তখন ঘুরার সহিত সে প্রস্তাব প্রস্তাব্যমান করিয়াছিল। তৎপরে যখন ‘বাছব-সমিতির’ সভ্যেরা জোবীর ঘর ভাঙিতে উত্তর হইয়াছিল, তখন জোবী সেখানে আসিয়া বলে ‘ভেলে না,—আবার ঘর। আমার সর্ব্ব্ব তখনে আছে।’ তৎপরে যখন সমিতির সভ্যেরা তাহার ঘর হইতে রমানাথকে বহিয়া বাহিরে আনিয়া, তখন জোবী কিশোরের ভিতর যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত্য

কবির মোত সাধন করিতে পারিলাম না।
কাহরতাবে জোবি অজুনর দিনর করিলা বলিল,—
'বাবু বাবু ওকে যেতো না—ওকে যেতো না!
আসি আবার বৎ ক'তো, তারপর ওকে যেতো!'

কিশোর। জোবি, এ কি? তুমি চোর
পাকিরে তাব? চোরের সঙ্গে স্কন্ধিত আগল কি?

জোবি। চোর কে? স্কন্ধিত আগল কি?
চোর নয় আমার জবর সর্ব্বক! চোর হোক,
ডাকাত হোক, পিশাচ হোক, ভাকল হোক,—
নাচীর জীবন সর্ব্বক, নাচীর বাসবাবু, নাচীর
প্রাণেশ্বর, নাচীর ইষ্টদেবতা! বাবু, আমি কুচরিত্রা
নই!

কিশোর। এ তোমার কে?

জোবি। আমার বাবো! বার বার আমি
উদ্ধাধিনী, বার বার আমি পাপদিনী, বার বার
আমি তিথ্যাদিনী, বার বার চরণ দেবা করিতে আমি
যাকুল্লা, বার বার মুক্তি আমার জবর আনন্দে, বার বার
বিবাহিনি ধ্যান করি, বার বার বর্ণনআমার পথপননে
বুঁধি, বার বার পেলে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রানী—
আমার সেই পরমনিধি! যেতো না—দীড়ন করে
না, সত্যি প্রাণ বৎ করে না!

কিশোর। তুমি কে?

জোবি। আমার বাপ এখনও জীবিত।
আমাদের দুইজনকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।
তাঁকে হিজাঙ্গা করে তিনি এর পায়ে অর্পণ
করেছেন কি না? আমার পাণ্ডুড়ী ত্যাগ
করেছেন। বাপ ত্যাগ করেছেন। আমি কবির
জন্তে হোয়ে বোরে কাক, বৎ কুকুরের ভায় ফিরি,
তাতে আমি ভিলমার ঘূষিত নই। আমার
স্বামীকে বেধতে পাই, এই আনন্দেই আমি বিবাহ-
নিধি উদ্ধত! এই আনন্দেই আমি বর্ণ সুখ ভোগ
করি! আমি ভিক্ষা করে খেয়ার বা কিছু পাই,
এই পাবনগ্নে অর্পণ করি। উনি আমার চেনেন না,
তিনি আমার স্পর্শ করেন না, উনি আমার স্থান

করেন, কিন্তু তাতে সত্যি কি এলো যেমো?
সত্যি তার জবরেশ্বরকে পুষা ক'রতে পারি, এই তার
হংগে! সত্যি এ হ'তে আর তাবনা কি?
তুমি দখায়, কীটপতঙ্গকেও দখা করে, আমার
প্রতি নির্দিষ্ট হতো না, আমার পতিভিক্ষা দাত,
প্রাণ ভিক্ষা দাত।

কিশোর। রমানাথ—রমানাথ! গোয়াধ
কি বল্বে, তুমি অত্যাচার—তুমি এ রকম পায়ে ঠেলে
যেবেছ? তুমি এগ, তোমার সত্য নাই। যা সত্য
করে না আমি তোমার সুখ চেয়ে তোমার
স্বামীকে হার্বনা করুণাম। আমি ওরে হিত কর-
বার চেষ্টা পাচো। হাথ হাথ, অত্যাচারে—এই
পথের পতিপত্নী দিল্লি! বরে, বরে এই গুরুত
নাচীর রত্নই সীতুন! এলো রমানাথ! যা আমি
মুচকর্মে বলছি তুমি দেখো!

হাথবতই সত্যি বোবির চিত্র মনোবদ, কিন্তু এই
চিত্র আলোচ্য নাটকে গিরিশচন্দ্র কিশোরীর
চিত্রেও ঠিকই এক ভাবেই ছুটাইয়া ছুঁয়াছেন।
সেই আপনাকে বকিত করিয়া দুর্জয় বাবো বোহি-
দেবের অরণ্যের সাহায্য করিয়াছে। সেও
আদর্শ রমণীর ভায় অক্লেপে বাবোর পত নির্গাভন
সহ করিয়াছে। তাই বসিতেছিলুম সত্যিবে
চিত্রের দিক হইতেও দেখিতে গেলে বসিতে সহ
এ চিত্রের পুনরাবৃত্তির কোনই প্রয়োজন ছিল না।

আলোচ্য নাটকে দেখানো আমরা বোবির
লাকাৎ পাই, দেখানোই তাহাকে দেখিতে পাই যে
একটা উদ্বেগ লইয়া উপস্থিত; শিশা বিহার জন্ত সে
বাক্স। নরনাচীর জাক-চকু উদ্ধাধিত করেই তাহার
কাঁধ, দুলালটানের চিত্রের পরিবর্তন দেখাও করি-
বার পর তাহার মুখে আমরা শুনি :—‘বাবু কি
কাজ আছে? না! বোকা ছুরিবেছে, ভিক্ষা
ছুরিবেছে, চোখের জগৎ ভিক্ষাছে! আর বোবি
কারণ জন্তে কিংবা না!’ তারপর সে নিরস্তিত
পীত পাবিল :—

‘কোথা যে বদুৎসন,
 দুহাশো মর কাহ কি আছে।
 একলা মারী রুটে নাহি,
 থাক্বে দিঃ তোয়ার কাছে।
 থাকেনা দিন, দিন পিঠাছে,
 মনে পাঁধা সব হয়েচে,
 চরম দিন আজ উষ্ম হয়েচে—

অনেকা করে আসে চম, পারদিনী রাখে পাছে।’
 কোঁটির কাহ দুহাইল সহ্য, কিন্তু কিশোরের
 মোদাশ্রক স্থিতি করিবার কথাটা ত ছিল না।
 আর একদলে পিঠিচক্র (ভূতীয় অত, ঘট পরি-
 ক্ষেপ) বেলমোরের পথে ভাড়ি বাইরা নীচ জাতিয়া
 জীমদের প্রবেশ করাইয়া ‘ভাড়ি গিয়ে তরা বধন
 ভারি’ পান্নী যে পাণ্ডবাইয়াছেন তারো’ আশে
 সন্ত হই যদি বসিয়া মনে হয়। ‘কীটোলা কেইনে
 সাধুয়ারি’ জানাইবার মত এই পানের
 অবতারনা ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্যই ত দেখিতে
 পাই না। ইহাতেও নাটকের পাভৌর্যের বিশেষ
 ছানি হইয়াছে বলিয়া অব্যাহত বিবাল।

কিশোরের চরিত্র পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে,
 তাহার ভাব পরম্পরকাতর প্রাণ, উচ্চশিক্ষিত যুগ
 দিগের আদর্শ হওয়া উচিত। ইহারই উচ্চ আদর্শে
 তরুণগণ হামলাস আপনার প্রব বৃত্তিতে পারিয়া
 ছিলেন। তাহার কথাতাই চল,—‘আমি মনে
 করুছ, মার কথা শুনে, তোমাদের সঙ্গে আসি
 ক’রে, বৃত্তি বাস্তবিকি দেখাচ্ছে। আমি বৃত্তে
 পারিনি যে, অদর্শ কল্পি। তুমি মাপ করলে।’
 ভাবিনী ও হামলাসের মিলন লক্ষ্য বাসিয়া উঠিল।
 লক্ষ্য-সমিতির সে একজন প্রাণ পাভা হইয়া
 গিয়া। তারই আদর্শ চরিত্র দেখিয়া বেঙ্গাল
 অর্ধপুত্র মোহিতমোহন আগার চরিত্রবান হইয়া
 উঠিলে পারিয়াছিল। তাহার মাতার মৃত সঙ্গীর
 ভাই চরিত্র বদান্যত, তাহাকে আপনার পত্নীকে
 বাহির করিয়া ‘নুতন মেয়ে আসুখ’ পাঠাইয়া দান-

চীয়েব যাপান বাড়িতে লইয়া বিলকপ অর্ধ প্রাপ্তি
 মোহন ভবি ভাবার সমক্ষে বহিরাছিল। মতলবট
 উভয়ের কথোপকথন হইতে বেশ বৃত্তি:ত পাঠা
 যায় :—

রমা। ‘তুমি মার ক’রে নিয়ে এসো, আমি
 যাপানে নিয়ে যাবো। তুমি পুঠিবে জানাবে যে
 মোর ক’রে তোমার মাপ নিয়ে গেছে, যাটা টাকা
 ছাড়তে পথ পায়ে না। তোমার গুণের ব্যাটার
 গালে চূনকালী পড়বে, ঘট বেরিয়েছে শুনে তোমা-
 রের একঘরে করবে, তোমার ছোট ভাইয়েরও লক্ষ্য
 তেমে যাবে।

মোহিত। তোমো মামা—মেমো মামা, বেশ
 মতলব মার করেছে। মন পাভার টাকার খাত
 ভাঙতে হবে,।

রমা। মন হাজার! পক্ষণ হাজার নিয়ে
 তবে ছাড়বে, কিন্তু মামা, তুমি শেবে না শেঙের।
 মোহিতের কিন্তু সন্দেহ হইতেছিল, সে বেটা তার
 সঙ্গে আসবে কি? তার চাল নাই চুলো নাই, যে
 মোদায়েই করে তার সঙ্গে সে আসবে কেন।
 তাই সে কথটা বিজ্ঞাপন করিল। উত্তরে রমানাথ
 বলিল,—‘তুমি সে মত তেমে।’, তুমি মের বাড়ী
 নিয়ে যেতে চাও, মের বাড়ী যাবে।’

মোহিত। তুমি কি করে জানে?

রমা। আচ্ছা, তোমার মেমো মামার মের
 দিন যেটা বুজো ম’রে পড়ে না? বেটা এক বছর
 তোমার, কোবি পাণ্ডী ম’লে এক বেটা আছে,
 যানোর সময় তার কাছে যেতো। আমি তার
 ঠেলে শুনি, সে তোমার এক মার মেমোর মত
 মের।

মোহিত। সত্যি নাকি, সত্যি?

তারপর কি ভাবে কাণ্ড হইবে তাহাও বিস্ত
 হইল। রমানাথ বলিল—‘রাগে দুমলে বেরিয়ে
 পড়বে। আমি মূলো ব্যাটারে ঠিক করে, পাভী
 নিয়ে একটু তফাতে থাকবে। আমি পাভীতে

তাকে নিয়ে বাগানে উঠেবা, আর তুমি এখানে
 বাগান খসে দেবে; বল, দাঁড়িয়ে দেখে' মতলব
 আটকা—তখনাথ চণ্ডিকা শ্রমে চরিত্র
 বলিল,—‘হেমা ব্যাটাকে মত কহেবা, পুণিলেও
 ব্যাটাকে দিগে দেবা। স্বস্তর ব্যাটাকে সুখের কাছে
 হাত নেড়ে বলবে, ‘কেমন বাবা’, যেরে ঘরে
 আটকে রাখে।’ টাকাটা একবার হাতে লাগলে
 হয়। পরামর্শ মত বোহিভোহন পক্ষা কিসকলকে
 পোপনে রাখে তাহার স্মৃতি দেখা করিবার মত
 মজ্জাবোধ করিল। ঘোষির হাতে পক্ষা
 লাগাইল। ঘোষি রাখে দেখা করিতে বাগন
 করিল। ‘হিনেও দেখা দেখা করিতে পরামর্শ
 বিল। কিসকল বুঝাইল অপমানিত স্বামী হিনের
 দেখে কি করিবা দেখা করিতে পারেন। ঘোষি
 কখন তাহার লগে থাকিতে চাহিল, তাহাতেও
 কিসকল রাজী হইল না, কারণ পক্ষে সিদ্ধি ছিল
 ‘সঙ্গে যেন কেহ না থাকে’ তাই ঘোষির উত্তরে
 কিসকল বলিল,—‘সে কি হয়? তিনি মানা করে
 ছেন। তাঁর মানা না শুনে তিনি রাগ কহেন,
 অভিমান ক’রে চলে যাবেন। আবার প্রাণ যে
 কি ক’রে তা তুমি জান না? মনে হচ্ছে, বুঝা
 কেন মত থাকে না, কেন রাজি হচ্ছে না? কতক
 তাঁর দেখা পাও।’ কোমি, জুনি আবার দেখা
 কহে মানা কহে। তুমি কিসকল হ’লে বামীর
 লগে দেখা কহে পুরে দেখাও, কিসকল কহে এনে
 স্বামীকে দাঁড়, স্বামীকে লগে কহা ক’রে স্বামী হাতে
 লাগে। তুমি তোমার, মন দিবে আবার মন কহে
 না? মানা ক’রে না আনি তা মানা শুনে না।
 তোমার মত যদি পথে পথে বেড়াতে হয়, যদি কিসকল
 ক’রে স্বামীকে দেখা কহে মত হয়, যদি স্বামী কিসে চান,
 তা হ’লে আমি জানাবি। তুমি আবার মত
 তাই দেখে। কি তাই দেখে? তুমি তোমার না, থাক।
 আবার স্বামীকে বলবে, আমি আনাপথ চেয়ে
 বিড়কী ঘোরে ঘাঘিরে দাঁড়িয়ে থাকেবা। এই

মত নিমিত্ত তাঁর আনিবে। যেন আমি নিমিত্ত
 না হয়, যেন তিনি আনিবে দেখা যেন।’ কহে,
 আমি তাঁর মানা কহে মত দেখে মানা। তিনি আনিবে
 লগে, ইতিমধ্যে, তিনি পথে না চলে।’

সুস্মৃতিমুখে মন নিমিত্ত মনীর বেসকল যেমন
 হারন করা হুগা, তেমনি প্রশাসন পতি বেসকল
 নিমিত্ত মননাভ্যাস চাপিত মনীর ও কহে
 বাগা হিতে পারে না।

উক্তে ঘোষি বলিয়ারিল,—‘জান্, তাই, যদি হুই
 আমার মত হ’তে পারিল, যদি মতল তাগ ক’হে
 পারিল, যদি মতল-মতল-মতল আনিবে হিতে পারিল,
 যদি তাগ মতল হুইতে পারিল, তা হ’লে মতল
 লুকে দেখা করিল। কিন্তু যদি মতল থাকে
 চান, লুকে মতল যদি মতল থাকে, যদি মতল
 মতল মতল কহে মতল, তা হ’লে রাখে দেখা
 করিলে। লুগান কহে মতল মতল, আমি লুকে
 পুরে দেখাই, অনেক মতল দেখে পাই; আমি
 দেখে লুগান কহে মতল মতল মতল; আমি
 যদি আবার মতল হ’তে মতল মতল না থাকে মতল
 দেখা করিল।’

গীত ।

কলক বাহা মতল যদি, কোমল প্রাণে মতল মতল,

লুগান-প্রাণে তাই মতল

মতল থাকে মতল মতল মতল

অতল মতল ক’রে,

মতল মতল মতল ক’রে,

মতল মতল মতল মতল,

আপন মতল মতল মতল

প্রাণে যে মতল মতল,

মতল মতল মতল মতল,

মতল মতল মতল মতল

সমান মতল মতল মতল

কবিবর ঘোষির মুখে যে মতল মতল মতল
 দিয়েছেন, তাহা মতল মতল মতল মতল

‘মুক্তনো কাক ডাল নয়’। দুপা-পাখা-প্রহ বিলম্বিত
ক’রে না পারিলে, কলকতঃ বাখার যদি না করিতে
পারিলে মোকশফনার উপহাস্যল্লহ হইবার ত্র না
হইলে, আপনঃ-ডাল না হইলে, প্রেতাল্পবেহ
সুহিত মিলিত হইবার উপায় নাই। যৎকত প্রেত
না হইলে,—সেই ব্যান আম না হইলে, পোপন
কাক করিবার হুঃসংলগত কাহার হইতে পারে
না।

কিরণময়ীরা প্রাণ ধ্বংস বিলম্বের আশা—
পতিদেবতার চরণ ধর্শন মানলে—২৩ হইরাছিল,
তখন কোবির নিষেধ বাগা তাঁর মনে স্থানই
পাইল না। চূড়ক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে,
লৌহপিণ্ডা যেমন পৃথককে আকর্ষণ করে, তেঁাহঁরের
অন্যানিও কিরণময়ীকেও সেইরূপ করিয়াছিল।
কোবিতের অস্বাস্ত কিরণ সোপানে তাহার সঞ্চিত
মেঘা কসিয়া, বাড়ীতে যে আকস্মিক বিপদ হইয়াছে
জাহার করা জানাইল। জানাইল তার তরীপতি
মাতা সিঁধ্যা কে, মা-আছাড় খেয়ে সমস্ত দিন পড়ে
আছেন, সুখে একটু জল পর্ষাও নহে নি। এ অবস্থায়
সকাতরে অঙ্গুরোধ করিল। আর না সিঁধ্যা কাল যাই
বার জন্য তাড়াত্যে অঙ্গুরোধ করিল, কিন্তু এই তাঁর
সমস্ত অঙ্গুরোধ তাহার মনে কোনরূপ চিহ্ন অর্জিত
করিতে পারিল না। সে ত প্রেমের মন্ত তাড়াত্যে সহ্য
হাঁইতেছে না—আজ লইয়া যাইতে না পারিলে
তাঁহার যে সমস্ত উদ্বেগ বার্ষ হইয়া যাইবে, তাই
সে তাঁদের সঞ্চিত বলিল,—‘আজ যাও ত চণ—
নইলে তুমি লাক্ বাড়ী চলে যাক, আশ্রিত ঘরের
ছলে ঘরে চলে যাই’ কিরণময়ী কিং কর্তব্য
বিস্মৃত হইয়া পড়িল। একবিকে বাড়ীতে বিপদ,
অন্যবিকে পতিদেবতার বিরোধ তাহান। একবিকে
পূর্ববাতিসী মাতার জল্পনা, অন্যবিকে স্বামীর মেঘা
কসিবার অবিফল পাইবার আশা। এই দুয়ের
জন্মে সে স্বামীর মেঘাকেই বরণ করিয়া লইল,
জাহার সঞ্চিত হাঁইতে সীতুত হইল; এবং

বলিল,—‘তুমি রাগ ক’রো না—রাগ ক’রো না।
তুমি যেখানে গিয়ে থাকবে, আমি সেইখানেই থাকি।’

যোহিত। যেখান নিবে যাওে কি ? তোকে
বাগানে কী, হোদায় বাগান চোকপুত্র এখন যুগান
যেবে নাই। আর জড়োয়া গমনার জেবায় মুক্ত
কাজেও।

কিছু। তুমি পাত্ত তলার নিচে খেল, আমি
পাত্ততলার বাঁকুবে। আমি শিতলের গহনা খুলে
অড়োয়া গহনা পত্তে চাই না;—আমি তোমার
চাই, তোমার পেচা বসুধা—এই আমার জীবনে
থান আন। তুমি পায়ে অধোবা বিল আমি
তাম্রাণী হ'তে চাই না।'

ব্যর্থবিত্তার ধ্বংসের লালসা দেখিতে অত্যন্ত
 ঘোহিত প্রবেশের সম্মান পাইবে কোথা হইতে?
 নতী কিরণবদীর অনাবাহিত পূর্ণি প্রবেশের
 বহিরা সে বৃষ্টিতে পারিল না; তাহার মনে
 হইতেছিল কতকণে সে দুর্গমের বাগানবাড়ীতে
 তাহারকে লইয়া যাইতে পারিবে। কিরণ প্রবেশ
 পাকৌর্য একাকী চকিতে হানী হইতেছিল
 না, তাহারকে একবার নিপাকী করিতে অশ্রু:স্রাব
 করিল, ঘোহিত বহান্নাথ যাহাকে সঙ্গে যাইতে
 বলিয়া চণিগা খেল। কিরণ এখন তাহার সহিত
 যাইতে কিছুতেই ভ্রাম্যে হইল না, বসন্তুগা গিরিহীন
 প্রাণ এখন সে সজ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল,—না,
 আমি কখনো উঠি না, আমার স্বামীর সঙ্গে
 নইলে আমি কখনো যাবো না,—আমি বাড়ী
 চলে যাই' তখন অমৃত্য। ঘোহিতকে পুনঃস্বা
 মনঃস্বপ্নে আসিতে হইল। জোবার ঘোহিত
 তাহারকে বলিল,—'ভবে যে বেটী। আমি তোমার
 পাখীর সঙ্গে গৌরী, আর আমারের মতলব বাড়ী
 যাক্। উঠি ত বঠ্ রেবে। হাদার সঙ্গে চ'লে
 যা।'

কিয়ং তেবোদুস্ত হয়ে বলিল—‘হুঁহি না। গকে
গেলে ঘাঘো না’ ।

শ্রেয়সময়ী রমণীর কোমলতা ও দৃঢ়তার দুঃসং-
সন্ধিগন যেখান বাতবিকই মুক্ত হইতে হয়—এখন
ইচ্ছা-সমুদ্র ত্রিঃ উপভোগ্যে সা ত্রিঃ। বাতবিতার
শ্রেয়সক বর্ধনোত্তী পিতাঃ যোতি এ দৃঢ়
উপভোগ্য করিতে পালি না। রাগো মাধার পে
দকল কথাই বলিয়া কেলিগ। তখন উভয়ের মনো
নিঃসিখিত কথাবার্তা হইল :—

কিরণ। তুমি না—কে বলে আমি যাগো না।

যোহিত। বটে—ভাকানো! তাল চোত
চুপি চুপি পাকিতে ওঠ, নইলে তোমার মুখ দেখে
না।

কিরণ। না না, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি দকে
এলো।

যোহিত। ও, হল দেখ না! তোমার দকে
দিয়ে কলোত-কলোতের মত মুখে মুখ দিয়ে
খাঙ্কো, তাই তোমার আর ক'রে এনেছি নর?
নাও পাকিতে ওঠো।

কিরণ। না—না—তুমি না পেলে থাকো না।

যোহিত। ও, অত ইয়ারকিতে আর কাজ
নেই প্রাণ। মনে করছে ব্রি, বর-বরকরা ক'বে,
আমার গিরি হ'বে? তা মনের কোণের ঠাই
দিয়ে না।

কথটা কিরণের কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল
না—ভাল করিয়া কথাটার অর্থও বোধ হয় সে
বুঝিতে পারিতেছিল না। তাই সে বলিল,—
'বলো-বলো, কি বল্ছিলে বলো। আমার নিজে
যর ক'বে না ত, তবে আমার কেন নিয়ে এলে?'
যোহিত। কেন নিয়ে এলাম—জবুং?

রমানাথ তখন জনান্তিকে তাহাকে বলিল,
'জারে চুপ—চুপ করো!'

যোহিত। চুপ করো কি, কিরণের জর?
একটা মেয়েমানুষকে জর করতে হবে। Damn it!
তবে শে.নো, টাকার বাক্যর। তুলো ব্যাটার
কাছ থেকে টাকা আদ'র ক'তে হবে। তুমি

কেন্দ্রা—মুদ্রণ বেরিয়ে এসে, এই বলে রূপাল
বাক্যে রে.মা বা.মা আর কানী ষট মৃত্যুবেছে।
এমিকে এটা তোমার বাগানে তুলে, আমি আমার
বর দেখে যে, আমার মন বোর ক'রে বাগানে
নিজে তুলেছে। তুমি হ'লেই টাকার বাক্যে পথ
পায়ে না। মুক্তগে। সাত চলে চলে তবে গেলেক
টিপেছি।

বিনা মেয়ে রমানাথ হইলে পণ্ডিত যেমন আর
হইয়া পড়ে, কিরণেরও ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়িল;
কিন্তু দৃঢ়তা যথোপযুক্ত বলায়ান তখন সে তার
দূর করিয়া বলিল,—'কি, কি বলো? বল—
বিখ্যাকথা বলো!' যদি সত্য হয়, তবু বল—
বিখ্যাকথা বলো। আমার জবুং—ইউরোপের
পথপাথে তেছে দিয়ে না। 'বলো—বিখ্যাকথা
বলো—তোমার প্রতিজ্ঞার কথা না হয়; যেমন
তোমার ঘানে ছিলাম, সেই ঘানে যেন থাকে
পারি; বলো—বলো—বিখ্যাকথা বলো!' এ
শ্রেয়সক তাহদের নিজস্ব। এ আশ্রিত কিরণের
বা তোমার চিত্র নয়—এ চিত্র লেখানিহিত—
পুণ্ডিত্যের উপাসকের। উপাসকের প্রতি
প্রাণত্যাগ আশ্রিতবেরের চিত্র। এই আশ্রিত
অশ্রু প্রাপ্ত হইলে, সবচে পণ্ডিত্যের সবচে
হইতে সমুদ্র হইবে। তোমারি.মাসী'যোহিত এ

যানের সার্থকতা বুঝি না—উপাসকের প্রাণের
সড়া পাইল না। জবুংর তরীতি.তার
ছিন্ন না হইয়া থাকিলে পথের বরফপে
তাহারা আপনি ব.বিয়া উঠি. নরকের
কীট মোহিত জবুং. বসিকতা করিয়া
বলিল,—'বাহবা—বাহবা! বেড়ে গেছো আর
বিমুখো।' তারপর তাহার জুকের মতো
পর্যাপ্ত মত যখন দীরে আসিয়া কিরণের মুখে কাপড়
বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হইতে যেন তখন, কিরণের
তাহাকে লাগাইয়া বলিলেন,—'বাহবা, আমার
অশ্রু প্রাপ্ত করে না।' দকলে দিলিয়া যখন কিরণ

মজীর ঘুবে কপেড় বন্ধন করিলে, তখন কিরণময়ী
আপনপ চোখা করিয়া চলনমত ঘুর হইতে বন্ধন
কর উপোসন করিয়া চৌৎকার করিয়া বলিল,—
হুকা বহো—হুকা বহো !'

সে কাতর আবেগে তখনকারে চরণে থিরা
শৌধহাইল, হৃৎকণ্ঠে বন্ধনপের লিখিত কিশোর
সেখানে আনিয়া উপস্থিত হইয়া সকলকে বাঁধিয়া
কেনিল। মোহিত তখন বলিল, 'কি কিশোরবাবু,
আমার স্ত্রী আনি নিজে বাড়ি, তোমার তা'তে কি ?'

কিশোর ব্যাঙ্গাধারনা জানিতে চাহিলে
কিশরময়ী তাহাকে বলিয়া উঠিল,—'বিশ্ববাবু,
কিশোরবাবু, আমার হুকা কখন। আমার ঘাসী
ঘর বহুখা। এ'লে আমার বাড়ী থেকে নিজে
এসেনে। এ'টা কোর করে আমার হুসালাবু
বাধানে নিজে আসেন।

মোহিত। কি, কিথাকথা।

কিশোর। কি কিথাকথা—মোহিতবাবু ?

মোহিত। আমি আমার স্ত্রী বাড়ী নিজে বাড়ি।

কিশোর। কুৎসিত, বেশবোয়ের বিকে।

মোহিত বাবু, আপনাকে যে জানোয়ার বলে,
জানোয়ারকে পালপাল দেখা হয়। আপনাকে
স্রোকে কলকে বেহার মতে জুটিয়ে
নিজে এসেনে। অন্যকে বেহার মতে কোর করে
পাকীতে তুলছেন ? একথা মোককে বলতে গেলে
মোকের কাছে বিখ্যাতী হতে হয়। কারও ঘরে
জন্মগ্রহণ করে আপনার এই আচর। অতিথানে
আপনার বিশেষণ নাই।

মোহিত। কি, কি হয়েছে ? আমার পরি-
বার নিয়ে বাড়ি। আমি তোমাদের নামে ন্যূনি
হইবো।

কিশোর। ন্যূনি, সেখাত্ত, যদি তুমি এই
মাকী ঘাসী না হ'তে। এই মহাবন বেটারের
আমি হুক নিতুম। কি বলছে, তোমার দস্তবিলে
তোমার পাকী স্ত্রী বাধা পাবে।

কিশোর উচ্চ সাধন করিয়া কিশোর তাহাকে
তাহার বাগের বাড়ীতে রাখিয়া আনি।

এইবার মাঝরা বোহিতের চিত্তের পরিবর্তনের
কাহিনীটুকু আগোতনা করিয়া। একদিন, হঠাৎ
সে গর্হিতঃ ঘুর আনিয়া অবাচিতভাবে কিশোর
বাবু নিকট অতীত জীবনের কাহিনী বিবৃত করিল।
আপনার বোধ লকল কিছুমাত্র পোশে না করিয়া
যখন অসুস্থিত চিত্তে বলিয়া যাঁতেছিল, তখন তাহার
মনে নির্জের আনিয়াছে। সুস্থিত পারিয়া
কিশোর বাবু তাহাকে বলিলেন, 'বাবু ও'ন
কথা ছেড়ে দিন।' তিনি ছাতিয়া দিতে বলিলে
সে ছাড়িতে পারিল না। অসুস্থতাপানে তাহার
জনন ও'জরিত। আগে লকল কথা খুলি না
বলিলে তাহার চিত্ত হইতেছে না, তাই সে উত্তর
বলিল,—'না না, লকলে বলছি তখন। বহিষার
পথ চুরি করে; হেল হয়। বটা অচ্যাপ ছিল
না; মেলে সাংঘাতিক ব্যাধি বে লড়ি। মে'র
ডাকার বাবু—কীর্তি সুখে পরিচয় পাই, তিনি
আপনার একজন বন্ধু—আমার অনেক বোম্বোতেন।
আমার স্ত্রী খাতিরে আমার প্রতি যেনে বাধা
করুন। আমার স্ত্রী কণের কণার কণে
জন্মে। তাৎহেন, তাতে আমার মন নর
হয়েছে—না। মেন থেকে বেরিয়েই প্রথম
তাবলেন যে কোন রকমে স্ত্রী সুখে আবার
আলাপ করে যদি পারিলে কিছু আমার কু-
পারি।'

কিশোর। মেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী পেলেন
না ?

মোহিত। বাড়ী কোথায় ? আমার অনেক
উপচা বাবু প'তে, আর অর্ধেক অংশ মৃত
মেনার মিকী হ'য়ে গেছে। এর আগেই না আমার
বাড়ী যেতে দিতেন না। না'র চুচী কয়েই চো-
বিখ্যা পিকা হগো কি না ?

কিশোর। তার পর—তার পর ?

মোহিত। গ্রীষ্মকালে সাধারণ বস্ত্রশ্রম, পাগলী
জোনি দেখা করিয়ে দিলে। বস্ত্রশ্রম, চুড়ীর মাথায়
কিছু নাই। তবে—গ্রীষ্মকালে উপবাস গিয়া
আমার আর বিতো, তাই আমার কষ্টতম, আর
পাঁচ বকম বাখার কিছুই ন। আর মাংস দুই বসো,
আমার গ্ৰীষ্মকালে কষ্টে তাত এনে দিলে, কিন্তু
আগনি মুজ্জিত হ'য়ে পড়ে গেল। ঘোষির ঠেকে
গুণগুণ, সে অনবধায়ে থেকে আমার খাওয়ায়। এত
দিনে গ্রীষ্মকালে ক'রে দেখি নি; যে গিন মুজ্জিত
ঘাট, দেখিন যেমলু। সে আমার যোগ আপনায়
কাছে আসতে বলতো, আমি ত বৈশ্ব নই যে, গ্রীষ্ম
উপবেশ নেব। কিন্তু কি কানেন, সেইদিন থেকে
মনটা যেন আর এক রকম হয়েছে; আর গ্রীষ্ম
মুখের তাত খেতে খেতে ন। বসিবেখরে লম্বাক্ষে
খেতেম। যোগ দিত না, হাত পেতে ভিলে
কষ্টে পারতেন না, হ'এক দিন উপবাসও যেত।
দক্ষিণীতে প'ড়ে থাকতেন; প'ড়ে কত কি
মনে হ'তো। মনে হ'লো, আপনায় কাছে যাই,
তাই এগেছি।

কিশোর। ভাল করেছেন, শোষণান, আপনায়
কাজকর্ম ক'রে যেন। আপনি সান টান ক'রে
যায়েন আসুন।

মোহিত। কিশোর বাবু, কাজকর্ম এখনই যেন,
আমায় উপযুক্ত কাজ যেন। আমি সমিতি ক'ট
যেব, আপনায়ের পাথের ধূসো পাথে লেগে যাই
আমায় মতি করে। এখনো আমার নিজেকে
নিজের খিঁচান নাই। আমি দেখবো আমার অভি-
মান সিদ্ধিছে কিনা, পরিচয়ের আর খেতে পারি
কি না, লতা শোষণাতে পারবো কি না।

একপাশে কাছ নিবেশন করা বড় লজ্জা কথা
নয়। অসুস্থতাপালে বড় হইয়া বাক্যের স্বাভাবিক
মতি ঘুণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অভিমানে হাত হইতে
সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে কি না, তাহা
ভিক সে জানে না—তাই তাহার মূখে আমায় জানিতে।

পাই এখার নিরেক্ষে নিরেক্ষ বিধান নাই। আপ-
নায় উপর খিঁচান থাকে যে কতক পরিমাণে তাহা
স্বাভাবিকতার করি ন; কিন্তু অতিরিক্ত হাজার
খিঁচান থাকিলে অস্বাভাবিকতার সত্তার ভিত্তি হারানকে
আবদ্ধ করিয়া রাখে একবার লতা।

আমোদ্য নাটকে চরিত্র কায়ীর পরিবর্তন কবি-
বর জ্ঞানভায়ে কলাকুপনীর ভাষা করিয়াছেন।
পতি-পত্নীর ভিতর বিরোধ ঘুটিয়া বিনয় দেখিতে
সকলেই ব্যস্ত।

কিশোরীর চরিত্র পূর্বেই একরূপ আমোচিত
হইয়াছে। মোহিতের কথা শুনিয়া বুঝা যায়
কিশোরী বৌ। যে স্ত্রী চরিত্র মোহিত আপ-
নায় বিবাহিতা রূপকর্তীকে অর্ধের লোভে অস্ত্রের
বাগানে তুলিয়া দিয়া তাহার মাথায় চিরকালের জন্য
কলঙ্ক পড়িয়া তুলিয়া দিতে পারে, সেই বিবাহিতা
নারী, রমণী আপনায় মুখের গ্রান ত্যাগ করিয়া
কিশোরীর আনন্দে বেঞ্চীর বিতে পারিয়াছিল—তিলে
তিলে আপনাকে বিক্রি করিয়া মুদ্রায় মূখ্য সাম্রাজ্য
অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। প্রেবের বলে প্রেবের
লজ্জা-মান ভয় বিদর্ভন দিয়া গোপনে পতি বৈবাহিক
প্রাপ্তকার চক্র আর নিবেশন করিয়া আগন্ত।
আত্মাভিমান থাকিলে দাম্পত্য প্রেম ক'ট করিতে
পারে না। আপনায় কথা থাকিলে প্রেম কাজ
করিতে পারে অসম্ভব। একবার প্রোচরিত হইয়াও
পুনরায় দাম্পত্যিক সেই কাজ করিতে অগ্রসর হয়।
প্রেমবার স্বামী সঙ্গিত মিলনের আশা, স্বস্তি
করবার আশার কণামাখী ছুটিয়াছিল, আর এখার
ছুটিয়াছিল বৈবাহিক প্রাপ্ত রক্ষা-স্বস্তির স্বার্থ নিবেশন
করিবার জন্য।

যজ্ঞ বস রমণী। এ উক্ত আদর্শ হইতে তোমা-
দিককে যেন কখনও অস্ত্রপথে চলিতে না। ঘেঁষি
তুমি ত পতির কেবলমাত্র নগ্নতা নয়—তুমি
মুখ্যতঃ পতির সাধনী ত নয়; তুমি পতি-সাধনা—
লক্ষ্য। এইরূপে বস রমণী ঘোষাবের প্রজ্ঞা স্বামী-
বিশ্বকে সুখের আনিয়া ভীষন যুদ্ধের কর। পাত্যাত্ত
একবারে বস রমণী আদর্শ দেখাইয়া দেন। প্র-
ভের নারী-সমস্তা লম্বাক্ষের লম্বাক্ষ হয়।

(ক্রমশঃ)

সঙ্ক্‌য়ার

(জীবনাবলম্ব যোযাণ)

অনন্ত আঁধার ব্যস্ত দাঁড়াইয়া আঁধি আল
 সন্ধ্যা-কিনারায়া,
 নিবৃত্ত পত্নীও দ্বিত সন্ধ্যের সিন্ধুনীও
 বীরে বহে বহে
 বীরে বীরে নেমে আসে আঁধারে পুঁথিবাণে,
 নিশার অকুল,
 নিবৃত্ত তারকাকুল কোন্‌ হুতপত হুত
 গাঢ়ি'হে বিজ্ঞান !
 কোন্‌ স্থান বেধনাক জ্বলি যোঁ জঃ' ব্যা
 কুহেলি স্মৃতিবারে !
 জাবিলা না পাই তার, কি বেন হারিয়ে ব্যা
 খুঁজিতেছি তারে ।
 নীরব নিশাৎ যোযা নিশাৎ তারকা
 লক্ষ কোন্‌ নাই,
 অণু, পরমাণু আর লগত বিশালকার
 প্রশান্ত সবাই ;
 লকলি শান্তিতে ভরা, শান্তি ব্যানবতী বরা,
 গায়ে চারি পাশে
 শান্তির প্রশান্ত হুত বিব্রাণে কিং' হুত
 হেদি' তারে জাঃ ।
 কোথা' সেই সৌম্য শান্তি বিমল জ্বলিৎ কান্তি
 অন্তরে আঁধার ।
 হুত নিশার আল, আঁধার মানস ব্যা
 কোথা' বাসি তার ।
 তাড়ত কুহেলি দ্বারা অস্ত্রে শ্রুতির কায়া
 বীরে তেলে ব্যা,

বাঁধিয়া অন্তরালে কত বাঁধি কাঁধা চ'লে
 কে পুঁথিবে তাদ,
 আল এই অন্তরালে দ্বিত বত পুঁথিবাণে
 গাঁধিয়া গাঁধিয়া
 মিলন বিয়োগদহ নাটকের অতিবহ
 জুঁলিছে গড়িয়া ।
 কোথা' চলেছি ব্যা লক্ষ্যহারা উভঃ প্রাণ
 পুণ্যনেতে ভেঙ্গে,
 কোন্‌ সেই আকর্ষণে এইরূপ শক্তিকণে
 জ্বলিৎ তাবলে,
 যে ব্যা আঁধার পাত অনুভব পাঠাবার
 উল্লেখে দ্বাই,
 দ্বিত সৌম্যমিত্রী বিতা আঁধারে বিবল দ্বিত
 শোক ভাপ দ্বাই ।
 কে গো জুঁলি বর কান্তি — দ্বিত্বিত্তী বহাশক্তি
 বসি' নীলিনার
 একই মধুর তানে বাঁধিয়াছি বিশ্বপাণে
 নীরব ভাবার ?
 সেই অমধুর ছন্দে স্থান কান্তি বহরনে
 দুটাও বিমল—
 বৃত্ত-ব্যয়ে এই আল বৃত্ত-হে আঁধা । ব্যা
 ব্যাচি গো কেবল,
 বিওনা বিওনা ফেলে হুত ভরে অবেধনে
 এ সৌর প্রাণন,
 মনের মন্দির শীর্ষে আগাও অতুল হয়ে
 অনন্ত কেতন ।

য;

(চিত্র)

[উইলিঙ্গা বেণী]

সম্মানিত ভাষার কারণে ওড়নার সমস্ত মেয়ে
অবুজ কথিয়া দোরে দোরে পৃথিবীর তালিত বকের
উপর নামিয়া আসিতেছিল, সত্য মৰ্ম্মস্পর্শী বহু।

সমস্ত দিন অগাধ স্রমে পুণিনী সূর্য্যোদয়েত জায়
পরিহারিল। বৃষ্টি সমীরণেও অল্প মধুর পরশে শিরিষা
উত্তীর্ণা পুণিনী দেখে অগাধ মৌল আকাশের বিকে।
চাছিল ককে অসম্পূর্ণ কলসী এইখা একটী রমণী
দোরে দোরে একটী পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা
হাত ধরিয়া নিম্নতর গ্রাম্যপথে গৃহের বিকে
অগ্রসর হইতে ছিলেন, কলসী হইতে ‘হলাব ছলখ’
কথিয়া কল মেলার বকে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার
মিত্র অকস্মৎ আরও মিত্র করিয়া তুলিতেছিল।

যাত্রী আনিয়া রমণী রজন-গৃহের দ্বারদ্বার কলসী
নাড়াইয়া বালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া করিলেন
“নাতি, আমার কাপড় বান্না এসে বেত মা।”

নাতিজী তাহার ছোট কাপো বেণীজী নাচাইতে
নাচাইতে ছুটিয়া খেল এবং অল্পকণ পরেই একখানি
শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দাঁতার দোরে বিল।

মনোরমা মিত্র বস্ত্রখানি ছাড়িয়া কজার বিকে
কথিয়া করিলেন “না’ব, জুঁরি খতে গিয়ে পড়া
করলে, শেষে উনি পড়া নেবেন।”

(২)

শিবপদ দত্ত গ্রামের পুণ্ড ৩০ টাঙ্গা মাহিনার
ঘাটীয়া করেন। বটীতে তাঁহার প্রী মনোরমা ও
কজা মাহিনী ঘাটীত অল্প কয়েকই ছিল না। সুতরাং
এই অল্প বেলায় এই ক্ষুদ্র পরিবারটির বিন খেল
আনন্দেও কাটিয়া গাইত।

মাহিনী পিতা ঘাটার একদিকে গড়ান। প্রত্যয়

মাহারপ পুত্র অপরূপ বেণী আনয় সে পাইত।
গ্রাম সম্প্রদায় ‘বিবিন’, ‘বুড়িমা’, ‘বেণীমা’,
ইত্যাদি অনেক বিভাজ্যিকের দল আনিয়া
মনোরমাকে অনেক কথিয়া বুড়াইগন জেটা
করিতেন যে, এখন, কথিয়া কজার ইচ্ছা
পরকাশ নষ্ট করা মনুচিত, এমন আরও যেত
কোনওতই দৃষ্টিগত মতে, গ্রাম তবিশেষে যেন
আর কখনও যেত না হয়। ‘কিন্তু পলকই বুঝ’,
এই ক্ষুদ্রাঙ্গা নারী কোর কবাই কাপে তুলিতেন
না। বৈশিষ্ট্যক দেখিয়া বিভাজ্যিকের দল পরিয়া
পড়িতেন।

মহারপ অকস্মৎ তখন নিবিড় ভাবে বিবরণ
বাপ্ত হইয়া যিচ্ছো। যের যের জীবনযুদ্ধের
মধ্যমিনেতে সমস্ত পল্লীবাসি সুখরিত হইয়া উঠিয়া-
উঠিল। মনোরমা জলদী তলার প্রণব করিয়া উঠিয়া
গড়াইলেন। এতবার অকস্মৎকর যথো চতুর্দিক
মিরিষণ করিয়া দীর্ঘপরবিক্রমে যামের ককে প্রাণ
করিলেন।

শিবপদ তখন প্রাক্ষণবে তিবিঃছুর মল্লীপথে
বিকে অকস্মৎকরিত চাইয়া বর্ণিচ্ছো।

মাহারপ হুড়ে হাত দিয়া মনোরমা করিলেন “এত
তলার হয়ে কি ভাববো?”

শিবপদ হাশিয়া “তোমার কল” বলিয়া ক্রীকে
বাহু বেঁটেনে বাঁধিয়া কেনিলেন। মনোরমা নিরন্তর
যামের বাহু হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার পরতলে
বলিয়া গড়িলেন। অধিবশেই মাহিনীর পড়া মূগুর
ক্রম কতবার মনোরমাকে বুড়াইয়া লিলা তাঁহার
কথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বাইল বৎসর বৎসে

এক-এ পানীকর উত্তীর্ণ হইয়া শিবপুর যখন প্রায়ে ফিলিলেন, তখন অনেকেই তাঁহাকে অগ্রস্থানে চাহুরিত লক্ষ্যন করিতে বলিয়াছিল; কিন্তু শিবপুর ভ্রামল লভ্যতা ঘোষণা পত্রী জননীকে ছাড়িয়া ঘাইতে একেবারেই নাগাহ। জুতায় তিনি নিজ প্রায়েই লম্বাক জুগ ঘাটায়তে এই দীর্ঘ দূর বৎসর বেশ আনন্দেই কাটাই-তেছেন।

নত হইয়া শ্রীর মুখ চুখন করিয়া শিবপুর করিলেন, “কান্ড কাণ্ডে আজ এত ঘেরা বন’ ঘে।” মুখ হাসিয়া মনোহরা করিলেন “তাই মুক্তি এত বেগে হয়েই।”

শিবপুর হাসিয়া করিলেন “আর তার শত্রুও টিক বিয়েছি, শত্রু বস্ত্র —”

৮-মুখা দিতা কৃত্রিম হৃদয়জুতে মনোহরা করিলেন “আজ, তবে যাও এমন দ্বারা করত আদি গোলা।”

মনোহরা চলিয়া ঘাইবার উপক্রম করিতেই শিবপুর নিজ বাহু দ্বারা তাঁকে বেঁটন করিয়া করিলেন “ব’ত দিকি তেমন ঘা’ব।” মনোহরা অগত্যা হাসিয়া আবার বলিয়া পড়িলেন।

(৩)

জুটনা হইতে মুখ হুলিয়া মনোহরা কস্তার উল্লেখে করিলেন “কীদর তেমন না, কান ফাটো দাও, ফাটো দাও হলে আমি তোমার অনেক খেলনা দেখ”। লাবিকী কিন্তু খেলনার উল্লেখে ত কিছু দাতা আনন্দিত হইল না, সে পূর্ণবৎ জন্মন নির্ভিত সুখে করিল “না, আমি খেলা চাই না।” মনোহরা কি চাই বিজ্ঞাপ্য করিবার পূর্বেই সে কোল আদিকার করিয়া বলিল। “আঃ হুঁ” বলিয়া মনোহরা কন্যাকে কোল হইতে উঠাইয়া বিহার জন্য হাত ধাক্কাতেই চাকিয়া উঠিলেন, উমির মুখে বলিয়া উঠিলেন “একি অর হয়েছে নাকি?” একদল লগটে বস্ত্র দিয়া তাগ অসুতব করিয়া বুদ্ধিলেন ঐদায় আশা দ্বিধা বহু নাই।

জুটনা কোলিয়া বাঘীর উল্লেখে লাবিকীকে কোলে লইয়া ক্রম পথে মনোহরা ককে প্রবেশ করিলেন, শিবপুর তখন আনাগার সমুখে বলিয়া এত ঘনি বই পড়িতেছিলেন। সে দিন তবিরাত, জুতায় জুতায় তাড়া নাই, নতাই বাজিয়া সিঁহাতে, এখনও মনোহরা রক্তন লগাষ্ট বহু নাই, এম জুটন বিন মনোহরা’র বাজটার পূর্বে কখনও রক্তন কার্য লগাষ্ট বহু না; জুতায় বাইবারও তাড়া নাই। শিবপুর অত্যন্ত মনোযোগ লব্ধকাজে পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলেন। কিরতকণ পূর্বে মনোহরার লহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া সিঁহাতে, জুতায় শিবপুর জানিতেন যে কোন দিনইবা দ্বারাক না কেন মনোহরা বিবাহ হইয়া গেলে পর তাঁহারই ককে গৌর লক্ষ্যমান করিতে আসিতেন এম বস্ত্রকণ লগাষ্ট না শিবপুর মনোহরার কাছে দ্বার দানিয়া তাঁহার মান ওজন করিতেন ততকণ পূর্বাৎ জন্মাতরে দ্বি-বি দ্বারাইতে থাকিত, জুতায় মনোহরার পদাংগে তিনি কিরিয়া চাহিলেন না।

ককে প্রবেশ করিয়া মনোহরা শিবপুরকে বলিলেন “ওগো শুভঙ্কো”—লগাতে পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া শিবপুর করিলেন, “আঁ কি তাগি আবার যে আজ আবার দানিনি রাইয়ের দান তাকতে হলনা, আগনি তেবেছে।”

মনোহরা বাঘীর স্ব-ভূত দিয়া উমির খে: করিলেন “জন্মজো লাবির যে দর হয়েছে।” “বেদি” বলিয়া মনোহরার কোল হইতে লাবিকীকে লইয়া তিনি তাগ অসুতব করিলেন। পুস্তক খানি মুক্তিয়া দানিয়া বলিলেন “বেদি তাকার যদি পাই”। কন্যাকে কোলে লইয়া মনোহরা বিহার সুখে সেই খানে বলিয়া পড়িলেন। বেলা দ্বার একটার লগা শিবপুর তাকার সঙ্গে লইয়া বাজী করিলেন সুখের প্রথম তাগে তাঁহার লগত মুখ আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মনোহরা তখনও তেমনই তাগে বলিয়া ছিলেন,

ভাঙার সঙ্গে নিবন্ধকে বাঁটা ক্রিষ্টে দেখিয়া
কতটুকু চোখের উপর উপবেশন করাইয়া জ্ঞাপনে
পারেন তকে সিঁধা ঝাঁড়াইলেন।

ভাল করিয়া লম্বাকার পত্র ভাঙার বলি।
পেলেন, যে মনস্তা নিবন্ধ ও মনোমো করিয়া
হিলেন, সম্ভ্রুতি যে ভাবন বসন্ত গ্রাহকে আক্রমণ
করিয়াছে, সেই বসন্তই সাবিত্রীকেও আক্রমণ
করিয়াছে, ঐক্যের বন্ধোত্তর ঠিক করিয়া দিয়া
ভাঙার চেনিয়া পেলেন।

(৪)

অন্য হ্রস্ব হটকট ক্রিষ্টে করিতে কৌণ
কর্তে শাস্ত্রী ভাঙিল—“না।” কতবার সুখের উপর
জুঁকিয়া পড়িয়া মনোমো অস্বস্তিক কর্তে করি-
লেন, “কি মা? বসন্ত কি কট হাজে?”—“না।
কই?”—“এই ত আঁধি হইতি মা।” কহু যের
এই কহী কথা বলিয়া নিবন্ধ কতবার হেঁট নমন
হতেন। নিম্ন হস্তের মধ্যে জুলিয়া লইলেন।
তখন চাক্রি বাঁটা, লম্বাক পত্র একেবারে মৌরব,
নিম্ন, কোথাও একটু লম্বা নাই, শুধু কপে কপে
জুঁকিয়া গিয়া তীর চাঁকর নৈল আক্যপ ভেদ
করিয়া নিম্ন পত্রকে কাঁপাইয়া জুলিতোছিল।

বাঁহিরে অস্টা বাঁধা অস্বস্তিক ঝাঁড়াইয়া সুখের
মৃত ঘেন বাঁহিরে গজ অপেক্ষা করিতেছিল।

সাবিত্রী লম্বাক চাক্রি সুখের সহিত মৃত করিয়া
শেষে গিছেই হার মানিল।

একাত্তরের তরুণ আলোক যখন বিশ্বের সাথে

ভড়াইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় পিতামাতার এক-
মাত্র আনন্দের ধন সাবিত্রী তির্যক তরে চক্ষু
মুদিল। সাবিত্রীর সুখের উপর হইতে বহুবার
ভাবন চিত্র পূর্ণ হইয়া সুখের শান্তিময় হাওয়া পড়ি-
য়াছে। উদ্ভাবিনীর ভাব মনোমো সাবিত্রীকে
কোলে জুলিয়া লইলেন। শিশুগণ বহুবার হই
যাতে সুখ চাক্রিয়া বলিয়া পড়িলেন।

(৫)

ভাঙার কণ্ঠে নিবন্ধ চাক্রিলেন “মনোমো”।
মনোমো ভাবন হাঙ্গিতে অগনি ঘটে সুখিত করিয়া
জুলিয়া কতলেন “সেই সাবিত্রী কেন মনোমো করছে,
ঐ যে, ঐ যে, আবার ভাঙছে। আবার হেঁড়
বাগ, জুঁহি কে?” পুনর্বার ভাবন হাঙ্গিতে চক্ষু
সুখিত হইয়া উঠিল। বাঁহীস্বর নিবন্ধ হইতে
মৃত চাক্রিয়া বলিয়া বলিয়া পড়িলেন।

সাবিত্রী—সুখ পরিধারের একমাত্র আনন্দের
বসন্ত সাবিত্রী—লম্বাক, চিত্র আনন্দের মৌরব
পত্র মনোমো—সেই হার উদ্ভাবিনী। অস্বস্তিক
নিবন্ধের মৃত হতে চোখ জুলিয়া গিয়াছেন—তিনি যে
আর দেখিতে পারেন না।

ভাঙা ঘাট, ঐক্য বা করেন লম্বাকই মনোমো কর।
পিতা সর্বস্বাই মনোমো মনোমো কর, তাই হইতেও
একবার তাৎপর্য বুঝি বৈধ পিতার মনোমো করিতে, সুখ
মানব বুঝি সেই একবার গুণ মনোমো করিতে
অস্বস্তিক, তাই বুঝি আনন্দের অস্বস্তিক করনের কোন
শেষ নাই।

রুদ্রভীষণ রূপ

(গান)

(শ্রী-১৪:২৫৫ ধোব এম, এ)

‘এস’ রুদ্র ভীষণ রূপ

এস’ হৃদয়বহন যাতে,

হৃদয় হৃদয়ে হৃদয়ে

হৃদয় হৃদয়ে হৃদয়ে !

হৃদয় হৃদয়ে হৃদয়ে

হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে

হৃদয় হৃদয়ে হৃদয়ে

হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে !

হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে

হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে

হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে

হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে !

বংশীর কলঙ্ক

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বি, এ)

ভ্রমোৎপত্তি পরিচ্ছেদ

অন্যের আশ্রয়

বৈশিষ্ট্যের শোক কোঠারে হৃদয়কে যত
বাঁধিয়াছিল, যৌবনঃ অঙ্গুলিহারায়ে তাহা অপেক্ষা
কম হাজে নাই। অঙ্গুলি এঁকে মেঘের নিকিতে
যেমন বাজার ভাষা কঠোর ছিল, তেমনই তাহার
মনটা কুসুমের অপেক্ষা কোমল ছিল। হেঁচ, ঘা,
দাড়া ইত্যাদি অন্তরের কোমল কৃত্তিনিকের যেমন
তাহার জ্বরে ‘কৃত্তিনিক কৃত্তিনিক’, যৌবনঃ কুসুম
কোমলা হেঁচ ওঘা ওঘনী জ্বরেও সেরে গেল
কি না সন্দেহ।

কিন্তু যখন দিগাৎ নদীর তটে গেল হৃদয়-
প্রতিমায়ে বিলম্বিত হেঁচ-ঘা-দাড়া—যখন তাহার
দায়িত্বী (যৌবনঃ) তপিনী বৈশিষ্ট্যের শূণ্য প’বিত্র বহু
চিত্রনেত্রী হৃদয়—যখন অঙ্গুলি হৃদয় গাঢ়
কলঙ্ক হৃদয় হৃদয় করিয়া গমনমাগে উপিত

হৃদয়, তখন অঙ্গুলি হৃদয় নদীর গৈরি চিত্রা-পুষ্কর
বিক্রে চিত্রে চিত্রে এক নূতন ভাবে উদয় হইয়া
গেল। তাহার অস্তিত্ব লাভ হইতে হেঁচ-ঘা-
দাড়া হৃদয় হৃদয় হৃদয় হৃদয় হৃদয় হৃদয়
এই নিশাপ সন্ধ্যা বালিকা কি অপেক্ষা করিয়াছিল ?
কি প’লে এই কোমল প্রহসনী অঙ্গুলি করিয়া
পড়িল ? যে নিশাপ সন্ধ্যা হৃদয় হৃদয় হৃদয়
কাপুড়ের মত, লুকাইয়া দিয়াহুগে এঁই সোনার
পুতলীকে হৃদয় করিয়াহুগে তাহার ত’ এখনও শান্তি
গোণ হয় নাই। তবে সে নিশাপ সন্ধ্যা হৃদয়
এখনও বসিয়া রহিয়াছে কেন ?

এই হৃদয় সন্ধ্যা হৃদয় হৃদয় হৃদয় হৃদয়
অন্তরের বাঁধা গোপন করিয়া হৃদয় হৃদয়
হৃদয় হৃদয় হৃদয় হৃদয় হৃদয় হৃদয়

সে প্রথমেই সত্য কথার সংবাদ পাইল যে, বিনায়ক ঘটনার দিন সারা অশুভাঙ্ক বাণীর ছিল না। আরও একটা কথা এই যে, বৈশাখের হস্তার দিন হইতে বিনায়ক অন্তর্ধান করিয়াছে। সুতরাং বিনায়ক যে এই হস্তার মূলে ছিল, তাহা সন্দেহ বহুদূরই স্বাভাবিক। আর অল্পের প্রতি বিনায়কের মর্যাদিতিক জোব ও গিলা সঙ্গত হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কেননা সে অল্পকে তাহার প্রপঞ্চের প্রতিরোধ বলিয়া মনে করিত। তাই অল্পকে বত্যা করিতে গিয়া সে বৈশাখের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। অল্পের মৃত্যু বিখ্যাত হইল যে অশুভাঙ্ক ঘোর নিশ্চয়ই বিনায়ককে গুলিতে মারিয়া করিয়াছে। বিনায়ক যে ঘোরের মনে যোগ দিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তদুপরি বিনায়কের সঙ্গে অল্পের একটা ভোট ও পিতল অপ্রতি হইয়াছে।

মনে বসে এই সত্য তোলাপাড়ি করিয়া অল্প পরদিন অতর্কিতভাবে ঘোরের আঁজা আঁজরণ করিবার ও বহুদূরদূরিতিকে প্রেক্ষিত করিবার সন্ধান করিল। সে লুৎতা পানি ও মিরি প্রাতঃস্নানকে ডাকিয়া এই বিবর্তে গোপনে পরামর্শ করিল, অস্ত্র সঙ্গ বা কোঠারকে কিছু বলিল না, কেবল জানাইল যে সে পিকারে বাইতেছে। সে সুলিঙ্গের মধ্যে শাকের করিয়া তকি গেলের মত হাথিয়াছিল। তাহারের মধ্যে বাহা বাহা ভরজনে হলে লইল।

অতি গোপনে লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে ওজলে হাথিয়া অল্পের উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে লুৎতা পানির অমীনে তাহার মলং পাঠাইয়া দিল। কথা তবল তাহার অল্পের হাটা পথে বাইবে ও ঘোরের অজ্ঞার চাহিত্য দিগে। অল্প মিরি প্রাতঃস্নানকে লইয়া পিকারের ভানে কোমার বাইবে এবং ঘোরের আঁজার লকলে মিলিত হইবে।

অল্প নৌকা হইতে নামিয়া মলংের মধ্যে অস্ত্রের হইল। কৃত্ত মিরি কোমার লইয়া অপেক্ষা

করিতে আসিল, হাতে মিরি প্রাক্ষরভাবে অল্পের পশ্চাদ্ভরণ করিল। ঘোরের আঁজার নিচট হইয়া অল্প ইঙ্গিত হাতে মিরি তকি এং গোপনে অস্ত্র-বাণী অল্প করিতে গিল। হাতে মকনা এক না করিয়া অস্ত্রের হইল এং একটা গোপের পরিচিত হইয়া মস্তির উপর ভাইয়া পকিল। তাহার পর সে তাই মস্ত্রের মত কাণে হাট্টিয়া আঁজিয়া বাঁজিয়া গোপে মগা বিয়া অস্ত্রের হইল। কিছুক্ষণ অল্প তাহারে দেখিতে পাইল না।

অল্প চক্ষু পানিঃতঃ ঘোরের অস্ত্রের অস্ত্র মিরি হইতে গোপ অল্পের মগা বিয়া অতি লম্পর্ক এং একটা লোক চায়া। আঁজাবে অস্ত্রের হইতেছে। সে নৌকাটার হাতে মিরি মত কখনও কাণে হাট্টিয়া কখনও হুঁপা জড়ি দিয়া, অবার কখনও বা ঘোঁড়িয়া লতঃ পশ্চাদ্ভরণ করিতে করিতে নীর নিতে অস্ত্রের হইতেছিল। অল্পের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, তাই সে দুই হইতেই তাহারে চিনিল, সে লুৎতা পানি। তাহার ভাব দেখিয়া অল্পের সন্দেহ হইল, কোন লোক পানির পশ্চাদ্ভরণ করিতেছে। অমনই অল্প একটা গাধের আঁজানে লুকাইল।

লুৎতা পানি নদীর তীরের উৎপে অস্ত্রের অস্ত্রের হইতেছিল, গোপ হই সে কাণেও নিচট হাটা বাইয়া ঘোমানে অল্পে নৌকা চায়া বিয়া হইতেই দান অল্পের আঁজার পাতার উৎপে বাইতেছিল। পানি অল্পের লম্পর্ক বিয়া চিনিয়া মেল, অল্প মীরে মিলিল। অস্ত্রেরই অল্প বেবিল কৃত্ত কোমার হাতে লং প্রপঞ্চ ঘোঁড়ি তাহার লম্পর্ক বিয়া চিনিয়া মেল, তাহার লক তাহার মলং আর একটা লোক করিয়াছে, সেও লম্পর্ক।

হুঁপা করিলে অল্প অমতেই তাহার লক জুগি করিয়া হাট্টিতে পারিত। কিন্তু অতর্কিত অল্পে অবাচ করা অল্প কামুকবাচিত বলিয়া মনে করিত, তাই সে কিছু না বলিয়া ঘোমার প্রোত

উত্তর-বক্ষণ সেই একমুঠা তাহার অনোখা দাঁত-
আধাৰ কতকগুলি রাসের কপা উজ্জ্বল করিয়া
চোলালি বানান অক্ষপেঙ্ক ছুঁত্যা মারিল। পর-
মুহূর্তেই অকণ সন্ধ্যায় দেখিল, একমুঠাকে
শাপটা ঘায় ঘায় ছোবলাইতেছে, একমুঠাও
শাপটাকে নখে ও দাঁতে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া
বল বস্ত করি আর চোঁরা করিতেছে, লোকটার মুখ
নিরা ধমার্খই কোপুত নির্গত হইতেছে। শাপ
ও হাঙ্গুহ এত নড়িতেছে যে, শাপটাকে লক্ষ্য
করিবার সুবিধা হইতেছে না, তাই অকণ বশুচ
তুলিয়াও গুলি ছুঁড়িতে পারিতেছে না, তে
তাহার লক্ষ্য জই হইয়া গোবটা নিবৃত্ত হয়।
অগত সেই ভূতও তাহার চোখে জমে অলস হইয়া
উঠিল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাকে সেই জঘন
বিদারক ভূত দেখিতে হইল না। শাপে-মাংসে
লড়াই হইতে হইতে শাপ ও হাঙ্গুহ জমে জমে
হঠাৎ একবারে নদীতটে উপস্থিত হইয়াছিল।
অকণটা একবারে নদীর তৈলপাড় পা দিবারাত্রি
তাহার লাহের তরে কতকটা দাঁতি বসিয়া পড়িল
এবং অকণ চীৎকার করিয়া সাবধান করিতে না
করিতেই শাপ ও হাঙ্গুহ সপক্ষে নদীর উচ্চ গাভ
হইতে নদীপার্শ্বে পড়িয়া পেল।

অকণের সমস্ত শরীর কটকিত হইয়া উঠিল।
এমন ভয়াবহ স্তুত্যা সে জীনে কখনও প্রত্যক্ষ করে
নাই। সে লক্ষ দিবা নদীতটে উপস্থিত হইয়া
দেখিল, হাঙ্গুহ বা লর্ণেও চিহ্নবাক্স হেই, কেবল
তটের সন্নিহিত বানিকটা নদীবাগি ঘোণা হইয়া
উঠিয়াছে এবং সেই স্থানটার তখন নদীজল
আলোড়িত হইতেছে। ওঃ কি ভয়াবহ পরিণাম।

এতক্ষণ অকণের অস্তিত্বকে লক্ষ্য ছিল না।
কিন্তু এইবার সে যখন অকণে। দিকে ক্রিষ্টা দাঁড়া-
ইল, তখন আর মোরেকে দেখিতে পাইল না।
কিন্তু আশ্চর্য্যের সঙ্গলবনে ঘরিতেই হইবে, আশ
তাহার বল ভাঙ্গিতেই হইবে। অকণ ক্রতগবে স্তোপ

অকণের মধ্য দিয়া অগ্রগত চৌধা ঘোরের আঁঠির
অভিযুখে চলিল। অকণ চাড়াইয়া কাঁকা শব্দে
উপস্থিত হইয়া সে একটা পাহের আঁড়াল হইতে
দেখিতে পাইল, শুভাঘের ঘাটে তিন চারিজন
কোন্না বীণা তবিরাত্রে এবং উহার মধ্যে একজন
ঘোরে ও বিনায়ক বসিয়া আছে, ঘোরের শোকজন
কাঠের বাজ ও আঁঠু তথা বোকাই কড়িতেছে,
ঘোরে অঙ্গুলি সত্বতে বিনায়ককে অকণের অবস্থান-
স্থানের দিকে দেখাইয়া দিতেছে। অকণ লক্ষ দিবা
নদী অভিযুখে অগ্রার চৌধাঘাট ঘোরে সঙ্গলবনে,
কোন্না বীণা তবিরাত্রে কোন্না তানাইয়া দিল। অকণ
লক্ষ্য হইতে বংশীজনি করিবার অকণের শোক-
নাশস্থান হইতে বহিরে হইয়া আসিল; কিন্তু নদীর
জোরে স্ফোৰ্ণাভি বহুদূর ভ্রামিয়া দিয়াছে।
অকণ বশুচ উঠাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,
লগ্নবনে ঘোরে! এখনই ঘাটে নৌকা লাগাও, না
হইলে ভোমাদের লক্ষ্যকে গুলি করিয়া মারিবা।

উত্তরবক্ষণ ঘোরে পিশাচের মত অটুগণি
হাসিয়া তাহাকে গুলি ও লাগি দেখাইতে লাগিল
এবং নৌকা আরও তাকাতে লইয়া পেল।

ঘোরের বল অশ্রুত হইলে অকণ বিংগমনে শুভাঘে
প্রাণে করিল। সেখানে অগ্রগত কিছুই নাই,
ঘোরে সমস্তই লগ্নাইয়াছে, বোণ ধ্বংস বানী জিনিষ
যাং ছিল, তাহাও সব লইয়া দিগাছে। লুণ্ণ
পানিই বৃষ্টির নোবে আর উদ্বেগ বিকল করিবারে,
অকণের এই বিশ্রাম ভূতভুল হইল, বোধ হয় সেই
ভয়ে সে দেখা বিতেছে না। অকণ অশ্রুতগণের মধ্যে
সঙ্গলকেই পাইল, কেবল তাহার কেন্দ্র সঙ্গল
পাইল না। অকণ ঘোরের আঁঠার আঁঠু বরাইয়া
দিয়া নিছের কোন্না বীণা আসিল।

বাসাব কিরিয়া অকণের মনটা আরও অধিক
অঃসর হইল। একটা কানে লাগিয়া থাকিতে
এতক্ষণ টেনবিলের শোক ও অনিগর ভিলা হইতে
সে কতকটা অমায়িক পাইয়াছিল; কিন্তু সঙ্গার

পর ধার নির্ধনে সেই দুইটাই দিক্ত তেজে তাহার
মনকে জালা দিতে লাগিল।

গঙ্গা হাসিয়া হাঁড়াইতেই অরুণ চিহ্নাঙ্গা করিল
—সুখা পাণি এসেছে ?”

গঙ্গা বলিল, “না বাবা! সুখাই এসেছে, কেবল
সেই আসে নি।” বলিয়া গঙ্গা হঠাৎ তর্কিতে চলিয়া
গেল। অরুণের একটা চুড়ামণি হইল। সুখা
সেগ কোথায় ? নিশ্চয় তার বিপদ আগব চলেছে,
সে নিশ্চয় ঘোড়ের গায়ে পড়েছে।

সেদিন অরুণ বড়ই স্নান হইয়াছিল, সেই কণ্ঠ
অস্বাভাবিক পদ মনে করিয়াই সুখাই চাফিল।

ততক্ষণ সে সুখাইখারিল সে গানে না, কিন্তু
স্নান শেষবারে স্বর্ন পুত্ৰাঙ্গের উত্থান, ইহাতে,
তখন একটা মনুষ্যের ডাকে তার মস্তিষ্ক
জ্বল হইল। এইরূপ তিনবার ডাক শুনিবার পর
অরুণ পথার উপর উঠিয়া বলিল। ডাকের তিক
তার নিখবের জানাবার ব্যতীতই হইতেছিল।
হঠাৎ অরুণের মনে হইল যে ডাকটা অস্বাভাবিক,
সে অনেকবার আবেগপূর্ণ ইঙ্গিতের ডাকিয়া
পরাপর গৃহের কঠোর ত্রিভাঙ্গ।

তখনই অরুণ কিস্তিভিত্তিক পথাত্মক করিয়া
নিখর হইতে নিখর গঙ্গা জানাবার বহু গিয়া
হাঁড়াইল। জানালা খুলিয়াবার অরুণ সন্নিহিত
বেশিল, এবং সন্নিহিতগোষ্ঠে হাঁড়াইয়া একবার
মস্তাঙ্গু! অরুণের গোলাক হইল, সে চৌক্য
করিয়া গেল, “কে ডাকি ? বেগ বড়, এমন জানাব
না বিশেষ জ্ঞান করিব?”

তখন সেই দৃষ্টি ক্ষুণ্ণে জাহ্নু পাতিয়া বলিল
যেভাবে দাঁড়াতে বলিল, “বাবু, আদ্যে দিনে
পাছ না ? আমি সুখা পাণি। নিশ্চয়ই বোর
বোল, বড় ভয়ানক সাংগার নিয়ে এসেছে।”

অরুণ তার খুঁটিয়া গিল, সুখা পাণি বর স্রবণ
করিয়াই দীর্ঘ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলিল, “বাবু নিশ্চয়

পালাও, এখনই গিয়া আদ্যে হেঁচক দেব যত
জানক বিপদ।”

অরুণ কথারই বিচলিত না হইয়া বলিল,
“পালিয়ে যাব ? কেন ? কি বিপদ ? তোমার
কোন বিপদ চলে-নি ?”

সুখা বলিল, “না বলতে গেলে অনেক সময়
যাবে, তার মধ্যে এর এসে পড়বে। এতক্ষণে বর
তার মনো পার হচ্ছে।”

“কি ? কিসে ?”

“সে অনেক কথা। ঘোড়ের গায়ে পড়ে
পালক তাবের গ্রাম থেকে আবার চলে নিয়ে
আসছে। তার বলে পুঁচল ঘোড়ের কব হবে না।
যোরে, বিনামূল্যে আর যেমন। তাবের পুঁচল পথাই
খাইয়েছে, পুঁচল পুঁচল পোত বেঁধেছে, তারাই
তাবের চালিয়ে নিয়ে আসছে। তোমার স্রবণে
মাথাই তাবের স্রবণ উদ্বেগ, পালক বাবু, এখনই
পালাও, নইলে তোমার পাবে মাথা কুটে যাবে।”

অরুণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “আমি পালান, আর
যাও হইল, তাবের উপার ? এই সব ছেলে বেছে,
এই সব প্রলোভন—”

“বাবু, তাবের বেছেতে গেলে আর সময় থাকবে
না। আমি লুকিয়ে ওদের লক নিয়েছিলাম, পালক-
বোর গ্রামে নিয়েছিলাম, তাবের সব পলায়ন তখন
এসেছিল। তারা কেবল তোমার মাঝে তার আর
লুটতাম করে তার।”

“তা বুঝলাম, কিন্তু পলাই বেরে পালক আবার
লুট তাবের সময় কখন গ্রামে থাকবে কি ? সে
যা কয়েক ঘণ্টা বেরে, তুমি যাক, কঠোরতার
লগ্নকে জাগ্রত, লগ্নকে দেখানে প্রস্তুত হয়ে
থাকতে বলো। আমি—”

“বাবু, ই খান, পালকের ডাকের বাজছে,
বোরের একদল দলী পেরিয়েছে। এখন না
শেজোব নি, এখনও পালক বাবু—”

অরুণ দৃঢ় হয়ে বলিল, “সুখা, তোকে যা বললুম

তাই কর, আমি এখন থেকে এক পাও নড়বো না।"

সুখা চিন্তা খেলে অরণ পক্ষকে তুলিল এবং কেঁঠোরে ঘপ্তা ও অশান্ত পরিবারকে কারখানার লইয়া ঘাইতে আদেশ করিল। পক্ষ বিপদের সন্ধান বনা সুখা কাঁদিয়া বেলিল, কিন্তু অরণের ধ্বংস সে আপনাকে সাহায্যইয়া লইয়া সকলকে ডাকিতে গুটিল। অরণ কিম্বদন্তে নিঃসর সুখাবান কিছু কিছু ছাঃ এবং অরণের লইয়া কারখানার উপস্থিত হইল। তখন সেখানে বিস্তর লোক সমাবেশ হইয়াছে। অরণ কারখানার মধ্যস্থ লক্ষ্যপেক্ষা হস্তের ধরে স্রোতের দৃষ্টি ও বালক বালিকাসমূহকে পুজিয়া চারিদিকে প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া বিল এবং প্রত্যেক প্রবেশ পথে লম্বা পাগোড়া রাখিয়া বিল। এতদ্ব্যতীত সে তাহাঃ শাক্তবংশের মধ্য হইতে কয়েকজন বান্ধা বান্ধা লোককে প্রাচীরের স্থানে বান্ধে লুকাইয়া থাকিতে আদেশ করিল। সে আদেশ দিয়া রাখিল, পক্ষ প্রাচীরের অভ্যন্তর সন্নিবিষ্ট হইবার পূর্বে কেবল যেন একটীও অস্ত্র নিক্ষেপ করে, পক্ষ তাহাদিগের উপর অস্ত্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেও নহে; পরন্তু সে নিজে যখন লিঙ্গল বা মস্তকের আগ্রহান করিলে, তখন সকলে এক সঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে। সে সকলের নিকটে হালি হালি হুৎ সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। ইহার বহুপূর্বেই সে হইলেন লোককে অবপূর্ণ নাতিভার উদ্ভেদে পাঠাইয়াছিল; তাহাদের নিকট সে নাতিভার পোলিটিকাল অফিসার ও মিনিটারী পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নামে চিঠি বিছাইয়া।

অবিবক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। তখন পূর্বদিক দক্ষা হইয়া উঠিয়াছে। সেই কৌণ আলোকে কারখানার রসকেয়া সমিষ্টের বেলিল ভীষণ আতঙ্কে চাক-চোল বাধাইয়া চিত্র বিভিন্ন বেষে পঙ্কিত হইয়া পিণ্ডাচের ওয় নৃত্য ও চৌকর করিতে করিতে আতঙ্কের বল কারখানার অতিদূরে অগ্র-

সর হইতেছে। ইতঃপূর্বে তাহাঃ অরণের বাগা লুঠ করিয়া তাহাতে আতঙ্ক বধাইয়া বিতাছে, তাহা হইতে সুখাশি আকাশ মার্গে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ সকল কার্য সমাধার পর শাক্তদের কারখানার অস্তিত্বে ধাবমান হইয়াছে।

অরণের আবেশমত রসকেয়া নিশ্চেষ্ট হইল। এই বালক নীচতা যে ভেদে পূর্বদিক তাহা সুখ আতঙ্কেয়া বৃত্তিতে পারিল না। তাহাঃ মনস্কি যোবের নিঃসর লম্বা লুঠাঃ লোভে উদ্ভেদে মত কারখানার প্রাচীরের উপর চড়াও হইল। বাগ পৌর্নবের আতঙ্ক পাঠিলে যখন মত কঃকখনা গুঃলুঠ ও দাঃ করিয়া তাহাঃের তখন দ্রিক সেই অঃয়া হইয়াছে। তাহাঃ প্রাচীরের মধ্যে অদ্যঃ ভীর বর্ধন করিল, পরে খুঁকি ভোরাশি ও কুঠাঃ যাঃ আতঙ্ক করিয়া প্রাচীর তেব করিবার চেষ্টা করিল।

অকস্মৎ মন যেনিলা কাঁপিয়া হুঃক করিয়া লিঙ্গলের আগ্রহান হইল এবং লম্বা লম্বা আতঙ্কগণের উপরে একসঙ্গে মস্ত্র অস্ত্রুষ্টি হইয়া গেল। কারও বুকে কারও পুঃ কারও চক্রে বান বিধিল, ভীষণ বরষের খোঁচাঃ কাহারও তবলীয়া লাগ হইল। প্রথম বাধা পাইয়া অংশিত আতঙ্কে ভীষণ চৌকর করিয়া নদীতটাস্থে পলায়ন করিল। তখন তাহাঃের মনস্কি তাহাদিগকে রাখিয়া বরিয়া নানারূপে আতঙ্ক উৎসাহিত করিয়া ফিরাইয়া আনিল। এগারও সেইজন সুখাব মত লিঙ্গলের আগ্রহান হইল, অমনই আতঙ্কগণ তব তব বিধা পলায়ন করিল। এইজন বার বার পাঁচ লাভ বার হইবার পরে যখন আতঙ্কের মধ্যে অনেক বোকা হতাঃ হইল, তখন তাহাঃ আতঙ্ক করিয়া অংশিল না। তাহাঃ অতঃকিত ভাবে আতঙ্ক করিয়া সুখাশি ও লুঠঃ দাঃ করিলে, এইজন কপাঃ হিল। তাহাঃের পক্ষ যে এখন সুখাব মত দহিত লক্ষ্য প্রভত হইয়া

তাঁহাদের তরু আবেগপ্রাণি লইয়া অপেক্ষা করিলে, ইহা জানিলে তাঁহারা কখনও এই কাণ্ডে অগ্রসর হইত না।

কিন্তু রক্তকবিরের মধ্যেও অনেক লোক কম হইয়াছিল। অল্প চিন্তিত হইল। তাঁহাদের লোকবল সামান্য। এইভাবে লক্ষ্যে চলিলে, সে কতকগুলি করখানা রক্ষা করিতে পারিবে? আবেগের আপাততঃ মনোভটে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এইবার তাঁহারা নিশ্চিন্তই নহে। পুট হইয়া আসিলে। তাঁহাদের সকল বেঁজা নদী পার হইতে পারে নাই। বহিরা ভাংরা কিছুকাল অপেক্ষা করিতেছে না। সাঁড়িয়া হইতে সাধারণ বলাসময়ে আসে কিনা সম্বন্ধ। বিশেষতঃ তাঁহার অতীত কথেকখন রক্ষার মধ্যে গর ও চিন্তাচাকসোর লক্ষণ দেখা বাইতেছে। এ অবস্থার এতগুলি প্রাণলোক ও বালকবাণিকার রক্ষার তার গ্রহণ করা কি মুক্তমুক্ত? তাঁহা হইতে ইচ্ছামূলক কতক রক্ষার সাহায্যে সাঁড়িয়ার রক্ষা করিয়া বিলে। ন? ?

যখন চিন্তা, তখনই কাঁধ। অল্প সুস্থ-মাত্র বিলম্ব করিল না, নিমেষের মধ্যে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিল। তখন দুই এক একে আহত হইয়াছিল। যখন সে সেই রক্তাক্ত শরীরে কোঠায়ে বন্দী হইয়া সন্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহা-বিন্দকে সাঁড়িয়া বাঁধার নিমিত্ত অস্ত্রোত্তাপ করিল, তখন তাঁহারা কাঁপিয়া ফেলিল। কিন্তু ‘অল্প কোনও স্তম্ভত আপত্তি স্থান নাই, সকলকে পাঠাইয়া দিল।

যাকালসে অল্প চুপি চুপি সন্মার হাতে একবাণি এই দিগা বলিল, ‘সন্মার, এইখানে তাঁর মিসমিলিৎক বিল, এখানে তাঁরই বই, তুই জানিল ত’ ?

তাঁহাদের আগে ভাগিতে ভাগিতে গলা ও কোঠায়ে বন্দী বিদ্যার লইল। কোঠায়ে, কোণার? আর সুস্থগরেই এই সপ্তমূর দেখ

বর্ষিগণ) পড়ি অতনের নিঃসূচন করিয়া বলিল, ‘বাধা, মাশিকারি করি, তুই সূর শরীরে নিশাপনে ঘরে কিং এল। আদি যদি এতদিন বর্ষার কাছলোবাকো পতির দেখা করে খাট’, তাঁহা হলে নিশাপ বেলা, আমার এ আশীর্বাদ বিকল হবে না। স্বাধা, তোমার মত ছেলে যিনি পুত্র বহেছিলেম, তিনিও বর্ষ হ’লে তোমার রক্ষা করতেন, তোমার কোনও ভয় নাই।’

অবিকল্প অপেক্ষা করিতে হইল না। এ র অল্প দেখিল, লমপালের মত অগ্নিত আঘাত ঘোঁড়া তীর ধর ও অগ্নি চর্মে রক্ত হইয়া রণাঙ্গের সহিত তালে তালে লক্ষ বিধা নাচিতে নাচিতে কারখানার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহাদের সম্মুখে ভীষণ ময়োপাঞ্জনিতে অলমূল প্রাণলোক হইতেছে, তাঁহাদের বিতংত বৃষ্টি ও ততাবিক বিতংত সাজাআ। সুখ্যকরে স্পষ্টই বৃষ্টি হইয়া বর্ষকের মনে তার ও বর্ষার সন্মার করিতেছে। রক্তপিপাসু নর-রাক্ষস আর একবার রক্তের আশায় গাইয়া যনের বাঁধ অপেক্ষাও ভীষণ ও মিশ্রে হইয়াকে, এবার তাঁহারা সাজে কিরিয়া বাঁধে না। অল্প সুস্থ, পুং সন্মার: এই তাঁহার দেহ দিন। সন্মার ত’ হইবেই, মাতৃ হইয়া যতনের হাত কে একাইতে পারে? কিন্তু তবুও সন্মার পূর্বে অতি বড় ধর্ম্মের সাধনীর বৃকটা একবার কাঁপিয়া থাকে,—তবে না হটক, অস্তঃ অকৃত আকাক্ষার ত্রিভাঙ্গা দেহ এক-বার ম্প, করিয়া যনের মাঝে অগ্নি উঠে। কত কথা মনে পড়িল, স্মরণীয়নে এ সন্মারের মাঝার ভোর কাটিয়া যাওয়া কি লক্ষণ কথ? বড় খেদ—দেখা হইল না; সন্মার পিতা, অতিমাত্র স্বাধা বাল্যলক্ষণ সন্মার—আর—সেই—স্বাধার বৃষ্টি অল্পম দে স্বাধার সিংহাঙ্গনে মলা-ইয়া প্রাণ বিধা জালগায়াছে—আজ তাঁহারা

দুনিয়নায় মিশাইয়া যাইবে—আর ত' যেবা
হইল না।

অকপের বিবাক্স নিম্নেই মিশাইয়া গেল, চারিদিক হইতে বর্ষার বারিধায়ায় মত তীব্রতাই হইতে লাগিল, অগাধ সঙ্কট, বজ্র ও কুঠায়েয় অবিজ্ঞাত আঘাতে কাঠের শক্ত বেড়াও কাঁপিয়া কাঁপিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে দৃঢ় চলিল; কিন্তু আর দূরিত লক্ষ্যে যাবা বেওয়া বাই না; কাঠের বেড়া একহানে হেলিয়া পড়িল। তখন অকপ নিম্নের লোকজনকে জনাইয়া চৌকর করিয়া বলিল, “আর ঢকা নাহি, হাটার ইচ্ছা সে এমনও এই স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাউক।” অকপ এই কথা বলিয়া যেখানে বেড়া একদা হইয়াছিল, দক্ষ বিদ্যা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার স্মৃতির পরিবর্তনে সেই স্থান বুদ্ধের মধ্যে অনুভূত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও দুই তিন স্থানে বেড়া ভাঙিয়া পড়িল; অবশেষে বিজয়োন্নামোদিত আরও বোঝুপণ ভীষণ চৌকর করিয়া কারখানার ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া পুঠতরায় আঘাত করিল; কিন্তু অগত্যা ঘোরে বিন জিন্দন অশ্রুতের সঙ্গে অকপের প্রতি বাঁধান হইতে, তাহার বলে অকপ বিনাশককেও যেখিতে গাইল, তাহার অগ্রে অকপেরই কোঠা, তাহার হাতে অকপেরই শুল্ক। অকপ মাত্র পাঁচজন অশ্রুতকে লইয়া কথাতকল-ঘরটাকে পক্ষাৎ করিয়া যানের অস্ত্র সজ্জা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বহিবার পূর্বে সে যোড়েকে লক্ষ্য করিয়া গেল। যোড়ে যেমন হলবল সঙ্গে তাহাকে আক্রমণ করিতে দক্ষপ্রবান করিয়া অগ্রসর হইবে, অবশেষে দক্ষ করিয়া স্মৃতির আঘাত হইল। অকপের অব্যর্থ সজ্জানে যোড়ে দুই হইতেই আঘাত হইয়া একবার আকাশে দুই হাত জুলিয়া লাগিয়া জুলার বস্তুর মত ভূতলে পড়িয়া গেল, যোড়ের হৃদয়লাগি পড়ি গেল।

তখন বিনাশক তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া আবেগ-পক্ষে লইয়া তাহার বিপক্ষে ধাবমান হইল। অকপ ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণে বিনাশককে মোহের সঙ্গে পাঠাইতে পারিত; কিন্তু একবার বশুত উঠাইয়াই লক্ষ্য নানাইয়া গেল। বোধ হয় তখন বৈশালীর দৃশ্য মনে পড়িয়াছিল, তাই বিনাশককে মারিতে নিষেধ তাহার হাত কাঁপিল। বিনাশক পরের পরাবর্ণে মর্যাদাপ্রাপ্ত কাণ করিবারে, তাহার মাথার ঠিক ছিল না; অত্যাং তাহাকে মারি হইবে না। অকপ যখন এই কথা আবিষ্কারে, তখন লক্ষ্য তাহার উপর আঁগিয়া পড়িয়াছে। অকপ তখন পিতৃ উঠাইয়া যাহাকে স্মৃতি দেখিয়া তাহাকে স্মৃতি করিতে লাগিল; এত কাছে অগ্রে অকপের দেখিয়া ধাবমান আবেগে বাকিয়া দাঁড়াইল; একবার স্মৃতিভাবে পুঠিত করিয়াই তাহার পক্ষাৎ করিয়া বিপরীত দিকে দৌড়িল; বিনাশক তাহারপক্ষে নানা উৎসাহ বাক্যে স্মৃতি করিয়া হইতে পারিল না। তখন ক্রোধে কিন্তু আর বিনাশক একাকী পিতৃ উঠাইয়া অকপের প্রতি ধাবমান হইল, কিন্তু দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই কোথা হইতে একটা তীর আনিয়া তাহার চক্ষে বিদ্ধ হইল, বিনাশক লম্বে জ্বত-শায়ী হইল। অকপ তাহাকে সাংঘাত্য করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু নানা কত দূর হইতে অবিরল রক্তস্রাবে সে হর্ষণ ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল। পরন্তু স্মৃতি পাবিস্তে করিবার মনে সে একটা মুতবেদে বাবা প্রাপ্ত হইয়া জ্বত-পড়িয়া গেল। সেই সময়ে বিজয়োন্নামোদিত আর একদল আবেগ-সেনা কারখানা পুঠ করিয়া যাহা ও মুক্তার সহিত প্রাণে ছুটিয়া আসিতেছিল; তাহার সেই স্থানটার পড়িত হতাশকে বলিত দ্বিত করিয়া চলিয়া গেল।

এই সোচনীয় ঘটনার তিন বর্ষী পরে একজন
দুর্লভ অধ্যাত্মো মিনিটারী পুলিশ সেই স্থানে
উপস্থিত হইল; তাহারোয় দলপতি একজন ইংরেজ
সেনানী, তিনি একটা বৃদ্ধ বৈদ্য সোকেব সন্নি-
ত কথ্য করিতেছিলেন, তিনি পুরুষোত্তম কোঠারে।

ইংরেজ সেনানী অগ্নি অস্ত্র ভয়ঙ্কর। তিনি
চরিত্রবিশিষ্ট হত্যারোয় মধ্যে জীবিতপক্ষে অত-
সফল করিবার আশে ছিলেন এবং অগ্নি কোঠারের
সন্নিত তাহারোয় মধ্যে অস্ত্রের লক্ষ্য করিতে
লাগিলেন। বহুক্ষণ অস্ত্রলক্ষ্যে কোন ফল হইল
না। তবে কোঠারে হত্যার হইয়া পড়িলেন।
এমন সময়ে একজন পুলিশ-সেনা চৌক্য করিয়া
ছিল, সে একটা বন্দুক পাইয়াছে, বন্দুকটা
নিশ্চিতই কাঁধোঁড়। কোঠারে উৎসাহ ও
আগ্রহের সন্নিত ছুটিয়া গিয়া বন্দুকটা হাতে লইলেন
এবং বন্দুক কণের বলিয়া চিনিয়াই লক্ষ্যের সন্নি-
সেই স্থানটা তর তর করিয়া ঘূর্ণিতে আরম্ভ করিয়া
ছিলেন। ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে একস্থানে অস্ত্রের

একটা সোনার পেলিস পাওয়া গেল; যোগ্য হয়
সেটা হত্যারোয় সোকেবের আঁতালো লুকাইয়া ছিল,
তবে তাঁকে দেখিতে পারি নাই।

কিছুক্ষণ পরেই একটা নিপাতী কতকগুলি দ্রুতবেগে
সরাইতে সরাইতে একটা ভিনিষ বেবিয়া বিন্দু-জনি
করিয়া উঠিল। সময়ে সময়ে বেবিলা, সেই স্তম্ভে
বসতছিল! এইরূপ বসতছিল যে যে আর ছিল না
এমন নহে, কেন না তাহারোয় বৃত্ত হলে মাথা কাটিয়া
সইয়া যায়, ইয়াই তাহারোয় আশা। তবে এই
বেগে অন্যান্য বেগের মাথা সাধারণ অস্ত্রাঘাত ছিল
না। কোঠারে তাহার পতিত কোটি বেবিয়াই
হায় হায় করিয়া উঠিলেন,—সেটা যে অস্ত্রের
কোটি! তাহার আকার অস্ত্রাঘাত অস্ত্রের মত!
কোঠারের আর সম্বন্ধ ছিল না, তিনি বৃত্তসেন
বহুদূর তাহারোয় ইচ্ছা নির্দেশ জীবন বলি
দিয়াছে। কোঠারে বাগকের মত লুকাইয়া
কাঁদিয়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)

কণিকে অসীম

(ত্রিমালা বৈদ্য)

(৩য়) তেমনি ক'রে

আবেষ্টি চেয়ে,

তেমনি ক'রে—বিরাগ করে

একটু পেরে—

পাল দিয়ে যোর মাও মো' চ'লে,

নিউর হে মোর মনর ম'লে,

মন মনর হিমালা তুলে

জীবন খেয়ে—

তেমনি ক'রে নহন পঃ

আবেষ্টি চেয়ে।

(৩য়) তেমনি ক'রে নিমেষ করে

পথের মাঝে,

মুখের পানে নীরব মনে

চকিত লাগে—

চাইবে তুমি জাগিয়ে তুখা,

মুখের পানে মাতিয়ে নিখা,

ভালিহ-ভালি হই কপোলে

নিখান মেয়ে—

তেমনি ক'রে নিমেষ করে

আবেষ্টি চেয়ে।

(৩য়) তেমনি ক'রে পাগল হয়ে

কিচিকি মেয়ে,

পলক লাগি হরণ মাপি

পাইনা যে রে—

সেই যে পাগলার একটা নিমেষ,

অসীম সে যে মন সে কণিক,

নিখিল-মোড় কাঁদনা তার

মিটবে পেরে—

তেমনি ক'রে নহন পরে

আবেষ্টি চেয়ে।

ভাগের পুজা

[শ্রীমতাবতী দেবী-সংবতী ।]

(পূৰ্ণ পূজারীপন :—শ্রীমতী পৈলখালা ঘোষদায়া (২) শ্রীমতী বিমলবর মল্লবদায়া ; (৩) শ্রীমতী শরীখালা বর (৪) শ্রীমতী দিব্যাক্ষী জৈন-৬, (৫) শ্রীমতী চাক্ষালা বর, (৬) শ্রীমতী অমরকুমার দেব, (৭) শ্রীমতী সীতা দেবী, (৮) শ্রীমতী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, (৯) শ্রীমতী অচ্যবতী দেবী, (১০) শ্রীমতী পৈলখা ঘোষদায়া (১১) শ্রীমতী দিবিখালা দেবী, (১২) বার শ্রীমতী অমলবর দেব বারাহদেব; (১৩) শ্রীমতী রেখালা চৌধুরানী, (১৪) শ্রীমতী জ্ঞানতিএসর ঘোষ বি.এ.,।

কমলের কথা

বেশে কিয়ৎ এগেছি । হা-ও চল এগেছেন !
বাঁচা গেছে ! বলকাতা যার ভাল লাগে, লাগুক,
আমার আর ভাল লাগে না ।

সলোয়ারটা যে কি রকম তা আর ও বুকে
উঠতে পারছি নে । আমি একে বস চিনতে বাই
এ ততই হুকোঁধা হবে ওঠে । সলোয়ার কি সত্যই
এমনি, না শুধু আমার কাছেই এমনি ?

ভাবি—ভগবান কি না বিরহের আঘাতে,
সবই দিয়েছেন, নিজে ইচ্ছে করে যদি আমি তা
নষ্ট করে ফেলি তার বাহী তো তিনি ন্ন ! তিনি
শুধু বেধে রাখেন, আমার কাছের কম ঠিক
কখনে, হারী হবেন না ।

অমল এখানে এসে বেশ ছিল, আমি ও তার
সঙ্গে বিলে বেশ দিনগুলো কাটিয়েছিলাম । বলতে
কি—এই সময়টাকেই আমি মনে বর্ষার্থ পাতি
সেয়েছিলাম, আর কখনও এমন পাতি পাই নি ।
আমার হাত খুঁড়ানশাই হঠাৎ একদিন কোথা
অবস্থিত হয়ে পেরলেন, তাঁর লাড়া সে সময়টার
পাই নি । পরে শুনেছিলাম তিনি নাকি দূরত্বিত
অমলকে ভেঙে কঁচা করবার কামিতে ছিলেন, তার
কোমল মাথাটা চর্কন করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল,
কিন্তু অমলের তড়া পেয়ে একদম পা চাকা বিচেঁচি-
লেন । অমল এক একবার আমার পা চাপড়িয়ে

হাসতে হাসতে বলত ঝাঝঝুট চাঁদের আলোর মত
তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ুক তাই, বেশটা শান্ত
হোক ।

এ বিকে তাইরের মত অমল, ও বিকে দেবী-
রূপিনী না, এটা হৃদয়ে আমার শুভ স্মরণ নবীতে
ভুঞ্জন উঠিয়েছিলেন । প্রতিদিন একবার করে
হাতে আমার ঘেঁষে আগা চাই ই । যদি কোন
দিন না বেতে পারি, আমার মনে হয় সেদিনটা
আমার সম্পূর্ণ মিছে হয়ে যেত ।

প্রাণ আমার কাছে অনেক কথা গোপন
করে যেত, যেন সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস
করতে পারত না । আমি তার মনের মধ্যে থেকে
তার জ্ঞাত ব্যাপারটা কিছুতেই লুপ্ত করতে পারি নি ।
বেধলুম, হাতুঘের মনে একবার অবস্থান জন্মে
যেলে কিছুতেই আর তা বুঝ করা যায় না ।
মাগতীকে আমিই যে নিয়ে পেছলুম এ কথাটা
সম্পূর্ণ ঠিক না জানলেও প্রাণ আমার বিশ্বাস করে
নি । সুখে সে জ্ঞানতা ছোলেও তবে তার মনের
কোনখানে যে এই অবস্থানটা জেগে ছিল তা আমি
বেশ বুঝতে পারলুম । মেঘের অবিধার রূপে মেঘের
সেবার জেগেই সে আমার পাশে ভেঁক নিয়েছিল,
অমল কেমন তাইয়ের মত পরিপূর্ণ যেহঁদিয়ে
আমার বুকে ঝড়ের নিচেঁছিল, সে তখন করে
নিতে পারেন নি ।

না নিক্, তাতে আমার একটুও কতি নেই। আমি তাই গেয়েছি বা গেয়েছি, আমার বুক ভরে গেছে, তার বেশ ভালবাসা আমি চাই নে। আমি সত্যকে চিনেছি, আমি সত্য পথের পথিক হব, আর কিছু ধরকার নেই, আর কিছু আমি চাই নে।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা। পার্শ্বমিন অবকাশ পাই সিঁড়ি গ্রামে বেহলুম অবশের সঙ্গে, গ্রামের দ্বার নি, তার এ দিকে কাল ছিল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরেই অদলতে বহলুম একটু এস তাই, আমি তা করে আসছি।

সে আগন্তি করবার আগেই আমি বেরিয়ে পড়লুম।

আগুন মনে চলছিলাম বেশ, সন্ধ্যার তরল আঁখির তখন গ্রামের বুক ছড়িয়ে পড়েছে, বৃহৎ হেলপরে আরতির স্রব্দ শুকী বেধে উঠেছে, উজ্জ্বল আকাশটা আতে আতে মলিন হয়ে আগছিন্ন ঘাই বেধতে বেধতে আমি চলছিলাম। বাগানটার কাছে এসেই বমকে থাঁড়ালুম, এ বাগানটা প্রশান্তিহীন। বেহলুম পাছের নিচে অচলতার মধ্যে কে বলে। আমার পাশেই ছিল সে, একটু ভাল করে বেধতেই চিনতে পারলুম সে মালতী।

চাপা কান্নার শব্দ আমার কাণে ভেসে আগছিন্ন, আমি তাই থাঁড়ালুম। অশ্রুধা হয়ে ত্যাবলুম কেন সে কাঁদছে? তবে কি বা কিছু বলছেন?

না কিছু বলবেন এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। সেই মেঘবতী দয়াময়ী মা, ধীরে ধীরে একটা তিক্ত কৃৎযা কেউ কখনো পোনে নি, ধীরে ধীরে কল্লী একেবারেই কল্মসাতীত তিনি কিছু বলবেন? তবে—বোধ হয় প্রশ্ন,—না, সেও কিছু বলবে না। আমি প্রশ্নকে চিনি সে কিছু বলতে পারে না, মায়েরই ছেলে সে।

তাবলুম তাকে দিচ্চাঙ্গা করি কি হয়েছে, বিশ্ব প্রশ্নবটীর কিছুতেই কথা বলতে পারি নে,

কে যেন গলা ঢেলে ধরলে। এটি আমিই পেই—
যে একদিন—

না থাক সে কথা, ছোর করে এগিয়ে থিয়ে ডাকলুম “মালতী”—

সে চমকে উঠল। আমার সামনে “বেধে উঠে থাঁড়াল, তার কোল হতে সাধা যত কি একখানা পড়ে গেল, সে নিতে সে চাইলে না, কিছু আমি চাইলুম।

আমি বলুম এখানে এই সন্ধ্যাবেলা একলা কাঁদছে কেন মালতী? কেউ হোনার কিছু বদলেছে কি?

আমার কণ্ঠস্বরে কল্যাণ বেধে উঠেছিল কি কঠোরতা বর পড়েছিল তা পেই ই মনে। সে বাসিক চূপ করে থাঁড়িয়ে বসল। বৃহৎ পা লুম তার বুকের মধ্যে বাত-প্রতিপাত চলছে—উত্তর বেধে কি না। বাসিক পরে উত্তর ধেনে—না, কেউ কিছু বলে নি।

কথাটা শেষ করে সে দীরে দীরে বাড়ীর দিকে চলে গেল, আর একবার ফিরে ও চাইলে না।

অশ্রুধা হয়ে আমি তার পানে চেয়ে চাইলুম। কি অশ্রুধা বতাবের এই মেয়েটী। আমি তাকে এ পর্যন্ত, চিনতে পারলুম না সে কি। আমার সে ভাবি অবশ্যের চোখে বেধে, আমি যে একটা ম'ল্লব তা সে কোন কালেই মানতে চাই নি, আমিও মানলে না। এমন পক্ষিত ভাবে সে চলে গেল যে পেই পক্ষিত পা দু'খানার প্রতি কেপনের হাসটা যেন আমার বুকের মধ্যে গঁথে গেল।

আমি শব্দ করি ছেদলুম। ছিঃ, আশ্চর্য মোহ, আমার সব বিসর্জন দিতে হলে, আমার এ সব চিন্তা ভুলতে হবে যে। সে আমার না মালুক, তাতে আমার কি? তার চোখে আমার যে মানতেই হবে এমন কোনও কথা হতে পারে না।

বুকের মধ্যে হতে কে আমার চিন্তার করে বলে উঠল—বুঝা আশা, একবার এখানটার হাত

দিয়ে দেখ, তারপর কথা বলে। তুচ্ছ একটা নারী — সে কিনা তোমার মত একটা পুরুষকে এমন করে বুঝা করে চলে যায় ?”

হা—হ্যাঁ কর, হ্যাঁ কর তোমার ছেলেকে, আমার চাঁদিকে বাঁধ দিয়ে খেঁচ, তুচ্ছ উঠছে, বাঁধ তেঁকে গেলে আমার বান ডাকবে যে না। ধর্মতপসী, এলো না শক্তিবাঁহী, গীড়ার, যেমন করে মহিষাসুরকে হনিত পেরিত করেছিলে, আমার বুকের এই দুর্ভিক্ষ রিপুটাকে তেমনি হনন কর না।

বুকে মোর শেনুং। চলে যাচ্ছিলুম, চৌষ পড়ল দাবা সেই বস্তুর সঙ্গে। ভাঙ্গল দেব না, স্পর্শ করব না ; কিন্তু পায়লুম সেটাকে আমার তুলে নিতে হল।

একখানা কপাল, বুকের এখানা প্রাণবের সেই খড়ের কপাল ঘানি ; যেখানা সেদিন মনন নিকের হাতে মৃত কেটে তাঁতে বনে তার পর নিজের হাতে সেলাই করে প্রাণদকে উপহার দিয়েছিল।

এক দুর্ভিক্ষে চৌষের সমুখ হতে কাগো পড়ি। বলে শক্ত সেল, সহ্য আঁড়ার হবে সেল। বুকে কিন্তু বড় আঁখাত শেনুং তাই জড়ের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে হইলুম।

সস্তব—সস্তব, এসতে দবই সস্তব। মালতী প্রাণদকে ভাদবাসতে পারে এ ও যেমন সস্তব, আমার প্রাণদও যে মালতীকে ভাদবাসতে পারে সে ও তেমনি সস্তব। এসতে মস্তব কি আছে ? কিন্তু তবু মন বললে এমন ধরণের সস্তবতা সে আশা করে নি।

আঙুল নিয়ে বেলা—হাত পুড়বে, অংক পুড়বে। প্রাণদ আঙুল নিয়ে খেলতে বসেছে, তার সোনার ঘরে আঙুল বলে উঠেছে—এখন উপায় ?

কমানখানা পকেটখাত করলুম।

সেই দিন যে কি করে তার কাছে বলে ফেললুম প্রাণদবার সঙ্গে মালতীর বিয়ে দিলে কেমন হয় সে

কথা ব’লতে পারি নে। চেয়ে দেখলুম মার গোড়িঃনিগিত বুখানা নিমেষে বলি পংকর মত হয়ে গেল, অনিমেষে তিনি আমার পানে চেয়ে রইলেন, তারপর বলে উঠলেন—হিঃ কবল, ও কথা বলতে নেই।

সে কথা আমার বুকের মধ্যে গিয়ে এঁকে গেল। লক্ষ্য আর মাথা তুলতে পায়লুম না, আঁতে আঁতে বিবার নিরে বাড়ী এলুম।

তাই কি হতে পারে ? এ ও কখনও সস্তা হয় ? মালতীর সঙ্গে প্রাণবের বিয়ে—সমাজ কখনই লজ্জ করবে না। সমাজকে না মানিলুম—না কখনই লজ্জ করতে পারবেন না। মার যে ই একটী নাত্র ছেলে আর মালতী, সে কত সাধবার না পরিচিন্তা হয়ে গেছে।

রাজে ভাবতে ভাবতে কখন বুঁধের পড়লুম। বুঁধ ভাঙ্গল লকল বেলায়—প্রাণবের ব কার।

আঃ—কি বুঁধই বুঁধকে অবল, একঘণ্টা ঘরে ডেকে ডেকে আমার গলা ডেকে গেল। ওটা, বুঁধ হাত বুঁধে নাও, এখনি তোমার আমার সঙ্গে যেতে হবে !

আঁমি বড়কড় করে উঠে পড়লুম, তাকাতাকি বুঁধ হাত বুঁধে নিয়ে বললুম কোথায় যেতে হবে।

প্রাণদ বলিল—জমি লবা গুলো বেখতে অবল বুঁধ তাকতেই ওগে গেছে, বলে গায়ে তোমার নিয়ে যেতে। একটু জল খেয়ে নাও, ক্রিতে বেচি হবে।

প্রাণবের সঙ্গে বেকলুম।

এমনে পাঁশাপাশি ঢাক্ছিলুম, প্রাণদ মীর হয়ে বললে, কুমি মাকে লিজালা করেছিলে কমন মালতীর সঙ্গে আমার বিয়ে বলে কেমন হয় ? হঠাৎ তোমার এ কথা লিজালা করার সামনেটা কি ?”

লাগল কহে চেয়ে দেখলুম তাঁর বুখানা বেখ পাগল। তখন সব কথা খুলে বললুম, আর ও

বলল, আমার মাপ কোরো ভাই, আমি ঠিক বুঝে
পারি নি কখাটা কতদূর অজ্ঞান।

এসার এসার মুখে বললে, তোমার বেয়াকি
ভাই? তুমি ভাল কথাই বলেছিলে। মা আমার
মিছাদা করেছিলেন—

বলতে বলতে সে বেয়ঙ্গল। আমি বললুম
—তুমি কি বললে?

পজীর জুড়ে এসার বললে—একি হবার মত
ভাই? বিয়ে কখাটা কি যেমন তেমন বুকের মত
একটা কথা? ভাবনার সন্ধীনীরূপে থাকে শুধু
এখন করতে হবে শুধু তার বিস আমার দিক
দেখলেই চলেবে না, যেখানে হবে সবে আমার মাকে,
নিতে হবে আসে তাঁরই মত। আমার বুক চেঁচে
চেলের আমাকে মারি আবেশ লাগল কতক হবে।
মা ঘরে বলেন কে তোমার কাছে বড়, চোর এমন
অসুখু, মা মালতী না আমি, আমার অসুখুই
বলতে হবে সপনের আগে মা তুমি, তারপর আর
সব। আমার মায়েরই ছারি অসুখু নিতে, আর
সেই নারীই অসুখু পা সব। ভাই, আমার মা কি
যেমন তেমন মা? আমার মা যে পূর্ণি মা, তিনি যো
অসুখু নিত যে তাঁর কথা ঠেকতে পারব।
মালতীকে আমি ভালবাসি তা বলা তাকে গ্রহণ
করতে পারব না। তাকে আত্মবন এমন ভাল-
বাসার পরীক্ষণে কিছু আত্ম গ্রহণ করে বণে করে
আমার মায়ের চোখ অসুখু বহাতে পারব না।

বেয়ঙ্গল এসারের চোখ ছল ছল করছে।

মালতীর কথা

আমার দেবতা—গণো, তুমি আমারই একমাত্র
দেবতা। আমি তোমার তত্ত্ব করি, ভালবাসি,
তোমার পায়ে এঁটী লাগাত লাগলে আমার বুক
থিয়ে তা বাজে। গণো, আমি তো জানা করি
নি তোমার আমার এত কাছে আসা, কেন তুমি
এলে, কেন তুমি ছানালে তুমি আমার ভালবাস?

সে দিনকার সেই কখাটাই বেঁচে বেঁচে
আমার কানে বেন বেঁচে উঠে—‘বল মালতী বল,
তুমি আমার হবে?’

ছি, কিন্তু যেন তারতে বুকের চেতর তারি
গোপনে একটা পুঙ্কের গিরণ বধে বেঁচে,
আমাকে তা গতিবিজ্ঞ করে’ বিয়ে বেঁচে। আমি
কোর করে চাপতে চাইতুম—ছি, ছি, এ কি কথা,
একে মনে আনা ও পাশ।

মা হেলের কথাও আমি শুনেছিলুম। বুকের
চেতর লাগল মনে উঠল। হার, এমন করে
নিম্নে নিঃ। দুর্গল করে কেনে তুমি, শুধু
আমার গড়ে, গণো, শুধু এই হে, দুর্গা নারীর
অজ্ঞে।

কিন্তু তুমি বিতে এলে ও আমি নেব না। কেন
নেব? হার ছার আছে সে কখনও আমার জিনিষ
এমন করে নিতে পারে না। নিঃব হ’লে আসা
সহ কিছু নিঃব করাটাই না কঠিন।

পিশোয়ার দুখানা পজীর দেবলুপ, কেন, তা
আমি অসুখুই কতটা বুঝলুম। এই পাপিশো
নারীর জন্যে তাঁকে কত না সহিতে হলে। হেলের
প্রতি নিঃব হার হতে পারে না, হেলের যদি সব
অজ্ঞ কর তা তাকে আমার বুকের মধ্যে টেনে
ধাংবেনই। পিশো ও তো সেই মা।

কমলাবু আর বড় একটা আসতেন না।
সে দিন তাঁর চোখের লায়নে ধরা পড়ে গিয়ে আমি
যেন কেমন হয়ে গেছলুম, কি যে বলব তা কিছুই
ঠিক করতে পারিনি। এসার বাবু কদাল বাবা
আমার কাছে ছিল, ভাড়াভাড়িতে সে বিন কোথা
যে হারিয়ে কেলিছি তার কিছু ঠিক নেই।

পিশো এসার বাবু বিয়ে দেবার অজ্ঞে চেষ্টা
করেছিলেন, কিন্তু তারিফকে একটা কুৎসা বেরিয়ে-
ছিল যাতে সবক খোটাই হার হয়ে উঠল।

সে দিন আমি ঘাটে গেছলুম মল আনতে,
শ্রমাকো সে দিন নিঃব কাগো যেহে সেহে এসেছে

অধোভূত বিহীন, বেলা ঠিক মোটা দাঁড়ান না।
পুকুরের জলে কাণো ঘেঁষে চারি এনে পড়ে আরও
কানো দেখাছিল, তার ধারে ধারে বাবলা গাছে
হলধি বস্তুর ছল জ্বলি। দুটো উঠে অতি স্থির
দেখাছিল; দুহুনেই চেয়ে দেখছিল, এমন সময়
পেছনে কোমল ঘরে কে বলে উঠল "জল নিতে
এসেছ বৃষ্টি পরল বটে?"

তাকিয়ে দেখলুম প্রদীপবাহুদের পুত্র ঠাট্টার
সেই মেয়েটা। এর মধ্যে কখন যে তার সেই ছোট
শরীরটা বোনের তুলনায় রঙিন হয়ে গবে
উঠেছে তা আমি দেখি নি। অনেকদিন তাকে
দেখি নি, বোধ হয় বছর দুই তিন হবে, তার বয়স
অন্য ছিল বছর এগার বার, এখন বছর চৌদ্দ হবে।

আমি অস্বস্তি করে তাকিয়ে আছি দেখে সে
একটু ভাগলে, বললে—“আমার ভুলে গ্যাস নাকি
বটে?”

আমি মাঝে মধ্যে বললুম—না ভাই, ভুল
কেন? একদিন বৃষ্টি নামার ব্যক্তি ছিলে?”

মেয়েটি চোখ চুটো আঁচর চোখের ‘গরে
স্থাপন করে বললে—“হ্যাঁ, আমার ব্যক্তিতেই ছিল।
কি করব, এখানে অভ্যাচারে চোটে থাকতে
পারলুম না যে। যে তোমাদের এখানে লোক সব—”

চকিতে আমার মনে ত্রেনে উঠা সে সব দেখে-
ছিল, আমার ঘরে যে দিন অভ্যাচার হয় সে দিন
সে একা ছিল। আমি তাকিয়ে দেখলুম তার মুখ-
খানা তারি মগন। মিজালা করলুম—তোমার বা
কোথা?”

তার চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে পড়ল। শুনলুম
তার মা নেই, তিনি অনেকদিন আগে দাড়া গ্যাছেন
মাঝে মাঝে অনর্থক এ তার সইতে রাবি হানি
কারণ শরীর বিয়ের তার তা বলে তাঁদের বাড়ি
পড়ে। মাংসের এমনই তো গ্রাহ হচ্ছে। হুবেলা
ভাত বেগুনা খেতে পারে, পরনের ছেঁড়া কাপড়-
খানিক ধান করা চলতে পারে, কিন্তু বিয়ে বেগুনাটা,

তাতে অনেক পরচ পড়ে বাত, কানেই বিয়ের
আগে আত্মীয়রা তার নিতে চান না। বাবলা
পত্র তাতে এনে তার কাকার কাছে বিয়ে
গ্যাছেন, কারণ জাতটা তাঁদেরই; কলর হল
তাঁদের স্কেনেই হবে, মাংসের কি, বিশেষ তাঁর বোনই
বধন নেই।

হনটা তারি কোমল ঘরে এ'ল! আমি
অত্যাশ্রিত দেখেই তার মনোরম গলায় এই বসনেই
বোনী রক্ত চেনা শোনা হয়ে গ্যাছে। মিজালা
করলুম—“কাকা কাকিনা ভাবাছেন?”

শী একটু হাসলে আমি, তার সেই হাসিতেই
আমার প্রাণের উত্তর আমি পেলাম।

জল নিয়ে ব্যক্তি এলুম, মনের মধ্যে দেখেই
স্থির মগন। মুখখানা, তার হৃৎকণ্ঠের কথা শুনে
জাগ্রত। আমি নিয়ে গিয়ে দেখেছি বসনে তার
হৃৎকণ্ঠের সঙ্গে আমার হৃৎকণ্ঠের আশ্রিত করে
লাগল। যে ব্যক্তি পেয়েছে, সে ব্যক্তি ব্যক্তির
ব্যক্তি তার কেউ বুঝতে পারবে না। বনী কি
অভ্যেবের জালা বুঝতে পারে, বিয়ের ব্যক্তি অজ্ঞান
করতে পারে?

আমার নিজের কষ্ট ভুলে গিয়ে তাতে
লাগলুম, এ দেখেই: ক কি করে স্থায়ী করা যায়?
এমন কি কেউ নাই যে তাকে বিয়ে করে?

হঠাৎ মনে জেগে উঠল, প্রাণবাহুর কথা।

এ হতে পারে না কি? প্রাণবাহুর বিয়ে করা-
বেন না বলেছেন; এই তুমি স্থায়ী নারীকে ভাল-
বাসেন বলে আর কোন নারীকে ভালগণ্যে পাব-
বেন না। তিনি এখনই তাৎক্ষণিকের কারণে করে
যাচ্ছেন, কিন্তু এও কি একটা দেশের কাম নয়?
এই যে স্থায়ীটি, একে এই ব্যক্তি কষ্ট হতে উদ্ধার
করা এও ত দেশের প্রাণ কাম। এ'ল! নাকি হয়
তো কোনও ভবিষ্যৎ উদ্ভূত, নাকি হয়তো এক
সম্পর্ক করবেন, এবং জীবনটা একেবারেই নষ্ট
হয়ে যাবে, স্থায়ী নাগের তরেই হারাবে।

অন্য নইলমাত্র গ্রহণ করে সে শুধু বার্ষিকই থাকবে। আর তাই মাতৃক, এইটাই যে জীবন কথা। যেনের সেবার চাই মুহুর্তসংকেতী সজ্ঞান। তার সজ্ঞান হবে চিত্তকর, তার স্বাভাৱ যেনের কোনও উপকার হবে না, সে একটা। গল্পগ্রহণ করে যেনের থাকবে। এমনি করেই না আদ্যের যেনে, কর যেনে কর্তৃক প্রকৃতি লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মাতৃকের বিকাশ হতে পারছে না, যেন অংশেপাতে যাচ্ছে।

প্রদ্যাব্যবস্থার কথা শুনেছিলুম, শিশুসময় সতে তিনি দেখিন এই কথাই বলছিলেন। সজ্ঞানের স্বাভাৱ, তার ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতি কাল যাত্রায় পড়েই নির্ভর করে। সজ্ঞান যে হবে, সে স্বার্থপর সজ্ঞান হতে পারবে বাগ যাত্রায় ভুলে। কুচরিত্র বাগেরও অনেকগুলি সজ্ঞান হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের স্বাভাৱ—সে কথা বলে আর কাজ কি? আমাদের যেনে তার তো অগ্রভুল নেই।

বলব—এ কথা আমিই শিশুসময় বলব। তাঁকে শু একবার বলব কি? বলবা মাত্র তাঁর

স্বখানি কি রকম হয়ে যাবে—তিনি হরতো। তাইযেন, থাকে আমি এত ভালবাসি, তারই যুগে এই কথা।

যুকের অতি গভীর এক জাহ্নবায় বুঝা যেনে উঠল, তাঁর স্বখানি কর্তব্য এনে কণিক বিভোর হ'য়ে যেনে উঠলুম।

না, তবু বলব। এতে তাঁর ভাল, যেনের ভাল, যেনের ভাল, আর এই যেনেটীর ভাল। আমার শু এতে ভাল।—

এতে ভাল? কিসে ভাল নয়? আদ্যের যেনেতা তিরি, যেনেতাকে শুক উপরেই রাখতে চায়। শুক আশা করে না যেনেতা তাঁর কাছে আশুক। যেনেতাকে দিতে হবে শু ক্রি, প্রেম, ভালবাসা। আমি শুদিকে যাব, আমার যেনেতাকে আমি নিঃশেষে কেবল তেল দিয়ে যাব, শুকে সকল আশা বিপর্যয় হ'তে রক্ষা করবার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে পায়ে তলায় দাঁড়িয়ে থাকেযো। আমি আমার যেনেতাকে নষ্ট করতে পারব না, নিঃশেষ হাতে তাঁকে কাঁচা মাথাতে পারব না। * জবাব:

ভবিষ্যৎ ।

(গল্প)

(প্রিন্সিপাল সাহাব)

হেলেনেবার পুত্র ভাল ছেলে থাকলেও, পাক্কা ও পড়াই সন্দেহ। কিন্তু আমার বেশীদিন ভাল থাকতে দিল না। ঐকান্ত বকশে যোড়া লাগতে বনন সমস্ত বাঙালার হেলেনেবার উঠে পড়ে লাগল, শুকন আমার পাক্কা হেলেনেবার, বহুতারা এক পরিভ্রমক জমির চারদিক বিখ্যে হেলেনেবারের 'সুখ বন্ধ' করে হেলেন—একটা লাঠিধেলার শু কুটির আঁকা করে।

হেলেনেবার কেবল মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছি। পানের বহর বেলবার লাগেই বিভাতি ভিতায় প্রণাম করে, আদ্যের মাটি গারে বেবে যেনেতাকে হুট-সকল হলা।

বাবা ছিলেন ঐটি রাজতত্ত্ব—সরকারী বেতন-ভোগী যুগে। তাঁর পুত্র হয়ে, যেনেটীর উন্নয়নতা বিদ্যুত হেলেনেবার আদ্যের শুকাকী জীর বন শু বাবার পৌষতায় আমাকে ভবিষ্যৎ হাকিদি

পরের বলই এসেছিল যেখানেও—আমি কিন্তু কিছুতেই নিজে হলাম না।

বিধ-বিধাঙ্গের অতঃপ্তি ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে, অনিশ্চিত হাকিমি পদের আশার লাবণ্যে পৌঁছান অলেকা লাগি বেশ এবং সুস্থি করে বেশোড়ায় যখন 'অনিশ্চিত', তখন 'হাড়িরা সুখের প্রাণ যে অধোব জন', এই বিচোপণে আমি কেন, আমার মতন অনেক সুখের ছেলেই প্রবৃত্ত পড়া যোগে বেছে বেবে। কাজেই—বাবাকে নিষেধ করবার অবকাশ না দিয়েই, তাঁর শাসন-মন্ত্রির বাইরে যেখানে পড়লাম। বা সরস্বতীও হাঁপ ছেকে বাঁচলেন।

লেশাশঙ্কর ইত্যাদি দিয়ে বিগত তেলে বেশোড়ায় যেতে উঠলাম। লাগি:খলা, পান পাওয়া, কালে অকালে ভলেক্টারি করে বেকান এবং তাই বেড়ে উঠল, যে সময় বত মানাহারের সময় হয়ে উঠল না। যেসে মেলে হাওয়ার তরে না হলো—অতিরিক্ত বয়েসীতার যে একটা অল্প কিছু হতে পারে এই ভাবনাও না চিন্তিত হয়ে একদিন পিতার কাছে অজু:বাগ করলেন। পানের দর থেকে স্পষ্টই শুনতে পেলাম বাগ বললেন, "বাগ নিয়ে কোন কন নেই—বল উল্টো বিপত্তি হয়ে যাওয়া। জৌকের সুখে জুন পড়লে, আল:নিই কানু হয়ে পড়বে, তাই:বা কোন কারণ নেই।" বাবার কথার সাহসটা খুব বেড়ে গেল, কারণ বেশ গোড়া গেল যে তিনি পুত্রকে শাসন করতে নাগাম। তবে জৌকের সুখে জুন পড়ার কথাটা শুনে একটু দমাহুয় হলান।

বেল নির্জিবায়ে কিছুদিন কেটে গেল। এই সময় হঠাৎ একদিন আদ্যের সমিতির জুজুখের হাওয়া গোপনাল শুনে, আদ্য কথেকজন হাওয়া বেরিয়ে দেখলাম—একরম বৃদ্ধ নিরুপায় হয়ে পণির তেতর একটা নোঙা নর্দবার 'পাঁচ আইনেস' নিষদ তব করাত, পাছোড়াল তাকে খামার নিয়ে বাবার লজ টানাটানি করছে। বৃদ্ধ কাহুতি মিনতি

করছে, কিন্তু সরকারের শাস্তিরকক কিছুতেই নিষদ-তারানী করতে রাজী নন। বাবার বেগে লজার হয়ে পাছোড়ালকে বললাম, "কেন বাপু বৃদ্ধ হাছুরের নিয়ে টানাটানি করছ, কিছু নিষদের বৃদ্ধা হয়ে দ্বিদ্ধি—ছেড়ে দাও"—কিন্তু চোরা না না গোনে বর্ধের কাহিনী। জেহু—একবারে দস্তাবে জুজুখের বললেন, "এ বৃদ্ধা বংবনী ছা:য়—ইলু:কা মেই ছোড়মে হাছুর, তোন গোক হাছুর হাছুর, বললেন—তা:হাছুর:কা তি পানায় মে হাছুর।" হাকিমের ছেলে হয়ে একটা লাভটাকা বেতনের চৌকীদারের লখা চড়া কণা শুনে, বাবার হোতা:না কিছুবিলু করে উঠল। সরকারে কনেটগল মহাবীরকে হাছুর নিয়ে বৃদ্ধ:তা: কণা থেকে বৃদ্ধ করলাম। হাছুর বেগে প্রবৃত্তি এবং মহাবীরের রণ যোবনা করলেন। বেগতে বেগতে লোক, পাড়া, খোড়া, পুনিব হাছুর হাছুরে লখে একটা "বংবনী মেগার" লুই করে কেলন। অবস্থা বৃদ্ধিতে পেরে চারিবিদে তাকিয়ে দেখলাম যোগমাগে বৃদ্ধ লগে পড়েছেন—যার অবস্থা ক'ল পুনিবের হাতে লগে বত অবস্থা বাগ পড়েছি।

বৃদ্ধ ছুনিমে খানার পেলাম। কিন্তু উপরি উপরি গুতের দিন হারতের নানাবিধ শাসন সংস্কার মেবে এবং কিছু কিছু উপগোণ করে, হুঁচুটি, কনহারে, অনিবার—আগমনা হয়ে পড়লাম।

শিগা নির্জিবার? পুরের এই বিপদে বিপত্তি পুরের কথা, নিষদ হলে বিনশাত করছিলেন। সমিতির বোভারের ছুঁচুরজন এগে হাছে হাছে উৎসাহ দিয়ে যেতেন—বেগের লজ জেল খাটো তার চিন্তা কি? কিন্তু লেগে হবার পুঞ্জীং বেরণ নিষদন দেখা হাছুর, তাতে বেগের প্রতি সজ্জির হাছুরাটা বেন বিত:যিকার ক্রমেই অত্রিত হয়ে হাছুর।

বাই হোঁক গুতের দিন পরে, সরকার হাছুরের আদ্যলতে বাগবত দিখে নিয়ে গে হাছুর নিষদ

পেলায়। অবাগত থেকে বেরিয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন চারিদিকে ‘বেশেঘাতরদ্দ’ জ্বলি এবং ফুলের মালাব বহর বেখে হাজতের হেফাজতের কথা জুলে খেলায়, উৎসাহে বুক আবার স্তীত হয়ে উঠল। কিন্তু সে উৎসাহ বেদী বিন রইল না। চারিদিকে তখন ঘন ঘন ঠাণ্ডি এবং বৌগাজের বানী থেকে উঠে নিখোঁব বাগানার পত বৎসরের পরীক্ষিতার জ্বার নীতন তক্তপ্রাণ, ছিন্নের জলে ভটা আত্মপ নিতিয়ে রিল।

দীরে দীরে বাগানার অবশেষ:

নিকা পড়ে গেল।

(ছবি)

কথার বলে ‘হুজুরে চীন আর জুজুয়ে বাগানী’। ঘোণাকারের হুজুর যখন বাগান চলে চালা পড়ে গেল, তখন ঘরে বলে ভাবতে কাটা বড় একঘেয়ে হয়ে পড়ল। নিকর হঠাৎ বলে, নিকরকার চিত্তে পিতার অঙ্গলংগ কণা বাতে সইল না। বলে থাকার চেয়ে ব্যাঙ্গার খাটা ভাল। তাই চাকরীর চেষ্টা কিছুদিন উদ্বেগী করে দে গায়। কলকাতার কিছু সুবিধা না করতে গেলে অবশেষে বিদেশে যাওয়াই হির করলাম। কিন্তু বাই কোথায়! বাড়ির বাইরে কখনও পিতা, মাতা, ছেড়ে পা বিই নি, হঠাৎ একলা বিদেশে চাকরী করতে বাধ্যও চিন্তার কথা। পিতার এক বড় ভীত কোনও আশ্বাসের নিকট হইতে পক্ষিম্ব রেল আকিলের এক ডে বাবুর গুণর স্পারিশ পরত সংগ্রহ করে বিলেন। বা কিন্তু কিছুতেই যাবি হলেন না, পূজকে একা বিদেশে ছেড়ে বিতে। তবে ভীত অসম্মতি পিতারি মতাবতের কাছে টিকল না—পাক্ষে বাওয়াই স্থির হইল।

পাক্ষি পূর্ণিমা বেখে, ততদিনে যাদের বেওয়া তেজিল কোটি ঠাকুর দেবতার প্রণামী ফুল বিধ-পত্রের বর্ষ এটে পিতা, মাতার চণে ফুল মাথার নিম্নে একদিন পাক্ষি রওনা হলো। রাজিলাসে

ঐশ্বর্য প্রজালানে এসে পৌছল, অন্তরাজে নিকরকার যানে কোথায় বাব স্থির করতে না গেলে অবশিষ্ট রাজিলাসে জেপনেই কাটিয়ে বিলায়।

পরদিন প্রাত্যে বড় বাবুর সঙ্গে বেথা করতে, ভীত আকিলে বেলায়। মস্তবড় বেলায় তারখানার আকিল পেটের সুখে পৌঁছে একজন দার-রক্ষককে বড় বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করার, সে বড় হাতে আবারে বলল ‘কেহা বাবুরী—বাবুরী করলে আরা? হাব লোককে বকসি? ত’ হুহ বিলায় চাখিয়ে—’ নেহাৎ বোকা ছিলো না, পেগাইজীকে বিই খবার জুই করে বড় বাবুর মস্তান পেলায় বটে, কিন্তু—একবারেই বর্ণন বিলায় না। চিঠিখানা পাঠিয়ে আবদটা ভীতের কাকের মত অনেকা করার পর—ভীত তগব এস।

ততদিনেই বলে, বাবুরের আকৃতি বেখে তার প্রকৃতি বোকা হাব। তাই আবার চাকুরি দীরেনের প্রথম ও শেষ কাড়ারী বড়বাবুর একই বর্ণনা করছি। তবিল্পদের কথা যদি লতা হয়, তবে তা হতে ভীত প্রকৃতি বৃত্তে কাকের বেনী বট হয়ে না।

বাবুরট—বর্জিত, হেল কোম্পানীর উদারতার বেধের অস্থায়তে মাথার তাপ বেনী হওয়ায় এক অপরূপ তপের স্থিতি করেছে। ছোট চকু—গোলাকার, কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ তপে স্থিতি। বর্ণন বনজান, তাতে পেতলা মাথের অস্থায়তে সুখে অলকা তিলকা হিল। কণ চাপকনের মধ্যে বাবুরটিকে চিনে বের করা একটু প্রবণে স্থিতি প্রযোজন। এই—ত’ পেগ আকৃতি। তার গুণর—কর্তব্য একবারে কোমল-বর্জিত রাসত নিমিত্ত—গাভার—তাপ পরাই হয়। অর্থাৎ সর্বপ্রথম বাবুরটিকে পৃথিবীর আত্মতা বহুর তালিকাভুক্ত কালে আত্মবৃত্তিবিল্পের একটা নুতন আবিষ্কার!

এ যেন বড় বাবুর মস্তবে অর্জবটা বিকিয়ে, ফুল সুদীর পাক্ষির বিধে—বাধ্য হগ বাসিক—বর্ণন পূর্ণন-

টাকা যেমন। বাই হোক তখন যেমনের বিবেচনা
তাকতে গেলে চলে না, তাহাই নিঃসন্দেহ করে
নিগাম।

আকস্মিক একটা মেসু ছিল। বড় বাবুর আদেশে
সেখানে নতুন পেশাদার। তখনকার মতো যেমন
ছাঁটকা। এই মেসুটও তেমনি সর্বস্বত ও সর্ব-
স্বত্তের একটা ছাঁটকা—বাড়িটতে হয় সাতখানি
ঘর, প্রত্যেক ঘরে দুই, তিন বা ততোধিক
লোকের স্থান। সন্ধ্যাে উঠে আটটার ভেতর
দুই বাই কাঁকে বেরিয়ে যান, দুপুরে ঘটাখানে-
কের লজ বাঁধা ছুট পান, নাকে সুঁধে বসে। তিনে
আবার চলে যান। বাবার সঙ্গে দিনের বেলায়
সবই এইটুকু। তারে কিছু সম্পূর্ণ বিপরীত। ঠান-
দিত পল্লের সুবন্ধ পরে বেগের মত দিনের বেলায়
সবই—রাতে সন্ধ্যায়। পান বাঁধা বিবেচনা,
খাওয়া দেখা আঁ, আঁমাখ আঁলা, চালি কাটা,
পানিমা পানিমা মাংস সাংখ্যিক হয় চুপের বিশাখ
মিলাখ বা কিছু লজ তারে। আর এই সমস্ত
সম্মান স্থানের প্রধান কেজ ছিল আঁমাখের
মেসু।

আঁমাখ স্বরূপ ভেদে এসে, প্রথম দিন সূতন মাং-
সায় অপরিচিত লোকের সঙ্গে জ্ঞান খুলে নিখতে
না পেতে, বিজ্ঞানীয় ভাবে এক খানি সাংখ্যিক পত্র
লজ্জিত। মানা চিত্রা এসে ঘোরে ঘোরে মাংস
ভেতর ভীত করে তুলেছিল। পানের ঘরে তখন
পুরাণের মকলি চলেছে, বিবেচনা আঁমাখিত
স্বাভাবিক পান করে অসংকেই ভরপুর। পান, মাননা
হালি আঁমাখার ভেতর থেকে ঠাণ্ড অপরিচিত
কর্তৃক বলস "হাঁহে মনো, ও নতন ছোঁকাট
কে বে প আঁকিলে তত্তি হল নাকি প"

মনোনাথ—একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন "চন্দ্রবাবু
আঁমাখের হা। বড়বাবু (বড়) টবড়ো কেউ হবে,
পুঁড়ি বড়বাবু পুঁড়ি পুঁড়ি লোক চন্দ্রবাবু হালনা
ভাইকে না বিবে, হাঁহে অত নোজাখ ব্যাং তার হয়

কি প" মনো নাথ্য কথায় একটা মিলিত
ব্যক্তি মাঝে একটু সঙ্কট করে তখন।
বড়বাবু, আঁমাখ চাকরিতে বাধ্য লজ্জিত নয়।

স্তিম

বাবু তখন সূতন মাংসের মাংসের মাংস
বড়বাবু খুঁই আঁমাখ আঁমাখের মাংসে
মান মাংসের পুরে আঁমাখের ছুঁই পর একটিন
বড়বাবু কেউ বললেন "হাঁহে—ছোঁকাটা, জুঁই এ-
টান পান করে প"

আঁমাখ হা—

"বেগ—তা এক কুলা করতে হচ্ছিল।"

মনে করলাম, হতে যথাস্থান হয়ে আঁমাখের
কোনও ভাগ কাঁকে বেগের মাংস কবেই, কুলা-
স্বাভাবিক "বলু।"

"হা। বেগ—তোমাঝে গিয়ে—আঁমাখের—
মেসুটাকে সন্ধ্যায় লজ্জিত মাংসের করে পুঁড়ি
আঁমাখের বুলু। তাতে—তোমাঝে গিয়ে—তোমাঝে
ভাগ হয়—বা তোমাঝে গিয়ে—তোমাঝে
মাংসকে বলে কবে তাই কি একটা ভাগ মাংস-
লজ্জিত করে বিবেচনা। মাংস থেকেই তোমাঝে
গিয়ে তাহলে বেগ—হাঁহে।"

একজন বড় লজ্জিত মাংসের গুণ। তখন
এক লজ্জিত নয়। কেজাণিমা গুণ চাকরী তখন
বড় বাবুর বেগের মাংসের উত্তর নেই। কাঁকেই
সেইদিন লজ্জিত হতে তার হেগে মেসু পুঁড়ি
আঁমাখের মাঁটাটা নিগাম।

বিন ছুই বড়বাবু হেগের মাংসের পুঁড়িই মাংস
চন্দ্রবাবু। হেগে ত' নয়—হাঁহে খুঁড়ি—মাংস
বেগ। তাহা যে বড় বাবু হেগে মাংস মাংস
তাঁদের মাংসের মাংসের এক আঁমাখ তাঁদের মাংস
মেসুটাকে বড় মাংসের মাংসের বিবেচনা
মাংসের মাংসের মাংসের মাংসের মাংসের
মাংসের মাংসের মাংসের মাংসের মাংসের
মাংসের মাংসের মাংসের মাংসের মাংসের

আমি এমন বিব্রত হয়ে পড়লাম, যে অন্তরিক্তে নহর
কংকার আবার অঙ্গুর ছিল না।

মি শীঘ্রই কোন একাধারে তাহের পরশায়ল থেকে
বৃত্তে পারলাম যে—একের সংসর্গে আর কিছু দিন
থাকিলে আমার নিষেধ যা কিছু ঘোষণা আছে,
তাও ভুলে যেত হবে। তার ওপর হেলেন হুটির
সমুদ্রজ্ঞান বেবে একদিন অগ্রমনতে বহতানি
বেঙোর বেশেও গুরুত্বপূর্ণ জিনি শুনে আমি হতান
হয়ে পড়লাম। বড়বাবুকে বলতে বাধ্য হলাম—
আমার যাগা তাঁর পুত্রের শিক্ষকতা অঙ্গুর।
কিছু এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাশানে বড়বাবু আমো
সহ্য হলেন না। আমার প্রতি প্রতিশর চেষ্টা হলে,
আমাকে এরা আমার এনটাল পাপ করানি গুরু
বিশিষ্টালয়ের কর্তৃপক্ষপক্ষে নানাবিধ গুরুত্বের
বিশেষণ প্রাচীরে মাধ্যমিত করলেন এবং পুতি-
শেবে এ কথা বলতেও ছাড়লেন না যে—তাঁর
আকিলে আমার অগ্র আর বেনী দিন নাই—।

এই ঘটনার পর মাল হুতিনের ভেতর বড়বাবু
সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিভাল—আমি ও তাঁরকলা।
এমন দিন যেমনা যেদিন তাঁর সঙ্গে হাতাধাতি
হবার উপক্রম না হত। আমিও নাচোড়বাধা—
চাকরী ছাড়ব না।

নানা অস্থিগাতের যখন আমার সঙ্গে তিনি
লেগে উঠলেন না এবং দেখলেন আমি বেগে ভিলে
বেগলটি হলেও—এক ঝটপটে শুকনা, তখন বড়-
বাবু সাহেবের পরশ নিলেন।

এই সাহেবটি ছিল বড়বাবুর হাতে কণের
পুতুল। তার বড়বাবুই মাথা পিটিয়ে তাকে মাদ্রাস
করেছিলেন। সাহেবের কাছে আমার মাঝে তিনি
অভিযোগ করলেন—আমি চরিত্রহীন, চরিত্র
হাতাল। আমাকে আকিলে রাখলে আকিলের
অভ্যন্ত বাহ্যিক বিশদ্রাঘ্য হবে। এবং আমি যে
হাতাল তা প্রমাণ করতে তাঁর বেনী বিলম্ব হল না
—বড়বাবুর অঙ্গুরহাণ্ডাঙ্কী অনেকেই এ বিষয়ে

তাঁর কথাই লাগ দিল, আর—আমাদের বেগে আমি
শেখাবার হাতাল মাঝে ব্যাত—গেই—বেনীবাবু।
চরিত্র হীনতার কথাই বড়বাবু আমার গুরুত্বই
পল্লানবনে বললেন—আমি যখন তাঁর পুত্র কতার
পূর্বনিষ্পত্ত ছিলার তখন তাঁর বাড়ীর ভেতরে
মিকে সুদৃষ্টি করার—তিনি আমাকে বিভাতিত
করেছেন এবং অভ্যন্ত আরও নানা কথা—অনেকের
সুবে শোনা যায়—।

তাঁর এই হীন অভিযোগে চাপে, দুশায় আমার
বৈধীভূতি হল। সাহেবের গুরুত্বই তাঁকে বেশ
ছককা শুনিবে দিলাম। এই উদ্ভয়ের মত সাহেব
আমাকে একমাসের নোটিশ দিলেন। চাকরী যায়
যাক—আমি একটুও হুঁতবিত্ত হইনি। এত বড়
শত্ৰুতানের তাণ্ডেবাতী করা অপেক্ষা হুঁতবিত্তি করে
খাওয়া ও গায়ে জেগে। মাদ্রাস হয়ে বাস্তবের
প্রতি এই অমাসুখিক অভিচার অত্যাচার করে যে
শক্তির অপব্যবহার করে, তাকে একটু শিলা দিয়ে
ঘোরাই কেহানীহুলের আনোজের লাগ করার
প্রলোভনটা কিছুই আমি সন্ধান করতে পারলাম
না।

যাকবের সব চেয়ে বড় মর্জলতা হচ্ছে এই—যে
শে তাঁর নিষেধ চরিত্রটা একটুও বিভাতি না করে,
অপরের চরিত্রের বিরোধ করতে যায়। বাইরে
মাথুতার ভাগ করলেও এবং পাংকে চরিত্রহীন
বলেও, বড়বাবু নিজে ছিলেন একটি গতিতারের
প্রতিষ্ঠি। বয়সের চাপে, বর্ধকের যৌর্জলতা
গোপন করতে ‘জনপথের’ আত্মর নিতে শাংল না
করলেও, অধিকেনাৰি বিবিধ ভঙ্গিমায় তিনি
ছিলেন পুণ্যভঙ্গর একজন পথিক। কোন কোন
বেহতার বেহন ‘বোহ’ হয়, তেমনি এই বড়বাবু অপ-
বেহতারিরও বাহ দিন ছিল—শনিবার। আকিলের
যেনা পাও। চুচিয়েও, এই বহাঞ্জুর পাগনাটা
খিত গেই শুতবিনের মত আমাকে আরও হুঁতবিত্ত
দিন অপেক্ষা করতে হল।

সমিবার হাত। একে বঁধাফল তাঁর ওপর সন্মত দিনের কুটীয়ার সাং। পৃথিবীকে একেবারে পাখাবৃত্ত করে তুলেছিল। তাঁর মশটা বেছে বেছে, তখনও কিং কিং করে কুটী পড়ছিল। ওজাটীর একটা হুড়ি দিয়ে বড়বাবুর মালকে। অস্থানে এসে দেখলাম লম্বা বরষা বড়। বস্তাখানেক একটা গায়ে তলার অপেক্ষা করার পর প্রভু বর্ষন হলেন।

আমি আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিলাম। মাঝারি টুপিটা খুব পর্যাপ্ত চাপা দিয়ে, হাতালের মত টলতে টলতে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই—প্রভু বিড় বিড় করে বকতে বকতে পাশ কাটিয়ে বাঁওরার চোঁটা করলেন। আমিও বড় বকবোর একটা হোঁচট, খেয়ে একেবারে তাঁর খাড়ে গিয়ে পড়লাম। অহিংসের লম্বাট নেশা, হঠাৎ হাতালের বিপত্তিতে চোটে বাঁও-বায়, একেবারে অরিবর্ণা হয়ে, তাঁর সেই রাস্তা-নিশ্চিত হয়ে লম্বা তাহার সালি বিতে লাগলেন। আমি মালামালায় দিকে কর্পাত না করে পুনরায় অঙ্গের হতেই প্রভু আমায় এত খাড়া হারতেই—খিগণ বলে তাঁকে পুনরায় আক্রমণ করলাম। নেশায় ঘোরে নিজের শুকতার শাখাতে না পেয়ে তিনি হাতার ওপর আশ-সমর্পণ করে টোঁতে লাগলেন। গোলমাগ শুনে হুঁরে বাড়ীভদার বরষা খোলার লম্বা শুনে—আমি আর দেবী করতে পারলাম না। বা কতক উত্তম বরষা দিয়ে হাতার ঘারে মর্কমায় গিলে সন্ধানের মত গড়িয়ে দিয়ে চম্পট দিলাম।

সেই রাতেই প্রভু এবং প্রভুর স্থানকে দত্তবৎ করে নৌকায় হওনা হলাম। পরে শুনেছিলাম, প্রভুর সে দিনের খাড়া সাধলগে—আর মাসাধিক কাল সেগেছিল এবং তিনি আমাকে বিশেষ সন্মত করলেও, সে কথা নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করেন নি।

চাক্স

পশ্চিম থেকে কিরে আলার পর দশ বছর কেটে গিয়েছে। সন্ধ্যারের অবস্থা যা চিরদিন হয়ে,

আমছে—আমারও সেইরূপ। বাবা পেন্দন নিয়ে দেশে চাষবাস করছেন, আমাকে আর চাকুরী যেহীত হুঁচরে যেতে হয় নি, এক পুরস্কারের মত থেকে দেবারের দালানী শিবহিলায়। আমাকে কলকাতাতেই থাকতে হত, তবে প্রবিশ্রামত অবদর হলে মাসে মাসে বাড়ী যেতাম। এর মধ্যে অল্প এখন কোনও—উল্লেক ঘোণা ঘটনা ঘটে নাই।

এই লম্বা প্রকালে মাঝের এবং মেশপো বাঁওর ইচ্ছা হল একটি পুরবৎ ঘরে আনেন। আমি মোটপুত্র—সে কারণ, সাবটা বেটাতে হলে সাবাকেই উপলব্ধ হতে চাই। 'লম্বা' কথা বলতে গেলে—বিবাহের বিশেষ লক্ষণাতী আমি ছিলাম না। তবে পিতা, হাতার অতিমায় অপূর্ণ লম্বাটাও খুব মদ্য-তীন বিচেনা করলাম না। কাজেই—গাঁবের প্রভাবে আমাকে লম্বা হতে হল।

পাত্তি নির্জাটনের বটা পড়ে গেল। আমায় স্বপ্নন মনোমত পাত্তির সন্ধানে উঠে পড়ে লাগলেন। হুঁচরবার আমাকেও খাটাই করতে কাজার লক্ষ হতে হুঁচর জন এলেন। দেয়ে দেখা লম্বতে হুঁএকবার আমারও মতামত জিজ্ঞাসা করা হল, তবে আধুনিক যুগের ছেলে হলেন, স্ত্রী-নির্জাটনের ভারটা পিতা, হাতা, আমায়-স্বপ্ননের ওপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত করে নিশ্চিত ছিলাম। আশ্রয় এর মধ্যে একটু কথা ছিল,—খাড়া ছিলেন লম্বাঘরার বিবাহো,—সে কারণ আমার ভয়না-ছিল—তিনি বিনা কড়িতে একটা কুণ্ঠিত পুরবৎ কখনই ঘরে আনবেন না।

কয়েককাল অতুলকানের পর, প্রমাপতি লম্বা হলেন। শুনলাম, আমায়িই গ্রামের কিছুকরে মেয়ের বাড়ীলাগল। সেইখান হতেই বিবাহ হবে, কারণ মেয়ের পিতা পশ্চিম চাকুরী করেন। সে কারণ তাঁর ও আমায়ের প্রবিশ্রাম লম্বা তিনি এখানে এগেই মেয়ের বিবাহ বিবেচ্যে যাবেন।

খুব খুবখাবের সহিত পাকা দেখা প্রকৃতি লম্বা হল। বিবাহের দিন বরবেশে লম্বা হতে

ক, বাছর আখীর স্বপ্নন নিয়ে বিবাহ বাড়ী উপকৃত
হল। নেবেহ হাতুসই—কতাকারী। স্বপ্নন
হাশর ১৪৪ মস ছুট না পাওয়ার পূর্বে আসতে
পারেন নাই। বিবাহের দিন বিগ্রহের আসবার
কথা ছিল, কিন্তু শিখালম্ব ট্রেন বেশ হওয়ার, পরের
বাড়ীতে অর্থাৎ হাত বন্টার পর এসে পৌঁছিয়েছেন
হাশি। টেলিগ্রাম করেছেন। বাই চোক, তার
ভক্ত আবার কোনও অগ্রবিধা হয় নাই। বখা-
হিত নিম্নোক্তসারে বিবাহ হবে গেল। বখাজীরা
আবার করে বিগ্রাম করতে গেলেন। আদি সাগা-
রা জাপানের ভক্ত প্রস্তুত হয়ে বাসনের প্রবেশ
করল।

বাসর ঘরের আশর স্বপ্নন বেশ করে উঠেছে,
তখন বাইরে বোলদাল ও কথারী। শুনে বুলদাল
বক্তর মশাই এসে পৌঁছেছেন। তিনি বলছেন
হাশাল—২৪ কোষায় রে! আচ্ছা জুপিয়েছে এই
ই, বি, রেল কোম্পানী। একটি কি চুট মিনিটের
মত ট্রেন দিল্ করলাম। হাশাল আবার হাশা
বক্তর মশাই—উত্তরে বললেন “তা হাঙ্—ভাল
ভাল কাক মিটে গেছে। এখন হাত পা বোঁধ—”

“হাশাই বাবাজীকে একবার”—হবে এখন,
হাত পা বুঝে বেড়াই বখাজের সঙ্গে আশাপ পরিচয়
কর। হাশাই এখন বাসর ঘরে নিবেহে, মেয়েজ
কি আর এখন ছাড়বে। বাসা হাশাই ঘরে—
বিজ্ঞ চিন্তা করতে হবে না।”

“তা বেশ—ওরে কে আছিল বাবা একটু তানাক
বে—”

তারপর কথার সুকল্যায় বক্তর মশাই হাশাই
মেধায় নিরত হয়েছেন। ওঁর মত মেধা করার
আগ্রহ তখন আশারও বিশেষ ছিল না—কারণ
আদি তখন আরও ভাল দলী পেয়েছিলেন।

(প্যাজ)

সদর ভ্রান্ত সৈনিকের মত পরদিন অতি প্রকৃত-

ক্টে, নানা অধিলা করে বাসর সন্নিবীষের হাত
হতে নিতুতি পেয়ে, বাইরে বন্ধ বাছরের সন্ধান
যেহিবে পড়লাম। অম্বর বহল পাঠ হয়ে বাইরের
হাশাখার পা নিয়ে সবে দার সিগারেটটোটে আশপ
বহিষেছি, এমন সময় পূর্ণরাত্রের আগন্তুক অর্থাৎ
অপরিচিত বক্তর মহাপ্রেরার স্বর কাণে বেশ “ওরে
—খোঁড়া। কে আহিল একটু তানাক বে।
ওঠ—ওঠ—হাটোদের বেন জুজুকর্বে নিয়া।”

‘মসে কুহির ভাষায় বাণ’—বাসরের হাত থেকে
নিগ্রাহ পেলার, শ্রুত্রে আর এক বিপা! বিরক্ত
হয়ে সিগারেটটার একটা সুখটান নিয়ে বেগে বিয়ে,
সজীর ভাবে অগ্রসর হল। বাইরের প্রাকৃতিক
অবস্থা যেবে সুকল্যায় সেখানে এক বক্তর মশাই
বাড়ীত সকলেরই অর্ধেক রাহি। লম্বা করে
আর কল নেই! ঠৈক খানার হাশাখার উঠে,
যেমন ঘরে ঢুকতে বাব—অদনি ঘরের ভেতর থেকে
আগ্রহণ এল “এল—এল বাবা—”

আগ্রহণ শুনে সুখ জুগে তাকাতাই আবার
সুদুখে বে হুর্তি—বেদলান—তাকে আদি হস্তত!

—“হা! এ কি! এ যে—সেই রেল আফিসের,
বক্তরা—হাশন মজুববার। কি সর্জবান। ইনিই
কি আবার বক্তর—না এখানে নিমন্ত্রণ এসেছেন।
আবার মনে হল আদি যেন জন্মেই পূর্ণায় হয়ে
হাচ্ছি। কথা কওয়া দুইয় কথা—আমার এল
পাও নকবার ক্ষমতা ছিল না।

দূর থেকে আবার বেবে বক্তর মশাই—প্রথমটা
আমার চিনতে না পেয়ে, গায়ের হাত কাটা কতুখা-
টার পকেট হতে চপা বাসা বেহ করে, পরতে
পছতে বললেন “এল বাবা—এল, ভাল ট্রেন দিল্
করে—তোমার নিয়ে—হা!—একে। কিরণ!
দু—দু—”

বালিনের ভাল মাপ দেখলে মাহুব যেমন
আড়ট হয়ে ওঠে—বক্তর মহাপ্রেরার তখন ভক্ত
অবস্থা। মনে নেই অবসার কতকল ছিল।

ঐ প্রকারের কথা বলিতে, সে যেন একই লক্ষিত হইয়া পড়িল। ঠাণ্ডা হাওয়া চোখ সেই তরুণীর দিকে পড়িত হইবামাত্র, সে দেখিল, তরুণী স্থির-মুগ্ধিত ভাষার দিকে চাহিয়া আছে।

তখনকে নিরন্তর থাকিতে দেখিয়া, রমেন ভাষার বৌদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আজ্ঞা বৌদিদি, এখানে কেন? কি তপেনেই একচেটে, আমরা কি সব ব্যাপারের বন্দার ভেলে সেলাম?”

রমেনের কথা শুনিয়া ভাষার বৌদিদি চমকিত হইয়া বলিলেন, “ও, বড় ভুল হয়েচে তা। তুমি যে একজন প্রাণসার অংগের ছাছ। সে কথা আমি একদম ভুলে গেছি। যা হোক তুমি কেবল আমার অন্যায়ের শাস্ত।”

“না বৌদিদি, এখন গোরে আর হবে না। একবার যা হোয়ে গিরছে।” এই বলিয়া সে তপেনের ঘরের দিকে তাকাইল।

রমেনের কথাই তপেন বলিয়া উঠিল, “নাও নাও, অতঃপরেতে কার নই। যদি তোমার প্রাণসার এতই দরকার হোয়ে থাকে, তবে আবার টাঙ তুমি নাও। বৌদিদি, আগনি তিতরে গিরে ভেদে দেখুন-ভুতুন।”

বৌদিদির দিকে চাহিয়া যুব টিপিয়া হাসিয়া রমেন বলিল, “এই বৌদিদি, তুমি আর দেখে কোর না—ওঁদের বচ্চ কই চোখে।”

কথাটা শুনিবামাত্রই কি জানি কেন তপেন আর কোন কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে তত্বাক্ষে ঘাইতে দেখিয়া রমেন বলিল, “ওহে তপেন, ব্যক্ত কোবার—আমি কান্দ ছাচ্ছি।”

“সে আর তাই তোমাকে কই কেহে গোলে দিতে হবে না।” এই বলিয়া তপেন বাহিরে চলিয়া আসিয়া তাবিত্তে লাগিল—কি লজ্জার কথা, যদি তাঁদের কাছে এই সব গিরে থাকে? যদি তাঁহারা রমেনের ব্যক্ত: মুগ্ধত পেরে থাকেন। জরদ্ব একট: secondly]

এদিকে মহিলায়া নির: নির: বাণীর অভিযুখে চলিয়া গেলেন।

(১১)

পরদিন বিকাল বেলায় রমেনের বৌদিদি অন্যায়-বান্ধু বাসায় পর্যাপ্ত করিলাম; লোনা হইতে চকিতে লতমু হাসিমুখে আসিয়া বলিল, “বিবি, লক্ষ লক্ষ খুঁজি আর আশাভের বাণীর পর্যাপ্ত। পরীক্ষণেবের কথা আর কি মনে থাকে?”

লতমু কথার রমেনের বৌদিদি মুগ্ধ হাসিয়া বলিলেন, “কেন থাকবে না লতমু—বা:ত আশা দেখে কোর মনে থাকে তার বাবুয়া কো:তই ত দেখছি।”

নির: এইরূপ কথাই ধরন দু:ভিত পারিমা, লতমু হাতমু লতমু বিবর্ণ হইয়া গেল। ভাষার মুকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ করিয়া হাতুড়ির বা পড়িত লাগিল।

লতমু ভিত-প্রস্থান যুব লতমু মলিন হইতে দেখিয়া রমেনের বৌদিদি তাগকে লতমু মুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাৎ লোপাণ-নির্মিত গতে একটু ছুঁন দিয়া বলিলেন, “হাঁহে লতমু, মাঝবী কোথায় রে?”

“বৌদিদি ও ঘরে আছেন।” এই বলিয়া লতমু তাঁহাৎ লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি চপিতে লাগিল।

ঠাণ্ডা লতমু লতমু নির:কে আসিত দেখিয়া, মাঝবী তড়িত পড়িতে ঘর হইতে বাহির হইয়া, বিধির নামনে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, বিবি, কি রকমের হাতমু তুমি—একদিনও কি আসতে নেই? তাঁহুরপোনের পেয়ে কি মাঝবীর একবারে ছুঁলে গেলেন—আজ: বাহুৎ বা হো:তু বিবি।”

“কি কোরে লাগি লতমু মাঝবী—ঘরের কান-কর্ণ মনেতে আর আসতে পারি না। আজ যে লতমু কান কেলে এসেছি নির:ত বাবের বাহিরে—নইলে কি আর আসতুম?” এই বলিয়া তিনি ছুঁল করিলেন।

দ্বিধার কথা শুনিয়া মাধবী উৎফুল্লভাবে বলিল,
“ক’র সঙ্গে এমন কি কাজ দিদি?”

রমণের বৌদিদি কৌতুক-মিঞ্জিতকণ্ঠে বলিল,
“ক’র সঙ্গে আহার—তোর সঙ্গে আহার বিশেষ
সরকার আছে। তোর কি এমন কাজ সাহসে
কিছু বাতী আছে মাধবী?”

“না দিদি, এমন কোন সরকারী কাজ নেই।”
এই বলিয়া মাধবী দ্বিধার কথা শুনিবার জন্য উৎক্লিষ্ট
হইয়া উঠিল।

‘মাধবীর উৎকণ্ঠাকে নিবারণ করিবার জন্য,
রমণের বৌদিদি একে একে সমস্ত-তপন সম্পর্কিত
সমস্ত ঘটনা তাহাকে বলিল।

এই সব কথা শুনিয়া মাধবীর অস্ত্রকরণ আনন্দে
হুলিয়া উঠিল। সে অত্যধিক আনন্দে দ্বিধিকে
কড়াইয়া বলিয়া ফেলিল, “দিদি, যদি কোন সরকারে
তপন বাত্ব সংকে সমস্ত বিরেট বেওয়াতে পারেন
—তা’ হোসে বড়ই জ্বের হয়।”

“ওরে মাধবী তোকে আর অত কথা বোলতে
হবে না—সে সব আত্ম ও রমণ ঠাকুরপো পজার্ম
কোরে ঠিক কোচেছি। আমি কেবল একবার
সমস্ত পিতার মতটা জানতে এলাম। যদি উনি
বিশ্বব্রহ্মের মত হেন, তা’ হোসে ঠাকুরপো কলকাতার
পরে তপন ঠাকুরপোর বাপের মত নেবে।”

“কান্নাধের এরা মত ধোবার আগে আমিই মত
দিচ্ছি দিদি। তপনবাত্ব মতন মাপ্রবের হাতে
যদি এরা সমস্তক লগে দিতে না চান; তবে আর
ক’র হাতে বেবেন?”

মাধবীর কথা শুনিয়া রমণের বৌদিদি হাসিয়া
বলিলেন, “তুমি মত দিলে ত চোপে না মাধবী—
আমাদের মতে কি আসে যায় বল। বিশেষ মতে
বাক হবে, তাঁদের মত সরকার আগে।”

এই বলিয়া কিছুকাল নিরব থাকিয়া, কি
ভাবিয়া আবার রমণের বৌদিদি বলিলেন, “দেখ
মাধবী, কান্নাবাত্ব বামার কপালে আমি যা যা বলে

বেলাম, তাঁকে সব কথা পুনে বোলবি। তিনি
যেন তাঁর কাচাকাটকে সব কথা বলেন। তাঁরা
যা পরামর্শ কোরে দিবে তখন—আমাদের কাল
বোলবি, কাল দেব আমি এমন সময় আবার
বুলুগিত।” এই বলিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তাহাকে এইরূপ ভাবে চঠাৎ উঠিতে দেখিয়া
মাধবী ব্যস্তকণ্ঠে বলিল, “দিদি, যদিও বা একটু
পাথের খুণো বিতে এসে, কি একটু তবুও খোপতে
নেই?”

“না ভাই, আর আর বোলুন না, অত একদিন
এসে বোলুন।” এই বলিয়া তিনি ঘাইবার সময়
পুনর্বার বাত্বকে স্বাগত কহায়া দিয়া সেলেন,
ঘাটতে সে সব কথা ভাবের বলে।

মাধবী স্রিত উদ্বৃত্ত-বুখে বলিল, “পুর মনে থাকবে
দিদি—পুর মনে থাকবে। এখন হোবার হাত
হয়।” এই বলিয়া মাধবী হাসিয়া ফেলিল।

ঘাটতে ঘাটতে রমণের বৌদিদি বলিলেন,
“কান্নার হাত যল কিছু হবে না মাধবী, সমস্ত
কপালে লেখা থাকলেই হবে। তুমি আমি নিমিত্ত
মাত্র।”

(১২)

লক্ষ্য করি কিছু পূর্বে বাহিরের ‘কল’ সব দেখ
করিয়া অনাথগণু হেবনি বঃর সরসায় পরামর্শ
করিবেন, এমন সময় মাধবী বঃর চুঁকিয়া বিড়কতে
বলিল, “আজ বড় একটা সুখের আছে।”

পাথের কান্না খুণিতে খুণিতে অনাথগণু বনি-
লেন, “কি এমন সুখের?”

মাধবী হাসিমুখে বলিল, “কারণ তুমি একটু
বিস্ত্রাম কর, বাত্বখ খোত, তাহপর সব খুণে
বোলগো।” এই বলিয়া বামার হাত পা দুইবার
জল জল আনিতে চলিয়া গেল।

মাধবী জল লইয়া আসিলে অনাথগণু বলিলেন,
“সবু কোবার—তাকে ত বেধতে পারি না?”

মাধবী বলিল, “সে বেধেই উপরে আছে।”

হাত মুখ যোগে দেখে হইয়া গেল, অন্যথাবলিগেন, “কাল সাংসুক দেখবার মত আবার কবেকজন বন্ধ আসবেন।”

তখন মাঝী তার দ্বিধি কথাতণি তাঁগকে জ্ঞানাইয়া নিল এবং বলিল, যে তোমাদের মত বিগার আপনই তোমার গোরে মত বিয়া দিবেহি।

মাঝীর নিকট হইতে এই প্রকারের সু-সংবাদ শুনিয়া অন্যথাবলি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “এতে আর ত মত কতবার তোম করিব নেই। নিম্ন হই হোল শেষবাবুর তাইএর সঙ্গে তার বন্ধুটির করণ-নিষিদ্ধ চোরাগা বেখে অথাক্ গোরে বানিকরুণ দাঁড়িয়ে বেগে নিবেহি।”

স্বামীয় মুখে তপনের রংগে প্রসঙ্গা শুনিয়া মাঝী আত্ম-মুখে বলিল, “দ্বিধি বনে, তাঁর যত। তার মেয়ের চোরে স্বামী বড়ই মধুর। দিনির একান্ত ইচ্ছা যে তপনেরাবুর সঙ্গে সন্তুষ্ট বিবাহ হয়। তোমার মত কি এখন তাই বল?”

অন্যথাবলি হানিয়া বলিলেন, “তুমি ত আপনই আমার গোরে মত বিবেছে, এখন আমার মতের সহকার কি বল?”

মাঝী বলিল, “দশায়ে মতের মত ত বোধিত না, কাকাবাবুর মতটা ঠিক কোয়েই বিন। তিনি উপরেই বয়েই আছেন। শুভকাখা বিগদ কেন। তাঁর কাছে কথাটা পাইই না; তিনিও ত তপন-বাবুরকে পাকিতে দেখেছেন।”

“তিনিও তোমার দেখছি আর সহ না—আচ্ছা হকুম তামিল কোরতেই হুেব।” এই বলিয়া তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

কাকাবাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া অন্যথাবলি সন্তুষ্ট বিবাহ সম্পর্কে যে নতুন সখ্য আসিয়াছে তাহা সবিবারে তাঁহাকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়াই তিনি আনন্দাক্রান্তপূর্বকর্তে বলিলেন, “বাবা অন্যথ, শেষবাবুর বাসা, কোনটা বল শু—একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি।”

অন্যথাবলি বলিলেন, “কাকাবাবু, মত উত্তরা হবেন না। সব ত জ্ঞানেন—এখন কর্তব্য কি তাই বলুন। ভাল বিকালে শেষবাবুর জী আসিয়া সখ্য জানিয়া যাইবেন। তার পর যা করবার, সেদেখাও তা কোরুন।”

কাকাবলি চিন্তিত হইয়া বলিলেন, “বাবা অন্যথ, তপনের মতন এমন ছেলেকে কি আমি আশা কোরতে পারি—ইহা যে স্বাভাবিক।”

অন্যথাবলি বলিলেন, “সন্তুষ্ট অল্পটো যদি ঐ পাঁজ দেখা থাকে, তবেই বয়েই হবে। তবে বপেনবাবুর মতন সুপার পাঁজা কম সৌভাগ্যের কথা নয়?”

অন্যথাবলি কথাই তাঁহার হই রকে মনের দায়া দেখা দিল। তিনি কোন প্রকারে সেই অস্ত্রক মন করিয়া পাঁজ-বয়ে বলিলেন, “বাবা অন্যথ, সন্তুষ্ট কি এমন সৌভাগ্য হবে।”

“হবে কি না হবে তা ভগবানের হাত তত্ত্ব জানা গেল। কোরতে ছাড়ুন কেন কাকাবাবু?”

নিঃশেষ কি ছুতাল করিয়া গেল অন্যথ বাবু তাঁহার কাকাবাবুর চিত্তাধিত নেখিয়া বলিলেন, “কাকাবাবু, কাল তা’ হোলো কি কলা বাবে?”

অন্যথাবলি কথার চরিত হইয়া তিনি বলিলেন, “বোহা ও তুমি যা ভাল যোক তাই কর বাবা।”

কাকাবাবুরকে আর কিছু না বলিয়া অন্যথাবলি ঘর হইতে চলিয়া আসিলেন।

অন্যথাবলি বাহির হইয়া গেল, তিনি সন্তুষ্ট অস্ত্রের কথা তাহিতে লাগিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা—কত বিনিময় যখনই তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে স-সু্য কীবন বাহাতে হুবে কাটে তাহার উপায় চিন্তা করিয়া কাটাইয়া বিদ্যাহেন, আজ সন্তুষ্ট তাহী সৌভাগ্যের স্বতন দেখিয়া তাঁগর হইলও বহিরা বলদায়া করিয়া পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন বিকাল বেলায় রমেন তপেনের
ঘোঁসে ঘেলে আসিয়া দেখিল, তপেনের ঘর ভিতর
হইতে বন্ধ। পানের ঘরে ঘোঁস লইয়া আসিল—
তপেন আল আর বাতির ঘর নাই ঘরের মধ্যেই
আছে। “এই সংবাদ শুনিয়া রমেন নীচে গিয়া
মেষের ঠাঁহুকে রাজের খাবার চৈয়াদী করিতে
নিষেধ করিয়া পুনরায় উপরে উঠিয়া আসিয়া
তপেনের ঘরবার এক বিপুল বিরানী ওজনের
বাঁকা দিল।

ঘরবারে এমন সময়ে এইরূপ আঘাত হওয়াতে
তপেন ঘরের মধ্যে হইতে কহিল, “কে?”

রমেন কোন কথাই বলাই না দিয়া
পুনরায় ঘরবার বাঁকা দিল।

ঘরের মধ্যে হইতে তপেন পঙ্কট-কণ্ঠে বলিল,
“কে হে, ঘরবার এমন বাঁকা দাও—এত আর
বেওয়াসীল মাল নহ?”

তবুও রমেন তাহার বখার কোন উত্তর না
দিয়া ঘরবার আর একবার বাঁকা দিল।

এবার তপেন অসহিষ্ণু হইয়াই বলিল, “দাঁড়াও
না—কি রকম বে-রসিক হে?”

রমেন তপেনের ব্যবহারে অসহ্য হইয়া এমন
জোরে ঘরবার এক বাঁকা দিল যে অর্ধলগ্নী খুলিয়া
তপেনের পার তলার পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে রমেন
কড়ের মতন তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রমেনকে এইরূপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া,
তপেন চকিতে বলিল, “কি হে বিলম্বীবার,
ঘরবার সঙ্গে বৃদ্ধ করে জঘোঁসালে অধীর হোয়ে
পোকেছ যে?”

রমেন প্রত্যুত্তরে বলিল, “কি করি বল, তুমি
ত আর ঘরঝা খুলবে না; অপর্যা ঘরবার সঙ্গেই
খানিকটা কলহে কোরে নেওয়া গেল।”

“বলবে ত খুবই বেখালে, এমন হঠাৎ এ রকম
কোরে মদ্যপানের আসার উদ্দেশ্য কি তাই বল।”

এই বলিয়া তপেন রমেনের দিকে লোপুর্ন দৃষ্টিতে
চাহিয়া রহিল।

“কোনাকে বুঝি আর মাদুত বৈ নহ?” এই
বলিয়া রমেন তাহার হাশিতে স্বত্বানিকে তরিয়া
তুলিল।

তপেন তাহার কোন প্রবাব না দিয়া চুপ করিয়া
রহিল।

তপেনের দিকে চাহিয়া রমেন বলিল, “এতক্ষণ
ঘোরে ঘরের মধ্যে কি কোঁছিলে বলত?”

তপেন বিস্মিত হইয়া বলিল, “কি আর কোঁছা
—শুধেছিলাম।”

যাকস্বরে রমেন বলিল, “এই বুঝি তোমার
মোতির মদ্য—কোন শাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে
বলত?”

তপেন বলিল, “কোন শাস্ত্রে অস্ত্র এ কথা
লেখা নাই সত্য কিন্তু কি করি ভাল লাগছিল না
বলিয়াই শুধেছিলাম।”

অসুস্থিপুর কথা শুনিয়া রমেন বলিল, “শুধেই-
ছিলে না আর কিছু কোঁছিলে? চল, চল, একটু
বেড়িয়া আসি।” এই বলিয়া তপেনকে ঘোর
করিয়া বিছানা হইতে উঠাইয়া দিল।

হাতার চলিতে চলিতে রমেন বলিল, “তোমাকে
একটা সংখ্যাব দিতে একেবারেই ভুলে গেছি। কাল
যৌবনি বর্ধমান পেকে এসেছেন—তোমাকে এক-
বার দেখা করবার চক্র বলে বিবেচন। তুমি
তাই চল নচেৎ বোধিদি কি হবে কোথেকে।”

যৌবদি আসিয়াছেন শুনিয়া তপেন আর
দিককি না করিয়া রমেনের সঙ্গিত তাহারের বাগার
দিকে চলিল।

বাগার পৌছিয়াই রমেন অনেকে অধীর হইয়া
ডাক দিল, “যৌবদি, যৌবদি, আগামী হাশিয়া।”

রমেন ঠাঁহুহরণের পদার বহু শুনিয়া তাহার
যৌবদি উপর হইতে উত্তর বিলম্ব, “তপেন ঠাঁহুহ-
পোকে উপরে নিবে এস।”

বৌদিবির কথা যত রমেন তপেনকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া কহিল, “বৌদিবি, আশা ক’ন যত বোলন ?”

কথার উত্তর দিয়া বৌদিবি বলিলেন, “এই যতই এল।”

যত উত্তর দিয়া তপেন বোলিল—যতের একপুৰ্ণে একটি কাককাটা-সদৃশিত বাট—তাড়াতে হুৎকনসিত এক অপূর্ণ শব্দ।

তপেনকে দেখিতে পাইয়া রমেনের বৌদিবি বলিলেন, “সেই যে এলে, আর ত আশাধের ওখানে গেল না। লুকিয়ে লুকিয়ে বোধ হয় বাতাস-আসা করা হয় তাই না কি ঠাকুর গো ?”

বৌদিবির কথার কোন জবাব না দিয়া তপেন চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় তিনি বলিলেন, “কাজ যখন আসা হোয়েছে—তখন কাজে না থেয়ে কিন্তু যেতে দিচ্ছি না।” এই বলিয়া রমেনকে ইহিত করিলেন।

রমেন তারার বৌদিবিকে বলিল, “আমিও আসা-যাও সময় মেনে ঠাকুরকে খাবার তৈয়ার করবার কথা বলুন কোরে এসেছি।”

তপেন মুহূর্ত্ত হাসিয়া বলিল, “মিষ্টাই বৌদিবি, আপনাদের কোন অভিজ্ঞার আছে।”

উত্তরে রমেনের বৌদিবি বলিলেন, “আশাধের কোন অভিজ্ঞার নেই এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাক।”

* * * *

বাতাস শেষ হইয়া গেলে তপেন বাসার কিচিন্-বার ঘর ব্যস্ত হইলে, রমেন বলিল, “একটু অপেক্ষা

কর, বৌদিবিকে পাঠিয়ে দিই, তাঁর সঙ্গে দেখা কোরে তুমি যেও।”

কিছুকাল কাটয়া গেল অথচ বৌদিবি বা রমেনের আশিবার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়াঃ সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কাহাকে ভাব দিতে ‘ও’ পাইল না—পাছে কেহ যদি কিছু মনে করেন। এই ভাবিয়া সে আশা কিছুকাল নীরব থাকিয়া তাহাদের মজ্ঞ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বৌদিবির পরিবর্তে সে দেখিতে পাইল একটু লক্ষণছাত্র-তৃষাঃ। যোড়শী ত্রীমূর্ত্তি ঘরের মধ্যে চুক্ষিবায়াত্রই বাহিরে হানির উচ্চঃশব্দ উঠিল এঃ অব্যয় সহসা ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

গৃহের উজ্জ্বল আলোক তপেন দরজুক চিনিতে পারিচ্চা সহজে বলিল, “তুমি এখানে—কবে এলে ?”

লক্ষ্যার হাতা হইয়া লজ্জুকম্পিতকর্তে উত্তর দিল, “কাল।”

বাহির হইতে বৌদিবি বলিয়া উঠিলেন, “তপেন ঠাকুরগো, বাসার যাবে না ?”

আশালার কাক হইতে রমেন রাহিয়া উঠিল,

“গ্রেহের ঈদ পাতা জ্বল,

কোথায় নিয়ে যার কে জানে।”

হলদপথ্য বাহিয়া উঠিল। তপেনের বাবা তারার আত্মীয় বঙ্গদলপের সঙ্গে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাস্তার নবটার গরে দুইটা অন্তীর্ণিত জ্বর মিলিত হইল। তপেনের লক্ষণই যেন বঙ্গ মিলিয়া বেবিয়াই বোব হইতে লাগিল।

দয়ান্ত

কেহই কাহাকেও পরাণ হইতে বঞ্চিত না ; কিন্তু
 মুক্তি সাধাৰণে অপরূপে বহুত লবণৰ জল আনন্দ
 কৰিতে না পাৰিলে, মল বীৰিমা সাধাৰণেই মৰ্দ্দেব
 বিকল্পে সাময়িক উত্তৰনা বা স্তম্ভিতি। বৰ্ণে কোনও
 একটা কাৰ্য কৰা ভাল নহয়। মৰ্দ্দেব বিবেচনাপাত্ৰ।
 মল নহয়, তাহাতে আশেচানৰ বীৰিমা ও লুপ্তো
 বহুত সৃষ্টিৰ সাহায্য হইতে পারে এবং অনেক
 মলে মলমল কলিমা থাকে। ভূগ জ্যোতি সৃষ্টিৰ
 পক্ষে বিকল্পবাহীৰা বেষ্টন সাহায্য কৰিমা থাকে,
 বহুতাবলম্বীৰা লেভন কৰিতে পারেন না ; কিন্তু
 আনিমা কোন বৈকোবে আনিকাল বহুতাবলম্বীৰা
 হেই পৰিণত হে—আনিকাল সাহিত্য-পাশ্চাত্য
 মৰ্দ্দেবোৰাৰ ষ্টিতৰ বেষ্টন হুঁমজ্যেব আশে-
 চানৰ সৃষ্টি হইতেছে, তাহা দেখিমা বাতৰিকই
 বাখিত হইতে হয়। আচাৰ্য্য বাবেল্লজ্যেব চতুৰ্দা
 বহুতৰ পূৰ্বে আধুনিক হুঁমকে মল-বীৰিমা হুঁম বলিমা
 আখ্যাত কৰিমাছিলেন। তাহাৰ কথাই বলি, -
 "আনিকাল হাওঁৰাৰ সতি মল-বীৰিমা বিকে।
 যিনি দেখেবে নাছেন, তিনি মল-বীৰিমা বাজিচে
 পূজিমা লইয়া তাহাৰ সাহিত মল পাকাইতেছেন।
 আৰাধেব বহুতৰ মধ্যে বীৰিমা ভাবনীতৰ চক্ৰ।
 কেবন, তাহাৰা কংগ্রেসে, কনুকাংগে, জেগা
 সমিতিতে, পত্নী-পমিতিতে মল পাকাইতেছেন ;
 বীৰিমা সদাৰ-লজ্যেবৰ "পক্ষপাতী, তাহাৰা
 সামাজিক কনুকাংগে মিলিত হইতেছেন, বীৰিমা
 সনাতন ধৰ্ম্মৰ অঙ্গপত, তাহাৰা বৰ্ষ মদাৰত্বে
 সম্মিলিত হইতেছেন ; বীৰিমা নিমের উন্নতি চান,
 তাহাৰা মল বীৰিতেছেন ; বীৰিমা শিকার উন্নতি
 চান, তাহাৰা মল বীৰিতেছেন ; আদৰা সাহিত্য

সেইটাই কি চূপ করিয়া থাকিব? সকলের
থোকা নোকা আদায়ও মোট বাকিয়া এখানে
উপস্থিত হইয়াছি। সকলেই যদি গাওরের অঙ্গুলি
না চাশিয়া যেন, আমরাই বা বসিয়া থাকিব কেন?
আমাদের এই সাহিত্য-সম্মেলনে হরি কের
গজালিকা প্রবোধের মত পত্রের অঙ্গুলি-
বসিয়া উপহাস করিতে চান, তাহাতে আমরা
— কর্ণপাত করিব না।

করিব না, কেন না, হোতাওয়ার বেগে নৌরমান
হইয়া আমরা এখানে লম্বনত হইয়াছি, তাহা
বিংভার প্রেরিত বলিয়াছি, অনেকেই বিংভার
বাক্যবিক্রী ভাষীভাষীদের উদ্ভিতকরে লম্বনত
হইয়া কাত করিবার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা
যে আছে, তাহা সকলেই একবারো বাক্য
করিতে হইবে; কিন্তু লম্বনত বিষয় হইয়া মনো-
মালিন্য হইলেই আত্মভিত্তির বসন্ত হইয়া যে
লম্বনত যথোচিত হইতে করিতে হইবে ও ক্ষু-
দ্রত বল শকাইতে হইবে—এমন কোন কথা নাই।
আর এমন করিলে এত বড় জনসংগঠনের
অকালে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতে পারে।
বিংভারের ভিতর লম্বনত হইয়া কাত উঠিত।
আমাদের সঙ্গবাই মনে রাখা ভাল ‘সংগঠিত
কাণ্ড সাধিকা’—অভ্যর্থন বলকর করা কোন
মতেই কর্তব্য নয়।

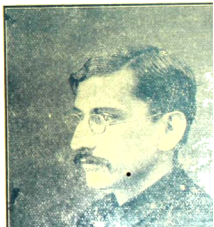
এবারকার মূল সভাপতি বর্ধমানানিগতির ও
বিজ্ঞান ও ধর্মের পাখার সভাপতিত্বের দ্বি-
ভাব্য যেন আর কথার মধ্যে লিপ্ত হইয়াছে।
সাহিত্য ও ইতিহাস পাখার সভাপতিত্বের
অভিভাব্য অতি বিস্তৃত হইয়াছে। ইতিহাস
পাখার অভিভাব্য অনেক নূতন জানিবার কথা
আছে। এমন সুচিন্তিত প্রবোধের যথোপযুক্ত
আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনে হয়
সভাপতিত্বের অভিভাব্য যত আর কথার বস
হয় ততই ভাল। হু কেরল একটি বিষয় লইয়া

আলোচনা করাই মুক্তিদায়ক; কারণ পাঠ্য সভা-
পতির অভিভাব্য প্রবণ ও ধারণ করিয়া রাখা
প্রোতবেশ পক্ষে বহু সময় বাগান নয়। এমন
মনোজ্ঞ ভাবে আর পরিণয়ের মধ্যে সভাপতিত্বের
বক্তব্য বিষয়ী বস উচিত, যাতে প্রোতবেশের
মনের মধ্যে একটি বাণ (impression) রাখিয়া
বাইতে পারে। নূতন তথ্যের লক্ষ্য ও তথ্যের
নিষ্ঠ হইতে প্রোতবেশ রাখিয়া থাকেন।

ভারপর যে ভাবে আমি কাল প্রবন্ধ পাঠ করি,
তাহার প্রাণা কোন মতেই করিতে পারা যায়
না। সময় সংক্ষেপে বক্তা অনেক প্রবন্ধ কব্জাকারে
পঠিত হয়। ইহাতে রসভর হইয়া যাব—মনেক মূলে
অর্থবোধ ভাঙ্গিয়া পড়ি না—তাদের পারস্পর্য, সত্য
থাকে না। আমাদের মনে হয় সভাপতি মহাপ্রেরণা
পূর্ণ হইতে প্রবন্ধগুলি পাঠ করি। তাহাদের মধ্যে
উৎকৃষ্ট পাঠ্য কি ছাড়া প্রবন্ধ বাছিয়া লইয়া সম্পূর্ণ
ভাবে পাঠ করিবার অঙ্গুলি যেন, তাহা হইলে
সকলেই রস গ্রহণ করিয়া শিক্ষাগত করিতে
পারেন। অপর প্রবন্ধ শুনি পঠিত বলিয়া
গৃহীত হইলেই উল। যতদূর সম্ভব হয় চাকা
সাহিত্য-সম্মেলন ইতিহাস পাখার সভাপতি
সুপ্রসিদ্ধ প্রবোধ ইতিহাসিক ডানম্যান ‘সুপ্র
এই প্রকার অঙ্গুলি করিয়াছিলেন; আর বর্ধমানে
ইতিহাসিক প্রবোধ বর্ধমান সরকার মহাপ্রেরণা
পঠিত প্রবন্ধগুলির যে আলোচনা পঠিত হইবে
তাহা নিষ্ঠারিত করিয়া রাখাছিলেন। অর্থবোধের
বক্তা এক ছন্দ করিয়া, তিনি যথোচিত লিখিয়া রাখা
তাদের পৌরোগ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এমন
করিলেও মনের ভাল হয়। তবে এই সম্প্রদায়
কাণ্ড সভাপতি মহাপ্রেরণার যথোচিত পরিপ্রণ
হইবে। আমার কোন কোন পাখা সভাপতি
মহাপ্রেরণা কালকে প্রবন্ধগুলির নিষ্ঠা
করিয়া থাকেন। এবার ধর্ম পাখার এই
নিষ্ঠাই অঙ্গুলি হইয়াছিল—সকল প্রবন্ধকারকেই



কুতুব-এ-জায়ে-সাহিবের মূল সজ্জাগুলি।



[illegible]

১৫ মিনিট সময় পড়িবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এরূপ করিলেও প্রবন্ধের রূপ-দাঁড়িও নষ্ট হইয়া যায়। বক্তব্য বিবেচনের ধারণাও বেশ হ্রাস পাইয়া যায় না। এরূপ কঠোর সূক্ষ্মদৃষ্টি নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্মিলনের সাপ্তাহিক যে একটা দিক আছে সে কথাটা আমরা ভুলিয়াই যাই। সাপ্তাহিক পত্রের পাঠ্যব্যয় বহু সূচিবদ্ধিত প্রবন্ধ পাঠ করিবার আনন্দের সূচনা ও সুযোগ হয় সত্য; সম্মিলনের পণ্ডিত প্রবন্ধও অনেক সময় সাপ্তাহিক পত্রে আমরা পড়িতে পাইয়া থাকি, কিন্তু সাহিত্যিক ও সাহিত্যাভ্যাসী-দের জীবনের ভাব-বিনিময়ে—যেনা যেনার সূচনা বাগানে বর্ধিত হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য। প্রবন্ধপাঠানি বহু করিয়া বিবার আমরা পক্ষপাতী নই; ঐ স্তলি বখাসস্তা কম করিয়া, সম্মিলন সাপ্তাহিকতার দিকটার প্রতি উজ্জ্বল-দিশের মূর্তি একটু আকর্ষণ করিয়া দিতে চাই। লতা বলিবার পূর্বে ও পরে অধিক সময়েই বিবার-নির্বাচন সমিতিতে বাহাদুর্য্যচলিয়া থাকে। সমাপ্ত ভঙ্গ-মহোৎসবদিগের ভিতর যেটা যেটার সূচনা বড় থাকে না। সাহিত্যের ভিতর বিবার বাহাদের সহিত আমরা এক প্রাণ, বাহাদের সহিত আমরা সম্বন্ধ—এক সভাপতি, বাহাদের আমাদের প্রেক্ষিত লক্ষ্য-বদ্ধ তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে নিবিবার সূচনা এখানে সংলগ্ন হইতে পারে। বহু সহিত বহু চ্যাম্বল পতিতের সূচনা করিয়া বিবার ব্যবস্থা রাখা সর্বোচ্চভাবে কর্তব্য। পত্র বিনিময়ে এ কাণ্ডটা কতক পরিমাণে যে চলিতে পারে না, তাহা বলি না; তবে এ কথা ও বলিয়া রাখা ভাল 'হৃদয়ের সাথ কি ঘোলে বেটে।

এইবার আমরা সংক্ষেপে অভিভাষণ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া ছু চারি কথা বলি। অত্যন্ত সাহিত্যের সভাপতি রাই বাহাদুর বরদাকান্ত দ্বিজ মহাপতির অভিভাষণ রূপে তবপূর হিগ

ইতিহাস সংক্ষেপে পাঠ্য সভাপতির নিকট যে সংলগ্ন বেশের অতীত কামিনী ভনিয়াহিগেন তাহা বলিয়া পর তিনি বলেন,—‘এই স্থানটা বাগানার অতীত ইতিহাসের সঙ্গে মানচিত্রের মত। আমরা মনে হয়, সাহিত্যের সঙ্গে এই স্থানটা কল্পিতকল্পিত; অর্থাৎ সাহিত্যের ভিত্তি ভিত্তি বিভাগের চর্চায় সাপ্তাহিক প্রবন্ধপরিমাণে এখানে জন্ম আছে। স্থানটির হ’তে কীকনাড়ার সঙ্গে এই স্থানটির মূল সম্প্রতিষ্ঠা ভানিয়ে দিবে একদিন শ্রীমত ভেলে দিবেহিগেন। কলিকাতা অংকোয়ের সময় বাগানী সেনার শেষ বিবরণ্যহিনী ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে এইখানে সপ্তাহের হ’য়ে রতাকার মাঠে ছাউনি কেনে ছিল। মহাপ্রভু ঈশ্বর একদিন আমাদের পার্শ্ববর্তী স্থানটির (বাগানার) শ্রীমতের মনে অবস্থান করেহিগেন এবং তাঁর পুত্র-রীতে বাস করেহিগেন। মহাপ্রভুর অন্ততম শ্রীমত বাগানার আশ্রয়। আমরা পরিবার কল্পণ সেনকে বৈজ্ঞানিক বৌদ্ধিক করেন। কল্পণ সেনের সবারি পুত্র-প্রতি আগ্রহ হ’য়েছে। কল্পণ সেনের সঙ্গে বাগানার প্রথম অভিভাষণের বেগান রামকমল সেন প্রবন্ধগ্রহণ করেন। পাঠ্য সভাপতির প্রাণিতামহ মহাপ্রতিষ্ঠা বাগানার তর্কচূষণ নৈয়াতীতে টোল করে বিকশিতের জ্ঞান দান করেহেন। তাঁর হাতের লেখা পুঁথি পাঠ্য সভাপতির ঘরে আমাদের বেশের পুন্যের সামগ্রী হয়ে আছে। এর পরই ভাটপাড়ার অন্নোদয় হয়। ভাটপাড়ার রতন তর্কচূষণ ও বাগানার হাতের প্রবন্ধের নাম লেখানিহিত। পাঠ্য সভাপতি যে রূপে লক্ষ্যগ্রহণ করেহেন, শ্রীমত ওর্কোৎসাহ, নীলমণি হাটপাড়ার, রামকমল হাটপাড়ার সেই রূপ উচ্চ করেহিগেন। তাঁর কোট নকশাবার অন্নোদয়েই বিবরণ্য নৈয়াতীক করেহিগেন।’

কৃত্তি থেকে এবার সূচিত্তে আলা দাক। পরি-কার রামকমল সেনের সঙ্গে আলাদা কেনে প্রসেনের লক্ষ্য হয়। তাঁর বক্তব্য সে রূপে সূচিত

প্রত্যক্ষিণ শাঠি ও প্রবণ কথিত্য গুণে কিরিয়া কেবল
সম্মিলনের অধিবেশনের জিহ্বাকলাপ মুদ্রিত করতঃ
বৎসরব্যধিকাল একত্রণ নিম্পন্ন ও নিশ্চেষ্ট থাকিলে
চলিবে না। বাহাদুরী ভাষা—বাহাদুরী সাহিত্যকে
প্রকৃত ইচ্ছাসিদ্ধান্তে বসাইবার ক্ষমতা—সাহিত্য-
ক্ষেত্রে চূড়ামণিগণকে স্থানান্তরিত করিয়া জনসাধারণের
মনোযোগ ভাষাব্যবহারে প্রতি আকৃষ্ট করিবার
প্রকৃষ্ট পন্থা অনুসন্ধান পূর্বক স্থির করিতে হইবে।
বর্তমানে যখন অষ্টম সাহিত্য সম্মিলন হয়, তখন
আমি অভিযর্থী সাহিত্যের সভাপতিত্বক্ষেণে যে
অভিভাষণ বিদ্যামিলাপ তাহাতে এই বিষয়ই
ইঙ্গিত ছিল। অথচ আপনাদের অনুমতি লইয়া
এই বিষয়েই আমি কিছু বিবরণ্যে বলিতে চাই।
আমার অভিভাষণের মূল উদ্দেশ্য তাহাই জানিবে।
আমি চাই যে আশাব্যবহার এই বহিঃ প্রবেশে Nobel
prize এর মত সাহিত্যিকগণের উৎসাহবর্ধন ক্ষমতা
কোনও prize বা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা
সম্ভবপর না হইলেও, প্রতি বৎসর চারি পাঁচ মুদ্রা
পরিমিত বা তদুপর কোনও পুরস্কারের আয়োজন
নিত্যন্ত অসম্ভবপর হইবে না। এই পুরস্কার
প্রদানেরদ্বারা চারি বা ততোধিক সাহিত্য-
শাখার বিস্তার করা যাইতে পারে যথা—বিজ্ঞান,
বর্ণন, ইতিহাস, সাহিত্য, ইত্যাদি। প্রত্যেক বৎসর
যখন সম্মিলন হইবে তখন একটী Executive
committee (কার্যনির্বাহক সমিতি) সম্মিলনের
পক্ষ হইতে গঠিত হইতে পারে এবং তৎসময়ের :—

মূলসভার সভাপতি

সাধা সভাপতিগণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মিলন পরিচালকের
সভাপতি ও সম্পাদক

এই সমিতির সমস্ত হইতে পারেন। বৎসরের
মধ্যে বাহাদুরী ভাষার রচিত গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া
লইয়া এই চারিটা শাখার চারিটা পুরস্কার কোন
চারিজনকে দেওয়া হইবে তাহা এই সমিতির দ্বারা

নিরীকৃত হইতে পারে। সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবসে
সম্মিলনের প্রধান সভাপতি এই পুরস্কার ঘোষণা
করবেন।

এই প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া তিনি
বহু দ্বন্দ্ব সাহিত্যিকের আশা পূর্ণ করিবার পথ প্রশস্ত
করিবার চেষ্টা করিষ্যে। অনেকেরই চেষ্টা করিয়া
থাকেন বর্ণন ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে বাহাদুরী ভাষার ভাস
পুস্তক প্রকাশিত হয় না। না হইবার কারণটা যদি
একটী বিশেষ করিয়া অনুধাবন করা যায় তাহা
হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেকদিনের
উৎসাহের অভাবেও পুস্তক পাঠকের সংখ্যা কম
বলিয়া পুস্তক বিক্রয়ের সংখ্যা ও কম। অল্প
পুস্তক হইতেও বাপাখাবার খরচ ও উঠে না। পত্রিকায়
করিয়া, বর্ষের পরমা ৮.৫ করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি
একাধিক হস্তক্ষেপ করিবেন? অবশ্য সাহিত্যিকেরা
মধ্যে যদি এমনজনী কেহ থাকেন তাহা হইলে তিনি
এমন কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন; কিন্তু হুঃ
সাহিত্যিকের এপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই।
সাহিত্যিকগণকে পুস্তকাদির ব্যবস্থা করা যে সমাধান
তাহা কাঠোকেও বিশেষ কঠিন বলিতে হইবে না।
প্রতিভার উদ্বোধন ইহা যে সমাধান তাহাও
আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

তৎপরে অন্য বহুদ্বন্দ্ব দ্বিতীয় সভাপতি
সম্মিলন হইয়া প্রত্যেক প্রকৃষ্ট বর্ণন বর্ণন-তর্পণ
করিয়া যে প্রকাশিত বস্তু করা যেন তাহাতে
লক্ষণেই হুঃ হইয়া পড়েন। অবশ্য সম্মিলনে একপা
বলিয়া রাখা ভাল সকল সভাপতি ঘাণেচোরাই
বক্তৃত্ত্ব-তর্পণে আনিয়া বক্তৃত্ত্ব প্রতি ঘোষণা
প্রদান-অর্পণ করিষ্যে। আর না করিবেনই কেন?
স্বস্তির পুষা না করিতে শিখিলে কোনও প্রতি
কোনও কালেই বহু হইতে পারে না।

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি কাঠোরে বসানব দ্বারা
বৎসর উৎসাহের অনবস্থা হুঃ অতিভাষণে প্রদর্শন
বিশেষাছেন—“অল্পতঃ পর মূল বাপার লইয়া আর

যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন, যাহা পণ্ডিত ভাষার যেরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেই যথেষ্ট একজন। তিনি আর বাংলাদেশের এবং ভারতের সৌভাগ্য। জননীশ্রদ্ধা প্রভৃতি রচনাবলির মধ্যে-
কবির জ্ঞান তাঁহার ক্ষমতা যথেষ্ট হইতে আদি মধ্য-
প্রান্তিক হইতে চলিতেছে। তাঁহার সাধনার কল
তাঁহার মাতৃভাষায় আত্মা তাঁহারি কাছে সন্নিবে-
শিত হইতেছে। বিজ্ঞানের উচ্চতর সত্য ভাষায় প্রকাশ
করা কঠিন। ইহা বুঝি সত্য কথা। কিন্তু কঠিন
বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। * * সাহা-
য্যার্থক অল্পবয়স্ক করিতেছি তাঁহার গবেষণা
মন্দিরের বাহিরে যে সমস্ত সমস্ত কৌতুহলী নরনারী
প্রভৃতি করিতেছে। তাহাদিগকে তাঁহার তপস্কার
কথা জানাইতে হইবে এবং সেই তপস্কার যে অল্প-
সময় লাভ হইয়াছে তাহার যথ্য তাহাদিগকে দিতে
হইবে। ইহাতে তাঁহার যোগ্যতা বৃদ্ধি হইবে।
এবং তাঁহার সাধনার সার্থক হইবে। যেরূপ জননী
প্রভৃতি জ্ঞানচক্র ও যেরূপের মত বৈজ্ঞানিক
আছেন এবং রচনাবলির মতো জানি কবি আছেন,
এই বিদ্যা যেরূপের দ্বারা যে যে দেশের সকার
করিতে তাহা অল্প উপায়ে সকারিত হওয়া অসম্ভব।
কোনো ভাষা যখন উন্নতির পথে বাইতে চাহে
তখন এই বল পরম সত্য হইবে।

আর আর যদি বঙ্গের যাহা বাংলা দেশে
বিজ্ঞানের চর্চা হইতেছে। * * * * পরের
সুখাপেক্ষা না হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা ও গবেষণা
করিয়া কোনো তব আবিষ্কার করা যে আবিষ্কারের
পক্ষে সম্ভব ইহা সত্য সত্য বঙ্গদেশের মধ্যে অসম্ভব
চিন্তা বঙ্গের আবিষ্কারের মনে স্থান পায় নাই। তাহ
পরে বাংলায় পূর্ণরূপে জননী ও প্রভৃতি
দ্বারা চিন্তা ও চিন্তা হইলে আবিষ্কার বিজ্ঞান-
আলোচনা যে মূল্য পাব যাইতেছে, তাহা আপনাতঃ
স্বতঃসিদ্ধি দেখিতে পাইতেছেন। আন প্রভৃতি ও
জননীশ্রদ্ধা প্রভৃতির গবেষণা-মূল্য প্রত্যক্ষ হইতে

বিবেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর পত্রিকা অল্প-
এবং "বঙ্গ বিজ্ঞানমন্দির" ও বিদ্যাবিদ্যালয়ের
পত্রিকাদ্বারা বঙ্গ বঙ্গ গবেষণায় নিযুক্ত। সত্য
লক্ষণ দেখে নাই। ইহা দেখিলে আপনাতঃ সত্য
হুনিয়া উঠে। কিন্তু এই আশা গোষণ করিয়াই
কি আমরা নিশ্চিত থাকি? হুনিয়া উঠি। বঙ্গবাসী
জিজ্ঞাসন বা জিজ্ঞাসন বঙ্গ বিবেশে প্রতিপত্তি লাভ
করিলে দেশের উন্নতি হয় না। বিজ্ঞানের শিক্ষা
যখন আবিষ্কারের যেরূপ সর্বাধিকারের অধিকার
আমরা গ্রহণ করিবে, তখন বৃত্তি। যেরূপ বিজ্ঞানের
চর্চা সার্থক হইয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স
জার্মানি, প্রভৃতি দেশের যে কোনো বৈজ্ঞানিক
পত্রের পাতা উল্টাইলে দেখা যায়, প্রতিবৎসর
দেশান্তর শত শত লোকে বঙ্গ বৃত্তি নির্মাণ
করিয়া পেন্সিওন লইতেছে। কেহ চা-বঙ্গ মত মত
সত্য আবিষ্কার করিয়া, কেহ কাগজের উন্নতি করিয়া
কেহ বা কপালের কৌশলে মত উন্নতি আবিষ্কার
করিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করিতেছে। আবিষ্কার
যেরূপ বঙ্গের সত্য লোকে বঙ্গ উন্নতি করিবে
পেন্সিওন মত আপনাতঃ তাহা হিমা করিয়া
করিতেছেন কি? বিবেশে বিজ্ঞান নিত্য প্রয়োজনীয়
বঙ্গ উন্নতি করেন, নানা প্রয়োজনীয় তব আবিষ্কার
করেন তাঁহারা বিধি বিজ্ঞানের উচ্চ-উপাধিচারী
পণ্ডিত নহ। তাঁহারা আবিষ্কারের মত অনেক মতো
চলনসই বিকৃত, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের
যাবহারিক দৃষ্টি তাঁহাদের অধিকার এখন
বলিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা চোখ খুলিয়া পরম
করিতে জানেন, হাত পা নাড়িয়া কাজ করিতে
পারেন, এবং চিন্তা করিয়া একটা কিছু উন্নতি
করিতে পারেন। আবিষ্কারের যেরূপ বঙ্গবাসী
মাত্রই তাঁহারা না হইবে ততদিন বঙ্গ, যেরূপ
বিজ্ঞানের চর্চা হইতেছে না। দেশের জনসাধারণকে
বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই
একথা আমি স্বীকার করি না। এখনকার

বাংলাভাষাটি এমন অল্পক ইহা স্বীকার্য্য হইবে যে, তাহাতে 'জ্ঞানের যে কোনো বিষয় যেটুকুট প্রকাশ করিতে একটুকু বই যথেষ্ট না।' তাহার পর সত্যপতি মহাপদ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন এবং কোন প্রাণীকে অল্পকন করিলে সাধারণ বিজ্ঞানের সুপ্তবস্তুগুলি জন্মদান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবে তাহারও পক্ষ দৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“কোন প্রাণীতে মতি কর্তন বৈজ্ঞানিক বস্তুকেও জনসাধারণের বোধগম্য করা যায়, আচার্য্য জননীপক্ষে তাহা সাহিত্য-পরিষদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি দেখাইয়াছেন। তা' ছাড়া টিন্ডাল যেহিঁ লবক প্রকৃত্ত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভাষাভাষার ইংলিশন হইতে নাহিয়া জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন, তাহা আপনাতা লক্ষ্যেই জানেন। আমরা এই লক্ষ্য আচার্য্যের পক্ষ প্রস্তুত করিতে পারিবা না কি? লক্ষ্য প্রচারে আমাদের বেশ কোনো কালে কোনো দেশেও সত্যতা ছিল না। সত্যের সন্ধান পাইয়া আমাদের দেশের রাসার ছেলে গিৎসন ছাড়া, ভিন্দুক ভাষার পর্ব্বতীয় ছাড়া—ছুরি বাহির হইয়াছেন এবং তাহাদের সাধনার ঘন জগৎ-মণ্ডল ঘটন করিয়া দিয়া উপভোগ করিয়াছেন। আমাাদের দেশের আউল-বাউল উদ্যোগে যৎসামান্য কলিকের বন সত্যের আভাস পাইলে মনে বসিয়া থাকিতে পারেন না,—নাচে গানে মাতোয়ারা হইয়া সব ছাড়াই সত্য বিলাইতে গেলের মতো বাহির হন। এই সব আপন-ভাষা ভাষার মনই তাহাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর অন্তরে সুধার অরমল কোপাইয়া আলি-ছেন। ইহারা মনস্তত্ত্ব জানেন না। তপস্কার বল হইতে বিলাইয়া জীবন কাটাইতেছেন। যিনি বিজ্ঞানের যে মন্ত্রের সাধনা করিয়া সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি অবৈজ্ঞানিক জনসাধা

রণকে সেই মন্ত্র দীক্ষা দিবেন। কেন্দ্র প্রস্তুত আছে, —আপনারই অজ্ঞানে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক নিম্নগ্রহণ করিবে।

দেশে বিজ্ঞান-প্রচার আর একটু উপায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রচার। আমেরিকা ও যুরোপের বিজ্ঞান-প্রকাশ দেশে যথা যথ, পরকারি বেসরকারি কারখানা ক্রমিক্রমে প্রকৃতি নানা প্রতিষ্ঠানে কার করিতে ক্রমে একটু মনস্তত্ত্বের আভাস হইলেই তাহার বিবরণ পুস্তকাকারে দেশের লক্ষ লোকের হাতে পৌঁছাই এবং লোকে সেই লক্ষ আভাসের কাণে লাগে। আমেরিকা আমাাদের পরকারি ক্রমিক্রমে চারি আভাসের কলেক্টর পক্ষ প্রকৃতি ক্রমিক্রমে দেশে প্রচার করিবার চেষ্টা হইতেছে,—কিন্তু তাহার আয়োজন যথেষ্ট নয়। কলেক্টর দ্বারা জানিতে পার না। ফল ক্রমিক্রমে নব চিকিৎসা শিল্প প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ বিলাইতেই যথার সাধারণের কর্ণ-পাণ্ডে হওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞান-প্রচার লক্ষ সাধারণ লিখিত বাংলা পুস্তকাদির প্রচারও আমারা দেখিতে পাইতেছি না। আচার্য্য ইংলী মহাপদ আর আমাদের মধ্যে নাই। মাননীয় বোম্বাই প্রদেশের মহাপদ এবং বিদ্যাপ্রচারের আগোচর প্রস্তুত। রং বাহাদুর চৌধুরী বহু মহাপদ যোগ করি ভাবিতেছেন তাহার বাধা যদিও ছিল বৃত্তি তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। মূল্যবৎ শ্রুত লক্ষের রং মহাপদের লেখনী এবং মন্ত্র পতিতে চলিয়াছে। জুবে ও অক্ষরকুসারের সুন্দর পতিতে জুনা করিলে মনে হয় যেন নবালোকবিশ্বের বিজ্ঞান-প্রচারের উত্তম অনেক কবিতা আলিয়ারছে। আমাাদের বৃহৎসংখ্যক সাহিত্যিক পত্রপত্রি পৃষ্ঠা ইংলি পত্রিকা হইতে পুঙ্খ অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক সংবাদে ও চিত্রে পূর্ণ থাকে। ইংলি এক মল পাঠকের মনোরঞ্জন হয়, কিন্তু শিক্ষা হয় না। পদার্থবিজ্ঞান,

কৃষিকা, বনিকৃষিকা, শ্রাণিবিজ্ঞান লব্ধে একবাণি
তাপ পুত্রকও বাংলা ভাষার নাই। ইহা লক্ষ্য
বিষয় নহে কি? আচাৰী জনগোষ্ঠ্যে যে ভাষা
“মাতৃক” হুযুক্ত করিগাছেন, ডাক্তার পিতৃ-
শেখর স্বদেশে কুৎসিতকাক লড়াইয়া হুযুক্ত চিত্রা
বাংলা যে ভাষা প্রকাশ করিগাছেন, যে ভাষা
আচাৰী প্রকৃষ্টত্রে ও শ্রাণিবিজ্ঞান রূপায়নীবিজ্ঞান
পরিচয় বিহার পর বেণাটগাছেন, তাহাকে কখনও
বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-প্রকাশের অঙ্গুপযোগী বলা যায় না।
বাংলা দেশকে এবং বাংলা ভাষাকে তাপ বাদেন,
এমন হুপুস্তিও হুপুস্তকের অভাব নাই। পাঠক-
পাঠিকার লগাও এখন কম নহে। তবে কেন এত
নিকাম? বহায়া, ঐহবস্ত্রে বিজ্ঞানগুণ মহাপর
দেশের প্রতি যে শ্রীতি, যে প্রজ্ঞা লইয়া স্বপ্নমিষ্ট
নিষিদ্ধা পিতাছেন, আপনাবিশ্বকে সেই প্রকার
বিজ্ঞানের নামা বিবরণের দরম পুত্রক পিষিয়া দেশের
লক্ষ লক্ষ বালকবালিকা ও বৈজ্ঞানিক জন-
সাধারণকে বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করিতে
হইবে। আচাৰী ভাষেজ্ঞস্বর বশ বৎসর পূর্বে
রোপনগা ত্যাপ করিয়া এই বিজ্ঞান-সাধারণ
কবিরোপে হাঁড়িয়া বকেল প্রণবর্গকে যে বিনীত
অঙ্গুপযোগী ভাষাইয়াছিলেন, আর আদি তাহারি
পুনরুক্তি করিতেছি,—“আপনাতা কুণ্ডবিত্ত,
আপনাতা জ্ঞানী, আপনাতা দনবী আপনাং
চৌর বসের নব জাগরণ আরম্ভ হইগাছে। জননী
বলভূমির কৌশিকজ্ঞা আপনাতের হস্তে হুত হইগাছে।
আপনাতের নিজের ঘণোত্তরি বেশ-বেশে ব্যাপ্ত
হইতেছে। কিন্তু বলভূমী আপনাতের সুখের দিকে
চাহিয়া আছেন, বলভাণা আপনাতের দেহ
প্রাণনা করিতেছে, বলসাহিত্য আপনাতের ককণা-
প্রাণী, বকের অনসাধন আপনাবিশের অন্তবাসী,
আপনাতের সপুং বিলাস কর্ণক্রেত পড়িয়া আছে।
একপে আপনাতের অবতরণ কখন।”

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ করিয়াছি। এখন

আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করি।
আমকাল আবারো বেণে অনেক দাবীক পর
হইতেছে। (ঐ সম) কালকের দুই চারি পৃষ্ঠা
কি শ্রাণিবিজ্ঞান উত্তরবিজ্ঞান প্রকৃতির “অত
পুথক” বাবা বাহ না? এই প্রকার স্থান
নির্দিষ্ট রাখিয়া যদি লক্ষ্যবস্তুরূপে তাহা দেশের
লোককে তির তির স্থানের পোকাকাকড় সাপগাত্ত,
টুকুটুকু-পিচিটি পত্তপকী, সাহোপার নাম ও
বিবরণ বিবিতার জন্ত প্রবোধক করন, তাহা হইলে
এটা বড় কার্য বহা। দেশের লোকে সার্থী
বিবেই। চট্রপ্রবেশে তাহা মাছ পাখী পে কাকাকড়
বেশা বাহ, বীরজুং তাহার লবজনি দেখা যায় না,
তাহারো নামও দেশের দেশের স্বতঃ। মাছেরা
অগাধের রি রকম স্থান বাদ করে, তাহাদের
জীবনের ইতিহাসই বা কি, কোন্ পাখীর কোন্
লব্ধে আবারো বেণে আসে, কথা চিন্তা যায়,
পাখীরে বাসানির্মাণ ও লজ্জানাগানের পদ্ধতিই
বা কি প্রকার—একপদ তথা কি আবার অঙ্গুপায়ন
করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিব না? কয়েক
বৎসর এই প্রকারে সাহোপা ও শ্রাণিদের
বিবরণ লগুহীত হইলে, স্বদেশের উত্তর ও শ্রাণি-
লব্ধে হুযুক্ত পুত্রক রচনার সম্ভব হইবে। আর
পটিন বৎসর বাটরি করিয়া বেবিয়াছি, ছেলে
যখন নিজের চিত্রকে বিশদ্বন বিয়া শুকনশাইয়ের
পর্যাপন্ন হয়, তখন তাহাতে আর পরার্থ থাকে
না। সে প্রবোধ বহ, শান্ত বহ, নিয়মনিষ্ঠ বহ,
বাবা হয় লব্ধ পাঠককে তে বহ শুপের তালিকা
চার তাহার লব্ধগিই তাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া
যায়,—খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেবল তাহার
নিজের উপরে নিজের বিখ্যাস। সে লব্ধ জীবনই
জ্ঞান লভান করিয়া পুঁথি বাটে, শুকর নির্ধন
যাত্ত সে এক পাও চপিত্তে পারে না। এই
প্রকার শুকনিয়া-বাগার সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে
বেশন অপকার করে, বিজ্ঞান-লব্ধে ঠিক সেই

কখনই অপকার করিহাই আনিবাহে। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ইচ্ছাশক্তি এক সময়ে বলিয়াছিলেন,—*Science commits suicide when it adopts a creed.* তাই বলিতে চাই, বাহায়া কামাধর্মের বেশের আনিবরণের সংগ্রহ করিবেন, তাঁরাবিশেষ ডাক্তারই হইলেও বহু মেডিকেলও মস্তব্যসম্বন্ধে বৌদ্ধ মতবার প্রবেশন নাই এবং ইচ্ছাবলি, ভিউন, ভিওনার ও ভর্তাবের পুণ্ডিতের কি লেখা আছে তাহাও বেবিবার মতকার নাই। দুইদর্শনে যাঁরা চোখে পড়ে তাহাই লিখিত হইত। চোখ খুলিয়া প্রকৃতিকে দেখাই বিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হইলে যে কল পাওয়া যাইবে তাহা অতুলনীয়।”

দর্শন সাধারণ সভাপতি পণ্ডিতব্রজবর লক্ষ্যন ভট্টাচার্য মহাশয় সংক্ষেপে বহু দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার মতীর জ্ঞানের ও বহু বিচার্য নতির পরিচয় পাওয়া যায়। সভাপতি ব্রজবর অমৃতলাল ব্রহ্ম মহাশয়ের রচনা মূল্য হইলেও বহুই প্রবেশের সহিত বলিতে হইতেছে তাহার নিকট হইতে আদর্শ বহুদূর আশা করিয়াছিলাম ততদূর পাই নাই। অনেক স্থলে মূল্য একটু তুলিল ও হইয়াছিল। বহু ব্যাখ্যানে পাঠ্য ভাষা তিনি অনেক স্থলে রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাহায়া সাহিত্যের যতি ও বিস্তৃতি আলোচনা না করিয়া, তিনি বহিঃপ্রাণা সাহিত্যের নাটকের প্রতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কথো আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধির নাট্যবিশারদের নিকট আদর্শ অনেক দূর নহে। লাভ করিতে পারিতাম; অবশ্য একেই অল্প কথায় বহা। তিনি বলিয়াছেন, তাহাতেও শিক্ষার কথা আছে, তবে উগাতে আশাযের তুলি হয় নাই। পরিশেষে বক্তব্য এই তাহাকে সভাপতির বরণ করিয়া বহা সাহিত্য-সম্মিলন কেবল যে তাহাকেই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, তাহার জ্ঞান বাবী যে পূর্ণে রক্ষিত হওয়া উচিত ছিল সে কথাও অস্বীকার করিবার নয়। বঙ্গীয় কবিগণ দিগন্তপথে যতঃ এই সম্মানই পদ বাগলায় সাহিত্যোক্তেরা কোন দিন মান না করিয়া যে পাপ অর্জন করিয়াছেন, যেন বহু ব্রজবর অমৃতলালকে সেই পদে বৃত্ত করিয়া নৈমিত্তিক অর্থানা সমিতির সভ্যেরা বাহায়া বেশের

—বাহায়া জাতীয়—বাহায়া সাহিত্যের সেই পাপের আশঙ্কিত করিয়াছেন।

তাঁর পর বঙ্গ অধ্যাপক, জ্ঞানে প্রসিদ্ধ ইতিহাস সাধারণ সভাপতি ডাক্তার কুমার নরেন্দ্রনাথ মাসার অতিরিক্ত সম্বন্ধে এক কথা বলিব। আদ্যের বহু বহায়া ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকেন এ অভিভাষণ তাহার নিকট সমাপ্ত হইবে। উৎসাহ পতক হইতে ইতিহাসে জ্ঞান সম্বন্ধ প্রাণী অল্পবৃত্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানের ভিত্তি সাধারণ উৎসর্গের কালে ইতিহাসের উপভোগ্য পদ অনেকটা স্তব্ধ হইয়াছে। তিনি যেখানাহেঁন একতম, লিপিতম, সুপ্রতিম প্রকৃতির আলোচনার কালে ইতিহাসে দুঃখের উপভোগ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাচীন পুণি হইতে অনেক সাধারণ পাঠ্য বিদ্যাছে। অবশ্য প্রাচীন পুণি সম্পাদন করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। সুপ্রাণীর পণ্ডিতগণ যে প্রমাণ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অল্পকরণ করিয়া একাধারে অপ্রাণ বহা আদ্যের এই ইতিহাসের সেই পদ অমলন করা উচিত। তৎপরে তিনি প্রমাণ প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের মাজের ব্যাপ্যতা করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাহা সভাপতির নিঃসর কথায় বলি—কেলে বহুপত্রিকা যে ইতিহাস নহে, তাহা এদেশের ইতিহাসিকগণ বহুলা পুণিই বুঝাইয়াছেন। ইহা জানিতেম “ইতিহাসে বহু, অর্থ তাৎ, যেকের উপদেশ থাকে,” অতীত ঘটনা সম্বন্ধে বহা সম্বন্ধের ভাণ বহু লক্ষ্য হয়। সম্বন্ধে ইতিহাসকে যথোপযোজন্য দ্বারা বিবেক একটু অধিক বৃত্তি পড়ায় বহুলা পুণিগণের ইতিহাসিক বিজ্ঞিত হই হইয়াছিল। ইতিহাসের ঐকম উপযোগ্যতা উৎসাহ বহু বাবাই বহু বহু, মহাত্ম্যতক প্রকৃষ্টম ইতিহাস বহা হইয়াছে (মহাত্ম্যত, আদি ১, ২৬৬) এত কলমাকের ইতিহাসের পাশে স্থানে বেষ্টিতার চেষ্টা হইয়াছে; কারণ আদ্য কোটিলার আশ্রয়ে (১, ৪) বেষ্টিতে পাই যে, তখন ইতিহাস বলিতে পুণ্য, ইতিহাস, আশাযিক, উপদেশ, বহুলা, অর্থপ্রাণ এই সমগ্রই বুঝাইত। ইতিহাসের এই ব্যাপক মাজ প্রাণ করিলেই আদ্য বুঝিত পারি—কেন কোন কোন স্থলে (পদ ২, ৮২, ১৫; বাহু ৪৫, ২) নিভাত করিত ঘটনাকেও ইতিহাস নাম বেষ্টি

মন্মথনা ।



প্রার্থনা নিরতা ।



১৩শ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৩০

৫ম সংখ্যা

শোকের পুরী

(শ্রীকৃষ্ণবরদাস মল্লিক বি, এ.)

১

শোকের পুরী সেবার ঘুরি মরছে কালো মেঘ
পাখান ঠেলি পড়ছে ঢলি কত অল বেগ।
বিদ্যল ঘরে বাপ অমে নিশায় করে জল,
কাপসা করে কাপটা কালাল বইছে অবিরল।

২

বিদ্যল ঘরের বাবা বলে, ভালোই করে খট
কেউ বা চিতার অদারেতে পড়ছে তুলে মট।
কেউ বা দিখার পিছু মোড়ে, কেউ বা মুড়ার কেশ।
ছুড়ল ছাড়ি কেউ বা পরে নৈরিকেরি বেগ।

৩

লগে লগীর লগে সেং কিয়ছে কেহ হাথ
কেউ বা স্বামীর শবের সনে স্তোম্য ভেঙ্গে যায়।
সেবার সদাই বাঁধাকার আর চক্রে বহে মৌর
লগ্নুয় হাথ ছুই কিনারে সজল গোখের তিড়।

৪

সেবার পলে স্বাভাবতী, প্রভাস তরা অল
সেবার খোরে অলসিত্তে বেব বেবতার বল।
সেবার থামে হুড়ায় এবং কোঁদ গু টকার ;
লগ্ন অলের শব্দে উঠে অনন্ত ঝঁকার।

জ্যোতিষ

(ঐশ্বর্যশক্তি সুরকার বিদ্যারত্ন)

সনাতন ধর্মের মূল বেদ। বেদ নিত্য অপৌকষ্য এবং সত্যো অতিষ্ঠিত। জ্যোতিষ শাস্ত্র এই বেদ বেদের চক্ষু—“বেদস্ত নির্ধণং চক্ষু জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্পয়ন্”—নাচর (অর্থাৎ নাচর-কবি বলিতেছেন, অমলিন জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের নির্মল চক্ষু)। ভূমণ্ডলে এমন বেশ নাই, যেখানে জ্যোতিষের আলোচনা হই। জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র—“চিকিৎসিত-জ্যোতিষ-তত্ত্ববাসাঃ পবে পবে প্রত্যক্ষোবহতি” (চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও তত্ত্ব প্রতিপদেই বিখ্যাত উপাধান করিয়া থাকে)। পাশ্চাত্য ভূষণে প্রবাসিতঃ ভাণ্ডার পরিচালনার জন্ত জ্যোতিষের আলোচনা হইতেছে। আদ্যের বেদে আদ্যের পূর্ণপুঙ্খবদ্য শুধু শোভা চালনার জন্ত জ্যোতিষের আলোচনা করিতে ন। বর্ষ-কালের জন্ত করিতেন,—“বিতেনতনবিল সৌরঃ শাস্ত্রঃ কৰ্ম ন সিধ্যতি”—ইতি নাসংঃ ।

“বেদা বি বজ্ঞাৰ্হ-মতি প্রকৃত্যঃ কালানু-

পূৰ্ণা বিহিতান্ত বজ্ঞাঃ ।

তদ্বিধিঃ কালবিধানশাস্ত্রঃ যো জ্যোতিষঃ বেদ স বেদ বজ্ঞান্ ॥ ইতি বেদাৎ জ্যোতিষয়্” জ্যোতিষ বর্ষকালের কাল নির্ণয় করিয়া বেদ। কাল বিহীকরণের কারণ হইতেছে—“বরেন-কাহুতিঃ কালে না কালে লক কোটঃ” (অর্থাৎ বরা কালে এক আঘতিতে যে কার্য—কল—হয়, অন্যের লক্ষ আঘতি বিশেষ কোন কার্য হয় না)।

দৈনিক জীবনে আদ্যরা ইহা দেখিতে পাই। বেদন রাজকর প্রদানের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কর না দিলে শাস্তি বিক্রয় হইয়া যায়, একবার

বিক্রয় হইলে আর কিংবা পাওয়া যায় না, তখন আদ্যাদ্যের বর্ষকর্ম সবচে নির্দিষ্টকালে কার্য না হইলে এই কর্ম পত্ত হয়—নিবন্ধ হয়।

এই লক্ষ্য হাড়ী জ্যোতিষশাস্ত্রের আর একটা বিদ্য আছে। জ্যোতিষশাস্ত্র যে বিভাগে প্রতিষ্ঠিত তাহা ইহার পণিত ও কণিত ভাগের সাহায্যে প্রাপ্ত পিত হয়। কণিত জ্যোতিষের হইট ভাগ আছে—একটি—রাষ্ট্র অর্থাৎ বেদের অর্থ্য জ্ঞান; অষ্টটি—জাতক অর্থাৎ মনুষ্যের জীবনের কলাকল।

এই জাতক-জ্যোতিষ নানা বিভাগে বিভক্ত—যেমন—(১) গেরাভ্য অর্থাৎ কোল্লিপনা (২) নই কোল্লি (৩) সানুগ্রিক বা করকোল্লি, লগটি পবনা, অক প্রত্যাবি লক্ষণ (৪) প্রপ পবনা (৫) যথোবর (৬) পূর্ণ জ্ঞান ইত্যাদি।

বর্তমান কেহ একবার জাতক-জ্যোতিষের সার-ব্যা সবচে আলোচনা করা হইতেছে। নভোমণ্ডল ঘাষণ রাশিতে বিভক্ত, এই রাশিগুলিকে অংগ ২৭টি নক্ষত্রে ভাগ করা হইয়াছে। আদ্যরা রবি, শুক্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—প্রবাসিতঃ এই ২৮টি গ্রহ স্বীকার করি। পাশ্চাত্য বেদে জ্যোতি-বেত্তারা রাহু ও কেতুকে একত্র প্রগ্রহই করেন; কিন্তু ইউরেননু ও নেপচুন হইট গ্রহ স্বীকার করেন; মোট তাহার ৩৮টি গ্রহ স্বীকার করেন। এই গ্রহ, রাশি ও নক্ষত্র লইয়া রাষ্ট্র ও মানব জীবনের কলাকল নির্ণয় করা হইয়া থাকে। বস্ততঃ রাষ্ট্র এক প্রাণীর উপর গ্রহের প্রভাব পরিবৃষ্ট হয়। এই গ্রহণকি রাশি নক্ষত্র এবং রাশিচক্রে গ্রহণের স্থিতি হইতে বিব করিতে পারা যায়। এবং এই শক্তিতে রাষ্ট্র ও মনুষ্যের কি ভবিষ্যৎ হয় কণিত-

জ্যোতিষ তাঃ নির্ণয় করিয়া দেয়। গ্রহগতি উপেক্ষার বিষয় নহে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা সমুদ্রের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ এবং উদ্বিগ্ন অগতে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রত্যয় কে অস্বীকার করিবে? এমন কি পাত্যন্ত্য চিকিৎসাসাশ্রয় বর্জন্যে স্বীকার করিতেছে যে একাধনী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে পত্নীয়ে রসাবিক্রা ঘটে—ইহা কি গ্রহগতির ফল নহে? কলিত জ্যোতিষের সাহায্য লইলে এই গ্রহগতি রাষ্ট্র ও মানবের উপর কি ভাবে প্রকাশ পায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। জ্যোতিষ বিজ্ঞান এই গ্রহগতি বুঝিবার সুন্দর পদ্ধতি দেখাইয়া দেয়।

যে বিজ্ঞান মানব চরিত্র বুঝাইয়া দেয়, যাহার সাহায্যে মানবের কৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জ্ঞানিতে পারা যায়, সে শাস্ত্র কখনই সাধারণ শাস্ত্র নহে। অমাবসী সূর্য্য পৃথিবী জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী যদি কলিত জ্যোতিষের ত্রিষপ্রদিক্ত বিবি নিয়মের দ্বারা পূর্ণ হইতেই জানা সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই বিজ্ঞানশাস্ত্র যে অতিশয় সমাধারের এবং প্রয়োজনীয়, তাহা কি সন্দেহ স্বীকার করিবে না? একটি শিশু অল্পগ্রহণ করিল, সেই ভাতক কতদিন জীবিত থাকিবে, কখন ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, কখন কোন বিশেষ পড়িবে, জীবনে মুখ ঐশ্বর্য্যলাভ করিবে কি না, জনদমাঃল ঘনবী হইবে কি না, চরিত্রবান্ হইবে কি না, এই সমুদায় জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়তায় অন্যথাসেই জ্ঞানিতে পারা যায়। এই সকল বুঝিবার সরল রীতি আছে। এক্ষণে উদাহরণ সাহায্যে এই সকল ক্ষুদ্রতর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

শিশু কুম্ভিষ্ট হইলেই এই শিশুর অল্প সময় গ্রহণ করিয়া কাষচক্র বা অক্ষকুণ্ডলী নির্মাণ করা হয় অর্থাৎ অল্পকালে রাশিচক্রে কোন গ্রহ কোথায় অবস্থান করিতেছে, তাহা স্থির করা হয়। তাহার পর দেখিতে হয়, এই শিশুর কোন দিষ্টাশঙ্কা অর্থাৎ বাণ্যকালেই বুড়া বা অমল সম্ভাবনা আছে কি না। ইহা দেখিলে দেখা যায় যে, যেখানে শিশুর,

কোণিতে দিষ্ট পাত্ৰা যাহ, সেখানে এই শিশুকে দিষ্ট-জনিত অমল ভোগ করিতে হয়। যেমন পতাকীচক্রে (ইহা একরূপ দিষ্ট পদনা) যেম (অস্ত্র) হইলেই এই পদনা নির্দিষ্ট দিনে মাস বা বৎসরে শিশুর নিশ্চয়ই অনিষ্ট ঘটবে। নিজের উদাহরণ সাহায্যে কথ্যটা সংক্ষেপে বোঝা যাইবে,—

১। পতাকীরিতি :—

অম্ম—১০২৬ সাল ২ই চৈত্রা শুক্রবার প্রাতে ৯:২৭ মিনিট। অক্ষকুণ্ডলীতে দেখা গেল যে, লগ বুধাশির ২৪ আং ৫৫ কলা এবং ১৮° ৪ ১৮° ৫ ১১° ১০ ২১° ১ ২২° ৭ ৩২° ১১ ১১° ১১° ১০° পতাকীচক্রে দেখা গেল রবির বগে অম্ম। রবি লগে একতু মল্ল বৃক্স, সূর্য্য বিক্ হইয়াছে; এমন কি চন্দ্রও লগের ১০° ৫ থাকায় চন্দ্রের সহিত বিক্ হইয়াছে। এই পতাকী পদনার আকাশ ১৭ ইত্যাদি মাস শিশুর পক্ষে দিষ্ট মাস নির্দেশ করে। এই ১৭ মাসেই শিশু ইংদার ত্যাগ করে। এখানে লগ ও চন্দ্র দুইটি বিক্ হওয়ায় দিষ্ট প্রবল—সূর্য্য শিশু রক্ষা পাইল না।

বিশেষ যেখানে বুধের বগে যেম পাচ, সেখানে শিশু ক্যাচ রক্ষা পায়।

এই পতাকীর বহু উদাহরণ দিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত বহুবিধ যোগের দিষ্ট আছে। শাস্ত্রে এই সকল যোগ লিখিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধে লিখিত যোগের উল্লেখ করিব না বলিয়া এখানে তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিল না। এ প্রবন্ধে অতি দূর ভাবে একরূপ ঘটনার কোণিতে কেমন একতাবাপন্ন স্বরূপটি গ্রহণ্যক, তাহা বোঝাই; এবং ঐরূপ গ্রহের সমাধানে যে জীবনের ঘটনা এই একতাবের লগেই চলিয়া থাকে তাহার ইঙ্গিত কেমন সুন্দর পাত্ৰা যাহ, তাহা বিবৃত করাই, এই প্রবন্ধের অন্ততম উদ্দেশ্য।

২। শিশুরিতি :—

অনেক শিশুর কোণিতে পতাকী দিষ্ট থাকে না

অথচ নৈপথে তাহারেব জীবনান্ত ঘটিল। যেমন,—

(ক) অশ্ব—১৮৩৩।৭।৩০ ১৯।১৬।৪।১।৩০ (১৯১৭

খ্রিঃ ১৭ নভেম্বর)—মৃত্যু ৮ মাসে।

অশ্বহুতগী—লং ১১।১৫' র ৭।২০' সু ৭।২০' ৫
৪।২০' সু ১।১৫' বক্রী কে ২।১০' ন ৩।২১' ম ৪।১২'
জ ৮.২৭' রা ৮।১০'

(খ) অশ্ব—১৮৩৪।৭।১২।১১।১০২।৩০ (১২১০
৫৭শে নভেম্বর) মৃত্যু ১১০ মাসে।

অশ্বহুতগী—লং ১।১৮' রা ১০।২২' ন ১।২৪'
ম ৩।২০' কে ৪।২২' জ ৬।২৭' সু ৬।২৮' র ৭।১০'
ট ৭।২৮' সু ৮।২৮'

ঐষ্টব্যঃ—হুইট কোজিভেই ননি ৫ম পত এবং
লর হুর্লপ। এইরূপ স্থলে নৈপথে মৃত্যু ঘটিল।
এ হুইট উৎসাহবৎকে যোগদ গিষ্টির মধ্যেও বরা
চলে।

পিতৃ সপক্ষে একজন শাস্ত্রকার ১২ বৎসর, অত্র
শাস্ত্রকার ২৪ বৎসর, পিতৃর আত্ম দেবিতবে না
বসিরাছেন। তাঁহাদের মতে এই সময় পিতা
মাতা বা পিতৃর পাশে আত্ম অতি ক্রম
করিয়া যে কোন সময়ে পিতৃর মৃত্যু ঘটতে পারে।
এই সময় ঐকম প্রয়োগে ও বৈব উপায়ে পিতৃকে
রক্ষা করিবার উপদেশ দিরাছেন।

(৩) অম্মাঃযোগঃ—মোতিব শাস্ত্রে মানবের
অম্মাঃ, মধ্যাঃ ও দীর্ঘাঃ ত্রেমে তিন প্রকার আত্ম
নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মতভেদে ৩২, ৩৬, ৪০ বর্ষ
অম্মাঃ; ৬৪, ৭২, ৮০ মধ্যাঃ এবং ৯৬, ১০৮, ১২০
দীর্ঘাঃ ধরা হইয়া থাকে।

অম্মাঃযোগে বাহ্যাত্মা অশ্মশ্রমে করে, তাহারাই এই
অম্মাঃর কোটা পার হইবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে
পতিত হয়। মধ্যাঃ ও দীর্ঘাঃ সপক্ষেও ঐরূপ।
কে অম্মাঃ হইবে, কে মধ্যাঃ হইবে, ইহা মোতিব
শাস্ত্রের বিবি দ্বারা শরীকা করিলেই জানা যায়।
উহার সূচক আলোচনা করিতে হইলে অনেক
কথা বলিতে হয় যদিবা সমসাময়িক গ্রন্থক বিরত

হইলাম এবং হুই তিনটি উৎসাহরণ দিরা মৃত্যু মানব
নয় বলিবা সে কার্যেও নিরত রহিলাম।

৪। বহুস্থলে দেখা যায় যে, নবজাত পিতৃর
তোন অবলম্বন ঘটিল না, কিছ তাহার পিতা বা
মাতার, কোন স্থলে উত্তরের আদর্শন মধ্যে
জীবনান্ত ঘটিল। ইহার কারণ সম্ভাব্যের প্রবল
পিতৃ মাতৃবিষ্টি। সম্ভাব্যের কোজি হইতে উৎসাহ
নির্দেশ বিশেষ কঠিন ব্যাপার নহে। উৎসাহনঃ—

(ক) অশ্ব—মক ১৮৩১।১।৮।২।৪০ (১০২৬।২
নোষ্ঠ)—মাতৃহানি ১০২৬—৩রা কার্তিক।

জাতিচক্রঃ—লং ১।২৪' র ১।৮' ম ১।৪' কে ১।১১'
জ ২।১২' সু ২।২২' ন ৩।২০' রা ৭।১১' ৫ ১০' সু ১।১৮'

ঐষ্টব্যঃ—লর সুব রাশি, তাহাতে রবি ও মঙ্গল
এবং মনে রাশি। ইহাতে পিতৃবিষ্টি ও মাতৃবিষ্টি
বুঝা যায়। এবং মাতৃবিষ্টি প্রবল। মঙ্গল মধ্যে
ইহার মাতার মৃত্যু ঘটিল এবং পিতার বিশেষ দীর্ঘা
হইয়াছিল; যেখানে লরে পাশ বাহ্যাত্ম ও ৭ম বা
৮মে পাশ থাকিবে সেখানে পিতৃমাতৃ সপক্ষে মত
বুঝিতে হইবে।

(খ) অশ্ব—১৮২৬।১।৪।৪।৪০

এপ্রেল)—মঙ্গের পর মাতৃহানি।

জাতিচক্রঃ—লং ১১।২২' সু ১১।১৪' র
১।৪' ম ১।১৪' সু ১।২২' ৫ ১।২০' রা ৪।৪' ম ২।২৫'

ঐষ্টব্যঃ—এখানে মনি ও মঙ্গল উভয়েই গিহের
নবাংশে আছে এবং চন্দ্রে এই চন্দ্রেই কেজ পঞ্চা
মাতৃহানি হইয়াছে। অতএব মনি এবং মঙ্গল
যে চন্দ্রে চন্দ্রে থাকিলে মাতার অন্তিম প্রব বুঝিতে হইবে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে মোতিব শাস্ত্রের
বিবি মানিরা সৌমহাদ করিলে অম্মাঃযোগে পুত্র
কন্তা জন্মে না, কিংবা সম্ভাব্যের বাধ্যকাল পিতৃমাতৃ
হানি হয় না। শাস্ত্রের আদেশ মানিলে ইচ্ছামত
পুত্র বা কন্তাও জন্মায় এবং এই সম্ভাব্য সৎ ও দীর্ঘজীবী
হয়; আর পিতৃ মাতৃ িষ্টি নষ্টা ক্রমপ্রব করে
না। আনন্ডা শাস্ত্র মানি বা স্ত্রত্যা পুত্রশোক

সংজ্ঞেই প্রাপ্ত হইবে। এই কথিত জ্যোতিষের সাধারণ্যে আমরা পুরোঁক বিশদ ভুলি হইতে সংজ্ঞেই রক্ষা পাইতে পারি।

৪। জ্ঞানবোধ বিম্ব চন্দ্রের বৈদ্যনা এক ভীষণ ব্যাপার। আক্ষিকাল বিধবাবিবাহ বিশেষ আশ্রয়ক এইরূপ মত ব্যক্ত করিতে অনেক ইহার জবাব পূর্বককে দেখা যায়। কিন্তু কয়েক প্রকৃত জবাবদান ব্যক্তি, বাহাতে বাণো বা যৌবনে বৈদ্যনা না ঘটে, তাহার কারণ অজ্ঞানতা করিয়া উহার প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র চক্রেতে অসুখি মিথ্যে দেখাইয়া দিতে পারে যে এই বালিকা বিববা হইবে এবং এই যুগক বিশেষীক হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে জ্যোতিষ শাস্ত্র অসুখি বিশদ দেখাইয়া দাত হইবে না; এবং প্রতিবিধানের এরূপ উপায় নির্দেশ করিতে সমর্থ বাহাতে এরূপ ভীষণ দৃষ্টিনা আনো ঘটবে না। জ্যোতিষের প্রতি আস্থা থাকিলে এবং শাস্ত্রের আদেশ মানিয়া চলিলে অশাধা সাধনও করা হইতে পারে। অন্যতর বিজ্ঞ নিপুণ শাস্ত্রজ বুড়িয়ান্ চিত্তাশীল জ্যোতিষীরাপ বৈদ্যনাযোগবৃত্ত ও পত্নীহানি যোগবৃত্ত কোম্পি দেখিয়া ব্যবস্থা করিলে ঐ যোগের বিশেষীক ফল ঘটাইতে পারেন। এরূপ ফলে শাস্ত্র বলিতেছে, “তৎপুণ যোগল দারিদ্র্যভেদ, জীবতি পুত্রদানবিশুদ্ধক” অর্থাৎ পুত্রকোম্পিতে বেরূপ পত্নীহানি যোগ লক্ষিত হয়, ঠিক এরূপ বৈদ্যনা যোগবৃত্ত জীৱ সহিত ঐ পুত্রের বিবাহ হইলে, উভয়ের ঐ ভাব্যবহ যোগ কাটিয়া “দোষ হয়ে হ’ল জপ” হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই যে, জী বা পুত্রের কোম্পিতে মঙ্গল গর, ৩৪, ১৪, ৮৪ ও ১২শে থাকিলে বানী বা পত্নীহানি হয়। ইহার উপায়রূপ এত কোম্পি যে তাহা এখানে তুলিয়া তুলি সমর্থ হইত করিবার আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু নিপুণ শাস্ত্রবর্জক জ্যোতিষেরূপগণকে একত্রিত করিয়া এরূপ যোগবৃত্ত পাজীর কোম্পি বিচার করিয়া সমান দেখা-

ক্রান্ত শাস্ত্রের সহিত বিবাহ নিলে, এই লক্ষণ অশ্রুত ঘটনা হইতে আমরা বহুদূর পরিমাণে রক্ষা পাইতে পারি। দৃষ্টান্তে আমরা দেখে, আমরা শাস্ত্রের প্রতি অশ্রুত পুণ্য, জুস্তং অতি আশ্রয়ক বিচার লক্ষ্য হই। আর এক কথা, অনেক বিচারে যৌতিক বিচার করান। মনে করেন, অসুখ “পুণ” “বর্ষ” প্রকৃতি মিল করিয়া বিবাহ দিলেই বৃষ্টি রোহিতমত জ্যোতিষ-সম্বন্ধ বিবাহ বেতন ৩৫শ। শাস্ত্রের জ্যোতিষীরাপ এরূপ যৌতিক বিচার করিতে চানেন এবং এরূপ বিচারে ভুল-খোঁট হইতেছে বা অন্য যোগবি বিবাহে মিল হইয়াছে দেখিয়া কোম্পি মিল করিয়া বিবাহের অজ্ঞানতা বিচার বিবাহে মঙ্গল হইবে বলিয়া অতিমত প্রকাশ করেন। অনেক আশ্রয়দান ব্যক্তি, এরূপ শাস্ত্রজ্ঞান হান অক্ষাচীন জ্যোতিষীর হাতে পড়িয়া কোম্পি মিল ঠিক হইয়াছে বিশ্বাসে বিবাহ মিথ্যে থাকে; তাহাতে অনেক যুগে অশ্রুত ফল ফলিয়া যায়। শুধু তাহাও শাস্ত্রের বিবাহ দারিদ্র্য কেনেন। বস্তুতঃ তাহাতে শাস্ত্রের দোষ নাই; বোধ হইতেছে যুগ জ্যোতিষ-বোধের। বিবাহে কোম্পি মিল করিতে হইলে কি কি বিষয় দেখিতে হয়, তাহাও জ্ঞান না থাকায়, তাহাও শাস্ত্রের অযোগ্যতা করিয়া থাকে; ফলে বিশ্বাসের মনে অবিদ্যমান জ্ঞান; প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রজ বুড়িয়ান্ জ্যোতিষী উভয়ের যৌতিক বিচার, আশ্রয়দান, শুদ্ধ মঙ্গল প্রকৃতি গ্রন্থের এবং ভাববিচার করিয়া কোম্পি মিল করিয়া নিলে, সেদূর ক্ষেত্রে বিবাহে অশ্রুত হইতেই পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাধারণ্যে লক্ষ্যে আমরা জ্ঞানবোধের কত ভদ্রিনা প্রকৃতি:ক অক্ষাচীন বৈদ্যনা হইতে বহুদূর পরিমাণে রক্ষা করিতে পারি।

৬। কতকগুলি পোকের আকর্ষিত ঘটনা হইতে। তাহাও শাস্ত্রের কোম্পি দেখিলে তাহা-দিককে ঐ বিষয়ে সাবধান করিয়া বেতন অশ্রুত

নহে। নিম্নে তিনখানি খুনি কোম্পি বেখাই
তেছে :—

(ক) ১৭০৮/১৭১১/২২৭১০২—০০৭ খালে
পিতলের স্তম্ভিতে নিহত। লং সিন্ধের ১৪'। চ
বু কড়াই। কেতু তুলার। শ মকরে। রা মেখে।
র ম মিথুনে। বৃ শু কৰ্কট।

(খ) ১৮০২/৩১০৪১৪০—২১ বর্ষে পিতলের
স্তম্ভিতে নিহত।

৪৪ বহু। রা বহুতে। বু মীনে। শ মেখে।
কে মিথুনে। চ কড়াই। র ম তুলার। বৃ শু
কৰ্কট।

(গ) ১৮০৪/২০ রাত ১০ টায় ভগ্ন।
২৬ বর্ষে পিতলের স্তম্ভিতে নিহত।

লং সিন্ধের ১৮'। চ সিন্ধে। শ কড়াই।
কেতু তুলার। শু কৰ্কট। র বৃ বহুতে। ম
বু মীনে। রাহ মেখে।

ঐহ্য :—উপরে লিখিত ৩টি কোম্পি হইতে বেখা
যায় যে, রবি মঙ্গল একত্র বা পরস্পরের কেন্দ্রে
আছে। শনি ও রবি মঙ্গলকে বেধিতেছে বা
কেন্দ্রে বা অষ্টমে আছে। আর অষ্টমতাব এবং
সন্ধ্যা তিনটি জিকোন পীড়িত। কোন কোম্পিতে
এইরূপ পর্জ্যাক্ত এবং সমাবেশ বেখা বাইলেই বলা
গিবে যে বাহার এই কোম্পি তাহার আকস্মিক
দুর্ঘটনা ঘটায় সন্ধ্যাবনা।

৭। কিন্তু গ্রহসমাবেশে পাণ্ডল বহু, কয়েকটি
পাণ্ডলের কোম্পি উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখান বাই-
তেছে :—

(ক) ১৮০৩/৪১০৪৮—লর কড়াই ১'। র
কড়াই। বৃ চ তুলার। রা কৰ্কট। শ মেখে।
বৃ কে বুধে। ম মিথুনে। শু সিন্ধে।

(খ) ১৮২২/১১/২৪৪০০/২১৪০—লর তুলার।
চ তুলার। রা কৰ্কট। বু শ বহুতে। র বৃ শু
কৰ্কট। কে বুধে। ম সিন্ধে।

(গ) ১৮১৮/৩/১১/১০১১২—লর সিন্ধে।

কে সিন্ধে। শ তুলার। চ বহুতে। রা কৰ্কট।
ম মেখে। বু বুধে। র শু মিথুনে। বৃ কৰ্কট।

(ঘ) ১৮০৭/০১/০৭/১৮—লর মিথুনে। শ
মিথুনে। বু সিন্ধে। রা কড়াই। চ কৰ্কট।
কে মীনে। র ম বৃ শু মেখে।

ঐহ্য :—এখানে বেখা যায় যে ৪ম পতি দুর্জল,
রবি পীড়িত এবং মঙ্গল বা শনি বা রা বুধ বা চন্দ্র
পীড়িত। বুধ পীড়িত হইলে মতি গুট করে।
বাহার কোম্পিতে এইরূপ শেষ বেখা বাইবে, তাহার
মতিঃকর দেখা আছে বা হইবে, ইহা জানি যা'।

৮। পুরুষের কোম্পি হইতে গ্রীষ্ম এবং গ্রীষ্ম
কোম্পি হইতে বার্মার অগ্নিস্রোত জান।

(ক) ১৭৮৭/১১/৭৭/১১—লর মীন ১২'।
কেতু লরে। চ কৰ্কট। রা কড়াই। শ তুলার।
ম বৃ বহুতে। র বৃ শু মকরে—গ্রীষ্ম কলে জুবিয়া
মুহূ।

(খ) ১৮১১/৩/২০/২৪—লর মীন। চ
বুধে। রা মিথুনে। ম শু শ সিন্ধে। বু র কড়াই।
বৃ কে বহুতে—২য় গ্রীষ্ম আগনে পুড়িয়া মুহূ।

(গ) ১৮২৪/১১/২৪/০৪/০৮, ৭—লর তুলার।
চ বহুতে। শ মকরে। র শু কে বু মীনে। ম বু
মেখে। রা কড়াই—বার্মার কলে জুবিয়া মুহূ।

ঐহ্য :—উক্ত কোম্পিগুলি হইতে বেখা যায় যে,
শুক ও ৭ম তাব পীড়িত। রবি তাব পশ্চাদ্ভুক্ত,
মুঠে বা কেন্দ্রে। এইরূপ সমর্থ্যাক্ত গ্রহ-গতিগণ-
নুক্ত কোম্পি হইলে গ্রীষ্ম বা বার্মার অগ্নিস্রোত সন্ধ্যাবনা
নির্দেশ করা গিবে।

জ্যোতিষে যেমন দুর্ঘটনা নির্দেশ করিয়া দেয়,
তেমন শুভ ঘটনাও জানাইয়া দেয়। উদাহরণে ইহা
বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে :—

(ক) ১৮৪৩/১১/১০/১০২, ০২ লং ৩১৮' রা ১১৩৮' ম ১১৪০'
শ ১১২৭' বু ২১১' র ২১২৭, ৪৮ ৪১৬, ৪৪' বু

(গ) ১৮১৮/৩/১১/১০১১২—লর সিন্ধে। ৪২৬/২০৫ক ৪১৮' শ ৭, ৩০'

will be very highly strained. A European war is threaten'd."

"Two deaths among the European royalties are indicated and one of them will be from violence or treachery." King Carol of Roumania died 10.10.14. The Archduke Franz Ferdinand, heir to the throne of Austria, was assassinated 28.6.14.

"Political relations all over the world during the months of August and September will be highly excited." (the war began in August).

শনিগ্রহকে যে অবস্থা হুঙ্কর কারণ বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ :-

"বিপ্লব জী বহুমৌলি বান্দো মল্লো বহা ভবেৎ ।
হহা কৃণা বিনশতি পুণ্ডি-শোভিত পুরিতা" । তথাচ
"বিপ্লবঃ বহুমৌলি-বান্দো মল্লো মল্লজিতঃ । ইত্যাদি

শনি বিপ্লব, কল্যাণ, ধন ও মান রূপিতে উপস্থিত হইলে রাজার বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং পৃথিবী রক্ত পরিপূর্ণ হয় । অর্থাৎ উক্ত রূপের যে কোন রূপিতে শনি আশ্রিত হইয়া থাকে । বিপত হুঙ্কর যে পাতাভাষিতে বর্ণিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ :-

"শিখুনকে" লুণ্ঠনগোত্রী হস্ত বা হস্ত সংস্থিত ।
গর্তিকং জায়তে বজ্র পশ্চিমাংশে লুণ্ঠনঃ ॥ অর্থাৎ
শিখুন রূপিতে শনি বা হস্তের অবস্থান কালে গর্তিক হইবে এবং পশ্চিম কোণে হস্তরূপ বিনষ্ট হইবে ।

হুঙ্কর শব্দের বচন আরম্ভ হইলে লুণ্ঠন বিধান করিতে চান না, প্রমাণ বিধি, শত্রু যে সত্য তাহা দেখাইতেছি । বৈধবন যে, শনি যখনই উক্ত ভাষি রূপিতে আশ্রিত হইবে, তখনই হুঙ্কর, রাজ্যনাশ, রাজার মৃত্যু, রাজার পরিবার, বিদ্রোহ, প্রকৃতি নানাবিধ উৎপাত হইয়াছে ; এবং এইরূপ যে , nar 1855.

আবস্থানকাল ঘটবে তাহাও স্মৃতিতে হইবে ।
ঐতিহাসিক প্রমাণ :-

শনি—বিপ্লব—মুঠাঘ—১৭২৮-১৭১৮২৪—২৮ ৪

১৮২৪-১৮২৮ ৪-১৮২৮১৮৩০—১৮৩০

কল্যাণ—, ১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০

১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০

১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০

১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০

১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০

১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০—১৮৩০

(১) শিখুনকে শনি—১৭২৮-১৭১৮২৪—২৮ ৪

১। 4th Mysore war and restoration of Hindu dynasty in Mysore.

২। Battle of Nile,

৩। Switzerland subdued by the

French. etc

১৮২৪-২৮ মুঠাঘ :-

১। Capture of Bharatpur.

২। Massacre of the Tanizaries in Turkey 1826.

৩। Varna surrendered to the Russians etc

১৮২৪-২৮ মুঠাঘ :-

১। The Sepoy Mutiny (1857).

২। Annexation of Oudh.

৩। English war with China and Persia.

৪। The Fallof Sebastopol 1855. etc

১৮২৪-২৮ মুঠাঘ :-

১। Annexation of Burma.

২। Alexander renounced the throne of Bulgaria 1886.

৩। Egyptian rebels captured San-

- ৪। French destroyed Chinese fleet on Min River 1884. etc
- ১৮৮৫-১৬ বৃষ্টি :-
- THE LAST GREAT WAR.
- (২) অষ্ট্ৰিয় শক্তি = ১৮০০-২ বৃষ্টি :-
- ১। 2nd Maharatta war.
- ২। War with Holkar.
- ৩। Tripolitan war. Bombardment of Tripoli.
- ৪। Battle of Trafalgar.
- ৫। Napoleonic war.
- ৬। Napoleon's victory at Austerlitz. etc
- কৰ্ণাট শক্তি = ১৮০২-০৫ বৃষ্টি :-
- ১। Change of Viceroy in India.
- ২। Twice resignation of Ministry in England.
- ৩। 2nd War with Seminole Indians begins 1835.
- ৪। A 2nd insurrection in Rome suppressed by Austrian troops 1832.
- ৫। Death of Emperor Francis 1835.
- ৬। Greece becomes independent 1832. etc
- ১৮০১-০৪ বৃষ্টি :-
- ১। Change of Viceroy in India.
- ২। Riots in Baltimore & Battle of Bull Run 1861.
- ৩। Separation of the Ionian Islands from England and united with Greece 1863.
- ৪। The Polish Insurrection.
- ৫। Mexican War 1861.
- ৬। War in Japan 1862. etc
- ১৮১১-১৩ বৃষ্টি :-
- ১। Manipur Expedition.
- ২। Labour disturbance at Homestead.
- ৩। War in German South West Africa.
- ৪। Dispute with Swiss Republic. etc
- ১৮২০-২১ বৃষ্টি :-
- ১। বোম্বা বিদ্ৰোহ, অনববোম, মহাদেশীয় সেনা, ভল-প্ৰবন, দ্বিতীয়, উত্তৰপুৰে জিলা বিদ্ৰোহ, নাতার হাৰাৰ হাৰাভাৰ ইত্যাদি।
- ২। আৰাধ্যলোভের আৰ্হণক আৰীমতা পাত, দ্বিতীয় পরিবর্তন; আৰ্হণক সক্তি, প্ৰেচিডেন্সি হাজি-এই দ্বিতীয়।
- ৩। কৰ্ণাটী হতে আৰ্হণকীৰ নিৰ্ভৰ, বৃহৎপরিমাণ বিপ্লব প্রকৃতি অসংখ্যকীৰ হাৰাভাৰ।
- (৩) অষ্ট্ৰিয় শক্তি = ১৮১১-১৮১৪ বৃষ্টি :-
- ১। The Nepal War.
- ২। The Napoleonic War.
- ৩। United States declare War against Britain. etc
- ১৮৪০-৫০ বৃষ্টি :-
- ১। The Sindh War.
- ২। The Gwalior War.
- ৩। British took Amoy in Opium War. etc
- ১৮৭০-৭৩ বৃষ্টি :-
- ১। Change of Viceroy in India.
- ২। War between France and Germany, etc
- ১৮৯৯-১৯০২ বৃষ্টি :-
- ১। Death of Queen Empress Victoria.
- ২। Change of Viceroy.

প্রাচীন-সংস্কৃত বিজ্ঞান হইবে গণনা করিয়া তৎসমুদয়ের
কোণী তরুণ করিয়া কল দিখিয়া গিরাহেন, তাহা
আন্তর্য্য ভাবে মিলিতেছে; ইহা কি অতিমাত্র
বিশ্বের কথা নয়? জ্যোতিষে কি অদূত উন্নতি
হইরাছিল। তাই বলিয়াছি যে এককালে জ্যোতিষ
বিজ্ঞান এদেশে আন্তর্য্যরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।
কালক্রমভাবে দেশের দুর্ভাগ্য আশ্রয়ের দুর্ভাগ্য
আশ্রয়ের এই অমূল্য শাস্ত্র নষ্ট হইয়াছে। এখনও
পণ্ডিতভাবে বাহা আছে তাহাও ধ্বংস হইতে
বসিয়াছে। আশ্রয়ের জ্যোতিষ এখন মৃত।
ইহা কি গণিত কি কলিত চুই তাহাই বিদ্যুতের
অতল জলে নিমগ্নপ্রায়। আর পান্ডিত্য জ্যোতিষের
এখন শৈশবাবস্থা। এখন তাহার গণিত ও কলিত
হই অর্থাৎ জ্যোতিষ হইতে চলিয়াছে। গণিত-
জ্যোতিষের ত কথাই নাই, কলিত-জ্যোতিষ এখনই
পান্ডিত্য বশত এমন প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে
যে কলিত জ্যোতিষের মানিকপত্রও পুস্তকের সংখ্যা
বৃদ্ধ কনয়। এমন কি কলিত জ্যোতিষের স্থান
কলেজ স্থাপিত হইয়া তথায় স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন
চলিতেছে। অনেক বিজ্ঞানোক্ত জ্যোতিষের ভাষ্যের
পরামর্শসমুদয়ে কাণ্ডও করিতেছেন। আর বাহ্যিক
জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের উন্নততম চূড়ার উঠিয়াছিল
তাহারের এখন কি বোঝা অসম্ভব। তাহারের
একটি পঞ্জিকার গণনা অষ্টটির সহিত মিলে না।
কলিত জ্যোতিষে যদিও তাহাও এখনও পান্ডি-
ত্বের কলিত গণনা হইতে উন্নত বসিয়াছে, তথাপি
তাহার মূল্যের স্রষ্ট। দেশের উপর নানাক্রম
অজ্ঞাতের উৎসাহিত স্বত্বাধীন চলিয়া যাওয়ায়
এই প্রাচীন শাস্ত্রের একরূপ লোপ লাগে

হওয়ার তারতীর জ্যোতিষে এই দুর্ভাগ্য। ইহাও সত্য
মুদ্রান্ত জ্যোতিষের সর্বত্র ধোঁহা রাখিবার ইচ্ছা
প্রবল হওয়ায় জ্যোতিষ-শাস্ত্র দুর্ভাগ্যের স্রম শিবের
উঠিয়াছে। এখন এই সুপুস্তক জ্যোতিষ শাস্ত্রের উচ্চ
সাধন করিতে হইলে, স্নাতকোত্তর গবেষণা আবশ্যিক।
এখনও পুস্তক সংগ্রহ হইতে পারে এবং যে
সকল পুস্তক আছে তাহা লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া
গবেষণা করিলে, অনেক লুপ্ত হইয়াছে হইতে পারে।
কিন্তু এমন সম্ভব বাকি কে আছে মিনি সত্যতরে
অবগত করিয়া এই শাস্ত্রের অমূল্যত্ব করিবেন।
যত প্রকার শাস্ত্র আশ্রয়ী আলোচনা করি, তাহারের
অংশক এই শাস্ত্র কোন অংশে হীন নহে। তথাপি
মূলপঞ্জিকাভাষ্যে আশ্রয়ের বেশে এই জ্যোতিষ
আলোচনা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। তাহা হার
নাম "জ্যোতিষশাস্ত্র", আর তাহার এই প্রবণতা।
তবে সত্য কখন ধ্বংস হয় না; এই বিশ্বাসের
বশবর্তী হইয়া আশা করিতে পারি এখন মিনি
আদিবে, যখন এই শাস্ত্র পূর্ণের জীব আশ্রয়
বিমল জ্যোতিষে লগ্নকে আলোকিত করিবে।

যে শাস্ত্র-সাধায়ে সৎ ও দীর্ঘকালী সন্ধান সত্য
উৎপাদন করা যায়, সেইখানে পিতৃবৃত্ত হানি রক্ত।
করা সম্ভবপর, বৈদ্য ও পণ্ডিতানি নিধারণ করিতে
পারা যায়, দুর্ভাগ্য, দুঃসময়, দুঃসময় প্রভৃতি নান-
বিধ অসংসার হওয়া যায়, সেই শাস্ত্র অতি প্রয়ো-
জনীয় সম্ভবতার অংশে কল্যাণদায়ক জ্যোতিষশাস্ত্র।
যাহাতে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসমূহের হয় তাহার চেষ্টা
করা সম্ভবপর হওয়ার একটি প্রধান কর্তব্য বসিয়া
বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়? *

* চতুর্দশ বর্ষীয় সাহিত্য-সমিতিতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের পঠিত।

নাঙ্গী রুদ্দীন

(ঐতিহাসিকগন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ)

পাঠান তখন দিল্লী-আগনে বসিয়া শাসিছে বেশ,
বাৎসা মামীর মাঝ স্থৌর ভাণের নাহিক শেষ,
বান্দা তাঁহার চরণে লুটকে, বর্ষ তাঁহার যুগে,
বাঁহতে তাঁহার বস্ত্রের পরিবা, বাজ্য হানিছে সুখে,
বাৎসা-পত্নী রজন করে, পক্ষ নাহিক বনে,
পতিব্রতী তাঁহার নিজ্য যোগ্যে কৃতি লভয়ে মনে,
অবলে হস্ত অকুলি লয়ে হাঁড়াল বাৎসা কাছে,
ভক্তি হাঁড়ারে বর্ষ ছাড়ে, দ্বায়ে পাইতে যাচে.

কছেন বেগম, "কেমনে তোমার যোগ্য অরমণ,"
কহিতে কহিতে কথন মন করি উঠে ছল ছল,
কছেন বাৎসা "হুতা প্রকার—তা' ছাড়া নহিত কেহ
দিল্লী-প্রাণার এ ধন-আগার তেব না তোপের পেচ,
কুহ লেখনী লবণ দ্বার অর্ধ কোথার তার,
অবলার হিতে আনিবে কৃত্য লইতে সেবার তার।"
"পতি বার লস! সেবার নিরন্ত, পত্নী তাহার দাসী"
কহিয়া বেগম নমিল চরণে ঐহুখে হুটল হাসি।

মোরসাহি যুদ্ধ

(ঐতিহাসিকগন কায় চৌধুরী বি, এ)

লাহোরের শাসিনার উত্তানে কোন এক বুড়া-
লজাব ঘোষ দ্বারা ধটক বুড়ামুলা নর্যকীর
বহিষ পণ্যবন্ধন দ্বাৰাজিতের পরিচয় হয়। এই
হাঙ্গামাবিলাসবদী রজনী রণবিংতে, আগনার
আগভেন লগে সম্পূর্ণরূপে আনমন করে।

ইতিং ইহার বোহে এতদূর আবিষ্ট হয় যে
মত অবস্থার রজনীকে সঙ্গে লইয়া প্রাইই হস্তিতে
চড়িয়া জব্ব করিতে বাহির হইতেন।

বোম্ব রণজিতের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার
করিয়াছিল যে কোন এক লম্বের দাড়াইয়া জুরদা-
নেম তার দুহাণুতে রণজিতের নামের সহিত তাহার
দাম মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১৮১১
বুর্জায়ে মোক্কেল দাবাকিত হুজ। প্রচারিত হয় ;
কিন্তু হুজা বুটে মোক্কেল অমুদ্রিত নিবন্ধনের প্রদান
প্ৰত্যাখ্যাত হয় না।

মোম দম্ব বহন বাচক। মদুর পুঙ্খই তাহার,

অভিষেকের একমাত্র নিবন্ধন। যদিও পণ্য-বিশিষ্ট
"মোর কাটনি" নামে অভিহিত, তথাপি যেটি
বাগাবদা সমাজে হুজাগুলি "মোরসাহি যুদ্ধ" নামেই
খ্যাত।

এই হুজাগুলিতে আগনি চিহ্ন অঙ্কিত আছে।
বুড়া-সীত-পটায়নী নর্যকী, বদী এবং লক্ষ্মণেশ্বরী
বনগর্জিত রজনীরাও আয়সি দ্বারক করিত। কিন্তু
কাল পরে এই বোম্ব চিহ্নটি লুপ্ত হইয়া যায়।

"দাবি" পুস্তকের নির্দেশানুসারে দুগদা-
নকিতা লালন করা দিব্যিদের গুপ্ততর অগদা।
মোর কাম্বো-বিবাসিনী দুগদা-
রজনী।

রণজিতের এই বোম্বাচার বর্ণগ্রাণ দিবদন বহু
বিন নির্দিষ্টারে সহ করিয়াছিলেন। অধুনা
তাঁহার তাঁহার গুপ্ত অগদা-
বিনাশের মত উক্ত হইলেন।

প্রথমতঃ দাবির তলে রণবিং কর্তৃক প্রথম

পূজোপহার নিষিদ্ধ হইল। তৎপরে তাঁহার তাঁহাকে সম্মতপরে পুরোহিতবৃন্দে এক সভায়ওপে আত্মন করিলেন। শঙ্করের সৰ্ব্বপ্রধান পুরুষ, জাতির এই কঠোর অবস্থানে মরণপে দুক্তপাশি হইয়া সভাতলে ঝালপাশিদের ঐতিহিবিবর্গের নিকট কথা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার তাঁহাকে একলক পক বিশেষিত সহস্র দুহা, অপরাধের গুণ

হিনাবে দিতে আবেশ বিশেষ। অর্ধকল্প তা জানাইয়া বর্ণিৎ পক সহস্র দুহা বিদ্যা নিকৃতি লাভ করেন।

ইহার পর বর্ণিৎ যোবৎ পাঠানকোটে প্রেরণ করেন। যোবৎের সহিত তাঁহার সমস্ত সমস্ত, বিজ্ঞিৎ হইয়া পেল সভা, কিন্তু চরিত্র বোধ তাঁহার পুরীকৃত হইল না।

বংশের কলঙ্ক

(ঐতিহ্যকৃত্যর বহু বি, এ)

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ

শোকে সাধনা

কালীশঙ্করের বহুলবাপানের বাটী পত্তীর শোক-চিত্ত বাধন করিয়াছে। শোকে লগ্ন্যয়ের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ বন্ধ থাকে না। কাজ যখন প্রত্যাহ চলিয়া থাকে, তেমনই চলিতেছে, তবুও যেন সাধা বাড়ীটা ব্যাপিরা একটা চাপা কায়ার ভাব হুটুয়া উঠিতেছে। কৃত্য পরিজন কাজ করিতেছে নীরবে, আজ্ঞা লইতেছে নীরবে, আজ্ঞা পালন করিতেছে নীরবে। যে গিঃছে, সে যেন বাড়ীর সব হাসিটুকুই লইয়া গিয়াছে। হার! সে যে সকলের নয়নানন্দ।

বিতণের একটা ককে হৃৎকেননিত শয্যার উপর অনিলা যোগের হাতনার হটকট করিতেছে। হুইটা হাসপাতালের নার্স অব্যোজ্ঞা তাঁহার শো গুজ্জবা করিতেছে। যেদিন আশা হইতে হুঃসংবাদ আসিযাকে, তাঁহার পরদিনই অনিলা যোগ অবিকারে আক্রান্ত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণ বিদায় হইবার পর অনিলা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। তাঁহাবিশেষে আহার কহাইবার উত্তোপে যাত থাকিয়া তাঁহার মনটা কতকটা চিত্তাপ্ত

ছিল; কিন্তু নিমন্ত্রিতগণ বিদায় হইলে পর বাড়ীটা যখন পুত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তখন কোথা হইতে রাশি রাশি ভাবনা আসিয়া তাঁহার মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন এই পৃথিবীটার সব বিখ্যাসে যোগ দেহিতেছে, যোগ বসিতেছে,—কিছুই কোন অতিব নাহি; যেন জ্ঞান, আনন্দ, গণি বলিয়া কোনও কিছুই অতিব নাহি; যেন পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভিয়া গিয়াছে, যেন আলোর পরিবর্তে কেবল অন্ধকারে সাধা পৃথিবীটা চাকিয়া গিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে অনিলা যোগ ভাবনক পরম হইয়া উঠিল। কিছু তাঁহার গোবে এক ফোটা মল নাহি। এটা বড় ক্লমকণ। সত্যার লমবে অনিলা যোগ ভিত্তরে এত আলো করিতে লাগিল যে, সে আর লুই করিতে পারিল না, অনেককণ বরিয়া মনে করিল এবং মানিয়ে আত্মকেশে রহিল। শোকে হুইটা তাঁহার যোগের কারণ বলিয়া বরিয়া লইল; কিন্তু ভাত্তারেরা বাড় নাড়িলেন, তাঁহারা শিঙাত করিলেন যে, অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার ফলেই এই হারূপ হোগ হইয়াছে।

হামসব বাবু তাঁত হইয়া অনিলাকে বাড়ী লইয়া বাইতে চাহিলেন, কিন্তু কানীশ্বর বাবু সেই অবস্থায় অনিলাকে নাড়াচাড়া করিতে দিতে চাহিলেন না। অনিলাও কিছুতে এই সময়ে তাহার কোঠামণিকে ছাড়িয়া বাইতে চাহিল না।

আজ রোগের দাত দিন। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, অনিলায় বহুশ ৮ রোগ হৃদযন্ত্রিক, তাই সকলেই বিব্রতবহনে ঘরে বসিয়া আছেন। আজ দুই তিন দিন হইতে অনিলা শ্রোণ বন্ধিতেছে। অনিলায় রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে একদিন রাত কাটে কিনা কাটে এমন হইল। সকলে শ্রোণ হাতে লইয়া শেব হাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কাংপ ডাক্তারেরা বলিয়াছেন ঐ সময়টাই সাংঘাতিক। হামসবর মনের মধ্যে একটা উৎকট প্রতিক্রিয়া করিয়া বলিলেন, লক্ষ্যজনাথ আশ্বির হইয়া বাহা গাও পাগড়ায়ণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এমন কি বালক আশ্বির কুদারও বিনিম্র হইয়া রোগিনী ঘরে বসিয়া অস্ত্রার্থণ করিতে লাগিল। কেবল কানীশ্বর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনিলায় রোগজিষ্ট পাত্তর বহনের প্রতি বিব্রুজি হইয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে সেই সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল, লক্ষ্য অস্ত্রে ভগবানের নাম মপিতে লাগিলেন। রোগিনী অস্বজ আশ্বির হইয়া পড়িল, তাহার চোখ মুখ যেন হিমলীল হইয়া আসিতে লাগিল। ডাক্তারেরা বিব্র প্রয়োগ করিলেন, সকলেই শেষে দুহুর্জের লজ প্রকৃত হইয়া রহিলেন।

কিন্তু ভগবানের দ্বারা অনিলায় আশ্বর্য পরি-বর্তন ঘটিল, ডাক্তারেরা সেই ভক্ত লক্ষ্য দেখিয়া হর্ষোৎকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। স্নান পরেই তাহার একব্যাক্য বলিলেন যে আর ভয় নাই।

• • • • •

সবে মাত্র ভোর হইয়াছে, রোগিনী ঘর হইতে লম্বাই চলিয়া গিয়াছে, কেবল কানীশ্বর শয্যাপার্শ্বে

অনিলায় হাতখানি ধরিয়া বসিয়া আছেন, আর একজন নারী একখানি ইঞ্জি চেয়ারে এসাইয়া পড়িয়া ঈশ্ব উদ্ভাষিত হইয়া তিমাইতেছে। ১৩শ কানীশ্বর দেখিলেন, অনিলা চক্ষু-দগদগ করিয়া একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া আছে, আহত পক্ষীর মত তাহার ক্রুর হাতখানি তাঁহার হাতের মধ্যে ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছে, অনিলা স্থিরদৃষ্টি হইয়া যেন কোনও বিষয় মগন করিতেছে। কণপরে তাহার রানমুখে হাসি ফুটয়া উঠিল, সে অতি কৌণ-কণ্ঠে ডাকিল “বাবা!”

কানীশ্বর সন্মুখে তাহার বিপুল কেশরাশির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “কি মা?”

অনিলা আবার চক্ষু নিম্নমিষ্ট করিল। পরে ধীরে অতি কৌণবরে বলিল, “ভায়েবনার বয়স সত্ব হর বাবা?”

কানীশ্বর যে আবার অনিলাকে এমন করিয়া কথা করিতে দেখিবেন তাহার এ আশা ছিল না, তাই বিপুল আনন্দে তাঁহার হস্তাভিহা গিয়াছিল। অতি কণ্ঠে সেই আনন্দ বহনে রাখিয়া তিনি বলিলেন, “কেন, মা ও কথা জিজ্ঞাস্য করছ কেন?”

অনিলা আবার ধীরে ধীরে বলিল, “বয়স দেখ-ছিলা, যেন অগণিত জন্মদেবের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যুদ্ধ করতে করতে সে পড়ে পেল, তার উপর দিয়ে জন্মদেব নাচতে নাচতে চলে গেল; কিন্তু পরেই আর একটা ভীল জন্মদেব তাকে কাঁধে করে নিয়ে কারখানার একটা ঘরে লুকিয়ে রইল। এখন তারা সেই জন্মদেব বেধে রয়েছে, এখন উঠে উঠে বেরাতে পাচ্ছে। হ্যাঁ, বাবা, বরা মাল্লব কি আবার ঘিরে আসে?”

কানীশ্বরও চোখদুটো মলে তরিয়া আসিল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আশ্বাণ বিদ্য বলিলেন, “আসে বৈ কি মা, কখনও কখনও আসে। সে কেবল ভগবানের দ্বারা উপর নির্ভর করে।”

অনিলা আবার বলিল, “হাঁ বাবা কিংবদন্তি আসে
পুণ্যে কি মিথ্যে কথা লিখিছে? না হলে লতা-
খান কিংবদন্তি আসে কি করে?”

“কালীশঙ্কর উত্তেজিত হইতে বলিলেন, “সাহিত্যের
লতাবনের ঘোরে, পুণ্যের কোরে। সত্যের পুণ্য,
সত্যের সত্য-কথনে মরা মানুষও কিংবদন্তি আসে।
কিন্তু তাতেও ভগবানের কথা ছিল। সত্যের মহিমা
দেখাবার জন্যে ভগবান সাহিত্যের মনে ঐ ভেদ
বিবেচনালেন। অনিলা আর কিছু বলিল না।

আরও দুই চারিদিন পরে অনিলা পঞ্চাশ পাইল,
এক ছুই চারিদিন পঞ্চাশ পাইবার পরে অর্ধে দুই ও
সবল হইতে লাগিল। এখন সে রান্নাঘর বা কালী-
শঙ্কর বাবুর পোত ঘরীয়া বাক্তার আসিয়া ইনি
চোখের বসিতে পারে। একদিন তাহার বাবা-জামা
বসিয়া আছে, এমন সময়ে একখানা ভাড়াটে টেক্সি
আসিয়া দ্বারে লাগিল এবং উঠা হইতে কয়েকটা লোক
নাহিয়া উপরের বাড়াভার উপস্থিত হইল।
সকলজনই নিচে ছিল, সেই তাহারিগকে লইয়া
আসিল।

আগন্তুকরা উপস্থিত হইতেই সেখানে একটা
অব্যক্ত উত্তোষনার স্রোত বহিয়া গেল, কেন না
আগন্তুকরা আর কেহ নহে, যহা সার আর্থার
কেমেলি ও কোঠারে সম্পত্তি। পঞ্চাশ দিড়িতে
উঠিবার সময়ে কল্লার রোলে তুলিয়াছিল বলিয়া
সকলকে তাহাকে অজ্ঞান পাঠাইয়া দিয়াছিল।
প্রথম আগন্তুকে সমাধানে পর দুইশতকাল
ঘটনাবলে পক্ষীয় নীরবতা বিরাজ করিল।
তাঁহার পর সাধেব উঠিয়া হঠাৎ কালী-
শঙ্করের হাত বহিয়া আবেগভরে বলিলেন, “বাবা,
কি বলে তোমার বোস্তাব বা লাখনা দোখো, তা
নাথার আসছে না। তবে একটা কথা বলতে
ভয়না হচ্ছে। আমার পুত্রবাহুব, লগ্নারের খেলার
আধাঘের ভারিভিত হইয়া আছে। জ্ঞাতরা তোমার
মত জানী তাতে বিচলিত হইবে না। আর অল্প যে

ভাবে চলে গেছে তা আমি বিবেচনা করি না—এই
কোঠারের মুখে সব খোদ।

তখন বৃদ্ধ কোঠারে বসিতে লাগিলেন, “বাবু,
কি বলব, বলতে মুখে কথা লগ্নে না। একাধারে
এত জ্ঞান, এত গুণ আর কোথাও ত’ যেহিনি
নাহু। হাঃ! হাঃ! আমার আধাঘের জ্ঞানে
তাকে বিশদর্শন দিয়ে এলুম, এ হুঃব রাবো
কোথায়। বাবু, আমার একমাত্র কন্যা, আমার
বড় আবেগের, বড় ঘেঁহের বৈধিলী—তার গুণের
কথা এক মুখে বলতে পারি নি—বাবু, তাকে
হারিবে এত কথা লগ্নি নি। ধর্মের কথা বলব,
এই ক’মালে আমার ছেলে আধাঘের যে কি
রাবার বন্ধনে বেঁধেছিল, তা বলবার ভাষা পাই
না। বৈধিলীর মৃত্যুর আগে আমার জানতুম না
যে সে আধাঘের যনিব।” একবিনের জ্ঞান কখনও
সে তাহার বাবাঘারে জানতে পেরে নি। কি
হাসি হাসি মুখে, কি মধুর মৃদু কথা, কি মরল
আচরণ, কি কথা মাঝে, কি বেহা তাগালা, সব
কি বাবু, নিমের গুণ সে সকলকে বর্ণ করে
কেনেছিল।”

কোঠারে কীহিয়া উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে
অশ্রুমাণে করিলেন। সাধেব হঠাৎ বলিয়া
উঠিলেন, “কোঠারে, সব বললে, কিন্তু তোমার
মেয়ে যে অল্পের জ্ঞান প্রাণ বিবেছিল, তা ত’
বলে না।”

সকলে চমকিয়া উঠিলেন এবং কোঠারের
মুখপানে একদৃষ্টে উৎসুক নড়নে রহিলেন।
কোঠারে বলিতে লাগিলেন, “সে অনেক কথা।
আমার মেয়ে তার কর্তব্য কল্য করেছে। আমার
জানতুম, সে অল্পকে ভাঙের মত ভালবাসত,
কিন্তু তার ভালবাসা যে তা হতে আরও গভীর,
তা ত’ জানতুম না, তাই সে অল্পের বিপরীত
আপনি বৃদ্ধ পক্ষে সেই বিপরীত ভুলে নিয়েছিল।
সত্যের এ হতে স্রবের মৃত্যু কি হতে পারে? কিন্তু

জেনে যেতুম, অকণ্ঠে কি জন্তু, কার জন্তু প্রাণ বিপদ।
যাবের সে রক্ষা করবার জন্তে অদ্বৈত উদ্ধার লক্ষণী
আবর বহুবার লক্ষণী অটল পাখির মত
চাঁড়িয়েছিল, তারা তার কে ? সে ত' ইচ্ছা করলে
আমাদের সঙ্গে পানিরে আগতে পারত। আবার
যখন আমরা তার হাতে পায়ে ধরে আবারের সঙ্গে
আসবার জন্তে অত্যাশঙ্কিত হয়েছিলাম, তখন তার
মুখে যে হাসি ছুটে উঠেছিল, সে হাসি এ পৃথিবীর
না। আমরা তখনই কেনেছিলাম, সে মরণের জন্ত
এতদূর হয়েছে ? অদ্বৈতকে রক্ষা করবার জন্তে—
হৃদয়কে রক্ষা করবার জন্তে—সে আপনাকে আপনাকে
আহুতি দিতে কৃতসম্মত হয়েছে।”

হাস্যময় হাঁস-এতদূর নিয়ে অল্প বিসর্জন
করিতেছিলেন, আঃ থাকিতে পারিলেন না।
হাস্যময় হাঁস তবুই ইঁদুরা বাঁড়াইয়া কানোপকর
বানুর ছুটা মাত খঁসিয়া উঠে:বারে কাঁথিতে কাঁথিতে
বসিলেন, “কালি, তাই, আবার কমা কর। আমি
নরান্না, তা না হলে চোখ থাকতে অচল হবে কেন ?
তাই, তোমেরই কথা ঠিক। তুই যা বলেছিলি,
সেইকি বা বলেছে, আমার নিশা যা যে চোখে
তাকে ঘেঁষেছে, তাই ঠিক ; আমি ঘোর ভুলের
ফলে বংশের জলজ্ঞানকে বংশের কলত বলেছি,
আমিই তার অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছি। কালি,
আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?”

শ্রদ্ধাভিযোজিত শ্রদ্ধাভিযোজিত

অতীবনীয় প্রত্যাবর্তন

“বৃদ্ধ যেহেতু, ঠাঁও ত' এখনও ঘেঁষেন নি।
তোমাদের বসি শোন, তোমরা কান্দই আবার গিয়ে
চেনে দর, ঘেঁষি কেনন টাকা আবার না বধ।
বানু ত' আসাঘের একলে কুণো কাৎ হয়েছেন,
এখা আর ভাটা কি ? কান্দই ধার। বেঁচে
থাকলেই বড় ভাটা ছিল।” গিরিবারার ঘরে
বসিয়া রমেন এই কথা বলিল। বলিবার সময়,

আবার মুখে চোখে যে দাক্ষিণ্য হিংসা ও কুটিলতার
চিহ্ন প্রকটত হইয়া উঠিল, তাহা বাহ্যিকভাবে
ঐক্যতার পাখা আঁগিত হুঁচুচোরের হুঁচু কিনা
লক্ষ্যে।

গিরি বলিল, “আবার যেতে আগন্তি নেই, কিন্তু
তোমাদের ঐ যে আশি, ঐ ছুঁড়িতে যেখানে বড়
ভয় করে। ছুঁড়ি যেন অস্তরের ভিতরেও ভয় করে
দিলি দেখ। ইচ্ছা করে, নব বিয়ে ওর চোখ মটো
উপড়ে কেলে বিই—”

“আঃ কি বলছিলাম পান্থের মত ? ও সব ঘেঁষি
করত। এখন যেনে যে। কাল তোমরা যাবি।
শুনেনি, কাল নাহবে আর রামদত্তটাও থাকবে,
কাল ওদের একটা মজলি হবে, সেখানে আনিলাকে
পন্ডিত পাঠাবার কথা ঠিক হবে। কাল আমিও
থাকবো সেই সময়ে, কেন না আমাকেও থাকতে
বলেছে। তোমরা আবার খুব করে গানিগানি
করবি, মোহ মিথি। তা হলেই যেমিস টাকা আমায়
হবে, তাই কি এই একখানা বাঁড়িও গেরে যাবি।
আমালতের ভয় দেখাশোই কানু হবে। এতদিন
ওদের তরঙ্গা ছিল, অকণ্ঠে এলেই সব লক্ষ্যে নিটে
যাবে। এখন আমালতে বাঁড়ালে ওদের পকে প্রাণ
বিছুই নেই, আবারের মুঁড়ি মুঁড়ি প্রাণ আছে।
আমালতে বাঁড়ার জন্তে কলতের ভয়ে অকণ্ঠে বড়
মায়াব বাণ টাকা দিতে লখ পাবে না।”

গিরি যখন আনিবার স্থান পরিবর্তনের কথাবার্তা
চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় দুটো-তিনটি গিরিবারাকে
লইয়া তথায় হাজির হইল। তাহাণিকে দেখিয়াই
কালী শব্দের নোকাবড় স্বর অকণ্ঠের বাতনালিষ্ট
হইল। সরোম বিব্রত ও স্থানীয় দৃষ্টিপাত করিয়া
বসিয়া রহিল, সাধেব বিস্মিত নৈবে চাখিয়া
রহিলেন, রামদত্ত বানু বাড়ি হেঁট করিয়া রহিলেন,
আনিলা পুণ্ড্রীতে একবার চাখিয়া দৃষ্টি কিরাইয়া
আবার আকাশের পানে চাখিয়া রহিল।

রমেন মহাজ্ঞান হইবার তাণ করিয়া রহিল,

“আবার তোঁরা এখানে পূর্বাঙ্গ আবার ধাও।
করেছ? এমন বেহায়া ত’ কোথাও দেখিনি?
তোমাধের কি সময় অমন নেই, যান কাল নেই?

সুদৃঢ়তী বিনীতভাবে বলিল, “কি করণে
বাধা? কোণার বাব বাগ, এখানে না এসে,
না বেয়ে বাগ বাব কি বাগ? তুমিই ত’ আমাধের
বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছ বাবা?”

রমেশ অশ্রুত হৃদ হইবার তাগ করিয়া বলিল,
“আমি? তোমাধের গাধন ত কম নয়।”

হঠাৎ নিচে একটা ভয়ানক গোল উঠিল।
কৃত্য পরিজনের জুহু হর্ষধ্বনি এবং বড়োবড়ি ছুট-
ছুটি গড়িয়া গেল।

সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সন্দের বিষয়
অপনোদিত হইতে না হইতে, সেই বহুকে উচ্চা-
গ্রিত হর্ষধ্বনি আকাশে মিশাইতে না মিলাইতে,
আন্দর্ভা কাণে বটিল। এ কি! স্বাধাই কি মধ্য
মাধু্য কিরিয়া আসিল!

সর্বপ্রথমে অরুণকুমার ও তাহার প্রভুতক
হুহুয় এক লাফে দুই তিনটা সোপান অতিক্রম
করিতে করিতে এবং উদ্ভাসের পন্দাতে বিস্তার লোক
আনন্দ কোলাহল করিতে বহিতে উপরের বার-
তায় উপস্থিত হইল। তখন দেখানে যে খাপার
সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

অরুণ কোনও দিকে দৃষ্টি ত না করিয়া দরবার
একবারে কালীশঙ্করের নিকটে উপস্থিত হইয়া
জ্বলন্ত আত্ম পাতিত। বলিয়া তাঁহাকে বাস্তবপনে
আব্দ করিয়া তাঁহার ক্ষোভে মাথা রাখিয়া বাস্ত-
বত্বকে ডাকিল, “বাগ, বাবা!”

কালীশঙ্কর অকণ-র মাথাটা বুকের মধ্যে ঢাপিয়া
বহিয়া অকণকাল নীরবে রহিলেন, যোগ হয় তাঁহার
অন্তরের অন্তরত হইতে সেই সর্বসিদ্ধিহাতা দ্বালা
ভগবানের উদ্দেশ্যে নীরব ভক্তবাব উপস্থিত হইতে-
ছিল। অকণেরই তিনিও “বাগ, বাবা!” বলিয়া
বালকের মত ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া উঠিলেন।

কিন্তু সে দুর্ভাগ্যবান নয়। অকণ নিজেই
লজিত হইয়া চোখের রস দুইদাড়াইয়া উঠিয়া
বুকে ঢালি আনিয়া বলিতে লাগিল, “বাগ, কি
মনে করেছিলেম আপনায়? আমি বুঝে দেখি?
হা! আবার মত একটা অকর্ণনা নাকি শিবির
নয়?”

এটবে সত্যক, বাঃ বেশ লোক ত’, তোর
স্বপ্নের খবর তুই নিজে বিনি নি, বলা দিলে, বাঃ বলা
তুই যে ভবানে দাঁড়িয়ে রইলি? এই যে সার আর্ধ্য,
নন্দ্যার, ভাল আছে। এই যে কোঠারে বাবু,
বাঃ আনিত এখানে এগেছেন? শুনে এগেছিলুম
বটে, গায়েবের সঙ্গে আপনায় কলঙ্কতা বলা
করেছেন। বড়োবড়ি রবেছেন দেখছি, বাঃ তা
হলে সকলের সঙ্গেই দেখা বস এক বাতায়।”
বলিতে বলিতে হঠাৎ বাস্তবায় গেল পরে সাধারণ
বলিল, “কেবল আমি আর—বাঃ নিগার সঙ্গে
দেখা হ’তে থাকি। তাহা বোঝে হয় মাঝেকে
যেখানে বানোব পেয়েছে ব’লে মনে করণে, হাঃ-
বাঃ বাবা!”

অকণ এত তাড়াতাড়ি কথা বলিয়া বাইরেছিল
যে কাণের কথা বিবাহ অবশ্য হইল না। ‘অখন
ও অনিলার নাম করণ তখন লক্ষণে ঘোলা এক
কোণে বলিয়া বলিয়া হিল সেইখানে দৃষ্টি পাত করিল
কিন্তু কেহ দেখানে—অনিলাকে ঘেঁষতে গাইল না।
অনিলা দুর্ভাগ্যের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছিল।

অকণ আবার সন্দের বুকের নিকটে তাড়াইয়া
বাগতে লাগিল, “কি ক’রে বাতলুম? ওঃ পে ভাতি
কপাল ধোরে। শরীরের জ্বালা জ্বালায় খাবাত
পেয়েছিল, সে সব আংলা দিয়ে রক্ত বোকাইল ব’লে
শরীরটা।” বিদ্য বিদ্য করতে লাগল, টলে পড়ে
দেখুন। তারপর কি হয়েছিলো আনি নি। একটু
একটু অস্পষ্ট হাওয়ার মত মনে পড়ে, পালক মাঝের
বাগনায় তাগে তাগে নাড়তে নাড়তে আদ্যের
মাড়িয়ে চলে গেল। তারপর মনে ভেতনা হ’ল,

বখন বৈশম্য, আমি একটা ভাটের ঘরে বসেছি, আর বাঘের মত আতঙ্ক ভোগে ক'রে নিজে শোকাচ্ছে এই জঙ্গলী আবার লুণা পাণি।”

সকলে সবিস্ময়ে অঙ্গুর নির্ধিষ্ট হিতে সূচিপাত করিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে ঝাঁড়াইয়া এক সম্পূর্ণ অশ্রুচিত স্তম্ভি, তাহাকে দেখিতে অনেকটা মণি-পুটী অথবা তুখা কুণ্ডাইই মত। অঙ্গুর লুণা পাণির বেশ ভূষা পরিবর্তিত করিয়া তাহাকে কলি-ভাঙার আনিয়াছিল, সুতরাং এখন আর তাহা কলি-ভাঙার আনিয়াছিল, সুতরাং এখন আর তাহা কলি-ভাঙার আনিয়াছিল, সুতরাং এখন আর তাহা কলি-ভাঙার আনিয়াছিল।

কেমনেই সাধের এইবার কথা করিলেন। এই লামাও বিবরণের মধ্যে অঙ্গুর—আপনার অঙ্গুর মৌখিকীকৃত কথা কেমন গোপন রাখিয়াছে, তাহা লামাওয়ের মুক্তিতে থাকি রহিল না। তিনি অঙ্গুরের পিঠি চাপড়াইয়া বলিলেন, “বুদ্ধে, আমি। সব বুঝছি। আপা কহি, তোমার মত ফেলে রেখে দেব। বাগানীর করে করে চোক।”

তারপর লুণা পাণি মানাইল বিনামূল্যে অঙ্গুরের কোঠি ও পাতল চূরি করিয়াছিল। সে বখন বুঝে নিতে হইল। পড়িয়াছিল, এখন আতঙ্কিত তাহাকে অঙ্গুর মনে করিয়া তাহার মস্তক কাটিয়া লইয়া নিয়াছিল। তারপর সে কি করিয়া অঙ্গুরের আগে বীচাইল—সে কথা বখন সে অঙ্গুরের কাছে বসিতে লাগিল, তখন সকলেরই দৃষ্টি একটা উষ্ম ও অনিশ্চয় হইয়া গেল।

এই অলভ্য জঙ্গলী পাহাড়ী নারায়ণের কেন্দ্র স্পর্শের সম্পূর্ণ শুধে এই আতঙ্কিত পরিবর্তন। রায়বর বাহু ঠাঁই উঠিয়া অঙ্গুরের হাত ধরিয়া পাল্লেন যেন সঙ্গর করে বলিলেন, “বাগা অঙ্গুর, আবার তোমার আবার কেটে গেছে, আমি না বুঝে তোমার বসে কলম বসেছিলাম, আবার কথা কর। এখন বুঝি চুনি শুধু আবার আনিয়া উপস্থিত হও, তুনি—”

অঙ্গুর লজ্জিত হইয়া বলিল, “এ কি বলেন

বড়কালা। আমি আপা-বাগা সন্তান, বাগার কাছে কথা রেখে আবারে নঃক কেনে। না—”

ঠাঁই অঙ্গুরের দৃষ্টি মুক্তি-অন্য পরিণামের উপর নিশ্চিত হইল, উহারা একজন লামার অঙ্গুরের কোঠি দেখিয়া বলিয়াছিল, অঙ্গুর দেখিয়া উঠিল। মুক্তি-অন্য অঙ্গুরকে দেখিয়াই দ্বিগির হাত ধরিয়া পলাইবার লব্ধি হইতেছিল, কিন্তু তাৎক্ষণিক লামার তাহা-নিগদে ভগ্না দিয়া বসিতে দ্বিগির ক'রাইল বলিয়া তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল।

অঙ্গুর তাহা-নিগদে দেখিয়া অত্যন্ত খান্ডিত হইয়া বলিল, “এরা কাহা, এরা এখানে কি করতে এসেছে?”

সকলে নীরব, হান্নান একটা বাক্য সন্তোর নীরবভাবে বাগন করিল। অঙ্গুর পুনর্বার তাহা-নিগদে ভাগ করিয়া নিরীক্স করিয়া লিল, “এত, দেখছি পাহাড়ের মুক্তি-অন্য, আর এই তাহা-নিগদে দেখে দেখে হচ্ছে, এত পাহাড়ী গোপা নিয়ে ছিলুম। আমি দেখাশুণি টাকা পাঠাতে পারি নি বলে বুঝে তোমরা বাগার কাছে বসবার করতে এসেছে? তাহা-নিগদী কি এখনও পারে নি? তা, কেন করছে, বাগার কাছে এসেছে। বসুন বাবা, ওদের একটা বন্দোবস্ত করে দিন, ওরা বড় দুঃখী, আতঙ্কিত পাহাড়ী গোপা পড়েই ওদের এত কষ্ট।”

তবেল সন্ধ্যার পল্লি, সে তাহিল বুঝে তাহা-নিগদে লামার লামান মানলি। কানিয়া বাব। তাই সে তাহা-নিগদী ফুট হইবার ভাগ করিয়া বলিল, “ভুবিও দেখন, ওদের কথা না কি মোনাবার মত, না এখন মোনাবার মত। স্পষ্ট দেখ না, যেন কিনা আবারে তাহা-নিগদে বসে তাহা-নিগদে বসে তাহা-নিগদে বসে নাগিল করছে। কিসের নাগিল, কিসের বোঝা-পোষ?

যেই বসাইয়া দিয়া মাত্র মুক্তি-অন্য হাত ছোঁচ করিয়া বলিল, “বাগা, তোমরাই বিচাষ কর, ও কথা শুনা না। তোমরাই ভগ্না নিয়েছিলে

খোকার বাপ কিয়ে এলে বিচার হবে। তা খোকার বাপ ত' এসেছে, এখন বিচার করা তোমরা বিচার করলে আমাদের আদালত যে ত হবে কেন ?

অল্প তাহার কথাই একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া অশ্রুতকাল কেলকল মেতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "বিচার ? খোকার বাপ ? এ সব কি, আমি ত কিছুই বুঝেছি না।"

মুন্ডি-অলী হাত নাড়িয়া অস্ত্রমের ঢকে বলিল, "সে কি বাবা, এখন ওদগ কথা বললে হবে কেন ? খোকার বাপ হতে, এই খোকার মার মুখ না চাইলেও চাইতে পাঠ, কিন্তু খোকার মুখও চাইতে হয়। বল না গো খোকার মা, আমি ত বাবুর উপোষে তোমার ঘরে টাই নিয়েছিলাম মায়।"

অল্প অধিকতর আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "আমার অজ্ঞানতবে একটা আদত প্রাণোক্তকে তুমি ঘরে ভাগ্যে নিয়েছিলে একথা ঠিক, সেই প্রাণোক্তটা এই কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না—কিন্তু থাকে কি অবস্থার তোমাদের ঘরে এনেছিলুম, তাও ত' তোমরা জান।" না হয় বাগালীকে তাক না, সে সঃ বলবে এখন।"

মুন্ডি-অলী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া অল্পের কথাটা মুক্কা লইয়া বলিল, "ওমা, তা জানিনি ? আমি ত' তখনই বলেছিলাম যে ত পোহাতি। আর বাব্বা ভূমিহীত সব বরও পত্তোরে তার নিরে তকে আমায় ঘরে বালাগ হবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলে। তা সবই ঠিক চলছিল, তবে মাঝে হতে এই তোমার বন্ধু এই মেছের রমেশবাবু খোঃ পোঃ বন্ধ করে পোঃখোঃ ঘটালে।"

অল্প বলিল, "আমি ত এর কিছুই অবগত করি না। সেই ভাতারই ত বলে দিয়েছিল এই প্রাণোক্তটার সব অবস্থার কথা, আর আমিই বটে বিধে এর চিহ্নবঙ্গাপত্র করিয়েছিলাম। কিন্তু কি অবস্থার শব্দে আমায় এই সব তার নিতে হয়েছিল,

তাও ত' তোমরা জান। সেদিন তোমার চুৰোপ, আঁখার হাত, বিষ্ট লুচিল। আমি ভিলবার তরে চোখ অধি বধাতিটা টেনে তুলে বিধে খুব মোরে পাড়ী হাঁকিয়ে আসছিলাম, বঠাব একটা প্রাণোক্ত ঠিক তোমার ঘোড়ানের কাছে রাখা হতে ওখানে হাতা পার হ'তে শেল, আমি সাবলাতে গিয়েও খোড়া সামন্তে পারলুম না, তাকে চাপা দিলাম। তাই ত' তার তার নিয়েছিলাম। তার আগে তাকে, কখনও দেখিনি।"

মুন্ডি-অলী লকলের অলঙ্কো এই লমবে দিরিক একটা উপুনি দিল। দিরিবালাত অমনই ঘোঁষটা ফেলি। লকলের স্মৃতিবে অম্লসর হইয়া অল্পকে লম্বোদন করিয়া বলিল, "বটে, তবু আগে আমায় কাছে না চিঠে না, দেখ নি ? কলির ঘনই এই। কি লম্বতানি গো মা, কি লম্বতানি! নিজের লম্বের লজ আমায় লক্ষ্যমান করে এখন লেকা লেগে বলছ কিছুই জান না। না হয় তোমার হেলেনে না নেগে, না হয় আমরা তিকে করে খাবো কিছু মিণো কথা ব'লে সত্যি ঢাকবার চেষ্টা করছ কেন ?"

অল্প একবারে স্তম্ভিত। বলিল, "তোমরা বলচ, আমি তোমার স্কুলের বাব করে এনেছি, তোমার যে সন্তান হয়েছে তার কারণও আমি, তেমন তোমাদের এই কথা না ?

দিঃগাণা কথাই বিধার পুহেই মুন্ডি-অলী বলিল, "তা ত' তুমি নিজেই জান।"

অল্প বলিল, "স্বাঃগে আমি মিথ্য বলছি। একবার সোমাংসা এখন হঠে লরে না। টে ফেই বাবাণী কৈ ? কৈ সেই ভাতার টে ? তা ছাড়া অশাংস বাবার আগে রমেশকে সব খুলে বলে গেছি। রমা, তুই ত' না। জানিস, ১৭ বল ত' তাই, তাহলে লকলের স্মৃতি হবে।"

রমেশ ঠোঁট ভিরাইয়া লইয়া বলিল, "আরে থাক পে, বেতে খেনা। সারি বন্ধ বাপারটা কি

না, ঐ নিয়ে আবার সাক্ষীদান, বিচার আচার !
তুই রেবেবে ?”

অকল অবাক হইয়া তাহার মুখপানে তাকাইয়া
হইল। সরোজ সাক্ষীদান উদ্ভিগ্না অকলের এক-
খানা হাত ধরিয়া বলিল, “কি বলছিল রমা ! এটা
কি ছেলেকেবার কথা হচ্ছে ?”

রমেশ সজ্জীর হইয়া বলিল, “তা যদি বল, তা
হলে মীমাংসা ত এর হয়েই গেছে। সেই বাবাণী
বলে কোকটা ত একদিন বস্ত্রাঘের সামনে সেই
ভাকারকে আর সেনের করুন বাড়কে এনে সাক্ষী
দিয়ে গেছে ; তুমি কি তা জান না ?”

অকল এই সময়ে সত্যাককে বাধা দিয়া বলিল,
“সাক্ষী দিয়ে গেছে আবার বিপক্ষে ? কি বলছে
তার ?”

রমেশ বলিল, “বৈধ, ওদন কথা আর না
তোলাই ভাল। বরং তার চেয়ে এদের সম্বন্ধে
একটা বন্দোবস্ত করে বিচার করে দিলেই ভাল
হয়।”

অকল উত্তেজিতভাবে বলিল, “বল, কি বলছে
তার ?”

অকলের মুখের ভাব দেখিয়া রমেশ ভীত হইল,
আমর—অঃমতা—করিয়া বলিল, “আমি কি বল ?
কভারাত ত জানেন, তাঁমাই দিচ্ছিল। কখন না।”

অকল কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া—
আবার দৃকপাতের বলিল, “বল।”

রমেশ তখন খেন নিতান্ত অনিচ্ছা সবে বলিতে
লাগিল, “বাবাণী বসেছে, তুমিই নাকি ঐ মেয়েটিকে
ঘরের বার করে এনে কালোঘাটে রেখেছিলে, সে
যে ভাকারকে এনেছিল সেই ভাকারও বলে দেছে,
তুমি তাকে কালোঘাটে থাকতে ঐ মেয়েটির মত
কল দিয়েছিলে, তার পর ঐ স্রোণোণী অকলসবা
হলে, তাকে কাছে রেখে বেগা শুনা করবার ভরে
বাবাণীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মুক্তি-ওলীর বাড়ী
রেখেছিলে। আমার সেনের বাড়ী তোমার ভাত-

বিহেতে মুক্তিওলীর বাড়ী বাগবা-আপা করতে
থেবেছে।” আমি তাই কখন বিধেণ ক’নি বলে
আমার হেসে উড়িয়ে দিবেছে, আমার পেয়ে চাক্ষু
দেখিয়ে দিবেছে—”

মুক্তি-ওলী—তাহার মুখের কথা তাকিয়া লইয়া
বলিল, “কেন, কেনা জানে ? পাড়ার দাকে মিলেণ
করবে সেই বলবে, এ ত আমার ছাণা বই বাপু !”

অকল মুক্তি-ওলীর কথার কথার না দিয়া
রমেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “বটে, এতমুখ
হয়েছে ? তা এখন তোমার চাক্ষু দেখিয়ে দিলে,
তখন তুমি আমাকে সে কথা—বল নি কেন ?

রমেশ বলিল, “বাঃ আমি বলতে পার কেন ?
তুমি আমার স্রোণোণী বেগা শুনা ক’ন্তে বললে,
খেরপোয়ে আর সেগা গুজ্জরার টাকা বিধে পেপে,
আমার কি বৃত্তে বাকি থাকে কিছু ? আমি
জাবসুখ, তোমার একটা বেগাল চেপেচে, আমি
পোলযোগ করে—”

সরোজ সত্যাকের বলিল, “তা তুমি অকলের এই
রকম বেগাল বরাবর দেখে আগদ বলে মোটে
আমরাই হও নি ? বিবাবাবী—”

অকল বাধা দিয়া বলিল, “বাঃ তুই খান সরোজ !
তাহলে রমেশ তোমার বিবাল এই স্রোণোণের বা
বলছে, তা সব সত্য ?—”

দ্বিবিবাণী এতকণ নীরবে তর্ক জ্বলিতেছিল,
অকলের এই কথা শুনিয়া সে একবারে চারবাধিনীর
মত খুব কাণটা দিয়া বলিল, “না তা সত্য হবে কেন,
আমরা সব খানিয়ে বমছি।”

অকল তত্বিত হইয়া। এ পূর্ববর্তীতে এত
কণটা এত প্রেক্ষা থাকতে পারে ! এঁকি,
হবে কেন : এখন তাই কখন বাধ ? গতিই কি
সে অকল হুয়া, না আর কেউ ?

অকল বিজ্ঞানের মত বলিল, আপনারা সব শুন-
লেন, আমার নামে কি তদানিক অভিযোগ উপস্থিত
হবেছে। এর চেয়ে মানুষের আর কি অপবাদ হতে

পারে? অবস্তা অশ্রুধার বসবার আবার অনিবার্য
নেই, কেন না এতগুলি লোক—বিশেষতঃ আবার
বন্ধু ভ্রমণ—আবার বিপক্ষে প্রমাণ প্রদান দিয়ে
সাক্ষী দিলে, স্তম্ভিত ওটাকে অভিযোগই বলতে
হবে। সেই অভিযোগের বিপক্ষে আমার সাক্ষী
কেবল আমার মুখের কথা। সে কথার আপনাদের
বিশ্বাস না হবারই কথা, কিন্তু তবুও আমি বলছি,
আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, আমি শুধু একটা বৈষ্ণব
হবার জন্যে এই প্রলোভনটিকে গাড়ী চাপা দেবার
কথা সে সময়ে ভাবতে বসিনি। বাকি, সে কথা
বলে এখন কে বিশ্বাস করবে? যে কথার অস্তি-
যোগ আবার নামে উপস্থিত হয়েছে, তা হতে বত-
কণ আমি মুক্ত হতে না পারছি, ততক্ষণ আমি আপ-
নাদের সম্মুখে বা সম্মুখে উপস্থিত থাকবার অঙ্গুল-
মুক্ত। তাই আমি এখনই আপনাদের কাছে বিদায়
নিবে বাচ্ছি।”

কালীশঙ্কর তাহার কথা শেষ না হইতেই দুই
হাতে অকণ্ঠে জড়াইয়া বসিয়া বাস্পগদগদকণ্ঠে
বলিলেন, “কোথা, যাবে বাবা? যে বা বলে বন্ধুক,
আমার চোখে তুমি নির্দোষ।”

সত্যোত্তর বলিলেন একখানা ভাঙা খরসা বলিল,
“কে কোথায় কোথায়? অগতঃ সকলে ভোকে
যোনি বললেও আমি বলিবে না।”

এই সময়ে কঠোর কেনেডি সাহেব উঠিয়া অকণ্ঠে
বীণে হাত রাখিয়া বলিলেন “অকণ্ঠ যে নির্দোষ
ভাঙে কারও লক্ষ্যে নাই। তবে এর বিপক্ষে
একটা খোঁজ বন্ধুত্ব করেছে। বতকণ না সেই বন্ধু-
ত্ব ভেদ করে অকণ্ঠে নির্দোষ প্রমাণ করতে
পারবে, ততক্ষণ এর মনে পড়ি আপনাকে না, এখানে
একদণ্ডও থাকতে পারবে না। ও ঠিকই বলেছে,
এখন থেকে অস্ত্র দিয়ে থাকাই এর কর্তব্য। তা,
এখন ও আমার সঙ্গেই অস্ত্র, ওর আমি কোঠা-
য়ের বাগান দিয়ে থাক। চল, কোঠার। কালী
হুঃখ কোথায় না, তোমার হেলে অশ্রুধারমুক্ত হ’লে
নীলই তোমার কাছে কিংবদন্তি আসবে।”

সাহেব এই কথা বলিয়া অকণ্ঠ ও কোঠায়েকে
সইয়া চলিয়া গেলেন, সত্যোত্তর ও লুইয়া পাশি তাঁহা-
দের পশ্চাদ্ভ্রমণ করিল।

(ক্রমশঃ)

মিত্যশূর

(ঐ প্রবোধ নাট্যে বন্দোপাখ্যান এম এ. বি এল.)

যে উদার স্তরে বাঁধা বিধ-বীণা বানি
ছোট বড় সব পানই পায় সেখা স্থান
ককের কল্মশ মনে নিখিলেই প্রাণী
মিত্যশূরে স্তর বিধা পায় নানা পান,
অতি তুচ্ছ স্বার্থ লাগি’ বন্দ-কোলাহলে
অন্ধ ব্যক্তি’ মেরা হবে তুমি সেই স্তর,
তখনো তুমি যে নাথ, বসিয়া বিরলে,

অস্তরের অস্তঃসূর কর তুরসুর।
তোমার সে চিরন্তন মিত্য-মতা হুৎ,
যেই আর নাহি দেখি, মানি নাহি মানি,
স্বপ্ন হইতে তুমি কত নহ হুৎ,
তোমাকে আশ্রয় পায় তোবে মর্জ মানি,
অস্তরের নীড়ে ইহা বৃষ্টি স্পষ্ট করি’
নগরের ভিত্তি হাথ, ব্যক্তি তা পাশরি’।

ভাগের পুকা

(ভাষ্কার—সিনেপচক্স সেনসুয় এন-৭, ডি-এল)

(পূর্ব পূজারীসহ :—স্বামী শৈলদাসা যোগদাস। (২) ব্রহ্ম বিজয়র মধুসদার, (৩) স্বামী সন্ন্যাসীনাথ স্বর (৪) ব্রহ্ম বিদগতি সৌম্যী এন-৪, (৫) স্বামী চক্ৰবর্তী বহু, (৬) ব্রহ্ম অমরসুধার সেন, (৭) স্বামী লীলা দেবী, (৮) স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, (৯) স্বামী অতাবতী দেবী, (১০) ব্রহ্ম শৈলদাস যোগদাস (১১) স্বামী বিদ্যাসা দেবী, (১২) স্বামী অমর সেন যোগদাস, (১৩) স্বামী বৈদ্যনাথ সৌম্যদাসী, (১৪) ব্রহ্ম স্বামী অমর সেন বি. এ, (১৫) অতাবতী দেবী সরস্বতী।

গলো বো, দটীও সকে এগাধের বিয়ের কথা স্বপ্নে ঘোরের কাছে পড়িল, তখন এগাধ কাছেরেই ছিল। সে আড়ালে হাতুড়িয়া শুনি।

মনটা তার তারি বিয়ত চাইল উঠিল। কেন তা' সে বুঝিতে পারিল না। সে হাঁ করিয়া ঘরের মধুঘে আসিয়া বলিল, “হা, আবার বিয়ের কথাটা যোগদাস ক'রে” আলোচনা করো না; আমি বিয়ে ক'রবো না।”

সেই দিনই সে ঠাণ্ডা তরুতর্য্য বাঁধিয়া কলি-কাতা রঙনা হইল—সে বলিল, ভারী অকস্মী বরকারে সে হাইতেছে। কিন্তু আসল কথা পরল। বউর কাছে থেকে গলাইবার তাক্সা ছিল।

শ্রেনে আসিয়া সে মধ্য খিট্টাটে পড়িল। একটি অল্প বয়সের বউ হাকড়া শ্রেনে হইতে বস্তুরের সঙ্গে এগাধাঘাঘ খাড়া করিয়াছিলেন। ওর সঙ্গে একটি বি। পূর্বের শ্রেনে অল্প লোক কোনও কারণে শ্রেন হইতে নামিয়া যান, কিন্তু আর উঠিতে পারেন নাই। বৈশে ঐকটখার ভক্ত হুটতে হুটতে হোচট বাঁধা পড়িয়া খুব শুকণ্ডর রক্ত অহত হইয়া পড়েন। তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া শ্রেনে বাটার বউর কাছে নামাইয়া Waiting Room এ রাখিয়াছেন। মধু করে কাঁধিয়া ভালিহেতে, বি তখনক টোচামেচি করিতেছে।

এগাধ বির কাছে লিখাশা করিয়া বাণার

জানিল। এই ভাণ্ডের নারীকে এই অবস্থায় কেনিরা হাইতে তার মন সরিল না। সে হাইতে আসার জোগাড়ের উপর নানারকম অ্যাচারের হয় তাহার মন ছিল। তাই এই নারীহুইটে তাহারের অভিত্রাৎকের লিখাশা না যাওয়া পর্যন্ত এগাধ তাহাঙ্গিকে ছাড়িয়া যাওয়া লকত মনে করিল না। সে তাহারের কাছে গেল না, কেবল তফাৎ হইতে তাহারের পাখার খিটে লানিল। কলিকাতার বৈশ এগাধকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। অথ বউ পর Up ট্রেনে তফাৎ লোকটি আসিয়া লৌছিয়েন। তাঁর হাত পা ও মাথা ব্যাঙেজ করা, হুইটে তফাৎক বহাংরি করিয়া ঠাণ্ডাকে বাধাইল। যেখা জোগাড়কট তরে আর্জনাং করিয়া উঠিল।

তফাৎকটির নাম উমানাথ। এগাধাঘাঘে তাঁহার কিছু বিবর পাচে, তাই বেধা শুনা করেন, আর এক মাগুঁহু ব্যবসার চেষ্টা করেন। বউর তাঁর পুত্র-পুত্র সন্ত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। উমানাথ বাবু পুত্রবধূকে লইতে আসিয়া এখনি বিদায় হইয়া গড়িয়াছেন।

এগাধের কীবে তার করিয়া উমানাথ বাবু ভয়েটর কমে আসিয়া বসিয়াই বলিলেন, “তাই তো, এখন উপায়?”

তাই তো উপায়? এখন তাঁকেই যা হুয়ে কে আর হইকেই বা বেধে কে?

অনেক পবেষণার পর কোনও উপায়ই দিও
হইল না। একমাত্র উপায় এলাচাবাদে উমানাথ
বাবুর ছেলেকে, না হ'ল মনেনসিংহে বাণেশ কাছে
টলিগ্রাম করা। উৎসেই চাই মিনের কেত।
এ দুই দিন উমানাথ বাবু থাকেন কোম্পা আর
কেই বা তাঁদের দেখে শোনে। প্রসাদ তাঁহাবিগ্ধে
নিজের বাড়িতে লইতে চাহিল। উমানাথ তাৎপরে
বড় প্রসন্ন হইলেন না। তিনি বলিলেন, "হরি
হরা করে প্রাণের কোনও ভ্রমসোক আশ্রয়ের নিম্নে
এলাচাবাদ পৌঁছে যেন তবে আমি তাঁর কেনা
হ'বে থাকি।"

প্রাণ অকৃত্রিম করিয়া দাঁতে মুখ কাটতে
লাগিল, তার যে কনিকাতা বাইরের বড় ভাড়া।
কনিকাতার কাণের ভিত্তির ভিত্তি ভূবিধ্য সে সব
জুড়িতে চায়।

উমানাথ আবার বলিলেন, "ব'লতে সাধন হয়
না, কিন্তু আপনি নাকি বড় হরা ক'রেছেন তাই
বলি, যদি আপনার বিশেষ অন্তরবিধা না হয় তবে
আপনি যদি আশ্রয়ের পৌঁছে যেন।"

খোমটার ভিতর হইতে বহু যে কাতর নয়ন
নিখাসের সহিত প্রাণের দুঃখ উপর নিবদ্ধ করিল
তাঁহা প্রসাদের চক্রে পড়িল। সে আরও বিরক্ত
হইয়া উঠিল—তার যে বড় ভাড়া।

হঠাৎ তার মনে পড়িল অমলের কথা—সে যে
জানিলেই বাইতে প্রসন্ন হইবে সে বিষয়ে লক্ষ্য
নাই। প্রসাদ বলিল, "জাহ্নু, আমি আপনাদের
লোক এনে বিজি।" বলিয়া অমলের সভানে
ছুটিল।

অর্ধপথে তার আপনাদের উপর রাগ হইল।
অমলের দিকে আর প্রাণ ছাড়িয়া ছাড়িয়া যে চানক
অন্তরবিধা হইবে তাহা সে জানিত। কাল হাটবার,
রাখ্যের লোক তার কাছে আসিলে তুলসী নিতে ও
ও হুতা বেড়িতে। এ কাল অমল কিংবা প্রসাদ
দুজনের একজন না থাকিলে হইবে না। কালেই

অমল যদি তার তবে প্রাণের পাবে পারিত হইবে।
তা' ছাড়া প্রাণের বা বাইরে না কেন? পরের
হিত করিবার এমন অমল, এতবড় একটা আঁই
কর্তব্যের সামনে সে লুপ্ত হইবে কেন?

বিরক্ত হইয়া প্রাণের কিংবা বলি, "চন্দ্র,
আমিই আপনাদের নিম্নে থাকি।"

উমানাথ তাৎপরে আশ্রয় করিলেন।
খোমটার ভিতর হইতে আর একটা কৃত্রিম হুঁই
আগিল। হুঁই হুঁই পর প্রসাদ উমানাথ বাবুর
সইয়া এলাচাবাদ চলিল।

পবে তাঁহাদের পরিচয় হইল। উমানাথ বাবু
অনেকক্ষণ ধরিয়ো প্রসাদের যে অনেক বিষয়
সইয়া আলোচন করিলেন। প্রাণের বেশির লোকের
অন্তর উন্মত্ত, পৃথিবীর বড় তিনি রাখেন আর
লোকহিতে তাঁর হিত আছে। উমানাথ বাবুর
উপর তার প্রভা হইল।

উমানাথ বলিলেন, "বাবাবীর কি বিবাহ
হ'য়েছে?"

প্রসাদ বলিল "না।" বলিতে কিছু তাঁর দুঃখ-
খানা একটু লাল হইয়া উঠিল।

উ। বিবাহ ক'বার ইচ্ছা নাই?

প্রসাদ বলিল, "না।" বলিতেই তার মনের
ভিতর তৎ করিয়া উঠিল। সে কেন যে এই
চৌড়ের কাছে কই করিয়া বিধা। কহা বলিয়া
কোঁলি তাবিয়া পাইল না। নিজের উপর রাগ
হইল, সে অকৃত্রিম করিল।

উমানাথ তখন তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করি-
লেন যে বিবাহ কহা উচিত। বিবাহ না করিলে
মনের একটা স্থিতিই হয় না। তাঁর অজ্ঞতার
যে কখনো লোক বেনী নিম্ন বিবাহ না করিয়াছিল
তাঁহা লবাই হয় পাগল হইয়াছে, না হয় আর বধনে
ধরিয়াছে না হয় এমন একটা কিছু হইয়াছে।

এ সব কথাই অল্প সময় হইলে প্রসাদ অনেক
আপত্তি করিতে পারিত কিন্তু এখন তার চিত্ত এ

কবীর সম্পূর্ণ সাধ ছিল বলিয়া সে আপত্তি করিল না। সে বলিল, “আমি কখনও বিয়ে করবো না এমন তো বলি নি। অপোতঃ ক’রবার ইচ্ছা নেই।”

“ওঃ বুকেছি, বাবাজী বুঝি অর্ধেক রাজক ও বিদ্যাবৎসী রাজকুমার মত অপেক্ষা করছেন; তা’ কিছু মনে করেন না বাবা, অমরা বুঝা হ’য়েছি, অনেক যৌবনও নষ্ট, ও সব আইডিয়া কোনও কাজেই নয়। প্রথমতঃ পৃথিবীর কোনও দেশেই কোনও বানী এ পর্য্যন্ত জন্মে—বিয়ের বন্ধন ছই পরে ঘোলা আনা সুখী হয় নি। কেউ হু আনা, কেউ মল আনা কেউ বড় ছোর বারো আনা—আর average ক’রে নেও, সব বেশেই লাভ আট আনার হাড়াবে। বিয়ে, বাবাজী, কপালটোক ব্যাপার। একটু বেবে শুনে লামলে উপস্থিত যেটা থাকে তু’ হেরে লেগে যাও—শেষ পর্য্যন্ত হু আনাই হ’ক মল আনাই হ’ক, তোমার ব্যাভ মত সুখ লেগে যাবে। এই ধর না আমার বিয়ে বাবা টেনিডাকটিক ক’রলেন। না তিনি, না আমি না না বেয়ে লেবলেন। তাঁকে বর বিলে এক বন্ধ। অমনি তারে তারে যি টিক হ’বে লেল। তা’ বাবাজী, আমি ভাঁক করে ব’লতে পারি। আমি অন্ততঃ বারো আনার লেলে হাড়িয়েছি। আর আমারে ব্যারিটার নবীন সুখুন্ডো, লাভ রান্দি বুয়ে কোর্টশিপ করে’ বিয়ে করে, ঘোলা বহরের বেরে—পাঁচ বছর না বেতে বেতে সেবের রূপ হ’ল ফোঁড়ী মত আর শুপের কোরে সুখুন্ডো তাহা ড্রাকটিল হেড়ে আন লেগে খোশান্তর বুয়ে বেড়াচ্ছে—এমনি পিঠীর তাঁজ। সব এইখানে বাবাজী, সব এইখানে”—বলিয়া তিনি কপালে হাত বিধা দেখাইলেন।

প্রশ্ন একটু হাসিয়া বলিল, “আপনার ভাগ্যে বার আনা হ’য়েছে বলে’ কি সবাই তারে বিয়ে ক’রবে ব’লতে চান?”

উমা। তা’ ব’লতে চাইলে, তবে বোটের উপর ফলের বে খুব তকাত হ’বে তা ব’লতে পারি না। গড় পড়তা সেই লাভ আট আনাই থাকবে, আর কারও ভাগ্যে হ’বে বারো আনা কারো ভাগ্যে হু’ আনা।

প্রশ্ন। আর কারো ভাগ্যে শূণ্য?

উমা। তা’ হ’তে পারে হয় তো। শূণ্য ভাগ্যে হ’বে যেমন হ’য়েছেন কোর্টশিপ করে’ সুখুন্ডো মশাই।

প্রশ্ন। তবে আপনি ভালবাসাবাদি জিনিষটার বিখান করেন না?

উমা। জিজ্ঞাস্য। বল কি বাঙালি, তুমি ছেলে মানুষ তোমার কিই বা ব’লবো? আমার একটা বহনাম আছে যে এই লকান বহর যখনও আমি আর আমার স্ত্রী যেন lover হয়ে গেছি। ভালবাসার বিখান করি না মানে কি?

প্র। যদি ভালবাসা আছে মানেই তবে বানী স্ত্রীর কপালটুকে বিয়ে করে, লেগে ভালবাসার লভে শর্পের দিকে হাত পেতে থাকার চেয়ে ভালবাসা না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক’রলে বোঝ কি? থাকে ভালবাসি তাকে যদি বিয়ে করি তবে এই আঁখারে চিল নাভবার দাব থেকে তো মুক্তি পাওয়া যায়।

হাসিয়া উমানাথ বলিলেন, “এ সব তোমার Poetry বাবাজী, নিছক Poetry ভালবাসা বইয়ে প’ড়েছ, আপন জিনিষটার আবার পাও নি কি না তাই এই সব ব’লছো। বিয়ে হ’লে ভালবাসতে হ’বেই, তা লে হু আনাই হ’ক আর বার আনাই হ’ক। ওই বে শূণ্যের কথা বলে সেটা সম্পূর্ণ আমি মানি না। মৃত সবে দিনরাত পোয়া বলা, একই interest নিয়ে মড়া চড়া, তার লকে মনের দিল কতকটা বে হ’তেই হ’বে। কখনই বিয়ে করে’ ভালবাসার লভ কারও ভগবানের কাছে হাত পেতে বলে’ থাকতে হয় না। তা’ ছাড়া ভালবাসা হ’ল বিয়ের একটা by-product বিয়ের আপন

উদ্ভেদ তো নয়। সেই bye product এর জন্তে সারাদ্বীপন হাঁ করে বলে' যে কাটাতে চাই তার দত্ত কেহুও কেউ নেই। জম্ম ভাগবৎসে আমি গ্রীষ্ম চলে না। যেমন চলে। খনির কোর্টপিল চর, পুষ্কর থাকেন একখানে নারী থাকেন আর একখানে। যেমন তেঁঠ। শেলে শোকে মল ধার তেমন। সখন ভাবের ভালবাসা পায় তখন ভাবের দেখা শুনা। আমি গ্রীষ্ম তো সেউ হ'বার ঘো নেই। ভাবের সবচেঁ চরিত্র খট্টার—বছরে তিনশো পঞ্চাশ দিনের। ভাবের সমস্তটা জীবন একেবারে সাধনা সাধনি হ'য়ে যেখামেনশী হ'য়ে যায়। ভাবের মধ্যে বস বস করবার হয় তার মধ্যে ভালবাসার আদান প্রদান শেরকে ছটাকের বেশী নয়। সেই একটা কারবারের কোনও পুষ্কর উগার না ক'রে যদি তুমি কেবল ভালবাসা সফল করে জীবন জোঁতে পা চোলে বেগ তব তোমার বেউলে হ'বার খোল খান সস্তাবনা।

“এই ধর না সুখের কথা। তারা পরস্পরকে ভালবাসতে তোতে লম্বের নেই, কিন্তু তা' ছাড়া কোনও কিছুতেই তাদের মিল ছিল না। সুখেরো ছিল পতিত, তার গ্রীষ্ম অকট সুখ। সুখেরো বেজায় বক্রে, গ্রীষ্ম ভোগ কপন, সুখেরো বন না হ'লে চলে না, গ্রা মনের গুচ্ছ মইতে পারে না। কামেই ভালবাসা থাকলেও তা' নিয়ে সংসার চললো না। কত ছোকরাই তো উঠুঁত বরণে একটা বেজের চাঁদমুখ বেবে শেনী বায়রণ কপতে থাকেন আর ভালবাসেন। কিন্তু বস, যদি ওইটুকু সফল নিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন তবে পড়াতে হ'বে নিস্তর। তুমি হয় তো খোঁড়া হিম্বু, তোমার তিনি খুঁটান, তুমি হয় তো হুখ ভালবাস তাঁর হুখ বেগলে ন্যাকার আসে। তুমি হয় তো সা খোঁদাশেনি করে' শোয়া পরম্ব করো না, তায় সা ছুঁয়ে না শুলে মুদই আসে না। তা ছাড়া তুমি ভরলোকের ছেলে, তোমার তিনি হয় তো নাজিনী—যার সঙ্গে তোমার মনের

যোগ ঘোটেই হ'তে পারে না। এ যুগে বিয়ে করা জেক বেজুরী। 'লভ' কামেত হয়, 'এগ' কর কিত্ত দেখানে মিল না আছে—কিহা মিল থাকবার সম্ভাবনা না আছে দেখানে বিয়ে ক'রোনা, ক'রলে পুনী হ'তে পারবে না। তাই আদামের সম্বন্ধে অবস্থান কাল বেচক স্বাক্ষরিত বিবাহ, -লম্বান বিবাহ এই সব চলে আসছে, তাই খনীর পক্ষে পরীষ বিয়ে করা উচিত নয়, পরীষের মনো বিয়ে ক'রতে নেই।”

এসাদ কটমট দৃষ্টিতে উদ্যানবের বিকে চািল। এ বুড়া কিত্তার অন্তরের কথা সস্তান পাইয়াছে। না-হইলে তার এ সব বকিবার কি প্রয়োজন। এ সব কথা তার ঘোটেই ভাল লাগিল না। সে একটু অদৃষ্টভাবে কথাটা চাপা দিয়া বাহিরের বিকে মুখ বাড়াইয়া বহিল।

উদ্যানের বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিলেন না, অনেকটা বকিয়া একটু শান্ত হইয়াছিলেন, হাঁকা কড়ি বাহির করিয়া তামাক খাইবার উত্তোপ করিলেন।

এলাহাবাদে নানিয়াই উদ্যানের বাবু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া তার আকিণে ঢুকিয়া বন টাকা খরচ করিয়া একখানা লম্বা টেলিগ্রাম করিলেন এসাদের দর নামে।

তাঁহার সঙ্গে রতনা হইবার সময় এসাদ তার মার নামে একখানা চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল, তাহা উদ্যানের খেঁখাছিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই চিঠির ঠিকানা তাঁহার মরণ ছিল। টেলিগ্রাম করিয়া তিনি এসাদকে লইয়া বাড়ী ফেলেন।

এসাদের মার কাছে তিনি নিজের নাম গোজ-কোজের পরিচয় দিয়া লিখিলেন, এসাদের সঙ্গে তিনি কতবার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। এসাদ তাঁহার সঙ্গে আছেন। এসাদের নবের যদি অতি-প্রোব হয় তবে অল্পপ্রোব করিয়া এলাহাবাদে আসিয়া বস্তু দেখিয়া যান। যে পর্যন্ত তাঁর আশা না হয়

দে পশ্চাৎ উদ্যানাথ প্রাণমত্রে এলাহা বাবে তাঁরিয়ার
অমুখিত চাওিলেন ।

প্রসাদেশ্বর কথা

ভাল কামান কয়েই এই উদ্যানাথ বাবু ।
বাত্তবিক পরের উপকার করিতে নেই । দেখালে
সিদ্ধবানি যেথা বুকছিলেন যখন সাগরের বুড়ো
ভীর কীবে ভর করে বুকছিল, আর বুকছিল একালে
আমি । উদ্যানাথ বাবুর উপকার করিতে আমি
এলাম এলাহাবাদ, পরের দিনই কিরে বাব । তা'
ভীর আবদার সাতটা দিন ভীর বাড়িতে থেকে
থেকেই হ'বে । আমি তো বুঝিয়ে বলান আমার
তরানক ভাড়', তরানক কাজ । কিন্তু উদ্যানাথ
যখন ভীর ওই অশ্রুধা হানি যেনে বেলে লিজালা
ক'রলেন কাজের হকবটা কি ? তখন আমি
ভীকে কোনও একটা হুঁখিখাযত জগাৰ দিতে
পারলাম না । আমি ব'লে বললাম যে "ভীর খুব
লক্ষী দরকারে কলকাতা বাড়িলাম ।

ভক্তলোক আমার তেমনি করে মুচকি ছেলে
একখানা টেলিগ্রাফ বের করে বেখালেদ, না লিখে-
ছেন "আশনি প্রাণমত্রে বত'রিন ইচ্ছা রাখতে
পারেন যদি তার কোনও আপত্তি না থাকে ।" বস'
এ কথা কিলে মেল । আসল কথাটাও বলা হ'ল
না । কেন হ'ল না তা' ব'লেতে পারি না, কেবল
আলার মনে হ'তে লাগলো যে এই লাকটির কাছে
হালতীর কথা উদ্বাপন করাও অসম্ভব । কথাটি
ভুললেই নিকর ইনি আমার পেটের নাকী থেকে লব
গোশন তথ্য বের করে' কেলে এমন একটা গুরু
পরিহাসের হাওয়া উড়িয়ে যেনেন যে আমার গহ
রোমাঙ্গ একবারে ঝুঁ হ'য়ে উড়ে' থাকে ।

যেতে পারলাম না, কিন্তু মধ্য অস্থির হ'য়ে
উঠলাম । মনটা ভারী উজ্জ্বল বোধ হ'ল, উদ্যা-
নাবের উপর ভীষণ রাগ হ'ল । লম্বক-লম্ব খুঁৎ খুঁৎ
করে খেড়তে লাগলাম । কিন্তু খুঁৎ খুঁৎ করবার
খুব বে মিলেব কোনও হেতু ছিল এ কথা ভোর

করে বলতে পারি না । ভক্তলোকের লম্বক পাক-
বারে মিলে আমার এমন তোমালে রাখেন যে
বলবার নয় । ভীর বড় ছেলে লুইট, যা'র ভীকে
আমি মনমত্রে বিশেষ পঠিত থেকে এই কামানবে
এলে পড়েছি, সে তো আমার গোলাদা ক'রছে ।
আর ভীর ভীট পেতো গোড়া থেকেই আমার
ধানী ব'নেই র'য়েছে । কথা সে কম না আমার
লগে, কিন্তু লক্ষণ বাড়ীর ভিতর থাকি
ততক্ষণ সে বামীর লগে আমার চারিত্রিক
বিষে খুব খুব করে' খুরে বেড়াচ্ছে আর আমার
এটা ওটা পেটা করে' বেড়াচ্ছে । মাকে মাঝে
কেবল তার খোঁটার তলা থেকে তার ভব' ডবে'
চোপ তুলে সে কাতর কৃত্তর মূর্তিতে আমার বিকে
চাহে । সে চাহনী যেন আমার অন্তরের খুঁৎখুঁতিকে
লক্ষ্য করে' স্পষ্ট ভিরহাও করে, এমন চান্দ্র মারে
মনের পিঠে যে আমি তরানক লক্ষিত হ'বে উঠি ।
এ মেয়েটির বহল বড় ভোর পনেরো বছর হ'বে—
একেবারে ছেলে মানুষ কিন্তু তার এমন তারিফি
চাল আর চক্কর মূর্তি বিধে এমন পড়ার ভিরহাও
কোথা থেকে এগো তা' ভেবে পাইনে ।

আমি একটি ঘেবে আছে, লুইয়ের ছোট বোন
চপলা । কথাটা অতঃপর ব'দান । মেয়ে অনেকই
আছে । উদ্যানাথ বাবুর পাঁচটি মেয়ে । দুটির
বিবাহ হ'য়েছে আর তিনটি এখনো খরে মজুত ।
তা' ছাড়া ভীর ভারীও ভীট দুই আছে । কিন্তু
আমার চ'বে সেগেছে কেবল ওই একটি মেয়ে ।
এমন একটা মতি মেয়ে ভুতরাতে কেউ যেনেছে
কিনা লম্বোহ । তরানক বাড়ত বেথেট, বহলও
বহর জৌদ হ'বে, কিন্তু সে লাকলক্ষি ছুটুটি
করে' বেড়াই যেন খুব বহরের খুকট । তার
বাগ না অনেক কষ্টে এইটুকু ক'রেছেন যে সে
এখন বাইরে রাতার ছুটে যায় না, কিন্তু বিলাপনা
বাড়িতে করে আঠার আনা । তাইবের লগে তার
মারিয়ারি সেগেই আছে, অতীত যে তার আট বছরের,

বড় ভাত পে গ্রাহ্য করে না। তার উপর যখনই চোরাখা করে, দুই এক বা' মারও বাধ, মার পেয়ে হেসে পড়ায়।

'আমি যখন প্রথম এ বাড়ীতে আসলাম তখন চপলায় তারি লজ্জা। আমার কাছে আসে না; সে বেখানে থাকে সেখানে আমি সেলে সে বোড় মারে তা' সে মাঠের পর মাঠ ছুটে হয়তো পালায়। অথচ আমাকে বেখবার কোজ্জলও তার খোল জানা আছে। আমি তখন ঘরে বসে থাকি হঠাৎ যেখি একদিককার ঝিল মিলির একটা পানী উঠে পেল আর তার ভিতর দিয়ে চকল হুটো চোব উকি মেয়ে আমাকে চেয়ে দেখছে। আমার চোখে চোখে পড়তেই সে ঝিল মিলি ছেড়ে দিয়ে এই ছুট!

হ'ক চৌদ্দ বছরের মেয়ে, কিন্তু একে বেখে খোমনও লজ্জাও হয় না, এর লুকোচুরী বেলো বেখে হাসি পাও, লসে লসে খেলতেও ইচ্ছা করে। তার আমাকে লুকিয়ে বেড়ান বেখে আমার ইচ্ছা হ'ল তাকে একবার ধরে' সামনা সামনি ধাক্কা করিয়ে কেনি। এ ইচ্ছা হবার কারণ এই যে আমি তাকে কিছুতেই চৌদ্দ বছরের মেয়ে ব'লে বিবেচনা ক'রতে পারি নি, তাকে ছোট্ট একটা আট বশ বছরের ছুই মেয়ে ব'লেই আমি দেখেছি। তা ছাড়া এ মেয়েটাকে কেবল আবহাওয়ার মতই আমি দেখেছি। ওই বড়বড়ির ঠাক বিধা হুটো ভাগর চকল চোব, যুগারের ঠাকে চার পাঁচটা চাপার কলির মত আত্ম—তার ভগায় ভগায় যেন বিদ্যৎ খেলে যাচ্ছে—তা' ছাড়া হঠাৎ এক সুহৃদের লজ্জা বেখা তার কোজ্জল চকল সুখানা আর তার পর ধাবমান ললিত অঙ্গবস্ত্র,—এ যেন তাকে দেখেও দেখতে না পাওয়া। কি আমি কেন আমার তারি ইচ্ছা হ'চ্ছিল মেয়েটাকে সামনা সামনি ধাক্কা দিয়ে দেখতে। এই যে সিকি খান্না বেখা, এতে যেন আমার তারি অকৃত্রিম ও অযত্নি বোধ হ'চ্ছিল।

সে যখন আমার পাশের ঘরে ব'লে খুব টেটিয়ে

টেটিয়ে তান দিয়ে দিয়ে "We are eleven" পড়তো, তখন আমার তারি আশ্চর্য্য ঠেকতো। সেই চকল চপলা যে আমার এতখানি ঘির সস্তার হ'বে পড়ে আর সে যে চিগমিনই এতটা স্থিতি সস্তার হ'বে পড়ে' এনেছে যে তার এতটা দিতা হ'বে পেছে, এ কথা ভাবতে আমার আশ্চর্য্য লাগতো। আমার তারি ইচ্ছা হ'ত এই সময় তাকে দেখতে। এখনো কি সে বিদ্যমানতার মত চকল নাকি তাই দেখতে তারি মন চাইতো। কিন্তু বেখবার স্থিতি কিছুতেই হ'বে ওঠ নি।

একদিন লকালে' আমি ঘেঁড়িয়ে ফিরছি। স্থবীর আবহাওয়া সবে ছিল' সে আনকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে বাহারে চলে গেল, আমি একলা বাহিরের ঘে ঘরউতে আছি থাকতাম সেখানে চুকতেই বেখলাম চপলা আমার দিকে শিনন কিং টেবিলের কাছে বসে' একাগ্রমনে কি একটা দেখছে। বাগানের দিকে এই ঘরের আর একটা ঘরজা ছিল। আমি পা টপে টপে সরে গিয়ে সেই ঘরজার দাঁড়ান। বেখলাম চপলা শান্তরস। বিধা মেয়েটি ইচ্ছা হ'ল এই স্থিতিবান্না একে নি। এ সে চকলা চপলাই নয়। তার চুলগুলো এলোবেলো হ'বে চারদিকে ছুটোছুটি ক'রছে, কাপড় চোপড় খুব আট্টাএর মত করে পরা নয়। কিন্তু তাতে একে মানাচ্ছিল বেশ। ঝাঁ হাতের আত্ম-গুলো সে চুলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে সেই হাতের উপর রাখা ভর দিয়ে ব'লে সে বই প'ড়ছিল। তার তারি পাগড়ীওয়ালা বড় বড় চোব হুটো একাগ্রকোতুলে বইখানার ভিতর বসে গিয়েছিল। বইখান্না যে উপভাস দেটা বলাই বাহুল্য।

হঠাৎ সে ঝিল ঝিল করে বেলে উঠলে, একটা বিল্লনী যেন তার মুখের উপর দিয়ে স্বপ্নবলু করে খেলে গেল। স্বপ্নবলু ব'তওলি তার মুখের উপর যেন মুক্তোর মালা পরিবে বিলে। আমি একটু চমকে উঠে দিচ্ছি গেলাম। জেবে বেখলাম

এমন অবস্থায় একে বেথলে পূর লোকে মন্ম ভাবতে পারে। এখন আর তাকে সেই কঠি পুত্রী মনে হইল না, এখন সে কীতিমত তার চোখের বহর গমনার মত পথে ব'লেছিল, তাই আমি একটু সন্মোচ বোধ করলাম। আমি দু'বে গিয়ে আবার বরজার দিক দিয়ে বেশ পথ করে যবে ঢুকলাম। চক্ষিভা হ্রদীর মত তড়াক করে উঠে ঝড় বৈকিয়ে এক মুহূর্তের মত ভাবিয়ে একটু হেসে যে ছুট। কিন্তু সে ভুল করলে; পোতা বরজার দিকে না গিয়ে বাড়ীর বাহিরে তার বাগা অসম্ভব। কিন্তু সে অসম্ভব বলে, কিছু ক্রাইই করে না। সে পটান জনালির উপর উঠে বাড়ী পাড় হাত লাগে বেগার উজোপ করল।

আমি কিন্তু খী করে খোঁড়ে তার হাত ধরে বেরালাম। কেন? ব'লেতে পারি না ঠিক। বোধ হয় তারগাম যে ভদ্রান দিয়ে গকে অবনি করে' লাকিয়ে শ'কতে বেওয়াটা ঠিক হবে না। তা' ছাড়া তার এই চকলা হ্রদীর স্তম্ভটি সোজাসোজি বেথবারও বোধ হয় একটু সোত হ'রেছিল। বাই হ'ক আমি তার হাত ধরে কেল'ম। সে মা'নসা থেকে নেনে বী করে সুখানা ঢেকে কেরে আর মোর করে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলো। বিছুতেই বদন পায়লে না তখন মুখ নীচু করে হ'হাত দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো। আমি হ' হাতই ধরে বেজাম। সে শরীরটাকে বৈকিয়ে ছুড়িয়ে নানা রকম করে মোর করতে লাগলো। আমার হত স্তম্ভার হাত থেকে তাতে সে মুক্তি পাবে কেনন করে? কিন্তু এটা বুঝলাম যে তার গার মোর আছে; সে নবনীত কোংগা নয়, বরিত সে হাত সুখানা তার আমি হাতের তিত্তর ব'রেছিলাম সে সুখানা তারি নয়।

আমি হেসে খামস "এইবার?"

সে খেবস, "হে" "হার" "সেগুন" "ধান" প্রভৃতি অসুই শব্দ করে লাগলো। একবার হঠাৎ তার

মোটা সুখানা আমি দেখতে পেলাম। লক্ষ্য হে রক্তজবার মত লাল হ'রে গেছে; সে তার আঙনের মত কীকাল উজ্জস গোথ দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে "হিঃ"। আমি এককম মুগ্ধ গিয়ে তাকে হেড়ে দিলাম। তাই মুক্তি আর তাই "হিঃ" এমন একটা তিরকার আমার মনের তিত্তর এমনি ছুীর মত হ'রে ব'লে গেল যে তা' ব'লবার কথা নয়।

তাই তো! এ কি বিসম্বল কাণ্ডটা আমি করে' ব'ললাম। চপলা যে আর হোষ্টি মেয়েটি নয় তা' আমি সমস্ত ক্ষতর দিয়ে এখন অসুভব করলাম আর লক্ষ্য কর'তে পেলাম। চপলা যে আমাকে কি ভাবলো তাতে আমার এক টোটা সন্দেহ রইলো না। আমি তার কাছে একটা বেহাৎ পাণিষ্ট বনে পেলাম, আর আমার এই সম্পূর্ণ নির্দোষ খেলাটা তার কাছে একটা ভদ্রানক সাহসের চেষ্টা বলে ঠাড়িয়ে গেল। কি খেত্র!

দেখিন আর লক্ষ্য করো কাছে মুখ দেখাতে পারলাম না। চপলার ঘোঁষির চলন-চালন বেন' আমার কাছে ভারী গভীর গভীর ঠেকলো। তিনি নিশ্চয় স্তনেছেন আর স্তনে না জানি কি ভাবছেন। সুখীও সব স্তনেছে বলেই মনে হ'ল। উদ্ভাবন বাসুও মুখে বড় একটা হাসি বেখা দেল না। আর চপলা সেই যে ভুব মারলো, তাকে তো সারাবিনের মতো বেখাই গেল না। আমি তারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এ যে অস্বাভি এ তো কইবারও নয় সইবারও নয়। কেউ আমার কাছে তো সুখোমুখী হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না, তিরস্কারও করছে না যে মুক্তির বসব। অথচ চোখে লবার এই তিরস্কার বেথতে পাচ্ছি। এর কি লবার বেথ? আর লবার বেথই বা কি ছাই? আমার কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য যে কেউ বিশ্বাস করবে?

রাতিরে বাঙার পর আমি উদ্যান বাসুক ব'লার "আমি কাল সকালেই ছাছি।"

উমানাথ করেন, “বিলম্ব, কাল তোমার মা আসছেন আর তুমি যাবে কি রকম?”

মা আসছেন? আমি আকাশ থেকে পড়লাম। উমানাথ বাবু আমাকে মার চিঠি বিলেন। তিনি লিখেছেন “আবার যদি মেয়ে লক্ষ্য হয় তবেই হ’বে, তার আর মেয়ে দেখবার সরকার নেই। তবে যখন উমানাথ বাবু নিতান্তই পীড়ানীড়ি ক’রছেন তখন মা আসছেন। বিশেষ আমি যখন এখানে আছি।”

এ সব কি কথা? তুমি তোমার এত সব কাণ্ড হ’য়ে গেছে, আমি তার কিছুই জানি না।

আমি জ্বীয়েকে নিগ্রিবিদ পেয়ে বেশ এতটু উচ্চ ভাবেই বলছি “এ সব কি? আমি তোমার বোনকে বিয়ে করবো না।”

জ্বীর তদানক আশ্চর্য হ’য়ে বলে, “সে কি? আমার স্ত্রী ত’ হ’লে মিথ্যা ব’লেছে?”

আমার লম্বেই হইল না কি কথা জ্বীরের স্ত্রী তাকে ব’লেছে। আমি একেবারে এতটু হ’য়ে পেলাম। সুখ নীচু করে ব’ললাম, “তিনি বহুতো ছুগ বুকেছেন, আমাকে মাগ করো।”

কিন্তু মাগ করার কোনও রকম তার চোমার টের পেলাম না।

সেদিন রাতে তারি এসোমেলো সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। মাগতীর সঙ্গে চপলা মিশে গিয়ে কি সব যে দেখতে লাগলাম তা ভাবতেও লক্ষ্য করে। আমি রূপের তাতে উঠে বসে জানাণার উপর বসে তাবত লাগলাম।

মালতীকে আমি ভালবাসি সে বিধে লম্বেই নাই। কিন্তু কেনম ভালবাসি। সে দিন উমানাথ বাবু ব’লছিলেন, “ভালবাসার রকম কের আছে। আমি পাঁচটা ভালবাসি বাবার মত। জ্বিকি লুইগ সায়েব খোঁড়া ভালবাসে চুড়বার মত; আর চৌবট্ট পুড়ের মহারাষ্ট্র বাহাদুর খোঁড়া ভালবাসেন আক্ত-বলে বেঁধে রাখবার মত। ইংরেজরা আমায়ের

বেশটাকে ভালবাসেন—এমন বেশ কি হয় এত টাকা, এত মর্যাদা ছিন্দিার আর কোথাও দিলে না। আদ্যে এই বেশ ভালবাসি। আমার একটা মাসুখক ভালবাসি চৌধ দিয়ে—তার রূপ দেখবার মত, আর আর একজনকে ভালবাসি রক্ত তার রাগা খাবার মত, একজনকে ভালবাসি তার হৃৎস্পন্দ মত, আর একজনকে তার ভালবাসার মত। ষাঁট ভালবাসা তাকেই বসি, যেখানে আমার সব মন প্রাণ ইঞ্জির দিয়ে আর একরনের সবটাকে আমি আনন্দ বোধ ক’রতে পারি। এমনটা সম্ভারে হয় না। তবে যারা আমি মাগে হ’তে পারে, আমি স্ত্রীর মধ্যে—যেখানে তোমার সবটার সঙ্গে তোমার স্ত্রীর সবটার দেখাশোনি নাখানি হ’য়ে গেছে।”

কথাটা মনে এখন বড় লাগলো। মালতীকে কি আমি ভালবাসি। তার রূপ মন নয়, কিন্তু—এই ধর চপলার কাছে—তাকে রূপী বলা চলে না তা স্বীকার ক’রতেই হ’বে। তার হৃৎস্পন্দই আমার অন্তরকে বেশী মমিত ক’রেছে। সেই হৃৎস্পন্দিতা নুগি যা আমি ছবিত্রে এঁকেছিলাম সেইটাই তো আমার অন্তরের ভিতর বসে’ র’য়েছে। কিন্তু উমানাথ বাবু যা’ ব’লেছেন সে বিক দিঃ দেখতে সেলে—আমি মাগতীর কিই বা জানি কিই বা ভালবাসি। ওকে লিখে বস ক’রতে পারি কি? তার সঙ্গে আমার মনের যোগ কোথায়? আমার আদর্শ, আমার চিত্ত এ সব তো তার মনের বাসে কাছেই নাই। বেশ বলতে আমাদের গীতানা বই কিছু সে বোঝে কি না লক্ষ্য। কথিতা তার প্রাণে কোনও সন্ডা ঘেঁষ না। অস্ত বিস্তে এই চপলা—এ দেখার পড়ার বুদ্ধিতে, কালকর্ষে চকমতীর সব রকমেই আমার মনের চারিত্রিক দিয়ে বেড়ে তাকে তৃপ্তি দিতে পারে।

এ কথা ভাবতে আমার তদানক রাগ হ’ল—নিম্নের উপর তারি অজ্ঞতা হ’ল।

মালতীর কাছে বিদ্যামাতকতা করছি বলে

হয়ে হ'ল। কিন্তু সে তো আবার লোক অর্থাৎ বিয়ে দিয়েছে। তবে আর বিধানবাক্যটাই বা কই ক'রলুম? তা' হ'ল! আর একটা কথাদামতী আবার ভালবাসার মান কেনই বিনেই রাখেনি। আমি যেই ক'লকাতার বাড়ীতে গেলুম সে অমনি ঘেরিয়ে গেল। আমি গেলুম খ'লেই যে গেল তা' নিশ্চয়। তারপর ঘরের কথা নে অকীকার ক'রলে। আর শেষ দরকার লগে আবার বিয়ের প্রস্তাব করে' বসলো। তবে আর আবার ঘোষ কি?

এমনি সব এসোমেলো তাহা আবার হ'ল। বড়ই ভাবতে লাগলাম, ততই বেহুতে শেলার যে চপলাকে আমি বেশ রীতিমত—ভালবাসছি খ'লতে আর এখন তরল। ক'রি না—কিন্তু রীতিমত কামনা ক'রছি; আর আবার দম আবার অজান্তলগেই তাকে গভীরপে করনা ক'রে' অপর আনন্দ অসু-ভব ক'রছে।

হি—হি—হি—আমি কি একটা এমনি অসমর্থ! মাকে যে আমি এই বলে ঘেরিয়েছি যে আমি বিয়ে ক'রে না। আজ যদি হঠাৎ চপলাকে বিয়ে করে' নিয়ে তাঁর কাছে কিরি তবে যে আমি সুখ বেগিতে পারবো না। আমি নিজেই মনকে এই লম্বুঘের-অন্তে খুব ধমকলাদ লাগলাম, শেষে মালতীকে ছোর ক'রে ধ্যান ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম।

কিন্তু মালতী যে নেই, সে আবার হবে না, হ'তে পারে না। সে পরতী; তার কথা ধ্যান করত যে আবার গাপ! আর এমিকে চপলাকে নিয়ে আমি এং ফাটটা করে' খ'লেছি—তার বৌদি সেও টের পেয়েছে আর সুখেরক খ'লেছে। এখন যদি আমি তাকে বিয়ে করবো না বলি তবে তার যদি চাব'কে আবার চাব'ক তুপে যেহ তবু বো আবার কিছু খ'লবার থাকবে না। যদি চাব'ক তার না মারে সে কেবল তাদের অলমরে উপকার ক'রেছিলাম বলে'।

তবে চিত্তে কিছুই ঠিক ক'রতে পারলুম না, মা এং আবার এ দার থেকে উদ্ধার ক'রবেন এই সবদায় লম্বু তাহনা চিত্তা মার পায় সদর্পণ করে' বিয়ে আ'নি ঘুমিয়ে প'ড়লাম।

মা এং আবার উদ্ধার ক'রলেন—চপলাকে আশীর্বাদ ক'রে।

মানতীর কথা

আমি তখন হুটনো হুটছিলাম। মার কাছে ঘাবাবানু এং একখানা লম্বা টেলিগ্রাম পড়ে শুনাগেল। এসালাবনের উদ্যোগ বাবু আমায়ের প্রেমার বাবুং সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চান।

তার শুনেই মা তেজস্বীতে আবার দিকে চাই-লেন। আমি লজ্জায় মরে গেলুম। আবার বুকের ভিতর যে ছুঁচ ছুঁজিগ তা' তাঁর কাছে লুকাবার মত একমনে তরকারী হুটেতে লাগলুম।

উদ্যোগ বাবুর বাপের নাম মার শোনা ছিল। তিনি যে বড় কেওকেটা নন তা' তিনি জানেন। মা বলেন, "কি উত্তর বি বলতে মানতী?"

কি লজ্জা! আবার কেন বিজ্ঞাপন বল দেখি? আবার ইচ্ছা কি, তা কি মাঘের এখনো জানুতে বাকী আছে? আমি শুধু বললাম, "বেশ তো বেশ হয়,"

মার সুবাসনা কিন্তু কেমন যেন পচা হ'বে উঠলো। তিনি বানিক লগ চূপ করে থেকে-বলেন, "সুই গিবে যে নির্মল, প্রেমার ঘরি বিয়ে ক'রতে চাই তবে আবার অমত নেই। আর সে বহু-দিন ইচ্ছা দেখানে থাকুক। মানা করেন, "কিন্তু বিবি, তোমার যে যেতে গিয়েছেন উদ্যোগ বাবু। আমি বলি চল না একবার।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেলে মা বলেন, "না, আবার আর গিয়ে মরকার নেই।"

সেই তার কথা হ'ল। তার পর উদ্যোগ বাবু কেহ তার ক'রলেন। শেষ পর্যন্ত মা বাওয়াই বিয়ে ক'রলেন।

ବେଳ ତୋ ବେଳ ! ଏହି ତୋ ଘୋଷା ଡାଳ ! ଆମି ନୀଚ ମରଣର ସେତେ, ତାର ବିନ୍ଦୁ, ଆମାର ଏତେ କି ବଳବାର ଆଦେ ? ଆମାର ଗୁମର ଡାଳ ମନ ମଡ଼େ ବାକବେ ଏହନ କି ଆଦେ ଆମାର । ତା'ଛାଡ଼ା ଡାଳେ ତୋ ଆମି ମେତେ ମାରି ନା । ଆମି ସେ ମରଣା, ବିଷବା ! ତାର ତାମ ହ'ବ—ତାର ବଡ଼ ଏମେ ଡାଳେ ଆମାର ସତ ଭାଗବାହୁକ ଏହି ତୋ ଆମି ଡାଳ ! ଡାଳେ ଆମି ତୋ ସୁଖିଆ ନିତେ ଡାଳ—ତାହି ତୋ ସର ବେଳେ ମାରି:ସହିଲୁ । ତବେ କି ? ବେଳ ତୋ ବେଳ !

କିନ୍ତୁ, ସନ ସାନେ କହି । ମୋଡ଼ା ଡୋରର ଗଳ ସାନେ କହି ! ବୁକ ସେ ଡେଲେ ସାମ ! ହାବ ସେ ମୋଡ଼ାହ-ସୁବୀ ଗୁଟୋ ଦିନ 'ହୁ କି ବସ୍ତ୍ରଇ ଦେଖେହିନି, ଆମାର ସାତୋଳେ କୋନ୍ ବର୍ଗେ ହୁଇ ଉଡ଼େ ମିରେ:ସିନି ? ମବ ସମ, ମବ ସିରେ ! ତାହି ନା ଆମ ତୋର ଆଛାଡ଼ ବେଳ ତୋର ଡିବମଚିତିତ ସାତୀର ଉପର ମଡ଼େ କେବେ ସଂଗତେ ହେବ ! ସାମ ସାମ !

ମା ଆମାକେ ମକେ ନିତେ ଡାଲେନ । ମୋଡ଼ା କମାଳ ଆମାର । ଆମି ସମ୍ବନ୍ଧ, "ମାମାକେ ଏ କ'ବିନ ନା ହବ ସାକୀତେହି ଡେବେ ସାନ ।" ତାହି ହ'ବ, ମା ଏମାମ ମେହେନ ।

ଆମ ସବର ଏମେକେ, କାମ ଏମାମ ସାବୁର ବିରେ, ଆମ ଆମି ତବୁ ବୈତେ ଆସି ! ସାମାର ସବନ ବୁକ କାଟେ ତବନ ମୋକେ ସରେ ନା କେନ ? କିମ୍ବେର ଆମାର ଆମାର ସତ ଲୋକ ବୈତେ ବାକେ । କେବଳ

ମରେର ମମେକେ ହ'ବେ ବୈତେ ବାକବାର ଗଜ—ସାମ ସେ କମାଳ !

ଆମ ଆମ ଏକଟା କଥା ସନେ ହ'ବେ । ଏମାମ ସାବୁ ଏକଦିନ ଆମାର ତାମ ବେଳ:ସିନେ, । ଆଛା ତାର ବଡ଼ ନିରେ ଏମେନ କି:ସି ଏମେ, ଆମାର ହବ ତୋ ଆମାର ଭାଗବେଳେ କେମେତେ ମାରେନ । ସାମି ସାମେନ, ସାମି ଡେବିନି କ'ରେ ଏମେ ବାମେନ ! ତବୁ କି ଆମି ବାକ୍ସା ସତ ମକ ହ'ବେ ବାକ୍ସେ ମା:ସା ? ନା ମାତବୋ ନା । ଆମାର ସାମି ମେହି ଜ୍ଞାନବୋଧନ ବୌଦ୍ଧ-ସୁଖିଆ ଆମାର ମାମେନ ସେବେର କାକାମ ହ'ବେ ସାକୀର ତବେ ସେ ଆମି କେବଳ ତାର ମାରେ ମୁଟି:ସି ମଡ଼ବୋ ତା ବୁଝେତେ ମା:ଲୁବ ।

ତବେ ?—କି ମର୍ମନାମ ।

ଏମେନ ଆମ ବାକା ଚଳେ ନା । ବାକ୍ସେତ ମା:ମୋଡ଼ ନା । ଏମିନ ଆମାର ସନଟା ବଡ଼ିରେର ଉପର ବି:ମାମ ତରେ ଉଠେ । ଆମି ମେବ ମର୍ମନାମ କି କ'ରେ ବଳବୋ ତା' କେ ଜାବେ । ବାକ୍ସେ ମବ ଡେବେ ତାମାମି ମେହି ଏମାବେର ଗଜ ଆମାର ବା:ସି କି ମେବେ ଆମେନ ଜାମବୋ ।

ତାର ଡେବେ ମୋବିର ମମ ମକ କି ?

ମେବ

ସାମତା ଆମାର ନିକେସେନ ହବାର ମାସାହି ନାନା ସବବ କାମା:ସୁବ: କାରିତେ ମା:ମିମ । ତିନ ଦିନ ମର ମୁତନ ବଡ଼ି ମାସା ଏମାମ ଓ ତାର ମା କିରିଆ ଆମିଆ ମେବିତେ ମାସିମେନ ବୌଦ୍ଧି ଗଲେ ସାମତାର ସେବ ହୁମିଆ ତାମିଆ ଉଠିଆବେ ।

বাদলের বেদনা

(শ্রীযেযুন্সুখার রাহ)

মন যে কেমন করে গগো,	সাঁঝের আঁখার জঘাট হয়ে
মন যে কেমন করে !	উঠল তিলে তিলে,
ফুটি-বাঁধা তিলে বাতাস	হালের সান্নি, অকেরা আর
চুপুচে আঁখার ঘরে,—	নেইকো তিলে-বিলে ।
আঁখার মন যে কেমন করে !	কেতের গলে, গানের শীষে,
তিমে বাতাস, তিলে বাতাস !	এক্সা ধরে গেছে বিশে,
কোন দরবে প্রাণকে মাতাস,	গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে
বন ঘোলাঘো কাঁক-ভোলানো	কাঁকচে কাঁহার তরে,
যেখ-রাগিনীর বচে,	আঁখার মন যে কেমন করে !
আঁখার মন যে কেমন করে !	
যেখেরা লব কাহার চিতার	তাহের কথা ভাব্‌তি কেবল
ভব্ব পায়ে মাখে,	পালিয়ে গেছে যারা,
আকাশের ঐ নীলকমলে	এখনি থেকে নিষে ছুটি
আড়াগেতে চাক ।	কোথায় হোণো হাতা !
যে দিকে চাই সাপুলা যে চোখ,	এক্সা ধরে ব'লে আঁজি,
গাছের পথে নেই কোন লোক,	বেব্‌তি খুণে স্থতির সান্নি,
চিসুর আংলো জ'লে নেবে	নিঃখাগেতে মুকের তলা
কাঁক নদীর চরে,	উঠচে ভ'রে ভ'রে,
মন যে কেমন করে !	আঁখার মন যে কেমন করে !

বন-বিহঙ্গী

(গল্প)

(দ্বিতীয় ভাগ) সুখোপাখ্যান)

(১)

হুই হাতের দৃঢ় হৃদয়ে একটা একটা বটবৃক্ষের
নাশল ঘরিয়া এক সীঁওতা-সুখটী হুলিতেছিল।
বোলুনা বোলার তালে তালে তরলী-কর্ক-নিঃসৃত
পানের জ্বা, অপ্রতির রক্তাভ-রঞ্জিত তরলজিত
পাতার পাতার প্রতিবর্ত হইয়া বনানী-প্রান্তে দ্রুতি
ঘরিতেছিল। সে গাহিতেছিল,—

বনের মাঝে সোপার আলো,

আকাশের একদিকে ঘেঁষ উঠেছে,

আবার বোলুনা হুলিছে,

আমি আর গায়ে কিম্বা না,—

হেইয়া হো ! হেইয়া হো !!

হো, হো,—বলিয়া ঘোর ঠেলা দিতেই বোলুনা
উপরে উঠিল, আবার নামিয়া আসিল, আবার উঠিল,
আবার নামিল !

অনতিদূরে দিগ্‌-ভ্রামর তরলজিত করেকটা
জ্বর পাখিও এবং তাহার পাখদুল পরিবর্তন করিয়া
অনিতরত বৃষশ্রোণী, সীঁওতা পলটিকে লঘতনে
বকে ঘরিয়া, প্রান্তরের উপর ইতস্ততঃ বিকিণ হইয়া
পড়িয়াছে !.....

বনৌষধিপূর্ণ পাহাড়ের পাশে, পত্র-পুষ্প-স্রজিত
অরণ্যের একান্ত বৃক্ষের তলায়, উষার আকাশের
দিগ্‌-করণ ভ্রামরদিয়ার নীচে, উজ্জ্বল রবি শরীর
তরল কিরণোদ্ভাসিত প্রান্তরে, শান্তিধর্ম কুঞ্জরূপী
বাঁধিয়া, প্রকৃতির হাসল, নয় বর্ষের অনাধার বন
মনের আনন্দের বহুধর্ম-দীপন আপন করিতেছে !

হুলিতে হুলিতে ঢকল বাতাসে তরলীর আলু-

লালিত কেশভক্ত এবং অগ্ন্যুত্ত অকল্যাণ সোন্
খাইতেছিল।

অসম্মত পক্ষান্তে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই বেবিল,
কে যেন একটা অপরিচিত লোক সেইদিকে অগ্রসর
হইতেছে। লোকটার পরনে মাথা খুঁটি, পায়ে
রক্তিন মাঝা, হাতে ছাতা ও ছড়ি। তরলী তাবিল,
এই পরদেশী পথিক যোগ হবে শব্দ হারাইয়াছে।

লোকটা কাছে আসিয়া হাড়াইয়াছিল, সে
খেপালের কোঁকে আরও হুইবার বোলু বাঁধা
আপস্বকের যুগের পানে তাহার হরিণ-চোখের বিদ্ব
দৃষ্টি হানিয়া কহিল,—ও কারিন্ তুহিন্ কানা ?
(হুই কোথা থাকিন্ তু)

লোকটা সীঁওতানিতায়া আনিত না। হাতের
ইন্দ্রায় মুক্কাইয়া বিল, সে তাহার ভাষা বুঝে না,
এবং তরলী যদি তাহাকে তাহাধের প্রাণে লইয়া
ঘাইতে পারে তাহা হইলে ভাল হয়।

হাতের বিনে এখান হইতে প্রায় চার পাঁচ
ক্রোশ দূরে একটা প্রাণে তাহার 'পথন' করিতে
ঘাইত, কারেই এখানের সীঁওতাগ অবিবাসীরা
প্রায় সকলেই একই আদর্শ বাধা বসিতে পারিত।

তরলী বলিল, তুদের বাংনা আমি জানি।
বলিয়াই কিছু করিয়া জ্বংৎ হালিগা ইন্দ্রায় এই
পরদেশী পথিককে তাহার পক্ষান্তে আনিতে ইরিত
কহিল।

এই ভ্রামরদিয়ার পারায়েই নিটোল বাধ্যতায়
যৌবনের অল্পান জ্যোতি,—দুখে চোখে নির্দোষ
চন্দ্রতার গতি তবিল ! দুবক পক্ষান্তে চলিতেছিল,

ভরলী ফেলিয়া চলিয়া চকল চরণে একটুখানি অগ্রগর
হঠাৎ লগাশো করিল,—কার ঘরে ক বাধি ?

—তোদের গায়ে মাতকঃ মুক্সি লোক কেউ
নেই ? তার ঘরেই চলে ...আমি কে জানি ? ...
পুলিশের লোক ।...

পুলিশের নাম শুনিয়া ভরলী একটু থমকিয়া
দাঁড়াইয়া কহিল, ও ! পুনরাব চলিতে লাগিল ।
অতঃক্বে হইলে হরত' একটু চমকিয়া উঠিত, কারণ
এই আশ্চর্য্য স্বাভীন বনবাণী হল জানে যে
তাহাদেরও আর দেখিন নাই,—এই ইংরাজ-শাসিত
ভারতবর্ষে তাহাবিনিকেও প্রতি পনবিষয়ে আইন
মানিয়া চলিতে হইবে, নচেৎ এই পুলিশ নামবাণী
রাজার কনভা-প্রাপ্ত মাকালী কর্তব্যবাহু তাহাদের
হনের উল্লুখ স্বাভীনতাকে কারাগারের দৌর-শৃঙ্খলে
কবী করিয়া নিতেও সূচিত হইবে না । সেইজন্য হাতে-
মাতে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের বহুবিধ অত্যাচার
এই নিরীহ সাঁওতালদের দুখ বৃদ্ধিয়া স্বে করে ।
বৎসর ধামেক পূর্বে পুলিশের নাম ধরিয়া একটা
লোক এই গ্রাম হইতে প্রাচ্য ছিল চম্পিয়ন
'ছোয়ান'কে আসামের চা-বাগানে পাঠাইয়া
দিয়াছে । পরে, আবার আর-একজন আসিয়া,
জের টাকা 'দাবন' বিয়া লোভ দেখাইয়া, বেশা
খাওয়াইয়া, প্রাচ্য জিম্পন সাঁওতাল পুরুষ-সম্প্রদায়কে
কল্যাণ সূত্রিতে লইয়া গেছে । ক্রিয়ার নাম নাই,
বরং একে-একে তাহাদের মৃত্যু সংবাদ গ্রায়ে
আগিয়া পৌছিতেছে । আরও কিছুদিন পূর্বে
তখনকাল বাণী পাবিত-সাহেব, এই প্রকৃতি-পুলক
অসত্য সাঁওতাল জাতিতে উনার রাজবর্ষে দীক্ষিত
করিয়া সভা এবং লিখিত ক্রিয়ার দ্ব্য উদ্দেশ্যে
একপ্রকার কোর করিয়াই হুইট গৃহবকে আঁবার
হইতে আলোকে টানিয়া লইয়া গেছে । সেই নব-
ময় ভাগ্যবিত্ত পরিবারের বয়স্কদের চরণতলে
দীর্ঘের স্বপ্নাভি এবং আশ্চর্য্যবাহা চিরতরে
ভাঙতি বিয়া এখনও লভ্যতার চরণ সীমার পৌছিতে

পারিবারিক কি না কেব বলিতে পারে না, তবে
লক্ষ্যিত তাহাঃবর্ষই মখে একজন নিভাত কর্মজীবনের
মত পুনরাব এই বনপ্রান্তের লব্ধকৃতীরে করিয়া
স্বাঃ-পরিভাত অবস্থার বাপ করিতেছে মজে ।

তৎকালে নীতল গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভরলী
একটা ঘরের প্রাচ্যে এই নব-পরিভিত অত্যাচারের
লক্ষ একটা 'বাটিয়া' বিয়াইয়া দিয়া করিল, ব'ল,
আমি ডেকে আনিছি ।

পরিবার পরিচ্ছন্ন কৃতীরাবার বিকে ভাড়াইয়া
আগন্তুক করিল,—এটা তোমার নিজের ঘর নাকি ?...
তোমার নাম কি ?

—মাঝার নাম মুক্সী আছে । ই, ইট আমার
ঘর বেটে । আমার আর কেউ নাই ।...

—তবে তুমি বাস কি করে ?

মুক্সী করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কেনে
আদ্যবর্ষে কি বাঃর আনা আছে নাকি ? ঘর
ঘরে পাই, তার ঘরেই পাই ।

—তবে তুমি কল্যাণ-সূত্রিতে চলে না ? দেখানে
সেখনি কত সুখ, কত টাকা, তারি সুখ ।

—না, না, আর কেউ বাধ ত' জাঃ, আমি
যাব নাই । বলিয়া, মুক্সী, লক্ষ্যকে ডাকিবার
লক্ষ ঘরের বাহিরে হইয়া গেল ।

ঘরে প্রান্তীরে বাগাই ছিল না, কারণেই এই
অত্যাচার লভ্যব্যক্তিটিকে দেখিবার লক্ষ দ্ব' একটা
হেলে ছোঁকুয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ।

কিৎকল পরে মুক্সী বাসিতে বাসিতে করিয়া
আসিল ।

লক্ষ্যতে বৃদ্ধ লক্ষ্য ।

অতঃ, এই বাকুট যে পুলিশের লোক নহেন
এবং রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী একটা কল্যাণ-সূত্র
সাঁওতাল একজন বৈতন্যতঃ 'রিফুটার' (Recruit-
ter) মাত্র, সে কথাটা পূর্বা সাজাঃ গোপন করিয়া

পুলিনের পাড়ীরা বড়ো রাখিয়া দোণটী করিল,—
কই মুকুটী, তোদের সর্দার কোথা ?

সর্দার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সমুখ আসিয়া
হাতজোড় করিয়া করিল, এই যে, আমি পা :

বুড় সর্দার তাকাতাকি আগ্রসর হইয়া আসিয়া
বাবু আর হাতটা বরিতে গিয়া বসিয়া উঠিল,—না,
না বাবু, না। লেখি না বাবু। আচ্ছা, উম্মাকে
আমি ডেকে' দিছি। বসিয়া দুই একটা গাছের
নীচে একজন সাঁওতাল বুকের দিকে অঙ্গুনি সজ্জিত
করিয়া ডাকিল,—হুঃমঃ তো ! (এখানে আর)

লোকটা আগিটেছিল, সর্দার করিল, এই যে
সোনা আসছে বাবু,... তুই খেলি নাই যে।
একজনে খেতে দে। আবার কাঁঠালটা ভেঙে দি।

সর্দার কাঁঠালটা ভাঙিতে বলিল। সোনা
কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বাবু বলিল, তোর নামে
ওয়ারেন্ট আছে সোনা। তাকে যেতে হবে।...

—ই বাব। বলিয়া, সোনা খাটের কাছে
বসিল।

বাবু করিল, সর্দার ! এ যে বাব বলছে।

সর্দার পুনী হইয়া বলিল, খেল। উম্মার ঘাঘর
পুনী হা, বাবু। আমরা সে বকব ভাত চাই
বাবু—তুই ত আনিস। ঘর বা পুনী, বরক—
আমরা কিছুই বলব নাই।

বাবু, সোনাকে বলিল, তা'হ'লে তুই এইখানেই
থাক সোনা। আলই তোর রেতে উঠে, আমরা
সঙ্গে যেতে হবে।..... এইখানেই থাক, মুকুনি ?
...তা না'হ'লে বসত রেতে উঠে' বোটা কোথাও
পালাতে পারে।

সর্দার উচ্চকণ্ঠে করিল, কেপেদিস ? বাবেকু
কি ? বুকের কথাটি বলে, আবার আর একটি কাজ
ক'বেকু ? না, না,—তা ক'বেক নাই, তুই খেবে'
দিস।...তা, তুই এইখানেই থাক কেনে সোনা !
মুকুটীর কাছে তো তুই থাকিস ?

সোনা একবার মুকুটীর দিকে পানে তাকাইল।

সে তখন উম্মার দৃষ্টিতে সমুখ বনের দিকে
তাকাইয়া বসিয়াছিল। বনের মাঝার পুর্ণিমার
চাঁদ উঠিয়াছে। বনজল-জুড়িত সিঁদু বাতাসের
সোলাসী আশ্বসে সমগ্র বনানী মাঠানের বড়া
চিনেতেছিল।.....

বাবু বলিল, বল কোথা যে। এক মাস জল খে।

বাবু বুকের পানে তাকাইয়া সর্দার বসিল,—
আবু বা বাবু, খেলি নাই যে !... সুগা ত' আনাখের
হাতে জল খাবি না? বাবু—ওই অধুনা থেকে থেকে
আবু পা।..... বারে সোনা, বাবু লগে যা। তুই ও
বা মুকুটী, একটা বাঁট নিয়ে তুই ও বা বাবু
সঙ্গে।

সোনা ও মুকুটী বাবুক সঙ্গে লইয়া অঙ্গুর
আস্ত্রের পাশে অঙ্গুরি নির্ধেণ করিয়া বলিল, ওই
গাখ' পা, ওইখানে জল খ' ত'।

বাবু বেশিল, বনের ঘাংর একটা স্থান একটু
খানি খুঁড়িয়া গর্ত করিয়া তাহাতে একটু খনি জল
ধরা হইয়াছে। বিশেষ এই যে, সে বজ্র নির্ধন
জলটুকু কখনও শুষ্ক হইয়া যায় না। পাগড় ও
জব্বলের অঙ্গর প্রাপ্ত দিগা যে নবীটা প্রবাহিত হইয়া
গিয়াছে, তাহার দূরত্ব কিছু বেশী বসিয়া ইহাও এই
সময় প'হ'টুকু আধিকার করিয়া দেখিয়াছে। কেমন
করিয়া এই বর্ষের অনভ্যন্তরিত মাটির নীচে এই
অসুপ্তে শুভ জলস্রোতের সন্ধান পাইল, অর্ধ সত্য
বাংলার বাবু তাহা ঠাংর করিতে পারিল না।
সে তখন নিজ কর্ণসিঁদুর আননে বিস্তার হইয়া
পড়িয়াছিল। সে যে কেমন করিয়া নিবেদন বুদ্ধির
জোরে এই গরম বিধানী সাঁওতাল নিগকে ভুগাইয়া
তাঁহাদের স্বাধীন মুক্ত বস্ত্র ছায়েক কদলা-ছুটির
অনিলাভা বন্দী করিতে চিনিয়াছে, এই কথাটা
তাঁহাকে এত বেশী উত্তরা করিয়া তুলিয়াছিল যে,
তাঁহার নিকট আভিকার প্রজ্ঞা-কিংবদন্তি
বনপ্রান্তের পরমার্থ প্রাণধারার ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু
নিজাঙ একটা ভুজ বাগার বসিয়া মনে হইল।

কিহারা পথে দেখা গেল, সোনা ও মুকুতী
কব্জা আরম্ভ করিয়াছে। সোনা বসিবে, হঠাৎ
তাঁহাকে ঘাইতেই হইবে, কারণ এ স্থানটা তাঁহার
আর ভাল লাগিতেছে না।

মুকুতী বসিতেছে, তুই কেনে যাবি ?

এই লইয়া বিবাহের স্তম্ভপাত !

বাসুক নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া সোনা বলিল,
এই ! বাবু আসছে, চূপ কর।

মুকুতী জোর গলায় বলিল, চূপ করলেই হলো
আর কি ! কই, তুই যা দেখি ?

বাবু নিজালা করিল, কি হলো কি রে
তোদের ?

মুকুতী কি বলিতে ঘাইতেছিল, সোনা ভাড়া-
ভাড়া বলিয়া উঠিল, বাবু, বাবু, ই আনাকে বলছে
দুয়ের মেনে যেতে হইবে না।

বাবু বলিল, কেন ? তোদের মননার এত
ভাব কিসের ? সোনা তোর কে হয় রে মুকুতী ?

মুকুতী ঈষৎ হাসিয়া একটা সলজ্জ কটাক হাসিয়া
কহিল, ই রে ! উ আমার কে হয়, সবাইকে বলে
দেখাই। তুর বেশ আসে বাবু !... সোনা আমার
কেউ নয়,—হলো ? তুই উরাকে নিয়ে যাস না
বাবু, তা হ'লে আনাকেও যেতে হইবেক !

জানা বহুভরার শান্তিময় নিষ্কণ্ড নিবাসটুকু
হাতিয়া এই বনবিহগকে যদি অস্ত্র কোথাও ধরী
হইতে হয়, তাহা হইলে সবা হাতধরী এই মুকুতীর
আগে যে কত ধেনী থাকিবে, সে সংখ্যক এই পাখ-
কের অঙ্গোচ্চ হ্রিস বলিয়াই, উত্তরে সে বলিল,
'তুই ও চল। এখানেই চেয়ে চেয়ে শুখে থাকবি।'
অতিমানসী ওকণী কণ্ঠা কাতর কণ্ঠের সুর
জনিয়া উঠিল, ইরে ! বুঝ সুখ ! তাহেই যে তুজু অমন
স্বপ্নের চেহারা... আসি জানি রে জানি, সুখ জানি।
তুদের মেনে উ নেশা খেতে গিয়ে এসেছে, সেই
সেপার টানে ছুটছে। আর কিছু নয় :...

বাবু ক্রমশঃ পাকীয়া বজায় রাখিয়া কহিল

যা যা বল্-নই তো কি না,—ওর নামে ওয়াবেট্
সোনাকে বেতেই হবে। তুইও চল আনাদের
সঙ্গে।

তাই যাব, বলিয়া মুকুতী হু হু করিয়া
চলিয়া গেল।

৩

মোড় জানকী কলশাকুটির একটা খড়ো বাওড়া
ঘরে সোনা, মুকুতী এবং আরও চইজন আলাদা-
ব'জী আশিয়া বাস করিতে লাগিল। বাবী
দর্শন প্রার্থিনী হইয়া যে চইজন সাঁওতাল বংশী
আলাদা ঘাইবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা
যে প্রারম্ভিত হইয়াছে, সে কথা গোপন করিল না।
সোনা ও মুকুতীর কলহ তখনও ঘিটে নাই, কাজেই
এলব দিকে নতর রাখিবার অবসর তাহাদের ছিল
না।

কলশা বসিতে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন
পাতাল পুরী হুড়কের মধ্যে সোনার সহিত কলশা
কাটিতে মুকুতীর বড় অনিচ্ছা হইত। বিবাহান্তর
আর সময় সময়টাই হালি ও গানের কলোঙ্কাসে
মুকুতী তাহাদের বন্দীকীর্ণের অশেষবিধ বসনা
কুলাইয়া রাখিত। তাবিহাছিল, এমনি করিয়াই
কিছু দিন কাটিবে, কিন্তু একথা এক আসর সভ্যর
এই বন-বিহঙ্গের পে মনের জুল ভাঙিয়া গেল।

সেদিন ম্যানেজার সাহেবের বাংলোর পাশে
দিয়া মুকুতী নোকানে সন্ধ্যা করিতে ঘাইতেছিল,
এমন সময় সভ্যর পুত্র অক্ষকরাজের পথের বাকে
একজন হিন্দুস্থানী চাপরাশী তাহার পথরোধ
করিয়া থাড়াইল, কহিল,—চল তু'বে সাহেব
তঁাকেই !

মুকুতী কোন কথা না বলিয়া চাপরাশীর পশ্চাৎ
গাহেবের বাংলোর ভিতর প্রবেশ করিল। চাপরাশী
তাহাকে একটা ককের ভিতর ঢুকাইয়া বিদা করিয়া
পড়িল।

সাহেব মহা খাইয়া রক্তিম নমনে একটা চেয়ারের

পায়ে হেলান দিয়া চুকুট টানিচেহেন। মুক্কা বসিল কি বস্ছিল নাহেব ?

সাধেব মুখে কোন কথা না বলিয়া মুক্কার এক থানা হাত ঘূর্ণ মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

মুক্কা সধিখয়ে বলিল, ই কি, ছাড়... হাতটা টানিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অশ্রুতের মত বলপূর্ণী পত্ত-প্রকৃতি এই ধানবের মুষ্টি শিথিল করিতে পারিল না।

সাধেব আর একটা হাত দিয়া মুক্কাকে তড়াইয়া ধরিতে গেল। মুক্কা আর হির থাকিতে পারিল না। অসম্বন্ধের নিমিত্ত সাধেবের বিরাট উবরের উপর সজোরে এক ঘুনি ঢালাতেই সাধেব বহুপায় চীৎকার করিয়া উঠিল, My God !...

তাহাকে ছাড়িয়া সাধেব পেটে হাত দিয়া তৎক্ষণাৎ চোরে বলিয়া পড়িল।

মুক্কা কাল বিলম্ব না করিয়া ছুটয়া তাহারের খাণ্ডার দিকে চলিয়া গেল।

সোনা বাহিরের উঠানের ধারে দাঁড়াইয়াছিল, মুক্কা তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, চল আর,—চলো আর সোনা এখানে থাকিস্ না।

মুক্কার হঠাৎ একপ ভাব দেখিয়া সোনা একটু বিস্মিত হইয়া কহিল,—কেনে মুক্কা, কেনে বল।

আর। বলিয়া মুক্কা অন্ধকার আঁধারের উপর ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুষ্টির সীমানা ছাড়িয়া বহুদূরে আলিখা মুক্কা বালিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, সোনা, সাধেব আমাকে ছোর করে বসেছিল। আর কোথাও পালাই চল।

সোনা বলিল, লু তুবে। ওই বে বাবের আলো দেখতে গেছিস্ ভই মুষ্টিতে চল। বসিয়া অনতি-দূরে অজুনি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

খাণ্ডার নিকটে কে একজন স্ত্রী দাঁড়াইয়াছিল, মুক্কা জিজ্ঞাসা করিল, ইধানবার সাধেব কেনে বেটে রে ?

লোকটা বলিল, পূণ ভাল সাধেব। কেনে ?...

সোনা বলিল, তুদের লম্বারের কাছে আমাবিকে নিয়ে চ দেখি,—আমরা এইখানে কাল কল।

আর, বলিয়া, লোকটা তাহাবিকে কিয়দূর লইয়া গিয়া সর্দারের খণ্ডা খরটা দেখাইয়া বলিল, ওই ধরে যা।

সর্দার জাতিতে দীওতাল। বলিল, বেশ। কাল থেকে কাল করিস্ তুয়া। আজ আমার ঘরেই থাক। কাল তুহিকে একটু ঘর দিব।

সর্দারের বাড়ীতে এই আগন্তুক অসামান্যের ঘরের স্রষ্ট হইল না।

আগন্তুকের পর মুক্কা বলিল, কিয়দূর সর্দার, আমাবের ছফনার বিরা বিরে বেতে হেৎকু তুবে।

সর্দার সজ্ঞিত জানাটুয়া কহিল, ই বিব। কয়কে ?... কত টাকা খরচ করতে পারবি ?

সোনা বলিল, টাকা কোথা পাব আমরা ?

সর্দার দ্বিগুণ হাসিয়া কহিল, আমি যে বড় পণ্ডীত যে! বেশ, তুং হু'টাকার মদ দিস্ আর আমি কিছু দিব। আট-আনা করে রাখলেই চার বিনে হু'টাকা।... বুক্লে ?

৪

সামান্য একটা স্ত্রী রমনীর হস্তে লাঞ্চিত হইয়া ছোড়ানকার মানোহার সাধেব একেবারে কিষ্ট-প্রাণ হইয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ মুক্কার সজ্ঞান করিবার নিমিত্ত খাণ্ডার চাপাখানী পাঠানো হইল, কিন্তু সে কিরিয়। অসিয়া আনিইল যে তাহারা খাণ্ডা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে।

সাধেব পুঙ্কার ঘোষণা করিল, যে তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকেই বন টাকা বকুনো।

...চার পাঁচদিন পরে এক চাপাখানী আনিয়া সংবাদ দিল যে তাহারা তখনীয় মুষ্টিতে কাল করিতেছে, কিন্তু কোন একারেই আনিতে চার

না। বরং ভাল করিয়া ভাষাবিশেষে আশিষ্টে বলিলে ভাষায় উদ্ধতভাবে বলে যে স্থানঃ মনিলে ম্যানেজার সাহেবকে খুন করিতেও কহু করিবেন না।

সাহেব মন বাইরে হাতপাল এইরাছিল, করিল, আশি নিজেই হাব সেখানে। চন্দ্র তোরা কে বাবি।
‘‘স্তম্ভীর কুঠি সেখানে হইতে মাইল ষানেকের পথ। সাহেব পায়ে হাঁটাই বাহির হইল। স্তম্ভীর লইয়া একজন চাপরাশী সঙ্গে চলিল।

সেদিন দুক্কী ও সোনার বিবাহ-উৎসব।

হাওড়ার প্রায় সমস্ত কুল-কামিন এই আনন্দে যোগ দিয়া নৃত্য-গীতে ও কলহাতে সে স্থানটা সুশ্রুতি করিয়া তুলিয়াছিল। ...সমুখে তাহাদের ম্যানেজার সাহেবের ‘বাংলা’ বাড়ী হইতে একটা বিলাতি কুকুরের অবিলাত চৌকরার ভনিতে পাওয়া যাইতেছিল। এই উৎসব-গীতে-সুখ প্রায়শের মধ্যে কুকুরের বর্কণ চৌকরার নিত্যক বেহুতা শুনাইলেও উপায় নাই।

সাহেবের নিম্নাং ব্যাঘাত হইতেছিল বলিয়া জনৈক বান্দ্যাদা আদিয়া সংবাদ দিল, ওরে সর্দার, তোরা আজকার মতন পান খান্না,—সাহেবের ঘুম হচ্ছে না।

দুক্কী বলিয়া উঠিল, যা রে? আনন্ড সায়েন্ করতি, তাত্ত বস্তুত দিবি নাই, আর সাহেবের কুকুরটা বে চৌকাকে, তার বেলায়?

বান্দ্যাদা বলিল, সাহেবের কুকুর এখন’বার চৌকাবে, তাই বলে’ তোরাও চৌকাবে নাকি?

—ঐ, গানে কব্বি। জুই বন্দা জুর সাহেবকে। বলিয়া দুক্কী ঈষৎ হাসিয়া, বান্দ্যাদার গায়ের উপর এমটা পলাপ ফুলের গুচ্ছ ছুঁড়িয়া দিল।

পল্কাৎ হইতে হঠাৎ দুক্কীর পৃষ্ঠে সজোরে এমটা চাবুক পড়িতেই সে কিরিয়া যেমন, জেড় আনকীর সেই চরিত্ত ম্যানেজার সাহেব আদিয়া গাড়াইয়াছে।

চাবুকের আঘাত বাইরা দুক্কীর সর্কাপ আদিয়া উঠিল। চৌকরার করিয়া করিল,—সোনা, এই সেই সাহেব,—মাত্ ইয়াকে। বনিয়া সমর্পে একটা খুঁশি উচাইয়া দুক্কী সাহেবের বিঃ আঃসর হইল।

ইতিমধ্যে সকলেরই দৃষ্টি সাহেবের উপর পড়িয়াছিল।

সোনা একটা লাঠির সন্ধানে এবিক-ওবিক হাতাইতেছিল। সাহেব তিতাতিত জাব পূত হইয়া দুক্কীর উদ্ধত হইয়ের উপর আর এক বা চাবুক বংইয়া দিল। দুক্কী এইবার প্রাণপণে অগ্রসর হইয়া সাহেবের কুকুর উপর লম্বা করিয়া এক খুঁশি তুলিল, কিন্তু সে আঘাত সাহেবের অঙ্গে বাজিবার পুংকট, সাহেব লকেট হইতে গুলিতয়া পিগলটা বাহির করিয়া দুক্কীর কুকুর উপর ধরিয়া আওয়াস করিয়া দিল। সস্তর আর্ন্তনাদ করিয়া দুক্কী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সাহেবের কলকের কাহিনী আর কখনও প্রসারিত হইবে না আনিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

সোনা একটা লাঠি হাতে লইয়া সাহেবের বিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, সর্দার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিষেধ করিল।

দুক্কী কিংবদন্ত হাত পা ছুঁড়িয়া য়ার উপর ছটফট করিল, পরে রক্ত-রক্তিত বেহে উৎসব ক্ষেত্রের একপার্শ্বে নিষত হইয়া গেল। তাহার শিথিল কবরীভূত রক্ত-পলাশের শুষ্ক ইতস্ততঃ বিকিষ্ট হইয়া উঠানটাকে ‘খু-আখু’ করিয়া তুলিল।

...একে ত’ এই বিবাহ-উৎসবের আনন্দ কল-রং অনিবা ম্যানেজার সাহেবের ঘুম আসিতেছিল না, তাহার উপর অকস্মাৎ একটা ভলি হোড়ার পক্ষে চমকিত হইয়া সাহেব ভাড়াভাড়ি বাংলার বাহিরে আশিতেই যেখিল জরপণে মোড় আনকীর ম্যানেজার-সাহেব সেইমিকে আশিতেছে। পর-প্লয়ের মধ্যে আলাপ আশ্যাদিত হইল, কথাবার্ত্ত

হইল, পরামর্শ হইল এবং আরও যে কত কি হইল তাহা একমাত্র অন্তর্ধ্যাতী জানেন।

এই বখিনী বন-বিবোধীর সূচ্য-লংবাণ শ্রুত্বা বিহু-টারলবু শুনিল কি না বলিতে পারি না। এই অত্যাচার খোচনীর পরিণাম কাহিনী, বনানী-পরিবেষ্টিত গভিন্দী পার হইয়া, ভাষা বহুধরার নিক্ত কোলের

নিরীহ সঁওতাল অধিবাসী সূক্ষ্মর নিকট কোনদিন পৌছিতে পারিবে কিনা জানি না, তবে এই চুচু মাত্র বলিতে পারি যে, পরদিন সন্ধ্যাতে এ লম্বের কোথাও কোন আশ্বাশন দেখা পেন না,—এখান-কার কাক-পক্ষীর নিকটের মুকুদী ও গোলার অকস্মৎ অন্তর্ধ্যানের ইতিহাস অবশেষে রক্ষা পেয়া

রেল-পথে

(ইংরাজী হইতে)

(শ্রীবোধিত লাল বহুদধাগবি, এ)

চক্রেছি রেলের গাড়ী, পাছ-পালা ঘর-বাড়ী
মোদের লিঙ্কনে সব স্রষ্টবৎসে বাধা !
মাঠের উপরে দেখি সারাটা আকাশ এ কি !—
সবগুলি ভাষা নিরে লামে লামে বাধা !

আকাশের সব তারা—পতি পায় পতিবাধা !
রূপালি বশোত যেন নিশীথের বনে !

নীরস ধরারে ছাতি' ক'কে ক'কে দেব পাতি—
যেন সব চলিয়াছে আবারের মনে !

তবে আর কি তাহা না ? গোপা ইন্দুনিভাবনা !
বতই চুচু পাতি, বতবুধ হোক—
মোদের পায়ের নীচে মর্তা লগের' বাধা পিছে,
যেহ তবু লামে আছে ওই বর্ষা-পাক !

নারী

(শ্রীমতাজসুন্দার গুপ্ত)

(চুঃখানিত হইতে)

আমরা দুহনে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু কিম্ব
এক অন্তত দুহর্ত এসে আমাদের বন্ধুত্বের ভোমকে
হঠাৎ ছিন্ন করে দিবে চলে যেন !.....

ভারতের দীর্ঘবন্দর চলে গেছে ;.....প্রায়ে কিরে
এলে শুনুশু, সে অসংব্রতানে পীড়িত। আবারকে
বেধতে চায় !.....

.....তার ঘরে ঢুকুণ্ড। আবার চারিচকের
মিলন হ'ল।.....উঃ, গোপের আক্রমণে তার
চোখেরা এখন হ'বে দিগেছিল যে চেনা যায় না।
জর্জল জরাজীর্ণ বেহাশনাকে নিয়ে সে তখন চুপ
করে বসেছিল। আবারকে দেখে সে তার ক'ল,
জর্জল হাতখানা আবার মিকে নিঃশব্দে বাড়িয়ে
দিলে। আশ্রয়তরে হ'বতে তুলে নিলুনা.....

অনেকজন তার পাশে বসে ছিলুনা। হঠাৎ
মনে হ'ল আর একজন কে যেন আবার হাত
হুটোকে ধরে আছে। মনে হোল যেন আবারের
জ্বলনের দাঁতখানে আর একজন দীর্ঘ, রিট, বেত-
কার নারী বসে আছে। তার আগামদস্তক যেন
একটা লম্বা পোষাকে খোঁড়া। তার গভীর চোপ
হুটো ক্যাকলে হ'বে গিয়েছিল, বহু বিবর্ধ টোটে
হুটো নীরব।.....

বুকপুণ্ড, এই নারীই আমাদের হাত হুটোকে বুক
করে রেখেছে !.....সেই আমাদের তিক-বিলন
করে দিবেছে।

হা,—সেই 'নারী' বুক 'বুক' !.....

করিয়া বলিলেন “আহা, আবারের মধ্যে আবারের Host (নিয়ন্ত্রকর্তা) বয়স অনুসৃতিক হইলেন।”
কক্ষ-মহান তৎকণাৎ বলিয়া উঠিলেন “ইহাতে
মুখের কারণ নাই, কারণ আবারা এতদ্যেই
এক একটি Host অর্থাৎ আবারা এতদ্যেই একটি
একক।”

(২) একবার ত্রিণিতা ও শ্রী স্বাধীনতা বিধেয় ক্রফোর্ডন এক সভায় সভাপতিত্বে বক্তৃতা দিতেছিলেন। বক্তৃতার বেতনভোগে অতিথি ও অধিবাসী ভাষার বেতনভোগের সমান-সংখ্যার প্রকৃতি বিবরণে ভাষাভিষেকের শিক্ষা করিয়া অবশেষে বলিয়া উঠিলেন “যেখানে লোকেরা ‘শ্রীভাষার মানসিক উন্নতি’ লক্ষ্যে এতদূর উদ্যোগ, সেখানে থাকিতে নাই, সেখানে বসে বসে পরিচালনা করা যায় তাই মঙ্গল—” এই বলিয়া লাঠিটা গ্রহণ করিয়া ক্রফোর্ডনকে পদাঘাত পরিচালনা করিয়া গেলেন।



(শ্রীনাথ ঘোষ)

হিম্মেট, বট’ ও ‘বেকন’র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার অগ্রসর ক্রফোর্ডন ও শ্রীনাথ সেকালে ইংরাজী শিক্ষিত বাহাদুরিদের অগ্রগণ্য ছিলেন এবং বঙ্গীয় ক্রফোর্ডন পাল তাঁহাদের দ্বারা ‘দাহিত্যিক জগৎ’ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ডন শ্রীনাথ ও গিরিশচন্দ্র ‘বেকন বেকন’ নামক একখানি ইংরাজী সমাধাঙ্গ প্রকাশিত করিতেন। ছাপাখানা হইতে কিংবদন্তি সমস্ত কনসিটোলার মাঝে গোরাবিশেষের নিবাসন হইতে অধ্যাপিত পাইবার মত তাঁহারা স্বয়ং

মাঝে মাঝে গোরাবিশেষের অগ্রগণ্যে গ্রন্থ ইংরাজী কথিতে কথিতে আনিতে যেন, একবার একজন গোরা দুই হইতে তিনগণের কথোপকথন শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাঁহারা কোন ভাষাভেদ কর্তৃক যেন। ‘বেকন বেকন’ ইংরাজী প্রবর্তক গিরিশচন্দ্র কখনও উক্তসব ইংরাজী প্রবর্তক হইয়াছিলেন যে তিনি গুরুভ্রষ্টের অধীনে জ্ঞানার্থে একটা চাকরী করিয়া যেন। শ্রীনাথ তেজস্বী ব্যক্তিত্ব হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির জুইনসেটরাখানার পদ অধিকৃত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ ইংরাজীভাষার সুপণ্ডিত হইয়া পাল ও বঙ্গ ভাষায় একটু পণ্ডিত।

নিম্নলিখিত প্ৰাতিভা - প্রবর্তক।

শ্রীনাথের কর্তৃত্বের একজন ইংরাজ কথোপকথন যখন গেলেন। শ্রীনাথ ইংরাজী ভাষায় পাল একটা সেই ইংরাজ ভাষায় যেন কথিত তাঁহাদের সহিত ভাষা ভিন্নিতে কথোপকথন করিতে অসমর্থ করিলেন। শ্রীনাথও যেন ইংরাজী ভাষায় না এইরূপ ভাষা করিয়া ভাষা ভিন্নিতে তাঁহাদের প্রবর্তক উত্তম দিতে লাগিলেন। বহুতর কথোপকথন পাল শ্রীনাথের উত্তম ইংরাজী কর্তৃত্বের সেই গুরুত্ব প্রদান করিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া দ্বিগুণে লাগিলেন এবং সেই ইংরাজী সমাধাঙ্গ করিয়া বলিলেন “শ্রীনাথ ঠিক আশাভেদই মত বিতর্ক ইংরাজীতে কথা কথিতে পারেন, তাঁহাদের সহিত একত্র কথিত করিয়া বিতর্কিত কথা কথিবার প্রয়োজন কি?” এই বলিয়া তিনি শ্রীনাথের সহিত বিতর্ক ইংরাজীতে কথোপকথন মূল করিলেন। পূর্বেই ইংরাজী বিতর্ক হইয়া শ্রীনাথের সুবেদন দিকে চাওয়া হইলেন।

সেকালে উক্তিয়া বিভাগে যে সকল তেজস্বী ব্যক্তিত্ব হইতে হইতেন তাঁহাদের উক্তিয়া-ভাষা শিখিতে হইত। উক্তিয়াভাষার অগ্রগণ্য

লোকের সহিত কিছুপ অনর্গল কথাবার্তা করিতে পারেন তাহা একজন দক্ষ বিজ্ঞাবিশারদ নিবিশিষ্ট নবক সন্মুখে পরীক্ষিত হইত। জিনাথকে একজন নবীন ইংরাজ নিবিশিষ্টানের সন্মুখে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। জিনাথের উদ্ভিষাতাচার জ্ঞান সচৌর্চ সীমার আবেছ — প্রদানতঃ পাত্রে বেহাগবের সহিত কথাবার্তা করিয়া সজিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যপ্রিয়ানী নিবিশিষ্টান পরীক্ষক মহাশয়ের নিকট পরীক্ষা দিতে তিনি একটুও স্ফুর্জিত হইলেন না। পরীক্ষক মহাশয় এসজন উড়ে বেহাগকে ডাকাইয়া জিনাথকে তাহার সহিত কথা করিতে বলিলেন। জিনাথ সেই বেহাগকে গাশালালি দিয়া দুই চারিটা কথা বলিলেন। ইহাতে সে

অমানক হাসিয়া পেল। সে তাঁৎকার করিয়া অনর্গল বক্তব্য ঘাইতে লাগিল। জিনাথ মুহুঃ মুহুঃ চাপেন আর একটা করিয়া গাশালালি মুচক কথা বলেন। উদ্ভিষাতাবাদী উত্তঃোত্তর উত্তেজিত হইয়া উঠিত লাগিল। সাহেব পরীক্ষক মনে করিলেন জিনাথ বেশ উদ্ভিষাতা আছেন, তাহা না হইলে একজন উদ্ভিষা বেহাগের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। তিনি জঁহাতিপকে নিয়ত করিয়া জিনাথকে উদ্ভিষাতাবাদীজ্ঞানের প্রশংসাপত্র নিবিয়া বিলেন। জিনাথ বলেবের বহুদিন ডেপুটি কঃনেটঃর কার্য করিয়াছিলেন এবং উদ্ভিষাতাবাদ জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

টিকটিকির বিবাহে

(নক্সা)

(ঐকম্যেন্দ্রে দ্বিত)

সে আশ্ব অনেকদিনের কথা। তখন আশ্বদের গ্রামে উচ্চ বিজ্ঞাপন ছিল না। প্রত্যহ ১৩টার পূর্বে আহায়াদি সারিয়া টেপনে বাইয়া ট্রেণ ঘরিতে হইত এবং আশ্বদের টেপনের ২৩টা টেপনের পর জোয়ার সম্বর টেপনে নাখিয়া সেইখানের বিজ্ঞাপনঃ আশ্বদের ও নিকটবর্তী গ্রাম সম্বন্ধে বাসঃ পড়িতে আশিত। নিকটে আর কোন উচ্চ বিজ্ঞাপন ছিল না। প্রত্যহ যে সম্বর টেপনে বাসঃ, সেটঃনও টিক সেই সম্বর টেপনে আশিয়া উপঃবৃত হইলান। অত্রদিন টেপনে আশ্বদের সম্বরাদীঃ বা সম্বর বিজ্ঞাপনঃে বাইবার বাহ্যবের প্রয়োজন, তাহারা ব্যতীত বহু একটা কেহ আশিত

না। কিন্তু সেদিন চেনা ও অচেনা বহু লোকের সমাগম বেবিশাল। ট্রেণ আশিতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। দুই একজনকে বিজ্ঞাপন করিয়া জানিলায় যে সেদিন কোন এক ‘সিদ্ধবাক’ গুরু আশ্বাদারী মহাশয় পুজুবেগ আশিবার কথা, তাহাতেই সংবন্ধনা করিবার এক এই জনতার সন্ধ্যাষণ।

আশ্বদের ট্রেণ আশিবার কিছু পূর্বে অপর দিকের ট্রেণ আশিয়া ঝড়াইল এবং তাহাতেই সিদ্ধবাক পুঙ্খ আশিলেন। ট্রেণ ঝড়াইয়াবাহ সকলেই অখান স্রোতঃ কাসরাত বিকে ছুটিল। আশিত কোতঃবলং বশবর্তী হইয়া সেইখানে দিয়া

মেঘিলাৰ সপাপুত্ৰৰ মধ্যম স্ত্ৰেণীৰ বহুজীৱী বাঁড়াইয়া আহেহে। তীহাৰ মূখে মৃতপুত্ৰ হালি কপিত একোশ পাৰিতোছে। একে কপিত মিলাইয়া ৰাইহেতে। তীহাৰ দিবা বা জন্তুৱা সকলে সেই ধৰ্ম্মাৰ সাধনে সটান শুইয়া পড়িয়া। ভিনখন কৰিয়েছে। একটু পৰে একজন অগ্ৰণৰ হইবা শুক ব'বৰ পদাৰ একপাতি ফুলেৰ হালি বোলাইয়া থিলেন। একে পৰায়েই শুকবেৰ পাকী হইতে অন্তৰণ কৰিলেন। শুকবেৰে পায়ের বৰ্ণ পোড়া মাতীৰ মত, বহল আশ্বাৰ চমিৰ, পায়ৈ পেকৰা যন্ত্ৰেয় হাতকটী পিন্ধেৰ পাৰ্জাবী ও পেকৰা হুক বহু। চেহাৰাৰ বা পৰিচ্ছবে বিশেষ কোন বিশেষৰ দেখা পেল না। বেজাৰ ভীত বলিবা শুকবেৰ অগ্ৰণৰ হইতে পাৰিতোহেন না। সকলেই মনোৱজনে ভটহ।

আমাৰেৰ টেপেৰ আঁৰ সময় হইয়াছে বলিবা অগণ পায়ৈ ৰাইহেতছিলিবা, এখন সময় আমাৰেৰ একজন সপপাতী আসিয়া খবৰ দিল যে যঠাং কি কাৰণে (এজন হঠাৎ কাৰণ নহোমধ্যে হয় বলিবা আমাৰেৰ বা সন্তা হইবা দিয়াছিল) আমাৰেৰ টেপনে ইন্দ্ৰিন বাৰাপ হইবা দিয়াছে। একে দটীহুৱেৰ আগে আৰ পাকী ৰাইবাৰ কোন আনা নাই। অসত্য। সেইদিনকাৰ মত বিভালয়ে ৰাইবাৰ আগাৰ লগাৰালি দিবা পুনৰাৰ শুকবেৰ বৰ্ণনে ৰাইলাগ। শুকবেৰে শুকবেৰ তখন সবেমাজ টেপন হইতে বহিৰ্গত হইবা নিকটেই একটী গ্ৰাণে কোন শিখোৰ বাকী পদন্ত্ৰেই ৰাইহেতহেন। একে পন্দাৰগানী লোকেৰা শুকবেৰ যে স্থানেৰ উপৰ দিবা ৰাইহেতহেন, তথাকার মতী হইবা কেহ বা মন্তক বা দিচ্ছাতে ল্পৰ কৰিতেহেন। একে কেহ বা আনদাভিগৰে দানিকাৰ উপৰ ভিলক কাটিতে-হেন। আনদাও শুকবেৰকে অসুপৰণ কৰিবা সেই গ্ৰাণে উপস্থিত হইলাগ।

শুকবেৰ গৃহে পৌছিবা অম্বৰে কিছুজন বিজ্ঞা-

য়েৰ পৰ বাহিৰে আসিয়া। বহা থিলেন। একে আনি ভাল বিভালেৰ ডামডাৰ আনৰ পাতিৰা তাহাতে বসিলেন। তখন তীহাৰ একজন শেৰক —যোতৰাণে শুকবেৰেৰ নিকট কোনও বিশেষ কিছু বলিবাৰ মত তীহাৰ মত পিকা বৰিলেন। একে শুকবেৰ দেখককে সেই প্ৰগৰ বোলা। কৰিত নিষেধ কৰিলেন। দেখক কিত নাছোড়গা-বা। শুকবেৰেৰ মেঘিলাৰ তাহাতে কহ বান না। দেখক বহই আগ্ৰহ একোশ কহে, শুকবেৰেৰ তাহাতে ততোমিক বিয়ত হইতে বসেন। তখন বানীৰ আৰও বহই চান্দিবন দেখকৰ সবে দেখাবান কৰিলেন। কাৰে কাৰেই শুকবেৰ যেন নিতান্ত অমিচ্ছ। সবেও কিছু অম্বৰেৰেই পতিত হত থিলেন।

তখন সেই দিবা ৰাঁহা বসিলেন, তাহা হইতে বহা পেল যে শুকবেৰ মাজ টেপ চাচিগাৰ কিছু পূৰ্বে টেপনে আসিয়াছিলেন। কোনও একটা পৰ্ণ উপলক্ষে পেনিন পাড়াতে বৈৰি ভিত্ত হইয়া-ছিল। আৰ পাড়াতেই আৰগা ছিল না। কিন্তু একটী কামৰা একেবাৰেই থালি। সেটা সাৰেব-বেৰ লগ। অস্ত্ৰবানে সুবিধাবত আৰগা না পাৰয়াৰ শুকবেৰ সদিবা; সেইখানেই উঠিল। অম্বৰে একজন বেনীৰ টিকিট পৰিবৰ্ণক বাঁড়াইয়া-ছিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া শুকবেৰকে এই পাড়াতে (উৰা শুখ সাৰেববেৰ লগ বলিবা) উঠিতে বাৰণ কৰে। শুকবেৰ তাহাকে কৰ্ণণ বাক্যে কিছু বলিলে সে সাৰেৰ টেপন মাইবাৰে ডাকিতে বাৰ। এখন সময় একজন শুকবেৰ অপেক্ষাত তেৰ বৈৰি নিকট কাল বৰ্ণে। একে বোধ হয় জাত দিগবেৰ আৰও অৰণ। সেম সাৰে। আসিয়া শুকবেৰকে এই পাড়া হইতে নামিতে বনে। একে সেই সময়ই সেই দেখাৰ টিকিট পৰিবৰ্ণক ও সাৰেব টেপন মাইবাৰে লইবা দেখালে আসিয়া পড়ে। সাৰেব শুকবেৰকে নামিতে বলিলে শুকবেৰ

উত্তর যেন যে তাঁহাকে নাহিতে বলা সাহেবের লক্ষে বিশেষ অভ্যাস। কারণ এরূপ করিলে সাহেবের বেশীও বর্ণের উপর ভিত্তি দেওয়া হয়। মহামান্য সরকার বাহাদুরও বর্ণের বৈশিষ্ট্য চক্ষু করেন, এরূপ ক্ষেপে সাহেব যে কোন সাহেবে এইরূপ ধর্ম বিতর্ক করিয়া করিতে প্রেরণ পাইতেছেন, তাহা সেই জগৎমানই জানেন। শুকদেব করিয়া আদিয়া এ বিষয়ে সাহেবের উপরিস্থ কণ্ঠচাক্ষুরিকে জানাইবেন বাল্যে গুরুপ্রদর্শনও করেন। কিন্তু সাহেব তাহাতে করণশক্তি না করিয়া বলিলেন যে গাড়ী ছাড়িয়া আর বেশী বিলম্ব নাই, অতএব শুকদেব আসনা হইতে না নাহিলে তিনি পুলিশ ডাকিয়া শুকদেবকে নানাইয়া দিবে। তখন শুকদেব সাহেবের সন্নিহিত ঘরনা না করিয়া তাঁহার উপর এত চাল চাঙ্গিলেন। তাঁহার লক্ষে যে ছোট্ট চাঁদ-বাগ ছিল, তাহা পুলিশ একটা পুতান হেঁচা ও মহলা মেঘেবের (যাহা উত্তর পশ্চিমে চলে) পারদান্য বাধির করিয়া কাপড়ের উপরেই টানিয়া টানিয়া পরিতে লাগিলেন। পারদান্যটা কিছু ছোট ছিল। টানটানিতে প্রায় আধ কোমর অধিক যখন উঠিয়াছে, তখন সাহেব শুকদেবকে লিখিয়া করিলেন, “ও কি করিতেছ?” শুকদেব গভীর ভাবে জবাব দিলেন “I am trying to become European.” (আমি সাহেব হইবার চেষ্টা করিতেছি)। উত্তর শুনিয়া সাহেব হাসিয়া খানিক-কম নিকতর হইয়া চাঙ্গিলেন, তার পর যেন সাহেবকে বলিলেন, যে শুকদেব যখন সাহেবের পোষাক পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহারই আর নানাইয়া বিহার ক্ষমতা তাঁহার নাই। কারণ কলিকাতার বোড়-মৌড়ের মাঠেও অনেকে ওরূপ পোষাকে সম্মিত বাঙ্গালী এবং বিশেষ করিয়া বাড়ারামৌড়ীও আসে এবং চুক্তিতে পায়। অতএব যেন সাহেবকে অল্প স্থান-সুবিধা দিতে বলিয়া টেননের সাহেব চলিয়া গেলেন। গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

উপস্থিত লক্ষ্যে এই কথা শুনিয়া একাকী শুকদেবের ঘরঘের প্রবেশ্য করিতে লাগিল এবং এই বলিয়া সমস্তের পরিচালনা করিতে লাগিল, “বাহবে, যেনের সকল লোক যদি শুকদেবের মত সংসারী হইত, তাহা হইলে সাহেবের এ বেশ হইতে তাড়ানিয়া দেওয়া অসম্ভব সম্ভব হইত। তাহার মধ্যে একজন নাপিত বিয়া বলিয়া উদ্ভিগ যে সাহেব যখন শুকদেবকে পুলিশ ডাকিয়া নানাইয়া বিহার প্রেরণ করে তখন তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে সাহেবকে বেশ করিয়া চুকাইয়া শুসাইয়া দেয় এবং নানাইয়া দেয় যে শুকদেবের জম্মাটা পুলিশই ছিলেন। কিন্তু শুকদেব নিজে উপস্থিত থাকায় তাহা আর হইয়া উঠিল না। পরে শুনিলাম যে শুকদেবের পিতাঠাকুর নাকি পুলিশের জমাদার সৈয়দ জীব ছিলেন এবং যোর যতগানে সেবে কোনও ইতর রমনী শ্রমোতে আবেশ প্রবেশ করিতে করিতে পরলোক লাভ করেন। কালে-কালেই শুকদেব (যেহ হয় reactionএর ফল) পুলিশের উপর ভয়ানক চটা এবং তাঁহার পিতাও যে পুলিশ ছিলেন তাহাও সমস্ত লম্বা স্থান বিশেষে জীবিত পাইলেই পরোক্ষভাবে অব্যাকার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কোথাও বা লক্ষ্য হন এবং যেখানে যাহা পড়েন তাহার ঠাট্টা করিতেছিলেন যদিও হাসিয়া উড়াইয়া বিয়া তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য অল্প কথার অবতারণা করিতেন। শুনা যায় যে শুকদেব যখন নাকি পূর্বে কোন অফিসের জবাবে বা এরূপ কোন একটা বোকাবোকা লোকের বেতনে জায়া করিতেন, এবং তথা হইতে কিছু মোটা রক্তের টাকা আদ্য-সংপূর্ণক কিছুদিন গা ঢাকা যেন। পরে হঠাৎ শুকদেবরূপে আবির্ভূত হয় এবং অত্যাবিধ দেই অকপিত চণ্ডিতে। অতএব এই হুঁ। কথা শুকদেবের লক্ষ্যের রটান। কালে-কালেই ইহার লক্ষ্য দিখা দশকে আদ্য লাভী নহি।

সেইদিন সেইখানে আরও কিছুকণ থাকিয়া শুকনোবের আরও দু চারিটা কীটিকলাপ বা পঙ্ক-ককির কথা শুনিয়া বাড়ী ফিরিয়া।

শুকনোবের নামের নাকি কিছু বিশেষ ছিল। তাঁহাকে হঠাৎ ডেনা বাইত না বলিয়া কেহ 'বর্ণ চোরা আদ', কেহ বা 'বর্ণ লতর' ইত্যাদি নামে ডিরাছিল। আবার কেহ কেহ (শুকনোব কিছু সেটা রকমের টাক্য লইয়া অন্তর্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া) 'মোটা' বলিয়া ডাকিত। ঠিক নাম (বোধ হয় এখনও সেই নামে গুয়ায়েস্ট আছে বলিয়া) এখনও জানা যায় নাই। এমন কি তাঁহার অন্ত-রক্ম শিবোক্তাও জানে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তাঁহার পর দুই তিন বৎসর কাটায়া গিয়াছে। একদিন হঠাৎ কোন বন্ধুর সেই শুকনোব লগ্নে বলিলেন যে লোক পরস্পার অন্য বাইতেছে যে সেই শুকনোব কিছুদিন হইতে সিঙাঙ্ক হইয়াছেন। এবং তিনি বাহার লগ্নে যাঁহা কিছু বলিতেছেন তাহাই সত্য সত্যে বলিতেছে। এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে আবার খেঁচিয়ার ইচ্ছা হইল এবং একদিন আনিও আবার এক বন্ধু শুকনোবকে দর্শন করিবার লগ্ন তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইল। তখন বেলা প্রায় বিয়সর। শুকনোব তাঁহার পুত্রার ঘরের ঘর ঘুলে একখানি বৃগ চর্মের আলনে বসিয়াছেন। তাঁহারই ঈশ্বরের বাণী হইতে প্রকাশ যে, ওই চর্মে বসিয়া তিনি অতীত দেবতাকে ধ্যানমগ্ন হইয়া লগ্নে করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পর হইতেই সিঙাঙ্ক হইয়াছেন।

আমরা বাইহা প্রণামাদি করিবার পর তিনি আশ্রমের স্থল প্রদর্শন করিলেন। আশ্রম প্রণামটা করিতে ভক্ত ইচ্ছা ছিল না, কারণ পূর্বে যেমন এক বাহ শুনিয়াছিলাম যে তিনি টাঙাল বা উহারই একটা কাছাকাছি জাতীয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী রূপার তাঁহার ভক্তের পরিচয়টা বা খবরটা রাখা

আর কেহ প্রয়োজনীয়তা গণ্য করে না, এবং ব্রাহ্মণের জাতি সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেও কেহ পছন্দ ইচ্ছা রাখ না। অতএব আনিও নয়া বন্ধুর মধ্যে তাঁহাকে সম্মান না দেখান তত্ত্বতার বহির্ভূত হইলেও হইতে পারে বলিয়া আর বিমর্শিত না করিয়া আনিও বন্ধু সঙ্গে স্বাভাবিক অভিবাদন করিয়াছিলেন।

কিছুকণ পরে তিনি ঈশ্বর হাতে। সঠিক জানাইলেন যে আর তাঁহার ঘরের টিকটিকির বিবাহ হইবে। তাঁহার ঘরে একটা টিকটিকি ছিল এবং সেটা একেলা দেয়ালের গায়ে পুত্রিা বেড়াইত। তাহার কোড়া ছিল না। সে প্রায়ই টিকটিকি কবিত্ত এবং সুবোধ্য 'পাইলেই গোড়া' মাকড় খরিয়া বাইত। কখনও শুকনোবের পুত্রার উপকরণের উপর কেহ কাঁড়ে না থাকিলে ঘরটুকু সন্তপ্ত তাপ বলাইত। কিন্তু শুকনোব তাহাতে বিরক্ত হইতেন না। বকে মাঝে মাঝে এক আদ্য ফুটা ফল দুঃর টিকটিকির উদ্দেশ্যে ফেলিয়া দিতেন এবং তাহাতে নামিয়া থাকিত যেখিনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শুকনোবের এইরূপ লগ্নজীব্য সমগ্রা দেখিয়া শিবোক্তা মোহিত হইতেন। সন্নিহীন টিকটিকিটার লগ্ন শুকনোব নাকি প্রায় পতীর রূপে প্রকাশ করিতেন। এবং প্রায় প্রত্যাহই শিবোক্তার সম্মুখে আঁক কাটা। পুত্রিা বলিতেন, না, আশ্রম টিকটিকিটার বিবাহের কোন সম্ভাবনা নাই। আনিও দুই একদিন বলিয়া বলিতেন আর টিকটিকিটার ঠিক বিবাহ হইবে কিন্তু আনিককণ এনির্কী ওদিক দূর বিকল্প করিতে করিতে লোভমুক্ত শিবোক্তাকে বলিতেন, হইল না, হইল না আর আর বিবাহ হইল না।

আজ আমরা বাইবার লগ্ন, তিনি হঠাৎ পান-বেধানী ভাবে বলিয়া বলিলেন, আর এই বিবাহ হইবেই। অমনিই তাঁহার শিবোক্তার মধ্যে একটা সাদা পড়িয়া গেল। শুকনোবের অতিপ্রাণাঙ্গণের

কেহ বাগার তেহ বা জুপ ইত্যাদির ভোগোড়ে ব্যস্ত হইলেন। গুরুদেবের টিকটিকির আর বিবাহ এবং গুরুদেব সিদ্ধবাক হইয়া গেই কথা আজ সকলকে জানাইয়া চমৎকৃত করিয়াছেন। স্বয়ং গুরুদেব শৌরহিত্য করিবে। আর হাং কোথা! গুরুদেব নিজে পটবস্ত্র পরিধান করিয়া আশনার খোল ও বৃহদায়তন তহুটীকে চন্দন চর্চিত করিলেন। মাসলিক অমৃতান সম্বন্ধে চলিতে লাগিল। বেধিতে বেধিতে বিবাহের আর সকল অমৃতানই সম্পন্ন হইয়া আসিল, কিন্তু পাত্রের এখনও কোন উদ্দেশ্য নাই। সকলেই যেন পাত্রী অত্যাধে ভাবিত হইয়াছে, শুধু সিদ্ধবাকমীর আশ্বাসে একেবারে নিরাশ হইয়া নাই। 'যেনা হটায় মধ্যে বিবাহ হইবার কথা। হটা বাধিতে সম্ভার থাকে আচ্ছ। এমন সময় হুতে দেখা যেন যে একজন লোক বতকগুলি মাহুর মাথা লইয়া সামনের রক্তা বিয়া বাইতেছে। একজন মাহুর বিকেটাকে ডাকিবার প্রয়াস করিল, আর একজন সঙ্গে লগে প্রতিবাদ করিয়া

উঠিল। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি তাহাব কথার কর্পণত না করিয়া মাহুরগালাকে ডাকিয়া আনিয়া। মাহুরগালা আনিয়া যেমন মাহুরের বস্ত্রাটী মাথা-ইয়াতে, অমনি গুরুদেবের টিকটিকটা লুপ্ত করিল। সেই মুহূর্ত্তে মাহুরের বস্ত্র হইতে অপর একটা টিকটিক লাকাইয়া পড়িল এবং এদিক তদিক চাহিয়া দেখিতেই গুরুদেবের টিকটিক পুনরায় লুপ্ত করিল। তখন মাহুরগালাই টিকটিক দৌড়িয়া বাই। গুরুদেবের টিকটিকির সঙ্গে মিশিল এবং ভ্রমণে একসঙ্গে গুরুদেবের টিকটিকির বাগার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। গুরুদেব তখনই লোক বাধাইলেন এবং ত্রাণোক্তেরা ছলুধনি করিলেন। পিয়ার বগ মধ্যমধ্যে মৃত্যু করিতে লাগিল 'নয় সিদ্ধ বাকমীর অর্ধ' ধ্বনিতে সমস্ত প্রায় সচকিত হইয়া উঠিল। আর আমরা বাসিকরণ গোকার মত মিশ্রবে বসিয়া বাসিরা চরম সুখকরিত স্মৃতি লইয়া গৃহ করিগাম।

শকাব্দ

(খ্রিস্টাব্দে যোগ দিও)

প্রচলিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শকাব্দের প্রচলন হয়। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক এ মতটা প্রাক্ত বসিয়া নির্দেশ করেন।

আমরা উক্ত পক্ষের মতবাদগুলি আশেচনা করিয়া সত্যো উপনীত হইবার একটু চেষ্টা করিব। পাল্লভাট্টা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে কাটিহার ও উজ্জয়িনী প্রদেশের শক নৃপতিবর্গ

এই যুগের স্রষ্টাকর্তা। ১২১০ সালের "হরেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটিজ্ জার্নেল" নামক পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় ডাক্তার স্কাট বলেন যে সুবিখ্যাত শকরাজ মহেশ্বরি এই যুগ প্রবর্তন করেন। তিনি ৭৮ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১২৫ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত ৪৭ বৎসর রাজত্ব করেন। অপর পক্ষে আটা মেনীষ ঐতিহাসিকগণ বলেন, দাক্ষিণাত্যের শত বাহন নৃপতিগণ শক নামক প্রথম পরাক্রান্ত বিদেশীয় আভিক

পত্রাঙ্কিত করিয়া “শালিবাচন শত্ৰু” নামক এই যুগের প্রচলন করেন। ভারতের বহু স্থানে আজিও এই মত প্রচলিত। সম্ভ্রান্ত স্থবিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ রাকবানী তাঁহার “ধন্তবরী” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শত্ৰু নামক যুগটি এই যুগের প্রাবর্তক। শত্ৰু কথাটি বিশেষ্য নহে, মধ্যপ্রাচ্যের ‘শত্ৰু’ হইতে ইহার উৎপত্তি হইরাছে বলিয়া অনেক মনীষী অনুমান করেন, এবং এই ‘শত্ৰু’র নামের নানিকের অর্থ্যর খোঁজিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্বপ্রায়ে অধ্যাপক রামবাবুর নূতন মতটি আন্দোলন করা যাইক। বর্তমান প্রচলিত মতের বিক্ষেপে অধ্যাপকের বিজ্ঞতা এই যে শত্ৰু প্রাচ্যিক পত্রাঙ্কিত করিয়া এই যুগের নাম ‘শত্ৰু’ হইল কেন? ইহার উত্তরে উপনিষদ অধ্যাপক মহাশয় বলেন, শতবাহন যুগতিবর্ণের মধ্যে শত্ৰু নামক এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহারই নামে এই যুগের নাম শত্ৰু হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক রামবাবু, এই যুগতির রাজ্যকাল অথবা নানিকা অর্থ্যর খোঁজিত নিগূঢ় কোনও উল্লেখ করেন নাই; অথবা পুরাণাদিতেও যে শত্ৰু কোনও উল্লেখ আছে তাহাও অধ্যাপিককে বলান নাই। শতবাহন যুগতিবর্ণের নামাবলী অনুসন্ধান করিলে আশ্চর্য্য বসেন নামক কয়েক যুগতির উল্লেখ দেখিতে পাই। স্থবিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথ তাঁহার Early History of India নামক গ্রন্থে বাহু ও বংশসূত্রপত্র মত শতবাহন যুগতিবর্ণের নাম ও নামকরণের তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকার আশ্রয় লিখিত যুগতি “শিবস্কর মধুরীপুত্র শত্ৰুসেনের” নাম দেখিতে পাই। তিনি ৮৫ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পূর্বে বাহুর নামক করিয়াছিলেন তাঁহারই এক বংশের অধিক রাজত্ব করেন নাই। কিন্তু এই যুগতি ২৮ বৎসরকাল রাজ্যশালন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শিবস্কর

এক খোঁজ দ্বিতীয় পুত্রবরী দ্বিতীয় ভারতের স্মরণিক যুগতি ছিলেন। এই শত্ৰুসেনের নাম দ্বি নানিকা। অর্থ্যর লিখিত থাকে তাহা হইলে তাঁহার নামই যে যুগের স্মৃতি হইয়াছিল তাহা অনুমান করিতে পারা যায় অথ। এতদ্বারা হইতে পায়ে যে শত্ৰুসেন কিছুকাল পূর্বেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছিলেন, কেন না, শিবস্কর তালিকায রামাবের রাজ্যকালের অধিকাংশ স্থানেই অনুমানিক। বাহা ৮৫ খৃঃ, অধ্যাপক রামবাবুর একটা কথা আশ্রয় লইয়া মনীষীরা বলিয়া যেন করি। তিনি লিখিয়াছেন যে যদি এই যুগ অর্থ্যর হিন্দু যুগটি কর্তৃক প্রচলিত না হইত তাহা হইলে হিন্দুযুগের বর্ণনায় প্রকৃতিত ইহা কখনই ব্যবহৃত হইত না।

কিন্তু অধ্যাপক রামবাবুর মতের বিক্ষেপে আশ্রয় কতগুলি কারণ দেখিতে পাই, যার কারণে তাঁহার মত আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি না। প্রথমতঃ সম্ভ্রান্ত গ্রন্থে এবং বিবিধ প্রকার লিপিতে আশ্রয় শত্ৰুসেনের যুগতিবর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু শত্ৰু নামক কোনও রাজার নাম অনুসন্ধান করিয়া আশ্রয় পাই না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মাগধ ও শত্ৰুসেনের যুগতিবর্ণের যুগের উল্লেখ আছে, কিন্তু ই হই বংশের যুগ প্রতিষ্ঠাতা যুগতির কোনও নাম আশ্রয় পর্যন্তকাল পুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। শত্ৰু বংশের যুগতিবর্ণ এই যুগ মানিয়া গণিতেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার ইহার প্রাবর্তক যে কে তাহা নির্ণয় করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। বহু, বৎসর পূর্বে হইতে ৮-১০০০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত এ বিষয়ের কোনরূপ মীমাংসার চেষ্টাও হয় নাই। আশ্রয়র যেন হয় যে কোনও শত্ৰুসেন নামক যুগতিবর্ণের এই যুগের স্মৃতি হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, দাক্ষিণাত্যের শতবাহন যুগতিবর্ণ এই যুগের নাম তাঁহারই কোনও যুগের ব্যবহার করেন নাই। যদি মধুরীপুত্র শত্ৰুসেন এই যুগ প্রতিষ্ঠা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার বংশবংশন নিশ্চয়ই

এই দুপ তাঁরাবের সুপ্রাণিপিতে ব্যবহার করিতেন। আবার, শকসেন কর্তৃক শকবিশেষ পরাক্রমের কথাও আমরা কোনও নতুন নতুন নিপিতে দেখিতে পাই না। বিতর্ক বিশিষ্টাঙ্গ নৌদৌলপুত্র কর্তৃক শকরাজ নইলপের পরাক্রম কথা নাগিকের জ্ঞান আভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অপর একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় এই যে দৌলদাপুত্রের মাতা বলজী পুত্রের জন্মোত্তরে প্রবাসী করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার স্বামীকে (ইংলান্ডে অধ্যাপক নগরীর দুপ প্রবর্তক বলিতহেন) পরিত্যাগ বা দুপ প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কোনও উল্লেখ করেন নাই। এই দুইটি কারণে আমাদের মনে হয় যে এই দুপ শকসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হই নাই।

এখন অধ্যাপক মহাশয়ের মত পরিচয়্য করিয়া প্রোচ ও পাক্‌তা পণ্ডিতগণের মতামত দেখা যাউক। তাঁরাও বলেন যে শকসেনাবর্গ কাটাচার ও উজ্জয়িনীতে রাহব করিতেন এবং ইংলান্ড এই দুপের প্রচলন করেন। এই সমুদয় নৃপতিগণ তাঁরাবের সুপ্রাণ শক্‌ ব্যবহার করিতেন এবং সুপ্রাণিগ এক পুরাতন। প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অঙ্গুপকান করিলে দেখিত পাওয়া যায় যে শক্‌ শকরাজকর্তৃক কর্তৃত্ব প্রচলিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রমাণ সুপ্রাণি অঙ্গুপকান করিয়া দেখিলে আমাদের মনে হয় ৭৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ এই সময়ের পূর্বে এক বঙ্গের পূর্বেই শক্‌ব্যের উপস্থিতি হয়।

কিন্তু কাহার দ্বারা এবং কি ঘটনা উপলক্ষে এই দুপের প্রচলন হইয়াছিল সে সম্বন্ধে এখনও সম্যক জানিবার আশা উপনীত হইতে পারি নাই, পূর্বেই আমরা ভাক্‌চর স্ট্রোটের কথা বলিয়াছি। তিনি বলেন যে, নগর নামক নৃপতি কর্তৃক এই নব দুপ প্রবর্তিত হয়। কিন্তু, কোথা হইতে ইহা অগত হইলেন, তাহা কোনও উল্লেখ তিনি করেন নাই। তদুপরি শি. ইংলার প্রত্নতত্ত্ব বলেন যে নগর বিতর্কীয়া প্রাচ্যে রাহব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি

কখনই এই দুপ প্রচলন করিতে পারেন না। নগরের পরবর্তী নৃপতি নতন ও কর্তব্য বিতর্কীয়া প্রাচ্যের দেখাদে রাহব করেন। ৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁরাবের মধ্যে কেহ জীবিত ছিলেন না। হইতে পারে যে শকসেন উজ্জয়িনীতে বিজয়বিজয়ের ব্যপকরণের উদ্দেশ্যে রাহব করিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দে যত নতক মালবের অধীশ্বরের এবং সমস্ত নতক প্রবর্তের দ্বারা এবং যৌধ্য ও গুপ্ত বঙ্গের অধিকারি দ্বারা ছিল না। বিজয়বিজয় উজ্জয়িনীতে যে শক্তির বীজ ৭৭ পূর্বে খৃষ্টাব্দে মৌল্য করিয়াছিলেন, তাহা কালে একত্রে করিয়া ৭৮ খৃঃ অব্দে সমুদ্রে উৎখা হইয়া যায়। শকসেন সম্ভবতঃ এই কারণে দুর্গম পথ নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া নব দুপ প্রবর্তন করেন, কিন্তু দ্বারা হটক, ইংলার আশ্রয়ের দ্বারা দ্বারা। বিষয়টি যে সমস্ত রহস্যময় আশ্রয় তাহাতে অঙ্গু-মাত্র সম্ভব নাই।

পরিশেষে আমরা আর একটি মতের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই মতটি নতন নহে। শক্‌ব্য বিজয়বিজয় কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই বিজয়বিজয় বর্ষপ্রাণ হিন্দুবিষয়ের প্রধান দ্বারা হইলেন। তিনি শকসেনকে বিভাজিত করিয়া শক্‌ব্যের প্রচলন করেন। কিন্তু যদিও এই মতটিকে সাধারণ লোকে আশ্রিত বিবাস করে, তথাপি ইহা প্রাক্‌ হইতে পারে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন হিন্দু ভৌগোলিক প্রাচ্য শক্‌ব্যের কথা আছে। “শকসেনগণ” এবং “শক সেনগণ” এই দুইটি শব্দ উল্লেখ ভৌগোলিক দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন এই ভৌগোলিক প্রাচ্য সম্বন্ধে হইয়াছিল তাহা বিজয় হইতে পারে? ভাক্‌চর স্ট্রোট ইংলার উত্তরে বলেন যে ৭০-৮০ খৃঃ অব্দে হিন্দু বা জৌকরের ভৌগোলিক প্রাচ্য করিয়া তাঁরাবের ভৌগোলিক প্রচলন করেন। ভাক্‌চর স্ট্রোটের কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, ইংলার কতকটা যে সম্ভ

নিহিত আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুভ্যোক্তিধর বয়স আশ্রয়িতাদের নিকট হইতে পৃথীত হইয়াছিল; কিন্তু ৪০০ পূঃ অব্দে হিন্দু ও গ্রীকদের সংস্পর্শ প্রথম সংঘটিত হয় নাই। বাবিলনাশিত বীর সেকেন্দরের সময় হইতে (২০০-১০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে) ভারত ও গ্রীক ভাষাভেদ পরস্পর সম্যকভাবে আদান প্রদান করিতেছে। সুতরাং ৪০০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুভ্যোক্তির যে রচিত হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। হিন্দুভ্যোক্তি ভাষার বয়স পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। আবার

মহানুপস্থিগণ বিনোদী হইলেও অশিক্ষিত ছিলেন না। কাব্য, ধর্ম, নগর, কলা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে ভাষাভেদ অস্বাভাবিক সম্যক ছিল এবং গ্রীকদের নিকট হইতেও ভাষার বর্ণনা শিক্ষালাভ করিয়া ছিলেন। আবার আরও তুলিতে পাই যে, ভাষাভেদ অনেক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভাষাভেদ অস্বাভাবিক ছিল। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রের সময়ক সম্যক সম্যক জ্যোতিষ চারিগুণ এবং কলিযুগকে মকরী অক্ষত বিকৃত করিয়া ছিলেন।

“রোগশয্যার প্রলাপ” ও ব্যোমকেশ মুস্তফী

(ঐচ্ছিক ভাষ্য)

‘রোগশয্যার প্রলাপ’—ঐয়োপাভূত শব্দ ওয়াক্যে ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত। জিন্দগী রচনা পণ্ডিত সম্পাদিত। মূল্য ১ টাকা পত্রিক ১০০)

পুস্তকখানিতে ১৯শে রচনা আছে। পূর্বে ‘মানসী’ পত্রিকার বাবাংলিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি পাঠ করিয়া তখন রস ও আনন্দ পাইয়া বাক্যাদি পাঠ্য পত্র হইয়াছিল। রচয়িতা যে কে তখন অনেক জানিতেন না; লেখক মহাশয়ের বক্তৃতাভাষ্য তাহা জানিতেন। আজ সে গোপন কাহিনী বাক্য করিয়া নবীন রচনা তাহা বাক্যাদি পাঠ্য পত্র ওয়াক্যে করিয়াছেন এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া পাঠ্যপত্রের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই রচনাগুলি মুস্তফী মহাশয়ের শেষ রচনা।

সম্পাদক ভাষ্য তাহার নিবেদনে লিখিয়াছেন,—“ভাষার শ্রী হস্তের কৌশলেন্দু-প্রসূত এই রচনা, প্রাচীন কবি, ভাষার প্রথম বৈশিষ্ট্য সাধারণ ও সামান্য প্রথম করিবেন।” রচনাগুলি বরণপত্র-বাক্যের শ্রী হস্তের লেখ্য পত্র; কিন্তু এগুলি কৌশল

লেখনী-প্রসূত নয়। ‘ভাষার শৌর্যপত্র’ নষ্ট কোথাও হয় নাই। চিত্তাঙ্গীকতা ও ভাবুকা প্রকাশের দ্বারা দ্বারা করিতেছে। ভাষার দুর্বলতা, অস্পষ্টতা বা ভক্তির চিত্র কোথাও নাই। বৃত্তের কালক্রমে ভাষার শব্দভেদ উপর আদিত্য পত্রিকাছিল পত্র, কিন্তু ভাষার মনের উপর কিছুই না আদিত্য বিচার করিতে পারে নাই। এগুলিকে লেখক মহাশয়ের ‘প্রলাপ’ আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু এগুলি ভাষার চিত্তাঙ্গীকতা ব্যক্তিগত ভাষার আদিত্য প্রাচীন-ভাষার প্রাচীন প্রাচীন পথে নিহত করিবে। ভাষার সহজ সহজ পত্র লুপ্ত।

প্রথমই বলিয়া রাখা ভাল—আমি এ পুস্তকের সমালোচনা করিতে বসি নাই—সে শক্তি আমার নাই। আমার জীবনের ‘আদিত্য’—বাল্যের দ্বারা, কৈশোরের ও যৌবনের বক্তৃতা, জ্যোতির পরামর্শবাক্য, আদিত্য কবিতা—তাহার পুস্তকখানিতে বৈচিত্র্য সম্যক দেখে মনোবীর লেখার সমালোচনা করিবার আমি উপযুক্ত পাত্র নই। জীবনে ভাষার নিকট হইতে যে সকল বিবরণ শিক্ষা করিয়াছি, তাহা



ডা. বোম্বার্ডার

হু একজন সত্যবাদী ও সু-বিশ্বাসী

নাই। দ্বিতীয় দিককে আবার শোকে ও কোন দিন মুহূর্তমান হইতে দেখি নাই, আবার আনন্দে আচ্ছন্ন হইতেও দেখি নাই। দ্বিতীয়কে বরণ করিয়া যিনি জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন—স্বপ্ন হ্রসবে সমভাবে যিনি জগৎপানের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া পর হইয়াছিলেন, সেই মহাশয় সাহিত্য রচয়িতার সম্বন্ধে যে সকল

সত্যকথা বলিয়াছেন তাহা বর্ণিত হইল, তাহা একটা বর্ষও অতিবাহিত নয়—বাক্যবিকই “পূর্ণ বেন দত্ত হইয়া আপনার সুপ্রসন্ন বিচারে অপর সকলের চিত্তকে বোধিত করে, যোদ্ধাকল্পেও তেমন সাহিত্য দ্বারা আত্মপ্রতি প্রদান করিয়া, সাহিত্যের পোষ্য ও কলাপ কাবনার নিম্নের পরীক্ষার পেষ রক্ত প্রসূতি পর্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এ দানের স্বপ্ন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয়

সাহিত্য-সম্মিলন বা বাণীনাথ সাহিত্যিক-সম্মিলন কোন দিন পরিসোধ করিতে পারিবে না।”

কেহ যদি আত্মবিবরণে নিজস্বা করেন যোমকেশ বাবু বাণীনাথ হাতী সাহিত্যে কি দিয়া গিয়াছেন, তাহার উত্তরে যে আমি কি বলিব, তাহা এখন ভাবিয়াই ত পাইতেছি না। সাহিত্য-পরিষদ প্রচারিত—“দশা তত্ত্বিতরবিধি” ও “উপা-দশন” সম্পাদন ও ছোট গল্পের পুস্তক “সদা-নিবন” ত্রিভুজ তাঁহার নিজ নামে প্রকাশিত পুস্তক ত বড় মনে পড়িতেছি না। এখন হই পুস্তক সম্পাদনে তিনি যে কৃত্তিব দেখাইয়াছেন, প্রাচীন সৌন্দর্য সাহিত্যের সহিত তিনি কতটা যে জুগতিত ছিলেন তাহার যে নিবর্ণন দিয়াছেন, তাহা অনগ্র-সাধারণ। তিনি স্বনামে বড় কিছু রাখা যান নাই। পরিষদ পত্রিকা ও অন্যান্য দাদিক পত্রিকা কয়েকটা মুদ্রিত প্রবন্ধ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ‘বেলাখা’ প্রবন্ধের ভাদিকা ও পুস্তক যদি সাধারণে প্রকাশ করা কোন দিন সম্ভবপর হয় তবেই মুক্ত কর্তে বাণীনাথকে স্বীকার করিতে হইবে বঙ্গবাসীর দৃষ্টিতে তাহার স্থান বড় কম নয়।

আলোচ্য পুস্তক সম্বন্ধে হৃদয় কথা বলিবার পূর্বে, আর একটা কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলিব, সাহিত্য-সেবীর সেবার উৎসর্গে প্রাপ্ত যোমকেশ বেলাখানই কোন সাহিত্যিকের সন্ধান পাইয়াছেন, সেইখানেই গিয়া তিনি তাহার ভাষা প্রাণের অধিক মান করিয়া, সাধারণের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। সাহিত্যিকের গুণের কীর্তন করিতে কোন দিন কেহ তাঁহাকে বিরত যোগে নাই।

সময় করিয়া বলিবার কথটা যোমকেশের খুব ছিল। সেখানগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার রস-জ্ঞানের পরিচয় সকলেই পাইবেন। এখন প্রলাপে রোগের কথা আছে—তারপর গল্পেরই প্রলাপের কয়েকটিতে সামাজিক সমস্যার সমাধান আছে—

দিকার যাবতী কিরণ চরণ উচিত, বাণীনাথ দিকার কার্যভারিহ। প্রকৃতি বিপর্যয় হইয়াছে। আন্তরিক ইতিহাসিক আলোচনাও প্রলাপে বাধ পড়ে নাই। প্রলাপগুলির মূর্তি এই—২। বৈজ্ঞানিক ১। ৩। বাণীনাথের এত অমূল্য, বর, প্রমাণের মীড়া কেন? ৪। একান্তবর্তী পরিবার টিকিতেছে না কেন? ৫। বিধবায় আশ্রয়ের সমাজে নিরাশ্রয় হইতেছে কেন? ৬। কোমলবয়সের ভেলেনের সেখানকার হইতে কেন? ৭। কার্যের উপনামে প্রাণের সমাজের কষ্ট না লাভ? ৮। বাণীনাথ যুক্তকথা কেন থাকে? চুল খাটো করিয়া কীটে? ৯। বাণীনাথ কীটে কি? ১০। দাদা’র প্রবন্ধ চর্চনা কেন? ১১। বাণীনাথ কতবার? ১২। আশ্রয়ের ইতিহাস নাই কেন? ১৩। কলিকাতা প্রাচীনতা ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক আদর্শ প্রদত্ত হইবে? ১৪। ভাষ্যবাসী এমন পতিত কেন? ১৫। বিবেক প্রত্যাপন কৃষ্ণ ও অন্ধার বাণীনাথ লোকবিশেষ হইবে কি প্রকারে হইতে পারে? ১৬। আশ্রয়ের অপ্রাভাব ও বঙ্গভাষার কারণ?

এই সকল প্রশ্ন রোশনকারী যোমকেশের মনে উদয় হইয়াই লব পার নাই; তিনি কারণ অনু-সন্ধান করিবার জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন। প্রাচী-কার্যের পদ্ধতি ও নির্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আশ্রয় এই মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির আলোচনা দেখিতে চাই—দেখিতে চাই আশ্রয়ের কৃত্তিব উচ্চশিক্ষিত যুক্তকথা এ বিষয়ে কি সন্ধান উপনীত হন। হানাতাব বসন্ত: আশ্রয় তাঁহার মতগুলি উদ্ভূত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না, তাঁহার চিন্তার মূর্তিহীন ও বিস্মৃতি কতদূর ছিল—তাঁহার অন্তর্ভুক্ত ও বিচার-বিবেচন শক্তি কিরণ হ্রাস ছিল। কার্য-কার্য-পরামর্শ ও বিচার তাঁহার কথায় আশ্রয় ছিল। পরোপার্জিত ছিল তাঁহার উদার প্রাণ। সম্বন্ধিতব্য ব্যক্তি জীবন বীণ হইবার হ্রাসযোজন লজ্জা সমধাই যাতছিল। কিসে তিনি

আপনাকে কোন হুম্বীর কাজে লাগাইতে পারিবেন
তাঁহার ওস্তাই—তাঁহাদের ব্যপার বাবী হইবার—
তাঁহাদের অরহম্ব হুংসেবাচনের ওস্ত তিনি চিত্তা
করিয়া যে সকল উপায় ইচ্ছাবন করিয়া পিতাছেন
তাঁহা জাতির সম্প্রদর্শণে একদিন পণ্য হইবে।
এই পুস্তকখানি আমরা চিত্তাশীল ব্যক্তিব্যে গৃহ-
পত্রিকা রূপে দেখিতে চাই।

এখানে পাঠকবিশেষ লেখক বাগবের একটি
চিত্তার ব্যাভার সহিত পরিচয় করিয়া দিব। আশ-
কাল অত্র ও বস্ত্র সমস্ত হইয়া আমার অত্রবিত্তর
সকলেই বিব্রত। সন্দাঙ্গে-পণ্য পুণ্যর ভাষ
তাঁহারাও কথায় এই দ্বন্দ্ব সমস্তার সমাধান করিবার
চেষ্টা করিব। “অন্তাত্যবের কারণ হইয়াছে—
বিবেশে নত্ব ইষ্টানি এবং ইষ্টাত্যবের কারণ-হইয়াছে
—কিধনী বণিকের মতিব প্রেত্ব কলকারখানার
প্রেত্ব হুস্ত ও হুস্ত বস্ত্রের আদানি; আর
এই হুস্তের উৎপাতে বেশে অধবক্ষ্য লোণ
পাইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতীকার কি নাই ?
মন আর ও ভাবিতে লাগিল, এই নত্ব রপ্তানীতে
ও বেশের ক্রয়ক সম্প্রদাৰ অর্থশালী হইতেছে,
হুস্তরাই ইহাতে কতি কি ?—কতি আছে। ক্রয়ক
নত্ব বেশে বিক্রয় করিলে বেশের লোকও তাহাকে
অর্থ দিয়া আপনাদের অত্র ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু
বিবেশে নত্ব বিক্রয় করিলে বিবেশী অর্থ কেবল
ক্রয়কর হুস্তগত হয়, বেশের লোক তৎকথাৎ সে
অর্থ পায় না। তাহাদের নিম্নের অর্থ গিয়াই
তখন বিবেশে অত্র ক্রয় করিতে হয়, তাহাতে ক্রয়ক
বেশের অর্থও (বেশের নত্বর ভাষ) বিবেশীর ক্র-
য়ত হইয়া পড়ে এবং কালে বেশই নত্ব ও অর্থ—
উভয়েই বসিত হইয়া পড়ে।” ইহার প্রতীকার
করিতে হইলে,—“আমাদেরও অন্ত বেশে পিয়া
আমাদের বেশের অত্র পণ্য বিনিময়ে, অর্থ সংগ্রহ
করিয়া, অত্র আদানী বেশ হইতে অত্র ক্রয় করিয়া
আনিতে হইবে।” অত্র তাঁহার ইচ্ছাবিত উপায়

কাণ্ডে পরিণত করা বহু সম্বল ব্যাপার নয় তাঁহা
তিনি বুদ্ধিমানিলেন, কিন্তু সকল কাণ্ডের তাল
বিকটা তিনি বেধিতেম বসিরা, তিনি আশ্বাস
দিখাছেন বহির্জগৎমা চালাইবার পত্রি তাঁরতবাশীর
আছে ? তিনি বসিখাছেন,—“একিণ আশেরিকা
বুটপ গাধনার বদি লকাবিক হিম্মুখানী বসিক
বদবাগ করিয়া বিবেশী বাদিয়া চালাইয়া তাহাতে
সংস্কৃ লাকল ও ক্রতিব লাত করিয়া থাকিতে
পারে, তবে আমাদের বেশের এই অসম্বল সম্বল
হইতেই বা বিচিত্র কি ? ইহার লত্ব প্রাথমিক চেষ্টা
কিজন করিতে হইবে, কিজন লোক লইয়া কাণ্ডের
হুস্তগত করিতে হইবে, ইহার জন্য ঐবেশিক
বাণিজ্যে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদাৰের প্রয়োজন হইলে,
সেবগ শিক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা-সাহায্য-
সমিতির সাহায্যে কোন কোন বেশে শিক্ষার্থী
পাঠান আন্ত্রক কি না,—ইত্যাদি বিষয়ে বেশের
হুস্তগণের ভাবিবার ও কর্তব্য নির্ণয়ের যে
সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সম্বল
নাই।”

অত্র কথাটা যে ভাবিবার বিষয় তাহা আর
কাহাকেও বিপদ করিয়া বলিতে হইবে না। বেশের
ধনাগম বৃদ্ধির ইহা যে এখটা উপায়, তাহা
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বেশের শিল-
বাণিজ্যের প্রসাধে অর্থগম হয় নত্ব—হুস্তগত
বসিত পণ্যার্থের সম্বলহার করিতে পারিলে লাতবান
হওয়া যায়; কিন্তু এ কথাটাও অবিলম্বাবী নত্ব
যে বিবেশীরা আমাদের বেশ হইতে বস্ত্রর বস্ত্র
যে পরিমাণ অর্থ লইয়া রাইতেছেন, তাহার বিনিময়ে
আমরা যদি বিবেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া জাতির
বদভাগ্যর পূর্ণ না করিতে পারি, তাহা হইলে
এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা বিশ্বমাঝে
নিঃস্ব হইয়া পড়িব—আর সেদিন আসিতে যে বহু
যেটী আছে তাহাও ত মনে হয় না। তাই বলি
এ বিষয়ে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের বঃ

হাথা উচিত 'কলনীর জল পড়াইতে পড়াইতে যেনা
দিন চলে না।'

এবার পুস্তক হইতে হু একটা রসের কথা
তুলিয়া রসিক লেখক মহাশয়ের রসজ্ঞানের পরিচয়
দিব :—'আমি একটু খুসী আছি ;—যেখিতেছি,
ভাকারেরা কথিয়ারের প্রেতাই আনিতেছেন—
কঠোর, অসহ্য, পার্শ্ব, পৃষ্ঠে ঢোকা মরিতেছেন—
কঠোরের রিহাৎগাল বেওয়া হইতেছে, হইতেছে
হইবিসে চাপ দিতেছেন, কেহ বা একেবারে বর্ষ
পরিচয় হইতে জ্বক করিয়া এ, বি, সি, ডি,
বলাইতেছেন, কেহ বা নাটকি-নাইন বলাইয়া,
আমি যে দিহাৎ-আইয়ের বাজার পড়িয়াছি, তাহা
উপলব্ধি করাইতেছেন।'

'হুয় হাসের রোশী আছি বেশ আছি।' বীরপর
আহার—কেমন খাইতেছি—বেগান, আনুয়,—
বাধা জ্ব বেলার চক্রে যেখিতে পাইতাম না—

সি'জুরিগাণীতে আদিবার সময় যদি কোন দিন
লোভবশতঃ কিনিবার কথা মনে উঠিত, অমনি
পাওনাগারের ঘূষ মনে পড়িয়া সঙ্কটত হত আরও
জ্বয় হইয়া বাইত।'

পরিবেশে একটা কথা বলিয়া এই আলোচনা
শেষ করিব। সেটা হইতেছে লেখক মহাশয়ের
জাতির প্রেতি উৎস্র তাগবাণ। তাঁর জাত যে
জগতের মধ্যে বস্তু ছিল—আবার যে বস্তু হইবে
এ বায়নাটা তাঁর লকল সময়েই ছিল, তাই যেখানে
তিনি বিদেশীর নীচ অসুভাষণ দেখিয়াছেন সেই
খানেই কশাখাত করিয়াছেন। ৮৮ নিবন্ধ পাঠ
করিলে কথাটার বাখার্বা উপলব্ধি হইবে। জাতির
অসুভূতি ও চিন্তার সাহায্যে, বিদেশীর চিন্তা শাসনজ্ঞা
প্রকৃতিকে নিরূপ করিয়া গইতে সর্গবাই তিনি
যাত্রা ছিলেন।

আপন মুখে আপন কথা কইব না আর কইব না

(ঐশীলা বেনী)

কথা ক'রে লাখ মেটে না তাইতো কথা কইব না,
অজুল অগার জায পায়াবার ভাষার বীদন বইব না ;

কইব কথা পাখীর গানে,
বেগুয় বেগে মধুর গানে ;
কল্লোলিনী নদীর প্রাণে,
প্রাণ ফিলাব গানের বাণে ;
নীমার সাক্ষে রইব না।

কথা ক'রে জুড়ায় না মন, তেমন কথা কইব না,
জোমহৌন নীরস আশোতনে অন্তরে আর সইব না ;

আবার মনের কথা নিয়ে,
যায় যে নদীর জ্বাষ দিয়ে,
নবীন বন লজল বেয়ে
জমাট অলস উঠলো বেগে,
আবার কথাই বইতো না।

আপন মুখে আপন কথা কইব না আর কইব না,
আবার মনের কথাই কীশায় মনের পাতায় প্রেতা না ;
জ্বয় কাশের চামর ঘোলা,
কুহুয় কমল আপন স্তোলা
কয় যে আবার অসল আপা,
তার চেয়ে ২৮ আবার জায ;
বিকৃত হইব না।

সমালোচনা

(সত্যবান)

স্বপ্ন-সংস্কৃত—বীথিকল। লুকাই ঐক্যাদি
গান রায় কবিরেখার বি. এ. প্রণীত। মূল্য ১০০।

স্বপ্ন-সংস্কৃত গোষ্ঠী-সংগীত হৃদয় বিঠানব্রের রস
'কালের ভিতর বিরাট রসে পশিয়া মন গ্রাণ আকুল
ক'রো দেহ।' সুলন-রাস-হোলি-চকন, চির-
কিনোতীর হোলন হোলত তালে তালে, কবির
বীথিক—কালিন্দীর কল-কল্লোসের মতই লীলাবিত।
কোথাও উতলা, মন-মজরা বত্নে কাপাকাপি,
কোথাও 'কুচুস—ভালা রক্তে রক্তা-বলোনের কাপ-
নেণ্ড' আবার কোথাও বা খায়া-কমক-বীথিকার
অভিনয়ের বানী হুকাবিয়া হুকাবিয়া উঠিয়াছে।

'বহায়েন-কল', 'ভিলোকন', 'আবের গ্রাণ', শিব
চণ্ড', 'সুলন-বিলন', 'প্রেক্ষণ' প্রভৃতি কবিতাগুলি
বিরাট বৈকল্য রস-মাতিতো নিত্যকাল বরিয়া যে
চিরন্তনী রাসিনী কীর্জন স্বর-লিপিতে স্বয়ং বহা
বিরাছে,—সেই এক অমৃত সুর ব্রহ্মবৈশ্ব রক্তে রক্ত
হণিয়া উঠিয়াছে। স্থানভাবে বনোদহরতগুলি
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। দু' একটা
মূল পাঠকপদের অবগতির জন্য বলিতেছি :—

'বিকে বিকে তব একই যে রক ভবিষ্য, ইত্যাদি'
(৩০ পৃষ্ঠা) 'যেহী হ'লে তুই উঁকি হিলে বেহে অ'বি
বেদি ইত্যাদি' (৩১ পৃষ্ঠা) 'পায়ে নুপুর ইত্যাদি...
মনির খাচার সোণার ফিলসে বাঁধা থাকি অবিরল'
(৩৩ পৃষ্ঠা)। এগুলি যে বাস্তবিকই উপাদেয় তাহা
কবির-রসলিপিসমূহকে আর অধিক করিয়া
বলিয়া দিতে হইবে না। এগুলি প্রকৃত রস সাক্ষ্যে
ভরপুরবাণী পূরায় আর্থে নিবেদিত প্রসূর
কমল। পুঙ্খানুপুঙ্খ এই লুকাই কবিতাগুলি
আমরা দৃশ্যকণ্ঠে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পণ্ডিত নৌরোজুব্বার শুভ এম এ, সি এই
এইট ডি, বি লিট, যার এটল 'পরিচয়ে, যে
সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের
ও ভাবুকের পরিচায়ক। চিরন্তন তাবের বাহা-
বাহিকতা ও পাণ্ডিত্যের বিবেক লক্ষ্য রাখিয়া
কবিতাগুলি নির্মাণিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়;
কিন্তু আশাযের বাহাণে 'বি' (দীর্ঘ) ও 'কি'র
সম্পদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাগুলি নির্মাণিত
হইত তাহা হইলে অবিকল্পিত শোভন হইত। লুকাই
'শিব চণ্ড' কবিতার পার্শ্বে 'জ্বালাপাত' এবং
রসোজ্ঞন 'মহাষ্টমী' কবিতার পূর্বে 'লীলাচতুর্বা'
স্থান পাইত না। চন্দন নই 'দুর্ভেদ' 'সোহাগিনী' ও
'জ্বিলাপাত' এমন প্রসঙ্গ কাণ্ডে স্থান না পাইলেই
ভাল হইত। 'কল রাসাল' কবিতার তাহার পরি-
পাট্য থাকিলেও তাবের বনোদহরিতের অত্যন্ত
লক্ষিত হয়। আশা কবির অসুখাগী ভক্ত।
কবি প্রতিভা তাঁহার যথেষ্ট আছে। সে প্রতিভা
বাহাতে অমূল্য থাকে ও তাঁহার কবি মনঃপ্রভা
বাহাতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয় তাহার মন্তাই
হুই একটা অগ্রিম সত্য গ্রন্থের লক্ষিত বলিতে হইল।
কাব্য ধানিতে হঠাৎ প্রজ্ঞা অত্যন্ত লক্ষিত হয়।

স্বপ্ন-সংস্কৃত—ঐক্যেবলগান রায় প্রণীত
কাব্য। মূল্য এক টাকা। ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদ-
পট সবই ভাল। লুকাই যেসকলগানের কবিতা
মাণিকপদের পাঠকপদের নিষ্কট অপরিসীম নহে।
এই প্রথম কাব্য লইয়া তিনি বঙ্গবাণীর মনির ঘারে
আসিয়া ঠিকাইয়াছেন। কবিতাগুলি বাছাই
করিবার ও সাজাইবার তার যিনি নিরোধেছেন, তিনি
মাণিক্যক্ষেত্রে সর্বজন পরিচিত রসলিপিক ঐক্য

প্রথম চৌধুরী মহাপুত্র। কবিতাগুলির স্থান বিস্তারিত
ও নির্জন। সে 'চন্দ্রিমা' হবারই চেষ্টা করেছেন।

কবিতাগুলির পাঠ্য কবিতাগুলির স্থান নির্মাণ করেছেন।
না, কবিতা 'বিশ্ব' বলাই লেখেন তাইই প্রমাণ।
কালে। প্রকাশ করে থাকেন। অল্প অপমান
লেনার প্রতি সমতাভাষেই তাঁরা এ রকম কাজ করে
থাকেন। চোখে দেখা শিল্পী প্রথম চৌধুরী মহা-
পুত্রের ভাষা বোঝার দ্বারা কবিতাগুলি নির্মাণের
তার দ্বারা তাল কাজ করেছেন। তাঁর মত প্রমাণ
কল্প পাথরে যাচাই করে কবিতাগুলির মধ্যে যে
কিছু খাট শোনা দেওয়ার জন্যই একাধারে হয়েছে।
কবিতাগুলি যিনিই পড়বেন তিনিই কবির সত্য
সত্যের সরল আবেগ লাভ পেরে যুক্ত হবেন।
হাসানীর জীবনের বোধগম্য ঘটনা—'বংশবৃত্তঃ
লাজ্যগাঃ' লোকের জীবনের অল্পকৃত চিত্রকালের
সত্য ও শ্রীরাগির নিখুঁত ছবি মনোহর ভিকার
বিধা মুদ্রণের বাহির হয়েই। আলোচ্য
কাণ্ডে কবি তাঁহার বিশেষভাবে যে একটা ছাপ
বিত্তে পেয়েছেন, তাই সেখানকার আশা বড় স্থা
হয়। 'কুপের বাণ', 'আলিঙ্গন', 'চন্দ্র', 'বৃষ্টি'
'প্রভা' পথ', 'বহুধা' 'মানা' প্রভৃতি কবিতার
আশার বেশ তাল লেগেছে।

সেকালের লোক—ঐশ্বর্যবান যৌব, এম
এ, এক এম এল, এক আর ই এল প্রণীত সচিব
চরিত কাহিনী। মূল্য বৈষ্ণব টাক। বাজ। ছাপা
কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। আলোচ্য পুস্তকে তিন-
জন মনোবীর জীবন চরিত আলোচিত হইয়াছে—
চন্দ্রিমা বংশের পূর্ণের বাগদামনে তাঁদের চরিত্রের
বৃহত্তম, তাঁদের নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বাগদামনে তাঁহাদেরকে
সম্মানের আসন দান করিয়াছিলেন,—তাঁহারা
মনোবীর কৈলাস চন্দ্র বসু, নীরব কবী রমাশ্রী রায়
ও আচাধ্যাকালি বিহারী দে, প্রথম দুইটা চরিত
'মাননী ও নন্দবানী' পত্রিকা ও শেষটা আশা
'বসুনাথ' প্রকাশিত হইয়াছিল। আশা লাগে

প্রকাশের সময়ে পাঠ করিয়াছিল। ও একদিন
পুস্তকাকারে সেখানকার বাসনা করিয়াছিল।
লেখক মহাপুত্র আশার দে গান্ধী চরিত্র
করিয়াছেন। পুস্তকানিতে আশা বিধি এত
অধিক মাত্রায় আছে, যে আশা হইয়া যায় কি
করিয়া তিনি এত কালি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।
তিনি 'আ' একজন জুগুপ্সিত ও চিত্তাঙ্গীল মুদ্রণের
দ্বিতীয়তা 'তিনি Bengaleeদের প্রথম সম্পাদক
ও প্রবর্তক রাক্ষসী 'কেন্দ্র' প্র'র'বাণ মনো
বিশিষ্ট যৌব মহাপুত্রের দৌর 'বৈষ্ণব' তাঁহার
মন্ত্রণগুলি উত্তরাধিকারী 'সুদে' পাঠ্য হইয়া ও তাঁহার
সম্প্রদায় করিয়াছেন। বাগা চটক এ পুস্তক
প্রকাশ করার আশা তাঁহাকে আন্তরিক বস্তুবাদ
হিসেহি।

মহাপুত্রের আশা বিধি প্রথম পাঠ্য মাপের কথক
বংশের পূর্ণের বসুনাথিলেন 'বাগদাম' আশা
'বিশ্ব' তাই। কথায় খুঁজি মত। 'তাই আশা
আশার পূর্ণের হইবে কথায় কথায়। বাই
তাঁহাদের পথি 'সুত্র' 'বৈষ্ণব' কথিতে আশা
পারি না। বাঁধার কৌশল-কলা ও জীবন
উক্ত আশা মাঝামাঝি সত্যের পথে গড়া বা।
তাঁহাদের 'সুত্র' 'বৈষ্ণব' লক্ষ্য না বোঝাই
পারিলে প্রভৃতির মধ্যে মাঝের একটা আশি বসি
পরিচিত হইতে পারিব না। মনোবীর প্রভৃতির
প্রক-চন্দ্র বিধা প্রাণের আবেগে মনোবীর জীবন পুনা
করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বড় বড় বড়
মহাপুত্র বাণী ও কলাইয়া বিধাছেন। পুস্তকানিতে
৩৬জন বিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্র আছে। তাঁহারা সকলেই
বৈষ্ণব ও মনোবীর ব্যক্তি। এই চরিত্র কথার বিশেষ
এই যে, ইহাতে আশার প্রাণ আশা বৈষ্ণব
পাওয়া যায় না। চরিত্র প্রাণ আশাই বিষ্ণু চরিত্র
প্রাণ ব্যাখ্যান আশা লেখকের সহিত
পরিচয় ও মনোবীর ইত্যাদি বিধির কথাই বৈষ্ণব বৈষ্ণব
পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকে 'ওয়েবস্টার' দৈব-

নাট্য' বিভাগের ইতিহাস বেশ ত্রিভাষিক হইয়াছে। অধুনাপুত্র ভবানীকুমার 'চাটার্জী সত্য', 'বেথুন সত্য', 'উত্তরশাড়া: হিতকরী সত্য', 'বল্লী সত্য' বিভাগ সত্য' প্রকৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁদের লুপ্ত বিবরণ আলোচ্য পুস্তকে আছে। আর কনক-প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানসিদ্ধ 'কলিকাতা রিভিউ' ইতিহাস রিকর্ডার, 'স্ট্রাইফ' রিভিউ' প্রকৃতি সাময়িকপত্রের কথা ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচলন আশা দেখিতে চাই। আলোচ্য পুস্তকের তিনটী চরিত্র—জ্ঞান, কৰ্ম ও তত্ত্ব নিষ্ঠার প্রতীক বঙ্গিয়া লেখক সংসার যোগ হয় গ্রহণ করিয়াছেন। আর এই তিনের সমন্বয়ে

যে আদর্শ চরিত্র সৃষ্ট হয়, তাহাতে লক্ষ্য করিয়াও কিছু নাই। আশা করি বাঙ্গালীর জীবনে এই তিনটী গুণের সমন্বয় দেখিতে পাইয়া আশা বৃদ্ধ হইবে।

পরিশেষে লেখক সংসারের নিকট আদর্শের সন্নিবেশিত অস্ত্রের যেন তিনি অস্ত্রগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ সংগ্রামে বিষমাত্মক একটা যুগে যেন, কাহন পুস্তকধানিক আশা আশা। বঙ্গিয়া গ্রহণ করি এক পাকাতা Book of Reference সম্বন্ধে যেন বিবরণ সৃষ্টি থাকে এখানেতেও লেখক দেখিতে চাই, কাহন ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে কোন অস্ত্রাভি-প্রতিষ্ঠানের কথা কেবল আলোচনা করিতে যেন সেই পুষ্ঠান্তি অন্যদিকে তিনি দেখিয়া লইতে পারেন।

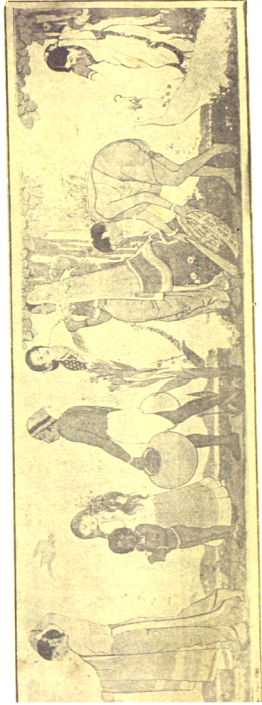
দূরগত

(ঐশ্বর্যপ্রিয় যোগ বি, এ,)

সমস্ত কামল বাগল নিশা,
আবার বেজেছে মিলন-সুখ,
তুচ্ছিত বসন্ত বসন্ত এগেছে—
বসন্ত এগেছে চির-বসন্ত।
অশ্রুপূর্ণ বোলায় ফুলিয়া,
নীল সাগরের তেউ উত্তরিয়া,
এল প্রিয়তম তুংন করিয়া—
ঐতলিয়া বিয়া বেবনাতুর।
কেতকী রচিতা বাগল-শব্দ
সার্বিক করে বাদনা তার;
বহুস মাঝে বহুস ডালাউ,
ফুলিকা গাঁথিছে কঠোর।

মিলন-বিশ্বরী মেঘেরা বাজায়,
বিবলী গোহাঙ্গ-প্রাণী আলায়,
আবার গলিমা বাগল বাজায়
বসন্তে অদ্বার্য সমস্ত-খায়।
হৃৎ হৃৎ বরি চলিছে এমনি
হৃৎ হৃৎ তিষ্ঠন বাগল রাতে,
হৃৎ হৃৎ মিলিছে আনিয়া
নব অস্ত্রাঙ্গের বসন্ত মাঝে।
বাল নিশার মাঝে পলন
সে হৃৎ হৃৎের রাঙা পলন,
চন্দন তার আনে বোধন—
তোলে শিহরণ স্বপ্ন-পাতে।

ସନ୍ତାନ



ଆଜିର ଗାତେ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭୀନ ଦୃଶ୍ୟ ।



১৩শ বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৩০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

আত্মঘাতীর চৈতন্য

(পূর্ব)

(ঐকগোপাল পাল বি. এ.)

(১)

সামান্য চরিত্র টাকা বেতনের শিক্ষক যোগেন্দ্র-
নাথের পুত্র সত্যপ্রিয় যে দিন সরকারী ডাক
বিভাগে দুই পত টাকা মাসেমানার চাকুরী পাইল,
সে দিন প্রতিবেশীদের সঙ্গে এই পরিচয় শিক্ষকের পরি-
বারই আলোচনার কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইল।

যোগেন্দ্রনাথ মাসিক মূল টাকা ভাড়ার এক-
খানি ছোট একতলা বাড়ীতে বাস করিতেন।

পাশের এক বিহীন গৃহে রাজি আহতারের পর
কর্তা গৃহস্থিতে কথামার্তা হইতেছিল।

কর্তা করিমেন, "তোমার যোগেন্দ্রনাথ এতদিন
যে রকম করি পেরেছে, এই ১২ শেষ জীবনটা তেমনি
হবে তাটাই হইবে।"

গৃহস্থী করিমেন, "হ্যাঁ না, সত্যর এখন ত দু'শ
টাকা মাইনে হ'ল, পরে কত অধিক মাইনে হইবে।"

কর্তা করিমেন, "চায়া! আর ল টাকা ত
হ'বেই, এমন কি আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত হ'তে
পারে।"

গৃহস্থী দুই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া করিমেন,
"বল কি গো! তোমার চেয়েও বেশী মাইনে হইবে।"

কহিলেন, “আমার আর কত
এখন আটাই ন টাকার পাঁজ,
না হয় শেষ পর্যন্ত চার ন টাকাই

পুঁথি নীচের নিখাম কেঁচিয়া কহিলেন, “এঃ
আর ঠাঙ্গু কিবির মজিতে পা পড়বে না।” ঠাঙ্গু
কিহি অর্থাৎ সত্যপ্রিয়ের জননী বাৎসব।

কর্তা কহিলেন, “অমন চেনে ক’লনের হর,
বৌয়ের চুকুতো।”

পুঁথি কহিলেন, “তা বা বলেও, শুধু দেখা
পড়ায় নহ সব বিকে।”

কর্তা কহিলেন, “আমি দু’ ভোরে খুব ভেসে
সেহল, বাতাকায় গিয়ে ঠিকানাম। ঘেঁষি যে
ঐ ভোরে সত্য সব বাড়ী ঘর কাঁট দিজে।”

পুঁথি কহিলেন, “তুমি আক বেশলে, পাছে
মার কষ্ট হবে বলে সত্য হোয় হুঁৎলা বাড়ী ঘর
কাঁট দেয়, চাচা-কাপড় কাচে, বাসন মাকে,
ইজনে আস্তান দেয়।”

কর্তা কহিলেন, “হ্যাঁ মাতৃকর্তি বটে! এ রকম
ছোলের উদ্দেশ্য না ক’লে পায়ে না।”

(২)

মাস দুই পরে সত্যপ্রিয়ের পরকর্ষী এক যোগেশ,
আহারের পর তাড়াতাড়ি ঘোঁসে নিম্নগ করিল। সে
দিন আরও তিন জনেরও নিম্নগ ছিল। তাহার
সকলেই মোটা দামিয়ার হাতকর্কটগারী।

মহের বোতল দেখিয়াই সত্যপ্রিয়ের খুব
জকাইয়া দেল।

ভাতার বিবর্ষ সুখেই দিকে চাটিয়া যোগেশ
হাসিয়া কহিল, “ওরুই না বাস, আশ্বেশ দেয়ী, কি
বাবে বল? তাই আনিবে নিচ্ছ।”

সত্যপ্রিয় হাত চোড় করিয়া কহিল, “একটাই
না, পাতের চেনে শেষে নাগা বাব।”

যোগেশ কহিল, “ভি-র ঘোঁসে পেলে একটু
আমুই না খেলে চলে না কি! আর কত ভাল

হেলে হয়ে কান নেই; এক ছাত্র বেয়েই বেধ
না।”

সত্যপ্রিয় সজীব মুখে কহিল, “না তাই ও আম
আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না।”

চারিজন বন্ধু মিলিয়া তাড়াতাড়ি অনেক মায়া
পাশবা গীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু সত্যপ্রিয় অমন অটল
হইয়া কহিল, “বাওয়া ত ঘরের কথা মন ল্পর্প করাত
আমি অজায পাশ বলে মনে করি। তোমরা ও
জিনিসটা ল্পর্প কর না।”

যোগেশ কহিল, “সত্য, তোমার যেখনি সব
ভাতেই বাড়াবাড়ি। আমরা কি তোমার বাই,
না মাতাল হই। কোন মানে চাও একদিন
আমরা কোন মানে ঝোটেই বাই না। দেখাপড়া
নিবে বড় চাকুতী করে এ রকম সুন্দরতার থাক।
তোমার কিছুতেই খোঁজা পায় না। মূল্যতা বলে বিশেষ
যদি এ সব বেতে আশঙ্কি কর, তা হ’লে সবাই
অসত্য বর্জ্য বলে ঠাট্টা করবে।”

সত্যপ্রিয় হাসিয়া কহিল, “এন বাওয়াটাই যদি
সত্যতার প্রদান আর হয়, তা হ’লে অমন সত্যতার
আমার কান নেই। আমি অসত্য হ’লেই থাকুত
চাই।”

যোগেশ কহিল, “তাই বাক—তোমার সঙ্গে
যকে যকে আমাদের মল্লুকিবে গেছে, এখন
মলাটা কি হবে নেওয়া থাক।”

আহারের পর যোগেশ ও অপর দুই বন্ধু। দ্বয়ো
যোগেশের পরামর্শ হইল, সত্যপ্রিয় তাহার কিছুই
জানিল না।

ট্যাঙ্গি ডাকিয়া যোগেশ সত্যপ্রিয়কে কহিল,
“উঠে পড় হে।”

সত্যপ্রিয় কহিল, “তোমরা বাবে এক দিকে,
আমি বাব আর এক দিকে—তা ছাড়া হাঁদা হয়েছ,
অনর্ধক ট্যাঙ্গি তাড়া বেওয়া কেন।”

যোগেশ হাসিয়া কহিল, “তোমার ভাড়া দিতে
হবে না, তার নেই হে। এখন উঠে পড়।” এই

ঘনিয়া এক রকম জোর করিয়া সত্যপ্রিয়কে ট্যাঙ্কিতে বসাইয়া দিল।

বেশিতে বেশিতে ট্যাঙ্কি আসিয়া যে বাড়ীর সম্মুখে থাকাইল, সে বাড়ীর উপর নীচের তলা হইতে পাঁচ লাঠী ছাত্তোনিয়ায় ও নানাবিধ বাস্তবস্ত্রের লব, আঙ্গুর, পের বাড়ীগুলি হইতে উৎখিত অস্ত্রাদি। বাস্তবস্ত্রের লবের লব্ধি ঘনিয়া সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া তুলিতেছিল।

সত্যপ্রিয় বিবর্ণ মুখে কহিল, “এ কোথায় এলে?”

হমেশ ইতিপূর্বে ট্যাঙ্কি হইতে নামিয়া বাজীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল।

যোগেশ সত্যর হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, “তবু নেই, এরা বাথ তাগুক না যে, তোমার একবারে দিলে যেহে কেলবে। কীন্দী পত্নির বুদ্ধির ভক্তে, পরিজ্ঞানের অবগান দূর করবার জন্ত হুই একদিন আমোদ প্রমোদ বরকার যে, এও তোমার বুদ্ধিরে বশতে হবে।”

তিনরনে ঘনিয়া সত্যকে ধরিয়া জোর করিয়া বাজীর ভিতর লইয়া গেল।

সত্যপ্রিয়ের লাগা বেহ খরখর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া কক্ষকর্মী ঘনিয়া উঠিল, “এ ভক্তলোককে এখানে এনে কেন?”

হমেশ হাসিয়া কহিল, “ও ভক্তলোক আর আমায় ছোটলোক নাকি?”

“কক্ষকর্মী হাসিয়া কহিল, “এ তোমরাট ভাল জান, উনি ভক্তলোক ঠিক ছেড়ে দাও।”

যোগেশ কহিল, “বেশ বেশি সত্য তোমার জন্ত আমি আমোদের গানগানি যেতে হ’ল, শুধু সত্য আমোদের মুখের ওপর ছোটলোক এলে।”

সত্যপ্রিয় হুই হাত মোড় করিয়া পাতে মুখে হস্তের দিকে চাহিয়া নবমীর পাটার দত্ত কেবলই কাঁপিতে লাগিল।

হমেশ কহিল, “ওকে ছেড়ে দাও, বেহুচ

মুখানো কি রকম লাগা চ’র দেবকালে পুনের দ্বারে ঠেকেন।”

হমেশ কহিল, “এ রকম বেহেনিক তা দ্বারে লাগি নি, যোগেশ ওকে ন নিয়ে গিয়ে এস।”

সত্যপ্রিয় যখন বাজীর বাজীরে আসিয়া থাকাটান তখন তাহার লক্ষ্য বাথ ভিত্তি উৎখাত, তাহার বুটা খাঁকি খাঁকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। সে এক মুহূর্ত্ত দেখানে থাকাটান না—তোথ কান বুজিয়া কোন রকমে সে গাটী পার হইয়া বড় তাহার পড়িয়া কপালেও মুখের বাথ বুজিয়া যেন হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার মনে বইগ আসি কীবনের একটা মত বড় ছাড়া কাটিয়া গেল। পূর্বে শৌছাইয়াই বনমীর সম্মুখ উপবিষ্ট হইয়া হুই হাতে তাহার পদদ্বয় লইয়া মাথাঘা দিয়া কানো কাঁড় ছাড়িবার ওজ নিঃশব্দে নিজের ঘরের দিকে চালা গেল। তাহার কেবলই মনে বইগে লাগিল, মন খাওয়া আর বাস্তবাসীন্দ্রিতে লইয়া হুইলম আমোদ প্রমোদ করা আমোদভার নামোদর মাত্র।

(৩)

মাস ছয়েক পরের কথা। সত্যপ্রিয় তাহারে পুরান গৃহের ঠিক পাশেই এক বিহীন গৃহ ভাড়া লইয়াছে। একদিন তাৎক্ষণিক নুনে হুঁচ, নুতন তাৎক্ষণিক, নুতন হার লরিয়া পাড়াপ্রাচীরের গৃহে বেড়াইয়া গেলেন।

বিতলগৃহের গৃহিণী তারে ওষ্ঠান্তে করিলেন, “হাজু নির্দিষ্ট যদি আসে সাগের দটা দেখত! আমোদের ত এমন কাঁপড়পরে কেতে ও আমার মাথা হেঁট হ’লে যেত। শুধু আমি তাহা নির্দিষ্ট চেয়ে বসলে অনেক ছোট। বাস্তবাসীরা ছুঃত করত, উনি এখন আর ওপর থেকে নামেন না। রাঃ দিনই পায়ে ওপর পা ধরে বসে আছে। ঠাকুরা মুখের গোফাঘালা মাটিতে ভাঙা দাঁতে দাঁতে, এক কোলায় মল অবধি নিজে গাড়িঘে যান না, তাহা দাঁদিতে

এসিয়ে যেনে। দেখলে হাড় ভাল দাড়! হাই বল না কেন, বড়টা বাড়াবাড়ি তান না।”

কর্তা হাসিয়া কহিলেন, “শিল টাকা হাইনের ছল বাড়িয়েছে ছেলে যদি খটখট বড় চাটের খঁবে পড়ে, তা খঁবে বাড়ির পড়ের মতবা ঐ রকমই হয়। তবে সত্য হলে ভাল, তার ভাল তখন মনুষ্য নি।”

পুথিনী কহিলেন, “আমার কাছে চার্জ দেবে, এর মধ্যে সত্যর এত সাধন হবে—তবে তুমি আপিসে নাকি খুব সাধেবিদ্যা করে?”

কর্তা কহিলেন, “তা কবে বৈ কি! তাদের যা কাল তাতে একটু অধট্ট দরকারে হয়, তবে সত্য কিছু বাড়াবাড়ি করে যে কথ ঠিক। কেবলি-বেশ লম্বা ইংরেজি ছাড়া, বাংলায় কবাই বলে না—; নতুন চাকরিতে ঢুকে, তাতে কি খঁবে দেখি—চাকরী কি মিনিষ হুঁবিন পবেই তা বুঝতে পারবে—জেন ও চান্সিং সব মনুষ্য থাকে।”

পুথিনী কহিলেন, “সত্যর ভাল হয় ত মনুষ্য বেতে পারে, কিন্তু গরমার ভাল দিন দিন বেড়েই যাবে তা তুমি দেখ। জানেই ত ছুঁটো ঘেরকে ত্রিকৈ দিকে করে কোম রকমে পার করে তাতে রকে করেচে—কখনও একটা পয়সার মিনিষ খিচে পারে নি—এখন মস্তাহে ছুঁ তিন দিন ঘেরেছো বাকী মিনিষ থাকেই। ছোট ঘেরোটোকে ভাল ভাল অরনি পাঠাতে হয়। সত্য ত তার মনুষ্যের দিকে চেয়েই যেনে না। যা করে না,—না যেন হাটতে চাও। ছড়িয়ে দিচ্ছে। একটা কি আর ভাল, না এ খেই দিন নাই, সত্যর ত বিবে বাগড়া হবে।”

কর্তা হাসিয়া কহিলেন, “তাই ত আনার হাত্ন বিদি যে হুঁবিন পারে সব মিটরে বচে করে দিচ্ছে। তবে সত্য তার থাকে যে রকম ভক্তি করে, তাতে ত মনে হয় না,—বিবে করলেই তার মাতৃ-ভক্তিতে তাঁটা পড়ে যাবে।”

পুথিনী কহিলেন, “সত্য মানুষ ত, খঁলেই বা না,

তাই বনে কং বাড়াবাড়ি হয় করবে। খট আনুক তখন হালু দিহির ঘেরকে ভাল ভাল পাঠান বেতিয়ে যাবে। সত্য কি এখন কিছু জানুতে পারে—এখন জানাবার লোক হয়ে, তখন ওসব বন্ধ হয়ে যাবে।”

ইহারই বিন ততক পুরে সত্য কি একখানি দরকারী কাগজ বাড়ীতে কেলিয়ার্থদাছিল। আপিসে পৌঁছিয়া সে কথা মনে পড়িলেই তাড়াতাড়ি খান ছই মক্কা কাগজে লই করিয়া তাহ পঠাই বাড়ী কিলে। আপিস। পলিয মোকটা পুথিয়া গৃহের নিকটবর্তী হইতেই দেখিল, তাহাঃসর বাড়ীর মাদী একটা চাকরীতে করিয়া কি লইয়া হাই-য়েছে। তাহাকে দেখিবার নি ছিঠাঃ খীত হইয়া শূত্ৰদিবার টোটা কিল। সত্যর লম্বের কইন, কি নিচ্চাই কিছু ছুরি করিয়া লইয়া হাইতেচে, কিছু পথের নাকদানে ত্রিকৈ কিছু না বগিয়া গৃহে এসে পড়িয়া মনুষ্যই জননীকে দেখিতে পাইয়া কহিল, “না তুমি ও ত্রিকৈ ত খুব ভাল বল, কিন্তু আমার মনে হয় সে চোর। এই মোড়ের কাছে আমার সঙ্গে যেনা—আমাকে দেখেই সে যেন কি লুকোবার চেষ্টা করিল।”

সত্য যে খটখট এমন অদমনে বাড়ী করিয়া আপিসে এঃ ত্রিকৈ বে তাহার হাঃমনে পড়িয়া যাবেঃসরনিঃ একথা একবারও মনে হয় নাই। তাই সত্যর কথাঃ বিচলিত হইয়া লগকাল ছুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, “আনুক দেখি কি, কিজেন করব তখন সে তোমার দেখে লুকোছিল?”

সত্য আর কিছু না বগিয়া নিঃসর করে গিয়া টেবিলের উপর হইতে দরকারী কাগজখানি লইয়া তখনই বাড়ীর বহির হইয়া গেল।

ব্যঃসরে আপিল হইতে করিয়া গৃহে এসেঃ করিতে হাইবে এমন সময় মনুষ্যই ত্রিকৈ দেখিতে পাইয়া সে কহিল, “তখন চাকরীতে করে কি নিঃঃ য়াছিল?”

কি পতনত হইয়া থাকিবে? ইত্যন্তঃ করিয়া
অলসভাবে করিল, “বিবিমণির বাড়ীর জিনিষ
নিরে বাজ্জিলাই।”

সত্য আশ্চর্য হইয়া করিল, “বিবিমণির বাড়ীর
জিনিষ নিরে বাজ্জিল, আর না কিছু আছে না?
তবে আমাকে দেখে লুকোজ্জিলা কেন?”

কি তাহার দিকে ভাল কাল করিয়া চাহিয়া
বিলু, বিলু করিয়া কি বকিতে শাসিল, সত্য তাহা
বুঝিতে পারিল না। “কি যে মিথ্যা কথা বলিতেছে
সে বিষয়ে সত্য কোন সম্ভবত্ব ছিল না। কলঙ্কের
দে করিল, “চুরি করে আবার মিথ্যা কথা বলা
হ’লে, লু’লু আর কাচো।”

এই মিথ্যা চোর-অপরাধ কিও সীতবে সঙ্ক
করিল না, স্বাক্ষর রাখিল, “চোর চোর বলছেন
না, বাবা বাবু, চুরি করে থাকি, পুলিশে যেবেন
লু’লু না আর কাচো।”

কোথ চাপিয়া সত্য তাহার জনমীর সম্মুখে
উপস্থিত হইল, কিও তাহার অসুস্থত্ব করিল।

সত্য কিছু বলিবার পূর্বেই কি রাসমণির
দিকে চাহিয়া ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “হইল
তোমার চাকরী না, তুমি লুকিয়ে ঘরের বাড়ী
জিনিষ পাঠাবে আর আমি চুরির দায়ে থাকা
পড়ব।”

সত্যগ্রন্থ গভীর হইয়া দাঁড়াইয়া করিল। রাসমণি
মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া করিলেন, “আবার তখন
কথাটা মনে ছিল না বাবা, খুকীকে ও স্বপ্নও কিছু
হিসে পারিনি তাই কিছু খাবার কিনে বিকে দিয়ে
তখন পাঠিয়েছিলাম।”

সত্য বেদনানীকিত অন্তরে নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া
গেল। আশ্রিতের গোপাল পরিণাম চেয়ারের উপর
অনেকক্ষণ বলিয়া করিল। জনমীর আশ্রিতের এই
ব্যবহারটা তাহার নিজস্ব একটা নতুন বিষয়ের মত
ঠেকিল; তাহার জামনার স্মরণে যেন কেমন
কোঁপা কাইয়া গেল।

(৪)

এই সময় যোগেন্দ্রের তাকার এক বন্ধু
কতার সহিত মাত্র দুই ঘণ্টার টাকা পূর্ণ পতার
বিহার স্থির করিয়া কেলেন। বিহার বাড়ীর
তাকার এই পুস্তকটিকে কেলিয়া নিলে সে যে
চতুর্ভুজ ন্যূন বিকসিত ভাবেতে কোন সম্ভবত্ব ছিল
না; কিন্তু যোগেন্দ্র তাপ তাকার কেলেন না, পুঁহী
আশ্রিত হইয়া করিলেন। যাক হটক বিহারের পর
রাসমণি তাহার নিজস্ব আশ্রিতের প্রকৃত বিহারের
ও বিহারিকের অতি বড় প্রত্যক্ষ বলিয়া গাণি
পাতিয়া গেল, গল্প করিতে করিতে নবমুখ প্রস
করিয়া যত সুখিলেন।

বিহারের পর যোগেন্দ্রের কতিয়া গেল, সত্য
চপলাকে পরিচয় সত্য যেন এক নতুন মনে পাত
করিল। আশ্রিতের সম্মুখ হইয়া যার মত মত চপলা
তাকার কাচো থাকিত। সত্যের সহিত গল্প করিয়া
সত্য যেন কিছুতেই তৃপ্তা দিত না। তাহার মনে
হইত যদি আশ্রিত না গিয়া পেই সম্মুখ হইত সে
সত্যের কাচো থাকিতে সহিত তাহা হইলে তাহার
মনের কথা পরিপূর্ণভাবে দিত। এক অধি দিন
যদি কোন কাজে চপলা আশ্রিতের সম্মুখ হইত
হইত, সত্য অধিরিক্ত স্বপ্নাবহিত করিয়া ফেঁইত।
চপলাকে লইয়া এমনই তখন হইয়া থাকিত যে,
চপলা কি খাব, কি পাবে, দেখেই সত্যের সত্যের
তাকার মতমত থাকিত না। তাহার পাতাকার
স্বপ্নে ও চপলায় সহিত তাহার কোন কথা হইত
না; উভয়ের মধ্যে যে কতাবর্তী হইত, তাহার
সহিত বাস্তব জীবনের বড় একটা স্বপ্ন থাকিত না।
অতি সম্মুখ এক মহলে তাহার টেবল বলিয়া
অবস্থিত হইয়া গেল। রাসমণি ও সত্য বাড়াবাড়ি
ভাল লাগিত না। তবে পুস্তক ও সত্যের মত
আশ্রিতের তিনি নিজস্বের বড় করিতে পারিতেন
বলিয়া এই বাড়াবাড়ি দুই হইয়া সত্য করিয়া
হাইতেন।

সেদিন কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী এক বিবাহের রাসমণির নিমন্ত্রণ ছিল। দুই সপ্তা পূজাযজ্ঞ শেষ হইয়া তিনি বঙ্গালবাসে নিঃস্রা—পুণে উপস্থিত হইলেন।

রাসমণির একজন আত্মীর আত্মী একজন আত্মী-চাকর করিল, “বউটার কেমন হাল করে এসেছে দেখেছ তাই?”

যিহঁতটি করিল, “তা আর দেখিনি। আমার ভাড়া কিনি যে কিছুই বুঝি না, ওদের দ্বারের খবর কিছু রাখি না। যেহেতুটোকে ত মনোনিবেশ করে পার করেছিল, জানাইয়া পঁচিশ জিহ টাকা মাইনের চাকরী করে, চাপ নেই চুলো নেই, সেই যেহেতুটোকে দ্বারের খোঁজের পরনা কাপড় পরিয়ে ঘটা করে লাঠিয়ে আসা হয়েছে। শুধু তাই নয় নিজেও ভাল কাপড় চোপা পরনা পরে সেবে আসা হয়েছে। সজ্ঞাও করে না! আর সেবে শুধে এয়েছিল কিনা সেই বাড়ীতে দ্বার ভোঁসের হাঁড়ির খবর রাখে।”

নিমন্ত্রণ বাইরা কিহঁতে রাসমণির অনেকটা বিদগ্ধ হইয়া গেল। সত্যগ্রহ আরার সারিয়া তাহার পরোক্ষ করিয়া বেড়াইতেছিল, আর আশপাশে গেল। পরে সে রাস হইয়া নিজেই বহু গিয়া বসিতেই বাড়ীর দপ্তর পক্ষী খাবার দ্বারা তাহার কাণে পেল। সঙ্গে সঙ্গে জানালার দ্বারে গিয়া হাঁড়ীতেই সে দেখিতে পাইল তাহার জননী পক্ষী হইতে নামিতে-ছেন। পরে তাহার দুই ভগিনী ও চেলী পক্ষী হইতে নামিতেই রাসমণি বস্তু সংবাদ করিয়া কহিলেন, “দেখ নোন, যেমন্তর বাড়ীর কাপড় দ্বারা পরে একবারে ছুটে গুতে যোয়া না। আমার ঘরে কাপড় দ্বারাও পূলে রেখে তবে যেখানে পুণী যোয়া।”

সত্যগ্রহ দীর্ঘনিশ্বাস তেলিয়া জানালার দ্বার হইতে সরিয়া গেল। ওস্তোষের উপর বসিয়াই অবসরও উঠিয়া পড়িয়া বসিয়া পুণী হাঁড়ীতে।

তখন রাসমণি তাঁহার দুই সপ্তা ও বস্তুকে লইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, সত্যগ্রহের ছোট ভগিনীকে ডাকিয়া কহিল, “বুকা, তোর বৌনিকে একবার ডেকে দে ত।”

রাসমণি বস্তু বিকে একবার চাহিয়া জিজ্ঞাসিত করিয়া চোপা-পলায় কহিলেন, “বস্তু, কাপড় দ্বারা ছেড়ে তাহা দ্বারা।”

বুকা বস্তুকে বলিলে, সত্যগ্রহ কহিল, “বস্তু, একটা কথা ত। তার পর কাপড় দ্বারা ছাড়তে বাবে।”

রাসমণি আর কিছু বলিলেন না, ক্রোধেরে চোঁকা যেন। চোপা কুণ্ডিত বানৌ নিজটে আশ্রয় উপস্থিত হইল।

সত্যগ্রহের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেই সে কহিল, “বা নিজেই রাস করেছেন।”

সত্য কহিল, “নামি তোমার ডেকেছি বলে যা কখনও রাস করতে পারেন।”

সে কথা উত্তর না দিয়া চেলী কহিল, “ভালো কেন?”

সত্যগ্রহ কহিল, “ওঁরা আমার নিজের কছ! কতজন তোমার কাছে পাই নি, বল দেখি।”

চেলী পুণ্ডিত হইয়া দ্বারের দপ্তর বিকে চাহিয়া কহিল, “তা! একজনই।” কহিতেছিল, আর পাঁচ মিহিও না হয় থাকতে, এখন আমার ডেকে দাও।”

সত্যগ্রহ আনিয়া দেখাইয়া কহিল, “বেশ ও বানৌ।”

চেলী হাসিয়া কহিল, “বস্তু ও বস্তু দাওনা, কিছু ছেড়ে দিচ্ছি।”

উত্তর সত্যগ্রহ পক্ষীকে দ্বারের কাছে টানিয়া আনিয়া মুখ চুবন করিল।

অবসর পরে চেলী পুণ্ডিত পাইয়া দ্বারের দিকটে বাইতেই সত্যগ্রহ ডাকিল, “নাম।”

চলনা কিরিয়া হাঁড়াইয়া হাশিয়া করিল "নাংক
লিছু ডাকো! এলে সব শুনাও।" এই বলিয়া গে চলিয়া
গেল।

মিনিট মনকে পরে কিরিয়া আসিলে সত্য
কহিল, "তখন একটা কথা বলব বলব করেও ফুলে
গেলান।" ও রকম মাঝে বে বড় নেমন্তর বাড়িতে
সেতলে।"

চলনা হাসিয়া কহিল, "তোমা বাবুদের আবার
মুখি পৈন্তের দরকার কি? তোমার পরিচরই ত
আমার পরিচর। আমি সঙ্গে শুকে না গেলেনও
ত লোকে জানবে, আমি কার স্ত্রী।"

সত্যার উচ্ছ্বল মুখে সত্যীর দিকে চাহিয়া
বলিয়া রহিল।

দিন পূরন পরে আসিল হইতে কিরিয়া সত্য
পত্নীকে কহিল, "এখন হৈতী হয়ে নাও যোগেশের
বাড়ী তোমার আবার নেমন্তর।"

চলনা মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া কহিল, "সাব
গোজ করে যেতে হবে না কি?"

সত্য কহিল, "না সাব গোজ কিছু করতে হবে
না। তবে যদি 'হ' গাভা কণী হাতে বিয়ে যেয়ো
না। হুঁড়ি ও গারটা পরে যেয়ো। তোমার এক-
খানা মায়াবি কাপড় ছিল না? সেইটে পরে
নিও, তাতে তোমার বেশ বেধার।"

চলনা মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "গে কাপড়
ত নেই।"

সত্যার হাসিয়া কহিল, "এর মধ্যে কবে
পরলে যে ছিঁকে গেল?"

চলনা কহিল, "গে কাপড়খানা মা ছোট্টাছু
ঝিকে বিয়েছেন।"

সত্য কহিল, "এবে সেই ঢাকাইখানা পরে
যেয়ো।"

চলনা কহিল "দেখানা ও নেই।"

সত্য হাসিয়া কহিল, "বেশ যা' হয় পরে এল।"

চলনা কহিল, "তা আসু'চি। তবে হুঁড়ি হারিও

আবার নেই, ঠাকুরকিও পরে গেছে।" পরশ না
পরে গেলো কি চলবে না?"

সত্য বানিকমণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,
"নার হুঁড়ি তোমার হাতে হবে না? আর মাকে
তবে বিন এক চড়া নুতন গারও প'ড়তে এমন
দিয়েছি। আরেকের মতন তাই পরে চল
একবারে কণী হাতে বিয়ে বাঙালী ভাল দেখাবে
না।"

(৪)

দিন মনেক পরে সত্যাশ্বিন এইত কিরিয়াই
চলনা তাহার সমুখে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়া প্রতি-
দিনকার মত আজ স্বামীর কোট খুলিয়া বিয়া দবার
আলনার স্মৃতিয়া রাখিয়া জুতার কিতা খুলিবার
অন্ত স্বামীর পাথর কাছের মেয়ের উপর বসিয়া
পড়িল।

সত্য হাসিয়া কহিল, "তুমি দেখছি উপহার
যেটা আমার এ হাত হু'খানাক একেবারে অকর্মণ্য
না করে নিয়ে ছাড়বে না। তোমা জুতা খোলবার
মত শক্তিও কি আমার এ হাত হু'খানার নেই?
হোমাকে কি এই জরই বিয়ে করে এমনটি না
কি?"

চলনা জুতার কিতা খুলিতে খুলিতে রহিল,
"নাংকর ঐ কথা! তুমিই ত বল, মেয়েদের
স্বামীর ইচ্ছার ওপর কাজ হাত থেগা
অস্তায়। আবার এসব কাজ হাল লাগে
আমি করি, তুমি বাবা দিতে দাস কেন?
তা হাঁড়া তোমার হাতের ওপর তুমিই ও আঁবির
করতে গাইব। এই শু লিখা দি। ঐ হাত দাব কল
পিয়ে এলে তার মুখ একটু জিকবেরে দরকার
নেই?"

হালোচ্ছল মুখে সত্য কহিল, "খাটু চেয়েছে।
তোমার সঙ্গে ত আর কথাই পারবার সো নেই?"

চলনা জুতাখোঁড়া বখাৎনে রাখিয়া স্বামীর
সমুখে হাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল, "এইবার প্যাট লুনা

হেঁকে, হাতখুঁত খুঁত, কাঃ একটু অঁহ
হওয়া।

চপলায় হাত হইবে দুঃখিনি নইয়া সত্য
কহিল, "এইবার পায় নিজে হাতের কাছে আসিত
করা! যেহে, কোনো কারণে যেন ছাড়া না হয়, তা-
হীলে হইবে কখনো নাহি।"

চপলা বহিঃ "নাহি" একবার বোঝা
নাহি। এই বলিয়া চপলার উপর হইতে পাখা-
খানি আনতে গিয়া খানার দিকে ক্রিয়া কহিল,
"ই কাপড়ের বাস্তবসিদ্ধি।"

সত্য বলিল, "তোমার দেহের মোহ ও বাস্ত-
বের কথা একবারে ভুলে গেলুম। খুঁত দেখ
না, কি আছে?"

বাস্তব পুত্রেরই প্রথম নিম্নারামি সত্য চপলায়
গোখে পড়িল।

সত্য বলিল, "একে এখনই একবার বেধিরে
এসে, আমি তখন হাতখুঁত খুঁত আসি।"

চপলা প্রথমতঃ কাপড়ের না হাতে লইয়া
তাহার দক্ষঃ নিম্ন উপস্থিত হইল।

কাপড়খানি ও হাতে চাপিয়া আঁকিত করিয়া
সত্যমণি কহিলেন, এর মধ্যে পিঠে বুলি লাগানো
হয়েছে? একখানা পুরাতন কাপড় বুকের
বিষয়ে তা' বুলি আর মত হ'ল না? এত বিশেষ!"

চপলায় কান্না বাহিল। অতি কষ্টে চোখের
জল সোথ কহিয়া আঁকিত কহিল, "আমি ত
কাপড় অমৃত বলি নি, না।"

সত্যমণি তখন বিজ্ঞপ্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি
বলতে যাবে কেন, সত্য তোমার বাস্তব পূলে
বেধেছে কাপড় নই। তাই তোমার কানে এনে
বিষয়ে। আমি কতি কত কি না।"

চপলা আর কিছু না বলিয়া ঘরের ঘরে
ফক হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রথমতঃ
আবেশ করিয়া বেধিল, তাহার বামী তখন ও হাতখুঁত
খুঁত করিয়া আসেন নাই। তাড়াতাড়ি অকল

প্রান্তে চকু খুঁত না দেখাযায় অপেক্ষায় হাঁটাইয়া
হইল।

সত্য চপলার দৃষ্টিয়া হুঁহ হইয়া বসিলে চপলা
কহিল, "কেন তুমি কাপড় কিনে আনিবে? না
কত রাগ করবেন।"

সত্য আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তুমি কি বলতে
তার ঠিক নই। তোমার কাপড় কিনে বিধেহি
হবে যা হান করবেন? তা' কি কখনও হয়? আমি
এখন যাচ্ছি যার কাছে।" এই বলিয়া সত্য
চপলাকে কিছু বলিবার অবসর না বিধাইয়া হুঁহ হইতে
বাহির হইয়া গেল।

প্রথমতঃ হুঁহ উপস্থিত হইয়া কহিল, "না,
তুমি না কি রাগ করছেন?"

সত্যমণি অস্তরের কোথ দমন কহিয়া কহিলেন,
"কি এপর রাগ করবেন?"

সত্য হাসিমুখে কহিল, "একে একখানা কাপড়
কেন দিচ্ছেছি বলে, তুমি না কি রাগ করছেন?"

সত্যমণি বিষয়ের ভাব দেখাইয়া কহিলেন,
"শোন একবার কথা! তুমি একখা বিখান করি?
এ আলাদা করবার কথা, না রাগ করবার কথা।
এখনকার যৌ ত্রিবেশ যেন কেমন দাঁধা হয়েছে।
সব কথা তারাই উঠে করে হুঁহতে চায়। বাস্তবকে
তারা এটা পদক্ষেপ বলে মনে করে, মা'র মত
দেখতে জানে না।"

সত্য হঠাৎ সত্য হইয়া কহিল, "এ কথা এখনি
তুমি জানা হ'লনি কেন মা? আমি তাকে এখন
গিবে বলি, তুমিও তাকে দেখ করে বুঝিবে দিও
না," এই বলিয়া নিজেই ককে করিয়া গিয়া বেধিল,
চপলা শুভমুখে হাঁটাইয়া আছে। তাহাকে কোলের
কাছে টানিয়া আনিয়া দ্বিধা কর্তে সত্য কহিল, "গল্প
যাকে আমার জ্ঞান বুঝে না, যা কি কথাও জানা-
নো ওপর রাগ করতে পারেন। আমার মা কি
তোমার মা নয়?"

চপলা আর কাগজবোম কবিত্তে পারিল না,
স্বামীর মুখে মুখ ভুলিয়া ঝানিতে পারিল।

সত্য তোমার মাথাব হাত বুলাইতে বুলাইতে
পার্তব্য হইয়া কহিল, “কীং কেন?”

চপলা মুখ তুলিয়া কহিল, “তুমি কেন আমার
ওতখা করে? ছেলে বেলায় আমার নিজের মা
ঘরে গেছে, আমি আমার সেই মা কিসে পেতেছি।
আমি তোমার সহধর্মিণী, তোমার মা যে আমারই
মা, একথা আমার তুমি আমার বলে বেবে।”

সত্য কাপড়ের মুটে ভাঙার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া
কহিল, “তা’ কি আমি জানিনি। বেশ ও কথা
আর আমি তোমার বলব না।”

মাগ ছই পরে সত্য আপিল কইতে কহিয়া
পোষাক ছাড়িবার পূর্বে চপলাকে কহিল, “দেখ,
তোমার ভান্ন হাতখানা।”

চপলা বিস্মিত নৈরে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া
হাতখানা বাড়াইয়া দিতেই সত্য লকেট হইতে
পাঁচ পান্না ছুড়ি বাহির করিয়া হাতে পরাইয়া
দিল। তারপর আর পাঁচপান্না ছুড়ি চপলার হাতে
দিয়া কহিল, “আগে বা হাতে পর, তার পরে
তোমার কথা শুনা।” চপলা বাপ্পাকুলনৈরে ছুড়ি
করপান্না পরিয়া সত্যর দিকে চাহিতেই, সত্য এক
ছড়াকার তাহার পলায় সুগাইয়া দিয়া হাসিয়া
উঠিল।

চপলার চোখের কোণ দিয়া দুই কোটা অঙ্গ
পড়াইয়া গড়িল। তাকাতাকি অকলে চক্ষু মুছিয়া
ব্যথা-ভগ্না কর্তে কহিল, “কেন তুমি আমার গ্রেত
এ সব আনলে? এত ওলো টাকা নষ্ট করলি।”

সত্যর এই আর্জি বর্জনর ও সুখের ব্যাকুল ভাব
লক্ষ্য করিয়া সত্য আশ্চর্য হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

চপলা কহিল, “গরনা পরাটাই যে চেয়েছে
সব চেয়ে বড় চৌপায়া, তা’ যদি মনে করতাম
তা’ বলে ত তোমার কাছে আমি নিজেই চাইতাম।
এ সব না আনলেই ছিল ভাল।”

সত্য তাহার কথার অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া
কহিল, “কতগুলো বাড়তি টাকা পেলাম তাই
দিয়ে তোমার গ্রেত এ গুণনা গরনা তৈরী করে
এনেছি। এতে যে, তোমার চিত্তার কারণ কিসে
হ’ল তা’ত আমি বুঝতে পারছি না।”

চপলা মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কোর করিয়া
হাসিয়া কহিল, “ও তোমার লব তোমাদা করছিলাম
তা’ ও তুমি বুঝতে পারলে না? তুমি সব করে
গরনা তৈরী করে এনে আমার পরিবেশ দিয়েছ, এর
চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে?”

সত্য মুখী হইয়া কহিল, “খাও মা’কে বেঁধে
বার পাথের প্লা’ নিয়ে এলো।”

(৬)

অরুণ পরে সত্য নিজেই কাপড় ভাষা ছাড়িয়া
জননীর ককে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল চপলা
মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে, জননীর মুখ অত্যন্ত
গম্ভীর। কিন্তু পুস্তকে দেখিবারাঙ্গ রাসদণ্ডির
মুখের সে গম্ভীর্য অদৃষ্ট হইয়া যেন এত
মুখের উপর প্রকট হইয়া উঠিল। আনিয়া তিনি কহি-
লেন, “বার ও ছুড়ি বেশ অল্প হইবে, বাবা।”

সত্য প্রহরমুখে কহিল, “কতগুলো বাড়তি
টাকা পেলাম মা, তাই দিয়ে গরনা গুণনা গ্রেত
এনেছি। অক আর সুকীকে যে হার আর ছুড়ি
দিয়েছ তা’ আর কেনের ত মিথ্যা মা! ওদের
বিয়ের সময় ত কিছুই দেখা হয় নি।”

রাসদণ্ডি আরও গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “বৌমার
বাপের বাড়ীও ছুড়ি তার আমার ব্যক্তিগত পকেট
আছে, ওটা তা’ নিতে যাক কেন। আমিই বা
তা’ দিতে বা। কেন?”

সত্যস্বরে এক যেন অরুণ জননীর পাশে
বসিয়াছিল, তাহার পলায় ওজনর চপলার বাপের
বাড়ীর সেই হার ছড়াকি হইতেছিল, রাসদণ্ডি সে
কথা একবারেই মনে ছিল না। তৎক্ষণাৎ অরুণ
জননীর সেই সুগটা সুগাইয়া পাইয়া কহিল, “হার

ছড়াটা আর থাক্বে শুধু শুধু পড়ে থাক্বে, তাই আচ্ছ বেগ করে পরেছি, হ্যাঁ! না কি আর তা' জানে! "

সত্য হাসিয়া কহিল, "তা' পরেছিল, বেশ করেছিল। ও আর তোকে কিয়রে গিঁতে ধরে না!"

- অকস্মতঃ হঠাৎ বিদ্যা কহিল, "বৌদির ও বাপের বাড়ীর হার আমি নিতে যাব কেন বাবা? একদিন নেমস্তত্র বাড়ী গিয়ে পেছলান বলে বৌদি আর সে দিন থেকে রোগ করে ও হার পরে নি, মা! থাক্বে পড়ে ছিল। কে পাগ কুড়ান্তে বাবে খাবা?"

রাসমণি কহিলেন, "বৌঃ থাক্ আবার হারিন, অকস্ম গরনা পহার ভাবনা কি?"

কিন্তু হারিন অর্থাৎ অকস্মতঃর পানী সানাত্রিণ টাকা হাইনের কেতানী। সে তাহার খাম পায়ে ফেলিয়া কোন রকমে ছই বেলায় অগ্রেয় স্থাপন করে। সে তাহার ক্রীকে পানো গড়াইয়া বিবে, কখনো সত্যর নিকট কেমন অদ্ভুত ঠেকিল। তাহার উপর অকস্মতঃ চণলায় বৎক যে কথা বলিল তাহা শুনিয়া সত্য অস্তরে বিবর বেবনাও পাইল।

অকস্মতঃর মননীর মূখের দিকে চাখিয়া লইয়া কহিল, "জাহো পুরণো গরনা দেব কেন বাবা, নতুন গরনা বধি নিতেই হয় নেব?"

সত্য অকস্মতঃর কহিল, "বেশ, আমি নতুন গরনাই পড়িয়ে দেব।" এই বলিয়া সে কক হইতে বাহির হইয়া গেল। আদিক পরে হাত মূণ বুইয়া নিজের বকে কিয়দা দিয়া সেবান অকস্মতঃর খাণ্ডের যেকানী হাতে লইয়া ধাঁড়াইয়া আছে। বদকাল হুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া যেকানী হইতে একটা লম্বা তুলিয়া লইয়া গালে ফেলিয়া দিয়া চক্ চক্ করিয়া এক বেলায় মল পান করিয়া সেলাসটি খাখানো রাখিয়া দিল।

অকস্মতঃর কিছু না বলিয়া যেকানীখানি হাতে করিয়া মননীর মূখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "এই দেখ বা, বাবা কিছুই খেলে না। তোমারই ত বোধ, প্রথম থেকে যদি আলসা না দিতে তা' হলে তোমার বৌদি এমন করে তোমার ছেলেকে বদ করত পাওত! এখন থেকে খুব সাবধান হও না, না হ'লে আশাবের সবাইকে অনেক মূখে পেতে হবে। তুমি ত পুত্রের মাথা একবারে খেয়ে বসনি যে ছেলেকে খাখাটী অবধি দিবে আপতে পার না?"

রাসমণি অগ্রস্তমূখে কহিলেন, "জাহ বাকি-বহুনা দিসনে না। সত্য, খৌটার এখন জাউটা হ'য়ে পড়েছে সে-ব আমি একে অংগ পুড়ে বড়ি, আর কাটা হ'য়ে মূনের দ্বিটে দিসনে। লামান হ'তে হবে বৈ কি তা আমি :বুঁত না, তোনাকে এমন দিয়া দিওকি, সে যদি বড় বোকোর বেচে হয় তবে দিনের বেলায় আর সত্যর সান্বে বাবে না?"

সে দিন পড়ীর রাতে চণলা লখন করিতে আসিল। সেই যে সে তাহার বস্ত্রকে গরনা বেখাইতে রাখিছিল, তার পর এই প্রথম সে এক ককে প্রবেশ করিল। সত্য হাতের উপর মাথা রাখিয়া চোখ চাটাইয়াই শুইয়াছিল। চণলা তাহার নিকটে আসিয়া ধাঁড়াইতেই সে ছই হাতে তাহাকে বকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, "আমি কি করেছি যে তুমি আমার ওপর এমন মিষ্ট হলে?"

চণলা দ্বির করিয়া আসিয়াছিল, সে আল খানীর মূখে কিছুতেই চোখের মল ফেলিবে না, কিন্তু তাহার সে সংকল্প কোথায় তাসিয়া গেল। সে চোখে কাগড় দিয়া কাঁদিত লাগিল।

সত্যপ্রিয় কিছুকণ নির্ভীক হইয়া বলিয়া রহিল, এদিকে চণলায় কায়ার বেগও অনেকটা কমিয়া আসিল। পাচকুরে সত্য প্রায় করিল, "কি হয়েছে আশাও বল, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না? না কি তোমার বকেছেন?"

চপলা নিজস্তর হইয়া রহিল।

সত্য ভাবিল তাহা হইলে নাই হয়ত তা'হাকে
তিয়ত করিয়াছে। যদিই বা কঠিনা থাকেন
তাহা হইলে এতটা রোগ করা চপলার কখনই উচিত
হই নাই। যা ত বা! কিছু বলেন তা' ত তাহা হই
তানোর ভ্রত, তাহাকে বিদ্যা দিবার কথা। তাহার
মাকে নিজেরই চপলা নিগের দার মত দেখিত
অত্যন্ত দয় নাই, এই ভাবিয়া মত কহিল, “দার
কথাই যদি তা' কর ত' বলে সত্যি আমার ভাবি
কই হয়।”

চপলা এবারও নিজস্তর হইয়া রহিল।

সত্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “দার কথা
তুমি ঠিক বুঝে পায়নি। আজ্ঞা, তিনি কি
বলেছেন তুমি?”

চপলার চোখের মল শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু
কর্তৃত্বময় তাহার ভিজিয়াছিল। সে আত্মবর্তে
আত্মবরে বলিয়া উঠিল, “তোমার পায়ে পড়ি,
আমার কোনো কথা জিজ্ঞাস্য করে না।”

সে কেমন করিয়া বুঝুট্টা বলিলে তাহার
বক্ত তাহাকে ছোটগোক বেড়ার মধ্যে বলিয়া
গালি দিচ্ছে। সত্য কি ভাবিয়া তাহাকে আর
কোন প্রশ্ন করিল না সেও যেই চিহ্ন দেখে।

পর দিন সত্যের ঘুম ভাঙিবার পূর্বেই চপলা
মধ্যাহ্ন কক্ষা দেখে যে ঘরের বাহির হইয়া গেল,
সত্য আলিঙ্গন দাঁড়ায় পূর্বে সে আর তাহার সন্নিহিত
যেথা কহিল না। সত্য আলিঙ্গন হইতে যথাসময়ে
কিরিয়া আসিল এবং বহুকণ চপলার অপেক্ষায়
বসিয়া রহিল, কিন্তু চপলা আসিল না।

ধানিক পরে তাহার জননী বহুকণে আ সত্য
দাঁড়াইয়া কহিলেন, “এখনও কাশড়-স্বাধা হুড়ুনি
বাধা? সেই কো'ল কাপে দু'টা খেয়ে বেরিয়েছ,
সুখ যে একবারে শুকিয়ে গেছে। স্বাধা বাধা,
কাশড়-স্বাধা ছেড়ে শীঘ্র কর তা' সুখ বুঝে
এলে, আদি বাবার নিয়ে আসি। বৌবার যে কি

হবেছে বাবা, তা' ত জুই বুঝে পায়নি না।
এত করে স্বাধা সত্য এলেন, কাশড় স্বাধা
শুভিরে ফুলে যেন এলো, বাবারা বিয়ে এলো;
তা' বৌ-বা যে কি গো, যে কিছুতেই এসে না।
পরের ঘরে, বৌ কিছু ত মনে পায় না। স্বাধা
বাধা, আর বসে পেলো না, সেই কখন এলেন?” এই
বলিয়া তিনি কক হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সত্য বানিকশ্য বহু হইয়া বসিয়া বসিল।
তার পর ঘরে ঘরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশ্রয়ের
শোখাক গিরিয়াই বহু হইতে বাহির হইয়া গেল
এব আত্মবর্তে এখানে সেখানে গুটিয়া অনেক
রাত্রে বাঁধা করিল।

সঙ্গে সঙ্গে রোগনি তাহার কক্ষ প্রবেশ করিয়া
বলিয়া উঠিলেন, “কাশড়-স্বাধা না ছেড়েই যে
আবার বেরিয়ে দেখলে বাবা,” বিশেষ কাক ছিল
বুঝি?”

জননী কান্দে দিয়া। কথা বলা সত্যপ্রবের
অভ্যাস ছিল না। কিন্তু তাহার কি যে হইয়াছে,
তা' সে নিজেই যোকে না। তাই সে স্পষ্ট
করিয়া কেন উত্তর দিতে পারিল না—কহিল,
“পরীকটা ভাল যোগ হইল না, তাই পড়ার বাটে
এ'ই বেড়ি : এল'ব ম'।”

জননী কহিলেন, “এ' বেশ করেছ বাবা, এখন
পরীকটা সেবেছে?”

সত্য শান্তভাবে কহিল, “হ্যাঁ মা, পরীকটা বেশ
ক' বুঝে বেবেছে।”

বেবিনও অনেক রাত্রে চপলা শুইতে আসিল।
সত্য কাক হইয়া বুঝাইয়া গুটিয়াছিল, কানেই
চপলার শব্দবৎ আশ্রয়ে পারিল না।

এদিক করিয়া দিন কতক কাটা গেল।
এতদিনই পড়ার রাত্রে চপলা শুইতে আসে এবং
ভোরে উঠিয়া চলিয়া যাবে, শান্ত্রিভবনের মধ্যে সত্যের
সন্নিহিত আর তাহার বেথা হয় না। সত্য অতৃপ্ত
উদ্যম দাক্ষ্য লইয়া প্রতিদিন আসিলে দার এবং

আগিল ঘেঁরে কিরিয়া আদিয়া খানিককন যেন
চপলার স্রোতকার ঘরের পানে ঢাকিয়া থাকে।
তালেব আশিশের শোখাক ছাড়িয়া হাত মুখ দুইই
মাথের সামনে বেঁধে তলঃবাগ করিয়া বীড়ার বাহির
হইয়া যার কখনও অত্যাগে পড়েও মাঠে পায়চারি
করিয়া বেড়াই, কখনও বা কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের
বাড়ী দিয়া উপস্থিত হয়। এমনভাবে বেড়াইয়া
গল্প করিয়া সে অনেক রাত্রে গৃহে কিরিয়া আসে।
কোন দিন চপলা আগিলার পুকেই সে স্নানভাবে
দুখাইয়া পড়ে, কোন দিন চপলার অলংকার ছাড়িয়া
ভুইয়া পড়ে, কিন্তু চপলার সমিত বেধা হইলে
উচরের মধ্যে চই ঢাকিবার বেলা হয় না।

ক্রমে চপলার এই বাগার সত্য্য নিকট অস্ব
বেধ হইল। তাহার ক্রাঃ শিখা অগ্নি যে
তাহার অনন্য উপর অকার্য্য অভিমান করিয়া
পেলা তাহার সাংগা একাইয়া চলিতেছে। তাহারই
সমুখে তাহার অনন্য চপলাকে সকালে বিকালে
তাহার কাছে আদিবার জর কত অসুযোগ উপ-
যোগ করিয়াছে, তদুপ চপলা নিজেই কোট
বজাঃ ডাকিয়াছে, তাহার কাছে আসে নাই।
তাহার স্ত্রী হইয়া যে তাহার অনন্যকে অজ্ঞা
করিবে ইহা তাহার নিকট একবারে অস্ব বেধ
হইল। কিন্তু ইহার প্রতিকার যে কি তাহা সে
জানিয়া পাইল না। অলস চপলাকে সব সময়
কাছে পাইবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতঃপূর্বে
তাহার হৃদয় মধ্যে গুটিত রাখিল।

• (৮)

এনি একদিন মাঝে মাঝে কাগিতে কাগিতে
সত্য্য গৃহে কিরিল। নিড়িতে উঠিতে উঠিতে হঠাৎ
অকস্মাতঃ একটা কথা কানে বাইতেই সে চলিয়া
যিয়া দ্বির হইয়া ইড়াইল "বৌবিকে খুব মিথ্যা
বিরোধ ত মা। সেই দিন খেঃ কালের বেলায়
আর দখতার ঘর বাড়ার না। কি এমন মিথ্যা
বিরোধ মা?"

রাসমনি কহিলেন, "বাঃ সেঃ বড় মিথ্যা
আর হইয়া। 'ছাঃ তুমি বহি ঘোড়গোঃ বোড়ার
বেধে না হও তা' বলে বিনের লোয় আঃ ওয়ার
সুখো হবে না। শুণু তাই নয় আরও অনেক বিধেও,
আমি বতকন না লুঃ ততকন রাত্রে ও সে ঘরে
ভুতে যেতে পারবে না। কেন, ঠিক করেছি
কি না? সত্য্য আবার খুব ভাল কেলে, তাকে
আমি 'মা' বুঝিয়ে বিবোধি, সে তাই বুঝেই।
বৌবিকে ও আমি মিথ্যা বিধে এমন কথা বলতে
মানা করে দিরাই। তাই ত সে বলে না, না
হলে কি আর সে চুপ করে থাকতো?"

অকস্মাতঃ রাসমনি কহিল, "তা ঠিক করেছ
মা, না হলে যেতে হ'বিন পরে 'বৌদির হাতে
বাঁধা সব টাকা দিয়ে বিত।"

রাসমনি কহিলেন, "সেই তরই ত আবার সব
সময় হ'ত। বৌদির হাতে টাকা পড়লে তোদের কি
আর কিছু দিতে পারতাম? এই যে তোদের
তথানে চাপ ভাল পাঠাই তা' কত সুকিয়ে পাঠাতে
হয় তা' ত তোরা বুঝতে পারিসনে। সে অনেক
দিনের কথা, একদিন কি বাপো ত সত্য্য নাম্নেই
পড়ে গেহল। কত কষ্টে সে দিন ত মাগলে
নিরেছি।"

সত্য্য আর শুনিতে পারিল না। তাহার মাঝার
মধ্যে আগুন জলিয়া উঠিল। তাহার ঘনে হইল
তাহার পায়ে। নীচে হইতে যেন পুখিরী ঘরে
ঘরে গরিয়া বাইতেছে, তোদের সামনে বিনের
আগো অকস্মাতঃ আছর হইয়া বাইতেছে। কোন
রকমে চলিতে চলিতে সে নিতের ককে বাইয়া
পৌছিল এবং দখতার উপর আছড়াইয়া পড়িল।

বহুদূর সে প্রায় অর্ধ অচেতনাব্যবস্থায়ে শুয়ে
থাবে দখতার উপর পড়িয়া রহিল, হঠাৎ এক সময়
আঁখিঃ চাপকার করিয়া উঠিল, "মা।"

অদূরে পুজার আঁখিকণ্ঠের শুনিয়া রাসমনি

যাত্রা হইয়া পুণ্ড্র নগরকে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন
সত্য বিজ্ঞানীয় পড়িয়া ছুটকট করিতেছে।

কৃত্তবর্ষ চক্রে জননীর দিকে চাহিয়া বার হই
সত্য কেবল 'মা মা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। উৎ-
কণ্ঠিগা জননী পুণ্ড্র শব্দের বলিয়া কপালে হাত
দিয়া চমকিয়া উঠিলেন, চোখের করিয়া ডাকিলেন,
“ও বোনা ও আক! তোরা শৌণ্ডির এ ঘরে
আহ। সত্য আবার আসে এ ঘরে বেচল হয়ে
গড়েছে।”

পুণ্ড্র অতি বড় কঠোর অস্ত্র দিয়ে কণা
মন হইলে বুকে সত্যের রাখিয়া চপলা ছুটিয়া কন-
মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাসমণি আঁর্জকটে বলিয়া উঠিলেন “এম্বে
যোনা, একবার কপালে হাত দিয়ে বেশ ঘেন
আন্তন টিক্কে লড়ে।”

চপলা রাসমণির পার্শ্বে বলিবার সত্য তাহার
হুই অস্ত্র হতে তাহার হাত হুইখানি চাপিয়া গরিয়া
তাহার বুকের উপর রাখিল।

সে রাত্রে অতের এতটুকু উপশম হইল না,
পরদিন ও আর কথিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল
না। ডাক্তার কামিল, ঔষধের ও ব্যবস্থা হইল,
কিন্তু যোগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল, সত্যশ্রিত
প্রায় সব সময় অষ্টান্তের মত পড়িয়া থাকিত।
মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণের জর যখন তাহার জ্ঞানলতার
হইত, সে ‘মা মা’ বলিয়া কণ্ঠের ডাকিয়া উঠিত।

এমনি করিয়া দিন মসেক কাটিয়া গেল।
এবার যিনের দিন রোগের একটু উপশম দেখা গেল।
লভ্য মাঝার মধ্য অমনেকটা কথিয়া লাগিল।
এখন সে লোক দেখিলে চিনিতে পারে, লোকের
কথা শুনিতে বুঝিতে পারে। এমনি অবস্থায় এক
দিন মধ্যাহ্নে সে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। রাসমণি
চপলাকে একটু দূর ডাকিয়া চাপা সমাধি করিলেন,
“ডাক্তাররা বলে গেল শুশ্রূষা, কোন ভয়ের
কারণ নেই, কিন্তু যোগ দিতে এখনও অনেক বেড়া।

যে ক’টা টাকা ছিল তা’ত এ ক’দিন ডাক্তার
ও ঔষধের দান দিতেই সব খুঁটিয়ে খেছে। এখনও
কম টাকা ত লাগবে না। তোমার স্বামীকে
কিছু বার করে দাও, না হ’লে চান্দা ক
করে।”

চপলা নিশ্চিত মেয়ে পুণ্ড্র বুকের দিকে চাহিয়া
মুখ কণ্ঠে করিল, “আমি টাকা কোথায় পা
না।”

রাসমণি সে কথা কণ না দিয়া করিলেন,
“সত্য আবার যে ক’টা টাকা দেয় তা’ত
সত্যেরই খরচ হবে বার। আমি কি তার থেকে
কিছু বাঁচিয়ে রেখেছি যে এখন বার করা। তুমি
বাঁচা এ সময়ে টাকা ভগ্না লুকিয়ে রাখ না,—
বের করে দাও। এক বছরে সত্য ত তোমার কন-
টাকাটা দেয় নি। আবার কি মাইনের সব
টাকা বিসিয়ে নে, বাকি টাকাদুগুন লই ত
তোমার বাঁকে আঁ? হেলের মতো এক আনার
মাখার টিক নেই। তোমার সোজা হাত করে লুটি
যাও আর আনার আঁখা না। সত্য একটু
খুঁটিয়ে, দিবে বাক্যকি করে তার গুণটা ভেঙে
দিয়ো না।—টাকা কটা বের করে দাও।” একটু
খামিয়া আবার করিলে, “এমন কঠোর পুণ্ড্রের
মত বোনা হ’বে বাঁচিয়ে রাখলে ত আবার চপ্বে
না—হেলের চিকিৎসা ত করতে হবে। টাকা না
দাও, এখানেই পড়া পুণ্ড্র দাও, তাই বম্ব রবে
টাকা এনে আসে হেলেকে ত বাঁচাই।”

অতঃপর দিন ছই পুণ্ড্র সত্যের হাতে ত ক
ঘরের একখানি কাপড় পড়িয়াছিল। তাহার
কনিষ্ঠ জ্ঞাতা, জ্ঞানব্রতীর নামে পণ্ডিত বাঁকে। টি
পুণ্ড্রের টাকা লইয়া পড়িল, ই কামরখায়ে
তাঁহারই লিখা দেখা গেল। তাহা ছাড়া তাহা
জননী যে মধ্যাহ্নের খরচ চপ্পে কিছু কি,
বাঁচাইয়া মাল খানিক পুণ্ড্রের তাহা অশো
একখানি পাঁচ টাকার কোম্পানীর কাপড় খরি

করিয়াছিল, সে যথোপযুক্ত সত্য কানে গাশিয়া-
ছিল।

এইমাত্র হাসানি যে কথাগুলো চপলাকে
বলিলেন, সেগুলো অতি নিরীকণ ভাবে সত্য
কানে গিয়া বাজিল। তাহার চরম মন্তব্য
যথোপযুক্ত আশ্রয় অর্থাৎ উত্তর। তাহার
অন্তিম মন্তব্য ভেদ করিয়া কীর্ণ কণ্ঠে ভিতর
দিয়া ‘মা’ ‘মা’ ধ্বনি বাহির হইয়া সমস্ত
স্বরবানিকে কাঁপাইয়া দিল। একে একে
সে আবার মন্তব্য হইয়া পড়িল।

(৯)

সত্যপ্রিয় হোমস্কেট হইয়া কানে বাহির হইবার
মাপ ছেকে পরে পানের বাড়ীর সেই গৃহিণী
কর্তাকে হাসিয়া কহিলেন “কিন্তু, সত্য নাকি
খুব ভাল ছেলে ?” তাহার মত ছেলে হয়
না, তার স্মৃতি তোমার মনে ধরতে না, এখন
যে পড়ার একবারে তি তি পড়ে গেছে !”

কর্তা পড়ার হইয়া কহিলেন, “পড়ার ছেলে,
হঠাৎ অনেক টাকা হাতে পড়ে গেছে, মাথাটা ঠিক
হয়তে পারে নি, ছেলে পরে সাবলে যাবে।”

গৃহিণী কহিলেন, “বাবো বলে ত মনে হয় না,
আগে একটু আদমি মন খেঁও এ ধর আনি
শেষে, কিন্তু মন খানেক পেকে শুষ্কি বস্তু
বাড়ারিকি কয়ে। সেই ভাত খেয়ে সকালে
বোঁবে যায়, রাত্রি দুটোর আগে নাকি আর
বাড়িই ফেরে না, পড়ে থেকে কোন্ হুগোর পড়ে
থাকে। যেমন ভাল ছেলে ছিল তেমনই অবশ্যপাতে
গেছে।”

কর্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “একটা
বাড়ি ভিৎসে, তা আনি আগে মানুসাম না,
তবে মনেতে পাই চারদিকে ধাক্কা করে বেড়াচ্ছে।
অত মন বেলে কি মাইনেও টাকার কুপোয়। ওদের
সমস্রিও খোঁচ হয় খুব কটে চলে, কি বল ?”

গৃহিণী গালে হাত দিয়া কহিলেন, “এদা

একটুও না, বরং রাত্রিবিদ্য নগরী আশ্রয় চলে
যেহেতু। খেয়ে দুটো ত খায়েছ মতো পড়ি বিন
এসে থাকে, তাহে: সত্য পোষ ও খেয়ে চলে
পড়বার খা। দেখলে, পড়ি বলি, আবার মা এক-
বারে বলে যায়। তার ওপর মাঝাইয়ের ত প্রাই
নেবস্ত্র হচ্ছে, তাহে: নোংরা খা কি ?” একটু হাসিয়া
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার কহিলেন, “কিন্তু
কটে হয় বটটাকে খেয়ে, ক’বাসের তেরে বেচারি
মুখে আনি একদিনও একটু হাসি দেখানো না,
মুখখানা খেন না সময় শুধিবেই আছে। একখানা
খা পড়ি একদিনও তাকে পড়তে দেখি বি।”

একদিন সত্য প্রাই কিছুর মতল মশাণ বাড়ী
কিরি,তখন অবশ্য রাত্রি এসাটা বাহিয়া গিয়াছে,
চপলা ও সৎমাতা মনেককে প্রবেশ করিয়াছিল।
অবশ্য প্রাইমেই সত্য চোখের বিন্দুতেই চপলা
পাখা হইয়া নিঃশব্দে হাওয়া করিতে লাগিল। সত্য
অনেকটা মুখ হইলে চপলা তাহার মুখা
শোখা হাওয়া দিল। সত্য মুক্তি পাইয়া তেমন
নিঃশব্দে চোখের উপর বসিয়া রহিল। চপলা
তাহার পানের মূখে হাঁটু দিয়া বসিয়া পড়িয়া
তাহার হাত চাপিয়া বসিয়া যথাক্রমে বৃষ্টিতে
তাহার মুখের কিকে চাপিয়া আর্জকটে কহিল, “কেন
তুমি এমন হলো ?”

সত্য মুখ কাটিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া
আদিল। অতি কটে সে কহিল “চপলা আমার
কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না। আমি ত তোমার
কোন কথা জিজ্ঞাসা করি না।”

চপলা তাহার পানের উপর মূখ
কাটিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সত্য হই হাতে চপলার মুখখানা
তুলিয়া বসিয়া কহিল, “চপলা আমি তোমার কোন
দিন অন্যায় করি, তুমি কথা খসেন ?”

চপলা বেদনাক্রিষ্ট বৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে
চোখিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

সত্য সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল,
“আমি যত বলই বাই না তেজ, এ আনন্দই আমার
লাগবে যে তোমার অনাধার করা কষ্ট কবা বলায়
যত অস্ত্রায় আর কিছু নেই। উঃ বড় যন্ত্রণা চপলা,
কত যন্ত্রণা।”

চপলা স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া কাতর
দৃষ্টিতে তারার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল “আর
ও সব খেচো না, কোথায় যেথো না তোমার দিকে
আর স্নেহে পারি না।”

অন্যকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সত্য কহিল,
“অনেকদূর এগিয়েছি, ফেরবার ইচ্ছে ও নেই,
পড়িত নেই। তুমি আমার কিছু বল না।”

চপলা হুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া
নীচেরে অঙ্গ বিসর্জন করিতে লাগিল।

দিন হই পরে আগিলের কাল শেষ করিয়া
সত্য এক ঘোঁটেলে আকর্ষিত যন্ত্রণান করিয়া ঘোঁটেরে
চাপিয়া গৃহে ফিরিল। তখনও সন্ধ্যার কিছু দিগন্ত
ছিল, সত্য এক ভাড়া নোট পকেট হইতে বাহির
করিয়া হাতে লইয়া টলিতে টলিতে জননীর সন্মুখে
উপস্থিত হইয়া নোটের ভাড়াটা তাঁহার পায়ে
কাছে ফেলিয়া দিয়া অদ্ভুতকণ্ঠে কহিল, “নোট
ক’খানা ভাল করে শুধে নাও যা। এমনি খেতে
আমার আরো পকাশ টাকা বাইনে খেতেই।
আমি ওর থেকে একটা পরমাণু খসে করি নি,
তুমি ভাল করে শুধে দেখ যা।”

রানমণি নোটের ভাড়াটা হাতী হইতে তুলিয়া
লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তেমন অদ্ভুত-
কণ্ঠে আবার সত্য কহিল, “খালি নোট তুলে নিলে
হবে না যা, শুধে নিতে হবে, না হ’লে আমি এখান
থেকে কিছুতেই নড়ব না যা, এই বলে পড়লাম”
এই বলিয়া ওপাস করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া
পড়িল।

তাঁহার হুই ভগিনী জননীর পাশেই বসিয়া
ছিল, তাঁহার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

রক্তবর্ণ চক্ষে তারাদের দিকে চাহিয়া সত্যক-
সকালন করিতে করিতে সত্য কহিল “আমি মাতাল
হয়েছি মনে করেছিল। মা তুমি নোট শুধে নাও,
না হলে আমি এখান থেকে নড়’চান, না।”

তাঁহার হুই ভগিনী হাসিয়া উদ্ভাস হইয়া
উঠিল, হাসিয়া এ ওর পায়ে লুটোপুটি খাইতে
খাইতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রানমণি সত্যের নোট ক’খানি শুধিয়া
ধেখিলেন।

সত্য তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল, “শ্রীক হয়েছে
পকাশ টাকা বেনা পেয়েছি না? না, না।”

রানমণি কহিলেন, “হ্যাঁ বাবা পেয়েছি। তুমি
এখন কাপড় চোপড় ছেড়ে ওঘরে গিয়া শোও যা।”

অন্যকাল নিঃশব্দ জননীর মুখের দিকে চাহিয়া
থাকিয়া কোন রকমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অধিও পাবে
সত্য কক্ষের বাহির হইয়া আসিল।

চপলা বাবা-মার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।
পরশে একখানা আধ-মহলা কাপড় এবং হাতে হুই
সাহি পাঁখা ছাড়া আর কোন অলঙ্কারই ছিল না।
সত্য সেই দিকে চাহিতেই দেখিল, চপলার হুই
চোখ দিয়া অঙ্গ পড়াইয়া পড়িতেছে। সত্য বিস্মিত
হইয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে মাথা তারার মুখের
উপর তুলিয়া পড়িল, সমস্ত দেহ তাঁহার তুলিতে
লাগিল। একবার বা দেহভাগ একবার বা হেলি
ধরিয়া নিজেতে কিছুকল দেহো গাখিয়া দিড়ির
দিকে ছত্রস্তর হইল এবং নীচে নামিয়া গিয়া গৃহ
হইতে নিজস্ব হইয়া গেল।

সেদিন সত্যের মার প্রায় অষ্টোত্তর অবস্থার সত্য
গৃহে ফিরিল। বাড়ীর সকলে তখন নিত্রিত জোড়ে
বিলাসলাভ করিতেছিল, কেবল চপলা উৎকর্ষ হইয়া
দিড়ির উপর বসিয়াছিল। পরে সাইগামাত্র পবর
ধরজা খুন্দিয়া দিয়া সে কোন রকমে সত্যকে উপরে
আনিয়া শয্যার উপর পোয়াইয়া বিল। চোত্রের সমস্ত
সত্য কতকটা অকৃত্রিম হইয়া চাহিতেই দেখিল, চপলা

তাহার পিছরে বসিয়া তখনও চাওয়া কবিতায়ে ।
সত্য হাত চাপিয়া বসিয়া ব্যতিক্রমে তাকিল,
“চলো!”

চলার এই বক্তব্য শুধু কাটা বস্তুর করিয়া
এল করিয়া পড়িল।

সত্য যখনো দ্বিভুততঃ বলিয়া উঠিল, “উঃ আর
পারি না যে বহু যার, যে বেস্তা ব্যক্তি যার আমি
যে তাকে আত্মস্বামী বলে বুঝা করতাম।”

কাহিনতে কাহিনতে চলল কহিল, “আমি তোমার
আর কি বস্তু, জুড়িত পদ্যোক্ত। আমিও যে আর
আর সঙ্কর করে পারি না।”

সত্য সত্য তাহার হাত ছাড়িয়া বিয়া উঠিয়া
বসিল এবং ঐকান্তিক তামার সুবে বিকে চাহিয়া
নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

সে দিন সত্য আর কামিল গেল না, পথ
হইতে উঠিল না; কিছু সুখেও গেল না। পথ
তাহার অত্যধিক মনোহীন বস্তু তাহার শরীর কেন
অংশে বোধ হইতেছিল। কিছুই বেন তাহার
ভাল লাগিতেন না। তাহার মনটা কেন সঙ্ক
করিতেছিল। কেনই তাহার মন হইতেছিল,
সে কেন এমন তাই বস্তু হইতে চাহিয়াছে।
কেন? উঃ, সে শুধু বুঝিয়া গুই হাতে বুক
চাপিয়া বসিয়া “আর উপর পড়িয়া ছুটুকটু করিতে
লাগিল। আত্মস্বামীর রক্তা পাইবার কি কোন
উপায় নাই? সত্য সত্য চলার কোন স্থানসূচি
তাহার মনস্তত্ত্ব সন্মুখে উদ্ভাসিত উঠিল। এই
তৎ এতজন আছে যে টোকা চাহে না, শুধু তাহা-
কেই চাহে? এ বস্তুটা ত তাহার প্রতিনিধি মন
পড়ে নাই। সত্যের আর বেন বস্তু আত্মস্বামীর
সত্যের সত্য পাইল। সন্মুখে কাটবস্তু
দেখিতে পাইলে সত্যের ব্যক্তির স্বরূপ বেন
আনন্দে বুঝা করিয়া উঠে, সত্যের সত্য বিস্ত
স্বরূপে বেনই আনন্দে বুঝা করিতে লাগিল। সে

আত্মস্বামীর পাইবার কি? বেকা হইতে লাগিল।
এক দ্বারদ্বার নিঃশব্দে হস্তের দিকে লাগিল।

দিন সাতের পরে পালের ব্যক্তি কহিলেন,
“সত্য শুনিও যে বেস্তা বিস্তে?”

শুধিলে কহিলেন, “এখন পালের আগেই ব্যক্তি
আসে, আর তৎবেস্তা দেবনি। তাৎৎৎৎ তাৎ।”

কহিলে কহিলেন “আমি ত তোমার বেনস্বামীর,
হরিন পরে পাইলে বেনে?”

শুধিলে কহিলেন, “আবার আরও কর্তে
কঃন। ব্যক্তি, হাত হইতে এখন পু. ব্যক্তি।”

ইহার পর আটটা দ্বি. কাটা পাইলে। এক
দিন প্রাঃকালে সত্য তখনই সন্মুখে উপস্থিত হইয়া
কহিল, “হা, অঃমরা ব্যক্তি।” চলল। পিছনে
কাটা হইল।

কোথার হাইতেছে এ প্রশ্ন করিবার পাইল
হাস্যের হইল না। তিনি শুধু মিথ্যা কহি-
লেন, “কখন কিরবে?”

সত্য কহিল, “আমি না মা,” আর কিছু
বসিল না, চলল। লইয়া তখনই কক তাৎ করিয়া
গেল।

পরদিন সত্য ও চলল। বেন কহিল না, তখন
হাস্যের ব্যস্ততাবে স্বামীর মিকট উপস্থিত হইয়া
কহিলেন, “সত্য মোমকে নিয়ে কোথায় গেল বস
বিধি? আমর ত কিরবে না?”

হাস্যের স্বামী দলারের কোন কথাই থাকি-
লেন না, কহিলেন, “আমাকে এ কথা মিথ্যা
করে ত কোন লাভ নেই।”

আমি আবার পাইয়া নিঃশব্দে নিঃশব্দে
কিিয়া গেলেন।

কম্পের কাপিল হইতে পালের লইয়া আসিল
যে তাহার বঃ এক বঃস্বের ছুই লইয়াছে; কিন্তু
কোথার পাইলে, তাহা কেন জানে না।

পূজা

(জিলীমা বেনী)

আজ পেরেছি জুইতে মাথা অপরানীয় পায়ে,
সেই সরসে বস আমার হৃদয়ে প্রাণের বায়ে ।
ছোট্টর কাছে ছোট্ট হ'লেম, এড়িয়ে যান্নের দ্বার,
এ বন-কুসুম আপনি যে তাই পড়ল ত্রাণা পায়,
হারা আবার যেমন দিল তাদের হৃ' হাত ভ'রে,
যা ছিল মোর বিনিময়েছি যে সেই সুখে চোখ স্তরে ;
যিক্ত আবার কঙ্গল হারা তিক্ত বচন ক'রে,
লিক্ত তাদের তপ্ত এ পপ, ক'রতু যে প্রেম ব'রে ।
যাকের হাতের চিহ্নের আঘাত দাঁপ দিল এ কুচে,
বিলিয়েছি মোর সব অন্তর তাদের বিকৃত সুখে,

আবার হারা মাঝিবে 'দিল দার' জীবা লাচে,
ভাঙেরই আজ মধুর ক'রে বিবেরি প্রেম লাচে,
এই কাচেতে পাইনি দবর অস্তরণে ঘেমে,
বাথার পোণিত বাপ তথাতে বাথার তাল বেমে ;
তোবার শূণ্য হুগ চন্দন, তোবার গগন নাগ,
হয় নি চন্দে, হয় নি গাঁথা, হয় নি প্রাণী মাগ,
তোবার মাথার অগুরু বারি সিন্দর সুগবন,
তোবার যানের কর্পূর আর হৃদে ঢালা ব্রন,
হয় নি রতন, হয় নি আলন, অ'ন্ননাতে অ'ঁকা,
হয় নি যে আজ বদন তলে পরান রেণু রাধা ;

এটুকু মোর পূজা হে আজ পুঙ্খিবে অহতায়,
স্বপন শূন হৃদ পীতে গৈবেছি এই হার ।

সমালোচকের কাজ

(শ্রীচাক্স মির)

দেখিন কোন এক সম্ভার অনৈক প্রাণিক সাহি-
ত্যিক সমালোচকের উপর অথবা আক্রমণ করিয়া
বলেম, 'ঈ'হারা সমালোচনা করেন ভাণ্ডারের
আপেক্ষা হাচারা বই লেখেন তাঁহারা যে কম সুস্থিমান
এ অথবা ত মনে হয় না? সমালোচকের গঠন
করিবার শক্তি কোথায়? ভাগ-মধ্য বিচার করিয়া
বিচার তাহারা কে?"

কথাটা মনে লাগিল না। গঠন করিবার শক্তি
সকল সমালোচকের নাই থাকিতে পারে; কিন্তু
কাহারও যে না থাকিবে এ কথা ভেদন করিয়া

যাকার করি। এ দেশে সমালোচকের সংখ্যা খুব
কম। তাহার উপর বাহারা এ কার্যে তৎপর
করেন তাহাদের জ্ঞানের গভীরতা ও অন্তর্ভুক্তি, বস্তু
বিচার শক্তির অভাব বৈশিষ্ট্য হয় না তাহাও বলি
না; অথবা এখন তথাকথিত সমালোচনার নামে
নিহিত অতি বা নিহিত নিম্না যে বাতির হয় তাহাও
সমর্থন করি না। মর্যে মর্যে সমালোচনার নামে
ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারিত হইতে দেখিয়া মর্মান্ত
হইতে হয়। ইংরাজীতে বামাকে Destructive
criticism বলে যেমন দেখি-দেখান, ভাবন

করে তাহার সঠিক ধরন জানা না থাকিলে সমালোচক আলোচ্য চরিত্রগুলি স্থিতিতে পারিবে না।

বৈ-জন্য পূর্ণ ধারণা বা সত্য্যের লইয়া সমালোচনা করিতে অগ্রণের হওয়া কর্তব্য নয়। অসঙ্গতি বা টান বাক্য (Bias) সমালোচকের পক্ষে অত্যন্ত গহিত কাণ্ড। ম্যাপু আর্গুমেন্টের মতে disinterestedness নিঃস্বার্থ ভাবে আলোচনাই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃত সমালোচকের কোন দলের বা পক্ষীয় সংকীর্ণতার মধ্যে বাস করা উচিত নয়। উদাহরণ দ্বিতীয় থাকিলে অপরোক্ষভাবে তিনি বলেন: মতের বিতর্কে যে অধিক পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে বিজ্ঞতা কি? এ-প্রশ্নে দ্বন্দ্ব মতের সমালোচকের মধ্যে পূর্ণ পক্ষপাতের যৌথ বোঝা বাইত, কে-এর রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার বিভিন্ন দলের মুখপত্রের সমালোচনাতে এই পক্ষপাতের ঘোষ বেশ পঙ্খিটু ভাবে দেখা বাইতেছে। নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করা বলের মধ্যে থাকিরা বড় সহন নয়। আনুগত্য সাহিত্যিকদের ভিতর ও এক্ষণ হল বাহিরে চোরাই হইয়াছে হইতেছে। বলের লোকের লেখা সমালোচনায় বখার্বন্ধ হইতেছে না। অবজ্ঞা হল বাহিরে বোঝাই প্রথমে বলিলাম। হল বাহির অত্যধিক ক্রোধের ফলে সমালোচনা যে ভাল হয় না হইতে পারে তাহার একটা কারণ দেখাইলাম। হল সৃষ্টির অন্তর ও বুঝ আছে। বলের ভিতরে থাকিলে বলের মতটা বেশ মথমে অনুমান করা যায়। হলদ্বারা সাহিত্যিকদের ভাবের আদান প্রদান হইয়া ভাবের খাটোটা পুষ্টিলাভ করে; কিন্তু আবার অজ্ঞাত বলের ভাবের সহিত পরিচয় না থাকায় রূপ, বিকৃত বাহিরের মতটা কানিয়ার হুযোগ না থাকায় বা প্রচার সহিত আলোচনা না করার ফলে প্রত্যেক বলের ভাব মূল পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

এত পার্থক্যে অগতে থাকিবেই থাকিবে। আবার

মতের সহিত অপর মতের মিল না থাকিলে বিজ্ঞ মতটার যে কোন মূল্য নাই একথা তাহার মনে স্থান দেন, তাহার অস্বিকার ও অস্বত্ববিচার বশেই রূপ করিয়া থাকেন। সত্য্যের দ্বারা বশবর্তী হইয়া এবং কোনরূপ বিবেচ্য প্রাপ্তি না হইয়া স্বাধীন মতের পার্থক্য রাখেন তাহাবিশেষ বোধ দিবার কিছুই নাই। অগতে প্রকৃত বস্তু পার্থক্য honest differences of opinions থাকিবেই থাকিবে। আর লেখক থাকিবে দরকার। মতের ঘাটাই করিবার রূপ—মতের প্রকৃত ঠিক করিবার রূপ বিভিন্ন মতের অস্তিত্বের প্রদর্শন আছে। বাকী সত্যই বলিবারে, Antagonisms are our real friends। তাহার আশ্রয় করি মতের দ্বারা বস্তু আদানের প্রকৃত রূপ। কোন কোন আদানের বোধগম্য দেখাইয়া দেন। বিভিন্ন বস্তু দ্বারা আদানের প্রকৃত রূপ ঘাটাই করিয়া লইতে পারি। সমালোচকের মধ্যেই উদাহরণ পাকা পুই বরকার।

এখানে কিন্তু একটা কথা উচিত: সমালোচকের মধ্যে মতের অনেক হইবে অনেক মতের মধ্যে চলি। কারণ মত শিরোধার্য করিয়া লইব। আদানের মধ্যে মত বিবেচ্য হইলে যেরূপে প্রশ্ন লইয়া যে টানটানি হয় তাহা ও মতলেই প্রদান। উত্তরে আদান এই মতের মিল: চাই, নিজের বিবেক বুদ্ধির দ্বারা ঘাটাই করা উচিত কোন মতটা প্রদর্শন আর কোনটা প্রদান। অস্বত্ব বিজ্ঞ মতের সম এই সমগ্র প্রকৃত। কিন্তু মনে রাখা উচিত অবিকার্য হল সমালোচকের এক-ধর্মবশী হইয়া মত নিয়ম থাকেন, অস্বত্ব তাহার যে মূল ফল হইয়া করিয়া এবং কখন তাহা বলিতেছি না। সমালোচকের নিজের মতের যে বিজ্ঞা হুট্টা উঠে সেই মতটা দেখিবার তিনি মত প্রকাশ করেন। অনেক হলে বস্তুপরিচিত ভিন্ন ভিন্ন রং দেখিবার পারের ভিন্ন ভিন্ন রং এবং কল্পনার মত, অথবা হাজার আশ্রয় দেখিয়া অস্বত্ব বিবেকের পরিচয় মত সমালোচকেরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া

থাকেন। এগুলি আদ্যা পুণ্য করিয়া এক অবশ্য
সত্য উপনীত হইতে পারি।

আসক্তির অত্যধিক ফলে সমালোচনার নামে
যে ইচ্ছাকৃত অথবা নিষা ও সুবলা কিংবা অথবা
অন্যথা বাহির হয় তাহা যেখান বাস্তবিকই মর্মান্বিত
হইতে হয়। অবশ্য কালের দ্বারা প্রকৃত সমালোচক
কেহ নাই তাহা নানি। ভাল যে সেখানে যেখানে
যথিতে পারে তাহাই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবে।
কালের কঠিন পাকের দ্বারা নাই হলে কোন দেশের
কোন সাহিত্যই টিকিতে পারে না। কেহ কেহ
বলেন সমালোচকের অথবা নিষা বা প্রশংসার কি ই
বা আসিয়া যায়? আসিয়া যায়। এখানে লক্ষ্য
যেমনের একটা কথা ভুলিয়া যি :—“Though we
have no apprehensions that puffing will
ever confer permanent reputation on the
understanding, we still think its influence
most pernicious. Men of real merit will,
if they persevere, at last reach the
station to which they are entitled, and
intruders will be ejected with contempt
and derision. But it is no small evil that
the avenues to fame should be blocked-
up by a swarm of noisy pushing, elbow-
wing pretenders, who though they will
not ultimately be able to make good
their own entrance hinder, in the
meantime, those who have a right to
enter” সমালোচকের অথবা বাহ্যিক অথবা
লোকের দ্বারা যশ কখনও হইবে না, তাহা আমরা
আনি; কিন্তু এরূপ করা ও পঠিত কাজ। যাহা
প্রকৃত গুণী তরঙ্গ সাধন বলে যশের উত্তম নিধি
উঠে, সেই সফল অথবা লোকদের দূর করিবে
ইহা সত্য; কিন্তু যশের পথ গুলিতে প্রবেশ
করিবার যাহাদের প্রকৃত অধিকার আছে, তাহাদের

প্রবেশ করিতে না দিয়া যাহা অনধিকারী
তাহা অনর্থক পথ ভাঙে করিয়া হাঁড়াইবে যা তাহা-
কথিত সমালোচকের দ্বারা সমালোচনার-বা
সেই সকল পক্ষে ভিত্তি করিয়া থাকিবে তাহারা
বাহির যিনি যে ত প্রবেশ করিতে পারিবে না।
তাহার ঠেগঠেনি করাই পার হইবে। আর এ
ক্ষেত্রে আরও একটা কথা মনে পড়িল, অধিকার
কোন কোন সমালোচকের কোন কোন দেশের
দেশের উপর অথবা শ্রীতি দেবিতা—তাহাদের
উপর অর্পিত সুখ্যাতির পূর্ণ ভূমি দেবিতা
জৈনক ইংরাজী সমালোচকের তাহার বলিতে
পেলে indiscriminate distribution of
praise দেবিতা, শুধু বা যশ-শ্রীতিই ইহার অন্যতম
কারণ বলিয়া মনে হয়। আমরা কোন কোন
ক্ষেত্রে পুস্তক-প্রকাশকের সুখের দিকে চাহিয়া
ঐরূপ দেখা যায় তাহাও বলিতে পারি না।
কোনরূপ আর্থের বন্ধিত হইয়া সমালোচনা করা
উচিত নয়। এই পথের কাণ্ডে যিনি সত্য হইবেন
যাও বিশুদ্ধ দেওয়া তাঁহার প্রধান কর্তব্য।

কোনও পুস্তক বা চিত্রের সমালোচনা করিতে
হইলে কেবলমাত্র দোষের বৃত্তি বা রূপ-আয়ের
সাধনো করিলেও চলিবে না। প্রথমেই বৃত্তিতে
চৌ করিতে হইবে লেখক বা চিত্রকরের প্রতিপাত্ত
বিষয় কি। তিনি কি আদর্শমতে নূতন তথ্যের
সন্ধান বিস্তে চান—কি শিখাইতে চান—তাহার
বক্তব্য বিষয় কি? তাহাও দেখিতে হইবে সেই
উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে। কলঙ্কভিত্তিক কি
পাইলেন। উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া যে বাস্তবিক তাহা
আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।
অনেক দেশক অস্বাভাবিক চিত্র—পাণের চিত্র
অতিত করেন, স্ত্রীল ও পুণ্য চিত্রের পার্থক্য দেখাই-
বার জন্য। ইহাদের এরূপ কাব্য আদ্যা অঙ্গুলোদন
করিতে পারি, যদি পাণের প্রতি প্রকৃতই তাহাদের
সেবা পড়িয়া যুগ্ম আসে ও পুণ্যের পুতি উজ্জল

হইয়া উঠিয়া উঠে। নচেৎ যে লক্ষ্য লেখক কেবল নিজ কাল্পনিক ও পাপের চিত্র অঙ্কিত করেন তাহা বিপক্ষে কোন রূপে সমর্থন করা যায় না। আদর্শ সমালোচক নহে। সমালোচকিত্ব বিধে লক্ষ্য তাহা বিধি অঙ্কিত না করিলে সে চিত্রের মৌল্য লোকে অস্বীকৃত করিতে পারিবে না। লেখকের স্বভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা সমালোচকের অবশ্য কর্তব্য।

সমালোচকের সত্যের প্রতি বস্তুই কেন অবলম্বিত হইতে পারে না, লেখকের বা চিত্রকরের ভাষা—বক্তব্য—উদ্দেশ্য—প্রতি সমালোচকিত্ব না থাকিলে প্রকৃত সমালোচনা হইতেই পারে না। সেটে কথাটা মোর করিয়া বলিগায়েন, যে লেখক ও সমালোচকের ভাষার সমতা যদি না থাকে তা হ'লে খাঁটি সমালোচনা হ'তে পারে না। সমালোচকের ও লেখকের মূর্তির মূখ একমুখে হওয়া চাই।

আর আদ্যের মনে সেই সমালোচকই বড় সমালোচক হইয়া মনটা ভুল। আর মনটা গলা ইন্দ্রিয়ের মত চল চল। যে কোন মূর্তি তা খেঁচে গড়ন বহুত পাওয়া যায়। ভাষার তরলতার মাপকাঠিতে ও সমালোচকবিধকে যাচাই করা উচিত। আর তাই পাথরে খোদার মত মূর্তি অপরিণতীয়, তাই কাছ থেকে ভাল সমালোচনা আপো করা যায় না। সমালোচকের কাজই হইতেছে লেখকের লেখা পড়িয়া তাঁর মতটা, তাঁর ভাবটা যদি বিচারসহ হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠিতভাবে তাহা গ্রহণ করা—অগতে লেখক-প্রচেষ্টা সত্যের খোঁজা করা। অগতে ভাব ছাড়া কিছু থাকে না। ভাবের নিহতই পরিত্রাণ হয়। তাই চিরন্তন। ভাষার দ্বারা যে বদলাইয়া যায় না তাহা বলি না, পুরাতন ভাষার দ্বারা বদলাইয়া, বান আলো সত্য কিন্তু নূতন ভাষা, পুরাতন ভাষকে আপনায় করিয়া তবে ঠাড়াইতে পারে। অগতে ভাষার বিব্রোহ যে হয় না, যা

হয় নাই তাহা বলি না, তবে অধিকাংশ লেখক তাহা হয় তাহাই বলি। ২২শের ভাষা ভাষার নতুন মনোবো, ব্যতীত কেহই আশ্রিত পারে না। মনোবো ভাষার অগ্রগতি। ভাষার ভাষার সহিত পরিচিত হইতে হইলে প্রত্যেক লেখকই বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। সাধারণ সমালোচক হইয়া লেখকের নূতন ভাষা লক্ষ্যে আধা করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম লেখকের প্রতি সমালোচকিত্ব না থাকিলে প্রত্যেক সমালোচনা হইতে পারে না। অতঃপর বিচারের বৃত্তি, যিহে বলা—নূতন ভাষাকে গ্রহণ করা মনোবো না বিনা। নির্ভীক সত্যকে সমালোচক মনে করেন—যদি তিনি মনে করেন শাস্ত্রী ও মনোবো ইত্যাদি উচিত নয়, তাহা হইলে সেই ভাষাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁর চেষ্টা করা উচিত। কর্তব্য। অতঃপর মনোবো হইতে উচিত।

কর ও অল্প পরোবে কেন কিছুই সমালোচনা করা উচিত নয়। বস-মেকাজী লোক কখনও ভাল সমালোচক হইতে পারে না। আর লক্ষ্য সমালোচকিত্ব তাহা সমালোচনা না করিতে পারিলে প্রকৃত সমালোচনা হইতে পারে না। তিনিই প্রকৃত সমালোচক হইবার উপযুক্ত পাত্র যিনি সর্বদাই সংগ্রহণে থাকেন—বাহার পরো ও মন সর্বদাই প্রকৃত। শাস্ত্রী বা মানসিক অল্পভাষার বা লক্ষ্যের প্রকৃত ভাষার ভা। বা চিত্রা পূর্ণ নয়, বাহার বাক্য পূর্ণ ভাষার মনে সমালোচক হইলে প্রতিভাও হয়—মুহুর মনে বিবেচনা বা পূর্ণতা বান পাঠ না—বাহার চক্ষুর্দর্শি ইন্দ্রিয়ের সর্বদা সমগ্র থাকিবে। বাহার অল্পভাষার সর্বদা হয়, তিনিই প্রকৃত সমালোচক হইবার উপযুক্ত পাত্র।

সমালোচনার প্রতিটি বিবেচনা পাত্র কোন মতেই ভাল নয়। অপরের মনে অধা কষ্ট বেগবা সমালোচকের কাজ নয়। মনে রাখা উচিত হুণ

প্রাতি মানবেরই ইহালা থাকে। জানকীত জুলের
কক সাজা হইতে পারে; কিন্তু শাস্তির বিধান
এইজন্য হওয়া উচিত যাহাতে যে ব্যক্তি আপনায়
জুল ক্রান্তে পারিয়া আপনাকে সংশোধন করিতে
পারে। নিম্নলিখিত সমালোচনা করিলে সে সমা-
লোচনার কোন কল পাওয়া যায় না। ইংল্যান্ডে
একটা প্রবন্ধ আছে justice lampred with
mercy সমালোচনার এই পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া
উচিত। সমালোচকের দ্বারা হইয়া পড়িয়া
যেও হেঁচকি পড়িয়া যায়। সমালোচকের
দ্বারা শুধুই বর্ণনা তাহার দ্বারা
সত্যের সহিত সাক্ষ্যকৃত্তি আদর্শ বোধিত
হই। প্রতিষ্ঠা ও যশ অর্জনের বিবে সমালোচকের
লক্ষ্য রাখা উচিত নয়—কর্তব্যের বিবেই তাহার লক্ষ্য
থাকা যাহাটুক। তাহার মনে রাখা উচিত মানবের
জ্ঞান যোগ্য হইয়া কখন তাহার জীবনের উদ্দেশ্য—
মতের আধোচনা না হইলে সত্য উপনীত হওয়া
অসম্ভব। সাধারণের চরিত্র পরিবর্তন প্রকৃত
সমালোচক যত সতর্ক করিতে পারেন অপর কেহ
হইতে পারে না। শুধু ও শুধুই পড়িতে করাইয়া
হিঁতে সমালোচকের অগ্রগতি ওয়া কর্তব্য।
মুক্তকর্ত্তে শুধুই লুপ্যতি করা উচিত, এখানে তাহার
কৃপণতা করিলে তাহার প্রত্যক্ষ্য থাকিবে। নগণ্য
লেখকের শুধু পড়িতে পাইলে সমালোচক যদি
তাহার শুধু ব্যাখ্যান করিতে কৃপণতা না করেন,
তাঁহা হইলে কালে সেই লেখক সাধনা বলে জাতীয়
সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। সমালো-
চকের দ্বারা যে শুধু শিল্পীর শিল্প-সাধনা যে অকালে
নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায়
না—কত না শিল্পীর মানসসুস্থ হইয়া তাহাদের
সমর্থিতার দ্বারা লেখকের অভাবে শুকাইয়া
গিয়াছে কে তাহার সংখ্যা গণনা করিবে? তাই
বলিতেছিলাম সমালোচকের প্রাধান্য শুধু থাকা
হইয়া সমর্থিত। অর্থাৎ লেখকের তাৎকে

অনুসৃত করা হই—আর তাহার প্রকাশ করা হই
তাহার বিবেকের কোণার। যৌথ দ্বারাতে সংশোধিত
হয়, তাহার বক্তব্যেই যেমন উচিত বটে, কিন্তু
সর্বোচ্চ শুধুই আদর্শ করা হই। অর্থাৎ শুধু
লিখা করিয়া পরে যৌথ কর্ত্তে করা ভাল।

অন্যকালে কোন কোন সমালোচক নুতন
লেখকের প্রতি অসম্মান সমালোচনা করিয়া থাকেন।
তাঁহাদের প্রতি বিশেষ যত্ন বর্জন করিতে কৃতা বোধ
করেন না। তবল যদি লেখকের লেখার বোধ
অনেক আছে, কিন্তু এটা কি মনে রাখা উচিত
নয় যে, কলে না নাহিলে সীতার কি করিয়া
নিষিদ্ধে পারা যায়? নিষিদ্ধে নিষিদ্ধে
তাঁহার বোধ সংশোধিত হইতে পারে—তাঁহাদের
পারদর্শী হইতে হইবে। এখানেই তাঁহাদিগকে
লিখিত্য করা কোন মতে উচিত নয়। অন্যের মনে
হয় সমালোচকের ইহা অগ্র করণীয় যে বোধো
লেখকের বা শিল্পীর পড়িয়া সাধারণ মান
পাওয়া যায়, সেখানে উৎসাহের বা হিঁতেই সে ব্যক্তি
বীজকে সজীবিত করিয়া রাখা। অন্যান্য বা
অপরিজ্ঞাত প্রতিভার বিকাশের সহায়ক হওয়া
সমালোচকের অগ্র কর্ত্তব্য। আর যদি সে বীজের
অন্য-পক্ষ না থাকে তাহা হইলে তাহা কল বিতে
পারিবে না। এরূপ করিলে সাহিত্যে কতি কিছু
হইবে না; কিন্তু উৎসাহের কলে লেখকের মনে
সাধনার পথে অগ্রগতি হইবার বাসনা জাগিয়া
উঠিবে। সময়ে উৎসাহ পাইয়া অনেক লেখক
যে সমর্থিত্যের ঈর্ষুকি করিয়াছেন তাহার নিদর্শন
সাহিত্যে অনেক আছে।

আর একটা অতীত প্রবোধনীয় কথা বলিতে
হই। সমালোচকের দ্বারা-সত্যের সহিত প্রকৃতির
সংশোধন বেন থাকে। প্রকৃতির স্তবে স্তবে—
প্রকৃতির সহিত সমর্থন হইয়া সমালোচক ও যৌথ
স্বাধীন হইয়া যেন। প্রকৃতির সহিত হাত ধরিয়া
না চলিতে পারিলে সন্যাসের প্রতিভার আলোচনা

অর্থহীনতা বা অর্থহীনতা নন, সে কথাটাও তাঁহার জুলিলে চমকে না। বাস্তবিক জীবনের যথার্থতা অস্বপ্ন রূপে বিচারকের যেমন একমাত্র কর্তব্য, সত্যের অজুহাতে সেখানের জগৎপ্রবাহ কর্তৃক তেমনই সমালোচকের অবস্থা কর্তব্য। ব্যক্তিগত হিসাব লোককে তিনি পছন্দ না করিতে পারেন, সমালোচকের স্বাধীনতা প্রদান করিলে তাঁহাকে সেখানের বচনায় উপর আন্দোলন করিতে হইবে—তাঁহার বক্তব্যের ভিতর বিরাট রূপের ব্যাধি প্রকাশিত হইয়াছে কি না দেখাওঁতে হইবে—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বিষয়ে তিনি কতকগুলি কৃতকাব্য হইয়াছেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আন্দোলন করিতে হইবে।

এক কথায় বলিতে গেলে সেখানের ব্যক্তিকে না জুলিলে সমালোচনা করিতে যাওয়া বিতর্কিত। মনে রাখা উচিত সমালোচনা সেখানের নয়—লেখার।

অপর দিকে সমালোচকেরও আপনায় ব্যক্তিগত হাতাইতে হইবে—ভুলিতে হইবে তিনি সমাজ বা কোন সাহিত্যিক হলের নয়। বিচার বুদ্ধিগলে সেখার বিশ্লেষণ করিয়া গভীর ও জীবনের যথার্থতা অস্বপ্ন রূপে লেখকের হৃদয় হইতে সাধারণ লোকের আনন্দ (ও স্নেহ নষ্টে শিখা) লাভ করিতে পারে তাহার জন্য যিনি আন্দোলন করেন তিনিই প্রকৃত সমালোচক।

রোগী ও ব্যাধি

(ঈশ্বারদাস সেনগুপ্ত)

রোগী করে ব্যাধিগুলো মরণের আগে
প্রাণীর মত কেন কাছে ঘোর কাছে ?
হৃদয়েতে মরিতে চাহি থাকু নীরে সতে,
ব্যাধি কাহে, "যাবে তুমি বেঁচেতার ধরে
ভটি হয়ে যেতে হলে, আবার ধরনা
হলে দেখে ইঞ্জিয়ারে বসুধা কাননা,
যাতপূত ভক্ত হন বেহতার ধরে,
নিরে যাব তোমার সপি মরণের করে।"

তুমি

(ঈশ্বরী গতিকা রানী)

তুমি হৃদয় লাভ মধুর উষ্ম স্তবগতি,
তুমি আশিত্য চির-হৃদয় পুরুষ প্রেমান ঘোষিতি।
তুমি ত' কার্য তুমি হে কারে, মৌন হরণ তুমি;
তুমিই সগীষ তুমি সীমাহীন তুমি অগ্নি-খোদ তুমি।
তুমি ত' বিধাতা প্রথমল তুমি তব-তথ্যগী,
তুমি হে নৃতন তুমি পুরাতন, তুমি নব তুমি নারী।
তুমি তোমার স্বপ্ন প্রেম ভাঙা গড়া তুমি সবে,
তোমাগত প্রাণ কেন ভগবান আবার নাহিক হবে ?

বরুণ-উৎসবে

(শ্রীহেন্সকুমার রায়)

আজ বরুণের আদর বাড়ে, বায়ল-মেঘে মুখ বাজে,
 ব্যস্ত চপল তারে তারে বাতাস বাজায় বেহালা,—
 নদীর গায়ে কাজল খোলা, অদৌর মলের বিটনি খোলা,
 ঢেউ-শিঙা দিচ্ছে তালি,—হেগেই করে বেহালা !
 আঁল আঁনি যে রূপের বণিক, যেটো-পথের উজল পণিক,
 বনের মণ্ড হুলুচে কৈশে মর্দহিত মদ্যে,
 হঠাৎ বেখায় খাম্বা রেগে, বোড়ো-হাওয়ার মর্দকা হেগে
 ভাল-তমালে যেতাল মাতঃ তুলুচে তুহুস হলা রে !
 যালের রাধা ফল্কা ধেনে, দিচ্ছে আশুন-কল্কা টেনে,
 চমক করে পল্কা ডালে এক সুগন্ধ-বধূ,
 যেমল-কড়ি'র ধোঁছে বেলা, দুঃখেদুরে মদ্যে' মেলা,
 আজ প্রকৃতি কতক কটিন, কতক মুহ-বধূ !

মাঠের ঘাটের বরুণানিতে, ব'লে আছি মান্দাটিতে,
 জাগুচে কতই ভাবনা চিতে, এই বিষনে একাকী !
 ভাবের ঘরে থাকে দেখা, কল্পনারি চিত্র-রথা,
 জলের ছাঁটের আদ্রনা ঘা'—সে-দব চলে দেখা কি ?
 এই বধুবাঈ এমনি ক'রে, লক যুগের দেতু ব'রে,
 কুবন-কুবন ত'রে এগে কিরে চ'লে গিরেহে !
 আজ বাগলে আদ্যেরো প্রাণ, যে রূপ-ধারা কহুচে পো পান,
 নিল-যুগের আদ্য মাহুবে পেই মধুই তো গিরেহে !
 পূজ-মেঘের পার্জনীতে, পেই দেবদেব এই কিতিতে,
 কুবনের জীব-যুগুটে নাদত বধন বাঁসিনী,
 বধা-বাধার মণ্ড ত'রে, কাঁধত ভিজে অঙ্গ-মোরে,
 একলা-ঘরে কোন্ সে কটিন্ বিবহিনী কামিনী !

না-জানি কোন্ গধন-বনে, যুগে দানব-পুত্র সনে,
 দলোহারা মনের মাহুবে লগড়-হাতে,—যৌর যে সে !
 না-জানি কোন্ তেগাতরে; নীল-পাপরের দীপাতরে,
 না-জানি কোন্ কাটার কোপে—কেনন ক'রে কদব সে !

আমরা হাঁটের খণ্ডে বাঁতে, থাকত তারা ওঁহা'র বাঁতে,
 ঘোঁরে গায়ে শাল-দোলালা—তারে'র গন্ত চন্দ্র গো।
 কেলে, ঘোরা বল্‌তি যেমন, বল্‌তনাকো হারা এমন,
 "বধেখি বিপুল আকাশ—কড় অকৃতির ধন গো।"
 যেখতে তারা এই অকৃতি, বিশ্ব-বোঁর অকৃতি
 গড়-জানি-গণধরী নতিরূপা জননী!
 বিহাতে তাঁর জোঁধের অনল, বুটী পে তাঁর রেজি'র জল,
 ভাবত তারা, কল-পরে জাপেন মান-মননী!

তারপরেতে লাখ-বহু কল্পে হরা শ্রাদ-দয়া,
 মরেতা তবু এই কৃতি, গদা-ঘো—বাবিরা!
 দেবজাতি ঘ'নরে বু'ত, বোজ়ে চাঁ দিলেন জুবে
 কালিদাস জ্ঞার জামেব জার বিদ্যাপতি কবিরা।
 সেবিভেগ তো জে বরষ, আনুত কোঁদল কবির অগন,
 জা'গিরে বিত বেবাহ জুবে,—কৃদাবনের যমুনা।
 বধা-কবি জুমেতে চাহ, গতিভেগা পুঁজে বেড়াই,
 এখন কেবল জুগোল এবং এর তবের নমুনা!
 বৈজ্ঞানিকের হাঁতের ধানী, গেলাকো কল্পে দানী,
 মুক বোঁয়ের পাগ্লা কোঁড়া ঘের পাঠিয়ে অগামী,
 মেগুবেত জে চাঁর জুঁড়ে, কলের বিদ্যান থাকে উড়ে,
 ষ্টিবারাপুট অগত কসু'ত নরে, খোলমৌ।

•

মে বিজা! হে-বহু! আছে তবু এই ভরসা-
 ছুই-চাঁটি বাউল কবি আজও ঘোঁরা'র জোলেন-নি,
 মে-ভরসার গড়ের বেলে, দিত-গোলা বোঁদল খোলে,
 আজও তাহের তাহের কাঁপুত কলের ঘোঁরা'র কোলে-নি।
 আজও তারা তা'গিন্‌ পাগাচ, ঘোঁরা'র সজল নাট্যশালা,
 আজও তারা মিছে ধাঁড়ার জুলে কাঁদের তাড়া রে!
 তার নিরে জোর জপ-ধারী, বুটী-করা জুই জাহরী,
 জে ধারী'র মেলা'র গানে গাই যেন জোর সাজা রে!
 তক তক বাজুক ঘোঁ, দক-দক কাঁপুক কোঁ,
 তুক তুক গা'তা হাঁরা তুক বাঁদল-ভগিনী—
 চিকু'মিকে আনু হলের মালা—যেন হীরে-মণি তা!

জুই-কামিনী কোথায় কোটে,
কখন কোথায় শিউরে ওঠে,
তুই-চাপা সে রহস্য চাপা, হোসে কবল বলে কই !
নাও আগুনের লাগে বেশি, দেখ-পাহাড়ের তলে ঐ !
মত্ত কেকার ভাঙত বাঁশী,
শব্দে যে প্রাণ হত উঠাশী,
হন শেরিঃ হন ছুটে বাহ—যেন আকুল হরিণী,
বর্ষা লো তুই কবির বর্ষা—তোনার তুচ্ছ করি-নি !
ভিজি মাটির পদ আনো,
শোনাও হত ছন্দ কানো,
ঘোরাও ঘরা-বহ ঘোরাও ঘরাও ঘরা-প্রবেশ,
যাক বহুবার মুক ভেসে যাক বিহ প্রেমের প্রাবনে ।

একটি সত্যিকারের রূপকথা!

(ঐপরিচিত গোপাখ্যায়)

হেসে অশ্রু, মা-বাগের মনে আনন্দ আর গর
না; কিন্তু আন্তরিক বিবরণ হেলের মাথা
বললে চেনা চেনা সোনা গুটি। মাথাটাও ছিল
তার মেহের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়, তাই ডাকার
বলি বলে এ হেসে বাঁচবে না, বাঁচতে পারে না।
ডাকার-বলির চরম-বাণী উপেক্ষা করেও হেসেট
বৈতে হইল, শুধু বাঁচা নয়, তরুণ-কব চাবের মত
দিন দিন সে মা-বাগের আদর সোহাগে দেখতে
বেগতে বড় হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু অতি বৃহৎ
মজ্জিত নিখে বেচারা সময় সময় ভারী দুঃখিলে
পড়ে যেত। অতটুকু বেহ অতবড় মাথা বয়ে নিখে
যেড়াতে পারত। কেন, তাই সময় সময় পড়ে গিরে
এখন ধরা আঘাত পেত যে, মাগের প্রাণ ভারী
উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠত। একদিন বাতাসা থেকে
পড়ে গিরে সিঁড়ি বেয়ে পড়তে পড়তে একেবারে
নীচে এসে পড়ল। কলে তার কপালের একপাশে
একটা চোট লাগল যে, অনেকটা ধারপা একেবারে
কাঁক হয়ে পেল। সবসময় মনে করলে, সে আর
বৈতে নেই, কিন্তু মা এখন উর্ধ্বাশে ঘোড়ে এসে

যাট যাট করে তাকে কোলে তুলে নিলেন, তব
বেধা পেলে, কাটান বিয়ে হকের পক্ষে হুঁতিন ফোঁটা
পল সোনা চুইয়ে পড়ত। এা থেকেই মা-বাগ
জানতে পারলেন তাঁদের এ বোকাট কোল কথ-
তেই “সোনার চাব” নয়, আর অতবড় মাথাটার
মধ্যে দিগাই অনেকখানি সোনা আছে—সবরের
বহে ।

বলা বাহুল্য, কথটা তাঁরা গ্রহণনে গোপনেই
রাখলেন। বেচারা হেসেটও অল্প জানতে পেলে
না যে, সে অতবড় একটা সম্পদের অধিকারী।
আগে আগে নে হাউতে শিখলে, কথাবার্তাও সে
দিখা বলতে পারে।

একদিন হেসে তার মজ্জিত শুধালে, “আবার
কেন তুমি বাইরের হেসেবের সাথে খেলাধুলা
করতে যাও না, যা ?”

“মা মা বিলেন, ‘সোনা আবার, মালিক
আবার, তাঁরা তোমাং চুই করে নিখে বাবে যে !’

তাঁরা তাকে চুই করে নিখে, এই তব খেঁচিয়ে
তাঁরা তাকে আপনাদের আত্মনাকেই ঠেঁচিয়ে

রাখলেন। তখন পঞ্চম ঘরের মধ্যে সে একাই নিঃশেষ গড়ে বেগা করত, বাইরে বাগার আঁখার আঁখ কখনো করত না।

ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল। তার বদন আঠার বছর বয়সে তখন ঠাণ্ডা তাকে জানাল যে, ঐ বছর তাকে কি অগৌরব সম্প্রদায় অধিকারী করেছে না হুনিয়ার পাঠিয়েছেন। আঠার বৎসর কাল তাঁরা তাকে কত না কষ্ট, কত না বেনাপূর্ণাঘাত দিয়ে লালন পালন করে আসছেন, তাই আঁখকে তাঁরা তার কাছে খানিকটা মগনের দাবী করলেন। ছেলে এতটুকু ইতস্তত না করে তক্ষুনি মাথার খুলি তেড়ে খানিকটা সোনার চোপা বার করে মাথের পাখের কাছে ছুঁড়ে বিলে। আর সেই মুহূর্তেই তার মনে হল, হুনিয়ার তার মত সম্পদখালী আর কে আছে? তাই আপনাতর মনমতে বেচারার মাথা টিক রাখা সম্ভব হল না। একদিন সে মা-বাপকে কিছু না বলে আপনাতর মনে মনেই উল্লুখ প্রাণের এসে গীড়াল।

স্রোতখিনীরা বীণ গেতে বিয়ে যেমন ভীত বেগে জল বইতে থাকে, তেমনি ভীনের আঠারটি বছর মা-বাপের চোখের আঁহতনে যে ছেলে বেড়ে উঠেছে, সে একদিন মঙ্গা ছাড়া পেয়ে হুনিয়ার উয়ার খোলা আকাশের তলে এসে গীড়াল, যে ছেলে আপন সম্পত্তী ছেড়ে গ্রানাক্তরেও কোনদিন বড় একটা ধোঁতে পার নি, সে বদন একেবারে শরতের মকল বিলাপ হাসনের মাতখানে এসে গীড়াল তখন যে তার বেহে মনে একটু পরিবর্তন এসে বাবে— তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অর্ধের অভাব নেই, হিসেব নিকসেরও তাবনা নেই, খোলাবজুটির মত সে আপনাতর খোলাগাফিক বারখাঙ্গলা বাড়িয়েই চলে, সে যেন কোন খানপাংখা বা মবাবপুর। কলে মতিভের বেঙ্গল অপ-খংখার হতে লালল তাতে তাকে মনে হওয়া অসম্ভব হবে না যে, তার মাথার সোনার খনিট যেন কোন

কালেই নিঃশেষ হবে না, হতে পারে না। কিন্তু কথার আছে, কিছুক ছিঃ বেগে খাট করলেও হাজার খোলাও খেব হয়ে যায়, তা তার মাথার খনি নিঃশেষ হবে তাতে আর বিচিত্রতা কি!

ক্রমে তার চোখ দুটো কোটরে গেবিঃ খেল দুটি নিস্তার হয়ে এস, লাল গেতে খেল। একদিন লাজারত উজ্জ্বল ঢাকঃলার লঃ অভিনয় খেবের মনঃমকের মত, তৈমরীদ খীঃলিঃার মত সে হতভাঃা খুবক অবসর খেব মন নিয়ে খেবের একতঃলে নিঃশেষ অবস্থা বলে চইল।

ঠাঃ তার মনে হল, এমনি অবসানপ্রত হোদীঃ মত বলে থাকলে তো তার চঃবে না, তাকে বাটতে হবে, খেটে খেতে হবে। কেন না স্কিত বনাঃার তো প্রাঃ নিঃশেষ হয়ে এসেছে, বঃকের মত তখন সে তার সোনার খনিটকে আগলে রাখবে। যে করেই হোক আপনাতর ভীঃিকা তাকে নিয়েই অর্জন করতে হবে। তাই লঃ জুগে সে কঃমে সেগে খেল। খনি আর সে কোন কারঃেই ছুঁইবে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তার প্রাঃের বঃ তার এ গোপন বনাঃারের লঃখনিট যে জানত একথা সে কোন দিনই মনেও তাঃতে পারে নি। একদিন সে মতীঃ স্কিত্তিরে আপনাতর খিঃনার সঃে অঃোরে খুঃোজিল, এমনি লঃখ বঃবঃ তার পা টিঃে টিঃে চোঃের মঃ খঃে ঢুকল। ঠাঃ মাঃার এক বিষয় আঃাত পেঃে সে মদন খেঃে উঠল তখন খেঃতে পেলে বঃবঃ তার, কি একটা খিঃখ তাঃাতাঃি লুকিঃে খীঃ করে খেবের বার হয়ে গেল।

তার মাথার খনি থেকে আর এক টুকরা মঃল বঃবঃের কঃলে চলে গেল।

কিছুদিন যায়, বেচারী একদিন কথা নেই, খাঃী নেই, এক খাঃিকা খুঃে মঃল করে খেব নিয়ে এস। খুঃ খুঃরী খিঃরী তার বঃ, মঃল প্রাঃ দিয়ে মন বিঃে সে তাকে তাঃোঃাঃে। বঃ তার তাঃে তাঃোঃাঃে। তার খঃের মঃাঃ

ছিল না, আর কাজেই সে আপন ইচ্ছা মত বসুন্ধর
সামান্য, বসুন্ধরত আখ্যায় মানসে তাবিস করে।
না-চাইতেই কত সুখের সুখের সব বিলাস সাধ-
্যোক্তে বসুন্ধর পর ভরে পেল।

বসুন্ধর নিতানন্দন আখ্যায়ের পেন ছিল না, বেদা-
রীত প্রাণপণে সে আখ্যায়ের বরত জেনেছিল। বসুন্ধর
প্রাণে আখ্যায় লাগবে তবে তোখা গেছে কি উঠায়ে
সে অর্থ আধরণ করে, কোনদিনও তা খুব ছুটে
বলতে পারে নি।

বসুন্ধর, "তীর ঘরার আখ্যায়ের তো কিছুই
অজান নেই, তোখার আখ্যায় তো প্রচুর।"

বেচারি জাখাৎ, "তা বই কি, কেন তোখার
কি চাই?" বলেই প্রেম-বিলস গোখে সে তখন
বসুন্ধর দিকে চেয়ে যেনে কলে। সে জানেও না যে,
এই প্রিয়তমাই তার মনস তিন তিল করে প্রাণ
করছেন। তবু এক এক সময় তার মনে ভয় হত,
না এবার থেকে একটু বুঝে চলতে হবে, এভাবে
অনিয়মিত ব্যার করা তো আর চলবে না। হাত
এবার থেকে জটোতে হবে, অথ তিক সেই সবাই
হয় তো তখনী স্রী হাণতে হাণতে সূত্রাযোগদ্বন্দ্ব
খাবীর সুখে এসে হাঁড়াত।

—গোলা স্তন্যো, ভবের বাড়ীর ছোট বোয়ের
পলার সুখের একটি হার বেখে এসাম। কেনন সুখের
নতুন তার পক্ষন আর পাখরগুলি কেনন কক্ কক্
করছে। দায়ও নাকি খুব বেশী নয়। হাখার
দশেক হবে। একবার দেখবে?"

—তার জন্তে কি? আখ্যায় পাবে। বখা
সময়ে বসুন্ধর পলার যে হার এনে সুগিরে দিবে পরম
সৌরবে আখ্যায়প্রাণে সে উৎসাহ হয়ে উঠল।

এমনি করে তাদের জীবনের আরো ক'টি বছর
দ্বিখা আখ্যানে একটা সুখ স্বপ্ন মত কেটে গেল,
একদিন বেচারি দেখতে গেলে তার প্রিয়তমার বো-
ঝে নীতল, অসাড়। বর্ণের বোঝা কাকি দিবে
কোন সুখের তার বুক বালি করে কোন এক

অজ্ঞাত পথে যথার্থতা করেছে। তার বখাখাৎ
খুব সাধনা মনই তখন দক্ষিত ছিল। কিন্তু তা
হলে কি হয়, সমাধে হার অর্থ প্রতীতি, তা। স্রীর
সংকার ও আখ্যায়ি তো আর সাধারণ মোকের
অবস্থার অস্থায়ী রূপে চলবে না। যোগে যোগে কখন
কাঠ ও বি, অখ্যানে বসুন্ধর হল আর চাইই পক্ষে তার
জীবন সঙ্গিনীর জ্বলন্ত মত বেরখানি পুড়ে ছাই হয়ে
গেল। বখাখাৎ খুবখাখাৎ মনে প্রাচুর হয়ে গেল।
পুস্তক, বোখা, খালিত—ক'ট বার গেল না। প্রিয়ার
অর্থ স্বর্ণপাত বো, পুস্তকচর্চা এ খার বসন তখন
সে ছ'গতে মানখান শেখ করেন, আখ্যায়ের ব্যাখ্যায়
কম ছিল না।

খুব টে-টো আর খুবখাখাৎ মর্মে কাজ লাগে হয়ে
গেল। তখন বেরখান তরি একান্ত অপর,
মাখা যেন একেবারে খালি—একেবারে খা খা
করছে, কেবল খালার খুলির এককোণে লেকেণে
এক অখরুণা তখনো পড়ে রয়েছে, পথ বেধে
চল:হ'লে, কক্ কক্, উত্তরবে মত উঠা চাইনি
যেখ মনে হয় যেন অনেক কাল পরে সে অখ্যায়
জাখান করছে, এই ব্যা উলটে উলটে উঠ
এগেছে।

পলার মন শেখ করে সে যখন বাড়ীর দিকে
কিরছে তখন আপন সত্য। তারপরে প্রিয়ার
আলোগুলি জালানো হয়েকে, বোখানের বাতি
গুলির অর্ধজ্বল আলোয় আলোকিত
রাখপথে দৌলখা আরো বাড়িয়েছে। বসুন্ধর
জনতা আপন মনে চলছে—নীলবে। উল্লান্তের মত
আপনায় মনে রাজ্য লেছিল, চাই এক মলিকারের
বোখানের সামনে এসে সে খন্ডক পাড়ান, বেরখ
তরো তরো কত অখরুণা পথ সাধান রয়েছে। অখ-
লক গোখে সে চেয়ে রইল। তার পুতলখা যে তার
বর আখ্যায় করে চলে গেছে, একখা তার তখন
মনেই ছিল না। সে আপনায় মনে হলে "বলে
উঠল, "বা কেনন সুখের জীবিতগুলি! এতল

শেলে কত সুখী হই সে কু" তখন সে ওষ্ঠানি কেন-
হাত জন্তে হোতানে প্রাণন করন।

হোকানের কোণে হোকানের করণরত্না
বসেছিল। চাঁদ চাঁদকার প্রাণ সে কোণের বিকে
চেয়ে বেয়ে, এতটা মোক কীচের আলমারীর
সাধনে একমুহুরে আলমারীর ভাণ্ডা হইবে, অপর

হাত সে মোকানীর বিকে বাড়িবে বিবেকে, সে হাত
রক্তমাখা, তাত্ত মাঝে রক্তমাখা মোনা পড়ে থাকে।
লোকটা মোকানীকে বেয়ে দৃষ্টি হইবে জীব বিকে
এক মুহুরে চেয়ে বইল। ৩

৩. অগ্নিকোণ কোণের বর অবলম্বনে

সূচনা ও সমাপ্তি

(শ্রীমদেবদামোদর বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল.)

(১)

কালের কয়লা ডেইরী উঠিল কি বাড়ি'
কত তালে নৃত্য করে উল্লসের মন,
চৈতন্য ইন্দ্রিয় অরি বাহু কোণে আঁরি
রক্ত নেত্র চাহে যেন দহিতে তুতল;
প্রাণ-রক্তনো এল এ ধরণী মাঝে!
প্রাণ বৈতন্য কোণে ফড়ির মর্জয়,
বিদ্যাপিতে স্তম্ভি হাই একত বিদ্যাহে
বিদ্যাহে একটু হাণি অশ্রু-সজ্জন;
ভাষণ বিদ্যাপ কায় উঠিল দুর্কাতি'
ইন্দ্রিয়ের তুত-শ্রেণী নকল-স্বপ্নী আনি
লগ্নো কি ছাড়া লেহে ছুটল হৃৎকি'
আত্মে শরিত কি উঠিল নিদ্রাতি;
শুভ শুভ প্রাণনে তরিল প্রাণ
কীপিল কুটীর লনে রাজ-গিহোপন।

(২)

শ্রুতি কালের চক্র শূন্য যোনি পথে
নিবেশে নবনে তাপে নব বৃত্ত-পট,
দীপ্তমুখে দিবসের লগ্ন অথ রথে
প্রাণ প্রাণনে রবি বইলা প্রাণট;
কোণা পেল প্রাণের সেই স্তম্ভ—স্বক;
সে স্বক্যের আর নিশে না লঙ্ঘন
বিধি কি হিঁড়িয়া কীর্ণ স্তম্ভে নিদ্রা
নব উপাধানে বিধ করিলা নিদ্রা!
মনে ক'ল এ স্তম্ভে রবে চিরদিন,
নবীন চরিত্র আলো নিবিবে না আত,
স্ববে স্ববে, স্ববে শক্তি চির অস্তরী
আশার সাগরে নিভ, বহিবে কোণার;
— অহনি কহিল বাণী দ্বন্দ্ব বেগতা
দিবসের পথে রাত্তি ছুলা না এ কথা।

আবেগকণ্ঠে বিদ্রোহ করাই। ৮০ পৃষ্ঠায় প্রবেশ করিয়া
 লিখিয়াছেন, 'বাৎসর্য্য ভাষ্যস্বরূপ তখন সাধারণ হইতে
 কাব্যের পথে—ঐশ্বর্য্য নদীর পূর্ণ গঠের পট্যবাসে।'
 পাশ্চাত্য লিখিয়াছেন, 'যুব সন্তান পৌরোহিত্য
 নামক স্থানে।' একই স্থানে করিবার কারণ তিনি
 বলেন নাই; তা কেবল ঈষ্টের পাইপেন ভাষ্য উদ্ধৃত
 করেন নাই। তাহার উদ্ধৃতির অধিগণ্যোক্তি ও
 প্রত্যয়ে আছে। একই পৃষ্ঠায়, উদ্ধৃত করিয়া
 লিখিয়াছেন—'প্রাথমিক যবন' 'যবন কবির' প্রভৃতি
 (মাইনোরের) প্রতি আছে। কিন্তু মননবিন্দী ব্যবস্থায়
 শুধু প্রেমের স্বপ্নভ্রমস্থান কল্পনা করেছেন।
 চিত্রণ করিবার মন্ত্র সঙ্গীতকে ব্যবস্থা করিয়া
 নাই ইত্যাদি। (৮৬ পৃষ্ঠা) আশা করি কালক্রমে
 উদ্ধৃত থাকিবে না। চরিত্র হইতে উপস্থাপনের প্রায়
 মনোরম—সুপ্রতিষ্ঠিত নাটকের বিশেষ্য আছে।
 পড়িতে গিয়া দেখে না করে উঠে পড়া বাদ
 না। তাহা যাহা যে পড়িতে হইবে বসন্ত তিননা। ছবি
 মিন বিলম্বিত হইয়া প্রথম করিয়াছেন,—যাহা
 বিদ্রোহীমণ্ডকে মনন করিয়া তাহা পড়ি ও লুপ্ত
 করত। আশ্রিত পারিবারিক, তাহা হইতে
 ভাষ্য প্রভৃতি ও সাধারণ পড়িবে বেশ পাওয়া যায়।
 'চিত্রিত পদ্য' বিকল্প—ভাষ্য, যাহা সমস্ত
 মনোভাব প্রকাশের বিকল্প। জিন অটপভাবে প্রকাশ
 মান হইতে পারিয়াছিলেন বাস্তব অনেক পড়ি
 ভাষ্য প্রভৃতি ছিল। 'চৈতন্য' চাকর জামাল
 উদ্বোধনের প্রতি আশ্রিত ভাষ্য অল্প প্রকাশ করি,
 তুমি আশ্রিত ও প্রকাশের বিবরণে তিনি
 পড়িয়াছিলেন। সেই সকল আশ্রিতের প্রকাশনা
 তাহা হইবার সময়ের প্রকাশ প্রকাশনা অল্প

পড়িয়াছিলে, ভাষায় কি কোন অর্থই নাই। সে
কি কোল নির্ভরক গ্রাম্য বলন। তার পুত্র
মহেশবাবুর সহিত বলিতে হয়,—‘আগে তার মধ্যে
একটি তেজস্বিতা ছিল, তাই আমার তার প’রে
জন্ম ছিল। কিন্তু এমন বেব’চ দিন দিন বিল’নি-
তার আর মোহে তলিয়ে যাবার ভয়ে অত্যাশঙ্কনে
বৈকুণ্ঠে।’ তিনি ‘তার মধ্যে আশ্চর্য্যাব্যাহার—
আশ্চর্য্যাব্যাহার ভাবটা কিসে আনিবার চেষ্টা করিয়া-
ছিলেন।’ প্রেরণালার ঠাঁতের বেগবার সামগ্রী হ’য়ে
মহিম যে দাঁড়িয়েছিল, পুণ্ড পড়ে তা বৃক্ষের
পেড়েছিল—সে যে ভাবে পশু ক’রে বেধেছে সেটা
স্মৃতি করেই একদিন মহিম ভাবে ভুলিয়ে দিয়ে-
ছিল। কিন্তু সে যে শেষ রক্ষা কর্ত্তে পেড়েছিল
এইটাই ভাল।

ভাষার সহিত বলিতে হইতেছে পুস্তক বাসিতে
বর্ণিত হইতেছে। ভাষার বোধও অনেক আছে।
তৎকালি বৃত্তান্ত লিখেছি :—‘সানিমা’ ‘সানিমা’ কথা
দুইটা বসবার দেখিতে পাওয়া যায়। ১১পৃষ্ঠা—
‘সাগর যে আগে হইতে উজ্জ্বলিত হইয়া নদীবাসীর
সঙ্গে সানিমাকে (?) সন্ত বেনমাঝেবধে আপ-
নার বিরাট প্রবলতার (?) মধ্যে আশ্চর্য্য করিয়া
নিরঞ্জন সন্ততীরের বিকে উদার হইয়া ছুটিয়াছিল’
ইত্যাদি। ২১পৃষ্ঠা ‘জীৱ বিকে বিবলিত (?) এক
চাকনি চাহিয়া’। ৩০পৃষ্ঠা ‘সানিমা’র (?) উপর
নারীশ্রী বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুক-
মহিমা (?) যেন নীরবেই প্রকাশ করিয়াছিল;’
‘উল’হরণ আর অধিক দেখাইতে চাহিনা, এদিকে
একদিকে একই অগহিত হইতে অজ্ঞান করি।
আর একটা কথা বলি, বাহার মুখে যে কথার
বলিলে শোভা পায়—বাধাকে বলা হইতেছে
বাধা তাহার নিকট দুর্য্যোগ না যে, দেহপ-
ভাবে কথোপকথন করা উচিত। ৫০ পৃষ্ঠার
সিদ্ধান্ত সাধুত্বকে মহিম বলিতেছেন—
‘সাধুতা, এতটা সহ্য কোন মহে-মজু-ব যে কোন-

দিন দেখেও তা আশ্রয় করিনি।’ এতদিনে
বাধারই স্বভাব বুঝি, তাতে জ্বি বা ব’গেছ,
ও যেহ তা ‘নকল কাটা মত ক’র জুগে জুগে
পারেন’ (?) সাধুত্বের ‘কাটা মত ক’রে জুগে
জুগে যে কি, তাহা কিছুমাত্রই বুঝিতে পারি নাই,
একথা আশ্রয় নিগেহাতে বলিতে পারি।

এই পুস্তকখানি উপভোগ্য গ্রন্থ। পাঠকবিশেষ
আনন্দ দিতে পারিবে, একথা আশ্রয় নিগেহাতে
বলিতে পারি। শিখিবার অনেক কথা ইহাতে
আছে—অনেক পুস্তকন কথা এখন জু-প্রাণী ভাবে
বলা হইতেছে যে জু-প্রাণী হাপ জাখিয়া যায়।
জু-প্রাণী নহুনা বিহু :—‘কাক ক’র হ’লে তাম
হাট, সতাকে আগের মধ্যে জু-প্রাণী করা চাই।’
(৩৮ পৃষ্ঠা) ‘জু-প্রাণী আনন্দ-মজুই মাঝ
তপতা।’ (৪২পৃষ্ঠা) ‘সাগর মুক্তি (সানিমা) ইব
মহিম পর্বজুগের) সেই জু-প্রাণী, সেই জু-প্রাণী
ক’রে’ (৪০ পৃষ্ঠা) (২৬ লোকের) টাকা সাধ-
রণের—আমি ভাঙার মাঝ।’ (১০৭ পৃষ্ঠা)
ইত্যাদি।

জলপত্র প্রবন্ধলেখক—প্রবন্ধ লেখক
—স্বাধীনতার জলপত্র লেন প্রবীত। জল ২২
টাকা। পৃষ্ঠা ৩২৪; প্রকাশকের নিবেদনে
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় স্বাধীন গির্জাঘরে,—
‘স্বাধীনতার এছাড়াও যে তাহা প্রকাশিত
হইয়া থাকে, আশ্রয় তাহা অসম্ভব করি
নাই; আশ্রয় এই এছাড়াও আশ্রয় স্বাধীন,
কপম উজ্জ্বল, জাপা জু-প্রাণী, এছাড়াও
কপম জাপা,—আশ্রয় ইহাও জু-প্রাণী
প্রকাশিত কহিতে বর চট্টোপাধ্যায় স্বাধীন
করি নাই।’ কথাগুলি সব সত্য—কিন্তু প্রবন্ধলেখক
জু (?) মজুত তাহা জাপা নয়।

সাহিত্য কেজে প্রবন্ধলেখক : মহিম বাহু
পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়া মাজ—স্বাধীনতা
মাজের সহিতই আর বিস্তার তাহার পরিচয় আছে।

সৃষ্টির পথ দেখাইয়া দার্শনিক সমস্যার সমাধান করিয়া বিদ্যাজেন।

ঈশ্বানু বিদ্যা চরণ এ কাব্যের অঙ্গুল্যাক্ষ করিয়া সাহিত্যের সম্পদে বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে যোগ দিয়া তিনি অগ্রগামী। অনেক স্থানেই অঙ্গুল্যাক্ষ সূলের অঙ্গুল্যাক্ষী হইয়াছে; সূলের সৌন্দর্য্যও অনেক স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। সূলের অর্থবোধ কঠিনে যোগানে পারেন না, সেই বাসেই অঙ্গুল্যাক্ষ তাবঙ্গুল্যাক্ষ বিদ্যাজেন। অনেক স্থানেই একখানি পুঁথি হইতে শাস্ত্রী মহাশয় পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছেন, অপর পুঁথিও কেহ পান নাই। পাওয়া গেলে ভুলো, বুলভলির নীমাণো করিয়াই প্রবিত্ত হইবে। বতখিন তাহা না পাওয়া যায়, ততখিন অঙ্গুল্যাক্ষ একত্র করিতেবাধ্য। তাহা বহুদূর সত্ত্ব সতল হইয়াছে। বুলবিলেব আর একটু মাঝিঁত হইলে ভাল হইত।

পত বৎসর আঘাট ঘাসে পুস্তকখানির প্রথম সংগ্রহে বাহির হইয়াছিল; ছয় মাসের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়ায় বুঝতে হইবে বাগলা যেনে সংসাদিকার আঘর কিছুমাত্র কমে নাই।

পাণ্ডিত্যের দার্শনিক পঞ্চগুলি বাধ্য এ সংকরণে নূতন সংযোজিত হওয়ার পুস্তকখানির উপাধেয়তা অধিক বর্ধিত হইয়াছে। আরও কয়েকস্থলে পাণ্ডিত্য বাগলা আবরক বলিয়া বসে করি।

অঙ্গুল্যাক্ষ—গ্রন্থ উপস্থাপিত ঈশ্বানু যোগে প্রসার যোগ প্রদীত উপস্থাপ। পাণ্ডিত্য যোগে প্রসার যোগ প্রদীত উপস্থাপ। পাণ্ডিত্য যোগে প্রসার যোগ প্রদীত উপস্থাপ। পাণ্ডিত্য যোগে প্রসার যোগ প্রদীত উপস্থাপ।

উপস্থাপিত খানির সন্ধান এইঃ—বাগলা যোগে প্রসার যোগ প্রদীত উপস্থাপ। পাণ্ডিত্য যোগে প্রসার যোগ প্রদীত উপস্থাপ। পাণ্ডিত্য যোগে প্রসার যোগ প্রদীত উপস্থাপ।

বর্ণ করিবে না এইরূপ ইচ্ছাই তাহার ছিল, কিন্তু বুদ্ধাঙ্কুরমার অত্যধিক আগ্রহ তাহাকে বিবাহে সম্মতি দিতে হইল। কলিকাতার বড় গুরু অঙ্গুল্যাক্ষের কস্তা দুঃখের সহিত তাহার বিবাহ হয়। দুঃখব্যাধি রোগেই সত্যনাথ ও সন্তোষ প্রসন্ন, কথা বলেন,—“গাঙ্কুরমারকে বস্ত্র করিও।” স্ত্রীনাথ ও এই কষ্টব্য পাপন করিতে কোনদিন স্ত্রী করেন নাই। সন্তোষপ্রাণ বুদ্ধ ও তাহার গৌরব নাতাত্ত্বিক বহুই ভাবাসিত। সত্যনাথ ও স্ত্রীনাথ উভয়ে উভয়ে বহুই ভালগণিত।

ওকালতী পাপ করিও নতঃবলি বিধা সত্যনাথ বাগলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

স্বাধীনতায় সত্যনাথ অঙ্গুল্যাক্ষের মধ্যেই পুণ্য বেল বসাইয়া যি পেন।, স্ত্রীনাথ প্রাচীন বিদ্যাশাস্ত্রী তার উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। স্ত্রীনাথ ও স্ত্রীনাথের নাতাত্ত্বিক উপস্থাপিত করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত।

চারিবেশের প্রাণ বাসের পর স্ত্রীনাথ তাহার এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে পিতামহে যান, কিন্তু অধিক দিন থাকেন নাই। স্ত্রীনাথের পিতার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল তাঁর অর্ধ-মানস। তাঁর মার মুহুর সময় নগর টাকাকড়ি বাহা ছিল তাহা তিনি তাঁর অল্প ভাইয়ের কাঁচি বিধা মাঝমাঝ করেন। এ সময় তাহার বাগলায় দন্ডা পড়িয়া যায়। স্ত্রীনাথের বিবাহে যেমন দুঃখান করিয়া ছিলেন ততঃ ভগ্নীর বিবাহে ও তাঁর ভগ্নীনাথ দুঃখানের বিবাহে কাঁচি দন্ডা করেন; তলে স্ত্রীনাথ ভাবে জড়িত হ'লেন। মানসিক মানসিক দৃষ্টান্তের 'হেতু ভিৎসে' তিনি অঙ্গুল্যাক্ষের মধ্যে যোগ দান। ভগ্নীনাথের মধ্যে বাগলায় মকদ্দমা হইয়া গেলক বাগীর বিভাগ হইয়া পেন। প্রাচীন স্ত্রীনাথের মধ্যে বুদ্ধের মধ্যে খুব যত্ননা যোগ করিতে লাগিল। একবার খুব বাগলাকাঁচি হইল। সত্যনাথ স্ত্রীনাথকে লইয়া

যে দায়িত্ব সে গ্রহণ করিচাচ্ছে তাহা পূর্ণ করা তাহার শক্তি অক্ষম করণীয়। সেই কর্তব্যের জন্য—সে কর্তব্য ভোগলাভস্বরূপ মামাস্ত্রের হইলেও—তাঁহা বাক্যসমূহ চরিতার্থ করিবার চেষ্টা অগ্রাহ্য নহে। অল্পপদা যে তাহার বিবেক একবার কিরিয়াও চাহে না এটা যে অস্বাভাবিক ভাঙ্গিতে কিছুমাত্র সম্ভব নহে। সত্য কথা বলিতে কি অল্পপদার মনের চিন্তার দ্বারা আত্মা বৃত্তিতে পারি না। লেখক মামাস্ত্রের দ্বারাইতে চেষ্টা করিয়াছেন অল্পপদার দ্বিধা ক্রটি অধ্যয়ন করাই সে দ্বারাইতে প্রভা করিতে পারেন নাই। অবশ্য যে যেগুলি বৃত্তিমাণ তাহাতে সম্ভব নাই। কিন্তু অল্পপদার চরিত্র যে তাহা আকর্ষিত হইয়াছে, আত্মা তাহার কিছুতেই অল্প-মোহন করিতে পারি না। এ চিত্র আত্মাধের দেশীয় চিত্র নয়—বিদেশীয় স্থানীয় জীবিত ‘স্বপ্ন ভাবের’ যে চিত্র যেখানে পাওয়া যায় এ সেই চিত্রের অল্পকণ নাই—‘তবু মন দিয়া লক্ষ লক্ষ পক্ষি’ এক হইবার ভারতীয় চিত্র ইহা যে নয় তাহা আর

কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া বিবেক হইবে না। অল্পপদার জীবনের তুহানলগৎ খাউ খাউ করিয়া চলিতে পারিল। আত্ম অল্পপদার জন্ত মামাস্ত্র চেষ্টিত। সেবা-নিষেধতা অল্পপদার চিত্র বড়ই উপভোগ্য। অল্পপদার মৃত্যু কল্পনাময়। তুহানলগৎ ভাল করিয়া দেখাইবার জন্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বৈদ্যানে উপভোগ্যের পরিবর্তন করিলে খাউ খাউ হইত, সেখানে না করিয়া পুথকখানিকে মদ্য বাড়াইয়া-ছেন। অল্পপদার তাম্র ও সত্যনামের জীবনের তুহানলগৎ মদ্যপান পুথকখানি দেখে হইবে মদ্য হইত। অল্পপদার জীবনের তুহানলগৎ না মদ্যপানে উপভোগ্যের কিছুমাত্র সত্য হইত না। অল্পপদার জীবনের পুন্যের উৎসর্গের স্ত্রীর না কেবল উপভোগ্যখানি কল্পনাময় হইত না বটে; কিন্তু মদ্যপানীয়ের কিছুমাত্র অত্যাচার থাকিত না। অল্পপদার চরিত্রও বেশ সুভাষ্য।

পুথকখানির তাহা ও সত্যনামের মদ্য। উপন্যাস বলি জীবনগ্রাহী।

পল্লী-যুধিষ্ঠির

(ঐচ্ছিকচরিত্র নবিক বি.এ)

জগদানন্দ ও অনেক ভাগ যুবোদয়ন ও বীর

সংসারের মধ্যে ভীষণ পল্লী-যুধিষ্ঠির।

দাখান টিকি স্বরূপ ভাবী

মিষ্ট বিনায় মৃত্যু হারি

চরিত্র নামে তবু তাহার গন্ধে বহে নীর।

(২)

মদ্যই জীবনের পক্ষপাতী, চট্টেন বেবে মোহ

অভ্যাচারের ক্ষত্র মুখে, বেজায় অলসোদয়।

নিলায়ে দান বাড়িবে নিজে

অল্পপদার কন দিখা পিতে,

অল্পপদার লেখ-বাহিক এমনি তিনি বীর।

(৩)

সত্য বলিল ভাল করিতে নাইকি দিখা তার

চরিত্র দিখা মনি যদি পদ সে পুথকখান।

দাকী পেখার রাজি মাপি,

অনেক করে পদের মাপি,

হিন্দুপের বেবতা তিনি মুগ্ধমনের পাণ্ডা।

(৪)

‘মাইল’ ও হার কল্পে না পার কাঁড়ে ‘ইয়া গো’

মহাত্ম্যেও দ্বিধাতে হবে অল্পপদার হিয়া গো।

সত্যপদার প্রবল মদ্য

মদ্যই জীবনের প্রণাম কর

মদ্যপানে তাহার বাপু মরণ হইয়া দিখা।

(৫)

অনেক মুগ্ধ এমনি তাহার লক্ষ্য দাবে টিক

ভাবের অল্পপদার পুথকখানি হার হার না যে নিরিখ।

দ্বন্দ্বকথার দ্বন্দ্ব কালে, পক্ষিপদেও চরণ চাটে,

পল্লী জীবনের বাস্তবশক্তি আর মোহের শক্তি।

সংসারের মধ্যে ভীষণ পল্লী-যুধিষ্ঠির।

সদাশিবের দণ্ড

(ভীষ্মোপনয়ন যোগ এন্ড বি. এ. সি. লন্ডন)

গঙ্গা

গঙ্গা প্রেমপ্রবাহিনী, গতিঃ পাবনী, অমর
বাহিনী। মংগলানীত গঙ্গা ঘানে নিশাপ চইতে
পারে। গঙ্গার পাশাপাশি বিচার নাই সকলেই
তারার কাছে মোক্ষ পাইতে পারে। সাধারণ অসি-
মনার তিনি তুই হ'রা যে কেন,—ভরনলাধনহীন
সকল যৌঃ বাগল ভদ্রাংয়ের করণ ঘোনে তিনি
ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তির বাণী : আবার
গর্জিতের লাজুকরা। অস্তমাতক মিলার উৎসাহ
কালে দত্ত করিয়া উৎসাহে সন্তোষ করিবার বাগনা
করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বেসম্বিতে পারিল না।
সেবধের মধ্যমে : তাঁহার বেস সাধারণেইতে পারেন
কি না সন্তোষ : করিয়া এককালে গঙ্গা অমর দত্ত
করিয়াছিলেন। মর্জিতের ভগবান তাঁহার সে
দর্প তাপেন নাই। মংগলবের গঙ্গা মধ্য লম্ব
বোধে গর্জিত করিয়াও তিনি পথ পান নাই
তুমি আমি কেন ছাঃ—গর্জিত পথ অপরম্বাণী।
লম্বের কর প্রণয় মুক্তি নাই, কুপ্রাপি মুক্তি পাইবে
না—গঙ্গা প্রেমবাহী, মোক্ষবাহিনী, কৈবল্যবাহিনী।
অন্তরঃ যেখানে প্রেম সেইখানেই স্বর্গ; স্বর্গের
নামান্তর প্রেম। বাগলাগর ভৈরবের প্রেমের
সঙ্গা স্থাপন করিয়া গিঃকে, নানাবেশ, নানা
লাহাৎ গর্জিত ভক্তির করিয়া নীর স্রোত
চলিতেছে, নানা দেশ পবিত্র হইতেছে। গঙ্গা !
তুমি সকলের হৃৎকে কীর্তিতে আন। যে তোমার
উপাসনা করে না তাঁহার প্রতিও কৃপা কটাক্ষে
চাখিয়া থাক, অস্তরঃ পুরাণে তোমার অপার মহিমা,
তোমার অপার বহা, তোমার অপার প্রেম,—
অতি সাধারণ ব্রহ্মের কসতলুতে বাহ তোমার
হস্ত, কিন্তু কাব্যভাণে তুমি বীরবী, তুমি ভায়ক-
নীর প্রাণাদেবী প্রিয় পুতপবিত্র। আসিয়া

তোমার পবিত্র সলিলে অপরম্বাণ করি, তোমার
পবিত্র সলিল পান করি, এমন শিখা করিলে
মুক্তি পাই। তোমার যে কল কল পথ বিন নাই
তাঃ নাই—তাঁহার এত প্রেম, এত ব্রহ্ম, তাঁহাতে এত
কবিতা যে সন্তোষের “ওষধোক্তে” নাই, প্রিয়-
তমার মর্জিতপূর্ণ পথে নাই, কালিগানের “সুখার
সন্তোষ” এর সর্গে নাই। আবার সেই কল কল
পথে এত অস্তরঃ, এত সাহায্য, এত মনোহর
যে তাঃ এতসময়ের “কটোক্তে” নাই, “প্রাণের
মনোহর” নাই, মনোহর “মৌল্যপণে” নাই। কিন্তু
লোকে তোমার সাধারণ অর্ধ বুঝে না, ঐ বা হৃৎ।
ইংরাজ ভাষি তোমার বীষ্মবাহে, তাঁহার প্রাণের
মহিমা বুঝে না। লোকের হৃৎ হ'লে তোমার
পূজা দেয়, লোকের হৃৎ হ'লে তোমারই হৃৎ
সংগঠিত হয়। এ সকলের কি কিছু অর্ধ নাই ?
আজ—কিন্তু কখনো তাঃ বুঝে ? তোমার ঐ
যে তাঃ, ঐ যে অপরম্বাণ কলকল ব্রহ্ম তাঁহাতে
মানবের এমন কোনও অনুভূতি নাই, তাঃ বুঝে যায়
না। তোমার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না এমন তাঃ
মানবের মনে উঃ হয় না। যে হৃৎ পো তোমার
ভরম্বাণে মোক্ষের কলান মনে করিয়া তোমার লগে
নিজের অস্তরঃ নিশায়, যে হৃৎ পো তোমার
সহীতে তাঁহার আনন্দলহরী নিশায়। তোমার
যে যেমন লগে যে যে তুমি তাঁহার কাছে তেমনই।
তুমি সকল সময়ে সকলের হৃৎকে হৃৎ, সকলের
হৃৎ হৃৎ। তোমার যে উপাসনা করে, তোমার
উপর যে দত্ত করে তুমি তাঁর সর্জন্য কর।
কবিতা আছে অপরঃ তোমার মহিমা না বুঝিয়া
দত্ত করিয়াছিল, অস্তরঃ তোমার সলিলেই তাঁহার
জীবনের সকল বজ্র লীন হইয়াছে। গঙ্গা সলিলে

পাই টানসদাপর তোমার পূজা ঘের নাই, তুমি
তাহাকে মূলে বিনাশ করিতে উত্তর হইয়াছিলে,
তথাপি অথোম মন্থরা তোমার পবিত্রতা বুকে না,
তোমার উপদেশ গ্রহণ করে না। তুমি জড় পদার্থ
অজ্ঞান তথাপি তোমার এত সন্তোষ—কিস্তি মন্থরা
মূর্খ আত্মা তাহা বুঝি কই? যেদিন আশ্বিন
হরিদাসের রোমনে রোমন করিতে পারি, রামদাসের
সুখে হাসিতে পারি সে দিন জানিব যে আমি
তোমাকে স্পর্শ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি।

প্রাচীনকালে লোকের পথের ধূস্রে কাঁধিতে
জানিত, পথের সঙ্গে সমানে ডিঙা আগা, যোগ
শোক ভোগ করিত। তখন তুমি মানবের ধূস্রে
সহনশ্রিত্য হুতুল ভাণাইয়া চলিতে—এখন আর
সেদিন নাই। পোশাক ভারত অংশেতে গিয়াছে।
আমি এখন ‘আমি’ হইয়াই যত, দিনান্তে ‘তুমি’
এক মুষ্টি ভক্ষণ করিলে কি না তাহা জানিবার
আবার সময় বা অবসর নাই। তোমার প্রণয়িনী
ভাণ্যার মূর্ত্তা হইয়াছে তুমি একা তাহার মস্ত রোমন
করিলে, বকে কড়াঘাত করিলে আবার তাহাতে
কি? আমি কি করিব! লোকে দাঁত থাকিতে
দাঁতের মর্দণনা বুকে না। অলোকানন্দা, ভাগ্যবতী
ও ভোগবতী ত্রিভুবনময়ী হইয়া এতোক পরমাণুতে
নিশিধ্যা বসন এক হইবে তখন অথোম মানব তোমার
মর্দণনা বুঝিবে; কিন্তু তখন বুঝিবার উপায় হইবে
না, আর তোমাকে পাইবে না। সমস্ত থাকিতে
মাজুবে জিনিসের মর্দণনা বুকে না এইত ধূস্র।
সমস্ত হইবে কিছুতেই থাকিবে না। কেবল মূর্ত্তি
কালের ক্ষুতি স্বরণ কড়াইয়া বিবে। তাই বলি
এখনও সময় আছে, এখনও তোমার মর্দণনা বুঝি-
বার অবকাশ আছে। গোড়া লোকে বুকে না—
ঐ ধূস্রে মরি। মদতে হিংসা, বেস
আলস্রহু ইত্যাদি নানাপ্রকার নানা কাজের রাকসী
জগিয়াছে পতিত শাখনী অথব ত্যারিনী পকে।
তুমি তাহাদের বিনাশ কর। অপবিত্র লোকদিগকে

তোমার সলিলে পবিত্র করিয়া দিয়া যাও। তুমি
যে বীণময় লইয়া অনবরত বিনোদ্য বহিতেছ
সেই বীণ মন্ত্র দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ ও আত্ম
সংস্কার করিয়া যাও। তোমার এমন সন্তপ কথ্য
তবু আত্মা বুঝি না কেন? তুমি আশ্বিন এক
কথা এক রাগে এক ভালে বসিতেছ—তবু
আত্মা বুঝি না, কেন না যদিও তুমি সাধা মন্থরা
বসিতেছ তোমার স্রোতার পরাশ্রুত নাই, সে
পরের মস্ত ডিঙা করিতে জোনে গেছে নাই, সে
তোমার কথা বুঝিবে কেমন করিয়া। সে হোটে,
তুমি মন্ত্র, সে হুংসী তুমি স্বরী। যে পথের মস্ত
আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে নিশিধ্য না তাহার
পক্ষে ও মস্তের পক্ষে কষ্টকর। আমি আমার মস্ত
বিভা উপাধীন করি, আমার মস্ত খন উপাধীন
করি। কিন্তু আমিরা সাধা জগৎ দ্বারা আবার, আবার
মহিত তাহার আরম্ভ, আর আবার মহিত তাহার
শেষ। আমি আবারই স্রুতরা আর কাহারও
নহি। মস্তের স্রব ধূস্রে উপর আবার কোনক
হাত নাই, স্রুতরা আবারও স্রব ধূস্রে উপর
কাহারও হাত নাই, মস্তরা এখন অবস্থায় যে জীবন
তাহা স্রবের ত’ কোনও অংশে নহ; বরং এক মস্তকার
ঘাতে চলে বলিয়া একঘেরে জীবন বড়ই কষ্টকর।
এই রকম যে কেহ—আপনকে মস্ত তাবিয়াছে
মস্তের মহিত যে সকল মন্ত্র-স্রবন করিয়াছে সে
কেন স্বরী হইবে? স্রবের ভাঙারে তাহার
অধিকার কি?

অনেকে বলে স্রব নির্জিনে পাওয়া যায়, মস্ত
সমাজের বাহিরে মস্তরা বসিয়া পড়া যায়। পেতা
স্রব না পাতি? কোন্‌ স্রব, কোন্‌ তপসী স্রব মস্তো-
গের আশ্রয় জন-সমাজ ত্যাগ করিয়া পাশ-নিবাস
অবলম্বন করিয়াছেন? স্রবমস্তের আশ্রয়
কোন্‌ মস্তান্তর দ্বারা পর্যন্তীকৃত সাধ করিয়াছেন?
বিদ্যামস্তের উদ্বেগ মন্ত্র, ‘ইলাইজার’ উদ্বেগ
“লাবেগার্ড”। পরকাল যে তাহাদের উদ্বেগ

হিল না তাহাকে বলিতেছে, তিন্ত পৰ্বতীয়
অবলম্বন করায় হেতু পরকাশ নহে। অস্ত্র
কোনও শোচনীয় ঘটনা তাহাকে ঐ কাণ্ডে নিমগ্নিত
করিয়াছে। পরে ফলে পরকাশের চিত্তা করিয়া
তাঁহারা নিমিত্তান্ত করিয়াছেন। তিন্ত হইকালে যে
স্বপ্ন নাতে বঞ্চিত রহিল না তাহা পরকাশের
আবৃত্তকতা কি? এই যে কালের স্রোত : হিতেছে
ইহাই সুখের স্রোত, প্রেমবন্তী ভাগ্যবীর তাহ ইহাই
সুখের কয়লাগিনী। প্রেমদান্বে পরহিতে রত থাক,
পরের মত কাঁথিতে শিকার কর; এই যে ঐতি
অস্ত্র বিন্দু তাহা এত মৃদু যে সস্ত্র রাম ভাঙা
রের মণিহুতা একত্র করিলেও তাহার সমুদ্র হয়
না। আপনার 'দুঃখ' হইতে লক লক তত্ত্বের সহিত
আপনাকে বাঁচ—এই মুকদ তত্ত্ব বিমল আনন্দ ও
ও অকৃত্রিম সুখ বহন করিবে, আর এই লগতই

সুখের লগত বলিয়া প্রতীতি হইবে, পরকাশের
প্রবোধন হইবে না। সুখের লগতই পরকাশ চিত্তা,
পরকাশের চিত্তা অতি মনোহর, অতি মনোহর, অতি
তৃপ্তি কর—তাই আদর্শ পরকাশের অবশ্যপূর্ণ ব্যত
থাকি। যদি ইহা লগতেই সুখ বিলিণ তবে পর-
কাশের আবৃত্তক কি? এই লগ পূর্ণ পৃথিবীই
সুখের স্থান। বাস্তব বাস্তবের হিতে মনোহর তাহ
প্রবাহিত হইক তাহাতেই আদ্যার মূর্তি।...

Man to man, the world o'er,
Shall brother be for a that !"

দ্ববন্ধি তব মীরে শাক্তকী নৈতি পবে
তদবধি মলমলিগে বৈ মুক্ত: কনৌ ত্রাণ।
তব ললকনিষ্ঠাং পাশিনাং শাসকটো
পতিত পদম বোনাং স্বাহি শাপি শ্রাবান্ ৪"

• • • • •

অন্ধকার ও নক্ষত্র

(শ্রীবাহিনীরজন দেন কবিরাজ)

কৃত অন্ধকার হবে,—“হে নক্ষত্র রাশি,
আধারে তাড়াবে বলি আদিত্য সাক্ষি।”

হানিয়া নক্ষত্ররাশি করিয়া উত্তর,
“পরম্পর নিলে মোরা হয়েছি সুখর,

সুখ বজ্র নাহি পারে হুঃ নাশিবারে,
তাই পরম্পর নিলে মোরা হুঃ লগারে।”

বংশের কলঙ্ক

(ঐতিহ্যজন্য বঙ্গবি, এ)

অকৃত্রিমশক্তি পশ্চিমোচ্চল

অতি বুদ্ধির পরিণাম

যখন নিচে একটা বিপুল আনন্দ কোলাহল
উদ্ভিত হইল, বহু লোক সম্মুখে “ব:বাণাব্দ।

বাণাব্দ।” করিয়া দ্বর্জজনি করিয়া উঠিল, তখন
অনিলা চমকিয়া উঠিল; সে উৎকর্ষ হইয়া উৎকর্ষ
নেজে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর
যখন সোপানে অলম্ব্য পদপঙ্খের দ্বারা সে সেই

চিরপরিচিত পথদ্বারা গুণিত পাইল, তখন দাক্ষিণ্য উদ্ভবনা যেন তাহার জ্বলন্ত কাটা বাহির হইবার উপক্রম হইল। তখন কি কথাই মুখ জ্বলিয়া গিয়াছিল? তাহার অন্তরের অন্তরের নীরব কাতর জ্ঞান কি সেই হৃদয়ালেবেরে সিংহাসন তলে পৌছিল?

সেই মুহূর্ত্তে তাহার লোলুপ দৃষ্টিতে সেই চির-পরিচিত চিরপ্রিয় বীৰ্য শালকমিত্ত বৃত্তি উপস্থিত হইল। যখন অগ্নিময় তাৎস লোকের মুখে আত্ম-বিক বীৰ্যমি উদ্ভিত হইল, যখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দে উদ্ভূত হইয়া ভগবানের ক্রয় গরিমা সূতা করিতে লাগিল, তখনও অনিলা আশনার চক্ষুঃ খিলা করিতে সাহসী হইল না। তখনও তাহার চক্ষুঃ সত্তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন এ সূত্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনয় দ্বারা!

কিন্তু যখন অকলঙ্কতার সত্যসত্যই ছুটিয়া আসিয়া অশ্লীলতার হাত ধরিয়া আনন্দ পথ পথে "বাঁবা, বাঁবা" স্বেচ্ছাধন করিল, তখন অনিলায় জ্বলন্তের ক্রিয়া যেন একবারে শুষ্ক হইবার উপক্রম করিল। এখন অনিলায় বিখাল হইল যে, সে স্বতঃস্ফূর্ত্তে রহিয়াছে, সে স্বাধা দেখিতেছে অনিত্যে সে সব যন্ত্র নষ্ট, সত্য। অমনই কোণা হইতে শব্দের সত্তা বস্তু তাহার মুখে চোখে ছুটিয়া আসিল, কোণা হইতে দাক্ষিণ্য আসিয়া তাৎসকে অভিব্যক্ত করিয়া ফেলিল। এ তাৎস গোপন করিবার মত সে সকলের অলঙ্কারে বীরে বীরে উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া একখানা লোকের উপর ভীরা পড়িল, তখনও তাহার সত্তা শব্দটা শুধু কীর্ণিতছিল।

তাহার পর সেইখানে থাকিয়া সে একটা করিয়া সব কথা শুনিয়া। অনিতে অনিতে তাহার মনে স্বর্ষ, বিম্বা, জাড়া, ভালবাসা, জোষ, স্নেহ, কত তাৎসের উৎস হইতে লাগিল। অকলঙ্কতার

বেদ, অকলঙ্কতার শোণ, বীর্যের, অকলঙ্কতার দয়াময় সত্তা সত্তার কথা অনিতে অনিতে তাহার সত্তা শব্দটা জোড়াতালি বেতন পত্রের ভাষা কীর্ণিত লাগিল, নীলোৎপল নয়ন ছাড়া অশ্লীল বেতনে তাহা আসিল। আবার যখন রমেশচন্দ্র ও পাড়ার স্নোলেট ছুটি অকলঙ্কতার কলঙ্ক কথা সবিচারে আশা করিতে লাগিল, তখন জোষ ও স্নেহ তাহার সত্তার সত্তা কীর্ণ হইয়া উঠিল।

যখন সাহেব অকলঙ্ক হইয়া চলিয়া গেলেন এবং সত্তা ও কোঠার জোড়াতালি অশ্লীল করিল, তখন অনিলা বীরে বীরে উঠিয়া নিজেই যখন কলঙ্ক চলিয়া গেল, এই শব্দটা কীর্ণতার জোড়াতালি অশ্লীল করিল, তখন অনিলায় কলঙ্ক চলিয়া গেল। তাহার মনে তাৎস চোখে মুখে পাছে বাক্ত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তখন তাহার সত্তা করিতে প্রস্তুত ছিল না।

যেহে বেদানে একখানি স্বাধাভাষা যখন স্তম্ভিত হইয়াছিল; সেখানি অনিলায় বস্তু করিয়া দ্বিগুণ ছিল। অনিলা সেই আশা যখন স্তম্ভিত হইয়া নতলাল হইয়া পল্লবীকৃতভাবে অশ্লীল করিতে প্রস্তুত করিল; একবার নয়, বার বার সে যখন স্বাধা স্তম্ভিত হইয়া বেদাতার উপরে অন্তরের অন্তরের মনোভা, ও স্তম্ভিত আশা করিল, চোখের মলে তাহার বস্তু তাহা দেখা। সর্ব-পরিমাণে দয়াময় তখন তাহার কাতর প্রার্থনা অনিত্যে, তুচ্ছ অর্থ সে, এত দয়া তার প্রতি।

কতকগুলি অনিলা এই ভাবে ছিল, তাহা সে জানে না, কিন্তু যখন কলঙ্কতার সত্তা পলায় আসিয়া পাইল, তখন সে স্তম্ভিত উঠিয়া গেল এবং চোখের মলে স্তম্ভিত প্রকৃতি হইয়া যায় ফুটিয়া গেল। "কিহে পলা", বলিতে না বলিতে সে উত্তেজিত হয়ে বলিল, "এই যে দ্বিগুণ। তুমি এখানে।" আর বাক্তসত্তা লোকে তোমার স্তম্ভিত

বিদ্বিষনি, বিদ্বিষনি, শুনেছে কি, আনাদের দাবাবাবু
কিহে এসেছে ? চল, চল, বাড়ি সব বাইরের
বায়োঁতার ন'সে আছে—”

অনিলা বাবা বিদ্যা বলিল, “না গম্বা, সেখানে
হাবার দরকার নেই, আমি সব জানি। তুই
এইখানে বস, একটা কথা ভিজালা কহুও, হাঁহে
কোঁঠারে বাবু মেয়ে প্রাণ গিয়ে তোমার দাবাবাবুকে
কথা করেছিল তুমিই। কথটা কি সত্য?”

গম্বার মুখ পঙ্কজ হইল; চোখ ছলছল করিতে
লাগিল। সে তখন একে একে মৈথিলীও সেই
অপূর্ণ আশ্বাসনের কথা বলিতে লাগিল। বলিতে
বলিতে তারাই চুপ্ চুপে পুড়িয়া আসিল, সে
হুঁপাইয়া হুঁপাইয়া কাঁহিতে কাঁহিতে বলিল,
“বিদ্বিষনি, সে গম্বা ঠাকরণের কথা পাণ বুধে
কি বলব ? দাবাবাবু হাঁহে মার পেটের বোনের
মত ভাল বাগতো। কিন্তু সে যে কি ঢেকে দাবা-
বাবুকে দেখেছিল, তা কেউ জানত না, তেবল
আমি জানতুম। দাবাবাবুর সাথে একটা কাঁটা
ছুটলে, আমি দেখতুম তার গর্জ শরীরে কে বেন
হাতার হাতার কাঁটা ঝুঁকছে। এমন তরে দাবা-
বাবুর সেরা করত যে দাবাবাবু সেই লসলেও এক-
টুকু কষ্ট টের পেত না। অথচ সব লুকিয়ে করত,
কেউ জানতে শু পারত না। দাবাবাবু জানত,
আমিই সব কছি। আঃ! সেমে প্রাণটাও
দিলে। যখন বোনের আঁড়াল থেকে বিনারক
দাবাবাবুকে বাণ মারলে, তখন দাবাবাবুর বুকের
উপর তাঁগিয়ে পড়ে আঁড়াল করে হইল। বিদ্বি-
ষনি! বড় ভাল ছিল সে গো, বড় ভাল ছিল!
আমি আঁড়াল থেকে লুকিয়ে শুনেছি, বিপর থেকে
দূরে ঠাণ্ডার লজ হইবার আগেই যিনেও সে দাবা-
বাবুকে কলকাতার চলে বেতে বলেছে, কত
আশার কথা বলেছে, কত বুঝিয়ে, কত শান্ত
করেছে!”

ভাবান্ধে গম্বা কিছুকণ কথা কহিতে পারিলে

না। তার পর বেগবদান্য ক্রমব্রতা অনিলাকে
দেখিয়া কথটা চালা দিবার লজ বলিল, “হ্যাঁ তাপ
কথা। হাবার সময় তুমি যে বই দাবাবাবুকে
দিতে বলেছিলে, দাবাবাবু সেই বই বানা তোমার
কিহিয়ে দিতে বলেছিল। সেই বই কি তোমার
বোঝে, না দাবাবাবুকে কিহিয়ে বোঝে?”

অনিলা ততো বলিল, “না, না, বই দাবাবাবু, যে,
একনই এনে যে।”

গম্বা তারার চকলতা দেখিয়া বিস্মিত হইল,
কিন্তু তখনই নিচে ছুটয়া গিয়া বই আনিয়া মিল।
গম্বাকে নিচে ধাইতে বলিয়া অনিলা শ্রমকক্ষে
প্রবেশ করিল এবং আগ্রহেরে পুরকথানির পাঠা
শুনিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে
একদানে ছুইগানি পাঠার মধ্যে আঁটা একদান
চিরকুট কাগজ বাহির হইয়া পড়িল; অনিলায় হাত
কাঁপিতে লাগিল, বুৰ্জ শুকশুক করিতে লাগিল;
সে কম্পিত স্বরে বেলিল সেই চিরকুটে তাহারই
হাতের লেখা রহিয়াছে,—“দাবাবাবু মাহুদ ঐতিহ্য
থাকে, নিলা”, আর তাহারই নিচে লেখা রহিয়াছে,
—“দাবা পূৰ্ব হ'ল না, নিলা। প্রার্থনা করি
তপবানের কাছে, তোমরা সুখী হও।”

অকণকুসার।”

অনিলায় বুকের ভিতর কি করিয়া উঠিল, তারাই
অভূতবাদ্য বাতীত কে বুঝবে! অনিলা ভাবিল
কুহ কণ্ট হমনের কারণাকীতে অকণকুসারের মনে
সম্মেয়ের বীল প্রাণিত হয়েছে। বোধ হয় সে ভাবি-
য়াছে আমি আগরের গহিত বিবাহিত হইবামি।
পরকণেই সে আশ্রয় হইয়া তাবিল দিগা কখনও
আগনার আগুন ঠিক ভাবে জ্বাণিতে পারে না।

• • • • •

যখন অনিলা এই সকল কথা ভাবিতেছিল,
তখন মাহুদের ভাগ্যবিধাতা অকণের সম্পর্কিত
সংসার-লীলা সুজের আর একটা গ্রন্থ উন্মোচন
করিতেছিলেন। বাহিরের ধরে বলিয়া অকণ

ভাবিতেছিল, “এঁরা, আমার দ্বারা এই সুখমিত কাল হয়েছে, অথচ আমার কিছু মনে পড়ছে না! কি আশ্চর্য! কি বিখ্যাত জিহ্বা-যোগ!” নিশা যদি বিখ্যাত করিয়া থাকে—“আর সে ভাবিতে পারিল না। চক্ষু সুস্থিরা শোকার ভইয়া পড়িল।

সন্ধ্যায় তাহার চিত্তাক্রান্ত মূখ দেখিয়া ভীত হইল, সে কাণ্ডাঙ্গরে ব্যাপ্ত তাবিয়া অকণকে জুলাইবার মানসে তাহাকে লইয়া কোথাও খেঁড়াইয়া আনিবার সন্ধান করিল। হঠাৎ সে বলিল, “তবে অকণ, আজ খড়্‌কার বাহি, আজ সেখানে মত বেলা, শ্রাবসুন্দরেরও আজ খুব বটা, বাহি!”

অকণের কাণে কোন কথা গেল কি না সম্ভেদ, তখন তার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল, সে শুধু বলিল, “এঁরা, কি বলছিল, যেতে হবে? চল!” বলিয়া সে উগ্রীয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহার মানাধার হয় নাই। সে হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল, “পাগল না কি, এখানে কি আর পড়ি আছে, যেতে হলে ওবেলা; না বরষোটের পেলও হয়। কিন্তু ষোটের যেতে হলে ছান আহারটা করে খাওয়া উচিত। আর চান করে নিই।”

হস্তালিতব্য অকণ উঠিল; সন্ধ্যাকের গহিত ঘান করিল, তাহার পর সন্ধ্যাকের ইজিতে ঠাকুর জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিল; উভয়ে কিছু বাইল। তারপর সন্ধ্যাক একখানা টেবিল আনাইয়া অকণকে লইয়া খড়্‌কা বসাই করিল।

টেবিলে বসিবার সময় অকণ গভীর হইয়া, বসিয়া রহিল, নানা কথা কহিবার চেষ্টা করিলেও সে “হী না” ছাড়া বেশী কথা কহিল না। কেবল একবার কীদ কীদ তাবে বলিল, “সেখ সন্ধ্যাক, তুই যে আমার সঙ্গে এখনও মোলায়েমা করছিল, এইটেই তোমার মন্ব। বড় ভাগ্য যে নিশা তোমার হাতে পড়েছে। অজ্ঞা তাই, আমার এই সুখের

কথা লিখিনি কেন? রমণ না লিখলে কিছুই জানতে পারতুম না ত’।”

বিস্মিত সন্ধ্যাক অকণের হাত হুটা ধরিয়া বলিল, “তোমার একটা মস্ত জুগ অকণ যে তুই রমণটাকে লত বিবেচন করিল। এই দেখনা, কত বড় মিথ্যা কথা বলে তোকে জীবন্তে মেরে রেখেছিল!”

“মিথ্যা কথা? কি মিথ্যা কথা?”

“এই আমার বিয়ের লম্বা? তাই বোনে কখনও বিয়ে হয়? তুই কি জানিল নি, অনিলা আমার—বোন?”

“তবে, তবে, রমণের কথা ঠিক না?”—

বলিয়া অকণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া সন্ধ্যাকের হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাচুল আত্মবিশ্বাস নষ্টের সন্ধ্যাকের মুখপানে উত্তরের প্রতীক্ষা চাহিয়া রহিল।

রমণ বলিল, “দাটেই না। অনিলায় বর ত’ ঠিক হয়েছে আছে। সে যে মনে মনে স্বাক্ষে বরণ করেছে, তা ত’ অনেক আগেই তোকে বলেছি—”

অকণ সন্ধ্যাকের হাতটা আবেগ ভরে চাপিয়া বলিল, অকণের শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল, যুগে চোখে রক্তজ্যোত খেলিয়া গেল, সে সন্ধ্যাককে বাহা নি। বলিল, “সন্ধ্যাক, তাই, যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তা হ’লে মূখ হুগল এই অপবিত্র লম্বা কর না, এ তোকে বলে বিলুপ। আগে ডেডেট্রিলুপ, ওদের কথার প্রতিবাদ কর না, ওদের কথা মত টাকা কড়ি নিয়ে বিবেচন করে দেবো। তার ভ্রম মিথ্যা প্রতিযোগ আগুন করুন। কিন্তু এখন আর তা পারিনি। সত্যি বলায়, আমার আশা পূর্ণ হবে।”

সন্ধ্যাক কোন হাসি হাসিয়া বলিল, “প্রতি কি কখনও মিথ্যা বলি? তুই কি আমার নতুন

জানি অকণ ? কিসে ভোর বিশেষ হবে ? তাই, আবারে বন্ধুত্বের পন্থা নিয়ে বলছি, আমি এমন প্রমাণ পেয়েছি যে অনিশার মনের উপর অবিকার এ কণ্ডিতে আর কারও হতে পারবে না। কেমন, বিশেষ হ'ল ?”

অকণ নীরবে গভীরভাবে বলিল, “গরোম, কলকাতার কিরে সেই বাবাঝীটাকে খরতে হবে, এ ব্যাপারের একটা হেতুনেও না করে আর আমি কিছুতে হাত বিছানি। বতকণ না নিশার মনের সন্দেহ দূর হয়, বতকণ আবার স্বাক্তি নেই।”

সরোজ বলিল বটে, আমি এতদিন বিশেষ করি নি। কিন্তু এখন গতি্য বলে মনে হচ্ছে।”

অকণ বলিল, “হঁ।”

সরোজ বলিল, “দেখ না, ভোর বিপক্ষে এবেও হয়ে কেমন একান্তি করলে। অনিলা বলছিল, সে অনেকবার লক্ষ্য করেছে, ওদের সঙ্গে রমেশের স্তম্ভ সঙ্কেত চালাচালি হয়েছে। আনিদ অকণ, রমেশটা কাঁকাব্যাকুকে জপিয়ে অনিলাকে বিয়ে করার চেষ্টার ছিল।

অকণ উত্তেজিত হয়ে বলিল, “কাকে ?”

সরোজ বলিল, “অনিসাকে। তার পর দেখ, তোকে কিংবা চিঠি লিখে মন খাড়াপ করে দিয়েছিল। ওর নিশ্চয় একটা কিছু মন্তব্য আছে তোমার সম্বন্ধে।”

অকণ বলিল, “আমার সম্বন্ধে ? কেন, আমি ত' ওর কখনও কোনও অনিষ্ট—”

সরোজ বাধা দিয়া বলিল, “অনিষ্ট ? বরং ভালই হয়েছিল, তা ত' মনঃকণ্ড লোকে জানে। থাক গে, বেলায় এসে পৌঁছিল পাড়ো, আর নাই। কলকাতার কিরে যা হয় করা যাবে। পয়সা কেন্দ্রের ভাল গোয়েন্দারও লাইবা পেতে পারবে।”

হুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করিয়া বেলায় প্রবেশ করিল। বেলায় ভয়ানক জিড়। হাওয়ার হাওয়ার লোক বেলা বেধিতে বা বিকিকিনি করিতে

আনিয়াছে। উত্তরে বন্ধকণ বাবু বেলায় কুড়িয়া জ্ঞান হইয়া একটা বোকারো আনিয়া বলিল। বোকারোয়ার তাহারের মত ভাব ছিলতেছে, এমন সময়ে মাঝের উড়ানী-মজান একটা লোক বোকারোনে ঢুকিয়া বলিল, “তাই, আবারে এতটু মল খাওয়াতে—”

লোকটার কথা শেষ হইল না, হঠাৎ অকণের বিকে দৃষ্টি পড়তে তাহার কথা শুনিয়া পেল, সে কিংবা বিস্ময়িত বেয়ে আকর্ণ বিস্মৃত হই করিয়া অকণের বিকে চাহিয়া রহিল। অকণের দৃষ্টি বাহিরে বেলা : বিকে ছিল বলি। সে লোকটাকে ভাল দেখিতে পার নাই। তাহার পর যখন সেই লোকটা দুটো অকণের পা হুই অকণেরা বসিয়া “নাংবাং, বাংবাং” বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কানিয়া উঠিল, তখন অকণ সন্দেহ চাহিয়া দেখিল, সেই লোকটা আর কেহ নহে, লম্বা হরি কৃষ্ণ-ভাঙ্গা। তাহার ছোঁয়া অত্যন্ত বিস্ত্রি হইয়া পিঠাছে, তাহারে অতিক্রমে মেনা পার নাহ।

অকণ তাহারে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া গলেবে লিখাসা করিল, “এক লম্বা হরি, তুনি মেন হয়ে গেছ ? এতদিন কি করছিলে, কোথায় ছিলে ? তোমার ববর ভাল ?”

লম্বা হরি কিকিং প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, “বরতে সবচে বেঁচে উঠেছি, বাবাংবাং। সেই তোমার লগে কাঁকাব্যার বেলা হ'ল, তারপর বেলে চলে গেলুম। সেখানে গিয়ে বেঁচে নিয়ে বেবলুর ভণ্ড বাবাংবাং খেঁচা লব কথা নিখো। যেনে কলকাতার কিরে সেই বেটার লগে বোকাপাড়া করার মতো বেকাঙ্কলুর, কিন্তু পেরোর কেতে কেহবার বিনেই আবার বেলা হ'ল পড়লুম। সেই যে বিছানা নিয়েছিলুম, তার পর ছদ্মস আবার নিয়ে ব'ব মাঝে মাঝে টানটানি চলে। ব্যাপারিতমোর পুণ্ডিতে হাড় কখনা বজার রইলো, কিন্তু বেহ আর ল'লুম দারলো না। দাস অনেক হ'ল

উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছি। এতটু সামনে
নিচ্ছেই আজ দিন সাতেক আগে বলকাতার রণনা
হয়েছি। পথে দুই একদিন বিশ্রাম করেছি জিহো-
বার মধ্যে। পেন পরন্ত বলকাতার পৌছেই সেই
বাবাজী যেটার লন্ডানে গিয়েছিল, আমাদের পূর্বে
যেপের গৌর মান ত বাকু। সুঁড়ি-মলীর বাবার আগমনে
সে উঠে আগে পাকার মহারা। হাকানে ঢুকলুম,
ইচ্ছে আগে সব লন্ডান নিয়ে বাবাজী যেটাকে গলা
টিপে বসব। কিন্তু মহারার গো আগমাই যে থর
বিলে ভাতাই একবারে শুয়ে পড়লুম।”

অকপ হাসিতে হাসিতে বলিল, “কি বাবাজী
বাণীর সেই, এই ত’?”

অরহরি বলিল, “না বাবাবাবু, ওখবরে বড়
একটা এসে যেত না। সে থরটা তোমারই
লম্বকে। আজ তোমার বড়কে না দেখলে ঐ
থরটাই বিবেচ করে বেশে কিরুদ। থর
জলসুব, বাবাবাবু আগামের জলে গেথারে আগ
হাতিয়েছে, তখন দুর্গল শরীরে সেই থরটা লম্ব
হল না, মাথা ঘুরে টলে পড়ে পেলুম। চেমনা
হলে আর কোন কিছুতে আঁহা হ’ল না, অমনই
যেনে ক্রান্তে প্রবৃত্ত হলুম, কলকাতার থরকে
আর এক বসন্ত ইচ্ছে হ’ল না। তার পর দিনেই
একজন সখী পেলুম, তার সঙ্গে বেশে বাতা কর-
লুম। সেই বন্ধুই, আমার বেলা দেখতে এখানে মানি-
য়েছে। কালই আমার রেনে চড়বার কথা। কিন্তু
বেততার বোধাধোণ, তা না হলে এখানে নাম
কেন, আর না নামলেই বা তোমার সঙ্গে দেখা
হবে কেন? তোমার যে আমার দেখবো, এ
আশা ছিল না, না কালীর মহার যে বেঁচে ফিরে
এসেছে, এই আশার মুখ। এখন বাবাজীর লন্ডান
পাই না পাই কতি সেই। বোটা অমাল ভক্ত, ওর
জুগুচির ত’ বুরতে পেয়েছি, তাই চের।
জোজোর ভক্ত বিটল কালীঘাটের সেই খুনে
কপাল কাটা ভাকার বোটার সঙ্গে যোগ দিয়ে

সুঁড়িটাকে বালাল করবার জন্তে সুঁড়ি-মলীর—”

অকপ লাফাইয়া উঠিয়া। কপিত হস্তে অরহরি
হাত ধরিয়া বিদ্যম আগ্রহেরে লিজাগা করিল, “কোন
ভাকার? তার কথা বলে অরহরি?”

অরহরি অকপের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল,
ততোধিক বিস্মিত হইল সে তারার প্রেরণ ভকী
ভনিয়া। সে বলিল, “কেন বাবাবাবু, সে ভক্তি-
য়ের খোঁজে তোমার বরকার কি? সে যেটা মহা
পাঠকী, মাহের পৌছানো বলে যোর নরকের
পাপ কল্পে।”

“কেনে? তার সঙ্গে বাবাজীর সম্পর্ক কি?
ঐ স্রোণোকী কেন সুঁড়ি-মলীর বাবার নামনে
এসেছিল? ওর বাড়ী কোথায়? বল, বল,
জাহতি তুনি যদি জান এখনই বল, বললে আমার
বড় উপকার করবে।” অকপের বের থর থর
কাঁপিতে লাগিল।

সরোহ এতকণ নির্ভীক হইয়া উপরে
কথোপকথন শুনিতেছিল, এইবার অকপের ভাব
দেখিয়া সে উহাকে ধরিয়া বগাইয়া বিল এবং
বোতালীর হাতে দুইটা টালা ভরিয়া দিয়া একটা
নির্জ্বল স্থান দিতে বলিল। সেখানে অকপ,
সরোহ ও অরহরির মধ্যে অনেক কথাবার্তা হইল।
সেই কথোপকথনের কল পাঠক দরে জানিতে
পারিবেন।

* * * *

আজ কালীপুত্রের সান্নিধ্যের তৃণ বিপণে
ভানে মহা মল্লিঙ্গ বলিষ্ঠাছে। আগ্রহ হন-থরে
বিহর গোচ অমায়ের হইয়াছে। লকণে অমু-
খোমে অমর পায় আর্থীর কেনেডি বিচারপতির
আগনে বসিয়াছেন, তাঁহার একপার্শ্বে কালীপুত্র,
রাহুলবর, সরোহ, অকপ ও রমেশ এবং অপরপার্শ্বে
বাবাজী, ভাকার, সুঁড়ি-মলী, গিরিবাণা, যেনের
বাহুগণ এবং আরও দুই তিনটা পাড়ার লোক
উপবিষ্ট রহিয়াছেন (অনিলাও যে পার্শ্বের ভকে

অন্তর্যাবে অবস্থান করিতেছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না)। প্রথমে সাহেব সকলকে অস্তর বিধা লতা কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন । তিনি নিরপেক্ষ বিচার করিলেন এবং বামিনী যদি তাহার লতী প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি প্রতিনিয়মপক্ষে অপোচিত কতিপুত্র করিতে বাধ্য করিবেন বলিয়া ভরসা বিধাচ্ছেন ।

একে একে লক্ষণে লক্ষ্যে বিল । প্রথমে গিরিবালায় শাক্য প্রমাণ হইল যে, সে বিধবা, অকণ তাহারের লাড়ায় আর বাইত এবং তাহার সহিত গোপনে প্রেমালোচন করিত, তাহার পর তাহার স্তম্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে লোকলজ্য তব নিষেধ কারে আনিয়া বাবিনার স্তম্ভ একদিন যোর রংঘোলের সময় তাহাকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া আসে এবং মুক্তি-ললীর বোকাবোনের স্তম্ভকটে তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেয় ; ঠিক সেই সময়ে অকণ (অকণের ইচ্ছাক্রমে কি না সে বলিতে পারে না) লাফাইয়া উঠিতেই সে পড়িয়া যায় এবং তাহার স্তম্ভকে গুরুতর আঘাত লাগে । তাহার পর বহুদিন সে অচেতন ছিল । যখন চেতনা হইল, তখন হইতে সে আর তাহার পূর্বের ঘর লংঘনের কথা কিছুই মনে করিতে পারে না । তবে সে মুক্তি-ললীর বাগানেই পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে এবং অকণ এখানেই তাহার সন্তান বার বহন করিতেছে । রমেশ বাবু যদি তাহার যোর-গোব বন্ধ না করিতেন এবং তাহাকে ঐ বাগা হইতে উঠাইয়া বিধার ভর না দেখাইতেন, তাহা হইলে এই সন্তান কৈলেকারী হইত না ।

মুক্তি-ললী ও বাবাকী গিরিবালায় কথায় প্রতিনিয়ম করিল মাজ । বাবাকীর কথার ভরীতে সেই গুরুতর বিয়ত সীমাতাকালেন একটা অক্ষুট হাণির রব উঠিল । ভাকারের শাক্যের সময় সন্তান ঘাটা নিষদ্ধ হইল । ভাকার ও পূর্ববর্তী শাক্যগণের সন্ধান করিলেন, অবিবাহিত বলিলেন যে, অকণ বাবু

তাহাকে গোপনে বনিয়াছিলেন যে অকণবধা রমণী তাহার পক্ষ প্রের, স্তম্ভতাং তাহাকে বাড়াইতে যত টাকা বার হর লক্ষ্যই তিনি লক্ষ্য বহন করিলেন । যেনেব বাবাকী শাক্য বলিলেন যে, তাহার অকণকে অকণ বাবুক সময় অকণের মুক্তি-ললীর বাগার ভিতরে বাজায় আগা করিতে গিয়াছিলেন । বাবুদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, অকণবাবু আগাম বাজার পূর্বে একদিন লক্ষ্যায় সময় বেদ-বাড়ীতে গিয়া রমেশকে তাহার ইচ্ছা ঐ সীমাকালী ভাং লইবার স্তম্ভ শাক্যে অনুরোধ করিয়াছিলেন এ কথা তাহার বাক্যে শুনিয়াছেন । সর্বশেষে রমেশের শাক্য পড়িল । গিরিবালায় কহত মত রমেশের নিত্যক অনিচ্ছাবশেষ সাহেবের হাতে অকণের সন্ধান প্রদান করিল ।

সাহেব এইবার অকণকে তাহার পক্ষে কথা বলিতে আদেশ করিলেন । অকণ অকণকে নির্ভর তাহার সময় কথা বলিয়া পেল । তাহার পর সাহেব শাক্যগণকে লেখা করিতে আরম্ভ করিলেন । সাহেবের লেখাতে গিরিবালায় যুখে এইটুকু প্রকাশ পাইল যে, সে তাহার পূর্বের ঘরঘাড়ের অথবা আশীরঘরনের কথা সীমাকালী মুক্তিলাহে অকণ অকণের সহিত সন্মর্শের কথা জুলে নাই । মুক্তি-ললী ও বাবাকীর কথায় স্তম্ভ কিছুই প্রকাশ পাইল না ।

ভাকারের লেখাকালে একটা ঘনমূল পড়িয়া পেল । ভাকার প্রথমে বলিলেন যে, তিনি বাবাকীকে তিনি করেন না, তিনি ঘটনার দিন তবানীপূরে একটা যোগী দেখিয়া ক্রিষ্টকল্পিলেন, সেই সময় বাবাকী তাহাকে পল হইতে লইয়া যায় । সাহেব যখন বিজ্ঞাপ্য করিলেন, সেই যোগীর বাড়ী কোথায় এবং তাহার বাড়ী কোথায়, তখন ভাকার সঙ্গতিত কইয়া ঠিকানা দিলেন । কিন্তু যখন সাহেব ঘটনা বলিয়া উঠিলেন যে, তাহার বাড়ী কালীঘাটে, তাহার নাম

জগদীশ ভাষ্কর, রাষ্ট্রতরঙ্গ ভাষ্কর নহে, তখন তাঁহার ঘর শুকাইয়া গেল। তিনি আশুতা আশুতা করিয়া বলিলেন, এতো আর আশ্রয় নহে যে মেঘা' কথা হচ্ছে, এ কেবল বাড়ী ভেঙে এনে জঙ্গলাকণ্ডে অপহান করা হচ্ছে, অতএব এখান থেকে চলিয়া যাওয়াই উচিত। এই কথা বলিয়া যেমন তিনি ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেন, অমনিই সহোদর তাঁহার পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া জগৎ-সত্তারদ্বারে বলিল, “এখন থেকে এখন একপাশ কেউ নড়তে পারবে না। বিচার চেয়েছে বাগা, তার বিচার লাগ না হলে যেতে পাবে না।”

বাগাজীঘের দলের সকলের ভিতর একটা আকস্মিক চাক্ষু্য দেখা গেল। রমেশও একটু বিচলিত হইবার তাব প্রকাশ করিল। মেঠা চকিতে লাগিল। মেসের বাবুদের বেতার লম্বা আর একটা নূতন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাতেও বাগাজী দলে আরও অবিক চাক্ষু্য উপস্থিত হইল। সার্কেণ মহাশয় লেশময় মুখে বলিয়া ফেলিলেন যে, তিনি ঘটনার দিন কেন, ঘটনার দিনের পূর্বেই ঐ বোকার দিকে মুক্তি-অনীর বাগায় থাকিতে দেখেছিলেন এবং তিনি হলপ করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি মুক্তি-অনীর লবে উৎসাহে একদিন মহা কলহ করিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, একথা তিনি মেসের অগ্রস্ত বাবুদিককে ইহার অনেক পূর্বে বলিয়াছেন।”

কহে মহা উত্তেজনা-স্রোত দেখা দিল। সাহেব সকলকে নিবদ্ধ হইতে বলিয়া পত্নীস্বরে বলিলেন, “এই বাবু যা বলছেন, তাতে প্রমাণ হচ্ছে, ঘটনার দিনের আগে থেকে এই ব্রৌলোক মুক্তি-অনীর বাগায় ছিল এবং সেখান মুক্তি-অনীর বা বাগাজীর জান ছিল; অথচ মুক্তি-অনীর ও বাগাজী বলছে যে, অতঃপরই প্রথমে তাকে এনে ঐ বাগায় তুলেছেন তা হ'লে এদের কথা মিথ্যা বলেই প্রমাণ হচ্ছে। এতে বাগাজী তোমাদের কিছু বলবার আছে?”

বাগাজী লাকাই গাহিয়া বলিলেন যে, “মেসের বাবু নিশ্চয়ই বুঝ থেকে তুলে দেখেছেন তুলেছেন, তাঁরা যখন বলছেন অতঃপরই প্রথমে যেহেতুকে বাগায় এনে তুলেছেন, তখন উনি নিশ্চয় আর কোন ব্রৌলোককে বাগায় ভগড়া করতে স্মরণ করেন।

সাহেব এতক্ষণ ঘুম টিপিয়া হাসিতেছিলেন, এইবার বলিলেন, “আর আমি যদি আর একজন লাকী এনে প্রমাণ করতে পারি যে ঐ ব্রৌলোকটা ঘটনার দিনের পূর্বে হতেই মুক্তি-অনীর বাগায় ছিল, তা হ'লে বাগাজী কি বলবে, তখন বাবুই কি বলবেন?”

রমেশ চমকিয়া উঠিল। তাহার বিশ্বাস অপ-
স্মৃতি হইতে না হইতে পাণের পুরের দরদা খুলিয়া
হানবদ্য বাবু একটা নূতন পোকে লইয়া হস্ত-পরে
প্রবেশ করিলেন; তিনি সাহেবের ইন্দ্রিত আগেই
উদ্ভীয়া গিয়াছিলেন। আশ্চর্যকর দেখিয়া বাগাজী,
মুক্তি-অনীর, গিরিবালা ও ভাষ্কর মুখের দাক্ষ
অবিশ্বাস্য জমি করিয়া উঠিল, যেন তাহারা
স্রোতারা দেখিয়াছে এইরূপ আতঙ্কের ভাব ব্যক্ত
করিল।

সংকল্প আতঙ্ক হইল। একি, এত অবস্থার
সুপনী ওয়াগা, ইত্যাকে দেখিয়া উগ্রা একদ
আতঙ্কিত হইল কেন? একি, বাগাজী ও ভাষ্কর
পলাইবার চেষ্টা করিতেছে কেন? বস্ততঃ বাগাজী
প্রথমে পলায়নের পথ খুঁজিতেছিল, কিন্তু পরোক্ষের
নিকট বাগাশ্রুত হইয়া অশ্রুযোগ করিল যে, সুপনী-
ওয়াগা চোর, মুক্তি-অনীর স্বপ্নদর্শক লইয়া বেশে
চলিত মিথ্যাছিল, উভয় কথা মিথ্যাঃবাগা নহে।

এই লগবে লম্বাঘরি অগ্রসর হইয়া কটকট দৃষ্টিতে
বাগাজীর দিকে চাহিয়া কঠোরকণ্ঠে বলিল, “আমার
কথায় বিশ্বাস হবে না, আমি চোর, কেমন না
বাগাজী? আমি চোর, আর তুমি লাকু? শুভ
জোড়োয়া! হজুহো লম্বা দেখেছেন, আমি বুঝি
চোর, তবে আমার দেখে ওরা আঁতকে উঠবে

কেন, পাশাখাব পথ খুঁজবে কেন? হুজুর, খবর সাকী করে বলছি, আমি চুরির বিশ্ববিদগ্ধ ছাতি নি, এই জোক্তোর বাবাকী বিধো ভর বেখিয়ে আবার কলকাতা ছাড়া করেছিল। কেন, তা এখন বেশ বুঝতে পেরেছি। আর তাই যোগ তাল পরে মুহুরাখ্য থেকে উঠে বকুল বাগানে ফিরে এসে বাবাকীর বেঁচে করতে গিয়ে এখন মুক্তি-অলৌর বাড়ী থেকে কালীবাটের কপালকাটা খুঁজে ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি লুং, তখনই বুঝে-ছিলাম যে, যে ছাড়াটাই ভজ্ঞে বাবাকী যেটা আবার কলকাতা ছাড়া করেছিল, তার সবচেয়ে কিছু বড়ত আছে।”

সাহেব হিষ্টিয়া করিলেন, “কি রকম, সব তেজ বল।”

জহরির আবার বলিতে লাগিল, “সব বলছি, আপনারা একটু বৈধ্য করে শুনে যান। এই আমায় দাবাবাখু—এই যে আপনাদের অকলখাখু—আর মত পতীরা প্রাণীকোর উপর তার বরা নারার কথা একদুখে বলতে পারি নি—সেই দাবাবাখু হুজুর কথা শুনলুম, তখন আর একরকম কলকাতার থাকতে ইচ্ছে হ’ল না। তাই এখন ঘেমে ফিরে যাবার দিন মুক্তি-অলৌর বাড়ার বিকেল আসতে আসতে দুই হতে জগদীশ ডাক্তারকে বেরতে দেখলুম, তখন মনে নানা সন্দেহের কথা উদয় হলো কিছু না বলে রেল টেলে ঘেমে বড়না হলুম। ডাক্তার বড়নার বেলার দাবাবাখুর সঙ্গে দেখা হল আর ঐ কপাল কাটা খুঁজে ডাক্তারের কথা উঠলো, তাই সব বুঝতে পারলুম। হুজুর, ঐ যেটা ডাক্তারের ভাগ করে অনেক দিন থেকে কালীবাটে এক পাগের আড়ত খুলে বসেছে। সেখানে ওর না এখন কাজ নেই। গুর্জারাত জগদীশ, মেয়ে চুঁচি, মেয়ে বেটা, ইত্যাদি সকল পণ্ডিত কাজই হয়? দিখো, গাউকিকেট, মাল জুয়াচুপি, লুকিয়ে বিদেওনা, সন্দেহের এখন অসম্ভব নেই যা না ইখানে

হয়। তাই ওর নাই খুঁজে ডাক্তার। একবার এক লাড়াখারে পেরুর ঘেমে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এখন তার বেবেছিল যে এখনও ওর কপালে তার বাগ আছে, আর একবার কালীবাটে ঐ রকম এক কাণ্ডে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল—”

অকল এই সববে বলিয়া উঠিল, সে কাণ্ডের কথা আমি জানি, তখন আমি কালীবাটে বেগতে যেতুম।”

জহরির বাবার বলিতে লাগিল, “তার পর সে পাড়া ছেড়ে ল’নখবে গিয়ে উঠলো, সেখানেও ঐ ব্যবসায় চালাতে লাগলো। এই ঘেমেটাকেও নিশ্চয় ঐ যেটা কোন পেরুর ঘর থেকে জুলিয়ে নিয়ে এসে বাবাকীর জেদার হেবেছে—”

ডাক্তার লাকাইয়া উঠিল বলিল, “দাবাই আপনাদের, এ ঘেমেয় কথা আমি জানি নি। মুক্তি-অলৌ তাকে খুঁজে ছেলেবেলায় লুকিয়ে এক কাছের পেরুর বাড়ী থেকে চুরি করে এনেছিল, ও মাগী তাদের বাড়ীর কি ছিল—”

মুক্তি অলৌ বিবদ জুজু হইয়া বলিয়া উঠিল, “বেগ করেই এনেছি, তার তাতে কি করে ডেবরা সুখপোড়া! বিলে সাপ, মাছ, ত এবেছে, মরল আর কি! আর তুই সুখপোড়া যে টাকার লোভে ওর বিধো মাথার পোড়ের ঘোঁরাই দিয়ে এইখানে রাখিয়ে দিলি, তার বেলা খোদ হল না? নজ্জার কে; থাকার, আগার বেগ মাগী! মাগী তোয়—”

বাবাকীর সবই ইয়ালা ইজিত বার্ব হইল। মুক্তি-অলৌ রানের বেশে ভিতরের সব কথা বলিয়া ফেলিল। তখন সাহেব ঘীরে ঘীরে মুক্তি-অলৌকে বলিলেন, “হা! বাচ্চা জুনি তাল নোক, জুনি মাগী হতে যাবে কেন? ঐ ডাক্তারটাই বড় নারের গোড়া। তা তাকে গেল কোথায়?”

বাবাকীর সন্দেহ হইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি

কথা গুলটিয়া লইবার চেষ্টায় বসিল, “হ” ডাকারী
যেন কেমন দ্বারা নোক গো! ডাকার -”

ডাকার ভাষায় সুখের কথা কাকিয়া লইয়া
বলিলেন, “বটে ডাকার বন্ধ লোক হ’ল? ঐ
ত’ নিয়েই সুখে বসেছে, তা ছাড়া আমিই ত ঘরে
বাড়িরে দিই—”

“কোন রতনপুর?”—ভাষ্যের উল্লেখিত ঘরে
রমেশ এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। একতল রমে-
শের বিকে কাচেরও লক্ষ্য ছিল না, এখন সকলে
সেই বিকে চাওয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।
স্বহৃৎ মধ্যে রমেশের চেহারা বিস্মী হইয়া গিয়াছে।
গিরিবালায় চোখেও লক্ষ্য বিন্দুর বিচ্ছিন্ন প্রকটত।

ডাকার অব্যব বিবাহ পূর্বেই হুড়ি-অলৌ চৌ-
কার করিয়া বসিল, “তুমি আমার বাড়িরে দি-
ছিলে, না? মেয়ের হোমগারে ভাগ দিয়েছিল
কে? কেবল ঐ রাধা দিত্বরের মেয়ে নয়? তা
ছাড়া কত ভদ্রলোকের মেয়ে হোমগারের মত্রে
তুমি কালীবাটে রেখেছিলে—”

রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, “কোন রতন-
পুর? কোন রংগামে দিত্বির? বল, বল।”

হুড়ি-অলৌ নাক বুড়াইয়া বসিল, “আহা, যেন
নেকা? রতনপুর আবার কটা? ঐ গোপাল
নগরের কাছে গো। ঐ নাটের গুল ডাকার—”

আর বলিতে হইল না, রমেশ ভীষণ আত্মনাম
করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ বে হুই হাতে চোখ
চাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, সকলে অবাক হইয়া
ভাষার বিকে চাওয়া করিলেন। ভাষার পর যখন
সে কথা বলিল, তখন সকলে ভাষার কঠোর
অব্যক্তাবিকতা লক্ষ্য করিয়া অবিকল্পিত বিস্মিত
হইলেন।

রমেশ গিরিবালাকে নির্দেশ করিয়া বসিল,
“বকে কি সখাই পুটী বলে ডাকত? ওর আসল
নাম কি সুরবালা ছিল?”

হুড়ি-অলৌ বিস্মিত দইয়া বসিল, “কেন বল
বেশি বাবু?”

রমেশের চোখ দুটা পোটর হইতে টাখিয়া
বাহির হইয়া আসিতেছিল। সে হাড়াইয়া উঠিয়া
সবলে হুড়ি অলৌর হাত চাপিয়া ধরিয়া বসিল,
“এন, বল!”

“আঃ বলছি, হাত ছাড়, হাতে মাপে যে বাবু।
রাধা দিত্বিরের বাড়ী কাল কত্নয় আমি, ঐ
পায়ে কৈবর্তদের মেয়ে কি না আমি। রাধা দিত্বির
বুড়ো বচেনে গোলাপকে বিয়ে করলে, নতুন বৌ
যবে এলে মতীন বিকে বড় ঘরায় দিতে লাগলো।
এই গিরিবালা বলে থাকে বেবছো, এই সেই
মতীন কি গো, এরাই নাম—”

“হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ”—রমেশ বিকট হাত্ত করিয়া
উঠিল, সকলে ভাষার ভাষা হেরাফা দেখিয়া ভীত
হইলেন। রমেশ উদ্ভাষের মত বিকট হাসিয়া
বসিয়া উঠিল, “বেশ হয়েছে, পানের উপযুক্ত লাগি
হয়েছে। তুমি রমেশ—হুড়ি-অলৌর পুরো মা বাপে।
সন্তান—তুমি হোমগারের স্বপ্ন বেবছিলে, না? বড়
হুড়িমান তুমি। অল্প ধনহুবেয়ের একমাত্র সন্তান
—বড় হিগেলে তার! তার হিগেলে অংশ পড়ে
যাছিল, কেমন না? অল্প স। নিষেছে, রাধার
অনিলাকে—ব্রজবন হুজুরী অনিলাকেও বেবো।
রমেশ, তোমার হুড়ি কৈখা পেন? কালীবাটে থেকে
তোমার সেই মেয়ে মাহুবাটকে নিয়ে আয়। কোন
মেয়েমাহুবাট? কেন, যেটা পেন? হুড়ি-অলৌ তোকে
হুগিয়ে দিয়েছিল। এই মেয়ে থাকতে এখন মনে
মেয়ে মাহুবাট? হুড়ি-অলৌ তাকে হুগিয়েছে। এটা
কে? এটা রতনপুরের রাধারমণ দিত্বিরের মেয়ে।
বল বাঃ কি যোগাযোগ! এই রাধা মানার প্রথম
পক্ষেই মেয়েই ত’ হ’ল বড়রের মনর হারিয়ে যায়!
রাধা রাধা! আপন মানা তোমার রমেশ। হু।
হুড়ি তোমার, হাঃ হাঃ হাঃ—” রমেশ হুই হাতে হুটী
হুটী ছল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ঘরের বাহির হইয়া পেল,

অকপের ইতিতে সত্যের তাহার
করিল।

এই বিতংগ কাণ্ডের আর বিস্তৃত বিবরণ লিখি-
বার প্রবৃত্তি হয় না। পানীর নিম্নস্থেই সমস্ত
পাপের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। বেথুড়ক নিতম্ব
টানের মত অকপকুনার এই অটনচক্ৰ হইতে
বাহির হইয়া আসিল। অকপকুনার রামদত্ত সত্বের
আগে অকপের চইটি হাত ধরিয়া ছল ছল নৈজে
চাহিয়া গহিলেন, তাহার চোখ দুটী নীরব ভাষায়
অকপের নিকট কন্যা ভিক্ষা করিতে লাগিল। কালী
দত্তর বাবু সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বাবানীর
মলকে পুনীনের হাতে না বিয়া ছাড়িয়া দিলেন।
কিন্তু একথাও বলিয়া দিলেন যে, যদি অকপের
তাহাদের কাহাকেও কলিকাতায় দেখিতে পায়
বা, তাহা হইলে তাহাকে আর কখন কখন হইবে
না।

— — —

সপ্ত বিংশতি পরিচ্ছেদ

স্মৃতি-মন্দির

"এল, নিরে বাবে, বল। না বললে এমনি রোগ
করবে, সে আর কি বলবে! হুঁ, সত্যি বলছি,
বল রোগ করবে,"—অকপের খিলা উঠলে নাক-
নিচা অকপের কঠোর অনিলা কুজির কোণের
মহিত এই কথা কটী বলিল।

আজ দুই মাস হইল অকপের সহিত অনিলার
বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বর: সরোবরান সেই বিবাহের
প্রথম উজোনি। সে বটা, সে দুমবার, মীরতাং
ভুতাতা, সে আমোদ প্রমোদ, সে নাচগান, সে
হাসি হাস্য ভবানীপুর ও বাগিনের লোকের
বহুদিন মনে থাকিবে। অকপ এ সকলে একবারে
নাশক ছিল, কিন্তু সরোবরের উৎসাহের তোড়ের
সুখে এবং চাহিলেন বুড়ার (কালীদত্তর রামদত্ত
জ্যেষ্ঠাধার কেনেডি ও কোঠারি মহাশয়ের) নির্জ-
ভাতিশের তাহার আপত্তি তাগিয়া বাধ।

আর অকপ জিতলের বিদ্যায় ককে আরাম
কেনার ঐক্য হেলিয়া পড়িয়া একখানা পদ্যের
কাগজ পড়িতেছিল। এই ছটা মাস সে যেন এক
পদ্মরাজ্যে পুষ্টিগেছে কিরিগেছে, বেড়াইগেছে, বদমাশ
করিগেছে। সত্যই কি সে অনিলাকে পাইগেছে?
না, এ কোন প্রশ্ন? না, প্রশ্ন? না। সরোবর
বা বলেছিল তা'ত সত্য। এই দুই মাসে এতোক
খুঁটনাট করে সে যে তাহার প্রতি অনিলার
প্রগাঢ় প্রেমের বহু পট্টে পাইগেছে। আর
চোখের মাঝে কাগজখানা থাকিলেও এবং চোখে
ছটা কাগজের উপর পড়িয়া থাকিলেও অকপের
চিন্তাধারা পূর্ণকৃত বাতেই প্রবাহিত হইতেছিল।
গ্রিক এমনিই সময়ে অনিলা টিপি টিপি করে চুকিয়া
একবারে কাছে আসিয়া কাগজখানা টান মাটিয়া
কেলিয়া দিল এবং কুজির জোবাভিমানমুক্তিত বরে
পূর্ণকৃত অস্থায়ণ করিল; তাহার কথার সুরে
অভিমান আর জোবা, কিন্তু অকপের কোণে দুই
হাসি, চোখের কোণে অকপ তালবানার
বিলোল কটাক।

অকপ সেই ভুবন প্রবাহী গিণোয়ীকে পাড়
আনিরনে আঁড়ে করিয়া কণকাল নীরবে চকু
নির্মিলিত করিয়া রহিল, তাবিল সত্যই কি সে
ভগবানের অশ্রুতদায় তাহার অনিলাকে প্রেমবদী
পত্নীত্বপে লাভ করিতে সক্ষম হইগেছে। তাহার
চোখের পাতা ভিত্তিয়া আসিল। স্বামীর আদরে
অনিলার কণকাল ভাবাবেশে বিভোর হইয়া
রহিল। তাহার পর অনিলা তাহাকে নীরব
বেধিয়া বলিল, "এল না, কি জাবহ? ও: নিরে
বাবে না বুঝি! তাই চুপ করে আছ? আচ্ছ,
বেধ,—" এই কথা বলিয়া অনিলা ঢকল হাতে
অকপের কাণের বোতাম খুলিতে ও পরাইতে
লাগিল।

অকপ প্রগাঢ় প্রেমাবেশে তাহার সেই সুন্দর
ব্রতখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রেমদগদগদ করে বলিল, "নিলা

পরীক্ষার কি শেষ হয় নি? এ বাড়ীতে আমি কে? সর্বোৎসাহী কর্তা তুমি, তোমার সহস্রকে কে না চলে? তুমি—”

অনিলা কোমল করপরে অচপের সুব চাপিয়া ক্রিমি কোণের সহিত বলিল, “হাও! কি যে বল, ছুঁ।”

অরুণ হাসিয়া বলিল, “না নিলা, আমি কি ঘিঘো বলেছি, এ বাড়ীতে আমার উপরোধ অগ্রহণ না থাকতে পারে, কিন্তু তুমি যা বর্ণন কর তা পালন করবে না, এমন লোক কে আছে? বাবা কি তা হলে তাকে আত্ম রাখেন? কি আমি, কি মন্তর আমি, বাবাকে ত’ একবারে বল করে ফেলছ—”

অনিলা তাহার সুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “আর তোমাকে?” অরুণও হাসিতে হাসিতে বলিল “ইস! তা আর হতে হয় না। সে বহু আমি এককালে বলতে পারে।”

“আচ্ছা, আচ্ছা, তাই গো মশাই, তাই। এখন, যা বলছিলুম, তার কি হ’বে?”

“আর আর কি? সে ত’ হয়েই রয়েছে। যখন তুমি যোগে যাবে, তখন যাবেই,—”

অনিলা ক্রিষ্ণহস্তে তাহার সুব চাপা দিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গভীরভাবে বলিল, “সেখ, এক শো বার অবন কথা খোঁচো না। ঠাট্টা ভাষালা করে একবার আধবার মূল্যে, এই ডের। আমি কে? আমি তোমার চরণ দেবার দাগো। আর বাবা? তিনি দেবতা, তাঁকে আমি বর্ষা মনে মনে পূজো করি, তাঁর সম্বন্ধে এমনই করে বললে আমার মনে বড় ব্যথা লাগে।” অনিলার চোখের পাতা ত্রিবিধা আগিল।

অরুণ বিম্বিত হইল না, সে অনিলার ত্রিতর বাহির সম্বোধি আনিত। দেও ভাষি গলায় বলিল, “না নিলা, আর বলণো না। যাওয়া ত’ ঠিকই আছে। তুমি যেদিন প্রথমে এই কথা শেঁকেছিলে, সেই দিনেই বাবা মৃত্তা বিয়েছিলেন। তবে তখনও

পঞ্চাতি সব নিরাপন্ন হয় নি বলে তোমার নিষেধেতে সম্মত হন নি। এখন সাংকেই নিষেধ গিবে সম্মত বন্দোবস্ত করছেন। তোমার মনের ইচ্ছা যে দিন ব্যক্ত হয়েছিল, সেই দিন চড়েই সাংকেই কাজে উদ্ভাসী হয়েছেন। সাংকেই ত্রিষ্টা পেয়েছি, সাতিয়া থেকে দিবাং-আবো পর্যন্ত সমস্ত পলটাই এখন স্তিতমিত পাণ্ডার বন্দোবস্ত হয়েছে। এই বার সাংকেই আনন্দের ঘেঁত বন্দোবস্ত করণ হ’বে। সত্যকে বলেছি, সে কিন্তু ঘেঁত চাইছে না, অর্থ আগে বিবেশে বেড়াতে এত ভাল বাসতো।”

অনিলা বলিল, “মীরা, সাংকেই মৃত্তা মৃত্তা কি হয়!”

অরুণ উৎসাহভরে বলিল, “তা ঠিক, এর সুন্দর একটা মাহুর্ষ্য ত’ আমি দেখতে পাই নে। ওর কথা উঠলে এং রমণের কথা মনে পড়ে, তখন তাবি ভবন কত ভিত্তি বাতুতে মাহুর্ষ্য পড়েছেন—”

অনিলা বাবা দিগা বলিল, “ও সোকাটার নাম সুখে এনো না। এত শচতান, এত বল—”

অরুণ বলিল, “তার শাখিও চরণ হয়েছে, এক-বারে উগ্রাব হয়ে গেছে। বাবা তাকে বহরমপুরের পাশলা গারবে পাঠিয়ে নিয়ে ভালই করেছেন। লককেই বসছে, তা না হলে সে খুব মৃত্তা আত্মহত্যা করতো।”

অনিলা বলিল, “হাক, এর কথা খাৎ, ও কথা মনে হ’লেই কষ্ট হয়। দেখ, সত্যটাও গেতে চাচ্ছে। ওকে নিয়ে যাবে ত’?”

অরুণ হাসিয়া বলিল, “ওকে না নিয়ে গেলে তোমার কাছে পার আছে কি না! আর থাকে সবে নিয়ে যাবে, সে সব ত’ আগেই বাবার কাছে ঠিক করে ফেলছ।”

অনিলা আরও বৃদ্ধবয়সে অরুণের কণ্ঠ বেটন করিয়া শ্রেয়শুকিত মনে অরুণের সুখের বিকে চাখিয়া বলিল, “তবু তুমি একবার বল।”

অরুণ হাসিয়া বলিল, “ও আবার শুকুন না হলে

বৃত্তি হবে না? বহুত' আমি একটা যে সে লোক
নই! তোমার থাকে ইচ্ছে হবে নেও, বাবা কাউকে
বাৎসব করবেন না। অমিকে নিঃসেই হবে, সে ত
আমায় ছিঁড়ে খেয়ে যেলে। আর বেশ, সরোজকে
জুঁম একবার ভাল দেখ না, তোমার কথা কেনতে
পায়ে না।

অনিলা হাসিয়া বলিল, "বেশ মজুৎ বা হ'ক,
আমি বললেই হবে যেন।" তারার পর ঠাৎ
পড়ার বইয়া বলিল, "বেশ, সরোজকে পড়াপড়ি
করে থাক নেই। জুঁম বেলত, অথচ তোমার কথাও
যখন রাখতে অনন্ত হাচ্ছে, তখন নিশ্চই কোন
কারণ আছে। সরোজনা তোমার কত ভালবাসে,
কি লোক দেখে তু' জান ত'?"

"জানি নি।"—বলিতে বলিতে শক্তমান
অঙ্গের চক্ষু অঙ্গপূর্ণ হইল। সে আবার বলিল
"সরোজ আমার ভ্রাতৃ কর্তে পারে না এমন কাজ
নেই। সেই লোক কেন আমার কথা রাখছে না,
বৃত্তিতে পরিপূর্ণ না?"

কথাটা চাপা দিবার চক্র অনিলা অল্প কথা
পাঠিল।

*

*

যেহা হোলে সজ্জন করিয়া বেগবতী দিখানেকী
ব্রহ্মপুত্র-স্রবের উৎসে দৃষ্টিগোচ্রে। ভীষণ জলাবর্ত
কুশল চক্রে গাও নিরখিতভাবে সুরিত্তেছে।
কত ভূপলতা বাণীর পৃথক্টের গতিতে নদীর বর
জোতে বাহিত হইয়া নিম্নে অতর্জন করিতেছে।
নদীর জল যেন উপংস করিয়া দৃষ্টিতেছে, আর সেই
ধলে অতর্জিতপ্রায় ভঙ্গলধেবের ব্রহ্মজ্ঞাতা পড়িয়া কি
শোভাই দৃষ্টাইয়াছে!

নদীতটের প্রায় বনভাঙ্গী ব্রহ্মজ্ঞাতা হইয়া
উঠিয়াছে। সেই রূপা আলোর স্নাত হইয়া
দৃষ্টী বহুদৃষ্টি হাত বসাইতে করিয়া নদীতটাত্মক
অঙ্গের হইতেছে, সেই দৃষ্টি দৃষ্টী অঙ্গ ও অনিলায়।
কলেহলে রূপা আলো, সেই আলোর তাহারও

আলোকিত। হাথার উপর পদ্মাদমান বিহঙ্গম
কুলায় অতিশুণে উড়িয়া বাহিরেতে, জমে ধোঁপের
আলো-আবার বীর বীর পৃথিবীতে নামিয়া
আসিতেছে।

নদীতটে বনভাঙ্গী কেহ নাই; নদীতটের
প্রাণের সাক্ষা নাই, নদীর পদপাতের সাক্ষাৎ নাই
অঙ্গের বেড়া-বহা একটা হানের সঙ্গীতবর্তী হইয়া
অকিঞ্চিৎকর হইয়া, সেই স্বর্নীর মধ্যে আর কিছু
নাই, কেবল একটা সুস্বাদু করাতক। কিশি-
কর্তে অঙ্গ বলিল, "নিলা এইখানে।"

অনিলা চকিতে স্বামীর সুবাসনে তাকাইয়া
দেখিল, সে সুবে কি তাবাক্ত: উপস্থিত হইয়াছে!
তারার চক্রে বসন্ত স্বামীর বহু বাত্যাধোপিত বেল
পত্রের মত বৎসর কাঁপতেছে, তারার স্বামীর বিশা
নয়ন চুটী অঙ্গভাঙ্গী হইয়াছে। অনিলা গুচ
আসিলেন স্বামীর বহু আত্ম করিয়া গিলে।
অনিলা সাধনার কথা করিতে দেখ, কিন্তু তাহার
বর্ত্ত বাসকত হইয়া আসিল। সে কেবল তাহার
কোমল করে স্বামীর হাতবাঁনি বহিয়া স্বর্নীর দৃষ্টি
স্বামীর সুবের নিকে চাইল। অঙ্গের চক্রে মতবাহু
হইয়া পথের দুপার বাবা দুটাইয়া অঙ্গের অতর্জিত
বলিল, "নিবি! সত্যি সাক্ষী পৃথিবী" জুঁম।
কি হার কীটাত্মকীট আমি, তোমার চরণ হেয়
যোগ্য নই। জুঁম তোমার অঙ্গ অন্ত পূর্ণবলে
আমার এই সুবের অবিচারী করে বিয়ে গিয়েছে। স্বর্ন
থেকে আশীর্বাদ কর, যেন তোমার এই অঙ্গ
হানের উপস্থিত হতে পারি।"

যখন অঙ্গের দ্বারা অনিলায় হাতবাঁনি বহিয়া
দৃষ্টি, তখন অনিলায় নৈশোৎসব নয়ন চুটী
তানিয়া গিয়াছে; অনিলা হুঁকাইয়া হুঁকাইয়া
কাঁদিয়েছে। অঙ্গ সেই প্রেমপ্রতিশোধে কুক
টানিয়া দিয়া প্রেমতরে সুখজন করিল, তাহার
নয়নের অঙ্গ সুহৃদইয়া বিয়া অঙ্গকর্তে বলিল, "ওল
নিলা, বাদার হাই।"

আবার অনিবার্য চোখ দুটা মনে ত'রফা আশি
সে স্বামীর হা'ত দুটা ধরিয়া আগ্রহপূর্ণ মনে
স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, “আবার একটা
অশুভোগে ভাষবে?”

অল্প সময়ে তাহার কণ্ঠস্বরে হইতে অসঙ্ক-
ত অশ্লীলতা করিতে করিতে বলিল, “কি অশু-
ভোগ? তোমার কোন্ অশুভোগ—”

অনিলা তারি প্রশ্নে বলিল, “এদ, এইখানে
একটা দ্বন্দ্বের নিদান তবু দেখে?”

অল্প বলিল, “তাই হলে, নিদা। আবার মনের
বালনাও প্রতিফলন করেছ—তুবি। বৈধিগীত'এ
পৃথিবীর ছিল না।”

* * *

কালীশঙ্কর বাবু আশ্বীর স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে
সইয়া আগমনের কালো জলসিঁদা-আবো গ্রামে
আসিয়াছেন। তাহার সত্বেই বাবু বীর অকালের
সেই আশ্বমানেও বসি দেখিয়াছেন এবং সেই স্থানে
একটা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু কেহই
সেই স্মৃতিস্তম্ভের কথাও চিহ্নিত নিবৃত্ত হাননি দেখিতে
হান নাই—যেখানে আর একটা অল্প কালো
খাপার নীরবে সংঘটিত হইয়াছিল। এই পৃথিবীতে
কত স্থানে কত সময়ে এইরূপ কত নীরব নিঃস্বার্থ
আশ্বমান খাপার অস্তিত্ব হইতেছে তাহা কে
বলিতে পারে, করজনেই বা তাহার সম্মান রাখে?

অনিলা কিন্তু একটা উদ্বেগে সইয়াই নিঃস্ব-
ার্থ আশ্বমানে। সে অকালের কীটিকলাপের
হান'ও দেখিলই; পরে স্বামীর সঙ্গে সেই নিঃস্ব-
ার্থে বসি গেল—যেখানে বৈধিগীত গ্রাম বসি

বিধা আপনাতঃ প্রিয়তমক নিশ্চয় হইতে চকা
করিয়াছিল—যেখানে প্রত্যহ পোশুগির অব্যবহিত
পূর্বে—যে সময়ে বৈধিগীত তাহার প্রিয়তমের বন্ধের
উপর মাথা রাখিয়া এই মরলক্ষ্য হইতে মধ্যস্থান
করিয়াছিল—সেই সময়ে অশ্রুতঃ তত্ত্বপ্রদা
তালবানার উপহার দিতে আসিত। অনিলা
চক্রে বৈধিগীত অজ্ঞানতা সত্তা, তাই সে সেই সত্তা-
ভীর্ষে পূজা বিধা পঠন পাতিয়াত করিত। অনিলা
পুশপদ পুশকোশাধি বিধা অথবা বৈধেয় অধ্যাদি
সাধাইয়া করতী তপে পূজা দিত না; কিন্তু প্রত্যহ
সে পূজাতে বালদ্বানে প্রত্যাগর্ভন করিলে বহি কে
সে স্থানটি দেখ্য করিত, তাহা হইলে স্মৃতিস্তম্ভের দেখিতে
পাইত সেই করতী তলের স্মৃতিস্তম্ভা গ্রিনা বাতিয়াতে
তিনিহা সিঁদে। অনিলা কলিকাতা প্রত্যাগর্ভনের
পূর্বে প্রত্যহ মরলক্ষ্যের সেই স্থানের পূজা করিত।

তাহার পর অনিলা অশ্রুতঃ কালীশঙ্কর
সেই স্থানে বহু স্মৃতিস্তম্ভে একটা স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ
করিয়াছিলেন। সেই স্মৃতিস্তম্ভের অধিষ্ঠাতা বৈধি-
গীত কিছই ছিল না, বরং স্মৃতিস্তম্ভের অস্তিত্বের
মরলক্ষ্যের মধ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ করতী বৃক।
তাহাই নিত্য পূজা, ভোগ, আর্চন হইত;
তাহাই স্মরণ অতিপিত্র অত্যাচার মধ্যে বিচরিত
হইত। স্মৃতিস্তম্ভের স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ হইয়াছিল—

“সত্তা-স্মৃতিস্তম্ভ”

আর দ্বন্দ্বের সোপানের নির্মাণ
হইয়াছিল—

“০২৭-স্মৃতিস্তম্ভ অনিলাবাসা”

স্মৃতিস্তম্ভ।

রাত্রির ধ্বনি

(খণ্ডগিরির ডাক-বাংলোয়,—ঘোর দুর্গোগে)

(ক্রীয়েমেল্লুয়ার হাট)

ঝিন্-ঝিন্ ঝিন্-ঝিন্ ; ঝিন্-ঝিন্ ঝিন্-ঝিন্,
ধন্-ধন্ ধন্-ধন্, গিদিব টিন্-টিন্ !
উল্লুন্ ঠিত—ধুক্-ধুক্-ধুক্-ধুক্ !
বজ্রার লাল গোব—বক্-বক্ ধুক্-ধুক্ !
আঁৎ সব ছাঁৎ-ছাঁৎ, লাঁৎ-লাঁৎ, হিম-হিম,
ঢাক্-ধুক্, বোঁৎ, গোব—ঝিন্-ঝিন্ ঝিন্-ঝিন্ !

হুপ্-হুপ্ ! ঐ শোন্—রত্নবন্ রত্নবন্ !
বজ্রার কন্-কন্—চাহ্-চাহ্ পদ্মপদ্ম !

বাঁহাটার স্পন্দ—কন্-কন্ স্পন্দ-স্পন্দ !
চক্-স্পন্দ—বক্-বক্ তাল পূব !
কন্-কন্ স্পন্দ-স্পন্দ, কিক্-কিক্ স্পন্দ-স্পন্দ !
বিজ্-লী কিক্-কিক্ ! অগ্নি বজ্র !
জল খাঁর ঘোর রাত্—চক্-চক্ স্পন্দ-স্পন্দ !
সিক্-পুধী—কন্-কন্, স্পন্দ-স্পন্দ !

হুপ্-হুপ্ ! ঐ শোন্—রত্নবন্ রত্নবন্ !
বজ্রার কন্-কন্—চাহ্-চাহ্ পদ্মপদ্ম !

ছাড়া, তাত্, বার—কন্-কন্ বার-বার !
বাল-ডাল টলটল—কোণ্-কোণ্ দাপ্-দাপ্ !
কটপট পাঁচাট, কটপট বাঁহাট,
চাঁৎকার ঐ কাত—সব বহু বাঁহাট !

তহ্-তহ্ সব বাঁহা ! তত্-তত্ বাঁহাট !
উদার ধুদার—কন্-কন্ বার-বার !

হুপ্-হুপ্ ! ঐ শোন্—রত্নবন্ রত্নবন্ !
বজ্রার কন্-কন্—চাহ্-চাহ্ পদ্মপদ্ম !

কিক্-কিক্, পিক্-সব—বজ্রার কন্-কন্ !
কট্-কট্ কট্-কট্—কট্-কট্, কট্-কট্ !
হতাঁর বৈ-বৈ, হতাঁর, বাঁহা-ডাল,
বাঁহা-বাঁহা চিল্ ! আন্-দাল্—কট্-কট্ !
বজ্রার বৈ-বৈ—বজ্রার কন্-কন্—
কট্-কট্ কট্-কট্—বজ্রার কন্-কন্ !

হুপ্-হুপ্ ! ঐ শোন্—রত্নবন্ রত্নবন্ !
বজ্রার কন্-কন্—চাহ্-চাহ্ পদ্মপদ্ম !

বিজ্-লী আঁহাট—কন্-কন্, আন্-বাহ !
জন্-জন্ বাহ—আঁহাট-আঁহাট !
কন্-কন্ সব কিক্—ঐ কিক্, ঐ কিক্—
কৈ-বাহ, কৈ-বাহ, কৈ-বাহ, কৈ-বাহ !
কৈ-বাহ—কৈ, কৈ—আঁহাট, আঁহাট !
আঁহাট বিজ্-লী—আন্-বাহ, আন্-বাহ !

হুপ্-হুপ্ ! ঐ শোন্—রত্নবন্ রত্নবন্ !
বজ্রার কন্-কন্—চাহ্-চাহ্ পদ্মপদ্ম !



আলো ও ভাসা

শিল্পী—প্রিয়োৎপন্ন শিল্প

শিল্পক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার এম,এ মহাশয়ের দ্বারা



১৩শ বর্ষ,

কার্তিক, ১৩৩০

৭ম সংখ্যা

দেবী দুর্গা

(ঐশ্বর্যচরণ বিভাভূষণ)

দুর্গাপূজা শারদীয়া পূজা। পরম বসিতে এখন
আমরা বৃষি—ভাঙ্ক-আধিন, পূর্ণে ব্রাহ্মইত আধিন-
কার্তিক; তাই শারদীয়া পূজা ভাগে হয় না।
আধিন-কার্তিকেই হয়। এটা পূব বড় পূজা।
এত বড় পূজা বঙ্গলায় আর নাই—ভারতেও নাই।
এই জন্যই এই পূজার নাম মহাপূজা। এই মহা-
পূজা বঙ্গলায় বৈশিষ্ট্য।

এ পূজার প্রবর্তন করিয়া তে, তা' গ্রিক জাতি
যায় না। প্রথম দুর্গাপূজা সম্বন্ধে হু'একখানি
পুরাণে একটু আছে বর পাওয়া যায়। শারদীয়া
পূজাকে লোকে বলে অকাল পূজা। অকালে পূজা
বলিয়া এই পূজার বেশী আয়ত। তাতে আবার
এটা নাকি রামচন্দ্রের পূজা। পুরাণ কিছ তাহা
জানিতে চায় না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ জেতার আগেও
প্রমাণ দেখাইয়াছেন। এই পুরাণের মতে,
দ্বারোভিষ সম্বন্ধে দুই ১৫৫ ও সমাধি বৈষ্ণব পরেও
দুর্গাপূজাচার্য্যেরা বিভিন্ন কল সাইয়াছিলেন। দেবী-
তাপসবত আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন, ভারতে
প্রথম রাজা নগপ্রথম দেবীর পূজা করেন। এ
সব সে কালের আখ্যান। একালে এ পূজার

প্রাণে কে তা' এখনও জানিতে পারা যায় নাই।
একালের দুর্গাপূজার একটা পাপুয়ে প্রমাণ আছে।
দুর্গা পূজার শতকের প্রথমপাঠে রাজা বজ্রবর্ধন
বর্তমান ছিলেন। ইহার তাম্রলিপ্যে উল্লেখ আছে
যে, তিনি মইতুহা দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।
বর্তমানবেশে শ্রী ১৫৫-বর্ষের নাম সঙ্গলই জানে।
তিপিন্ধর ইহার একখানি গ্রন্থ। ইহাতে
অনেক তথ্য আছে, দুর্গোৎসব তথ্য আছে; কারেই
প্রবন্ধের সময়ে যে দুর্গোৎসব হইত, তাহাতে
আর সন্দেহ হইতে পারে না। তাহা না হইলে এ
পূজার বিধি-ব্যবস্থা কেন? আকার বাবুদ্বয়
আমলে এই পূজার সূত্রের সংবাদ পাওয়া যায়।
প্রবন্ধ দুর্গাচরণ সত্যলি মহাপর বঙ্গলায় এই
সংবাদী প্রথম প্রচার করেন। আকবরের
চোপদার রাজা কংনোজায় বঙ্গলায় বেগমান
হইয়াছিলেন। ইহার শিতার নাম বিখ্যাত দীপ-
কার সুস্কৃতটী, শিতারের নাম উদয়নারায়ণ—রাজা
গণেশের জামক। ইনি এক মহাবল্ল করিতে ইচ্ছা
করেন। কাছেরকপুত্রে মটোচোপদার বণোহুতবে
তাহিরপুর রাজারের পুরোহিত। তাহাণের মধ্যে

হয়েন শাস্ত্রী বাঙালী-বেঙ্গিরের সঙ্গেরে চেয়ে বড়
লাগত ছিলেন। তিনি বলিলেন—মহাশয় চারিটা
—বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, অধ্যাপক ও শ্রোতা। একালে
এ সব যজ্ঞের অঙ্গুষ্ঠান অসম্ভব। তিনি তাঁহাকে
দুর্গাবন্দন করিবার বাধ্যতা ও অবশেষ বেন। আট
নয় লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া সংসারতোকে এই
দুর্গাবন্দনের অঙ্গুষ্ঠান হয়। হবেন শাস্ত্রী দুর্গাবন্দন-
পদ্ধতি লেখেন। এই পুস্তকটিতে যেখান অধ্যাপনার
নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পূজা করেন। এ পূজা
হইল বাসন্তী পূজা। তাহপর সীতোড়ের রাজা ও
আরও অনেক লোক দুর্গাবন্দন প্রচলিত করেন।
সেই পূজা আজও চলিয়া আসিতেছে।

দুর্গাপূজা আধারের বেশে চলিতেছে। প্রতিমা
পূজা পূজা হয়। বাঙালীর বাহিরের কোন কোন
যেণে শুদ্ধ নবপদ্ধিকার পূজা হয়। নেপালে নবপদ্ধিকার
পূজা হয়। কলি, বাক্যিক, খাঙ্গ, হরিদ্রা, বান,
কচু, বিখ, অশোক ও গজগী—এই নবী সপ্তের
পাতা এক লক্ষে করিয়া ভাণ্ডার উপর পূজা করা
হয়। কোন প্রতিমা থাকে না।

যেই দুর্গাকে লইয়া, দুর্গাতত্ত্ব উপলক্ষ্য করিয়া
অনেকে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। যেই দুর্গা
কোথা হইতে আসিলেন, তিনি বৈদিক দেবতা
কি না, এত সত্য প্রমাণ নাই। পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু
কিছু আলোচনাও হইয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্স
মুলার লিখিলেন, দুর্গা বৈদিক দেবতা নন। তিনি
মত বিলেন, অনাবাস্যের দেবতা দুর্গা আর্বের
দেবতা বলিয়া হিন্দুতোকে চলিয়া যান। এই মত
প্রচলিত হইবার পর হইতেই আধারের যেণের
কয়েকজন পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কতকগুলি নবীর
বাহির করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, পূর্বে
আর্বদেবতার পতীর মধ্যে দুর্গাদেবীর স্থান ছিল
না। তাঁহারা যের কয়েক বলিয়া দিয়াছেন, দুর্গা-
যেই বৈদিক দেবতা নন।

আমরা এই দেবীর আলোচনায় সত্যে একটু
আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

অধার (২য় মতন, ২৭৭ পৃষ্ঠা, ২৭ পৃষ্ঠা)
উপবেশ করিতেছেন—

ও বিদ্যা চক্রে বরণো কৃতানাম বর্তমানবে।

বক্ষত লিভরং তনায়।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বৃষ্টিতে
পাতা যায় যে, বক্ষ বক্ষ করিয়াছিলেন। বৈদিক
কুণ্ডে বক্ষার্থে বা কুণ্ডের নাম যে “বক্ষ-তনয়া”
ছিল, এইটী বোধ হয় তাহা। একটী কারণ। বক্ষ-
বেদিতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অধার বক্ষ-তনয়া
অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া গোকে
বৈদিককুণ্ডের শেষ দিকে বারুণা করিয়া লইল, যেই
দুর্গার প্রতি বক্ষার্থে। অধার অগ্নি যতীত আর
কেহ নন। কেন না, “কল্প” পক্ষে অগ্নি ও মহাবৈদ্য
উভয়ই বুঝাইত। তা’ ছাড়া পতন্যত্রাণে অগ্নির
দৌর্যাদিক আধারিকার যে অষ্টধর্মী নাম—কল্প,
বর্জ, লগ্ন-পতি, উগ্র, অগ্নি, ভব, মহাবৈদ্য, শ্যাম
লাগরা বার, নিবের সহিত বক্ষ-কল্পা পতীর বিাহ
হইয়াছিল, সেই আধারিকার মূলে এই বৈদিক
বাস্যার। অগ্নির সহিত যেই অজ্ঞেয়া বন্ধনে
আছে, এইটুকু বুঝাইবার জন্য বোধ হয়, পূজার
নিব-দুর্গার বিবাহ গোপার।

যেই কল্পে দুর্গাকে পরিণত হইল। এ
সময়ে বিচার করিতে হইলে আধারিকার আলোচন
জগতের একটী বীনা বক্ষণ করিতে হইবে।
আলোচন সাংকেত এমন একদিন আলিয়াছিল, বক্ষণ
করিয়া অগ্নি প্রাণিত না রাখিয়া তাহা বিবাহিয়াই
রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আধারনার
লগ্ন কোন্‌ই অঙ্গুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা
সকলে যেই বক্ষণ করিতেন। ইহার অধ্যাপক বক্ষণ
অধারের বাণী উক্ত করা বাইতে পারে। অধার
(১১০৬১০) উপবেশ করিতেছেন—

“যোগ্যতমোবধিতঃ বারুণ্য ক্রিতিঃ পর্বতায়,—

“অধার যোগ্যতমতী সপূর্ণবক্ষণা বর্ণগ্রগারিণী
যেই প্রভুত করিয়াছিলেন।”

কবিরা এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া পতীর দাননিদ্রার থাকিতেন। তারপর আবার বখন বেদের পতি কিরিতা গেল, তখন দীপালোক অগ্নির নিকট হইয়া প্রকৃতি মানের বরকার হইল। কবিরা কিন্তু পুনরাব অগ্নি প্রজালিত না করিয়া কুণ্ডের উপর—অর্থাৎ ‘বক্ষকভা’র উপর পৌতবর্ষের সূর্য দ্বাপন করিতেন। এই সূর্যকে গীতারাজ অগ্নি বলিয়া কুজিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে ‘বাব্যাবহী’ বলিতেন। কবেবেও তাই (১০।১৮৮:৩) উল্লিখিত হইয়াছে—‘বাকচো ঞ্জ-কেশো দেবজা বাবাংবহী। তান্তিরো বজ্জ-মিষদূঃ’ অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবতার নিকট কল বহন করিয়া কইয়া দাঁড়িতে পারিতেন। এই সূর্যই আমাদের দুর্গা। কুণ্ডের মন বিষ্ণু দুর্গার মন হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটা দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইঁহাদের একজন খোঁজা কুণ্ডেও ঢকা করিয়া থাকেন, একজন বজ্জের সূচনা করিয়া দিয়া থাকেন, গীতারাজ চারি হাত। একটা বৌ বজ্জানবাজী, আর একজন বজ্জের গজ অর্থাৎ দেব লাংবা করিয়া থাকেন। দুর্গার সঙ্গে আরও কয়েকটা ছোট দেবতা থাকার নিয়মগণ্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ব ধরণ। সূর্যমান বেরজান হইতেছেন সত্বঃ)। বজ্জাশুষ্ঠানের চত্রে যে অর্ধের প্রয়োজন: বাগাই বজ্জ)। খোঁজা কালিকের বজ্জ ঢকা করিতেন—আর গণেশ বজ্জের সূচনা করিয়া যেন, তাই তাঁর চার হাত। বৈদিক বজ্জের হোতা, অধিব্, পুরোহিত ও বহুমান, এই চারি হাত। দুর্গার পক্ষেও এগুলি ঠিক খাটে। এ ছাড়া আদ্যা পাই—

[যি পাকলা পূর্ণা পোত্তচানো বাবব বিণো
ককসো অদীয়াঃ। ৩।১৪।১]

‘তুহি বিতীর্ণ তেভোদ্বারা অত্যন্ত দীপ্তমান তুমি শক্ত
দগকে এবং হোমসংহিতা কামসংহিতাকে বিনাশ করা।’

আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদিক যন্ত্রে অগ্নিসেবতার নিচট অল্পরূপকে বহু করা হইতেছে।

দুর্গাই যে বৈদিক অগ্নি, তাহার আর একটা প্রমাণ এই—

দুর্গা দেবীর অর্জুনাকালে আমরা লক্ষ্যবের এই মন্ত উচ্চারণ করি,—

‘ও অর আভাতি বোতরে পুণানো ঙ্গাবান্তরে
নি হোতা সৎগি বরিদি।’

বৈদিক যন্ত্রের সেবত্রেণে দেখিতে পাওয়া যায়, ‘বক্ষ-কভা’ ক্রমশ: ‘উবা’তে পরিণত হইলেন, ‘উবা’ ‘অবিকা’র, এবং ‘অবিকা’ ‘দুর্গা’র পরিণত হইলেন। এ সময় আর তিনি বজ্জবেদি রহিলেন না; বজ্জবেদি ও অগ্নির সম্মিলিত শক্তি স্রোতবৎসরূপে পুণিত হইতে লাগিলেন।

শক্ত বজ্জবেদি (তাৎ) [বজ্জমনৌ সৎহিতা] বসিতহেন—হে শক্ত, এই তোমার বেঁটাগ তুমি তোমার তপিনী অবিকার সহিত আধাবন কর—‘এব তে কস্তাগঃ বজ্জা অবিকারা বঃ সুমব বাগা।’ ঐতিহ্যের আরণ্যকে আমরা দুর্গা, মহাশিব, কালিক, গণেশ, লক্ষ্মীকে এক সঙ্গে পাইয়াছি। এই সময় কস্ত ও মহাবেশ অভিন্ন হইয়াছেন। উমা, অবিকা ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাবেশ কস্ত তখন উবাগতি, অবিকাগতি। তখন উমা বা অবিকা বজ্জবেদের তপিনী মন। আমরা ঐতিহ্যের আরণ্যকের উল্লি-
খিত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া,ম,—

১। পুণ্ডর বিদ্র মাত্রাকস্ত দীমহি। তত্রো কস্ত
প্রচোবৎ। তৎপুণ্ডর্যঃ শিষ্টঃ মাত্রোবঃ দীমহি।
তত্রো কস্তঃ প্রচোবৎ। তৎপুণ্ডর্যঃ বিদ্রঃ বজ্জ-
ভুগায় দীমহি। তত্রো দ্বিষ্টঃ প্রচোবৎ। তৎপুণ্ডর্যঃ
বিদ্রঃ চক্ৰভুগায় দীমহি। [১০ম অধ্যায়ঃ। ১ম
অধ্যায়ঃ। ৪] তত্রো দ্বিষ্টঃ প্রচোবৎ। তৎপুণ্ডর্যঃ
মহাপেনার দীমহি। তত্রো বজ্জঃ প্রচোবৎ।
[১০।১৪ঃ]

২। কাত্যাবন্যর বিশুদ্ধে কতকুমারী বীমহি ।
তয়ো হর্ষিঃ প্রোচোষমাং । ৩ [১০।১৭] [সারন
ইহার তাৎপা বলিষ্ঠাছেন, যেহে নিমক্যার হইয়া
থাকে । তাই 'হর্ষী' কৃত্যাইতে 'হর্ষি'র প্রোষণ হই-
রাছে । 'হর্ষিঃ হর্ষনিকারিবাচঃ' দর্শক ভাষ্যমো
উচ্যতে ।*]

ক। নমো বিষ্ণুনাথঃ বিষ্ণুনাথঃ বিষ্ণুনা-
থঃ বিষ্ণুনাথঃ বিষ্ণুনাথঃ উদ্যতঃ নমো
নমঃ । ১০।১৮ ।

বৃহৎসংহতা বৈদিক বেদান্তর ব্যাখ্যায় । ইহাতে
(২৭৮, ৭৯) আবার বেদান্তে 'শ্রী, অশ্রিত, বাক্,
সরস্বতী' এবং 'হর্ষী' অস্তিত্ব । আবার যে 'হর্ষী'র পূজা
করিয়া বাক্, ঐশ্বর্য বানন সিংহ । দেবী বাক্
মিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং বেদান্তর বিশেষ
সাধাণ্যনার ঐশ্বর্যের নিকট গমন করেন । এই
বাক্ ও সিংহ যে অস্তিত্ব, পাঠে † তাহার প্রমাণ
আছে । বাক্ এবং 'হর্ষী' যে অস্তিত্ব, বৃহৎসংহতা তাহার
প্রমাণ । আবার বহুটুকু পাইয়া, তাহা হইতে
হর্ষীর সঠিত সিংহের সাদৃশ্যের একটা কারণ বিহিত
করা হইতে পারে । অধিবান ব্রাহ্মণে (৩।১২)
ব্রাহ্মবাক্ ব্রাহ্মণে নির্দেশ আছে । পূজাফলে
ব্রাহ্মবাক্ কল্যাণের পূজা করিতে হয় । দেবী
বাক্ ও কল্যাণি মূলতঃ এক হইলেও ভগবতঃ
বিভিন্ন । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৩।১০) উল্লেখ
আছে যে, ইহার কারণ তখন সম্পূর্ণ অস্তিত্ব । ব্রাহ্ম-
বাক্ ইহাকে কল্যাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।
কবেসের বিলম্বিত (২৫) ব্রাহ্মবাক্ হর্ষী নামে
অভিহিত করা হইয়াছে, আর এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মী
তৈত্তিরীয় আত্মপাঠে (১০।১) বান পাইয়াছে । এই

আত্মপাঠে তিনি ব্রাহ্মবান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া-
ছেন । সূত্রান্ত বেদা হইতেছে যে, হর্ষী, ব্রাহ্মবান
ও অত্র এই তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । হর্ষী
ও অত্র, অত্রই ব্রাহ্ম হর্ষীকে বিজ্ঞানাদিনী বলা
হইয়াছে । এই বিজ্ঞা সাতনি । তাহাযের নাম
কানো, কনালী, মনোব্রহ্ম, স্ত্রোত্রব্রহ্ম, ব্রহ্মব্রহ্ম,
সুনিব্রহ্ম এবং তৈত্তিরীয় । এই সাতবিজ্ঞা একট
করিয়া যে হর্ষী বলিষ্ঠা করেন, পুষ্কলংগে (১।১
১৪) তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন । †

বৈদিক যুগে অনেকগুলি দেবতার পূজা
হইত । সেই বেদান্তগুলি বৈদিক যুগের শেষ
কিছু হর্ষী নামে প্রচলিত ও পুণিত হয় । পূর্বে
উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মবানবী সাততার
অবিতা কল্যাণিনী । তৈত্তিরীয় আত্মপাঠে
(১০।১৮) হর্ষী কল্যাণী । এই আত্মপাঠে (১০।১)
আবার হর্ষীদেবীর আরাধনা আছে । সেইখানে
তিনি বৈষ্ণোভো । বিরোচন হর্ষী বা অত্রির নাম ।
অত্র (১০।১৭) বেদান্তে অত্রিক সৎবাচন করা
হইয়াছে, সেখানে হর্ষীর (হর্ষির) আরও দুইটা নাম
আছে—একটা কাত্যাবনী, অপরটা কতকুমারী ।
কেনোপনিষদে (৩।২৫) পাওয়া যায়, ব্রহ্মজা দেবী
ব্রহ্মবানের কল্যাণ উগা । তৈত্তিরীয় আত্মপাঠে (১০।
১৮) কত্রকে 'বাণতি বলা হইয়াছে । এই
আত্মপাঠে (১০।২৫।৩০) সরস্বতীকে বরা, বরাবো
সদ্যাবিতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে । পরে
আবার এগুলিকে হর্ষীদেবীর ভগবৎপ্রে প্রবৃত্ত
হইতে বেদা বাহ ।

বৈদিক যুগ হইতে পরযুগের সাহিত্য আলোচনা
করিয়া জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে হর্ষী-
দেবীর আরও দুইটা নামারূপ-ব্রহ্মবানত্ব যুগে ইহা
সম্পূর্ণ হয় । ব্রহ্মবানত্ব হর্ষীত্ব আলোচনা করিবার
ইচ্ছা হইল ।

* ব্যাখ্যায়োপনিষৎ ইহার প্রতিপত্তি করিয়াছে—
"কাত্যাবন্যাতঃ বিশুদ্ধে কতকুমারী বীমহি তয়ো হর্ষী
প্রোচোষমাং ।"

† Shakti and Shakia by Sir John Woodroffe

সে

(শ্রীকৃষ্ণানির্ঘাণ বন্দোপাখ্যায়)

সেগে যনের চোখে দেখে না কালি নুনের ঢে
এই পঙ্খ-ভোলাকে লাগল করে' তুলিয়েছে ?
ওই 'লঙ্কা-ভায়া' চেনে গো তার 'লঙ্কা-ব'ন'র 'ল' হুট—
থরে কাপা হাওয়া পালায় চুনের মূল সৃষ্টি ।

আলি তার বিরহের বেদনা বাজে এই বুকে,
খরি, তারই অপর-সুতার জুগল মোর বুকে ;
হুটি কালো আঁখির কটাক্ষে সে পূর্ণিমাতে হুগিরেছে,
খাটে মল তারিতে দো-ধনুনা জলিয়েছে ।

সে যে চান্দ্রো-পাশে একুশা খেঁচায় পেঁচিয়েছে,
আলি, তার হুটী বায় হাট-নরিয়ায় খেরিয়েছে ;—
সোনে গায়েগীতে হুহ বৈধেছে হুর্জনাথ,
সীতে তাল দিতে তার নীল চেউএয়া লম্বা পায় ।

সে যে চির-কনোর কালু-কোনা পটু-বৈ,
হুগে সাজিয়াছে বোঁর মধু-রাতের মূল-কানো ;
ও সে সোলাপ-ময়ী কোন্ 'খোয়া' রত-পদরা ঘেঘ ডালি,
থরে অগ্নীরা তার নিশনে ঝট-কালি ।

ওই অলক-ছোঁয়া পলক-হারি নানাতে
বিঠে চাউনি-বেলা কোঁতু-কোঁনীল কাঁধনাতে,—
কোন্ সোনালি মেসুমিনেরি মেসুমি-কেশর উন্নতি'
হালে গোয়েচনা-গোয়ী মনের উর্জনা ।

এল বরষ-বেলা গুজরাটার চন্দনে,
খাটে মালি 'শিশু' দৌবনেরি নন্দনে,
আগে মোংখা-মধুর উলুখনি বহু-লবনের আঁখ-হায়ে,
তানি অখ-লোকে নুপুর বাজে তার পায়ে ।

আলি পঙ্খ আলি কায়ানি তার সে যঃ-বৈধিতে,
খোটো বর্ণ-ভাতি তার ঐশ্বরের ভরিতে ;

কীৰ্ণে এক-দুগের পদ্ম-কাটা টোট হ'লানি বহুধরি'
সে খে চুপ'লগ হে গজপুংগে কর করি'।

এস মো মোর লাগত-মধ্যা জুয়তা
চাপো বাহেক ভাবন-পনের চুপ হুতা,
অবদ-নাগের বিধেও জালা বুকের মাংসে তরিহেহে
অড়ের পাঁচটা বেণু-কুড়িমের অরিহেহে'।

আমার ডাক্তারী

(রাধা শ্রীঅলম্বর সেন বাগার)

(১)

ভূনহিলাস, কোন রকমে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারলেই 'পাশ'—একেবারে কার্টে জিকিলেন। কথটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্যা—নিষা করা বাসের যতাব, তাড়াই এ কথা বলে থাক। নইলে আমি, শ্রীঅলম্বর সেন, কয়েকের ছেলে; আমি, এক-বার নয়, দুইবার নয়, তিন-তিনবার এই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে 'কেল' হব কেন? সব্বতী কিছুতেই তাঁর বড় কারখানার আদাকে প্রবেশ করতে দেবেন না, কিছু হয়েছিলেন।

বাসের বাপ-মা আছেন, তেমন ছেলেও যদি আমার বড় এমন করে তিনবার প্রবেশিকার কেল হয়, তা হ'লে তারও স্থান গৃহে হয় না। আমি ত পিতৃমাতৃদ্বীন, মামা-বাবীর অমীম অসুগ্রহে তাঁদের অহংকাস করি। তাঁরা যে বৈধা বারন করে তিন-তিনবার আমাকে পরীক্ষা দিতে দিয়েছিলেন, এ দুটাত সহজে মিলে না।

লোকে বলে, বার বার তিনবার, আদিত ত তিনবারই বেখলাব; সুতরাং এখন সব্বতীর কুয়ায় হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। এই ১২ বৎসর বাতুলের অহংকাস করিয়াছি; এখন আর সে সুকর্ণ করিতে হন সয়িল না। 'পাশ'ই না হয়

করিতে পারিলাম না, কিন্তু তার লকে লকে যে চকু মজা হাড়াইতে হইবে, এমন ত কোন কথা নাই। সুতরাং বির করিলাম, মামা-বাবীকে না মান-ইহা পলায়ন করিতে চাইবে। বির করিলেই ত হয় না, অনেক ভাবিতে হয়। প্রথম ভাবনা, বাই কোথায়? আখীর কুইক যে কোথায় কেহ আছেন, তাহা জানি না; আর, জানা থাকিলেও সে সব স্থানে বাই কি বলিরা। স্তনিয়াছি, কলিকাতায় গেলে না কি চাকুরী মিলে; সেখানে অনেক আকিল আছে; সে সব আকিলে আমার বড় বিজ্ঞ। লোকের দ্ব পদ্যা উপাধ্বনের বাধা নাই। বেশ, কলিকাতাতেই বাই, এং সেখানে আমার মামা বাবীর গ্রাণের কয়েকটি ছেলে কলেজে পড়ে, তাহাদেরই বাসায় উঠিরা এই চারি দিন ভেটা করিলেই এসটা না হয় একটা চাকুরী কুট্রিাই বাইবে; আবার সে বহুতা কয়েক দিন আমার বাপ-খরচ যোগাইতে কাতর হইবেন না।

একটার ব্যর্থতা হইল; কিন্তু কলিকাতা বাইতে হইলে যে পথ খরচের প্রয়োজন, তাহার কি ব্যবস্থা হইবে? আমার হাতে একটা পরপাত নাই; মামা বাবা স্তনিয়া প্রতিপাতন করিবাছেন, ইহাই যথেষ্ট। তিনি যে আরাধে মাপে মাপে বা সন্তো মণে

লব্ধই বসন্ত বসিছে কিছু কিছু দিনে, নিত্য
বাঁহুল না হইলে -ও আশা কেহই করিতে পারে
না। এক পথ আছে, যাঁহার বাহ্য ভাবিয়া বাহ্য
পাওয়া যায় তাহাই সম্বন্ধ করিয়া পলায়ন; কিন্তু,
হিঃ! যেবে কি চূরি করিতে হইবে? না,
অন্য কণ্ঠ আমার গাথা হইবে না; তিন বার
ম্যাটিক কেস করিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া
চূরি করিতে পারি না।

Never mind.—তলিকাটা আর কতই বা
বুঝ—বোল জোন পথ এই ত নয়—হাটাইয়া দাও;
উলি পলায়ন বলা, পুরো বোল মুখ, সবল; এই
বোল জোন পথ আর হাটতে পারি না? বুঝ
পারিব! ভোরে বাতী হইতে বাহির হইলে
নাগাধ সন্ধ্যা, বড় বেনো বহু ত রাত্রি আটটার মধ্যে
কলিকাতার পৌড়িতেই পারিব। পূর্বে
নয়ও নাই যে, পালের পথ দিতে হইবে। আহা
—থোৎ, একবেলা আর উপাশ দিতে পারিব না?

তবে হঠাৎ বাতী হইবে না; কলিকাতার
বন্ধুরা আছেন, তাঁহাদের একটু আগে সাধাব
যেওয়া কর্তব্য। তখন হানোর নিকট হইতে একটি
পয়সা চাওয়া লইয়া একখানি পোটকাওঁ কিনিয়া
আমার বন্ধু মথুরা বন্ধিককে লিখিলাম, বৃন্দার
সন্ধ্যার সময় আমি তাঁহাদের মেলে অভিবাদন হইব।

তাঁহাদের পর আর কি? সত্যতাই বৃন্দার
অন্তরে বাক্য কথো সন্ধ্যা পাতটার সমস্ত আমি
ঐকান্ত্যপূর্ণ দিচ্ছি বত্ৰি মাইল পথ পথের
অভিভাব করিয়া বন্ধুপনের মুক্তি দীর্ঘতর মেলে
উপস্থিত হইলাম। বন্ধুগণ আমার প্রাণ বিবরণ
তিনি অর্থাৎ। অনাহারে, পথে একটুও বিশ্রাম
না করিয়া তের ঘণ্টার বত্ৰি মাইল পথ পথের
অভিভাব করা—হী, বীরের উপস্থিতি বটে।

(২)

বন্ধুদের বাসায় গাই, প্রতিদিন সন্তক-অসন্তক
হাসে চাকুরীর ইন্দোবাসীতে কিং, কেহ সমস্ত

বিদায় করিয়া যেন, কেহ বা নির্দোষে ভাড়াইয়া
যেন। এমনই করিয়া প্রায় একমাস কাটাইলাম
—চাকরী আর হয় না, এতদেব এমন কথিয়া
বন্ধুপনের বন্ধুগণ হইয়াই বা আর সত্যনি থাকি?
মেদের মেলেই সকলেই আমাকে ভাল বাসিতেন,
কেহ কেহ আমার জন্ত চেষ্টাও করিতেন; কিন্তু
কাহারও কোন চেষ্টা কখনও হইল না।

পথে, একদিন মেদের সঙ্গে একটা কথি
করিলেন। নরেশ্বরী দেউকল মনের একন
বার্ষিক জ্যেষ্ঠে পড়িতেন। তাঁহার বাতী বুঝাও;
তাঁহার আশাও ভাল; যেই কথিয়াও না পারিতেন
অর্থাত্‌ই নাই। তাঁহার পিতা মরণেই বা পারিতেন
পথলোকসত হইয়াছেন; তাঁহার বাতীতে নাও
একটা বিষয় বিধি আছেন। নরেশ্বরী দেউকল
মানেবার এক মুক্তি।

কথি আমাকে লইয়া। এতদিন চেষ্টা
করিয়াও যখন কোন সুবিধা করা যেন না, তখন
আমার সন্দেহ কি করা যায়, কথিও তাহাও
আলোচনা বিষয়। এক একজন এক এক বসন্ত প্রায়
করিতেন। যখনপথে নরেশ্বরী দেউকল "বেশ,
অনুগ্রহের সন্ধে আমি একটা প্রার্থনা করি।
যখনকি বিনে চাকুরী পাওয়া সম্ভব নহ। আমি
বলি, অনুগ্রহ গোমিওপালী ডাক্তার হোত।"

বন্ধু মথুরা বলিলেন "ডাক্তার গোল বন্ধুই
ত হোগো না, অন্ততঃ তিনটা বন্ধুর পড়িতে হইবে।"

নরেশ্বরী দেউকল "তিন বন্ধু! কি যে
চোবলা বলা। তিন বিনের মধ্যেই গোল আমি
ডাক্তার বাবু করে দিচ্ছি। একটা গোমিওপালী
ঔষধের বাজ, আর ইংরাজী বাসনা যান তার পাঁচ
বই—এস, আর কিছুই বন্ধুকার নেই—শিকা খেটু
সরকার, তা আমি দুই তিন দিনেই শেষ করে
যেব। তারপর আসছে সন্তাইই বড়বিনের বন্ধ।
আনি বাড়ী গাব। আমাদের গাঁয়ের জারিও
তিন জোনের মধ্যে ডাক্তার নেই গলেই হয়। শুক

নিধে গিয়ে আবারের গায়ে ডাকাতীতে লাগিয়ে
 দিয়ে আনুহ। আর দুটো বছর পরেই আমি একটা
 বড় ডাকার কি না; কানেই আমি যদি বেলে
 গিয়ে বলি যে, আমার এক শ্রুত অল্পবয়স্ক ছিলাম
 একজন বড় হোমিওপ্যাথি, তা হ'লে বেলেই ইতর
 ভয় পুড়াই সে কথা খেলে নেবে। ও আমার
 'বাড়ীতেই থাক'। খ'য়ল কিছু লাগবে না। আর
 চিকিৎসা—তার ভয় কোন ভাবনা নেই; ইপি-
 কাক্স, একোনাইট, পলিপেলি; এই রকম গুটি
 কারক ঔষধ নাম জানলেই যোগে। কেমন
 করে ডাকাতী করতে হবে, তা আমি হইবিনে
 জালিন করে দেব। তোমরা বেলে, তিনমাসের
 মধ্যে শ্রীমান অল্পবয়স্ক বেশ সব ক'রে পারবে।
 উপার্জনও বেশ হবে। আর একটা কথা জান কি,
 এই যে হোমিও ঔষধ; এতে উপকার হোক না
 হোক, অপকার হবেই না; স্ত্রীরায় বেশ নিরাপদ
 চিকিৎসা; ওষুধ দিতে রোগী যেরে ফেলেছে, এ কথা
 কেউ বলতে পারবে না। কেমন অল্পবয়স্ক, ডাকার
 হ'তে পারবে? আর, আমার কার্যেত্তর ছেলে,
 বুড়িতে কাকত চাইতে কম নই। বেলে ডোবরা,
 হাঙ্গল যেতে না যেতেই অল্পবয়স্ক কেমন শুদ্ধি
 নেবে। কি বলবে?"

আমি বলিলাম "আপনারা বা ক'রেন, তাই
 করব। কিন্তু, আমি টাকা কোথায় পাব?"

নরেশ বাবু বলিলেন, "সে ভাবনা তোমাকে
 ভাবতে হবে না; সে সব আমি ঠিক করে দেব।
 কত আর লাগবে; বই, ডব্লুপত্র আর লাগুনজা,
 এতে খুব বেশী লাগলেও একজন টাকার উপর
 খরচ হবে না। আমি তা তোমাকে দিচ্ছি; হান
 ব'ছিনে, ব্যার দিচ্ছি। যখন পলার জলে যাবে,
 তখন ইজা হ'ল আমার খরচ শোধ দিও, না হ'ল, না
 দিও।"

সকলেই এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলেন। এক সপ্তাহ
 পরেই ককিলের ছুটি হইল। আমি শ্রুত নরেশ:

বয়স সহিত হোমিওপ্যাথি ডাকার লাগিয়া
 একটা ভেবেই বাজ, কয়েকখানি বই, একটা বুক-
 পত্রিকাও হয় এবং ডাকার বাবু উপযুক্ত পোষাক
 পরিচ্ছদে সজ্জিত হইল। পূর্ণ-বয়সে বেলেগ্রে
 উপস্থিত হইলাম। নরেশ বাবু জুগায় সকলেই
 জিনিলেন যে, আমি একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎস-
 ক; বেলেগ্রে নরেশ বাবু পুণে থাকিয়াই
 চিকিৎসা কার্য করিব।

ছই তিন দিন ঘাইতে না ঘাইতেই আমি
 ডাক্তারী আশ্রয় করিয়া যিলাম। নরেশ বাবু
 প্রথম প্রথম আমার দলী হইতেন এবং ডাক্তারী
 আদর-কারবা শিখাইয়া দিতেন। শেষে তিনি
 কলিকাতার চলিয়া গেলেন; আমি ডাকার হইয়া
 বসিলাম।

(৩)

আমি এক বৎসর এই বেলেগ্রে ডাকাতী
 করিলাম; চিকিৎসা কেমন করিয়াছি তাগে
 প্রমাণ এই যে, এই সুবীৰ্ণ কালের মধ্যে আমার
 গাতে ছই তিন শত রোগী আগিয়াছিল, তাগার
 মধ্যে বশ পনয়মির বেশী দার। আর নাই; আর
 বাহা দার। গিয়াছে, বলিতে বেলে ভাঙ্গা দার
 দাখিলই হইয়া ছিল, তাহাদের বাঁচিবার কোনই
 সম্ভাবনা ছিল না। বেলেগ্রে ও নিকটবর্তী অনেক-
 জন গ্রামে আমার বেশ পণ্যর প্রতিপত্তিও হইয়া-
 ছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে কত উপার্জন
 করিয়াছিলাম, তাহা যদি নিজাসা করেন, তাহা
 হইলে একটা লষ্টক জ্ঞানবরু দিতে পারিব না,
 কিন্তু যেটাখুটি বলিতে পারি, নরেশ বাবু টাকা
 শোধ হইয়া দিবারে, ডাকবরে আর ছয় শত টাকা
 দিয়া হইয়াছে, তাগার কাপড়-চোপড় সাজ-সজ্জাতেও
 একটু বেশী রকমই খরচ করিয়াছে—পাক:রং
 একটু অ'বক দাকার খোল-শোখা দী না হইলে
 পণ্যর দনে না, এ উপদেশ নরেশ বাবু কাহেই

পাইচাছিলান, স্ত্রুতগাং, বলিতে গেলে রানার হাঙ্গেরি ছিলান।

কিন্তু, অতৃপ্তে কই আছে, কে তারা খজন করিবে? পুষ্কার সময় পাঁড়ারারে মাপলেনিবা একটু বেশী নাত্রাং বেগা বেগ; আমার তখন আমার নিজার সময় পধ্যন্ত থাকে না; হোমিওপ্যাথি ঔষধে সে সময় ভাল রক্ষা করা যায় না; তাই নরেশ বাবু নিকট হইতে তিন চারিটা এসোপ্যাথি ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া লইয়াছিলেন, ঔষধপত্রও কিছু আনাইয়া লইয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথি ঔষধ বলিয়া কুইনিন বিক্কার, কিসার বিক্কার হই হাতে চালাইতাম; কলও হইত, টাকও আদিত।

এই সময় একদিন একটা তিন বৎসরের ছেলের জ্বর হইল; শুধু জ্বর নয়, তার সঙ্গে বাবার অসহ্য ঘরগা। ছেলেটা এক ব্রাহ্মণ বিবহার একঘাতি সন্তান। আবারও চিকিৎসাপত্র-পত্র ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি প্রথম দিন হোমিওপ্যাথি কি একটা ঔষধ তিন দাগ দিলাম। জ্বর ত কমিলই না, মাঝার ঘরগা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন বাইরা বেঁধি, বাগক প্রমাণ বহিতেছে। আমি ত ডাকিয়া পাই না কি ঔষধ দিব। বাগক চৌৎকার করিতেছে, তাহার বা কঁপিতেছে। আমি বাইতেই থোকর বা আমার হাত লড়াইয়া ধরিয়া কঁপিতে কঁপিতে বলিলেন “বা !, বোনাই তোমার, আমার ছেলেটাকে বাঁচাও। আমার যে আর কেউ নাই। আমার স্বধাগর্জক তোমাকে দিব।”

আমি বলিলাম, “ভয় নাই বা। কষ্টের হইবেন না, তিন চারি দিনের মধ্যেই থোকাকে স্তব্ধ করিব। আগনি কিছু চিন্তা করিবেন না।” তাঁহাকে ত বলিলাম চিন্তা করিবেন না, আমি কিছু অক্লান্ত সবুয়ে-পড়িলাম। থোকা বিকারের আঁয়ের কেবল বলে “না ঐ শোন কত বাজনা বাজছে। শোন না।” আর কোন কথা নাই, রোগের ঘরগার কথা নাই; শুধু “ঐ শোন বাজনা বাজছে।”

আমি কি করিব, নরেশ বাবু এবার ব্যবস্থা-পত্র অনুসারে ঔষধ দিলাম, কিছুই হইল না। অত্র সব রোগী দেখা ত্যাগ করিলাম; আমার আগের মধ্যে যে কেমন করিতে লাগিল, তাহা কি বলিয়া প্রকাশ করিব। তিন দিন তিন রাত্রি থোকাকে লইয়া চলিলাম। শুধু বই বেঁধি, আর থোকর সুখের বিকে চাই, আর বা মনে আসে সেই ঔষধ দিই। আমার কি তখন প্রাণের ষ্টিক ছিল। আমার রোগী ক্রমাগত বাজনা শুনিতেছে, আর আমি তাহার শব্দগার্বে বলিয়া নর-হত্যার বিজ্ঞা-যিকা দেখিতেছি। এতদিন চিকিৎসা করিয়াছি, একদিনও যে কথা মনে হয় নাই, এই বাগকের মৃত্যুশব্দা পার্বে বলিয়া সেই কথাই মনে হইতেছে— আমি নরহতাকারী। কিছু আমি না, কিছু শিশি নাই, অবশ্য বাহুবেধ জীবন লইয়া এ কি বেগা করিতেছি। বাহ, বাহ, এ কি পাশে আমি লিখ্ত হইয়াছি।

বস্তীর বিন সন্ধ্যার সময় থোকর শব্দগার্বে ছুপ করিয়া বলিয়া আহি, প্রতি মুহূর্তে তাহার শব্দ নিঃশব্দের প্রতীকা করিতেছি। আর তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। থোকা নিঃশব্দে বিছানার পড়িয়া আছে, তাহার সম্মুখোপ হইয়াছে। হতভাগী হাতা একমাত্র পুত্রের সুখের বিকে চাহিয়া বলিয়া আছেন; তিনিও বৃত্তিতে পারিষায়েন, আর আপা নাই।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই প্রতিবেশী শিশুনিদের বাড়ীতে বাজনা বাজিয়া উঠিল, বা দ্বর্গার অভিধান হইতেছে। থোকর সেই সময় একবার আন-সন্ধ্যার হইল; সে আগুনপে চৌৎকার করিয়া বলিল “ঐ শোন বা, বাজনা বাজছে।” তাহার পরই সব শেষ; আমি তাহার সুখের বিকে আর চাহিতে পারিলাম না। আমারও মাঝার ত্রিতর জীবন যবে বাজনা বাজিয়া উঠিল; আমি শব্ধের হইয়া পড়িলাম, আত্মর সন্তুখে যবৎ উত্তোপিত দেখিলাম।

আমি আর দ্বিধা থাকিতে পারিলাম না, উদ্ভাওয়ের মত চৈতন্য করিয়া উঠিলাম “ঐ শোন বাবুনা বাবুদে!” পর মুহূর্ত্তেই আমি ছুটয়া বাহির হইলাম।

সেই যে সেই যতী রাত্রিতে একবার বেবগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি, আর সে গ্রামে বাই নাই, আর সে

নরহত্যার সজ্জা আরো বিবেক চাহি নাই; আর এমন কার্য করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু, এখনও যথোপযোজ্য পদ, যখন চারিদিকে অন্ধকার বনাইয়া আসে, তখন আমার মাথার মধ্যে কে যেন আত্মনাথ করিয়া উঠে “ঐ শোন বাবুনা বাবুদে!”

নবমীতে নবাবলি

(গল্প)

(প্রবীণনাথ শাল)

(১)

নিঃসঙ্গকার প্রান্তিকেশের সাত বৎসরের কথা মনোরমা ছায়ায় মত অশ্রুপন্যাস মধে মধে ফিরিত। তাৎকালিক নিজের গৃহে বসে বসে দেখিতে পাইত না। আশ্রয়ের সময় মাতা আশ্রয় তাৎকালিক বোর করিয়া প্রসিদ্ধ-কইয়া বাইতেন। কিন্তু কোন সময়ে আশ্রয় শেষ করিয়া সে উর্দ্ধ্বাসে ছুটয়া আবার অশ্রুপন্যাস লিখিত আশ্রয় হামির হইত। কোন দিন বৈশাখ কোন কারণে যদি তাহার ক্রিান্তে বিলম্ব হইত অশ্রুপন্যাস তাৎকালিক বাংলায় হাত দিত না, তাহার প্রতীকার নিঃশেষে বলিয়া থাকিত,—মনোরমা তাহার পাত হইতে দাছ তরকারি কাড়িয়া না বাইলে তাহার বাইয়া তুলিত হইত না, মনোরমারও পুথার শেষ নিউত না। এমনই তাহা বোঁকশী সুখী অশ্রুপন্যাস ও লগ্নমবর্ষী বালিকা মনোরমার মধ্যে গভীর স্নেহের লগ্নম স্থাপিত হইয়াছিল।

হুই বৎসর হইল “অশ্রুপন্যাস” বিবাহ হইয়াছে। তাহার বান্ধা গভীনাথ কলিকাতার মেসে থাকিয়া বিএ পড়িতেছিল। সেবার গ্রীষ্মের ছুটিটা শক্ত গৃহে অতিবাহিত করিবার সময় করিয়া, ছুটির পর দিনই সে শওরালয়ে আশ্রয় উপস্থিত হইল। মনোরমা ছুটিটা দিয়া তাহার হাত-চাপিয়া বলিতেই গভীনাথ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সুখচন্দন করিল।

তাহার কীধের উপর হুই সুখীয়া স্মৃতি গৃহে মনোরমা বলিয়া উঠিল, “বা! আপনি আরি হুই, অশ্রুপন্যাসে বলিয়া দেব কিছ।”

গভীনাথ বোর করিয়া তাহার সুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আর একটা হুই করিয়া করিল, “আমি বোকা যেতে ত, গভীনাথকে বুঝি এ কথা কেব বলিয়া দেব।”

মনোরমা তাহার কতি সুখখানি হামিতে করিয়া ছোট্ট একটা কিল দেখাইয়া করিল, “কর ও কথা বলিলে কিন্তু আর বাইতেন।”

গভীনাথও হাসিয়া করিল, “বখন হুই বোঁ গইয়া বর করিতে হইবে, তখন ছোট্ট বোঁয়ের কাছে ত আর বাইতেই হইবে।”

মনোরমা ত্রুহুিক করিয়া করিল, “আমি বুঝি আপনার বোঁ! ও কথা বলিলে কিন্তু আমি আপনার কাছে আর আসিব না।

গভীনাথ করিল, “আমি তোমার কাড়িয়া দিলে ত তুমি বাইবে। কেমন করিয়া বাইবে নাও দেখি।” এই বলিয়া সে আবার মনোরমাকে হুই করিল।

সে দিন রাত্রে মনোরমা জিহ বরিয়া বলিল, সে কিছুতেই বাকী বাইবে না, আনাই বাবুর কাছে থাকিবে।

গভীনাথ হাসিয়া করিল, “বল তুমি কখনো

বাইত না, বাইলে তোমার সতীন কিছু তোমার
বয়টিকে ঢেকেণ্ডে বেধবল করিয়া লইবে।”

মনোরমা তাহার দ্বিধা হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া-
ছিল। অল্পশযা ঘোমটার ভিতর হইতে
মনোরমার উপর সহাত চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া
চাপা পলাই করিল, “পেনে সতাই বেধবল হইয়া
বাইবি, বরকে—”

তাৎক্ষণিক কথা শেষ করিতে না বিধা মনোরমা
তাহার হাতে চিমটি কাটিয়া করিল, “বা, তুই তারি
হুই বিবি! আমাইবানু আমার বর বুঝি?”

শচীনখ পাড়ীঘোর ভাব করিয়া করিল,
“আজ্ঞা আমি তোমার বর নহ ত?”

মনোরমা মুখ বুজাইয়া করিল, “হু, বর বৈ
কি! আপনি ত বিবির বর।”

শচীনখ করিল, “বিবির বর ত! আজ্ঞা, তাহা
হইলে তোমার সহিত আমার আড়ি হইয়া পেল।
তোমার সহিত আর আমি কথার বলিব না,
তোমার বিবির বর তুই থাকিতেও পাইবে না।”

মনোরমা ছলছল চোখে নিঃশেষে ঝাড়াইয়া
ছিল। চম্বাইবানু তাহার সহিত আড়ি করিয়া
দিয়ে এ বর তাহাকে আর থাকিতে দিবে না।

অল্পশযা তাহাকে লম্বা কোলের কাছে
টানিয়া আনিয়া নীচু হইয়া তাহার গলতলা চোখের
দিকে চাখিয়া হাসিয়া করিল, “তুই ভাব করিয়া
কেলু না, বল না, আপনি আমার বর।”

মনোরমা চোখ দুর্জিৎ করিল, “আপনি আমার
বর।”

শচীনখ তাৎক্ষণিক জীর বাধবন্ধন হইতে মোর
করিয়া মুক্ত করিয়া কোলে তুলিয়া গেল। তারপর
মুখচুবন করিয়া করিল, “ভাব, ভাব, ভাব! ছোট
মোয়ের উপর কি আমি হাস করিতে পারি।”

মনোরমার চিঠি মুখবানি বজীর আনন্দে পরি-
পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমনইভাবে বখনও শচীনখকে বর বলিয়া

স্বীকার করিয়া, বখনও বা বর বলিতে অস্বীকার
করিয়া শচীনখের চুবন লাভ করিয়া তাহার
শিঠি চড়িয়া, শিঠামাতা বাড়ীঘর সমস্ত বিদ্যিত
হইয়া তাহার দ্বিধা গুহে মনোবহার নেতুটা হাস
হাসের মত উড়িয়া পেল।

তার পর শচীনখের বাড়ী কিরিবার বিন দ্বিধ
হইল। অল্পশযা ছুপি ছুপি মনোরমাকে করিল,
“তোমার বর যে কাল বাড়ী বাইতেছে।”

মনোরমা করিল, “ইন্, বাইলেই হইল, আমি
কিছুতেই বাইতে বিব না।”

অল্পশযা করিল, “আজ্ঞা বেবিব কেনন করিয়া
তুই আটকাইয়া রাখিস।”

মনোরমা সতাই শচীনখকে আটকাইয়া রাখিল।
বাজার নির্ধিষ্ট দিনটা সে এমন ভাবে তাৎক্ষণিক
অড়াইয়া রাখিল যে শেষে শচীনখকে পরামর স্বীকার
করিয়া, শুধু সে দিনটা নয়, আরও দুইটা দিন
থাকিতে হইল এবং অল্পশযাকে অনেক লাগামাবন
করিয়া পর-তৌ বাজার দিনটা মনোরমার নিকট হুটেতে
খোপন রাখিয়া শচীনখ দিন চই পরে লুকাইয়া
কলিকাতা কিরিল।

(২)

মাস তিনেক পরে মনোরমা বর্ষাকালের এক মেঘ
মুক্ত সন্ধ্যায় নিমেষে গৃহ হইতে ছুটিয়া অল্পশযার
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ঝাঁপাইতে ঝাঁপাইতে
করিল, “বিবি তোমরা নাকি চনিয়া বাইতেছ?”

দীর্ঘনিশ্বাস কেনিয়া অল্পশযা গাঢ়বরে করিল,
“হ্যা তাই মঙ্গু, আমার বাইতেছি।”

মনোরমার অন্তর সে কণী কিছুতেই সত্য বলিয়া
গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। সে কাঁদ-কাঁদ
হইয়া করিল, “কেন বাইতেছ বিবি! না, না,
তোমরা বাইয়ো না।”

অল্পশযা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া
আনিয়া করিল, “না বাইয়া যে আমাদেহ উপায়
নাই তাই, বাবাকে যে বলি করিয়া বিদ্যেছে।”

মনোরমা কিছু বুঝিল না, সে কাল-কাল করিয়া তাহার বিধির সুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কে বলিল করিল, কোথায় বলিল করিল, বলিল করিলেই যে ঘাইতে হইবে, এমন কি কথা থাকে, তাহার মধ্যেই মধ্যে তেমনই এই সব প্রশ্ন জাগ্রিতে লাগিল, কিন্তু সুখ কুটুবা সে কোন কথা মিজালা করিতে পারিল না, অজান্তে আশ্চর্য্য তাহার কতি বুঝানি হক হক করিতেছিল।

অনুপমা বাধা-ভরা কণ্ঠে কহিল, “তিন দিন পরেই আশ্বিনের এ জারমা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে মত্ৰ।”

মনোরমার দুই চোখ বিরা ভাঙার করিয়া জল করিয়া পড়িতে লাগিল। “অনুপমা চন্দ্রও শুধু হইল না।” বাসিক পরে মনোরমা ব্যঙ্গভক্তি কণ্ঠে কহিল, “জামিও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, অত্ৰু মিদি, তোমরা যেখানে যাইবে আমিও সেইখানে যাইব।”

অনুপমা চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, “তোমার বাপ মা তোকে ছাড়িয়া যাবে কেন তাই।”

মনোরমা প্রশ্নপথে তাহাকে অড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “তোমার পায়ে পড়ি অত্ৰু মিদি, আমার সঙ্গে লইয়া যাইয়ো।”

অনুপমা তখনকার মত তাহাকে সাধনা দিবার জন্ত সম্মুখে কহিল, “তোকে লইয়া যাইব।”

বেশিতে বেশিতে অনুপমারের বাহার বিন আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা তাহার হুইখানি কাপড় লম্বায়ে বুকের সঙ্গে চালিয়া বহিয়া অনুপমারের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার প্রভুসুখের দিকে চাহিয়া অনুপমা কাঠা ঘোষ করিতে পারিল না। সে উজ্জ্বল হইয়া কাঁথিয়া উঠিল। মনোরমা তখনও জ্বলে, তাহার অত্ৰু মিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া গিয়া যাইবে, তাহাকে এখানে ফেলিয়া যাইবে না! তাই সে তাহার বিধির কাঠা ঘোষিয়া অশ্রুতা বহিরা চুল করিয়া রহিল।

প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে অনুপমা চোখের জলে বুক ভালাইয়া জনক জননী সহিত গাড়ীতে গিয়া উঠিল। মনোরমা তাহার জননীর বাঘ বন্ধনের মধ্যে ঠট্ঠকট্ঠ করিতে করিতে আর্জবের চৌকর করিতে লাগিল, “অত্ৰু মিদি তোমার পায়ে পড়ি, আমার সঙ্গে লইয়া যাও, ফেলিয়া যাইয়ো না, আমি তোমার ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

অনুপমা সেদিকে চাহিতে পারিল না, অকল্যাতে চন্দ্র চাকিয়া কুঁচিয়া কুঁচিয়া কাঁথিতে লাগিল।

অনুপমা চলিয়া গেল, মনোরমা তাহার জননীর সহিত গৃহে ফিলিল। বাসিকতার চোখের জল করিয়া অবশেষে শুকাইয়া গেল, কিন্তু তাহার চোখের পাতা লগন হইয়াই রহিল। তাহার জ্বলে আশ্বিনের বেলা এখনই শুকতার তাহে যাঁ জ্বালাল, জননীর বন্ধ প্রকাণ্ডের পশ্চাৎ থাকে তাহার এতটুকু উপলব্ধ হইল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহার অত্ৰু মিদি নাই কেনম করিয়া সে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিবে। ১৮/৭ তাহার মনে পড়িল, অত্ৰু মিদি আবার কবে আসিবে, তাহা শু বলিয়া গেল না। সে জননীর পলা অড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল, “মা অত্ৰু মিদি আবার কবে আসিবে?”

জননী তাহাকে ভুলাইবার মত্ৰ কহিলেন, “দীর্ঘই আসিবে মা।”

মনোরমা বাস্তবাবে বলিয়া উঠিল, “কাল, না পরন্তু?”

জননী বুকের বাধা চালিয়া কহিলেন, “পরন্তু।” মনোরমা সেই পরন্তুর অপেক্ষার উন্মত্তা হইয়া রহিল। পরন্তু আসিল, কিন্তু অনুপমা ত আসিল না। ভোর বেলায় তাড়াহাড়ি শব্দা ভাগ করিয়া সে অনুপমার গৃহের দিকে ছুটিল। কিন্তু কচুয়ারের সম্মুখে পৌঁছাইয়া সে অসুখিয়া ঝাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল সেই গৃহখানি যেন হা করিয়া তাহাকে গিলিতে আসিতেছে। মত্ৰ সে চৌকর করিয়া কহিল, “অত্ৰু মিদি, ‘অত্ৰু মিদি’।” পূর গৃহ হইতে সে লম্ব করণভাবে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কতি বুঝানির উপর মতোরে আঁড়াইয়া পড়িল। সে ছুটিয়া নিম্নের গৃহে গিয়া এবেশ করিল। লগাখিন সে অনুপমার গৃহের দিকে তবে চাহিতে পারিল না—নিম্নের গৃহের কোণে লুকাইয়া রহিল। এখনই তাহা যেন দিন কয়েক কাটা গেল। মনোরমা অবে বুঝল, তাহার অত্ৰু মিদি আর আসিবে না; তাহার আশাইখানুহ সহিত আর তাহার বেধা হইবে না; আর কেহ তাহাকে আদর করিয়া ছোট বো বলিয়া ডাকিবে না, তাহাকে কোলে ভুঁিয়া দায়া চুম্ব যাইবে না। জননীকেও আর সে কোন প্রশ্ন করিল না। কেবল পূর নিরানন্দ মনে দিনগুলি কাটািয়া দিতে লাগিল। তাহার জ্বলের স্তরের উপর বাহিরের দিক দিহ

একটা স্তম্ভ আবেশন পড়িল ঘটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা বেবনা হঠাৎ গেল।

(৩)

বৎসর তিনেক পরে একবার দিন ছুইয়ের চক্ক শতীনাথ ও অল্পসময় সহিত ঠাণ্ডা মনোরমার দেখা হইল গেল।

শতীনাথ তাহাকে দেখিয়া চাণিয়া কহিল, “কি গো ছোট বো, এতদিন পরে বচনীকে মনে পড়িল?” তাহার উত্তরে মনোরমা লজ্জায় রাগা হইয়া হাসিয়া অস্ত্র নিকে সুখ কিরাইয়া লয়।

শতীনাথ তবু ছাড়িল না, মোহর করিয়া তাহার মুখখানি নিম্নের দিকে কিরাইয়া কহিল, “এখনই করিয়া কি সত্যের হাতে বচনীকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে হয়?”

মনোরমা মুখ মন্ত করিয়া মুগ্ধ হয়ে কহিল, “হান্।” বলিয়া ফেলিয়া ঠাণ্ডা তিন বৎসর পূর্বেকার সেই আকাঙ্ক্ষিত শান্তির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল এবং সেই শান্তির অলংকার সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রহিল।

কিন্তু শতীনাথ আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না, তবু হাসিয়া কহিল, “আজ রাত্রে সত্যনকে আভুলিয়া থাকিবে ত?”

মনোরমা অল্পসময় নিকে চাখিয়া একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

বিদায়কালে শতীনাথ কহিল, “আবার ছোট বোকে যদি কোর দেখন করিয়া লয়, তাহাকে কিছু সহজে ছাড়িব না, তাহা বলিয়া রাখিতেছি। তাহাকে তুমি পূর্ন হইতে সাংখান করিয়া দিও।”

মনোরমা আল আয় তাহাকে কিল দেখাইতে পারিল না, তাকাতাড়ি আরক্তিম মুখে তাহাকে প্রণাম করিয়া জননীর পিছন শিঁছন সাক্ষাতে গিয়া উঠিল।

মনোরমার স্বপ্ন পূর্ণ চতুর্দশ বৎসর, তখন অমূল্য চরণের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের বৎসর বেড়ে গতে মনোরমা স্বামীকে বুকের উপর বাধা রাখিয়া হাসিয়া কহিল, “আমার আর একটা বর আছে, সে কথা কিন্তু তোমার এত দিন বলি নাই।”

আর একটা বর? অমূল্য আশ্চর্য হইয়া পতীর হাতে, অঙ্গ মুখের গানে নিঃশব্দে চাখিয়া রহিল।

মনোরমা নকৌতুক স্বামীর মুখের দিকে চাখিয়া

কহিল, “হী করিয়া আমার মুখের দিকে বড় চাখিয়া থাক যে? সত্যি ছেলেবেলাকার একটা বর আমার আছে—তিনি কি বলিয়াছেন কান, —এতদ্ব্যক্কে সাংখান করিয়া দিতে যে, ‘তোমার দেখা পাইলে তিনি লহবে তোমার ছাড়িয়েন না, তুমি তাহার ছোট বোকে দেখন করিয়া লইয়াছ।’ এই বলিয়া সে অপর্যাগুতাবে হাসিতে লাগিল। হাসি খামিসে সে স্বামীর কাছে তাহার বাংলা কীরনের স্তম্ভ হইত। তাহা হইয়া পবিত্রের বলিয়া দেখ, বলিতে বলিতে তাহার চোখ চলল কহিয়া উঠিল।

অমূল্য পতীর মাথাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা পরের বোকা আমি এতদিন অব্যক্ত বহিয়া বেড়াইলাম; স্বামীর গোখা তাহাকে শোঁকাইয়া নিয়া বুঝি বা ভেদীনি বারিগ তাহাকে শোঁকাইতে হয়?”

মনোরমা কহিল, “এখনও ত তিনি নবী করেন নাই, কাজেই তুমি আপাতঃ নিশ্চিত। যদি বা অব্যক্ত কোন দিন তিনি তাহার এই ছোট বোকে দাবী করিতেই আসেন, তুমি তাহাকে মুখে অঙ্কন করিবে। মগী হইতে পারিলে, আমি তোমার গলায় বিষমখাল পাইয়া নিয়া বেড়াই একবার সাংখ্য হইয়া যাইব।”

অমূল্য হাসিয়া কহিল, “যদি আমার পরামর্শ হয়?”

মনোরমা কহিল, “তাঁহার মাথা তখন পড়া যাইবে।”

এমনই ভাবে বড় মুখে তাহাবের দাম্পত্য জীবনের আরও দুইটা বৎসর কাটিয়া গেল। তার পর সহসা নির্ঘণ বজ্র আকাশে আড় স্বঃের মৃণা করিয়া পতীর কানো মেঘ দেখা দিল।

তখন গম্ভীর বাগা বেগে অস্ত্র রক্ত চাক গ দেখা দিরাছে। বহু মনিরী মুখক বিপ্লবের নেপথ্য হাতিয়া উঠিয়াছে। অতিদিন সাংখানপত্রের অস্ত্র নৃতন নৃতন সঙ্কট ডাকাতের কথা, পিতৃদের জালিত ধারণা বুনের কথা, বোমা লাগার কথা, বড় বড় অকস্মে অতিব্রজ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। মনোরমার স্বামী অমূল্যচরণ ভর্তি লংঘেই বিপ্লব-বাদীদের হলে যোগদান করিল।

(৪)

এই ভাবে আরও মাস কয়েক অতিবাহিত হইয়া গেল। পুণ্ডার আর বেশী বিলম্ব নাই। গলে

যাণে আকাশে বাতাসে তাহার আভাস পাওয়া
হইতেছে। এমনই দিনে অমূল্যর উপর এক
কিছু কাকের ভাও পড়িল। একজন উড়ন যাতোনা
বিপ্লবযোদ্ধার তথাকথিত শিক্কে লক্ষ্য করিল। কিন্তু সে
এমনই সহজ যে, বিশেষ চোঁটা করিয়া আঁচ পৰ্য্যন্ত
বিপ্লব পক্ষীরা তাহাকে পরলোকের পথে পাঠাইতে
পারে নাই। এ বৎসর তাহার বাড়িতে পুণ্য।
তাই সেখানে পর্য্যটন হইয়াছে। শত্ৰুর
সম্মুখে শিরের স্তম্ভে তাহাকে নিধন করিতে
হইবে।

সেদিন গুপ্ত আঁজা হইতে কিরিয়া আসিয়া
অমূল্য ব্যস্ত কর্তে মনোহর্যাকে কহিল, “তোমাকে
কাল আশ্বাসের বেশে রাখিয়া আসিব। সেখানে
পিসিমা আছেন, তাঁহার কাছে তোমার কিছুদিন
থাকিতে হইবে।”

মনোহর্য বাশা কুল নহেন তাহার সুখের বিকে
চাহিয়া কহিল, “কাকি তোমার পায়ে কি অপরাধ
করিয়াছি যে তুমি আমার সমবাণ বিতে চাহিতেছ।
আমি তোমার ছাতিয়া কোথায় বাইতে পারিব না।”

অনেক কাতোকাটের পর শেষে স্থির হইল,
যদিও বিন অমূল্য মনোহর্যকে সহ্য্য গ্রাহ্যে যাত্রা
করিতে।

পক্ষীর বিন গভীর রাত্রে অমূল্য ও তাহার এক
সহচরীর মধ্যে কথাবার্তা হইতেছিল।

মনোহর্য তখন পানের ঘরে শয্যা উপর চোখ
দুঃখিয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা
কথা কানে বাইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল।

সহচরীটি অমূল্যকে বলিতেছিল, “এইবার ঘেবা
বাইবে শতীনাথ যাতোনা কত বড় হুড়িয়াছে, তোমার
কাঁধে স্তম্ভ হাত হইতে কি করিয়া পেরুকা
পার। নবমীতে নয়বলি, বা, বা, বা!”

দীর্ঘ ভবে মনোহর্যার লাগা বের কণ্টকিত
হইয়া উঠিল। শতীনাথ যে তাহার কানাই বাবুর
নাম, অল্পদিনের বাসীর নাম তাহার ঘেবে-
বোমার বহর্য নাম। সেই শতীনাথকেই কি
তাহার বানী হওয়া কথিতে বাইবে, এই কথাই
মনোহর্য সত্যে ভাবিতে লাগিল। শতীনাথ যে
কি বলে, কোথায় থাকে, তাহা মনোহর্য
জানেন না, তবুও তাহার নামের সহিত
হওয়া কথাটি গভীর থাকায় তাহার হৃৎকটা খাতিয়া
খাতিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। এক এক সময়

তাহার মনে হইতেছিল শতীনাথ কত লোক-
বই নাম হইতে পারে, এ শতীনাথ যাতোনা বহ
কত তাহার কানাই বাবু নহে। কিন্তু তাহার বানী
নয়ন্য করিবে? মাতুল বাড়িতে তাহার বৃদ্ধ
একটু বাতিবে না। তিনি কেমন করিয়া এতবড়
নিষ্ঠুরতা করিবেন? উঃ বলিয়া সে দুই
হাতে বৃদ্ধ চাপিয়া ধরিল। এমন সময় আর
একটা কথা তাহার কানে পেল, বলতপুঃ!
তাহাকে ঘেবানে বন্যাস বেওয়া হইতেছে, তাহারই
সদ্রংটে এই বলতপুঃ গ্রাব। সে বারবার মনে
মনে ঐ নামটি উচ্চারণ করিতে লাগিল। হঠাৎ বার
বৎসর পূর্ণকীর একটা স্মৃতি অতি কৌতুহলে
তাহার মনের মধ্যে আঁগিয়া উঠিল। বলতপুঃই
তাহার কল্পবির দত্তর বাড়ী। তাহার জন্মভূমি।
বহিয়া কে বন মনোহর্যের নানা বিদ্যা পেল। কিছু
কথা বার্তার পর অমূল্য মনে করিতে আসিয়া
বেবিল, মনোহর্য বাসিলে সুখ ভবিষ্য পড়িয়া
আছে। পুণ্যহইতেই মনে করিয়া অমূল্য নিশ্চেষ্টে
তাহার পানে মন কলিল।

হজীর বিন তাহাকে পক্ষীভাষনে পিসিমার নিকট
রাখিয়া অমূল্য যখন সে বান তাগ করিতে উঠত
হইল, মনোহর্য সহ্য্য অমূল্যর পায়ে উপর পড়িয়া
আঁঠুঘরে বলিয়া উঠিল, “ও কাল তুমি করিবে
না।”

অমূল্য হত হইয়া পাড়াইল। তবে কি
মনোহর্য তাহাৎ পেরিবকার কথাবার্তা শুনি-
য়াছে?

মনোহর্য তখনই তাৎবে তাহার দুই পা ছড়াইয়া
বহিয়া কখন গভীর কর্তে কহিল, “ও কাল আমি
তোমার কিছুতেই করিতে দিব না। আমার হস্ত্য
না করিয়া তুমি কোথায় বাইতে পারিবে না।”

অমূল্য মাং বিপণে পড়িয়া পেল। কেমন
করিয়া কি বলিয়া যে তাহার পক্ষীর হাত হইতে
মুক্তি লাভ করিবে? সে ত ইচ্ছা করিয়া ঐ নিষ্ঠুর
কাকের হাত লয় নাই, তাহার উপর সে তার
চাপাইয়া বেওয়া হইয়াছে। সে নিকপাশ—কি
করিবে সে!

মনোহর্যকে সে বহ প্রকারে মুগ্ধাইবার চেষ্টা
করিল, কিন্তু কিছুতেই যখন মনোহর্য তাহার পা
ছাড়িতে চাহিল না; তখন সে একরকম বোমার
করিয়া নিঃশেষে মুক্ত করিয়া দিয়া পানপের মত

ছুটয়া সে স্থান হইতে নিজস্ব চইয়া গেল।
মনোহরা যেহেতু উপর উপর হইয়া পড়িয়া রহিল।

(৪)

অষ্টমীর দিন শতীনাথের অতঃপর প্রাণঃ
দাঁড়াইয়া মনোহরা ডাকিল, “বহুবিধি।”

অল্পপনা বাগাঝার দাঁড়াইয়া কাতর গতিত
কথা বলিতেছিল, চমকিয়া কিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর
বিল, “কে দাঁ ?”

মনোহরা স্নান হারিণা করিল, “আমার চিনিতে
পারিলে না অল্প বিধি, আমি যে মন্ত, তোমার
সতীন।”

অল্পপনা ছুটয়া গিয়া তাহাকে যুকে অড়াইয়া
ধরিয়া কহিল, “মন্ত, মন্ত, তুই ? আমায় যে তোকে
কত খুঁজিছ। আঃ, এবারকার পুরা—আমাবোধ
সার্থক হইল।” এমন সময় একটা পাঁচ বৎসরের
বালক “মা মা” বলিতে বলিতে সেইবিকে ছুটয়া
আসিল। মনোহরা আশ্রয়তরে ছই হাত বাড়াইয়া
তাঁহাকে কোলে লইতে গেল, সে শব্দ হইয়া
দাঁড়াইল। অল্পপনা হাসিয়া কহিল, “আরে বোকা
ছেলে, ত যে তোার ছোট মা ; কোলে যা।”

তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেই মনোহরার
ছই বোঝে গলে ভরিয়া আসিল।

অল্পপনা মনোহরাকে তাহার নিজের ঘরে
লইয়া গিয়া এ কথা বৈ কথার পর আনৌর
চাকুরীর কথা উল্লেখই কর্ণনাথাস
কেনিয়া কহিল, “আমার দিনগুলো যে কি রকম
তবে ভরে কাটিতেছে, তাহা আর তোকে কি
বলিব তাই ? আমার সব সময় মনে হয়, এই
খুঁজি কে ভঁকে স্তলি করিয়া যারিয়া কেলিল।”

মনোহরা কোন রকমে জ্বরের বস্ত্রা চাপিয়া
কহিল, “আমাইবাথুকে বল অল্পবিধি, তিনি যেন
এখনই ও চাকুরী ছাড়িয়া যেন।”

অল্পপনা বিবর হাসি হাসিয়া কহিল, “কত
বলিয়াছি তাই, কিন্তু কোন কথাই তিনি কান
যেন না। হাসিয়া বলেন, যখন অস্মিয়াছি, তখন
একদিন মরিতেই হ’বে, বিলাপ ভর করিয়া লাভ
কি ?”

মনোহরা কি বলিতে বাইতেছিল, এমন সময়
—শতীনাথ, ‘ও গো’ বলিয়া কক্ষ মধ্যে আসিয়া
কহিল, “এত অকস্মিতলব কিসের মন্ত ?

অল্পপনা লম্বত সুখানি হাসিতে করিয়া কহিল,

“আমার সতীন আসিবারে যে, বেখোত পাইতেছ
না।”

শতীনাথ আশ্চর্য হইয়া মনোহরার বিবেক
চাতিতেই, মনোহরা পলায় আসিল নিম্ন ভূমি হইয়া
তাহাকে প্রশ্ন করিল।

অল্পপনা শতীনাথের বিস্মিত মুখের বিবেক
চাতিয়া কহিল, “চিনিতে পারিলে না, আমায়ের
মন্ত, তোমার ছোট বো, আমায় সতীন।”

এইবার শতীনাথের সব কথা মনে পড়িয়া গেল।
হাতোত্তরাথে সে কহিল, যে তাহার বহুতক এত-
দিন কেলিয়া থাকিতে পারে তাহাকে “কি করিয়া
তিনিবে বল, তাহা ছাড়া ছোট বো
বলিবার অধিকার কি ? আর আমার আরো
যাচাতে ও নম বরিয়া ডাকিব সে গুলি
দিয়ে এবং অপর এক রূপের কানে সে কা উঠিলে
সে আমার পুন করিলে।”

এ যে কত বড় মতা, তাহা বুঝিয়া মনোহরা
নিবরিয়া উঠিল। সে পরিচালনে সে যোগদান
করিতে পারিল না ; নিশ্চয় দাঁড়াইয়া কাঁপতে
পারিল।

শতীনাথ কহিল, “কি গো, ছোট বউ, আমার
শব্দটকে সকে করিয়া আনিয়াছ ? নিশ্চয়ই কিছু
মনে আছে তে কথা, তাহাকে কিছু আমি লকরে
ছাড়িব না। তোমার তাহাকে বসিয়া রাখিয়াছ
আমি আনিতে চাই।”

তাহার হইয়া অল্পপনা হাসিয়া উত্তর বিল,
“মন্ত কি প্রাণে ভর নাই যে, সে আনিয়া শুনিয়া
শব্দপুটতে তাহার নুতন বহুতক লইয়া আনিবে।”

শতীনাথ হাসিয়া কহিল, “বাক, তাহা হইলে
আমি এখন নিশ্চয়, ক’দিন প্রাণ পুণ্য ছোট
বোয়ের সহিত কথা বলিতে পারিব।”

সে রাতে মনোহরা অল্পপনার পানেই নম
করিল। নমন করিবারান্ত্র অল্পপনা সুখাইয়া
পড়িল। মনোহরা বিনিস অল্কাই ছুট কুঁ করিতে
পারিল। শেষ রাতে সে সতবে চৌকর করিয়া
উঠিল, “বহুবিধি !” পুন ভাতিয়া অল্পপনা তাহার
পাশেহাত বিয়া ব্যগ্রকতে কহিল, “কি হইয়াছে যে
মন্ত ?” মনোহরা অতি কষ্ট নিবেরে লান্ধাইয়া
লইয়া কহিল, “কিছু না মন্ত দিদি, হুঁম ঘুণোত।”
এই বলিয়া সে ছই ধাতে অল্পপনার বেধ বেটন
করিয়া বরিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

নবমীর দিনের বেলাটা পূজার মানঃকর মধ্যে কোন রকমে কাটায়া গেল ; মনোরমার কোমল মনে হইতে লাগিল আর লজ্জাটা যেন না আছে । কিন্তু যখনমধ্যে সুখাবে পশ্চিম আকাশের কোণে আশ্বপোষন করিল এবং লজ্জাবোধী ঘরে ঘরে আদিয়া বহনকে আশ্বিন করিয়া বহিল ।

লচীনাথ এখন বাড়িরে ছিল। মনোরমার আজ্ঞানে ত্রিপুরে আসিতেই মনোরমা হঠাৎ লচীনাথের পথরোধ করিয়া ধাক্কাইয়া কহিল, “কানাই বাবু, আপনাকে আমি আর বাহির হইতে দিব না। আমার সহিত বসিয়া সাগরাস্রি আপনাকে গল্প করিতে হইবে।”

লচীনাথ হাসিয়া কহিল, “লালিকার রাজিটা আমার হাড়িয়া দিতে হইবে, তারপর ছুটির ব্যক্তি ক’টা দিন সাগরাস্রি করিয়া তোমার সহিত গল্প করিব। তোমার দিদি ত পুত্রান হইয়া গিয়াছে, নতুন পাউণ্ডে পুত্রানকে চাহে বল ত ?”

মনোরমা ব্যস্ত হইয়া কহিল, “আমি কোন কথা শুনিব না। আজ আর আপনাকে আমি কিছুতেই বাহিরে হইতে দিব না।”

মনোরমার কম্পিত কণ্ঠস্বর, বিবর্ণ মুখ ও তর-চকিত চক্ষু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লচীনাথের মনে হঠাৎ একটা সংকেত জাগাইয়া তুলিল। কিন্তু মনের তাবটী চাপিয়া হাসি সুখে সে কহিল, “কাজ আবার উপর এত অল্পগ্রহ কেন বল ত ?”

অশকল হুপ করিয়া থাকিয়া মনোরমা বিনতি ভরা কণ্ঠে কহিল, “কানাকে কখন কখন বিজ্ঞান করিবেন না, আমি উত্তর দিতে পারিব না। আমি যাহা বলিব, আপনাকে তাহা শুনিতে হইবে। এখন হইতে সাগরাস্রি এই ঘরে আপনাকে বসিয়া থাকিতে হইবে।”

লচীনাথ সংকেত ধাক্কাইয়া তুলিল। তাহার মনে যে সংকেত জাগিয়াছিল, তাহারই লব্ধে যে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

লজ্জা মনোরমা তাহার পায়ে উপর পড়িয়া বসিয়া উঠিল, “আমাকে একটা ভিক্ষা দিতে হইবে জানাইবাহু। বসুন দেবেন ?”

লচীনাথ দৃষ্টান্ত চিত্রা করিয়া কহিল, “তোমাকে আমার অর্থ কিছুই নাই, কি চাহ বল ?”

মনোরমা উল্লীয়া ধাক্কাইয়া কখন কখন মনে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, “আমার হাতের নোয়া দিবার শিঁড় আপনাকে বন্ধ করিতে হইবে।”

এমন সময় একজন কৃত্য আদিয়া সংবাদ দিল, একটা বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।

লচীনাথ মনোরমার দিকে চাহিয়া কহিল, “তুমি কিছু ভাবিবে না যন্ত্র, আমার যারা ভোবার কোন অনিষ্ট হইবে না। কে ডাকিতেছে, আমি শুনিয়া আসি।”

লচীনাথ চলিয়া গেল। মনোরমা তত্ত্ব হইয়া ধাক্কাইয়া কি ভাবিয়া হঠাৎ তাহার অঙ্গুষ্ঠ করিল। তখন কৃত্য উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরের দার হইতে সুখ ধাক্কাইয়া লজ্জার দিকে চাহিতেই মনোরমা পাবাণ স্তম্ভিত মত নিস্তম্ব হইয়া গেল। তাহার স্বামী অঙ্গুষ্ঠচরণ ও লচীনাথ সুখে সুখ হইয়া ধাক্কাইয়া আছে এবং অঙ্গুষ্ঠের জ্ঞান হাত খানি তাহার কোমের পকেটের মধ্যে হইতে কি যেন টানিয়া বাহির করিতেছে।

মনোরমা উল্লীয়াবিনীর ভাব প্রাপণে ছুটয়া গিয়া লচীনাথকে আকাশ করিয়া ধাক্কাইয়া স্বামীর সুখের দিকে চাহিয়া আন্তরিক বসিয়া উঠিল, “গোপা আমার জানাইবাহু।”

সঙ্গে সঙ্গে চাক চোপ কাশির শব্দে প্রাধানতল সুখহিত হইয়া উঠিল।

নাকছাবি

(ঐগিরিতানুসার বহু)

অধাঙ্গ-সাগরের স্রাবের চূড়ানে
পদ্মপ্রান্তে বিশাখা প্রেম নাথিকের
কিহন-ইহিত তুমি উল্লস নহানে,
তিবদীপ্ত বাতিটুকু আলোক-গৃহের—
আশাভরা চিত্তাহরা ; অঙ্গল করে
তুমি কেন বিহ্বল গুহ তস্থ পদনের
বিস্ত্র কণ্ঠাকটী ; গোচাঙ্গ-নিখরে

তুমি হৃদে নবোদিত স্রোতি-অকণ্ঠের
সদৃশ্যন ফেনশিশা ; কণ্ঠ-কল-নিরে
তুমি অবিবিমোহিনী মণি ঘোষাধর্মী *
নিখিল-স্বনন-লোভা ; মৌনের ছুটিয়ে
তুমি শান্ত প্রমোদের কান্ত তান্তি অম্বি !
অথবের অম্বীকা তুমি তিরস্তন
মরমের রসবের পরম-রতন ।

পল্লীগ্রামে ব্যাত্রিশিকার

(ঐকীনেত্রকৃত্যার হাথ)

পল্লীগ্রামে আমাদের বাস । কলিকাতা প্রকৃতি
বড় বড় সহরের অধিবাসীরা আমাদের অগ্রহণ
আমাদের অধিবা মজুবিধা বৃত্তিতে পারিবেন না ;
তাই আমাদের পল্লীগ্রামে বাসন সোণালীর একটি
অনভিত্তিত আলোখা তাঁহাদের সমুদ্র বহিরেতি ;
আশা করি ইহা দেখিয়া তাঁহারা আমাদের অগ্রহণ
কতকটা বৃত্তিতে পারিবেন ; হহ ত পল্লী সহরে
কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন ।

আমাদের গ্রামের চতুর্দিকে আট দশ ক্রোশের
মধ্যে বহু পল্লীগ্রাম আছে—তাঁহাদের সকলগুল
অপেক্ষা আমাদের পল্লীগ্রামে অধিক সহজ এবং
কতকটা সহরে ভাবাপন্ন, কারণ ইহা একটি অধিবর্তী
মহাকৃত্যার সহর টেনে । এখানে বাসা, আবাদত
জল, বিউনিসিপালিটী, দাতব্য চিকিৎসালয়,
লোকাল বোর্ডের অধিকার ইহাতে ছোটেল ও মের
লোকাল প্রকৃতি আধুনিক সভ্যতার কোন উপা-

দানেরই অভাব নাই । তাহাশি ইহার কোন বিকে
প্রায় দশ ক্রোশের মধ্যে বেগের লাইন নাই । বহু-
হুগুতী বেল টেনে বাসাঘাতের মত কোমোবোর্ডের
একটি ইটকন্ড পথ আছে, তাহার অগ্রহণ মত
শোচনীয় । টিকেবার প্রতিকরণের তাহার ভৌগোল্যের
তার গ্রহণ করে বটে, কিন্তু কোমোবোর্ডের টাকাকলি
দিয়া পথটিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেও
মাড়োয়ারী মহারসনের মরণবাহী প্রকর গাড়িগুলির
দৌহনিবৃত্ত হাল বেগিত চক্রে ক্রমাগত বর্ধণে অতি
অম মনেই গেই একল রিকুপশ অবুত হইয়া পড়ে ।
বৈক শিক মাতার পরিদৃষ্ট হই এবং স্রোতালে
মদনশ্যনী তুলার আভিনবো ও বর্ধাকলে আদ্য-
পৌর কর্ষমেব দুর্দমনী পগক্রমে এই পথ কিরণ
দুর্গম হইয়া উঠে, তাহা ভুক্তোপী তিত্র মস্তের
কল্পনা করা হুশাখা ! ইহার উপর মধ্যে মধ্যে এই
পথে মহাতীতি চূড়ার উপর মূর্খের পাখার ভার

বিবাহ করিয়া নিজে ও নিজের গৃহপুত্রকে
ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগে। সত্যকথের ভাঙে বৈধব্য
কোনদিন সৃষ্টিত হইলে এই দীর্ঘ পথের দ্বায়ে স্থানে
লাল-শাক্তীর নিশানে ইড়িতে দেখা যায়, এবং
ভাববারী ছোড়ার গাড়ীর কোচাংশে বস্তুভাষী
'টোকা' গাড়ী কোন চৌকি, মিনির বা তেঁতুল
কপিলুজ অংশে সংস্থাপিত হইয়া অল্প বয়সের মনে
আবৃত্ত সত্য করি।

গ্রামে নদী নাই বলিলেও চলে। গ্রামগ্রাম
বারি নদী স্রোত বারি নদী বহু বহু বহু বহু
তারার ছই পাশে বহু বহু পথের পথে ও গোপা-
পানির সমাজ; অধিকাংশ স্থানে 'মরিচা' পিঠা
বা ভাটাই হইয়া উঠিয়াছে। অনেক বাড়ির
অধিক বিশুদ্ধতা; গ্রামের জনসাধারণ স্রোতের ও
পুকুরের যে লক্ষণ ঘাটে মনে করে, সেই লক্ষণ
ঘাটে একইটি মনে নীচে এক বৃক্ষ পাত, কোন
দলে বসন্তের সময়ের বাতীর দ্বারা মানসীপথের সেই
মহাপথ হইতে উচ্চতর লভ করা অতি দূর
ব্যাপার। নদীর মল বহই শুভা। বাইতে—
তাই 'গোমুখ' স্রোত পথে 'কী' বিরা উঠিতেছে;
নদীতে যে লক্ষণ চাই পুষ্কর পুকুর আছে—
তারার সেই লক্ষণ কেরার শীর্ষ মনে চিনা।
পূর্ণাঙ্গ প্রসারিত করা হইয়া বোঝা যায়।
ইহাতেও দেখানো কল বসন করিতেছে। 'নদীর
পিতৃপুত্র' এরকম আছে। স্রোত নাই, কিন্তু স্রোত
মলবস্তুর পাত্র হইতে কোন দূর পাত্রী মিউনি-
পালিতীর টিকি নিতম বেগে না আঁটান মনে
বলে চাটিল বা মের দ্বারা মিত্র করিতে আঁ
ঠাছে, লক্ষ্যের পর লক্ষ্যে লক্ষ্যে না বাঁধিয়া তেজ
গড়ি পথ 'বহা' চিনিয়া বাইতেছে—তারার লক্ষণ
হইয়া আঁটের মর্মান 'রক্ত' মত গোপনীয় প্রভা
অভাব নাই।

আমাদের পাত্রী লক্ষণ ক্রটি কিছু মনে
চাঁচিয়া লইয়াছে। আমাদের এই গোমুখপুত্র

পুত্র বহু পুত্রের বাস ছিল, আঁটেরা কলের
ও বহুতর প্রকোপে অনেকদিন পুত্র অনেক
নির্ভয়ে হইয়াছে; তারার ভিত্তি বাঁচি বিহার
লোক নাই। সেই লক্ষণ ভিত্তি এখন দূর
সমাজ; যেখানে এক সমাজ দূরগোপন, কানীপুত্র
কলকাতা-পুত্র উপলক্ষে স্রোত চতুর্ভুজ
কোনখানে পুত্রিত হইত, পুত্রপুত্র পৌর
দূরিত করিত, অদ্য স্রোতের মত যেখানে
অন্য হইত, এখানে পুত্রকে মলবস্তুর পাত্র
কিছু করিত, সেই মলবস্তুর পাত্র এখন
সেখানে স্রোত বহু পাত্রের পাত্র চতুর্ভুজ
প্রসারিত করিয়া হইয়াছে আছে, তারার নীচে
বেতন, গলগলিত, চীৎ ও লাল ভেঁতের
মল, বিবাহের পথানে 'শিখর' যেত বেত
স্রোতের পাত্র, আর স্রোত সেই লক্ষণ
মিত্র বিরা কোন পাত্র বাতীর করিতে পাত্র
করে না; সেই লক্ষণ মনে বহু পাত্রের
বহু স্রোত পাত্রের মল পাত্রের মল মল
পাত্র পাত্রের পাত্র পাত্রের পাত্র করিতে
আঁট পাত্রী ত্রুত বহু বহু পাত্র প্রাণ
হা মিত্র বিরা মলবস্তুর আঁট প্রাণ
চাঁচি: 'কট' চাঁচিতে আঁট করে, তারার
পাত্রী কলকাতা পাত্রী মলবস্তুর পাত্র
পাত্রের পাত্র পাত্রের পাত্র হইতে বহু
পাত্রের পাত্র চতুর্ভুজ প্রাণ মিত্র
মলবস্তুর পাত্র চতুর্ভুজ পাত্রের
করিতে মনে। হই পাশে পাত্রের
চোটে মলবস্তুর পাত্র চাঁচি উঠিলে, মল
'চল', ই মল বা পাত্র—'ই মল পাত্র
মলবস্তুর পাত্র চাঁচি মলবস্তুর পাত্র
বহু: আমাদের পাত্রী একাধার বা
বহু: আমাদের পাত্রী একাধার বা
বহু: আমাদের পাত্রী একাধার বা

এখন স্রোত একটা। পাত্র মল
উচ্চতর বা পাত্র মল মল মল
উচ্চতর বা পাত্র মল মল মল

কাড়ীর কন্যেবল্লভা হোঁবে, বাড়ির চইয়া অক
পাতক পুত্রিতে পুত্রিতে 'ডাকাত পড়া'র মত সম্বরে
যিকট চিত্তবৃত্তি করিয়া নিমিত্ত পূৰ্ব্বানুগের তলিয়ার
হইতে আবেশ করিতেকে; চাঁদু আমার বাড়ীর
হই তিখনত গজ পূৰ্ণে পূৰ্ব্বোক্ত পুত্রবীর্যের ধারে
বাঁহ-পৰ্জন আয়ত্ব হইয়াছে! বাঘ ও বাঘিনী
উভয়ে নিম্নত প্রোথালান করিতেছে তাহা লষ্ট
বক্তিতে পারিতেছি। একটার পর খুব গভীর, এক
নিম্নত অনেকবার 'ইউর ইউর' করিতেছে;
আর একটার পর অনেক 'কুত চান' এবং কীদতর;
যেহেতু সেটাই বাঘিনী। যত্নের বাড়িরে দিয়া
চলন লইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই যোষ ওষ বর্ণনে
যোজনাত হয়; তিস্ত এতদূর আগ্রহ ও সাহস
এই উভয়েই অস্তাব মনতঃ হৃদয়ার পূর্বে কেহো-
নিদের ম্যাপের কাছে বসিয়া অন্তঃসর কি ঘটে
জানাই প্রতীক্য করিতেছি।

প্রায় বন মিনিট পরে একটা বাজেরই গর্জন
পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইতেছি; যোষ ওষ বাঘিনী
ওল গানে পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সাধকগণের নিম্ন
অভ্যাসন করিয়াছে। কারণ গ্রাম প্রান্তর যে
আবংগানে বাঘের আজ্ঞা, সেই বিকে 'কেউ' খুব
উৎসাহের সঙ্গে ডাকিতেছে শুনিতেছি। ডাকিতে
ডাকিতে এক একবার কল্পিত কণ্ঠে 'ক্যাক্ কেউ'
লক্ষ আর্তনাদ করিতেছে। কেউ নিকটে দিয়া
ডাকিতে আয়ত্ব করিলে বাঘ বা বাঘিনী উজ্জ্বল
হইয়া বনন তাহাকে ডাড়া করে, সেই সময় পলায়ন
পর 'কেউ' এই ডাবেই আর্তনাদ করে।

যাহা হউক, বাঘটা যথো যথো গর্জন করিতে
বহিতে আমার বাড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথের অপর
পার্শ্ব হাওঘরের পল্লভতে আমার প্রতিবেশীর
কলা বাগানে আদিয়াছে তাহা বৃত্তান্তে পারিতেছি।
কয়েক মিনিট পরে সে নীরব হইল।

আমার বাড়ীর ঠিক দিকনির্দেশে একটা ছোট বাগান।
এই বাগানের বাগিনে আশাযের প্রোতিবেশীর বাড়ীর

দোহা। বাগানে গোষ্ঠীকৃত কীটান, হুল, নারিকেল
প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। এই বাগানের মধ্যে
মিনিট দশেক পরে একটা লক্ষ হইল 'মাগ'—
বিড়ালের কণ্ঠস্বর বটে, কিন্তু সেট গের কতখানি
ভয়, ব্যাকুলতা ও হুসনা হুসর উঠিল, তাহা আমি
ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি। না। মনোঃ নৃষ্ট
আরম্ভ হইয়াছে, এবংত বেদ শোরে বর্জ্য
বহিতেছে। বিড়ার বাগ বিড়ালো দেহের
আর্তনাদ শুনিগাম—মাগ! যত্নের প্রায় কুড়ি
ঘাত পূর্বে, বাগানের উত্তর দিকের বেড়ার
অতি নিকটে; চক্ষুঃ নিম্নে স্থান করিয়া একটা
লক্ষ হইল! পুত্রিগাম, বসাই বিড়ালো দেহ
লইয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া আমানের দিকি বং আর্তনাদ
লাকাইয়া গড়িল। ল্যাপ্পের তীব্র আশোকে বাগ-
দন-পথে বারিয়ার আর্তনাদ অনেক দূর ম্যাপিকিত
করিয়াছে, যোষ হইল কি একটা ম্যাপের নকর
বেগে পথের বিকে চলিয়া গেল। তাহার আগ্রহ
লষ্ট দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত
পরে ডাকঘরের পার্শ্ব বাগানের নিকটে হইল আ-
এতবার বিড়ালটার বিহ্বল কণ্ঠ: তাহার আর্তনাদ
শুনিতে পাইলাম। তাহার পর নিরম্ব! বক্তিতে
ঠা করিয়া বেড়াটা গরল; আমি মগ্ন নিরাসিত
করিয়া ঘিটনে আমার শব্দ কয়েক চলিগাম।
প্রভাতে বিড়ালটার শব্দন লইয়া হত আগ্রহ
হইল।

প্রভাতে উঠিয়া দর্শ্যগ্রে বিড়ালো দেহ লই-
লাম। রায়ে বাঘে কোন বিড়াল দখিরা লইয়া
দিয়াছে তাহা বিহ্বল কণ্ঠ কটন হইল না। একটা
খুব বড় লাল কুণ্ডো বিড়াল লক্ষ্যই আমাধের
বাড়ীতে আদিয়াছে, অত্যাচারে বধেই করিত; কিন্তু
সেই দিন হইতে আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই।
পূর্বে রায়ে নৃষ্ট হইয়াছিল, ডাক যত্নে: কাছে নর
মাত্র উপর বাস-পার্শ্ব অতি দেখিগাম।

আমাদের প্রাঃবেশী শ্রীমান্ হুটনায় লজ্জাংগনা

যশা শিকারী ছিলেন, এখন তিনি 'কেউই নয়ন' অর্থাৎ বাঘ শিকার করিতে যান। বিজ্ঞানীর কবিশ্রমের সারের উৎকৃষ্ট যোনীরা বন্ধুত্ব ভিল, বোকা-বিদ্যায় বন্ধুত্ব। সাধের নিভিত সাধিলের মাথা কাটাঁইয়া 'মোমে' বাইবার সময় সেই বন্ধুত্বটী তাঁহার স্নিহা দানদানকে বকশিস্ দিয়া যান। কুচ নাথ সেই বন্ধুত্বটী অন্ন মূল্যে ক্রয় করিয়া বাসি শিকারের জন্য অতীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যে দিন বাঘের সন্ধান মিলিল, সে দিন তিনি কার্যাবসরোরে শিকারে বাইতে পারিলেন না; তাঁহার প্রতিবেদী বন্ধু ভবভোবের শিকারের উৎসাহ আরও অধিক। ভবভোব শুনিবেন, পুঙ্খনিপাত্ত বাঘে 'একটা বড় আদমগাছের ছায়ায় যেতখন বাঘ লুকাইয়া আছে। ভবভোব ভূতনাথের সেই বন্ধুত্বের একনগ্নে ছুরকা পূর্ব টোটা, আর একনগ্নে গুলি বিশিষ্ট টোটা তরিয়া কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া শিকারে চলিলেন। তাঁহার সাথে ভল বেয়ার উপর বুট, তাঁহার উপর পটী বড়ানো। পরিবাসে উপস্থাপরি তিনটা হাক্ পাংক; বুকপিত্ত ও চাই হাতে পুঙ্খ করিয়া কবল বড়াইয়া তাঁহার উপর তিনটী কোট আঁটিয়াছেন, বাঘের নথ বাগাতে বেহুর্গণ ভেদ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। সমগ্র বন্দিনার পলায়ন পুঙ্খ করিয়া বড়ান, সাধারণ পাংকটী উপর ছাটী বাঁধা। ক্যামেরা থাকিলে আদি এই শিকারী দেশের ছবি তুলিয়া লইত। কিন্তু বুদ্ধপুঙ্খ সুযোগ না থাকায় অগত্যা অতিনয় শিকারী স্ত্রী বৈধবাই নয়ন লকল করিলান। ভবভোব বন্ধুত্ব থাকে লইয়া বীরবর্ণে বাসি শিকারে চলিলেন, সঙ্গে এক দাল ছেলে।

নির্ধিক্ট আদমগাছের নীচে বাঘের সন্ধান, তা পাইয়া ভবভোব আবেশ করিলেন, "এখনে ভিল নাই!" আশে পাশে যে কবল ছিল তাহাতে লোষ্ট্র বর্ষিত হইতে লাগিল বাঁকটা যেতল কুচ হইতে বাঁহিত হইয়া অমূহে অগতীর তটী বনের ভিতর

আশ্রয় লইয়াছিল। এতটী ভিল তাহার অকপূর্ণ করিবার সাধে বর্ধন করিয়া যোয়া বাঘদায় আশিয়া বসিল। বেশ বড় বাঘ! সন্মুখে সেই ভয়ন স্ত্রী বৈধবা শিকারী ভবভোবের আশ্রয় পুঙ্খ বাঁধি বাইতে পারিল; 'তবে ত্রি যে বাঘ, বাঘেরে! এখনই থেয়ে কেঁলুনে' বলিয়া ভবভোবের সত্যের ভবভোব চন্দ্রট দান করিল। ভবভোব সেই সন্মুখের অবাধ্য বীজা-ইয়া কাঁপিতে ও বাঁহিতে লাগিলেন। বাঘ বোহ হর শিকারীর পোড়নীয় স্রব্যা স্ত্রীতে পারিল; এই তল সে ভবভোবের প্রতি কৃপা কটাক পাত না করিয়া বৈদ্যা হুনিয়া অগতীরে যাত্রা গ্রহণ করিতে চলিল।

বাঘ পলায় বৈধবা ভবভোবে। দায়ন হইল; তিনি ভাবিলেন, বাঘ অনেক দূরে গিয়াছে, এক গুলিতেই উৎসে লাংক করিতে পারিবেন; গুলি বাঁহিয়া বৈধ আক্রমণ করিতে আসে—তৎপূর্বেই চন্দ্রট বিতে পারিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বুদ্ধের কাছে বন্ধুত্ব করিয়া বাঁক বাকাইয়া এক চন্দ্র মূর্তি কপিঁত হতে 'কাংক' করিলেন। তাহারে এখন 'শাখ নাই' লাগিয়াছিল, গুলির দরিতে যে নলে 'হরক' ছিল, সেইটাই 'কাংক' হইয়া গেল! সৌভাগ্যক্রমে বাঘ তখন এতদূরে গিয়া পড়িয়াছিল যে, একটা ছুরকাও তাঁহার সোম্পর্ক করিতে পারিল না। সে বিরক্তিতার একবার পশ্চাতে চাহিয়া সত্যের অগত্যা অমূহ হইল। বহি বৈধক্রমে দুই একটা ছুরকা বাঘের সাথে বি'ধত, তাহা হইলে সে ভবভোব ছিঃখঃসে করিয়া আশিয়া ভবভোবের ভবভোবের আশ্রয় করিয়া বিত সন্ধান নাই। তাঁহা কবল ও পাংকটীর বর্ষ তাঁহাকে স্রব্যা করিতে পারিত না। বাঘটা বন্ধুত্ব হইলে ভবভোব বীরবর্ণে ও বর্ধক কলেবরে অকত থেয়েই বাঁকী ফিরিলেন; বন্ধুত্বের আবেশ করিয়া বসিলেন, 'কি লুৎখো! বাঁকটা আশ্রয় তরে

পালিতে গ্যালো, বাব আবারও তলি মারিতে তুল
হবে গ্যালো; টেনেলে আজ কি এমন দিকার হাত
হাটা খাড়া আমি যে পায়ে হেঁটে গিয়ে বাবকে
তলি করেছি—এতরে আমার সাক্ষরকে তোমাদের
বজবাব বেঁধে উঠিত।”

কিন্তু এই ভাষাভাষ শিকারী মৎস্যকাণ্ড একজন
বড় ধরের শিকারী আশাধের এ অফলে আরেন;
আমরা যি: এলেন বগিয়া তাঁরাকে পরিত্রিত
করিব। তিনি এই অফলের ইতোয় ঈশ্বারের
হানীত এতটাই। আশাধের গ্রাম হইতে তিন কোণ
দূরে শিটুলীর কুঠীতে তাঁহার আড্ডা। তিনি
কতকগুলি ইতর বাসনা গালি মৃত্তক করিয়া
জাতিগাছের, ভাগ্যেতে কুঠীর বাত ঢলে। বিবাদের
অবিকালে নবর বোড়ার ভিড়ি চাষুক হাতে লইয়া
মাঠে গবে গুরিয়া বেড়ান, কারণে অকাণ্ডে সেই
চাষুক কালা আশির পিঠে পড়ে; তাহারি ধর্য্য
কাতর হইয়া বধন পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে
মুখ বাধন করিয়া আঁঠুনাথ বটে,—তখন সাংঘ
মজা দেখিয়া হাসেন।

সাংঘের খেদন বাসনা তাহার স্ফুটতি, তাঁহার
কুঠীর তৎনৌলদার হাওয়ায় সহকারে সেইজন ইংরাজী
তাঁহার দ্বিগুণ পতি; সাংঘের তাহার ইংরাজী
কথা শুনিয়া আশে হ পান, এইজন্য হাওয়ায়
সাংঘের সহিত ইংরাজী ভিন্ন বাসল্য কথ্য বসে
না। সাংঘের কিন্তু তাহার গলে বাসনা তাহারেই
আলাপ করেন।

একদিন তাহার সাংঘকে বলিল, “পার,
টাইগারস্ টিগারী বিদ্রোহে গ্রাইল, ইক্ হউ কি।
ওয়ান, এ্যাণ্ড সো টিগ বল ডেড, আটরাব টাইগার
কিয়ার টেক কোয়ারংলে।”—এই অশুরী ইংরাজীর
অর্থ এই—“নদার, বাঘের অত্যাচার বড়ই বেড়ে
ইউঠেছে; যদি আগনি একটা মারেন, দে মার দাত
বের করে পড়ে থাকে, তা হ’লে আশাধের ভর বুর
হব।”

সাংঘের হাসি। বলিলেন, “বাঘ দেখলো, যদি
এক গুলিতে টাইগার লক্কা লাগে কোরিব।”

কিন্তু বাঘ খুঁজিয়া দেখাইতে হইল না। এক
দিন আড্ডাতে সাংঘের সাক্ষর পরীকার জবাই বেগ
হব এক প্রকাত বাঘ কুঠীর চাড়াব মূলদাণ্ডের
মধ্যে বগিয়া প্রমুদিত কুহরে সৌভ জায়া
করিতেছিল। বাগাধের মালী মতি মর্দার বাগানে
কাজ করিতে আসিয়া দেখে বাঘ দেখিয়া ভয়ে
আঁঠুনাথ করিয়া উঠিল; তাহারূপ: সাংঘের
কান্দার প্রবেশ করিয়া সাংঘের বার বিল।

সাংঘের তৎক্ষণাত্ বম্মকে টোটা করিয়া
বাগাধার আগিলেন; কিন্তু বেগানে দাঁড়াইয়া
বাঘ দেখিতে পাইলেন না, অথচ সেই নিরাপন্ন দান
হইতে নাহিয়া বাগানে প্রবেশ করিতেই তাঁহার
সাহস হইল না। তিনি বাগানে মালীকে আবেগ
বলিলেন—সে বাগানে দিয়া বাঘটাকে তাঁহার
কান্দার জানালার নিকট দাঁড়াইয়া দিবে; তিনি
ধরের দরজা বন্ধ করিয়া সেই জানালার পর্দার
ভিতর দিয়া তলি ঢালাইয়া বাঘ নারিবেন।

মালী বলিল, “হুজুর, বাঘ যদি ওপক না বহু
আগনি নাহিয়া অজুন, বেশ কাকা বাগাধার আছে;
এক গুলিতেই মারিতে পারিবেন।”

সাংঘ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ওই নেই,
সে’ হোয়া নেই; ও বাসালী নেই, বাঘ আছে।
কুহুর নেই, টু মৌ বাও।”

সাংঘের ধরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ
করিলেন, এবং জানালার পর্দার ভিতর দিয়া
বম্মকের মল বাহির করিয়া একা দ্বিত করিতে
লাগিলেন। মালী সাংঘের কল্পে বিচারা হইয়া
বাগানে প্রবেশ পূর্বক এক লাঠি হাতে লইয়া ‘বেট,
হেই’ করিতে লাগিল। কুহুর মধ্যে বাঘটা লাফাইয়া
মানকে আক্রমণ করিল, এবং তাহাকে কুতলপাতা
কান্দার মধ্য দ্বারা তাহার লক্ষ্য কৃত বিকৃত
কিল। তাহার পর তাহাকে অস্ত্রের আঘাত

ফেলিয়া বাঁধিয়া দুই লক্ষে বাগানের প্রান্তরে
মিকি আসিল; সাহেব তখনও বসন্ত ধরিয়া
লক্ষ্য স্থির করিতেছিলেন। বাঁধ একলক্ষে প্রান্তরে
উঠিয়া যখন অন্তর্ধান করে—তখন সাহেব মহাঃখের
‘কাহার’ করিলেন।

বাঁধ অস্থান করিলে সাহেব আর খুশিও থাকে
নাহিবে আসিলেন; মালীর তখন তৈতন্য বিলুপ্ত
আছে, তিনি তাহার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞের
মত মাথা নাড়িলেন, এবং হাতে লাঠী থাকিতে
অবতর কোথানটা আশ্রয় করিতে পারিল না
বলিয়া তাহার কাপুরুষতার নিশ্চয় করিলেন।
তাহার পর তাহাকে গুরু পাড়িতে জুনিয়া
আশ্রয় প্রদেয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া
ঔষধ বর্জ্য দেখ করিলেন। তিন দিন পরে
মতি বাসী তথেষ্ট মতি মালীগিরি হইতে পরিত্রাণ
লাভ করিল। তাহার অন্যথা বিধবা স্ত্রী শিত
সন্তানটিকে কোলে লইয়া এখন পথে আসিয়া
পাড়াইয়াছে। এলেন সাহেব বেতস বীরপুত্র
বিস্ত জ্ঞান হুৎ উপস্থিত থাকিলে বীরবে তিনি
অজ্ঞাতের মূখ অবিকৃত ইচ্ছা করিয়া সেনাপতির
দোষ লাভ করিতে পারিতেন।

মতি মালীর মৃত্যুর পর আশ্রয়ের পরামর্শ
নিবন্ধী জীবন ভুতনাথ ভায়া এলেন সাহেবের
উপর ভোঁ দিয়া বাঁধ শিকারের মত ফেলিয়া
উঠিলেন। ইতিমধ্যে তাহার একটু বন্দী করিয়া
কোণায় উঠির বাঁধ ঘটিল।

একদিন সন্ধ্যার পর বন পাল নৈশ চৌকস
দেখ করিয়া পাল চিহ্নাইতে চিহ্নাইতে তাহার
বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, আর হইতে লাভ
হইতে দেখিতে একবারি চেয়ারে বসিল, এবং
তাহার মাঝে কলিকার হু দিতে লাগিল।
বৈঠকখানার দান একটি, তাহা খোলা ছিল;
পাশেই ডাকপত্র, পত্রের দুইদিকে বাগান, মধ্যে
মধ্যে বৃক্ষের বাড়ি। বন পাল কলিকার হু দিতে

বিত্তে কিছু হুইতে হুইতে আশ্রয় তুলিতে
পাইল। দুই মিনিটের মধ্যেই হুইতে হুইতে
তাহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল; এক পাশে
একবারি বাঁধাও আর পাশে একটি আলবারি
ছিল, একটি কুহু পড়ে। বাঁধার নীচে, একটি
আলবারির আড়ালে লুকাইল। বন পাল হুকা
হাতে লইয়া সাহেবের এই বিচিত্র ব্যবহারের
কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়
আচম্বিতে এক বৃক্ষ দ্বারা একলক্ষে বনের বৈঠক-
খানায় প্রবেশ করিয়াই সমুখ চেয়ারে উপবিষ্ট
মহুয়া-মুষ্টি দেখিয়া চেয়ারের আঁধা হুই হুই
যায়ের নিকট ‘বাঁধা পাড়িয়া’ বসিল, এবং কুহুর
হুইতে কোন্ দিকে আরো লুভ হুইতে তাহার লক্ষ্য
করিতে লাগিল। বন পাল এই অপূর্ণ বৃত্ত
দেখিয়া তবে আশ্রয় করিয়া বসিল, “বাঁধ বের
চুকে গেছে কেহে যে বাঁধা?”—সুত্র কল, সমুখ
একটি দাত দাত, সেই দাত আঁচ করিয়া হুই দাত
হুই বাঁধ বসিয়া আছে, এবং শিকার বরিবার
আশায় চারিদিকে তীর ঘুটপাত করিতেছে। বন
পালের মনের অবস্থা পাঠক কল্পনা করুন। তাহার
আশ্রয়ে পড়ার অনেক লোক ‘লুই দিতে দিতে’
বৈঠকখানার সমুখে দৌড়াইয়া আসিল; তখন
বাঁধা শিকারের আগা ত্যাগ করিয়া বৈঠকখানায়
বসিবে আসিল, এবং একলক্ষে বাঁধার নীচে
দাঁড়াইয়া তাহারে পরামর্শ করিল। ইচ্ছা করিলেই
সে আগন্তুক লোকগুলির একজনকে হুবে করিয়া
লইয়া হুইতে পারিত, কিন্তু বোধ হয় সে তখনও
নরনোনিদের ব্যবহার নাই; ‘মান ইটার’
পথ্যে এসোশন পায় নাই।

বাঁধ পরামর্শ করিলে পড়ার লোক কেহ
কেনেতায়া মাঝাতে আসিল, কেহ কাঠের উপর
লাঠির আঘাত করিতে লাগিল; অনেকেরই হুবে
মার মার মার। ২৭ মিনিট পরে বাঁধা আঁধ
মাইল হুইতী দেব পড়ার প্রবেশ করিয়া, এক

ହୁଳସ୍ଥାନ କ୍ଷବେଶ ସୋମାମାର ମୂଳାତେ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 କରିତେ ଲାଗିଲ । ସୋମାମାର ସେ ମୂଳ ମୂଳ ବାହୁର
 ବାକେ-ମେଞ୍ଚିଲେ ତର ଦେବାଇ । ହୁଳସ୍ଥାନ କରିବାର
 ଲଜ ଶ୍ରାବେର-ସାବେର ଏ ଏକଟା କୌଶଳ । ବାସେ,
 ଜାକ ଅନିବା ମୂଳ ବାହୁ-ଶୁଳି 'ସୋମାମ', ହଇତ ବାହିର
 ହଇଁଁ ଚାରିଦିକେ ବୌଦ୍ଧାୟୋଡ଼ି କରିତେ ଲାଗିଲ,
 ଯେହି ଉଦାସେ ବାସଟା ଏକଟା ବାହୁର ସ୍ଥେ ମଇ ।
 ସାମ୍ବନ୍ଧ ମାର ହଇବା ଶାସବାସ୍ୟାମର ଶିତର ବିଦା
 ମହାଶୟର ଅସାବେ ଶ୍ରାବେନ କରିମ ।

একশ কাত গাই ঘটে! বহদিন লুপ্তে
আমাদের প্রাণের এক বিশাগকার। (স্বাঃ) বাঘের
মুখ হইতে বাঁধব কাকি!। লইয়াছি।

ঐমানু কুন্তনঃ বাখের এই আচাচার কন
জন্মিা বাখানির ভাৱ এক মাচা বাখিা একহন
বহুদয় সেই মক্কেৰ উপৰ হই তাহি মগৰ বাগ
কৰিলেন। মাচাৰ নীচে একটী ছাপা বাখিা
হাখিল; কিন্তু বুদ্ধান বাখ তীব্রবের মাখ উৎক
বুদ্ধিতে পাখিা মুখঃচাচক ছাপ মাখের গেভ
মংবদ কৰিল, মাচাৰ নিকট খেখিল না।

ইতিমধ্যে ভাঙ্গাবল'র প্রহরী একধি'র প্রত্যেক
সংবাদ দিল, "বাবু, বাঘে আম'র ঘোড়ার
ঝাঙটাকে কাপ'রাত্তে বেঁচে কে'পেছে। মাঝখান
বেয়েছে। ব্যক্তি মাঝখান, বে'পা'র'র 'বোঁট'গ' তার
'বাস। সেই গ'হের তগ'র টে'বে নিয়ে গি'য়েছে।"

জাফ বাধনায় আরও এক মাইল দাঁতন পূর্ণ
মাঠের মধ্যে একান্ত বর্ণনায়। সেই বর্ণনায়
ভাঙির ভিতর একটি বৃন্দ পল্লব আছে; সেই
বল্লবের একটি বাধ দ্বিতীয় বিন্দু কটে, যার
শিকারের বাধের হইয়া সেই সুবিশেষ প্রাণের
চতুর্ভুজ পলাইয়া গুরু বর্ণনায় বেড়াই, এবং
হাসিল, ভেড়া, বাঘ, কুকুর খরিয়া লইয়া যায়।
একটা কবের ভিতর পূর্ণনের অগ্ন্য অধি, স্বাধীন।
বাধে এক শিখর দ্বিতীয় কটে, কিছুদিন হইতে
প্রাণে শিখরের দাঁতন পাল্লা বাধ না। প্রত্যন্ত

ও সাংস্কারে মনবদ্ধ পুষ্যোগে। সে ইচ্ছাতান লক্ষিত
নীরব হইয়াছে।

ছুতনাথ তাহা পক্ষ পোষক পরিচয় লুপ্ত থাকে
 নইয়া মরণে বৃকপক্ষরাদী ভ্রাতৃদের সম্মুখে গিল-
 লেন। ভীষণা হান বৃকপক্ষে উপস্থিত হইলেন
 তখন প্রাণ ব্যাঘাত কাল। যে পক্ষঃ বাধ ছিৎ,
 সেই পক্ষঃরই নীচের বিকে একটু মনস্তি বৃহৎ ছিত্র
 ছিল; সেই ছিত্র দিয়া ব্যাঘ্রো লাগুন যেবিতে
 শাওয়া পেল। 'যে-কুলে' বাধ আছে শুনিয়া চারি-
 বিকের মাঠ হইতে মনক রোগান, কৃষা-
 কারকর্ণ পূর্ণভূবি রাখিয়া মরা বেবিতে মাণি।
 নিকটব পক্ষা-পক্ষের অবিবেচনা এম নরপক্ষ
 মূলমদান; তাহাদের অনেকই লাঠি কংগনগ লইয়া
 ব্যাঘ্র মর্দনবারে কেলু-বতে উপস্থিত হইল। কেহ
 বলিল, "বাঘে 'নায়া' দেখা' আছে, ঐ পোক্ত
 দিখে লুপ্তকর ভ্রাতৃ। টাঙে বার করা পেয়ো
 বাঘো; তা' হ'লে লাগু খোঁকলের মর্দি আটটা
 পড়া থাকে। তখন গায়ে উঠা ভ্রাতৃ কোণাল।"

শিকারী ভাষা ইহা গম্ভীৰ্জ মনে না করিয়া
বলিলেন, 'যাৰি ভপাৰেৰ ঐ চুৰি পাৰে বন্ধ
উঠিলে য'লৈ থাকি, তেমাৰা ধোৱা কৰ। নোৱা।
চোটে বাধ বাগ্ বাগ্ ক'ৰে, হাঁচফাণ পেচে,
পালাবোৱা পথ দাৰে না। বোঁতৰে যেন নীচে
নাম্বে, অৰি আদি জাপ কৰো। এক ভপাটই
কপোকাৰ হও।'

চাষাণে তখন একত্রাণি অসহ্যের বড়ি পড়া
 আশিল। অসহ্যের পাহা ছব সাত হাট বা ততো-
 বিক বোধ; চাষাণে তাহার অগ্রগণ্য মণিনার কতি
 বাহিয়া আশুন বহাইল। মণিনার কতিতে আশুন
 নিগে অসহ্য পুখ উষিত হয়; বাণের 'হাঁড়োপের'
 চোড়াকৈ অসহ্য নোয়া উঠিতে লাগিল যে, পু-
 ন্যগণের বহু উদ্ভব পণ্য অসহ্যের হইয়া পু-
 ন্যে নক উত্তাপও হুসহ হইয়া উঠিল। তাহাণা
 বাসের শাসনোপেয় উপস্থিত হইল; সেই গুণের

এক পাশে একটী সুস্বাদু 'মুকর' ছিল, বাঘ সেই মুকর দ্বারা খাতির হইয়া ভূতলে লক্ষ প্রাণ করিল। সে ফাকা দাঁপোরে আঁপবানাতঃ পক্কঃ কী ভাষা পুঙ্খানুপুঙ্খ গাহ হইতে তাহারে গুলি করিলেন; গুলি তাহার পক্ষেতেব একটী উরু ভেদ করিল; কিন্তু সে পড়িল না, পক্ষীরবৎ আর্ত নাদ করিয়া উপত্যকায় উড়ে উড়ে যথাসাধ্য ক্ষতচরিত্রা সুবস্ত্রী একটী অরণ্যে প্রবেশ করিল। ক্রমশঃ তাহারে ভিত্তি গুলি মাটির স্রোতঃ পাইল না। বর্ষাঙ্গণ হইতে লাগিল, 'লাকা' শিখা হইল ঐ এক গুলিতেই সুশোভন করিলে

। বর্ষাঙ্গণের উৎসাহ শিল্পি হইল না, বাঘ যে ভুলে কাঁজের প্রাণ করিয়াছিল, সেই ভুলে প্রবেশ করিয়া তাহারে 'বেশিল, বাঘ আবার বস্ত্রগাহ হইতে করিতেছে! এক সাগরী মূলমদান সুবস্ত্র বাঘের নিকটে গিয়া তাহার লতা লাগির অঙ্গাইল বাঘের মুখে পুতিয়া দিল! এবার বাঘ মরিয়া হইয়া ল্যাকাইয়া উঠিল, এক লাঠী দুই হইতে টেনিয়া কেলিয়া কপিমা আসিল; তবে বর্ষাঙ্গণ ক্রমেণে পদায়ন করিল। ইত্যনন্তে আর একটী মূলমদান সুবস্ত্র সেই জোলের মা: এক পাশে হীড়াইয়া দুই বাড়াইয়া মতা দেখিতেছিল; তাহার উপর বাঘের বৃষ্টি পড়িবার বাধা এক লক্ষ তাহার উপর নিশ্চিত হইল, এক নবত্যাগে তাহার সুবস্ত্র ও বস্ত্র বেশ কত বিস্তর করিল। 'শোনিয়া-জোরে' তাহার মর্জিত ভাঙ্গিয়া গেল।

'বাঘকে, দেখে' কে:জের!' শেষে সে আর্জ:

নার করিতে লাগিল। তাহার মাঝেমাঝে লক্ষ আনন্দের তাহার কাছে খোঁড়াইয়া মাগিল, একজন সাগরী সুবস্ত্র তাহার কাছেই সুবস্ত্র লাগি বাঘের সুবস্ত্র 'ভক্ত' জীবির বিশেষ বাঘ তাহার নিজস্বকে আর বেশী লখন করিবার সুযোগ না পাইয়া বসে ভস্ম দিল, এক নিকট পক্ষীনে 'দই' বনজুরি কলিও ক হস্তা অসুবস্ত্রী আর একটা মঙ্গলে প্রবেশ করিল। বাঘটা বহন পলায়ন করে শুখনও তাহারে একটু খোঁড়াইতে দেখা গিয়াছিল।

পথভ্রমে আতঃ প্রাণের নিকট গিয়া তাহারে গুলি ভাঙ্গি বিশৃঙ্খল বনে করিয়া নীকারী নিজস্ব হাড়িয়া ক্ষুদ্র বনে বাতী করিলেন; প্রাণের অনেক মোক তাহারে 'বিশ্বাস' হীড়াইয়া নানা প্রস্তে বিস্তর করিয়া তুলিল; 'তিনি' অল্পাংশ বনে বসিলেন, হাতী না থাকায় তিনি বাঘটাকে 'মরিয়া' অ নিজে পাইলেন না বটে, কিন্তু তার 'বাগ' আর 'বে' 'ভলি' লাগিয়াছে, তাহারে নিকটেই দেখানে ক্ষত হইবে; পক্ষীরে কোন বাসে ক্ষত হইলে বাঘ বাঢ়, কাঠ, কঠিন প্রকৃতি ব্রহ্মা সেই ক্ষতস্থলে পুষ্টিয়া বেধ, এ বাঘটাও তাহারে করবে, 'ক্ষত' জন্মেই বড় হইবে, তাহার উপর মাঝি বসিয়া পোকা পাড়িবে, শেষে সে বাগর মরিয়া থাকিবে।

আতঃ মূলমদান হুককে পাকিতে তুলিয়া প্রাণের হাসপাতালে লইয়া বাগরা হইল; দেখানে তাহার চিকিৎসা চলিতেছে, সে এ বাগা বাঁচিতেও পারে; কিন্তু বাঘের বৃত্তা লংঘন পাওয়া বেশ না, বস্ত্র প্রাতি তাহারে প্রাণের পক্ষীনে চারিত্রিক হইতে অন্তিম পাইতেছি।

স্বপ্ন-মতি।

(ঈশ্বরেন্দ্র দেব)

আজ্ঞা নতুন দি'ব,
তো ক'রে দিলেন খ'নি বিধি
কোলে একটি ছেলে
ক'ন ক'রে বাছাকে তাই তেলে
একলাটি এই ঘরে
ঝর ওপর বিছানো এই ছেঁড়া কাঁথার পরে
ঘুরে বেড়াই এখিক দেখিক শুনি ?
। য'বার না ঘুমন্ত এই টাংকে বুক নিরে
শব্দ শব্দ জ্বলের কাটি হতান সুতো ঘিরে
বোকার ভেত্রে একটা কিছু বুনি ?
অথাক আমি তত্ত ভোনের বেধে !
কখন ক'রে এমন ছেলে একলা ছেলে রেখে
অন্ধ বাজে পারিস্ বেতে চলে ?
আদার বোকা হোলে
বেধিস্ আমি রাখ'বো তাকে

সবাই কোলে কোলে !

হয় হোক সে বোঁচা বাঁধা
দিবা কালো মোহ'না হাঁধা
চুইপনা বাবানো তার থাক'না বতই মুখে—
তবু আমি তাকেই নিয়ে থাক'বো বেধিস্ জুখে !
তাই-তাই-তাই শেখাবো আর হাটি-হাটি-পা
টাংকে ভেত্রে বোল'বো ও টাং টিপ দিয়ে যা—
আদার কাছে শিখ'বে হাধা
মা-মা-তা-তা-বা-বা-বা !
আগো আগে নিষ্টি বুলি বুলবুলি সে বুলবে কত
মহনা শানিক টি'য়ের মতো !
পাক-পড়নী হয়তো বিধি বলবে এ সব পাগ'লাখো—
তবু কিছু অক্ষ'। বেধিস্ আমি
তার সঙ্গে ব'লে ব'লে তার জাঘাতেই কথা ক'বো !

তাই বলে ঠিক ছেলের আমি
কেবল মা'টি ধ'রেই রাখ'বো ?
মা'র লকালে ওপর বেগা
বোকার ছোট বোনের মতো
তার সঙ্গে ক'র'বো বেগা,
আমি বোকার বন্ধু হ'বো,
আমি হ'বো বোকার মাখো
কর'বো কত ছোটপাটি
ক'ল'কা কাঁটি
যাতায়াতি !
বোকার একটু অগ্রহ ধ'লে সব কিছু কা'র রেখে
নক'র'না তার মাখার গিরর খেচে ;
ঘিষায়াতি থাক'বো কাছে কা'রে
কটক যদি না পায় ব'ধা ! কট কিছু
হয় যদি তাই পায়ে !
হোসা ছেলে মা ছাড়া কি থাকে ?
নিজের হাতে নাইয়ে বেগো তাকে
বাইয়ে বেগো নিজে,
তার ভেত্রে কোমর বেঁধে রাখ'বো বেধিস্ কত কীবে !
বুকের ওপর পাঁক্তে বেগো
টাংমুখে তার হাখার চুখো
তাইরে তাকে পাশটিতে ধোর
বোল'বো বাহ বুঝা-বুঝো !
আদার ছেলে এখনি ক'রে
মা'রুখ ক'র'বো ভেত্রে ব'রে
পড়'বো তাকে নিজের ঘরের মতো !—
টিনের বাশী জিনের পুতুল তান'বা কিনে
বেল'না আছে হ'তো, !
কাঠোর বোঁকা চক'বে খোকা
হাটু হাটু হাটু হাটু বোকা

শুধু যাগেনা কিছুতে সে না পেলে তা' পুত্রগ বীণা
তার নান্দ'র বায়ে বায়েই শুধু লাড়ানী পিনী মাগি !

ধুম খেতে সে করবে লড়াই,
যা কিছু তার বাড়বে হুড়াই
কিছুকখানি বিতে গেলেই মুখে ;

অথচ হোম আনের তলে নিরুকারে

চুসুক বেবে জুখে !

নিজি তাকে সাজি; য' বিধে

যেড়াই দ্বি কোলে নিয়ে

তিন দিনিটের বেশী তবু থাকবে না সে পরিচার ;

পৈলবে যে সব শিতবের দুর্গে কাধেই অলসার !

আমার মণি আমার মণিক

চখের আড়াল চ'লে বাঁক—

উৎকর্ষের আতুল হ'বে উঠবে দেহ মন ;

কেন কেন—কাজা বেন—এই যে দাঁড়,

এই যে আমি ধন ।

বাট বাট যট । বাহা আবার ?

আধা দিবি তুই কি চান্দা ?

দেখু নিখিনি কিবেধ বাহার পেটের ত্রস্ত :

শৌখিনে আছে পেট !

ভোর জেতাই শোণো আমার খোকার কাছে

যাখাটি আদ হেট ;

কি আবে বলু কতি ছেলে

কিবেধ সময় ধব না পেলে

রাগ জো এমন লখার হ'বেই থাকে !

এতা কি আর খাতির কাকর রাগে ?

মাঘের বেহু মনে ক'রে চকু'করে টান্লে গাধা কত

পলাইলু তিলিয়ে নেবার মতো

হাট খোটার একটা ফোটাও সাধনি বাহু বোণ,

তাইত' হঠাৎ ভাত'ল শুষের খোর ;

ছোট মুখে মুখে খাতের এখন কামড়

বলিয়ে দিলে বুকে—

তাতে কিছু ব্যাধির চেয়ে জুখে

জ'র আবার উৎখলিত আল !

তবু একটা অসুখতার লাজ

কাটার মতো বিব'ছে আমায় বিবি !

লুনা কবে আমার কোলেও আসবে এমন

বুক জুড়ানো-নিবি ?

নূতন গান

(শ্রীযোজ্ঞনাথ বসু এম, এ,)

বাসনার ক্রান্তি

কোন গ্রাম প্রতাপবিত্ত শায়ক সন্ন্যাসী
পতীর বসুধিত চরিত্র বর্ণন করিয়া জন্মে লবঙ্গ
নারীজাতির প্রতি বিখ্যাস বাহাণ। কলে অতি
নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করিয়া পত্নীকে পবিত্রতা
হারা করিবার ব্যবস্থা করেন। প্রতি লঙ্কার একটী
দুঃখীরা পাণিগ্রহণ করিতেল, এবং তাহার সহিত
সাজি বাপন করিয়া পরদিন প্রাতে তাহাকে বন্দনে
বসি দিতেন। 'স্বাধা' রচন' নামক গ্রন্থে আছে

যে সন্ন্যাসীর উজির' কড়া সন্ন্যাসের পত্নী'র গ্রাম
করিয়া পর পর লবঙ্গ রচন' সন্ন্যাসীকে বনহুঙ্কর
উপভোগ শুনাইয়া তাহাকে এই নির্গমতার হাত
হইতে রক্ষা করিতাহিলেন। যদি সেই উজির
কড়ার দ্বার লক্ষণসাহিত্য : পলিকতা রচন' নিষেধ
জীবনকে নিবাকল বিপদাপন্ন করিয়া এই তাবের
সন্ন্যাসীকে এং লবঙ্গ নারী জাতি'কে উদ্ধার না করি-
তেন,—তাঁহা হইলে কি হইত ?

এই প্রসঙ্গী কেন মনে উঠিয়াছিল বলিতে পারি
না। 'স্বত' মনে অনেক 'কেন' উঠিয়া থাকে,

এবং অধিকাংশ সময়েই না পাওয়া যায় তাহার ঘাটে, না শাওর দ্বার তাহার সমাধান। যাহা হউক কথটা ভাবিতে ভাবিতে কোথায় কতদূর চলিয়া গিয়াছিল। বলিতে পারি না। মনে হয় যেন আঁতরের পর আঁতর পাড় হইয়া, কত পারাধ পল্লভ পিছনে ফেলিয়া, কত নব নবী সাগর পার হইয়া, এক বিশাল নগরীতে আসিয়া পৌঁছিয়া। সেখানে দেখিলাম আগুন-ভূলা অষ্টাদিকার সংখ্যা নাই, কিন্তু সমস্তই যেন বিধাক-মণ্ডিত। নগরীর প্রমোদভানগুলি লক্ষণে পরিণত হইয়া গিয়াছে। দীঘিগুলি শেফাল্য পুরিয়া দিয়াছে। পাহাড়ের কুঞ্জগুলি আর পুষ্পভারে লগ্ন। প্রেমিকার ভাষা নগরকোনে হাসি ঢালিয়া দেয় না। আপাধা, যোগ, জগল, কাঁটাগাছে সকল স্থান পুরিয়া দিয়া বিশ্বের সর্বের বাদস্থানে পরিণত হইয়াছে। রাতার ধারে ধারে আবর্জনা স্তম্ভীকৃত হইয়া রহিয়াছে। এখানে ভাবিলাম, এ নগর কি অমূল্য? এতটন রূপকথার জার কোন ভীষণ নরজুক রাক্ষস আনিয়া কি এধানকর দমক হার্য বাইরা ফেলিয়া অক্লান্ত রতনা লইয়া কোন আগন্তকের গুপ্ত বসিয়া আছে? এখানে শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু ভীতি হইতে পারে না। এই যে রাতার ধারে দ্বায়ন দেখা বাইতেছে; কিন্তু মুখ বেবিলে মনে হয়, কি একটা দারুণ অন্তর্দ্বারে তাহাদের ভিতর পুড়িয়া ছাই হইয়া বাইতেছে। সুখে অস্বাভাবিক ভাষার ভাব, হঠাৎ মাঝে কত ঘর্ষণ, কি কখন চাহিল!

এতদূর নগরীর এ রূপটি কেন? এখানে কি কোন ভীষণ মারাত্মক উপস্থিত হইয়াছে, অথবা রক্তিকর কতাল সূর্য্য একাধ পাইয়াছে? কোন বিশেষী শব্দ হাতে কি এ নগরী পরাভিত, বিলম্ব? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহার কাছে বিজ্ঞাপন করি। কাচাকোত চিনি না। বেবিলান অনেককই বড় ঠাণ্ডা ঘরিয়া উত্তর দিকে চালাইছে। আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলি-

লাম। অনেক দূর চলিয়া যখন একটা প্রকাণ্ড উচ্চান দেখিতে পাইলাম। উচ্চানে নানা শাওর বুক দেখিতে পাইলাম, কিন্তু সেগুলির উপর যত্নাৎ হস্তের দস্তর চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলাম না, মাঝখানে একটা বিশাল সরোবর, কিন্তু লক্ষ্যে পরিপূর্ণ। কতকগুলি লোক লাগাইয়া “সন্ধ্যা” করা হইতেছে। বাহারা কান করিতেছে, তাহারা যেন নিত্যক অনিচ্ছায়, অতিশয় বিষমুখে, নিত্যকৃত বাবা হইয়া কান করিতেছে। সন্ধ্যা বিশাল অটালিকা। তাহার বিপুল স্তম্ভগুলি প্রাচীরের দৃশ্যে বিভীষিকার পরিচয়। সমস্ত যোগান প্রেমের পার্থক্য থেকে থেকে ভুল। পায়ে কত দূর হস্তের স্তম্ভ ভুল। সূর্য্যগাম এইটা হার আগার। অনন্তর স্তম্ভে প্রাচীরে প্রবেশ করিলাম। এই বিশাল বিশ্ব পুরোত্তর রাজ্যের মৌল্যের অটন নাই। কাকলাই পড়িত স্তম্ভেতে বহুদূর পোষাক পরিহিত শাখিবের গভীর নাই। বেগ-চালে দেওয়ানে বিভিন্ন বর্ণের চিত্রবাসিতে নরন সনসিয়া বাহ। মাথার উপরে অংখা আড়ম্বল্য। বিভিন্ন বাহা। স্বর্ণোপাধাগুলি উপরে স্বর্ণ-লিঙ্গাধানে সজ্জা উপবিষ্ট। চাখিয়ার স্বর্ণ-চর হইতে স্বর্ণ-শাখার স্তম্ভ গঠিত। স্বর্ণ-চর হইতে যোগাধর বিজুত হইতেছে। আমি অবাক হইয়া বিশাল কক্ষের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অনেকগুলি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

এখন কথা বলিলেন রাষ্ট্রদূত—মহারাজ! সূর্য্যোদয় আর পাওয়া যায় না। রাতকৃত আর প্রাতে এখানে নিবেশন করেছে, জগতের দল্লর লোকের স্নান বহলেই মেয়ের বৈধা দেখে। নিত্যক তিন চার বেগের পিত্ত প্রিয় আর দমক রম্যই আর বিধা-হিত। এ অবস্থায় সজ্জার আবেশের গুপ্ত এখানে অবনত মস্তকে উপস্থিত।

সজ্জাটি—মহারাজ, এখানে সূর্য্য অতিমন্দের আর প্রমোদন নাই। অস্তমিত হইয়া যোগালে আতন

পরমাপু চাইতে উদ্ধৃত হইয়া যেখানে জীবন সেইখানেই
আনন্দের আগার স্থান করে। পরিত্যক্ত বিভা-
বৎ আবার শরীরের স্রব হইতে ঈর্ষা বুঝা উৎপন্ন
হইয়া এক পরম বিধাক বলির উৎপাদন করে।
তাহা সন্তোষের সংস্কারের জন্ম নিত্য সংগ্রামশীল।
এস, আবার বিবেক সমস্ত সন্তোষের একত্র করে
বিরাট হৃদয় আকার রচনা করি, এবং সন্তোষের
সমস্ত ঈর্ষাবাহি নির্দোষিত করে সর্বত্র আনন্দের
পাণ্ডিয়ারি বর্ষণ করি।

স্মৃতি। প্রেম ও ঈর্ষা উভয়ই উভয়ের আভ্যন্তর
কারণ। একের উদ্বেগে অপরটির জীবন অসম্ভব।
ওত্থান, আত্ম সর্বভোগ্য জ্ঞান বিভ্রান্তের পরে
খোঁজি ধর্মের নগ পথ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তৃতীয় ওত্থান। সকল মানবের প্রাণের একই
গতি। আবার স্বপ্নের জালবাগী ও ঈর্ষা নিত্য
আদিদেবে আবদ্ধ, একমুখী স্রোতে চির প্রবাহমান।
কবে কোথায় কোন্ হুয়ে কোন্ বিরাট বীণারী
বেজে ওঠে, আবার লারা মন প্রাণ সেই হুয়ের তানে
ভালে ভালে নীরব হয়ে ভেসে চলে যায়। প্রাণের
সমস্ত প্রেমের বহি নীতল সন্তোষের স্পর্শে তরল শান্ত
পাণ্ডি দ্বারা বহে যায়। আবার পরম বিদ্যুৎ
গতি, আবার সকল চাকসার অবগান, আমি
সেখানে ভুলি অতৃপ্তি কিছুই আর খোঁজ পাই না।
সজ্জার অলঙ্কার রূপস্বি যেন ওত, বিবের গতি
বেশে গেছে। সজ্জারূপে আর অবগানের স্থানা
নাই। বৃত্তি হুয়ের ঘোড়িনী আকর্ষণে নিকর
পশ্চিম দিক থেকেই উঠে আসছেন। সজ্জার
প্রত্যাবের আনন্দ হিটোল বহিছে। বৃকপজ,
ভামল দ্বর্জাবল, শিখির শিখর, না আতুল প্রেম দ্বারা
হাত হয়েছে। কিছুই বৃত্তি না—কিন্তু এটা প্রত্যক্ষ
বেধতে পাই সকলে সেই হুয়ের পানে ছুটে চলেছে।

স্মৃতি। বৈকল্য কবিশ্রমের অঙ্গ। প্রেম পাঁচার
পরে আর প্রেমগান কবে না? ওত্থান, প্রেম বোধ
হয় আত্ম বৃত্ত। প্রেমের সানিকার শিখর অকপট

চাকলা আর নাই। যৌবনের সঙ্গীত চাহিলে
আবরণের বুঝা প্রাণ, অতঃ কিং বিদ্যা-
বনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তাও বৃত্তি আর নাই।
এখন যেন প্রৌঢ়ার কৃত্রিম হাসির অন্তরালে স্তম্ভ
খলির চড়া। আর কে কি নূতন গান সোনারে?

যত্ন। মহারাণ, পাশ্চাত্য দেশ থেকে কয়েক-
জন ওত্থান সম্মতি আগমন করেছেন।

স্মৃতি। মহাবীর, তাহাদের সঙ্গানে উৎসাহ
করন।

চতুর্থ ওত্থান। জ্ঞানের অতীত বহু বিষয় আছে,
এ কথা বিবাহ করি। কিন্তু প্রত্যেকের অতীত
অপেক্ষে আগার, মানুষকে প্রত্যেক চাবে নিত্য বহু
করে তাবা জ্ঞান বৃত্তির মাত্ম অবমাননা ভিন্ন আর
কিছুই নয়। অন্যতে প্রকৃত পক্ষে কেহই পরমেশ্বর
দ্বারা আশা বৈদ্যে শুধু দুঃখ দার করে না।
আমি বাহাতে স্মৃতি হই অতঃ তাহাতে স্মৃতি হয়।
আমি বাহা চাই অতঃ কেন তা থেকে বঞ্চিত
করি। জনতে বৈতে থাকবার অধিকার সকলেরই
আছে। পার্থিব ধর্ম, দ্বর্জলের উপর প্রেমের
যে অত্যাচার, তার নিরাকরণে। সাধ্যমীতি জনকে
শান্তি মাথুণে উৎসাহ করিবে।

স্মৃতি। নামের বীজবল সৃষ্টি করানী যেনে
বেশা মিথেল। মনস্ত্র সামান্যিত তার পূর্বেই
জনতে গীত হয়েচে। নামের আকাঙ্ক্ষা মানুষের
অন্তঃকরণে আছে সত্য, কিন্তু সর্বত্র নামের সম্যক
অভিযুক্তি অসম্ভব। বিবেক গতি বৈবোধ্যবিত্তি।
সেই গতি চিরন্তনে বেমে না গেলে সম্পূর্ণ নাম কেনন
করে হবে, ওত্থান? আর তা যেদিন হবে, সেদিন
ত বিবেক অতিথি থাকবে না, সেদিন আর কারও
কোন কার্য থাকবে না।

স্মৃতি ওত্থান। বৈবোধ্য স্তম্ভের শক্তিতে যে
ঈর্ষার উৎপত্তি তাহাও প্রাণের উৎসাহ করিতে
পারে। আত্মজ্ঞাত প্রতিযোগিতার বৃত্তিতে
আমরা ব্যক্তিগত ঈর্ষাকে আহুতি দিব। যেন

যে-ন মানুষে মানুষে লাগি প্রতি দৃষ্টি উঠে।
প্রতিযোগিতার বহুতে উধাও জ্বলন্ত আত্মা
যে-ন লাগি নৌদেবে দৃষ্টি করবে। তাহে মানুষের
অন্য কাব্যকল্পী নক্তি উৎসর্গ হবে। আত্মা
ঐচ্ছিকান্য উত্তরকে একই তাহে একই সময়ে
লাগির সংস্থাপন করে তুলবে।

স্মৃতি। এখানেও নৃত্যের কিছুই নাই। এমনি
করেই প্রাচীন কালে আত্মপ্রতিষ্ঠা, এবং তৎকালীন
অনেক জাতি অত্র জাতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে, বিজয়
করে, জাতীয় গোত্রের অনুভব করে! তাই
অনেকদিন চলে গিয়েছে। এখন এক একটা
জাতি এক একটা দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন দেশে গিয়ে
আর বসবাস আরম্ভ করে না। বহু বিবর্তন বিবর্তনের
পর আজ ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের ভিতর বৃদ্ধ করণের
প্রকৃতি সাধারণ অথবা স্বল্পে বর্ণা হয় না।
প্রাচীন কালের বিজাতীয় বিচ্ছেদের একটা সুবিধা
ছিল। এক জাতির লোক অত্র জাতির লোকের
ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না। বাতায়তে
সুবিধা না থাকায় বাতায় আলাদা বড় বটে উঠে
না। আজ বিজাতীয় বহু উন্নতির ফলে তৎকালের
সকল দেশের লোকই সকল দেশে অতি কম সময়ে
ভিন্ন বাতায়তে বহু। বহু বর্ণা বর্ণা বর্ণে
এক বাতায়তে সুবিধা ও সময় সন্ধান আরও
অসম্ভব হইতে পারে। তখন বিজাতীয় বিচ্ছেদ
থাকলে মানুষের আর কিছুতেই লাগি পাবে না।
জ্ঞান, তথ্যের জগতে সব বস্তু বস্তু সময়ে
একটা জাতি থাকবে বলে মনে হয়। তখনও
এ মানের আর কোনই অর্থ থাকবে না।

বহু ওজন। মানুষ সর্বত্রই মানুষ। তার
জ্ঞান প্রকৃতি বিনা কারণে জগতে ওঠে না। সে
প্রকৃতির প্রদান কারণ অত্যাধিক। মানুষের জ্ঞানের
উৎস অত্যাধিক নির্ভর করে। তার সকলের
স্থান অথবা না করলে মানুষের অত্যাধিক বহু
হবে না। 'মাঠের ফল, খাটের ঘল' সকলে সমান

তাহে উৎসর্গ করক। জ্ঞান বিনামূল্যে সমান
করে আত্মপ্রতিষ্ঠা সকলে সমান হইবে পর। করক।
না তাহ সকলে সমান হইবে জ্ঞান করক।
চলক। পার্থক্যের জগতে মানুষের মনে একই
বাহ্য প্রতিক্রিয়া হইবে। সকল সমান পরিপ্রভা করে,
সমান কল উৎসর্গ করে, সমান জ্ঞান প্রদান করে।

স্মৃতি—সমাজিক সমাজিক (Socialism)
আর সমাজিক বা জ্ঞান সমাজিক কোন
না কোন তাহে তৎকালে বহু লোকেরই প্রতিক্রিয়া
আছে। বহু বহু সমাজিক সমাজিক তৎকালে
থাকে তা হইবে কি মানুষের পরিপ্রভা করক
প্রকৃতি আর পারক? বহু উত্তর বহু জগতে
কিছুই না থাকে, তা হইবে বহু বহু কি কোনও
প্রকৃতিতে বহু বহু পারক? মানুষের অত্যাধিক
যে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করক তার
তৎকালে না করক পেলে, মানুষ কি কোন
করক করক?—অর্থ কি তা পারক করক
অর্থ প্রকৃতির পারক পারক পরিপ্রভা হবে না।
তার করে করক এমনি পারক করক গিয়েই
কি পারক পারক পদম হয় নি?—ওজন, সর্ব মান
সমাজে সমান অর্থ প্রতিক্রিয়া হবে না।

সমাজ ওজন।—মানুষ তার জ্ঞান প্রতিক্রিয়া
সমাজের পারক মান করে সমাজিক হইবে। জ্ঞান
জগতে বহু এমনি মানুষ তার প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করক।
প্রকৃতির সমাজিক পারক পারক নিম্ন জগতে
মানুষ তার প্রতিক্রিয়া পারক পারক করক। মানুষ
তখন অত্যাধিক পারক করক। তখন তার
অত্যাধিক পারক মান আর প্রতিক্রিয়া পে পরিপ্রভা হবে
না। মানুষ মানুষের প্রতিযোগিতার মানুষের জ্ঞান
প্রতিক্রিয়া পারক পারক পরিপ্রভা করক কোন
অত্যাধিক পারক না। তখন সম্পূর্ণ পারক বিজয়
করক।

স্মৃতি।—প্রতিক্রিয়া পদম করক আত্মপ্রতিষ্ঠা
মানুষের নৃত্য নয়। বহু বহু জ্ঞানের বৃদ্ধি সমাজ

২

কর্ণ কৌমল, সুবেশ হ'বে ধন,
 হস্ত তরবার মৌল্যম ধানার লগ্না ;
 ইতিভালের মিনার পাশে অক্ষর,
 তাক্য বেধে কতই লোকের লব্ধ হয় ।
 গজ ঘেড়ে যোগীন লেপন কাখা
 লজ্জি তাঁহার কোন কাঠাতে না পুঝো ।
 চিত্রে ছুটায় চিত্রে অস্বাভাবিক
 তুলির রাজ্য তাবুক অবনীরে ।
 নন্দ অলিত হেম ভবানীর চিত্র
 না বেধ তো বক্তিতোহনি দিত্র ।

৩

লবণপটে কতো পৌষ পান গো,
 কতো ললিত কাখা হাতে মান গো ।
 কালিহাসের কীটক বেগু হ গান্ধী
 স্বাধা কুল ও নাগ বেশের আশী ।

পরিষদের উৎসব ও আনন্দ,
 অত্র বীণার নৃত্যযোগাঙ্গন দ্বন্দ্ব ;
 জ্বলের কলস ! দালিত কাখা বেতনী—
 কুব কেত ; র নীরবতার ছেবনী,
 বেগু বে তুমি ললল হ'বে চিত্র
 না বেধ তো বক্তিতোহনি দিত্র ।

৪

গভীর বাণী শুভান সামান্য
 পাঁচকড়ি ও লখ্যাদি অঙ্ক,
 বাস কৃষিতে প্রাণী ওই কাঁধে
 বিশ্বধামা নুকের কাছে টানছে ।
 এক হল আজ লাক্ষা ভাণ্ডারবর্ষ,
 বহুমতীর আর ধরে না হর্ষ ।
 'বক বাণী' 'ভারতী' আর বিধের ;
 নরকে পুজা নহ কো রে আর নিঃশেষ ।
 একই শব্দ 'উদ্বাহন'ই ইন্দু,
 আর বেধো তাই বিদু ও অবিদু ।

স্রোতের কুটো

(গল্প)

(জিহ্মান্ততোষ সাহায্য)

নিমাই দুখুজের সঙ্গে বাবুপুরের কোন রকের
 লব্ধ না থাকলেও, ভগবান তাকে গ্রামবাসীর
 স্রোত্যক জ্বল হুঃখর সঙ্গে এমন করে কড়িয়ে
 দিয়েছিলেন, যে—সমস্ত কড় কাগজ। মাথা। করেও
 সে এই গ্রামের মাটি কাঁধে পড়ে ছিল। কথার
 ধো, তার বরাতে যেখানকার অল বাহাল ইতিম
 থাকে, তাকে তা ভোগ করতেই—হবে। তাই
 দুখু পূর্ববরে সঙ্গগ্রহণ করেও, নিমাইর অকুটো
 দল তাকে একতুনি, আখীর বন্ধনের বন্ধন ছিন্ন

করে এনে, এই ক্ষুদ্র গ্রামবাসীর বাবার ভোরে
 কাঁটে পুটে বেঁধে দিয়েছিলেন ।

দশ বছর বয়সে বাপ না হারিয়ে, বাপক নিমাই
 যখন এতটুকু ঘেরের অধেধে চারিদিক হাতড়ে
 বেড়াচ্ছিল, তখন দুখ লক্ষ্যকীর অশ্রুতক দিদি তাকে
 বুকে করে এখানে এনেছিলেন । ভবীপতি হর্বাধাল
 বন্দোপাধ্যায়, এই নৃতন জীবটির আগমনে গভী
 না হলেও, গ্রীষ্ম হারিয়ে তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য
 হয়েছিলেন এবং ক্রমে এই অনাথ বাপকটির উপর

আকুই ১৫০ টাকেরই তার লালনপালনের খোল আনা তার নিতে হয়েছিল।

কথাই হল, 'তার বাবা তার পাড়া নেই—পাড়! পড়ানোর 'আমি মরি'। নিমাইকে জানাব হুর্গাবানের কিছু কতি বুদ্ধি হোক না বোক, গ্রামের লোকের চোখ টাটকে উঠল। তারা সবুখে না মল্লগে, পেছনে হাট্ট করতে ছাড়ল না যে—ওমুক গুণি পুতুর এনেছে, বিঘর হতে আতি শুষ্কিতের ঠাকি দিতে। কিন্তু তাইয়ের প্রাসাদ—বিপা। অলপাং চিরদিনই ভিত্তিহীন, কালেই হুর্গাবান যখন গ্রামবাসীদের কথা খেসেই উড়িয়ে দিলেন, তখন নিমাই বেশ রোভিমত ভাবে হুর্গাবানের বাড়ী কানৌ হয়ে বসল—মোরনী নিয়ে।

হুর্গাবান এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে গ্রামের লোক কিছুতেই না পেরে উঠে, তারা নিমাইকে নিয়ে পড়ল। নানাবিধ লাহুনা পছন্দ—তাকে উতাক করতে লাগল। কিন্তু অবশেষে নিমাইয়ের কাছেও তারের পরাজিত হতে হল।

সে বার গোহাল বাড়ী আসল, তারা আপনাপন গ্রাম বাটতে যখন ছোট ছেলেটাকে ঘরের ভেতর ফেল এলে বাড়ীর ও পাড়ার লোক বাইরে বাড়িবে নিষ্কণ হাহাকার করতে লাগল, তখন গ্রামের চকুশল নিমাই তারের সবুখ দিয়ে বুক ছলিয়ে সেই লক্ষ্য ঘরের ভেতর থেকে তাকে বের করে আনল। আরও একদিন মিষ্টিদের মেয়েটাকে গলে জুবে মরার হাত থেকে সেই বাঁচিয়ে-বিধে এসে গ্রামবাসীদের তাক লাগিয়ে থিল। গ্রামবাসীরা নিমাইয়ের অকুত লাহন ও আশ-নিষ্ঠরতা দেখে ক্রমেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, এর পর হতে নিশ্চিত মনে নিমাইয়ের কাছে ভাল মত সকল কানই বীরে বীরে চাপিয়ে দিতে লাগল। সেও এমন নিপুণ হতে, হানিগ্রুখে সকল কাজ করে যেত, যে গ্রামবাসীর হিংসার খোঁজ ক্রমেই করনা হয়ে গেল, অতি আপনার গনের মত তারা

নিমাইকে তারের সবুখের সাধী করে থিল।

পড়া পোন র অনিচ্ছা না থাকলেও, যা পরবর্তী তাকে বিশেষ কৃপা কংগেন না। যখন তার করে যেটুকু সমর্থ সে পেত, তাতে ইচ্ছার পড়া যুক্ত করা, এবং ইচ্ছার নিরবিত হানিগ্রা বেওয়া তাং পকে চরম্বট হয়ে উঠে, কালেই বাবা এবং তাকে মদ বহলেই বিভাগের নিকট বিবাহ নিতে হল।

(২)

গ্রামের এত লোক থাকতে, তাপাবিধাতা ওঠাৎ একদিন নিমাই এর ভাগ্যের ঘরে হচ্ছন কারি করে, হংগারের একমাত্র অবলম্বন তার দিবিটিকে ইং হংগার হতে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। নিমাই চারি দিহ অকতার দেখল। নিমিকে হারিয়ে নিমাই বড়ই মনমরা হয়ে পাল, কিন্তু থাকে গ্রামের লোকের অষ্ট প্রহর আনন্দ, তার চূপ করে বলে গাতা চলে না। দিন কতক শোকের ভাড়নাং সে জিহ্মাণ পেছে, আবার বৃকর বল কিরিয়ে আনল, দেশের সুখ চেয়ে সে মনকে মোহাল—চিরদিন মাহুয বেঁচে থাকে না।

কিন্তু এই একটা মাহুযের অতাবেই ভাবনে একটা বিলম্বিত ঘটে গেল, গ্রামে গেটা সে না বৃকরও, পরে সে মর্মে মর্মে বৃকর পারল। পড়া বিহোগের পর পাড়া প্রতিবাদী যখন হুর্গাবান বাবুকে বার বার মংগ করিয়ে থিল, যে পড়ার মুহূর্ত্তা ভগবান্টের ইচ্ছা ত্রি অপর কিছুই নয়, তখন অপরূক হুর্গাবানের আগে পুত্রান মরকের আগটা এমনই প্রবল হয়ে উঠল যে নুবোটা পড়া অপেক্ষা কতি সুখের কল্পনা তাকে পুনরাং বিবাহের মত অত্যন্ত ব্যস্ত করে তুলল। হুর্গতিক পৌড়িত বাবেশে সকল মস্তুর অভাব হলও যেরে কন্টি নেই, আর মাহুয কড়াবাং এর অপেক্ষা এমনই বার্ষিক, যে কড়ার অপরূক অপেক্ষা বনবান জানাতার দিকটাই দেখে বেশী। হুর্গাবানেরও পাত্রের অভাব হুর্গাবান,

পার্ব্ব্য গ্রামের নবীন চাটুর্ধীয়ায় বহু কাল ধরে
যোহিনীকে এক ছাত্তরগে বিনয় করে ধরে
আনলেন। নবীন চাটুর্ধীয়া লাভ করে, হারিয়েও বঞ্চিত
যোহিনী, নিজের স্থান নিশ্চয় রাখা আত্মজ্ঞান
যোহিনীকাল বিচার করে সংসারের ভাল পক্ষ
করে ধরে দুর্গাধারের গৃহস্থি আনলে বসল।
যোহিনী বয়স অপব্যয়ের বিন্যাসগতীয় খুঁটি না
করে যেখানে গিয়ে তার প্রথম দৃষ্টি পড়ল নিম্নে
এক। পতনের ভাই, সংসার স্থান ভক্তি দেখলেও
তাকে যেহেতু গিয়ে সে দেখতে পারেন না। মিসর
স্বভাব পর হতেই নিম্নেই এনে ভেঙ্গে পড়েছিল।
তার গুণের সংসারের মেনেটা পদে পদে তাকে
লাজিত করে, ক্রমেই তাকে দুর্গাধারের সংসার হতে
বিস্তার করতে লাগল। ভাল করে জ্ঞান হবার
পূর্বে সে মিসর সংসারে এসে টুকে, যোগে কাশ্মির
নিম্নেই, স্বদেশ, স্বজন ভুলে এই সংসারে ছেঁদের
বিশিষ্টে, পরকেই এতদিন আপনায় রেখে গ্রামের
ভাঙার ঘাল করে নিজেতে বিধিয়ে দিয়েছিল।
আম পরিবর্তনের চক্রে পড়ে নিজেও অসহায় অসহায়
গুণে, অবিদ্যাত গুণের কথা, বর্তমান অসহায়
বিচার কর্তৃক গিয়ে মিশে-দারা হয়ে পড়ল। সে
সব ছোড়, একেবারে হাত শুটবে বসল।

(৩)

যাযবপুত্রের ভূতনাথ ভাঙ্কার কর্তৃক নিম্নেই
আশন সংসারের মতই যেহেতু দেখতেন।
নিম্নেই স্বজন হত্যা করে এসে তার ভাঙ্কার বানায়
করাসের উপর আত্মা মিল, তখন তিনি তার
অবিদ্যাত ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দুর্গাধার
গ্রামের নবীন মাহেশ্বর ব্যক্তি, পাছে তিনি অসহায় হন,
শেষে ভূতনাথ ভাঙ্কার নিজের বাড়িতে নিম্নেই
ইচ্ছা লাগেও স্থান দিতে পারছিলেন না। দুর্গা-
ধারের সংসারের সঙ্গে তাই দুঃখের চিন্তা অধারের
সংশয় তখনও নিম্নেই রাখতে হল।

* নিম্নেই ইংল্যান্ডের সারা গ্রামের গুণ

একটা অসহায়ের হাতে পড়—গ্রামের লোক প্রতি
তার নিম্নেই অসহায় অসহায় কর্তৃক লাগল।
কিন্তু নিম্নেই কর্তৃকই ক্রিয়ারে আনবার কোন
প্রতিভাই তার ক্রিয়ারে পারল না। দিনের পর
দিন, মাসের পর মাস মতের মতন নিম্নেই
বিনয়তো অসহায়ের কেটে যাচ্ছে দেখে, ভূতনাথ
ভাঙ্কার অনেক ক্রিয়ারে তাকে ভাঙ্কার বানায়
কাঁধে নিম্নেই কর্তৃক লাগল। কিন্তু কর্তৃক আশান আর
তাকে উত্তীর্ণ কর্তৃক পারল না। গ্রামের সংসার
অসহায় অসহায় তার পায়ে তলায় কেঁবে গুটিয়ে
পড়লেও সে কিংবা ত্যাগ না।

দুর্গাধারের সংসারের সঙ্গে নিম্নেই যেহেতু
সহজ অবশিষ্ট ছিল, তাগাধারতা তাগে বোনামিন
রাখলেন না। অসহায় দুর্গাধারের সত্যন তাগের
কুণ্ডো গুণেই মুছে গিয়ে, বিধাতা তাকে সত্যন
তাগেই দেখাওঁতে পারল। নবীন আগন্তক
এসে দুর্গাধারের সংসারে এতদিন স্থান বসল করে
বসল যে নিম্নেই আটপাথরের মৌল্যভূমি পরিচালনা
কর্তৃক রাখা হল। কারণ যে ঘরের বাইরে সে
এতদিন এত পরিচালনের একজন হয়েছিল, তা সে
অনেকদিন হারিয়েছে। অসহায়ের নবীন
পরও যেহেতু পিঁড়কের বেড়ী নিম্নেই পায়ে
আটকে ছিল, পুত্রের আগমনে দুর্গাধার নিম্নেই
হাতে তাগে কেটে নিজে তাকে মুক্ত করে বিলেন।
গোয়া হরিণ ছানার মত মুক্তি পেলেও নিম্নেই মুক্ত
বাসারের বাব অসহায় কর্তৃক পারল না,
এতদিনের ক্রিয়ারে বাগ একেবারেই মুছে ফেলা তার
গকে অসহায় হল। সে অসহায় হয়ে, ভূতনাথ
ভাঙ্কারের বাড়িতে আসল মিল। মাহেশ্বর মনে
চিরদিন কিছুই বানা বৈধে থাকে না। শোক মুখ
পাঠাতে পারেন মত, এক কর্তৃক অসহায়—অসহায়
তার অসহায়ই চলে যায়। নিম্নেই গ্রামের
কত, সংসারের দুঃখের চাপে পড়ে গেল। মোতের
কুটীর মত সে সংসার তরঙ্গে পা ভাসিয়ে দিল

(৪)

দশ বঙ্গের কেটে গিয়েছে। কর্তৃকীন হতে
অবসর নেওয়ার পর আর আর দাখুয়ের মত
নিম্নায়েও অধিক হুগে দিন কেটে থাকিল। এই
দশের সারা বিধে সবসময়ই দাড়ি পড়ে গেল।
এক সেট এগোয়াশবাকী উত্তরকার চেই দশন
দাববপুত্রের ওপর দিহেও চলে গেল, তখন নিম্নায়ে
এগোয়া হুগেই সেই বিজয়ক-রয়ে হেগে উঠল,
তার এতদিনের বধির অবশ তার জনবগভীর হু-
গে গেল —

“করী তোমার বর্ষের ডাক

পড়েছে আর কোরে

অসল লখা ছেড়ে আবার

হাঁড়াত পায়ের পরে।

হুগে তোমার অমৃত হাঁড়ীর

মত বিজয় বঙ্গে

আত্মনিয়া উঠুক আগার,

বক উঠুক হুগে।”

সে আত্মনিয়া নিম্নায়ে এগে একটা বিপ্লবের
স্বীকৃতি করে ছিল। যে শক্তি এতদিন সংস্কারের নির্ধন
আবারে হুগের মাগে ভাঙে গিয়ে ছিল, সেই শক্তি
কর হিরাট্ট ল্পর্শে হুগে সবসময়ে ছুটে গেল,—
নিম্নাই আবার কর্তৃকেনে কাশিরে পড়ল।

এগোয়া দাড়া এতদিন নিম্নায়ে আছে বিনা হুগে
তখন হাতে টাকানিরে এগেচল তারা কিন্তু নিম্নাইয়ের
এই নবীন উত্তর বিশেষ শ্রোতির চক্রে বেগল না ; বহু
আবী অবসল আশকার ভাঙে বাধা বিগেই হাঁড়ান।
দুর্ভিক্ষ নিম্নাইকে অচির অগাধারে কেউ কোন
বিনাই কর্তৃকচ্যাক করত পারে নি। এখন সে এগোয়া
তত্ত্বানবাবী অমৃতবধের কাছে কোন সহস্রভূক্তিও
গেল না এখন বাধা প্রাপ্ত এতক শ্রোতের মত তার
পতিকে ছুটিরে নিরে গেল তাগের বিকে, দাড়া
বিজয়বুদ্ধির খালাবানীতে দহনীয় বৃক হতে দিন দিন
বহু হতে চলেছে। হুগোয়ার অস্তিত্ত পরিজনে

নিম্নাই এগোয়া নীন, দহির পতিতবহর মন আশবলে
আশবিত্ত করে, তাগের প্রাণের মতা গাধের
হুগুস তাগিরে হুগুস—বিগেট্ট হুগের বহাবহে—
‘হেগা—তাগ—কেত—বাগা’।

দাড়া পতিত অশুভ, দাড়া নীনহীন পনের কাশান,
দাড়া নিম্নায়ে আত্মনিয়া লকলের দাশান
হুগে, এতখানি উদারতা এগোয়াশীর ছিল না। অহু-
গেট তাগের এই আত্মনিয়ের মূলক্ষেত্র কহুতে
এগোয়াশীর বাগ চলে উঠল। নিম্নাই অকল
কল না। সে সমান অধে এট মন বহের দীকা
বান করত লাগল। দলে দলে বাগক, মূল, শিতা
মাতার শান উপেক্ষা করে, নিম্নায়ে তাগে হুগে
অসুতে লাগল। দীন, দহিরের মূলে দাশি হুগে
বেগল। অগের লজান তাগা পেগেছে। হুগের
লন, বাহুগের অধিবাব নিম্নাই তাগের চিনিরে
বিগেছে। বিগুগ উগাগে তাগা দলে দলে নিম্নায়ে
দল বাড়াতে লাগল।

দুর্ভিক্ষক নিম্নাই আশ বিজয়ীর বেগে
তাগের লজান পাগে বেগে, এগোয়াশীর অশবাবি
হুগে। অনেক দুর্ভিক্ষকর পর, এগোয়া মন অত
মাতল্লি মিলে কলিকাতা বাগী কনিবাবের বিকট
গিরে দলল বহা বগে নিম্নায়ে সমার প্রাণনা
করল। কনিবাব তাগের আশ্রয় করে বিগার
দিয়েল।

(৫)

দেগিন ‘গাধী পুগা’। বহুপতিত নিম্নাইয়ের
দল বাগাবের বেগে হোরে হুগা দিগে পড়েছিল,
অতঃ সেইবিনতির মত বিগেট্ট তাগার বেগা কেনা
বক হুগে। হুগাবান ভগেন নিম্নায়ে এই বহে-
নোহা বিগোবাগের বহা একজন এগান বক্তি।
এর কাগেগ একট ছিল। অনব, তাঁর প্রেগিগেট
গকাগেগের লন এগিগি বিগেগ লজান।

দীন হুগে গগতবোবিনীর দাড়ি কনিবাব
দহকার হরে পড়ল। তিনি বানীকে সে কথা বসুতে

দুর্গাবাস নিরীক ভিত্তে ভারতীয় সন্নিবেশে বোঝানো
 নিয়ে একজোড়া বিলাসী নাকী কিনি রাখার এসে
 হাড়তেই ছেলের চল ভীক্রে বিস্তারিত কাপড়
 কোরত 'হস্তে কাপড় নিমিত্ত, কতই লাগল।
 তিনি জ্ঞান করলেন না। তাঁকে চলে
 যেতে দেখে ছেলেরা তাঁর পাখের তলায় বৃত্ত
 পেতে বিড়ে শুভে পড়ল, দুর্গাবাস তাদের চোখ
 রাখিয়ে বদল দিয়ে উঠলেন। দুর্গাবাসের ভাব-
 গতিক দেখে ছেলেরা এখন হঠাৎ হাতে পড়েছে,
 তখন নিমাই সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে সমস্ত
 ব্যাপার শুনে, দুর্গাবাসের সুস্থে দিয়ে নিমিত্ত
 করে বলল, "দাদা, তুমি বিলাসী কাপড় কিনেছ।"

দুর্গাবাস অত্যন্ত কষ্টেরে বললেন "হাঁ, কিনেছি
 —তা হবে কি! দেখ নিমাই ভেঁপোদি করিল
 নে—পথ ছাড়।" দুর্গাবাস কথেকখন অগ্রগত হতে
 —নিমাই তাঁর কাপড় শুভ হাতখানা চলে করে
 বাস্পকৃত্ত করে বলল "দাদা—আর আমার ভিক্ষে
 হাও—"

"কি এতবড় আশ্চর্য, আমার হাত
 কোর কাপড় ছিনিয়ে নিতে চান। আমারই
 দেখে দাদু, আর আমারই ওপর জুলুম!
 হাড়ত—তোমার তের ডাকড" কাপড় জোড়াটা
 রাখার ওপর টান নিয়ে কলে, দুর্গাবাস রাগে
 কাপড়ে কাপড়ে বাড়ীর দিকে চলে গেলেন।
 ছেলের চল তাঁর ভাবগতিক দেখে স্তম্ভিত হয়ে
 থাকিতে রইল।

(৬)

পরদিন সকালে উঠে নিমাই ডাক্তার খানার
 কাজকর্ম শেষ করে, তার প্রেতশ্রী চটকা জুলে
 বসে ছেলের কাছ শিখাঙ্কিত। হঠাৎ বাইরে
 গোলমাল শুনে সে ডাক্তার বিকে তাকিয়ে দেখল,
 একজন বারোপা দাঁতিন জন কনেটল নিয়ে
 ফুলের বিকেই এসিয়ে আসছে। পুলিশ দেখে
 নিশাই বাইরে যেখানে এসে ব্যাপার কি জানবার

জন্য বারোপাকে জিজ্ঞাসা করল; কিন্তু বারোপা
 তার জন্য উত্তর না দিয়ে একজন কনেটলকে
 নিমাইকে হাতে হাতকড়ি পরাতে জুলুম দিয়ে
 বললেন, "তোমার নামে ওয়ারেন্ট আছে।" বিস্মিত
 নিমাই তারপর জিজ্ঞাসা করায় বারোপা বলল,
 "বারোপার হস্তের কাপ বেআইনি জুলুম দখল-
 দত্তি করেছে, লোকের ইচ্ছাঃ বরা বিবেক।"

"কর ওপর জুলুম করেছে—বারোপা বাবু?"

"দুর্গাবাস বাবু ওপর।"

বারোপার ন্যায় নিমাই স্তম্ভিত হয়ে অশ্রুপূর্ণ
 থাকিতে রইল। আর তার দ্বিধার জন্য যখন
 পড়ল। নিজের অজান্তায়ই নিমাইয়ের দুই
 চোখ দিয়ে বঃ তার করে খানিকটা অশ্রু পড়ে
 তার বক দিত্ত করে দিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই
 সে নিজের দুর্গবাস দেখে লক্ষ্য হতে, দুর্গবাস
 প্রাপকে কঠোর শাস্তি করল। তার দুর্গ-
 লতা দেখলে তার কথারা যে শক্তিমান হয়ে পড়বে!
 সে প্রাণান্তভাবে সবাইকে ভেঙে তার এই পুণ্য
 অভিযানের কারণ বুঝিয়ে দিয়ে তাদের বিরক্তাবে
 কর্তৃক্রেতে চলেতে আবেশ দিল। তারপর অবৈ-
 চলিত করে বারোপা বাবুকে সত্যবাদন করে বলল,
 "জুলুম বারোপা মাফের, আর যেহী করে লাভ নেই—
 অনেকটা পথ যেতে হবে।"

বারোপা কনেটলদের নিমাইকে খানার নিয়ে
 যেতে জুলুম দিয়ে, বোকা ছুটে দুর্গাবাস বাবুর
 বাড়ীর দিকে চলে গেল। আর সেই বিগ্রহের
 যৌর মাগার করে অন্যায়ী নিমাই—সাধারণ চোর
 ডাকাতের মত তার ফ্রোশ প্রবর্তী খানার বিকে
 পা গাঙ্গিয়ে দিল।

নিমাইয়ের ভক্তরা তার সঙ্গে সবে প্রাণের শেষ
 নীমা পর্যন্ত এল। নিমাই তাদের কীরে যেতে বলল।
 কিন্তু তারা কিরণ না, নিশ্চয় পাখেরে বুজির বত
 দেইখানে থাকিতে প্রবর্তী মুখের অজান্তে পথ
 বেধতে লাগল। দীর্ঘে দীর্ঘে নিমাই তাদের বুজির

অজ্ঞানে চলে গেল। কিন্তু তখনও তারা সেইখানে
বসন্তের মত ঝড়ের নিদ্রাবের বস্ত্রবস্তীর গানের
স্বর শুনেত পাচ্ছিল—

‘যাহ যাবে জীবন চলে।
তুণ শেখের দ্বারে তোমার কাজে,
বন্দেবাস্তবন—বনে।’

দৃষ্টি-লাভ

(ঐশ্বর্যবোধ নাশেরে বন্দোবাস্তবায় এম এ, বি এল)

হুয়ার হুতৌরু আগে তুলিবার তরে
হুতৌরু লগ যথা হুয়ারই আশ্রয়,
শান্তি আগে তেমনি গো এককাল ধরে’
শান্তিহীন লোকালয়ে বিবিধ আগর ;
আলু পেল বুঝা কাজে, শুধু বুঝা আগে
বাড়িয়া চলিল গুলু ছপছের কত,
অপেক্ষে বুঝি গায় কি মুদ্র বিখ্যানে

জীবন-বাড়ার সুখে অজ্ঞানের মত
চলেছি ধ্বংসের পানে ; কলশা তোমার
অকলশ নিমাক্ষণ মত্ততলে আঁধি’
সঙ্গা সড়িল ধ্বংস মত্তকে ‘আবার
তখনই পে’, দ্বারমুখ, আঁধি মনে ভাবি’
গৃহ ছাড়ি’ পশ্চিম কাননের তলে ;
আগমনের দাঁতলায় ও পদ কলশে।

সদাশিবের দণ্ডুর

(২)

বন্ধন

(ঐশ্বর্যবোধশব্দে বোধ এম, বি, এ, সি, লভন)

বান্দীর শান্তি ঠাকুরানীরা আনাইকে
‘কড়ি দিয়া কিনিয়া কড়ি দিয়া বিবিধ’ থাকেন।
এ কোন্ বোধে বান্দন ? সোকে দড়ি দিয়া
ছাপল, সর্কই বাধে। কড়ি ছাড়া জনতে
বিবিধার সামগ্রী আরও অনেক আছে, তবু
সোকা সোকে ঐ কড়ি বিবাই বিবিধে চাষ।
এ পাণ সোমারে সর্কগেই বান্দন আছে, বান্দন
কেষ্টই নহে। কড় জনতে বাধ্যকরণ প্রকৃতি
বান্দন আছে। জননী মঠের অস্ত্রায় বোধে জীব
নাড়ীর বান্দনে থাকে। সাপের যোনা আগে

বান্দন বোধ, পরে চিকিৎসা আরম্ভ করে। চোখে
বধ বন্ধন, আর বন্ধন বিধা থাকে। দৈনিক পোষাক
পরিচা বোধের বন্ধ বিধা শ্রমীরসঙ্গে বাধে।
এমন যে ইংরেজ আতি, দাঁতারা বান্দন তার
সুই বকাই করিয়া থাকেন, তাহারও আঁঠোতের
(gentle) বন্ধন আছে। তাহা না হইলে
শক্তিগ জুলাবও এক পেয়ে হঠাৎ সড়িত। এতদূর
যে সলল পুখিরী, চন্দ্র, সূর্য, প্রভ, নক্ষত্র ইত্যাদি
বান্দন আছে, তাহা না থাকিলে তাহার কলহাত
হইয়া ছুটয়া পড়াইত। পাতকে না বা বান্দন তে

মূল ছুট। বাকানোর 'এন' নাই বলিয়া 'গিন্টিও' ও নাই—বাকানো নিষ্কটক। ওয় আনবিলক লইয়া অনেক খোঁচাখুঁচি করে কেন তাহা জানি না। বাহারা করে তাহারা বোধ হয় 'এটিনি ক্রিও পেটান' নাম শুনে নাই, 'বিভা যুবকের' বর্ণনায় বুকে না, 'রোবিন্সন ক্রুসো'র পড়ে নাই, ক্রুসো-চাখিকার গ্রন্থের যে মতলস পঠিত তাহা অল্পই বহু করিতে সমর্থন নয়। বাহারা এই ক্রুসো বহু বহু হস্তানো সমগ্র বর্ণনায় বাক না, তাহারা যে গ্রন্থের ঐকান্তিকতা বুঝিবে তাহা অসম্ভব। গ্রন্থ রক্ষিতে পাঁচওমিহে অগতের বার জানা অংশ একত্র ঐকান্তিকতায়। সৈন্তত্ব নো ভাষ্যের সমগ্রকে নুহন করে বৈধেয়ন। সেময় শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনে নাই এমন লোক কে আছে? এসব বর্ণনায় গ্রন্থের বহনকে লোকে বর্ণ বহন গিন্টিও পরিচয় বিয়া থাকে; তার কারণ বর্ণ নখে বাস্তবত অর্থাৎ হইতেছে যাহা বারন করিয়া রাখে। যেখানে যেখানে যে অধিক লোক লোক কোন এক সম্ভব-হায গ্রন্থে পরিগণিত হইয়াছে সেই বাকনই গিন্টিও যে বর্ণ বহন তাহার মূল। গৌণবিক ইতিকথা হইতে যেখিত পাওয়া যায় যে বাকন বর্ণের গতি বহিতে, ফেরন তাবের পাশকে মধ্য পাশ বলে গণ্য করা হ'ত। আর সে সব শব্দের গ্রাহকিত ছিল গ্রাম্যবৃত্ত। বৃত্ত বিগ্রহের কারণ অনেক স্থলেই বর্ণ লইয়া। লোকে বলে যে গিন্টিও বিগ্রহের প্রধান যে দুই মতবাদ টোটার ঐ বৃত্ত। পাণ্ডো-টাইনের বহুবৃত্ত (crusades) বর্ণ লইয়া। দীত জীঃ বর্ণের গনি করিয়াছিলেন লোকে এই বিখ্য। করিয়া তাহাকে ক্রুস বিজ্ঞ করিয়াছিল। মূলমত-বিশেষ বিলাকৎ অ্যাকাশন বর্ণের মত।

বাকানোর মত কাহাও সমগ্র বহন বৃত্ত মত। বাকানোর মত কেবল বর্ণের এতটা আগ্রহের মত বহিয়া থাকে না। অমায়ের নামে বর্ণ, অ্যানে বর্ণ, স্রাঙ্ক বর্ণ, বিখ্যে বর্ণ, পাঙ্কি ডোহনে বর্ণ—

মূল বর্ণের মত। পনের ঐ বৃত্ত পুঁতিয়ে বর্ণ, পুস্তক বহন করিবে মত, বাকানোর বর্ণ। পুস্তক-মত পুঁতি শাবনী, শিবদ ও বৃত্তি বৈধেয়ন লোকে। যেবতার নাম করিয়া বহন করিলে পুণ্য হয়। পক্ষী পুণি তাহাও পুণ্যের কত। পুণ্যায় দিনে জমীনাতির কও আদায় করি, বাঙা, ওইতে বিধেয়ন হইয়া। তাহুও বৈধেয়ন নামে ডেলে-ডেলে-বের নাম রাখি। চক্রে বৃত্তি আদায়বের বৈধেয়ন, গ্রন্থের সমগ্র জানন করিলে অকর বর্ণ ও আদায় বের বাণো। বর্ণের-জন যার শিবগি আদায় তাহাকে একবার করি, তাহাকে সম্রাজের বাহির করিয়া বিজ। শ্রীকৃষ্ণের সম্রাজত্বনে: যে সকল শিবন করিয়া গিন্টিও, যে কোন ব্যক্তি তাহা অংকোণ করিলে আদায় তাহাওই সমগ্র হইতে পুণ্য করিয়া বিজ। শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থের মধ্যে যে জাইটে বিলাস করে না সমগ্র তাহাকে উৎখাত করিতে ক্রী করে না। সোক্রাট (Socrates) লোকের মত বিলাস পরিবর্তন করিয়াই গিয়া গ্রন্থে হারাইয়াছেন। মত সমগ্র ব্যাখ্যার নাম আদায় শুনা যায়, যে সকল হতা বিলাস গ্রন্থ করিলে আদায় পোষিত শুভ হইয়া আসিলে। বহু বর্ণ দিয়া সমগ্র বহন থাকে তাই; কিন্তু বৈধেয়নের অজ্ঞাতে সম্রাজের বহন হইলে তাহা কখনও বৈধেয়ন কশাপগ্রন্থ হয় না। বাক হটক যদি আদায় আদায়বের বহু-বাক্যের কান বহন থাকে তবে সে বর্ণ বহন অগ্র বহন উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহা বহু বোঝায় না। এ পোড়া বিলাস পতাকীতে মত, বহু: ও তাই বহিতেই বহু, কিন্তু লোকই আন আন লোকে জোলা মাঝ। আন মতপক্ষে নিম্ন হইয়া, ক্রী আদায় লোক সমগ্র হইতে অগ্র বিলাস করবে, বাকাইয়া বৈধেয়ন হইবে ও বাকি ও বাকি পূর্ণ গিন্টিও বহিবে; হাও বাকাইয়া হুণ্ডের জেই করা আদায়। বহন অগতের গতিই নয়। আদায়

যে সঙ্গে নিম্ন হুই নাই, তারকে কখনেও
নোত বেখাইবে। মনুষ্য ভিন্নতার জ্ঞান হুই
কখনেও মনুষ্য। মনুষ্যত্ব। ভগ্নতের শিরস মধ্যে
শক্তি পুষ্টি। ভাঙতে শক্তি ছাড়াইয়া বিদ্য। মনুষ্য
বিনা। বহুত বেখাই খাওেন। কেন মনুষ্য। এ
কোনো পুষ্টি। তুমি কখনে ইচ্ছা। এ সকল
করিতে প্রকৃত হইছে। ভোমারও কি কের
জ্ঞান আছে না কি? অথবা তুমি জানে। কের
বলে যে ভোমার উপরভোগার ভিত্তিতে তুমি
সকল কাহ। করিয়া থাক। তুমি নিষ্ঠাকার
চৈতন্য বসন, আবার কের বলে যে তুমি
পরমাণুগণে ভক্ত ভগ্নত। ভক্তই বহু আর
চৈতন্যই বহু। এ দুয়েতেই শক্তি আছে নানি;
হরের ভিতর পার্থক্য পেরাণার ভিতর আর বাহিরে
যে পার্থক্য। কিন্তু বিনিমি ইচ্ছা হউন তিনি
শক্তিই হউন আর ভক্তই হউন, তাঁহার জ্ঞান নাই
তাঁর আত্ম নাই এ কথা বস্তুতে বাহ। তিনি
জুগেও আছেন আবার জুগেও আছেন, মনুষ্যেরও

আছেন, আবার বিপদেরও আছেন। মনুষ্যের
তিনি কি জুগের করিয়া স্থিতি করিতে পারেন না।
মনুষ্যের জুগে স্থিতি করিয়া মনুষ্যের কি ছিল।
মনুষ্যের স্থিতি বহু—ইচ্ছারও আশ্রয় কি।
মনুষ্যের মনুষ্য স্থিতি বহু। কোন কর্তৃত্ব করিতে
না পারিলে মনুষ্য করিতে অসমর্থ বহু না, তখন
মিষ্টানুভাষী ইচ্ছা ইচ্ছা করিয়া আবাদিগণকে
পক্ষে নিম্ন করেন, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রকৃত প্রকৃতি
বাহিতে আগতি করেন, ইচ্ছা কেন শোক বিখ্যাস
করিয়ে। যে মনুষ্যের নাথ। বহু তুমি কবি বর্ষিত
বহুই মনুষ্য শক্তিমান বহু, তবে যে শক্তিতে মনুষ্য
যোর পরমাণুতে পরমাণুতে বাহিয়া এই জুগে
মনুষ্য মানবের স্থিতি করিয়াছে তাহা কাটিয়া বাহ
আবাদিগণের বেহাউ মনুষ্যবর্ষ মনুষ্য অসংখ্য
বাণীকরণে পরিণত হউক। ভোমার মনুষ্য নইয়া
তুমি হইয়া থাক, আবার নিষ্ঠিত হই—আবাদিগণের
সকল বাহন ছুটিয়া যাক।

অজ্ঞতা

(সংলাপিত)

আমি ত তাই তোমাদিক
বলিছিলাম তুমি,
লোকস ভেলে ১২ না রে তাই—
হুই না সত্যি দেখেন।
হাসির কথা বলো কানে,
বুনিয় বিয়ে চোপ খোলাতে,
পাণ্ডায়ে চার কেনন করে
ধন্যবে বল লজ্জা।

২

উপহাসের হাত কেন
উঠবে না এ হলো,
১২ বয়েসের পল বান
আটলে পাতার পলটে।
হবে পলক বাহান পেরে
মকুতে এনে তাবের লাবে,

দুখলে না ত লইবে না সে
পলক বাহানের কাঁহুনা
আমি ত তাই তোমাদিক
বলিছিলাম তুমি।
৩
৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩ তোপে
মৌলিহিদের আসরে,
স্বপ্নে পোকা কর্তা হলো
পেট ভরে সব হাস রে।
চেননা কেল, চোমুনা চিত্তে
লবীম্বয়ে এলেন বেতে
আমের যে বজা করেন
তোমরা ত তা দেখনি।
আমি ত তাই তোমাদিক
বলিছিলাম তুমি।

পড়িচ্ছে যে, কোনওরূপ স্বাধীনতা—বিকাশের
অবকাশ আর দেখানো নাই। সে অসীমতা—বাহিরের
অসীমতা নহে, সে অসীমতা—হিন্দু জাতির পুঙ্খ
পশ্চাদ্ভাবিত শাস্ত্রাচারের অসীমতা, সে অসীমতা—
হিন্দু জাতির সমাজবিশিষ্ট অসীমতা। শাস্ত্রের শাসন
ও সমাজের বিধান, এ দুয়ের দ্বারা পড়িয়া হিন্দুজাতি
এ ‘অস্বাভাৱী’ একেবারে কুণিগা ঘাইয়েই
বসিয়াছে যে, যে মানুষ, মানুষ: মত তাহারও
একটা অস্তিত্বের আঁকে, ভাল মন্দ কর্তব্যাকর্তব্য
বিচারের ক্ষমতা আছে, মানুষেরই মত তাহারও
স্বাধীনতা আছে স্বাধীন ভাবে চলিবার সাধনা আছে;
মানুষের মত সেও একটা সন্তান বস্তু, অশেষের হস্তের
জ্যোতিঃস্মৃতি, অথবা ঈশ্বরের সন্তান: পরিচালিত
ভুক্ত শাস্ত্র: তার জীবন বহন করিবার ভারই তাহার
কক্ষ নহে? সে একবারটা একেবারেই কুণিগা
গিয়াছে যে অশেষের হস্ত: নিবন্ধেও কিছু
ক’বার আছে? সে কোন হস্ত:র সকল কর্তব্য
দ্বারা বদ্ধ এখানে: বস পূর্ণ হইতে: নির্ধিত আছে,
তার এক চুল এবিধ চরিত্র ক’বার অতিক্রম
তাগর নাই তাহাও অশা: বাস্তব: ধারণ
তাগোশাস্ত্র পূর্ণিত: নির্ধিত, সে হস্ত:র মধ্য বিধাই
তাগকে বলিতে হইবে কোনওরূপ সূত্র অশা:
অতিক্রম তাগর স্তকে নির্ধিত। তাহার স্ত
তাগর জীবনের সমাজগণে বাহা নির্ধিত করিবার,
শাস্ত্র:নির্ধিত প্রণালীতে তাহাকে সে লক্ষ্যেই গমন
করিতে হইবে। শাস্ত্রের শাসন ও সমাজের বিধান
অতিক্রম পন্থা তাহা: শাস্ত্র: বিনের বাস্তব: নির্ধিত।
এই যে অস্ত্রের অসীমতা, ইং দর্শন:র বসিয়া
হিন্দু জাতির মনোর উপর আঘাত: করায় তাগর
এক অস্বাভাৱী হইয়াছে যে কোনওরূপ স্বাধীন চিন্তাই
আর দেখানো হান লাভ করিতে পারিতেছে না।
আগারের বিচারে আচারে ব্যবহারে শাস্ত্র:সমাজের
শাসন কর্তব্য যে জাতি আপনাদের স্বাধীন পন্থার
কথা একেবারেই কুণিগা গিয়াছে, তাহা ও ক’কে,

অস্ত্রের ও বাহিরের স্বাধীনতাই যে একবার তাহার
প্রাণ বহু তাহা বসাই বাহিন্য।

এখন দেখা যাউক মতাই কি ভারতের হিন্দু
জাতি অস্ত্রের: এই স্বাধীনতার মধ্যেই চিত্তবিন: প্রতি-
শাসিত হইয়া আঁকাইছে? আর এই যে শাস্ত্রের
শাসন ও সমাজের বিধান ইহা:কে কি সে চিত্তবিন:ই
স্বাধীনতার সাধনা:র স্তকে ক’কে ধারণ করিয়াছে?
নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে কোন ক্ষণেই একথা
সত্য বসিয়া বিবেচিত হই না।

ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র: দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে
পাই স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভেই জীবনের
মুক্তি, এ ইগার সাধনাই জ্ঞে: সাধনা:র সত্য শাস্ত্র:
ও পণ্ডিতগণ: এই মুক্তির পথেই জীবন:ক পরিচালিত
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। “পূর্ণ বহুবিনমু:জা:
পন্থ: পন্থ: সাধন:” ইহাই যে, শাস্ত্রের শেষ কথা
সে শাস্ত্র: কাগরও অস্ত্রের স্বাধীনতা বুদ্ধির সাধনতা
করিবারে, একথা বিধান করিতে প্রবৃত্তি হই না।
আর হিন্দু জাতি শাস্ত্রের: শাসন বাস্তব: করিয়া চলিয়া
আগিলেও, স্বাধীনতা বা কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধির তাগর
বিচার: বুদ্ধি ও অস্ত্র: জ্ঞানোপদেশ: যে কোনও স্থান ছিল
না তাহাও নহে। “বস্তু: ক’না:র সত্য:র সত্য:র
নেতর:” যিনি বীর বিচার: বুদ্ধির বাস্তব: শাস্ত্রের
সাধনতার স্বপ্ন: তহা: অস্বাভাবন: করেন, তিনিই
দর্শন:র স্বাধীনতা অশাস্ত্র:র: (মহা) আচার:
তুষ্টি “সাধন: জ্ঞে:র:” (মহা) বীর অস্ত্রের: অস্বাভাবন:
“বস্তু: প্রিয়বাসন:” (মহা) স্বাধীনতা নির্ধির: এ সত্যের
হান: শাস্ত্র:ক’ই নির্ধিত আছে। ক’না:ই
মানুষ:ক স্বাধীনতার: স্বাধীনতা:র পরিচয়: ক’না:ই
শাস্ত্রের: উদ্দেশ: ইং দর্শন:ক একবারে সত্য: হইতে
পারে?

তবে দর্শন:র পথে হিন্দুজাতি: প্রধানত: শাস্ত্র:

যাকার উপরই নির্ভর করে একথা সত্য, কিন্তু এ অভিব্যক্তি যেমন একমাত্র হিন্দু জাতির উপরেই যে প্রযোজ্য তাহা নহে, পৃথিবীর সকল জাতিই আপন আপন ধর্ম সাধনার নিষেধ নিষেধ শাস্ত্র বা মতামতবশত স্বাধীন নির্বোধ অনুসারেই বলিষ্ঠ থাকে। তবে সে সকল জাতির মধ্যে ক্ষেত্র কিছু সীমিত; উপসর্গ বা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেই প্রাধান্য তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্র একত্র সে সকল অনুষ্ঠানেই তাঁহাদের শাস্ত্রের আনুগত্য লক্ষিত হয়। বাহিরের আচারে বা-বাহিরে তাঁহারা একরূপ স্বাধীনই থাকিয়া যান। হিন্দু জাতির মধ্যে ধারণা ইহা হইতে একটু ব্যাপক, আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া আহার বিহার আচার ব্যবহার এ সকলই তাহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, এরূপ সকল বিষয়েই তাহাকে যথেষ্ট শাসন মানিয়া চলিতে হয়। কাহ্নেই হিন্দুর বিকে ধৃষ্ট করিলে তাহার সামাজিক শাস্ত্রানুগত্য বেশ সঙ্গতিপূর্ণই সকলের ধৃষ্ট আচরণ করে অন্য জাতির সেক্ষণ করে না, এইটুকুই তথ্য।

স্বাধীনতার আদর্শ সত্যে অভ্যস্ত জাতির ধারণা বাহ্যিক আনুগত্য এভাবে হিন্দুর ধারণা একটু 'যত্ন'। অপরকে আপনায় অধীন করিলে অর্থাৎ আপনাকে অস্ত-নিরপেক্ষ করিয়া পক্ষি তুলিতে পারিলেই যে স্বাধীনতা লাভ হয় এভাবে হিন্দুর নাই। হিন্দু বলে—“ব পশ্চের অর্থ আত্মা” “ব” এর অধীন, আত্মার অধীন, ইহাই স্বাধীন পশ্চের অর্থ; অর্থাৎ অস্ত তত্ত্বের অধীন না হইয়া মানুষের যে যেমন আত্মার অধীনতা অর্থহীন, তাহাইই নান স্বাধীনতা। কথটা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক।

মানুষ বস্তুতঃই আত্মশক্তি প্রাণ। মানুষের মধ্যে বাহিরের যে সকল শক্তি ক্রিয়া করে, তাহের যে সকল কারণ উঠে, তাহার উপর আধিপত্য করার, সেজন্যকে যথোচ্ছায়ে নিয়ন্ত্রিত করার সামর্থ্য মানুষের আছে। মানুষ যদি যথোচিত ভাবে

আত্মশক্তির অন্তর্নিহীন না করে, তাহা হইলে, তাহার আত্মা বস্তুতঃই দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন আর সে সকল ক্রিয়া বা তাহের উপর আধিপত্য করার সামর্থ্য তাহার থাকে না। সে সকলের উপর আধিপত্য করা তাহার কপা পকারের তখন সে সকলেই যাহা আত্মা নিজেই লজ্জিত হইয়া থাকে। মানুষের আত্মশক্তি বহুবিধ অনুষ্ঠান বা অধ্যাত্মিক থাকে, তাহা নিজেই তাহাকে স্বাধীন বলা যায়। আর সে অধ্যাত্মিক সে যে সকল জিন্স করে তাহাই স্বাধীন জিন্স বলিয়া বলা হইতে পারে। অধ্যাত্মিক জিন্স, জিন্স ক্রিয়া, যে সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করি, অদ্বৈত বনে করি সে সকল আত্মা স্বাধীনতাবেই করিতেছি, কিন্তু একটু অভিনিবেশ সংকারে জিন্স করিলে দেখা যায় তাহার মধ্যে পের স্বাধীনতা আনন্দের অঙ্গই আছে।

মানুষের শক্তি, সংসর্গ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবেশন, এগুলোর দ্বারা মানুষের মধ্যে যে সকল শক্তির সঞ্চারিত হয়, সাধারণতঃ মানুষের অস্ত-করণ, তাহার দ্বারা অস্তিত্ব হইয়া থাকে। সেজন্য অস্ত-করণে সে সকল জিন্স তাবনা বিচার বিতর্কের আবির্ভাব হয়, যে সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য বাট, সে সকল সেই লক্ষিত সংস্কার বাণীই অনুষ্ঠান। অতঃ-সে ক্ষেত্রে আপনায় স্বাধীন শক্তির প্রাণের কারণ তাহার উপর আধিপত্য করিতে পারে না, আর আত্ম-শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারেনা বলিয়া, অস্ত-করণ ও সেগুলির সংস্কারের উচ্চ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্বাধীনতাবে জিন্স, তাবনা, বিচার বিতর্ক কোনরূপ ক্রিয়াই অনুষ্ঠান করিতে পারে না; সে যাহা করে, যাহা ভাবে, শুধুই বোঝে, সেগুলিই তাহার লক্ষিত সংস্কারের অধ্যাত্মিক। তাহাইই অনু-করণে সম্পন্ন হয়। এ দ্বারা মানুষের আত্মা সেই লক্ষিত সংস্কারে বাণীর মধ্যে আপনাকে এইরূপে হারাষ্ট্রা করে যে তখন উৎসাহে যাহা তার তাহার পূর্ণক সত্তা খুলিয়া পাওয়া যায় না। তাহাই “ব”

নির্জাচারে শাস্ত্রাচারে অল্পসম্পন্ন করিয়াই যে
 হিন্দুত্বাতি আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিয়াছে
 একথাও সন্দেহ নহে। কারণ নিম্নোক্ত অল্প
 সংখ্যক আভ্যন্তরিক স্বাধীনতার উপরে যাত্রী হইয়া
 গিয়াছে। আর শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা ভঙ্গির অ-
 লোচনা করিলে যেখা যায়, সে সকলের একমাত্র লক্ষ্য
 হইতেছে, শাস্ত্রের আত্মাকে পূর্জীভূতরূপে স্বাধীন
 করিয়া তোলা। যদি একথা সত্য হয় তবে
 অন্তরের স্বাধীনতার উপরই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা।
 শাস্ত্রের অন্তরে লুপ্ত যে পরিমাণে স্বাধীনতা লুপ্ত
 করিতে থাকে, তাহার বহিরের স্বাধীনতাও ঠিক
 সেই পরিমাণেই শিথিল হয়। সেজন্য শাস্ত্র এই
 আভ্যন্তরিক স্বাধীনতাকেই উৎসাহ করিতে চেষ্টা
 করিয়াছেন। ইহাই হইল শাস্ত্রের সচিব স্বাধীন-
 তার সন্ধক।

উপরে যে স্বাধীনতার কথা বলা হইল তাহাই
 হিন্দুত্বাতির স্বাধীনতার চরম আদর্শ নহে। হিন্দু
 স্বাধীনতার চরম আদর্শ ইহাও একটু উপরে।
 সে অবস্থার আত্মা আপনাকে আপনাই পরিপূর্ণ,
 তখন কেহই তাহাকে অধীন করে না, সেও কাহাকে
 অধীন করে না, সুগম্য প্রাকৃতিক স্বাধীনতার কোন
 কিছুই সহিত তাহার সন্ধক থাকে না—সে এক
 অচিন্তনীয় অনাবিল অব্যবহিত অবস্থা। ইহাই
 হিন্দু স্বাধীনতার চরম আদর্শ—হিন্দু সাধনার চরম
 সিদ্ধি—ইহাই হিন্দুর স্বাধীনতা। কিন্তু সে স্বাধীনতার
 সহিত বাহ্যাত্মিক জীবনের সন্ধক নাই বলিয়া—
 বাহ্যাত্মিক গুণতে হিন্দুর বৈরাগ্য স্বাধীনতা, তাহাই
 উপরে প্রেরণ করিয়া দেয়া হইয়াছে।

বিজয়া

(প্রীতিগাথার)

“কি কি বিজয়া ?

ঐ যে গাভিছে ঘুরে মানাঘের ঘুর
 সাজায়ে বরণ ডালি পরিয়া সিন্দূর
 নব রক্তাধর বালে, পরি নব বেশ—
 —এল কত পুষ্পালা—অর্চনার বেশ,—
 বাজায়ে মঙ্গল শব্দ, ‘রক্তারি’ কল্লণ,—
 বিজয়ার কোলাহলি প্রেম আনন্দন !
 এল যে বিজয়া ।
 তরে রিক্ত সজ্জাভা তোর চাহ বিদা !

“এ আনন্দে নারি মোর ভাগ !

আদি অভাগিনী মোর বর্ষ অশ্রুগণ !
 এই মানাঘের ঘুরে এই গাভিগণে
 এই ঘেহ আনন্দনে পূর্ণ-সুখ-ভোগে
 এই কল্লণি হুয়ে অস্ত্রের শাব্য—
 —সাজায়ে ঘোরতর ঘাট, কেন তাকো হাট !
 রহিব অধীর কোরে লুপ্ত-মীরাং
 বাজুক বাজনা, বিহু উপলক্ষি সবে !

দস্ত রুচি কোমুদৌ

(ঐতিহ্যবাহুৰ ৱাৰ চৌধুৰী বি, এ)

বাবু ও বালক

বাবু। কি বে হোৱাৰা ! হুল আঁচাওনি
কেন ?

বা। .চিকণী নেই

বাবু। হোৱাৰ নেই—তোমাৰ বাপেৰ
আছে ত।

বা। বাবু হুল সেই ৮

ভয়ৰ্ত্ত আৱেহী ও মাৰি

ওৱে বাবা মাৰি ! চেউৰে প্ৰাপটা

আৰ এই বাকটা পেৰিই, ঠাণ্ডা হৰিনি

তাৰ আগেই ঠাণ্ডা হৰে।

পাদৰি ও মাতালক

পা। (মাথ আৰিষ্ট মাতালকে) ওৱে
জন্মচো—

মা। আৰ মোনা শুনিতে ধৰকাৰ নেই বাবা
—এট নাপ এক মনে।

বাবু ও চাকৰ

বা। ওৱে হৰে ! জলটা এত কালো কেন ?
—কি চেনছিল ?

চা। আপুগা না বহুতা, কিচ্ছুই ভাল
নাই—তবে পে কাগাছাব বাবু হেনা কৌছিল।

বাপ্ৰাণী সাহেব ও বালক

প্ৰাণী-পৰে

বালক। ও ভাই—ছাৰেব আছ'চে। চল
ছআই বেৰি গিৰো—(নিকটে গিৰা) আছ'চে
হবে না—ছাৰেব না, ছাৰেব না—ছেৰেবে।

বিচালয়

আছ'চি মোকদমা।

বি। আমি মানতে চাই Ringleader (দল-
পতি) কে ? নিৰ্গল, তুমি কিছ' কোৱেছিলে ?

নি। আমি ?—না—Sir—আমি ঝাণি
আঁহটা নিৱেহিলুম।

প্ৰত্নতাত্ত্বিক ও খোদাইকাৰক

প্ৰ। এই বে হেল পৰিকায় পড়া বাছে
inscriptionটা। উঃ কত কাল কেটে গেছে
তবুও অক্ষর শুণো ঠিক তেমনই আছে !

খো। (হানখে) —বহুতা, আই ল্যাৰাজ
বুই লেখ'ছিল।

শিক্ষক ও বালক

শ। সবাই মা-বাপেৰ কথা শুনবে।

বা। মাৰ কথা ?—আমি ও শুনি বাবাও
মোনে Sir।

দাশনিক ও স্ত্ৰী

দা। লগৎ দাৰাধৰ—কেউ ক'ৱো নৰ—স্ত্ৰী
পুত্ৰ পৰিবাৰ কিছু নৰ—কেউ নহ।

স্ত্ৰী (সহোখে)। কি আহি কেউ না—আজ্ঞা
লুহ আহি—তুমি হৈবে বেঙে বেঙে।

দা (সচকিত)। আৱে না—না—ও লৰ
কেতাবি—কেতাবি কথা।

কবি ও কেৱণী

ক। (গুহুৰো সুখামনে)—কব কব কৱে
বামল খাটা—বাঃ আৰুকেৰ বিনটো কি সুন্দৰ।

কে। (বৰ্ণমাক পৰে)—উঃ লা—বলে
কি হে।

সিদ্ধি

(গল্প)

(ঐতিহাসিক গল্প)

ঐশ্বর্য শুধু ছবিই অঁকত, আর বিনয়ত ঐ চব্বি কবাই কাঁড়, আর কোনোদিকে তার খোঁজ ছিল না। কাজেই চাল তার ফুটো হয়ে জল পড়ত, কাপড় তার মথলা হ'লো ছিঁড়ে যেত, পেটের ভাত কোনো দিন জুটত, কোনো দিন জুটত না। দশদিকে চোখ না বাঁধলে যে সংসারে সুবিধা করা যায় না, এমন কি ছবিরও যে একটা ভাং-সায়েত দিক আছে, সে জ্ঞান তার আবেগেই ছিল না। কাজেই ছবি তার বিকাত খুবই কম, এবং দাঁড় মিলত না মথলা। খরিদার দাব দিয়ে মনে করত, মধ্য করলুম—কে-ই বা কেনে এমন ছবি পরমা দিয়ে! আর শিল্পী দাব মিথোবাড়—

জলের হয়েও এ সংসারে মাপিক বিক্রার হাফের।

বহুটা বলত, কি ক'র মাথাখুঁত! ওতে কিছু হবে না। হগার হগে কোন্‌ দিন তা হয়ে যেত, আর কিছু কলো। আত্মবোরা মূলত, চাকরী করতে না পারো, সুবিধানার খোঁজান করে—আর কিছু না বোক, পেটের ভাতটাও জুটুক।

ঐশ্বর্য বলত, হাঁ—একটা কিছু করতে হবে বই কি, না কলো আর চলে কই?—কিন্তু ঐ বলা জ্ঞানবীঠ, কাজের বেলায় যে-কে-সেই—বন্ধ বাছবয়েরও পেরন-ফেরা, আর তারও রত্ন আর তুলি নিয়ে বলা। এক কথায় জুতে যেমন বাহুবক পেয়ে বলে, ছবিও তেমনি তাকে আত্মা করে পেয়ে বলেছিল।

মথাই তার আশা বেড়ে নিলে, আশা ছাড়তে পারলে না, শুধু তার স্ত্রী বৈদ্যবতী। সে খৈখা ধরে

এতীকা করে তইল; একটা কিছু ধরে থাকলে একদিন-না-একদিন সুরাধা না হয় বাধ না, এই ভিগ তার বিশ্বাস। খামীর সেবা নিজে সে দিনের পর দিন মাসের পর মাস খুব খুব পড়ে তইল। বহুতো বা জীবনের সবক'টা দিনও অমনি ক'র পড়ে থাকতে পারত; যদি না হঠাৎ একদিন তার মনে হত যে, সে নিরাশ্রয়; ভাত-কাপড়-তো কোনদিন জুটলই না, তার ওপর খামীর যে ভাগ্যপার ওপর নির্ভর করে, সে সংসারে বলা তরৈ পড়ে আছে, সে ভাগ্যপার ভগ্নহীকৃত বৃত্তি আর তার থাকে না।

বশকনে খামীকে যেমন করে পার, সে তো তেমন করে খামীকে কোনো দিনই সাহ মি, তবু অন্ততঃ রাজে বিছানার শুদেরও তাব লগে হুতো সুবহুধের কথা হয়েছে, কিন্তু কিছুদিন ধরে যে দেও একদম বন্ধ। খামীর সবথ ডাকাডাকি ক'র গলা না তুললে ছবির কাছ থেকে উঠে আসে না। তারপর অনিচ্ছায় হুটা বুঝে বিয়েই মাঝে—বই হুট। রাজে উঠে আসে কখন?—বখন চোখ-ভরা খুঁ, আর খেঁ-ভরা জ্ঞাপ্তি, বিছানায় এগে পড়তে-না-পড়তেই বৈদ্য-চাকচৌল পিটলেও আর তাকে জাপাবার জো থাকে না।

ঐশ্বর্য কি করছে-না-ক'র, সে খোঁজ বৈদ্য কোনো দিনই রাখত না। সে প্রতিদিন জোরে খাদ্য খুঁ থেকে ওঠবার আগে একবার করে ছবি-গুলি নেড়ে চেড়ে বাইরের খাখানি ঝাঁট দিয়ে মস্কত। যেদিন কোনো গতিকে ঐশ্বর্যর মনে বৈদ্য বিছানা থেকে ওঠা না হত, সেদিন তার

ওকিৎস বাবার সহকারক হইল না। কেন না, সে জানত, বাবী একবার ছবি নিয়ে এসে কায়ে সাধা নাই যে তাকে এতটুকু মতে দগার। এত দিন তার এ বিশ্বাস ছিল যে, বাবী আছে ছবি নিয়ে—নিজের খোঁজ-খোঁজে, তার কত চিত্রিত কোশে কায়ে নাই। কিন্তু বাবীর ভাবান্তর যেদিন ঘটেছিল তখন তাকে সত্য বলতে হইল, সেদিন আর তার কান নিয়ে সে নিশ্চিত বসে থাকতে পারেনা।

কাজের কীকৈ কীকৈ ছবি ছবি বাবীর খোঁজ িতে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য, জনমানব কেউ নাই তার কাছে; শুধু একবার ছবি আঁক সে মুখোমুখি বলে। 'ঈশ্বরের হাতে রক্তের ছবি; আঁকা এখনো শেষ হয় নি; একবার তুলি দিবে দেখে, আর একবার বড় বাকিয়ে দেবে। কখনো তার মুখে ছবি টুটে ওঠে, কখনো দস্তার হয়ে মাথা নাড়ে, কখনো বা বেঁচে-বিক্র করে কি যে বকে তার ঠিক নাই। যতবার বৈদ্য খোঁজ নিলে, আর নতুন কিছু তার চোখে পড়ল না; সে শুধু বেবলে, বাবীর চে বই ছবি তার মুখের দিকে—আর ছবি চোখ বাবীর মুখের দিকে। এম—শুধুই ছবি—হস্তশিল্পের দিকে তার কোনোই স্পর্শ নাই, তবু তার হাতে একটা দর্শনাত্মিক দীর্ঘাভ তার আগে আগে উঠল, আর সে নিজস্ব অজ্ঞানে অশ্রুতে লাগল।—নিশ্চল, নির্ভীক। পটের আঁকা সামান্য একখানা ছবি, কেমন করে তার বাবীর সমস্ত মন বঁধন করে আছে! আর এত সেবা এত দয় নিয়েও সে জোতের কুপের মতো অশ্রুতে ভেসে চলে কোথাক স্মারক এতটুকু ঠাই পেলো না।

পরদিন বৈদ্য নিজে বসে ঈশ্বরের মুখ তাকবার আগেই বাইরের সেই বখানি বাঁট নিছিন। বাঁট দেখার ইচ্ছা তার ঘোটেই ছিল না। কিন্তু ছবির উপর গান করে বসে কাঁটা না-যেওনাও যে কত বেদে-

দায়ী। তাই সে না এসে থাকতে পারে নি। কিন্তু তাকে তার তার মন ছিল না। রক্তের একটু বাট কাঁচ কাঁচকসুপে পড়ে গেল একবার ছবির উপর। বৈদ্য প্রবণতা আঁকতে উঠলে, কিন্তু তারপরেই অস্বস্তি হয়ে বেবলে, এ সেই নতুন ছবি—বা নিয়ে জীবন্ত কিছুকাল হবে একেবারে উদ্ধৃত হয়ে রয়েছে। ছবিখানা আলোর কালে তুলে থরতেই চোখে পড়ল, একটা দস্তবদ্ধ গান একটা কুচুচ বিকট আকার হাকসের রূপ ধরে যেন ছবির মুখখানাকে গ্রাস করেছে। এতটুকু ছাণির আভাসও কোনো দায় থেকে বেগা থাকে না। বৈদ্যের মুখখানি এটা অজান্তে তুলির ছাপের উদ্ভাস হয়ে উঠল। ঠিক সেই দরত্রে দুই তুলে চাইতেই সে চমকে লাড়ই হয়ে গেল। জীবন্ত তার মুখের দিকে চেয়ে জড় হয়ে পড়িয়ে। তার ই জড়তার মধ্যে যে পড়ায় গুলে ও তিৎকারের ব্যক্তি ছিল, তার আঘাত বৈদ্যের অত্যন্ত বিচলিত করে তুলল, কশিওরতে ছবিটি মাটিতে নামিয়ে রেখে সে বসবার চেষ্টা করলে, কাঁচ হয়ে গেছে—রক্তের বাট হাত থেকে পড়ে পড়ে।

ঈশ্বর ছবির মুখে মাটিতে বসে পড়ে কললে, কি সর্জননা যে তুমি আমার করেছে, সে তোমাকে আমি বলের ঘোঁড়াতে পাঠাব না।

তু! অত বিস্ময়পূর্ণ করে বৈদ্য কললে, সামান্য একখানা ছবি!

সামান্য!—কোথেকে অতিমানুষ ঈশ্বরের কঠোর কড় হয়ে গেল। কিছুকাল জড় হয়ে থেকে সে বললে, তুমি থাকে বলল সামান্য, সে সামান্য কাছে অনুগ্রহ—এখন কি, আগের চেয়েও বেশি দায়বদ্ধ নিমিত্ত, তা জান?

একটু নমন হয়ে বৈদ্য কললে, কিন্তু তুমি কি ইচ্ছা করলেই আর একখানা ছবি আঁকতে পারো না—ঠিক এমনি দায়?

উত্তেজিতভাবে জীবন্ত কললে, না—পারি নে।

এক একখানা তাঁস ছবির চক্রে যে প্রাণের
কতখানিরক বার করে বিতে হয়, সে আমিই
জানি। বাথো, আর থেকে তোমাকে আমি
মানা করে দিছি—মাঝার ছবির পর খাঁট
বিতে। বিতে হয় খাঁট—আমিই দিবে নাব—যখন
হয়। ছবির ওপর বার এতটুকু সমতা-বাণ নেই,
তাকে তো আমি আমার ছবির পরে চুকতে বিতে
পারিনে।

হৃৎকর্তে হৈমর মনটা মোহার মত পল
হয়ে গেল।—তোমার থাক্ত এই ছবি, আর এই
ছবির এত আদর মোহাণ ! যদি সে নিজের হাতে
শ্রমস্তর দেবার তার তুলে না নিত, যদি মনোরের
সকল জাণ নিজের বুক দিয়ে ঠেঁগিরে রাখবার চেষ্টা
করত না।—তার এই পুংছার ! কিছুকণ চুল করে
ধাড়িরে থেকে হৈম বললে, শুধু ছবির পর খাঁট
যেওয়া নয়—আজ থেকে তোমার পেরমানীর
কোনো কাজেই আর আমি হাত বিতে চাইনে।
তোমার প্রাণের চেয়েও বড় মরবের যে ছবি, সেই
ছবিই তোমাকে পাওয়াবে পরাবে—সব করবে।
আজ থেকে তোমার আপন বিবাহ!—বলে হৈম
পেছন কিছুলে।

শ্রমস্তর বললে, হৈম রাস করে বাপের বাড়ী
চলে যাচ্ছে। ডেকে ফেরাবার চেষ্টা করলে যে
তাকে সে ফেরাতে পারত, তা ঠিক। কিন্তু হৈমর
কথা শুনে তার মনে হইছে যে, ঘরের প্রাণ আর
আর তার স্ত্রী নয়—বাইরের যে-সমস্তকৃত্তমীন বণ
জনেই এক জন। নইলে প্রাণের রক্ত বিয়ে যে
ছবিকে সে মস্তাবিত করে তুলবার চেষ্টা করছে,
তার ওপর হৈম এখন করে বিক্রম হয়ে উঠে না।
তাইই হাতে পড়া এই অপরূপের দ্রাণ টোক্তের মধ্যে
হৈমকে ধরে রাখবার অধিকার সাজ আর শ্রমস্তর
নেই।

সে তুলি ধরলে, একদিন—হবিন—তিনদিন
অনাচারে অনিগ্রাহ তার তুলির দেখা চলে। নষ্ট

ছবি উদ্ধার না করে আর অন্য কার নেই—এই ছিল
তার পন। দিন মার রাতের প্রেমে সে মুক্ত,
শুধু অন্দো আর অন্ধকারে। তার আগর সব
মুগ্ধে নয়, কোনো কোনো দিন বেলা বেড় প্রেমে
বাইরের বিকে চেয়ে তার কঁপ হত যে, রাত নেই—
আলোটা নিবিধে বেওয়া সবকার।

শ্রমস্তর অন্ধের অঙ্গ চক্কাটা অংগেবে সত্যপতাই
মলম হয়ে উঠেছিল—সবস্ত বেশ এছবি। তার
শুণপানে মূবর করে উঠল। রাজা প্রোমা মলমই
একবাক্যে স্বীকার করলে যে, এত বড় শিল্পী তাদের
পেলে জন্মাব নি, আর কখনো সম্রাণে কি না পকে।
বার রাতের সা চেয়ে যে নিরেল—ছবি, তার
চেতর থেকেও গোকেবা সব অতুত শুণপার
নিবর্ণন বার করতে পারেন।

এই রকম অজ্ঞান মূগ্ধ হওয়া মূগ্ধে নানা
লোকে নানা কথা বলে থাকে। কেউ কেউ বলে,
শেষের যে ছবিখানা শিল্পী প্রাণের রক্ত নিয়ে এঁকে-
ছিল, তাতেই তার নামে গহ-জয়কার পড়ে যায়;
সকলেই তার শুণে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু
শৈলীভাগ লোকই এই মূল একটা আশ্চর্য
প্রেমের উল্লেখ করে থাকে; সে গল্পটি হচ্ছে
এই;—

শ্রমস্তর বণ ছবি নিয়ে বস্ত্র যেতে উঠেছিল—
বাহুজান এক রকম। হাটা হয়েছিল বললেও
চলে, এখন কে তাকে ডাকলে,—শিল্পী! শিল্পী!

আর যুগত মনোহর মাগুধ বেমন করে পাড়া
বেত, তেমন করে শ্রমস্তর, পাড়া নিলে, কে—
কে ও?

আশ্চর্য বললে, রাজার পারিষদ আমি।

শ্রমস্তর বিশ্বাস করতে পারেন না, ছবিটার
তাকে ঠাটা করবার লোকের অভাবে ছিল না।
বিকারের চোখের মতো কোণে কবে বেলে চটে
বললে, কি মনে করে? মনোহরের পাখা-এর

কহে কোনো যোগ্য লোকের দরকার হয়েছ
কি?—বলে অভ্যর্থনার সন্ধান একখানা তাক্তা
চৌকি অগ্রসর করে দিবে বুকের দিকে চাইতেই
ঐশ্বর্য সিন্ধুর তুল্য হবে দেখা। এমন সুখী
চর্যকে সে আর কখনো দেখেনি।

আগন্তুক বিদ্রুতভাবে বললে, মহারাজ সত্যই
তোমাকে ভেঙে পাঠিয়েছেন, শিষ্টা! তোমার ছবি
যেখো মন তার ভুলে গেছে।

হাত তোল করে ঐশ্বর্য বললে, আপনাতর কথা
আমার শিরোধারী; কিন্তু কোনো ক্ষুদ্র প্রকারও এ
অধর্মের ছবিতে মন ভুলেছে, আমি শুনিমি।

আগন্তুক বললে, শুধীর শুণ শুধীই বুন্দেন।
মহারাজ আমায়ের শুধী—শুণজ তোমাকে তিনি
ভেঙে পাঠিয়েছেন। তুমি হবে তাঁর রাজদরবার
প্রধান চিত্রশিল্পী।

ঐশ্বর্য শিথিল হয়ে বললে, রাজদরবার প্রধান
চিত্রশিল্পী! সে কি কাম! কতকড় কাম!—আমি
কিছুই জানিনে তো—সে কাম আমি পারব কি
মুত মহাপর?

আগন্তুক বললে, খুব পারবে। মহারাজ
তোমার ছবি দেখে বলেছেন, এর ঐশ্বর্য-একটা স্বপ্নের
টানে রূপ-স্বপ্নের তুল্য মনে, অস্ত্রের আঁটার
থেকে রূপের কমল বস্কে ওঠে।

ঐশ্বর্য সর্পিণী হয়ে বললে, তবু কি কাম আমার
করতে হবে, শুনেই পাইনে কি একটবার?

আগন্তুক বললে, কাম এই ছবি আঁকাই, তার
যেখি আর কিছু নয়—তবে মহারাজ যেমন যেমন
বলবেন, তেমন।

শিউরে উঠে ঐশ্বর্য বললে, বাগের জতুবের
ছবি! সে ছবি মানুষের কি করে আঁকে, আমি
বলতে পারিনে।

অত্যাশ্চর্যভাবে আশ্চর্যক বললে, কেন
পারবে না? হাতা তোমার চোখের যোগ্য নয়,
তাহাত যে এ কাম মনেতে মনেতে করছে।
হাতের হাতের টাকা এক একখানা হবির পারি-
লম্বিক—তা ছাড়া পুস্তক।

কপালে হাত ঠেকিয়ে ঐশ্বর্য বললে, নবম্বার।
নবম্বার! ও-সব পারিলম্বিক আর পুস্তকের আঁকার
ভাগ্যে নেই, আপনি অত্যাশ্চর্য অত্যাশ্চর্য লোকের সন্ধান
করুন।—বলে ঐশ্বর্য তার ছবির দিকে দৃষ্টি করিয়ে
বললে। বলতেই চোখ তার স্বপ্নে পেল—ছবি
কই!—এ যে রক্তের আঁকন! অস্ত্রের দরকার নত,
আছে—সাদা, নীল, লাল আরি করে—সব যেন
আঁলে প্রৌণ্ড হয়ে উঠে রঙের একটা অন্ধকারে
শিথিল পরিণত হয়ে বলতে, আমি সিদ্ধি, আমি
আনন্দরূপ, আমি অমৃত।

ঐশ্বর্য বিহব হয়ে থাকতে পারেন না—রক্তকাল
বরে তার অস্ত্রের যে আঁকন, সূর্যের স্রোতের
প্রকাশিত হবার ভেত্রে আত্ম-স্বাভাবিক করছিল,
সে যেন আর ঐ রূপস্বপ্নের আত্ম-হুতি দেবার ভেত্রে
মানকে বাস্তবতার করলে।

পরদিন বেলা পেল, ঐশ্বর্য তার গড়ের আঁকা
ছবির তসার পড়ে আছে—স্বাণশোণ নিশ্চয়, কিন্তু
ছবি তার সৌন্দর্য।

মৃত্যুর দান

(ঐক্যবিনোদেন সেন কবিতায়)

কালিদায় কাল লগে যান করি সন্ধ্যা-যুগু বীরে
আঁকার প্রাণবর্ষারে মৃত্যুরে বঁধিছে নত নিরে ।
মরণ অতিথি ধারে, করে ম'রে হুঙ্কার কল্যাণ ।
মৃত্যু' মন্ডাট-অঁবি পেরে কোন্ অমৃত-সন্ধান
অপলক বিস্ময়িত ! মূরে অই প্রেমধর মর্দক—
ভাণ্ডমন্ডলের হবি, ভরে দিছে হুঙ্কার অমৃত
মৃত্যু'মর্গে সুধারসি ; ভাবি মৌন সমাধির ধান
এক-প্রতিমার কণ্ঠে ছুটে উঠে মিলনের গান ;
মৌন হরে শুনে হুঙ্কার মৃত্যু আন মৃদু কর্ণ তার,

কল্প রামন-জনি নাহি পশে হৃদয়ী কন্যার ;
হৃৎ তপ্ত হেংখানি— ছুটাইতে কনি বজ্রার
পারেনি নিবাত্তে আলা, ধান্বে লেগে সুধামর্গ কার ।
তহু তাঁর নিঃসঙ্গ নীতল, এ পারের প্রেমবেলা
হঃস্বপন ভীষনের তেজে বিয়ে এই সন্ধ্যাবেলা
মুখখানী, মৃত্যু মেঘ পর্বা পড়িছে ; ভোতাতি লেখা
উলস করিছে লগ, ও পারোতে ই বাধ দেখা
চিত্রমিলনের ছাটি, বিকারনা দেখা অবমান ।
মৃত্যু আন সাক্ষাৎনে কি অমৃত করিয়াছে দান ।

“সেকেন্সে বঙ্কিম”

(ঐবেংগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বঙ্কিম নাকি সেকেন্সে হয়ে পড়েছেন ?
একেলেনের সুখে এখনি অলপ প্রায়ই পোনা
বাচ্ছে ।

‘একেলেন’ ব’লে সেকালের যোগজে বঙ্কিমের
ভাবি বদনাব ছিল । আবার একেলেয়া দেখারি
‘সেকেন্সে’ ব’লে বঙ্কিমকে স্তোতিমত নজান ক’রে
বিত্তে চান । বঙ্কিম তবে কোন্ কালের লোক ?

‘সেকেন্সে’ মানে কি ? যা অচল । সত্যিই
কি বঙ্কিম অচল ? এই প্রশ্নই আজ আমার মনে
উঠছে ।

মুক্তজিগা বলছেন, এ-রূপের উপরে বঙ্কিমের
আর কোনই প্রভাব নেই—না ভাবার, না
ভাবো ।

কিন্তু সাহিত্যের আলমের এ-রকম একাধিক

ডিক্টোয়ারি করলে তো চলবে না ! কথাটার
প্রমাণ চাই । ... মনসাধারণের তরফ থেকে বেলা
যাক । সাধারণের মন পূরক করার সবচেয়ে
উপযুক্ত স্থান হচ্ছে, রমালয় । কিন্তু লেখানো গেলে
দেখি, মাইকেল, মৌনবন্ধ ও রামকৃষ্ণ ঠাকুর প্রকৃতিঃ
অধিকাংশ বইই সেকেন্সে ব’লে অচল হয়ে পড় পড়
বঙ্কিমের সমস্ত বইই এখনো খুব সেকেন্সেই চলেছে ।
তবে কি ক’রে বঙ্কিমকে সেকেন্সে বলি ? পুত্র-ক-
লমে বদর নিলেও দেখবেন, অধিকাংশ বিখ্যাত
‘একেলেন’র মত এখনো বঙ্কিমের বই পোকার
কলারে পরিণত হয় নি ।

তার পর ভাবা । আপাততঃ সবচেয়ে একেলে
নামসাদা ঔপন্যাসিক হচ্ছেন ঐচ্ছিক পরবর্ত্তে স্ট্রো-
পাচারি মহাপুরুষ । তাঁর ভাবার সঙ্গেই-মিলিয়ে দেখা

যাক, বহিঃস্ব ভাষার ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে তিনি কতখানি এগিয়ে আসতে পেরেছেন। হঠাৎ একটি নতুন বিশেষ কথাটা বেশ বোকা গেল।

“সীতারামের” আঁচড় :—

“পূর্বকালে পূর্ণ বসন্তের ভূষণ নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম ‘ভূষণ’।—
এই এক মত কাহিনী বঙ্গের পূর্বে একদিন রাজি শেষে ভূষণ নগরের একটা সড় গলির ভিতর, গাছের উপর একজন মুগ্ধমান কবির শুইয়াছিল। কবির মৃত্যু হইয়া একেবারে গাছ বড় করিয়া শুইয়া আছে” প্রকৃতি।

“চরিত্রহীন”ের আঁচড় :—

“পশ্চিমের একটা বড় নগর এই সময়টায় দীর্ঘ পড়ি-পড়ি করিতেছিল।” পরবশে রাধাকৃষ্ণের এক লোক কি একটা সংকল্পের সাধন্য করে ভিক্ষা সাগ্রহ করিতে এই সময় কাটির পড়িয়াছেন। তাঁহারই বক্তব্য-সত্য উল্লেখক সভাপতি হইতে হইবে এবং তৎপল্লব-স্বাধীনতার ধারা কর্তব্য তাঁহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে” প্রকৃতি।

আপনারা বলুন, এই দুই ভাষার ভিতরে কত-
টুকু বলাব আছে ?

অতএব বাঁরা বহিঃস্ব ‘কেন হুগের’ বলে ভাবি করতে চান, তাঁদের কথা হয় তুল, নয়।

সাহিত্যিক আসরে ও আলোচনা-সভায় এমন চের আলোচককেও দেখেছি, বাঁরা বহিঃস্বের প্রতিভার বিপুলতা সর্বত্রই সম্বিধান। অজ্ঞানতায় জাতি ও সমাজের ভিতরে অনেক নতুন সমস্তা দাখ্য-
চাপক দিয়েছে, একালের চের চের মান লেখকের লেখাতেও তার ছাপ পাওয়া যাবে। বহিঃস্বের কোন-
কালে দেশ-বসন্ত-ওঠা-নি, কালে কালেই তাঁর লেখাতেও দেশ-বসন্তের ছাপ পাওয়া যায় না ! হঠাৎ একেলে লেখকরা বাঁদর বা বলেন নি, এমন অনেক

নতুন ভাষার কথা আস্তে পারছেন। তাই ব’লে তাঁদের শক্তি বা প্রতিভাকে বহিঃস্বের চেয়ে বড় মনে করার কোনই সম্ভাবনা নেই। কেন না, একেলে লেখকের এই নতুনস্বের ভঙ্গ ব্যক্তিগত প্রতিভার ক্ষেত্রে নয়—কেননা প্রতিষ্ঠিত যুগধর্মের স্বাভাবিক প্রবাহের চক্রে। বহিঃস্ব বৈতে থাকলে এখানে গহিষে থাকেন না—ভাষণ এগিয়ে যায়গাই প্রতিভার স্বার্থ। বিলাতের বর্তমান সমস্ত আলোচনা লেখানকার অনেক চুনোপুটি-
আতীর লেখকেরও রচনাও দেখা যায়। কিন্তু এগিয়ে যাওয়া নিয়ে কিছু বলেন নি ব’লে তাঁকে কি এ চুনোপুটির চেয়েও নীচের স্থানে নামিয়ে দিতাবে ?

মোট কথা, এক যুগের প্রতিভাবানের লোক আর এক যুগের প্রতিভাবানের তুলনা করাই ভুল—ভাষণ, এমন তুলনার অধিকাল ক্ষেত্রেই আবার হারাই সম্ভাবনা বেশী। তবে মানা যুগের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার দান যাচাই হবে কি করে ? তারও আলোচনা উপায় আছে।

ভিন্ন ভিন্ন যুগ-বিলাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার বিচার। আলোচ্য প্রতিভাবান কে-যুগে জন্মেছেন, দেখতে হবে সেই যুগের সাধারণ পত্তী ছাড়িয়ে তিনি কতটা বেশী অগ্রসর হ’তে পেরেছেন ? এভাবে বিচার করলেই দেখবেন, বহিঃস্ব তাঁর যুগের সাধারণ আবারও ছাড়িয়ে যতটা বেশী এগিয়ে গিয়েছেন, বাংলা দেশে সেই অগ্রগতির দখ-
যোগ্য দ্বিতীয় বৃষ্টান্ত একমাত্র রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে বহিঃস্বের মত আর দ্বিতীয় প্রতিভার লক্ষ প্রবেশে হইনি। তাঁর পরে রবীন্দ্র-
নাথও বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ ও ভাব-প্রকাশের শক্তি মাঝে বিচিত্র ভাবে তুলেছেন, লক্ষ্যে নেই। কিন্তু বহিঃস্বের দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে কেন্দ্র হাতেও চোঁর স্ববহার পেরেছিলেন—বহিঃস্বের ভাষা সে স্বাধীন আশে নি, তাঁকে শুকনো পাছকে

করিয়া পথ্য রচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সচিয়া ষাঁড়াত, এ পৃথিবীর ভাগ সাবিত্রী কিছুই তোমার ভক্ত নহ, কেবল এই তীব্রবাহী লোনাগমন বেল তোমার ভক্ত—বড় লোকের ভিত্তিজন্য বেল তোমার পুষ্টির সঙ্গে যথো যথো ইহার আলাপ হইবে।”

আর এক টুকরো নমুনা :—

“তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া ত ভক্ত প্রকৃতি ছাড়ে না—শৌখিন্য ত লুকায়িত হইবে না! তুমি যে সমুদ্রে নদীর বাও না কেন,—তল-মৌলিনার মাথায় বিকৃত হয় না,—সুখ বীড়ির বাণ ছিড়ে না—তারা তেমনই ধরে, তীরে বুক তেমনই ধোলে, বলে টানের আগে তেমনই ধলে। গড় প্রকৃতির যোগাধ্য। যেরূপো বাতীর জাহ, সফল সমুদ্রেই আদর করিতে চায়।”

মিরশেফ ব্যক্তিভাষ্যকেই বানতে হবে যে, এমন ভাষা একালের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকের কলম থেকে যেন্সেও তা প্রাপ্যনীর হ’ত। রামদাস বঙ্গ, সুভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ আর ষ্ট্রের ভাষার পত্তী ছাড়িয়ে বক্রিম বতটা এগিয়ে গিয়েছেন, বক্রিমের ভাষার আওতা ছাড়িয়ে তাঁর পরম্পরের কোন লেখকই ততটা এগুতে পারেন নি। আদর “হুজ্জৎ বাজ্জ” লিখে আর বানানে মৃতদেহ বেধিয়েও বক্রিমের নিজের ভাষা-বড় বাংলা ভাষাকে বিশেষ কিছু হলে দিতে পারি নি। সামান্য বা প্রভেদ চোখে পড়ে, তা ব্যক্তিগত রচনা-ভঙ্গীর প্রভেদ বাক্য। বক্রিম যে মৃতদেহ কাঠামো গড়েছিলেন, তা এখনো তেমনি আছে—মৃতদেহ কাঠামো গড়বার প্রতিভা আর কাকর ভিতরে বেধ-সুখ না। এখন আদর অনেক চমুটি ভাষার মেঘবায় প্রভেদ আ-লাপন করি বটে, কিন্তু এ আলাপনের বক্রিম ‘সেকেন্দ’ ধরে পড়েন নি। তাঁর মূখেই এ-সবকে আদর প্রথম উপলব্ধি পেয়েছি। তিনিই আদরের শিষ্যইছেন :—“অকারণে

বহু পক্ষের পরিবর্তে গুণ, অকারণে বাহার পরিবর্তে বস্তুক, অকারণে পাটার পরিবর্তে পাত্র এবং ভাষার পরিবর্তে ভাষা বাহার উচিত নহে। কেননা, বহু, বাহা, পাটা, ভাষা বাংলা, আর গুণ, বস্তুক, পাত্র, ভাষা সাক্ষ্য। বাংলা লিখিতে গিয়া অকারণে বাংলা ছাড়িয়া সাক্ষ্য কেন লিখি? আর যেথা যায় যে, সাক্ষ্য ছাড়িয়া বাংলা লেখ বাংলা করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুশ্রুতি ও তেজস্বী হয়। “হে জাঃ” বলিয়া যে ডাকে, ওহে হুই যেন সে বাজি করিতেছে; “তাইয়ে” বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে।”—সুতরাং যেথাই বাজ্জ, তাথা ষিঃও বক্রিমের পরে আদর বড় বেশী মৃতদেহ কিছু বলতে পারি নি, বহু বৈশিষ্ট্যগত লেখকই এখনো বক্রিমের ভাষাতেই লিখছেন। নীচের লাইন ক’টি বক্রিমের মত লোক। ভাষার এ-সুপেরও অধিকার লেখক লিখতে পারবেন না :—

“আমি রামদাসের চৌকিপালে চৌকির উপর বসিয়াছিলাম—উঠানে একটা যেও কুতুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আও হইতে পারি নাই—সেইখানে হইতেই রামদাসের বগাবলীর পট্টের পাইতে-ছিলাম। রামদাস একটি একটি করিয়া বেগাইল যে, তাহার চাহিটি হেলে, পাঁচটি বেধে, একটি ছেলে আর তিনটা মেয়ের বিবাহ দিতে বাকি আছে—পোষ্যভেদের হেলের বিবেচনায় কড়ির বহু, মেয়ের বিবেচনায় বটে, তবে ক’ন” প্রকৃতি। এর পরের কি কেউ বলতে চাইবেন যে, বক্রিম ‘সেকেন্দ’? সাহিত্যের মধ্যে ভাষাই হুজ্জৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নিমিত্ত এবং এইখানেই বক্রিম-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। এখানে বক্রিমের প্রতিভা আর ক’নেরই প্রতিভাকে ছাড়িয়ে উঠেছে—কেননা বহু বাড়া আর কথা নেই, তিনি আদরের সেই ভাষা ও ভাষা দিয়েছেন। আজ তাঁর ভাষাতেই লোক তাঁর প্রতিভাকে বেশো বলতে চাইছে। এ হুজ্জৎ বাস-ভাষার স্তম্ভভা।

বৌদ্ধিকতা যে প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় লক্ষণ, এ নিয়ে আর দ্বন্দ্বত নেই। নব নব সৃষ্টিতেও বাংলায় বঙ্কিম-সাহিত্যে বঙ্কিম এখনো অধিত্যক, বঙ্কিমকে বাটো করবার আগে একথাটা আমরা যেন জ্বল না যাই। কেবল তাব-প্রকাশের উপ-যোগী ভাষা নয়, সেই লগ্নে আধুনিক সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় তিনিই সর্বপ্রথমে নির্ধারিত করে গেছেন। সমালোচনা, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-সাহিত্য, একেলে প্রাণালীতে বর্ণন ও নান্ন আলোচনা—এমন কিছু নেই যেখানে তাঁকে দেখতে পাই না। আধুনিক আধুনিকের মানিকপত্র “বঙ্গবর্ধন”র আগে এতদেপে ছিল না। বঙ্কিম যদি একখানি-মাত্র উপ-ভাগও না লিখতেন, তা হ’লেও বাংলা দেশে আজ তিনি তুলনামূলক হয়ে থাকতেন। আন্তর্জাতিক বিদ্যা এই যে, এমন-সব সহজ সত্য যথাত বক্তৃতাটিকে মনে করিয়ে দিতে হয়। দেশে আরো বেশী জানো ডাক্তারের দরকার, বক্তৃতাটিকে স্মৃতিশক্তির অবস্থা বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে।

ভারতীয় উন্নয়ন-সংগ্রামের কাছে যে-জনে তিনি বেশীকম পরিচিত। এ-বিষয়ে লম্বা-চওড়া আলোচনা না করে সংক্ষেপে কিছু লেগেই যথেষ্ট হবে। বাংলা দেশে বঙ্কিম মুখ উপভোগের জটা নয়, প্রথম শ্রমীর উপভোগিকের সমস্ত স্তম্ভই তাঁর ছিল। তাঁর উপভোগের ‘প্রেম’র বাণুনি যে-রকম অপূর্ণ, একালের অবিকারণে প্রেমে মাঝে বিখ্যাত উপভোগে তা দেখতে পাই না। তাঁর পত্র, যে পত্র উপভোগিকের প্রেমেবের সর্বপ্রধান মাপকাঠি, সেই চিরন্তন সৃষ্টির পত্রিক বঙ্কিমের অসাধারণ। তিনি অসাধারণ চরিত্র সূর্য্য করেছেন, কিন্তু কোনটিকেই দেখলে অন্তর্ভুক্ত মনে পড়ে না। তিনোজনা, আয়েতা, বিমলা, মনোহরা, দুর্গামিনী, গিরিমায়া, জী, হুমা, গজলী, নন্দা, সুধা, কপালকুণ্ডলা, রত্নবিধি, শেখদল, প্রভুত, সাধু,

মহানন্দা, নিশি, রজনী, সৎসঙ্গী, জব্ব, রোহিনী, চিরমায়ী, সুধারূপী, কমলমণি, সুধামিনী, প্রমথ পোখালিনী, শৈবলিনী, বদনী, দ্বৈতা, চক্ৰবর্তী, কোবটীয়া, নির্মলসুধারী, ইন্দ্রা, সুভাষিনী, শান্তি প্রভৃতি এতনি আগে অনেক আছে, কত আর নাম করব? প্রেমের একজনও চরিত্রে প্রেমের লগ্নে লগ্নান নয়। পুরুষ চরিত্রের এতনি বৈচিত্র্য, কর্ম বিধে আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। বাংলা দেশের আর কোন উপভোগিক এত বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করেন নি। এটা কি বড় দেশে কথা?

আন্তর্জাতিক ‘সাইকলজি’ বলে এতটা কথা নিয়ে কাদের কাছে বক্তৃতাটী নাড়াচাড়া করা হয়। আমরা জাঁক করে বলি, বঙ্কিম মনোবিজ্ঞান-মূলক উপভোগ লিখতে পারেন নি, আধুনিক উপভোগিকরা এইখানেই বঙ্কিমের উপরে ঠেক করেছেন। একবার মনে কি, উপভোগ জানেন। ‘সাইকলজি’ তো লক্স শ্রমীর উপভোগিকাই প্রধান অবগত, তা ছাড়া চরিত্র সৃষ্টি অনন্তব। তবে উপভোগ আছে দুই শ্রেণীর—ঘটনা-প্রধান ও বিজ্ঞান-প্রধান। আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় শ্রেণীর উপভোগকেই চল বলেছে বেশী। আর-কালকার শেখদল ঘটনার উপরে স্তম্ভ-বন্দী কোর না নিয়ে, ঘটনার মূল যে মন, তার বিকেই বেশী ঝুঁক পড়েছেন। প্রথম শ্রেণী। শেখদল মনের কথা এত সবিজ্ঞানে বলেন না, তবে তাঁরা এখন কৌশলে ঘটনাবলী সামান্য পড়ুয়া। ঘাতে-ক’রে খুব সহজেই ধরতে পারে, মনের কোন অবস্থায় সাধুদের যাঁরা এতকম সব কাজ করা সস্তব হয়। প্রথম শ্রেণীর বই পড়তে গেলে পড়ুয়াবের একটু মাথা ঘামাতে হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়বার সময় তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হ’তে পারেন, কারণ পাত্র-পাতীর মনের কথা কেতাবেই স্পষ্ট করে লেখা থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুথকে এভাবে স্রবিকা থাকলেও অন্তর্ভুক্ত তা অনেকটা একচেয়ে ও কট-

পাঠা ; কিন্তু বটনা-প্রধান উপজাতি পড়তে বেনী
চালো লাগে ।

যদিহবান্ উপজাতি বটনা-প্রধান : কিন্তু বিজে-
ক-প্রধান উপজাতি আধুনিক ব'লেই যে তা
শ্রেষ্ঠ, এখন কথায় তা ভাব কখন ? তাহ'লে আর
আর লেখকের কথা বুঝ থাকুক, ভিত্তিঃ হ'লো : পণ্ডিত
কহে থাকেন না যে ! পড়া কথা হচ্ছে এই, লেখকের
প্রতিভা থাকলে চাই : প্রণীতেই উচ্চতর বই
লেখা হ'তে পারে ! পরন্তু 'গাইকন্ডি'র বেলাও
ছাই প্রণীতে যেখানে যায়,—তবে প্রথম প্রণীতে
প্রবন্ধ আর দ্বিতীয় প্রণীতে : প্রকৃতভাবে, তখন
যানি এইটুকু ।

সুতরাং পুরাতন প্রথম প্রণীই যথেষ্ট ব'লে
বহিষ্কৃত হ'য়ে যেতো : যত চান, আমি তাঁদের
বুদ্ধিতে তাত্ত্বিক করতে পারি নাই । ব'লিঃমত প্রধান
উদ্দেশ্য ছিল মনোবিজ্ঞানের মহিমা দেখানো । অতঃ
কোথায় যে তাঁর স্রব-প্রবাহ হয়-নি, একথা আমি
বলি না । প্রক-প্রবাহ হয়েছে বৈকি ! কিন্তু তেমন
প্রক-প্রবাহ এখনকার বড় বড় বিজ্ঞান-প্রধান বা
মনোবিজ্ঞান-লোক উপজাতিও বুদ্ধি বুদ্ধি পাওয়া
যায় ।

এখানে প্রশ্নকল্পে আর একটি বিষয় আলোচনা
করতে চাই : প্রতিভাবান উপজাতিও প্রবন্ধের
বলু ঐচ্ছিক পরংস্র জট্টাপাথার সংশয় বহু
আবশ্য "লোকানী"তে "আধুনিক সাহিত্যের
বৈকল্য" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছেন ও বহিঃমত
সম্বন্ধে কতকগুলি বহু প্রকাশ করেছেন । আমি
এতদূর যে বলতে মতঃ বিকল্পে আলোচনা করলুম,
পরংস্রা অবশ্য সে ধরনের লোক নন । বহিঃমত
তিনি অস্বীকার করেন না ।

তবে বহিঃমত "প্রশ্নেবহ" ও "প্রকৃৎকান্তির
উইল" নিয়ে পরংস্রা যে-ভাবে আলোচনা করেছেন,
তা পুণঃস্র ব'লে বনে হচ্ছে না । প্রত্যাপকে
শৈবলিনী পিতৃ-বহন ক্ষেত্র জালোবাস্ত্র—এ তাগো

বাগা বহনমত সকে সকে কেটেই উঠেছিল—উপজাতি
মধ্যেই তার ভেদ প্রমাণ আছে । এখন প্রশ্নের উল্লে
শৈবলিনীর ভেদে পুণঃস্রা বাগাঃ। কি আভা-
বিকতা আর কি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কিছুকাল
অপোত্তন হয় নি । "এত-বড় একটা অস্ত্রাধ কবিতার
প.ক সেই প্রশ্নের সত্য হ'লে" এবং বহুভাষ হ'লে
আমি তা কিছু চতাবেই প্রমাণিত করতে পারি ।
তারপর পরংস্রা লিখেন, "প্রত্যাপ অত-বড় একটা
কাণ্ড করিল, কিন্তু এখনকার দিনের পাঠক হস্ত
অন্যমনাক্রমে বলিয়া বসিয়ে—কি এখন আর সে
করিয়াঃ"—এটা পরংস্রার নিজেস্ব আশঙ্কা ।
"এখনকার দিনে"ও তৈ, এখন পাঠক তো আমি
চোখে দেখি নি, প্রত্যাপের অসুখ চরিত্র যাকে বৃত্ত
করে নি । তবে পাপ্লা পায়বে আমি বোঝ নিই
নি বটে । হঠাৎ দেখানো এরকম পাঠঃকর অস্ত্রাধ
নেই ।

আগল কথা কি, এখনকার মনঃস্রা বাগা
সমালোচনা নাম পেতে পারে না । পরংস্রা যা
করেছেন তা সমালোচনা নয়, আর 'কার্যকরতা'
বললেই চলে । ঠিক এই ভাবে দেখালে পরং
বান্ধুর যে-কোন উপজাতিকে কিছুতকিষ্কার
ক'রে তোলা যায় । বিজ্ঞানশাসিত টুক এই
পদ্ধতিতেই বহিঃস্রাধের অপূর্ণ রচনা "মোনার
তনী"কে নগদা, সাধারণ ও অর্থহীন প্রশ্ন-উদ্ভাষ
ব'লে প্রতিপন্ন ক'রেছিলেন ।

পরংস্রা "প্রকৃৎকান্তির উইল" নিয়েও এই
উদ্ভেদ পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন । রোবিনী
চরিত্রকে তিনি যে ভাবে দেখিয়েছেন, তা কি টিক ?
রোবিনীর মত চরিত্র আবার স্ত্রী অভিজ্ঞতার, বাস্তব
জীবনে আমি অনেক দেখেছি । এ-প্রণীর নারীর
প্রো আলো প্রশ্নই নয়—তা কান মাল । এরা
কিছু কালের মধ্যে একজনকে প্রাণ-মন দিয়েই
জালোবাসতে পারে বটে, কিন্তু এদের ভালো-
খাসা অস্বাভাবী । রোবিনীও এই ধরনের স্ত্রীলোক—

দে খালি গোবিন্দলালের সঙ্গে নয়, হরশালের সোভেত উইল টুটি ক'রেছিল—এং এইখানেই কপট-প্রোফিটা রোহিনীর চরিত্রের বহুত স্পষ্টত্বপেই খোঁকা যাচ্ছে। শবৎবাবু মত লোককেও যে তা খোঁকাতে হচ্ছে, এ আমার ওষ্ঠান্য। হরশালের পরে যখন গোবিন্দলাল, তখন তারশরের আর একজনও হবে না কেন? “আধুনিক লেখক হঠাৎকে গ্রহণ করিতে” বাধ্য,—কারণ এইটেই যে পথম স্বাভাবিক! “প্রণিকার পক্ষে প্রকৃত সাহায্য” করবার ক্ষেত্রে বক্রিম রোহিনীকে এমন সমর-প্রকৃতি ক'রে আঁচেন নি, শবৎবাবুর মত মানুষ বক্রিমকে আধুনিক কালে বাস্তবায়ন কথিত ‘সাইকলজি’রই আভিপ্রায় করতে ধ'ত। বক্রিম যে সেকেন্দ্রে নয়, এও আর তার একটা প্রমাণ।

আর গোবিন্দলালের খায়া রোহিনীর হতা?—শবৎবাবু কেনই বা ধ'রে নিচ্ছেন যে, বক্রিম এখানে পুণ্যের জয় ও শাপের পরাজয় দেখাতে চেয়েছেন? শবৎবাবুর কাগজে শবৎবাবু এই রকম হত্যার কথা প্রতিদিনই লেখতে পাবেন। গোবিন্দলালের মত অসহায় পড়লে অনেকই এমন পুন ক'রে পাকে। এখানেও বক্রিম স্বাভাবিকতার মুখশোকা করেছেন। “সেকেন্দ্রে ও একালে এইখানেই মত বড় ব্যবধান!” এ শবৎবাবুর মতের কাল্পনিক ব্যবধান! শবৎবাবু নিজেও রোহিনীর মত চরিত্রকে পেয়ে এই ভাবে যেখানেই না, তারই বা প্রমাণ কি? আদ্যন্তের হাতে বরা একবারিক বিচ্ছিন্ন প্রমাণই রয়েছে। রোহিনীর হত্যার সম্পর্কে শবৎবাবু ঠাট্টা ক'রে বলেছেন “এইরূপে তাহার শাপের শাস্তি না হইলে কাপা ও বোঁড়া হইয়া তাহাকে নিস্তরই কানীর পথে পথে ‘একটি পান্য দাত’ বদমায ভিত্তা করিয়া বেড়াইতে হইত।” কিন্তু এ ঠাট্টা বক্রিমের গায়ে না গেলে তাঁর নিজেরই গায়ে লেগেছে। শবৎবাবু কি ভুলে গেছেন, তাঁর “ঠিকরহীনে”র কিরণবদী শেষের বিকে পাগলী ও সুন্দর্য্য ধ'রে সত্যি সত্যিই লহরের

পথে পথে যুগে বেড়িয়েছিল? আর তাঁর বিরাগ-বোধের কথা? যে শাপের আশঙ্কিত কল্লত তারকেশ্বরে গিরে বস্মাকাজ ও শ্মু হয়ে শেষের উপরে সুভূত অশেকার এমন গোড়নীর অসহায় প'ড়ে ছিল যে, তার খানী পর্যন্ত ‘ভিত্তু’ মনে ক'রে তাকে পরমা নিতে সিরেছিলেন! কিরণবদী ও বিরাগ-বোধকে শবৎবাবু যেভাবে মেরেছেন, তার সুন্দর্য্য রোহিনীর মরণ তো সুন্দর মরণ! শবৎবাবু নিজে যা করেছেন, তারই ক্ষেত্রে বক্রিমকে তিনি ‘সেকেন্দ্রে’ ধ'লে নোথ বিঃসেহন। কাল এখানেও প্রাদিত হচ্ছে, বক্রিম এখনো ‘সেকেন্দ্রে’ হয়ে পড়েন নি। তাঁকে সেকেন্দ্রে বলা হয় নু'কি। কোরে নয়, গায়েও তোরে; কারণ, তাঁর পছন্দ ও শবৎ-আধুনিক শবৎ বাবু পছন্ডিতে আশ্চর্যকর মিল দেখা যাচ্ছে।

আমি এ-কথা মনে করি না যে, পুণ্যের জয় ও শাপের পরাজয় বক্রিমের নীতিশিক্ষা দেখায় ক্ষেত্রেই শবৎবাবু কিরণবদী ও বিরাগ-বোধকে শাস্তির পক্ষে টেনে নিয়ে সিরেছেন। শবৎবাবুর দৃষ্টি মতো স্বাভাবিক পরিণামের বিকেই নিশ্চয় ছিল। আবার, রোহিনীর পরিণামের বক্রিম যে নীতিশিক্ষারই একটা ইঙ্গিত বিঃসেহন, এমন মনে করা উল্লেখ না। ক'ব ও শুকনপাই আগায়া লোক, এই নয় সত্য কথাটা আর কলেকার আবিষ্কার নয়। শবৎবাবুর বিবাস, বক্রিম সেকেন্দ্রে লোক, অতএব তাঁর পক্ষে এটা মানা মঙ্গল্য। এই সুগ-বারণা নিয়েই তিনি বক্রিমকে নিজের বিপক্ষে হাচ করিয়ে, কল্পিত প্রতিক্রিয়া মলের মুখে এই হ'লেকার যোগ ক'রে দিরেছেন—“বক্রিম বাঁচিয়া নাই, সুভূত মারিবে কে? সুভূত সুভূত নাটক মতের ও কবিতা বাহির হইতেছে, তাহাতে হুশিকা নাই—তাহা নিরঙ্ক দ্বীতিপূর্ণ।”

কিন্তু বক্রিম যদি আক বৈচে থাকুকেন ও “আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ” পছন্দেন, তা'হলে

নিষ্ঠারই বলতেন যে, “আমি যা অনেকদিন আগেই বলেছি, পরবর্ত্তে আমি তাইই পুনরুক্তি করেছেন।

বহিষ কি বলেছেন, শুদ্ধ :- (তাহার উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের) “অনেক উত্তর নিবেদন যে, ‘নীতিবিশ্বাস’। যদি তারা সহ্য হয়, তবে ‘হিতোপদেশ’ বস্তুতঃ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে যত্ন যৎ হইতে নীতিবাহক্য আছে। সেই হিসাবে অখা-মালা হইতে পশুতলা কাব্যের অপকৃষ্ট।... কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে।”

বহিষের মত প্রতিভার বহুপুত্রের কবিব্যাংমুখী এতটা প্রশংসা হয় যে, সহস্রের তাঁরা সেকলে হইয়া পড়েন না। তাই এখনকার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বহিষের “বন্ধনতঃ” পানই হজ্জের সাগর ভারতের সর্বপ্রধান আতীর সঙ্গীত। “আনন্দ-বঠে” তিনি বর্তমানের পুরাতন দিগে গিরেছেন। এমন কি, এখনকার যা সহ-চেয়ে আধুনিক সমাজ, — কুসীন ও সাধারণের স্বার্থ, জঘন্য ও কৃষক সম্প্রদায়ের বিপাক—কবিদ্যার যা নিজে এমন মত একটা ভদ্র-পালট হইবে সের, বহিষ স-সব বিষয় নিবের যে কত চিন্তা করেছেন, তাঁর “বন্ধনের কৃষক” ও

“সাম্য” প্রকৃতি সুখী প্রবন্ধগুলি পড়লেই এটা বৃত্তে আর দেখি লাগে না।

বহিষকে আবার অকৃতজ্ঞের মত ভুলতে বসেছি— তাই বাতি ছেলে আম চাঁদের আলো দেখতে হ’ল। পরবর্ত্তে তো লেখা আছে,—বহিষের হাতে কেবল মাত্র ‘সেকেন্দ’ অথবা চানিয়েই তিনি নিশ্চিত হয়েছেন,—কিন্তু সাহিত্যিক আসরে এঁরাই এমন-সব নব্য লেখক-পুত্রকে দেখা যায়, যারা চাই বহিষকে একেবারে ভুড়ি দিয়ে নগ্ন্য ক’রে দিতে। এই-সব চুপোখুটি—না, কাগ-চিংটা! আন্দোলন দেখি, আর মনে মনে হাসি। কিন্তু এদের কীক ক’রে চোপে ধ’রে ধুঁটা মোরা করলেই দেখবেন, বহিষের লেখার সবচেয়ে এদের পরিচয় কতটা সামান্য! এক এসবার সাধ যার যুগ্মায় তর্কাল-ভারের তাহা অকৃত্তি ক’রে এদেরও বলি —“ওরে মূর্খ, কর্ণক, কৃৎসক, উক্কর, মল, অল্লমল চুয়াগ্রব রুধিলাগ্রত বইয়াছিস।” কিন্তু তারপরেই এই ভেবে বদলা লগত করি যে,—না, বহিষ যখন নিজেই এ বোচারাঘের এমন ভাষনক পাল্যপালির তাহা থেকে রেহাই দিবে গিয়েছেন, তখন তাঁদের আর অকম্প্য বিনা যেনে আঁচের মত জড়িত ক’রে ভাল নাই!

চিত্র প্রতীক্ষায়

(ষ্ট্রিপেস্ত্রফক সাহা) এম এ, বি এল)

তোমার বেশিদি বৃষ্টি এ পৃথিবী হাতে,
তবু পরিচিত জ্বিৎ কোন স্তম্ভকণ,
কতজুতে, কোন লোকে সেই পরিচয়—

সেই চোখে চোখে চিনে কোন্? প্রাক্ত নালে
বলেছিলে মৃত পানে ঘেরে অন্তরনে

কোন সম্মানিকনিত্ব? আলি মনে হয়
ওই জ্বিৎ, সেই আদি; পরিবর্তন হয়

এই বিধে আনাদের রূপান্তর নাই,
ওগো, যুগান্তর পরে নিমেষেই যেনে
তাই চিনিবাহি। তরুণিত বক তাই

বহিত করিয়া মত স্মৃতি উঠে বেগে
বিস্মৃত স্বপ্নের লব। বাই—তবে বাই।

আবার হইবে দেখা। রহিবাহি আদি।
যুগ যুগ সে অনন্ত যুদ্ধের লাদি।

সেকালের কথা

(ঐকম্পনাম যোগ এম, এ,)

রায়েজলাল ও কিশোরীচাঁদ।

ভারত বিখ্যাত দশমী ভাস্কর রাজা রায়েজলাল বিজ সি-আই-ই মহোদয়ের প্রেরণে বিবধক ইংরাজী প্রবন্ধাবলী আনিও কি স্বদেশে কি বিদেশে

পতিতপণের আভা
বিশ্ব আকৃষ্ট করি-
তেছে। কিন্তু এক-
কালে এই অশ-
মস্ত দশমী পূজার
যাত্রা বাঙ্গলা
সাহিত্য যে কতদূর
উন্নত হইয়াছিল
তাঁহা আমরা অনে-
কেই বিশ্বাস হই-
তেছি। তাঁহার
প্রধান কারণ এই
যে, রায়েজলালের
সর্বভোগ্য প্রভিতা
নানা ক্ষেত্রে প্রসূত
হইয়াছিল এবং কি
প্রেরণা, উদ্ভাৱে,
কি সামগ্ৰিক
জটিল প্রেক্ষার
বীজাণু, কি

বিধিবিধানের
শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে
সর্বত্রই যেনবাগী তাঁহার প্রভিতার উপর দাবী
করিয়াছিল। নতুবা হিন্দী 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' রচনা
সম্বন্ধে তাঁহার সজ্ঞিত বহুতথ্যপূর্ণ দায়িত্ব পত্রের প্রব-
র্তন ও সম্পাদন করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে যুগান্তর
আনিবন করিয়াছিলেন, প্রাকৃতিক জুগোপ ও ইতিহাস

বিবধক প্রাণি রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের
সম্পদ বর্ধিত করিয়াছিলেন এবং মিত্র ও
নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের গুণিত,
উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা পাইয়া-



রায়েজলাল মিত্র

ছিলেন, তাঁহার
প্রতি উপযুক্ত মতান
প্রদর্শনে, বঙ্গ
সাহিত্যে তাঁহার
কিঞ্চিৎ চিহ্নমাত্র
করিবার জন্য
স্বাভাবিক যোগ্য
এত উদ্যম
ব্যক্তি ন। তাঁহে-
প্রশংসার অনন্ত-
সাধারণ প্রতিভা
কেবল মাত্র বঙ্গ
সাহিত্যের উন্নতি
করে বিনিয়োগিত
হইত তাহা হইলে
বাঙ্গলা সাহিত্য যে
আজ কতদূর সমৃদ্ধ
হইত তাঁহার ইচ্ছা
করা যায় না। প্রক-
ল্পিত শ্রুতি জ্যোতি-

রিত্র নাথ ঠাকুর একবার একটি পরিবেশ বাগানের
পুষ্প করেন। বাঙ্গলায় পরিভাষা বাঁধিয়া
বেওয়া ও অন্তর উপরে বাঙ্গলা ভাষা ও
সাহিত্যের পুষ্টি সাধন সেই সমস্ত উদ্বেগ ছিল।
বর্তমান বিধে সাহিত্য পরিষদের উদ্বেগেই সাহিত্য
সেই সমস্ত উদ্বেগের অনৈক্য ছিল, না। রায়েজ-

লাল উৎসাহের সহিত সেই সভাও বোধবান
করিয়াছিলেন ও ভারত সভাপতিগণ স্বাকার
করিয়াছিলেন। বরিসম্প্রদ এই সভার অগ্রতম

সভা ছিলেন।
য যী জে না থ
ঔহার 'ঔ'রন
স্ব'ত'লিখ
হাছেন :-

সিঃ

যে নে যে
কহদিন সভা
বাগিয়া ছিল,
সমস্ত কাজ
এক রংগে-
লাল মিষ্ট
ক রি তে ন।
ভৌগোলিক
পরিচাযানি-
য়েই আশা
প্রথম হস্তক্ষেপ
ক রি তা হি-
লাম। পরি-
ভাষার প্রথম
বসুধা সমস্ত
বালেশ্বরগাই
টিক করিয়া
বি বা হি-
গেন। ০ ০

বালেশ্বর-
লাল মিষ্ট
স্বা স্বা ভী

ছিলেন। তিনি একাই একট সভা। এই উপলক্ষ্যে
ঔহার 'সহিত পরিচিত হইয়া আমি যত্ন হইয়া-
ছিল। ০ ০'

মানিকভদ্রার বাগানে দেখানে কোট অব

ওয়ার্ড ছিল লেখা: আমি যখন তখন ঔহার
সঙ্গে দেখা করিতে হইতাম। আমি সভাসে হাই-
ভাম—দেখিলাম তিনি লেখা পড়ার কাজে নিযুক্ত

আছেন। আর
বয়সের অধি-
বেচনা যখনই
অসংকেত আমি
ঔহার কাছে-
র ব্যাখ্যা ক-
তিভাষ, তিভ
যে বক্তৃতা-
বাক্যে দুই-
কাল অগ্রসর
দেখি নাই।
আমাকে যে-
ধবা মাত্র
তিনি কাল
রাখিয়া বিধা
কথা পাঠ
করিয়া দি-
তেন। সকলেই
জানেন তিনি
কানে কন স্ত-
নিতেন। এই
যত্ন পায়-
গকে তিনি
আমাকে প্র
করিবার অব-
কাশ দিতেন
না। কানে
একটা বক্তৃ



বিশ্বনাথ মিত্র

প্রথম ভূমি। তিনি নিজেই কথা করিয়া
হাইতেন। ঔহার সুখে সেই কথা শুনিবার লজ্জাই
আমি ঔহার কাছে হাইতাম। আর কাহারো
সঙ্গে বাগালাগে এক নতুন নতুন বিষয়ে এক খেদ

করিয়া ভাবিবার জিনিষ পাই নাই। আমি হুতু হইয়া তাঁহার আলোচনামত। বোধ করি তখন কার কালের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে সমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যে সব বই পাঠান হইত তিনি সেগুলি পেন্সিলের দ্বারা বিরাট নোট করিয়া পড়িতেন। এক এক দিন সেই রূপ কোন একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা ভাষাভিত্তিক ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা করিতেন,

তাঁহাতে আমি যেরূপ উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভাল করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং বাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন। তখন যে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আবির্ভা হোঁটাইয়াছিল সেই সম্বন্ধে আর কোন সম্ভাব্য বিচুতায় সুযোগেরা না করিয়া যদি একমাত্র নিজ মহাপ্রত্যক্ষ দ্বারা

কাম করাইয়া লওয়া হইত তবে বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের অনেক কার্য কেবল সেই একজন ব্যক্তির দ্বারা অনেক দূর অগ্রগতি হইত সম্ভব নাই।

সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের অন্ততম নেতা, ‘কলিকাতা রিভিউ’ প্রকৃতি পত্রের সম্পাদক, ছাত্রকল্যাণ ঠাকুর প্রকৃতির ইংরাজী জীবন-চরিত্রাচারিকা, ‘উত্তিষ্ঠান কৌশল’ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখ্যপত্রের সম্পাদক মনোমোহন কিশোরীচাঁদ

দ্বিজ রায়চন্দ্রগাল বিহের একজন অন্তঃসং বন্ধু ছিলেন। উভয়েই ইংল্যান্ডে অধ্যয়ন পড়িত ছিলেন। উভয়েই ব্রিটিশ ইতিহাস এম্পায়রিং প্রকৃতি রাজনীতিক সভ্য এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল সভ্য বক্তৃতাবাদ এবং সংবাদপত্র প্রতিপাদ্য প্রবন্ধাদি দ্বারা সেকালে প্রবলে পোক মত পুষ্টি করিতে সক্ষমতা করিয়াছিলেন। অপর কবি মনোমোহন কিশোরীচাঁদ সম্বন্ধে ‘স্বদেশী কাব্য’ লিখিয়াছেন—

“সাহসী বিশেষীচাঁদ
কৌশল সম্পাদক,
লিখিতে বলিতে পটু
যেণে পালক।”

বিশেষীচাঁদ স্বয়ং তাঁহার জ্ঞাতা শ্যাম-চাঁদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সেবা করিবার অবসর না পাইলেও তাঁহার উত্তীর্ণ অল্প বয়সে চোঁট পাইতেন তাঁহার প্রাণে সংঘর্ষে সত্য-ভূতি প্রদর্শন করিতেন। হামনাচার্য তর্কায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মনোমোহন দ্বিজ, রতনাল বন্দ্যোপাধ্যায়,



বর্তমানের চাঁদা গাও

মাইকেল মধুসূদন প্রকৃতি তাঁহার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রেডার্স-ট্রেন্স লঙ্কন পুস্তক একটা পুস্তক পুস্তকের তালিকা দৃষ্টে প্রচীত ও যে, কিশোরীচাঁদ রায়মোহন রায়ের সাহিত্যিক সাংগ্ৰহ করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। রায়চন্দ্র গালের সহিত মধ্যে মধ্যে কিশোরীচাঁদের বাঙ্গালী সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হইত। এখন বর্তমানের ‘স্বদেশী’ প্রকাশিত করেন সেই সময়ে একদিন

কিশোরীটাম রাধেজ্ঞানালকে বহু বর্ষের রচনা-
পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।
কিশোরীটামের কোঠা ঘোড়ার পুরনীয় ঐচ্ছিক
সংকলনে বহুখণ্ডে বর্ণিত যে, তিনি সেই সময়ে
সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাধেজ্ঞানাল কাগজ-
খানি মাঝিরা চাড়াই বসিলেন তাৎক্ষণিকে সম্পাদক
মহাশয় আইও একটু অবস্থিত হইলে তাঁহা হয়।
একটী প্রবন্ধে দুই এক স্থানে টংয়েরও পক্ষ ব্যবহৃত
হইয়াছিল এবং দুই একটী ইংরাজী পক্ষেও ব্যবহৃত
বহুস্থান হয় নাই তাহা দেখাইয়া বসিলেন। এখানে
নবীন পাঠকগণকে বহা অস্বাভাবিক হইবে না যে,
বিবিধ সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পাদনাকালে
রাধেজ্ঞানাল পণ্ডিত মহাশয়ের সহায়তার ভাষায়
বিশুদ্ধি কার্য ব্যতীত আর প্রয়াস পাইতেন।

যিনি পাক্কা গণিতগণের সিদ্ধান্তসমূহ স্মৃতি
তরু বারা অনাধারে বসন করিতেন তিনি যে

পাক্কা বৃক্ষের অভিব্যক্তি আপেক্ষা স্বাধীন চিত্রা-
শ্রুতি সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তি বৃক্ষাধীন বিবেচনা করি-
বেন তাহা আশ্চর্য নহে। একবার কোন লাহার
সত্য কোনও বিষয়ে রাধেজ্ঞানালের সহিত
কিশোরীটামের মতান্তর হয়। কিশোরীটাম স্বীয়
হস্তের সম্বন্ধে কোনও চিত্রাশ্রিত বিবেচনা লেখকের
একখানি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে তিনি
তিন দিন বহিরা অভিনিবেশ সহকারে সেই প্রব-
ন্ধের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে
উপনীত হইয়াছেন। রাধেজ্ঞানাল সেই প্রবন্ধের
নাম স্মরণার্থক বসিয়া উঠিলেন “যদি তাঁহার প্রব-
ন্ধ পাঠে বন্ধুর তিন দিন অভিনিবেশ করিয়া থাকেন
তাহা হইলে প্রবন্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে যে, বন্ধুর
তাঁহার অনুশীলনের তিন দিন বৃক্ষ নষ্ট করিয়া
ফেলিয়াছেন।”

প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি—প্রথমভাগ

(উচ্চাঙ্কুর দ্বিতীয়)

প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি—প্রথম
ভাগ—ভারতীয় হিন্দু ন্যায়ের নাম লাহা,
এন এ, বি এন, সি এডি প্রমুখ Studies in
Ancient Hindu Polity পুস্তকের বস্তুভাষ্য।
যে কথখানি পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা ভারতীয়
প্রাচীন হিন্দু-ন্যায় ও আলোচনার সহিত পরিচিত
হই, এখানি ভারতের মধ্যে অস্তিত্ব। এই পুস্তক
প্রণয়ন করিয়া লাহা মহাশয় বিশ্বজন-সমক্ষে সমা-
দৃত হইয়াছেন—তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া,
তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সংবেদনার ফল পাইয়া আমরা
বিস্মিত ও উপকৃত হইয়াছি। গুণীপূর্ণ চতুর্ধনতকে
ভারতে যে রাজ্য-শাসনপ্রণালী বিদ্যমান এমন সূচক
দণ্ডনীতি ছিল তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি

না। সংবেদন ও সত্য-প্রতিপত্তি কৌশল্যের স্বর্ণনিয়ম
অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে।

অনেকের ধারণা প্রাচীন ভারতীয় ন্যায়ের
ধারা কেবলমাত্র বর্ষ ও বর্ষের অভিব্যক্তি ছিল।
পার্বিক ব্যবহারিক জ্ঞান প্রাচীন ভারতীয়ের ছিল
না। আধুনিক সংবেদনার ফলে এ কলঙ্ক কাটিয়া
আমাদের সুস্থিতি। ধর্মার্থকামমোক্ষ-লাভের উপায়
তত্ত্বের সহিত প্রাচীন ভারতে যে পরিচিত ছিল তাহার
জুড়ে নিবন্ধন অনুশীলন-সম্বন্ধে প্রচারিত হইয়াছে।

এই সুচিহ্নিত পুস্তকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছবি
লিখিয়াছেন, অদ্বৈত ঐতিহাসিক ও বাস্তবায়ন-
ভারতীয় বাস্তবসম্মত সুযোগাযোগের বহান। এখানেই
তিনি স্মৃতিতে প্রয়োগ করিয়াছেন, দণ্ডনীতি-প্রণয়ন।

শ্রেণীভেদে যাত্রী চাপকা ও কৌটিল্য একবাক্যে।
তৎপরে তিনি প্রতিশর করিয়াছেন এখানি ভাৱভীর
অজ্ঞাত যত্নস্বয়ং ভাৱ কোন এক বিশেষ
চরণের লক্ষণ নয়—কৌটিল্য স্বয়ং ইহার রচয়িতা।
যবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অনেক-
স্থলে প্রত্যক্ষদর্শী রাজকর্ণচারিণী ভাৱকে অনেক
উপাধান দিয়া সাংগো করিয়াছে। চাপকা সেন্তনীর
লক্ষণ ও সম্পাদন করিয়াছেন।

তৎপরে সুযোগাধ্যায় বংশধর যে কয়টি যোকে
শ্রেণীভেদে নাম ধোণ ও অপ্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ
আছে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। বলা বাহ্যে
প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণীভেদে নাম পুস্তকে কুত্রাপি
দৃষ্ট হয় না। মেগস্থিনিদের বিবরণ ও অর্ধপ্রাক্তোক্ত
যোকের সাধু্য দেখাইয়া তিনি কৃত্তিকা পরিসমাপ্তি
করিয়াছেন। এস্থলে কৃত্তিকা হইতে কিয়ৎপল
উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যায়:—“গাত্যের প্রবান রাজ-
পুত্রবংশের মধ্যে কাহারও কাহারও উপরে বাহারের,
কাহারও কাহারও উপরে নগরের এবং অত্র
কাহারও উপর গৈত্রের তাহ গুণ আছে।” ইহার
সহিত অর্ধপ্রাক্ত বর্ণিত ‘সম্রাট্য’র সাধু্য আছে।
এই ‘সম্রাট্য’র অধীন ‘পদ্যাত্যক’ ও ‘ভদ্রাত্যক’
ঐক্যপুত্রবংশ মেগের বাসিন্দাবির তৎসংবাদ
করিতেন। নাগরিকের অর্ধপ্রাক্ত নগরের শাসনকর্তার
উপরে নগরের স্বাধ্য ঐক্যিত রক্ষাও শান্তিরক্ষার
তার ন্যস্ত ছিল এবং ‘সাম্যাত্যক’, ‘পদ্যাত্যক’, ‘সেনাপতি’
ঐক্যিত উপর সামরিক কাধ্যাবির তার ন্যস্ত ছিল।

(২) “কোন কোন কর্ণচারী যাত্রী তৎসংবাদ
করিতেন, অথী অরিল করিতেন এবং যে সপ্ত পথ
দ্বিধা বন্ধ বালেশর বল ছোট ছোট বালে প্রবেশ
করিত, সেই সপ্ত পথির্দর্শন করিতেন।” কৌটিল্য
ও উল্লেখ করিয়াছেন, ‘সাম্যাত্যক’ অধীন বিভিন্ন
কর্ণচারীরা কেহে জলসেচন-প্রশাসী, নদী ও অত্রাজ
জল পথের তৎসংবাদ করিতেন। অর্ধপ্রাক্ত-বর্ণিত
‘গোপ’ ‘হানিক’ ঐক্যিত কর্ণচারীগণ অথী অরিলের

কাধ্য করিতেন। (৩) “সেই কর্ণচারীগণই শিকার-
রীতিদের উপর কর্ণ করিতেন।” অর্ধপ্রাক্তে শিকারী-
দ্বিগকে ‘বহীত্ৰাত্যক’র (মোচরণ-কৃষির পরিসরক,)
অধীন বসিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (৪) “তীংগা
কর আহার করিতেন ও বিভিন্ন উপজীবিকার উপর
দৃষ্ট রাখিতেন।” অর্ধপ্রাক্তে রাজব ও কর-সংগ্রহ
বিভাগের সর্গপ্রবান কর্ণচারীরা ন্যস্ত ছিল ‘সদ্য
ধর্তী’। (৫) “তীংগা সামগ্ৰ্য নির্ধণে করাইতেন।”
অর্ধ প্রাক্তেও উক্ত হইয়াছে যে, সম্রাট্যের কর্ণস্ব
এই কাধ্য নির্ধারিত হইত। (৬) “প্রদ বিভাগের
কর্ণচারীগণ শির-কাষের সপ্ত বন্যেবস্ত করিতেন।”
এ কাধ্যভার যে সপল রাজকর্ণচারীনের উপর
ধাকিত তাহাও অর্ধপ্রাক্তের অর্ধপ্রাক্ত, প্রথম অধ্যায়
১৬ যোকে দেখিতে পাওয়া যায়। (৭) “কেবলমাত্র
কর আহারের অন্য নহে, বাহাতে অন্য ও মুদ্রা
সম্বন্ধে রাজসরকার সপ্ত সংবাদ পাইতে
পাওন, তাহার অন্য তৃতীয় বিভাগের কর্ণচারীগণ
কবন্ কাহার লক্ষ হইল এবং কবন্ কি তাহে
কাহার মুদ্রা হইল তাহার সমুদ্রবান করিতেন।”
অর্ধপ্রাক্তেও ‘হানিক’ ও ‘গোপ’ ঐক্যিত কর্ণচারীগণ
আদনসুভারীর কাধ্য করিতেন। বসিয়া নির্দেশ
আছে। (৮) “ওর্ধ বিভাগের কর্ণচারীগণ যাবদার-
বাসিন্দাবির তৎসংবাদ করিতেন। ইংগা
জ্যেদের ওরন ও পরিবাসাদির উপর দৃষ্ট রাখিতেন।”
অর্ধপ্রাক্তবর্ণিত ‘সাম্যাত্যক’কে কম ওরনের বাটবাহা,
কাটা, বাড়িগায়া ও কম যাপেই বেক, কুন্ডক
ঐক্যিত জ্যেদের উপর দৃষ্ট রাখিতে হইত, বাহাতে
নিশ্চিত (ভেদাল) জ্যে এবং অপেক্ষাকৃত মধ্য মিনিব
ভাগ বসিয়া কীকীত না হয় তাহাও প্রতি লক্ষ্য
রাগিত হইত।

আলোচ্য পুস্তকে প্রথম অধ্যায়ে শাস-বনন,
জল-সেচন, আবহবিত্তা; বিভীষ অধ্যায়ে গৃহশাসিত
পত ও পতচর কৃত্তি; তৃতীয় অধ্যায়ে গৃহশাসিত
পত বিভাগ—সুন, অরগা ও অথ ও ওর্ধ অধ্যায়ে

পক্ষ পালন বিধান—হটী সংক্ষেপে আলোচনা
কৃত হয়। তৎকালীন পণ্ডিতেরা পত্রবিশেষ লক্ষ্যে
যে সকল সম্বন্ধে উপনীত হইয়াছিলেন, সে সম-
স্ত আদিগ ও অন্তঃস্থ বলিয়া কল্পিত হইতেন।
সকল অধ্যায়ে স্থলপত্র ও দান সংক্ষেপ ও বর্ষ অধ্যায়ে
লোক হিতকর বিবিধ কল্পনার কথা আলো-
চিত হইয়াছে। অপর্যাপ্ত চারি প্রকার চিত্রবর্ণনা
পাশ্বে বিশেষভাবে পরিচয় পাওয়া যায়—
চিত্রবৎসক বা ত্রিভুজ, বিদ্যুৎচিত্রবৎসক ‘কল্পনোৎপাদ’,
‘সুতীক্ষ্ণাধি লংহা’ বা সূত্রিতা চিত্রবৎসক এবং
লক্ষ্যভিত্তি নিপুণ সাময়িক চিত্রবৎসক ও শুভ্রা
কীর্তি। তৎকালে চিত্রবৎসকের অব্যবহাস বসন্ত
কোন যোগীর ঘৃণা ঘটাইলে প্রমাণিত হইলে
তাহাকে শাস্তি পাইতে হইত। আত্মোচ্ছিন্নতার
বিধান অব্যবহাস দ্বারা মরণ ও জনাতীর্ণ স্থান সমূহের
অবিবাহী বিগকে যোগদান করিবার ব্যবস্থা রাজ-
সংকল্প হইতে হইত। মহামায়ে নিরাপত্তার পক্ষ
অপেক্ষিত হইত। অধুনা প্রচলিত মিউনিসিপ্যাল
আইনের অনুসরণ বিধি ব্যবস্থা তখন ছিল। এমন
কি সুসংগত ব্যবস্থার বহিঃসংগত তখন ছিল।
সকল অধ্যায়ে ‘ব্যবাস্য পুস্তক’ বা ‘সমাধারে’ বিষয়
আলোচিত হইয়াছে। ঐষ্টম অধ্যায়ে বর্ষাবিক্রমের
কথা বিস্তৃত হইয়াছে। তখন দুই প্রকার বিচার্যাস
ছিল—‘বর্ষান্ত’ ও ‘বিচার্যাস’ প্রকারের নিজেদের
মধ্যে যে সকল সামান্য বিবাদ বিগদান হইত, তাহার
বিচার হইত। ‘চালা’ বা ‘চালসরকারের’ বিজ্ঞে-
কোনও প্রকার অপরাধ জনসাধারণের অর্থনা বহ-
লোক সম্পর্কিত কোনও বৃত্তান্ত প্রতিষ্ঠানের অনিষ্টকর
কোনও অপরাধ অর্থনা নষ্ট হয়। প্রকৃত ভাষণ অপ-
রাধের বিচার ‘কলিক শোনে’ বিচার্যাসে হইত।
নবম অধ্যায়ে বিচার-পদ্ধতি বিস্তৃত হইয়াছে, বর্ষ,
ব্যবাস্য প্রচলিত রীতি ও রীতি বিধান এই চারিটি
মূল সূত্র অব্যবহাস বিচার-কার্য সম্বন্ধে হইত। নবম
অধ্যায়ে ব্যবহার বা ‘চুক্তি’ সংক্ষেপে যে সকল কথা
আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে আধুনিক ভারতীয়
চুক্তি আইনের মূল সূত্রগুলি অন্তর্ভুক্তভাবে দেখিতে

পাওয়া যায়। প্রকৃত ব্যবহার নিম্নলিখিত কার্য
উপক্ষে সম্পাদিত হইত। (১) বণ দান (২)
বিক্রয় (৩) নিবেদন (প্রকৃতিতে সজ্জিত দান) (৪)
উপনিষ (সুত্রকৃত ও সুত্রকৃত অব্যবহাস কোন
দান সজ্জিত দান) (৫) বন্ধক বা ভাণ্ডার (৬)
ভাড়া (৭) সম্ভার (৮) কর্ণ নিবেদন সম্ভার
বহিঃসংগত (৯) অস্তিত্ত বিবিধ প্রকার চুক্তি।
আদি (pledge), আদায় বা হটী, প্রকৃত ভাণ্ডার
চুক্তির কথাও অব্যবহাসে বর্ণিত হইয়াছে।
Tender ও Right of pre-emption সংক্ষেপে
আধুনিক হস্তের অনুসরণ বসন্ত ও এ পুস্তকে দেখিতে
পাওয়া যায়। ‘উপযুক্ত কারণ’ বা ‘উচ্চতর
বর্ষ উপযুক্ত সময়ে তাহার প্রাণ টাকা অব্যবহাস
নিকট হইতে প্রণয় না করে, তবে তাহার
ব্যবসায় অর্থদত্ত হইত। একজন অব্যবহাস অর্থদত্ত
তাহার বর্ষ টাকা সূত্রীয় পক্ষে কার্যকর নিকট
লক্ষ্য রাখিতে পারে এবং বর্ষ তাহার প্রণে, তবে
সেই দিন হইতে আর সূত্র তাহাকে দিতে হইত
না।”

অপর্যাপ্তের ওয়াহার তারিখ হইতে বণ বৎস-
রের মধ্যে বণ আদায় না হইলে তাহা তাহারি
হইত।

তখনকার দিনে বন্ধকী বণ সূত্রের দার বার্ষিক
১০% মুদ্রা ছিল, অব্যবহাস বণ উচ্চতর সূত্রের
দার বন্ধকী বার্ষিক ১০% মুদ্রা ছিল। বণ অধ্যায়ে
সংক্ষেপে অর্থদত্ততা এবং বণ বৎসর অর্থদত্ত হইবার
আলোচনা আদিতেই অনুগাতেই সূত্রের দার বৃত্তি
হইত। নিম্নিষ্ট উচ্চতর হস্তের অতিরিক্ত সূত্র লইলে
তাহাকে বন্ধিত হইতে হইত।

পুস্তক বানির অনুবাহ কল্পনায়েন ঐষ্টক কালো-
প্রেরণ বাণ্ডার এন এ ব্যবসায়। অনুবাহ প্রাণ
হইয়াছে। পুস্তকের দ্বারা কালস ভাগ মূল্য ১০-
টাকা। সূত্রের সর্বিত্ত বলিতে হইতেছে প্রাণ
বোঝার অনুবাহের কলে পুস্তকে বর্ষ বোঝা বর্ষান্ত
হইয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখ



প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রণেতা—
ডাক্তার কুমার প্রিয়কান্ত নরেন্দ্রনাথ সাহা
ব. এ. বি. এল. পি. জি. এ. এ.

ଅମ୍ବୁନା



କ୍ରୀଷାମଚକ୍ରେର ବନଗମନ ।



৩শ বর্ষ,

মাঘ, ১ ৩০

১০ম সংখ্যা

আত্মা

(খ্রিস্টাব্দ ১৯০৭ বিক্রমাব্দ ১৯৫৩)

(১)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, আত্মা যাক্স্মেরই
আছে, ইতর প্রাণীদের নাই। তাঁহাদের মতে ইতার
কার্য—বিবেক বলিহীন বাহ্য, তাহা যাক্স্মেরই আছে,
যাক্স্মেরই জীবের বিবেক নাই; সকল জীবেরই
প্রাণ আছে, কিন্তু একমাত্র বিবেক যাক্স্মাতিকে
প্রাণিতাজ্ঞা স্বতন্ত্র এক প্রেরণিত্ব করিয়াছে।
যাক্স্মের মধ্যে যে বস্তুর বিনাশ নাই এবং জড়ের
সহিত কোন সম্পর্ক নাই তাহাই আত্মা। কেহ
কেহ আবার শরীর, প্রাণ, মন একে আত্মাকে সম্পূর্ণ
রূপে পূর্বক বস্তু বলিয়া মনে করেন। কাহারও
কাহারও মতে আবার শরীর হইতে প্রাণ, প্রাণ
হইতে মন একে মন হইতে আত্মার উৎপত্তি হই-
য়াছে। কিন্তু আত্মা যে বস্তুত: কি তাহা অতি অল্প
লোকই স্থির করিতে পারিয়াছেন। অধিকাংশ দার্শ-
নিকের মতে যাক্স্মের মধ্যে বাহ্য চিন্তা এবং জ্ঞান

করে তাহাই আত্মা। কিন্তু আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে
পূর্বই মতভেদ। অন্যদের বেশে দার্শনিকেরা আত্মার
উৎপত্তি স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন আত্মা
অজ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রায়ই এ মত সমর্থন
করিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে ঐতর্য আত্মার
অমরত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, আত্মার
বিনাশ নাই বটে, কিন্তু আত্মার উৎপত্তি আছে।
যে বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে তাহা যে ক্ষয়ন করিয়া
আবনাদী হইতে পারে ইত্যাদের অনেকে তাহা
ধারণার আনিতে পারেন না। সেইজন্য অনেকে
আত্মাকে উৎপত্ত ও বিনাশশীল মনে করেন।
আবার এক প্রেরণী দার্শনিক আছেন অকৃত্রিমিক
জ্ঞানের ধারার ধারণার ব্যতিরেকে। তাঁহারা বলেন,
এই মত ভগবতের যে উপদান, আত্মারও সেই
উপদান। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির বৃত্তীকৃত কারণ
অকৃত্রিম, এক আত্মা, মন, প্রাণ ও শরীর জড়ত্বেরই

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিকাশ যাত্রা। সকল দিক্ দিয়া যেখানে যেখানে যাত্রা, প্রধানতঃ ভিন্ন প্রকার মতই প্রবণ; এক প্রকার মত এই যে ভক্তত্বই জগতের মূলভূত কারণ; দ্বিতীয় প্রকার মতে, আত্মা ও জড় পরস্পর স্বতন্ত্র, আত্মাতে ভক্ত এবং জড়ে চৈতন্যের কিছুই সন্শ্লক নাই; তৃতীয় প্রকার মত এই যে, আত্মাই সত্যের মূল, আত্মা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। পাক্কাটা বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব এবং পরকাল সম্বন্ধে কোন কথাই বলে না। সেখা যার কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বও মানেন না। কারণ, তাঁহারা ইহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পান না। কাহারও কাহারও অনুমান এই যে, জীবন, ভক্তেরই একটা ক্রিয়া বিশেষ (a mere function of matter) এবং মনোভূতি আর কিছুই নহে, মস্তিষ্কের একটা নির্গাস-বস্তু (a secretion of the brain) — শিল বেদন দ্বকতের নির্গাস, সেইরূপ। কেহ কেহ আবার জীবনকে পৃষ্ঠভূত সংবিৎ এবং অতীতের সম্মাননা-নিষ্ঠ ছাড়া আর কিছুই বলে করেন না। জড়বাদীরা আত্মা এবং আধ্যাত্মবাদীরা তৌতিক বা জড়সম্বন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। জড়বাদী এবং আধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে এই ধ্ব চিরকালই আছে।

যদি ঈশ্বর এবং জীবের অস্তিত্ব বিবাস না করা যায়, তাহা হইলে বর্ষ সত্ত্ব হয় না। ঈশ্বর এবং জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাসের উপরেই বর্ষের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

আত্মার অস্তিত্বে ও অন্তরের বিবাস, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মানুষেরই চিত্তকল বিচিত্রে ইচ্ছা, মস্তিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। ইহাতে কি বুঝায়? অমর্য যে আত্মার প্রকৃতিগত বর্ষ, ইহাতে কি ইহাই স্থানা করে না? বাব্দ-সুন্দর, তাঁহার "Life and Religion" নামক পুস্তকে (১৯৫

পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন, মানুষের অন্তরে জীবনের আত্ম-রক্ষার এক দুর্দমীয় আকাঙ্ক্ষা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবন আত্মরক্ষার প্রকৃতিতে, জীবনের শেষে, দুর্ব্ব অমর্যের অন্তরের আশায় ইহা প্রকাশ পায়। আত্মার মানস-ক্ষেত্রে এই ইচ্ছালতা সোপিত হইল কেন? যদি অমর্য কথার কথা হয়, তবে অমর্যের আকাঙ্ক্ষা মানবাচার বজাবসিদ্ধ বর্ষ কেন? অমর্য দেখি, প্রকৃতিগত জাগতিক প্রকৃতি মনেই মূল উদ্ভেদ আছে। অমর্যের আকাঙ্ক্ষা যখন মানবাচার প্রকৃতিগত বর্ষ, তখন মানবাচার বিনাশ কখনই হইতে পারে না। আত্মা যে মর্যমণীল নহে, মানবাচার যে পরকাল বলিয়া নিছ আছে, এই বিবাস মানব জাতির প্রকৃতিগত বর্ষ। কিন্তু মানবাচার পরকালটা যে কিস্ত্রণ, এসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধারণা! বর্তমান পাণ্ডি জীবনের অবসানে, জন্মান্তর দ্বারা যে মানবাচার নবজীবনের পুনঃ স্রষ্টা হই, এই ধারণার বিশ্বজাতির একটা বৈশিষ্ট্য স্থিতি হয়। এই ধারণার বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে এখন অনেক স্থলে অনেক প্রকার আলোচনা হইতেছে। পাক্কাটা মার্মনিকদের কেহ কেহ ক্রমশঃ বৃত্তিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, একমাত্র জন্মান্তরধারের দ্বারা ইচ্ছা জীবন-সমতার সমাধান সম্ভব হইতে পারে।

দ্বিতীয় ধারণা এই যে, আত্মা শরীর নহে, শরীরের অবিকারী। আত্মা জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত পরস্পর্য সেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করে। বৌদ্ধ, জৈন, সাম্মা, মঠেতাবাদী, বিন্ধ্যীষ্টেতাবাদী, বৈতাবাদী প্রকৃতি সকলেরই এই মত। আধুনিক ইহুত্বোদের মত এখন অন্তরূপ, কিন্তু প্রাচীন ইহুত্বোদের এই মত অবিশিষ্ট ছিল না। জন্মান্তর-ধারের আপত্তি-কারীদিগের মধ্যে জন্মান্তর-বাদ সম্বন্ধে আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, প্রত্যেক জীব, পূর্ণ-পূর্ণ অমর্য, জীবন গাণন করিয়াছে, অথচ পূর্ণ পূর্ণ জন্মের জীব-

নের ঘটনা, তাহাদের সকলের দৃষ্টি থাকে না। যানবাখা যদি পূর্ন পূর্ন জন্মে জীবন যাপন করিয়া থাকে, তবে তাহার পূর্ন পূর্ন জন্মের জীবনের ঘটনা, তাহার মনে থাকে না কেন? এই প্রশ্নের সমীচীন উত্তর এই যে, মনে যে থাকিতেই হইবে, তাহার কোন মানে নাই। আমাদের বর্তমান জীবনেরই বা কতটা কথা মনে থাকে? অতীত জীবনের কিছুই যে আমাদের মনে থাকে না, তাহাও প্রমাণ করা যায় না। আমাদের অতীত জীবনের স্মৃতি যদি একেবারে বিলুপ্ত হইত, আমাদের বর্তমান জীবন অসম্ভব হইয়া পড়িত। অতীত এক বর্তমান যে এক হইয়া গিয়া, তাহাতে আর্যো সন্দেহ নাই। অতীত আর কিছুই নহে, বর্তমানেরই জনক; বর্তমান আর কিছুই নহে, অতীতেরই সন্তান। অতীতের স্মৃতি ব্যতীত, বর্তমান সম্ভব হইত না। যদি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখা যায়, দেখা যায়, আমাদের বর্তমান জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই আমরা আমাদের অতীত জীবনের স্মৃতির পরিচয় দিতেছি। সন্তঃপ্রহৃত শিশুর হাত, জন্মন, তনুদ্বয় পানের মত তাহার দুখ-ব্যাধান, তাহার অস্তিত্ব জোড়া কোতুক প্রকৃতি কি, তাহার অতীত জীবনের স্মৃতির পরিচয় দেয় না? নিতু যখন কথা কহিতে শেখে, তখন লক্ষ্য করিলে, তাহার অতীত জীবনের স্মৃতির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কথা কহিবার বয় তাহার বেশ সম্পূর্ণভাবে আছে, দীকার করিতে হয় খট, কিন্তু কি তাহে, কেমন করিয়া, কোন্ দিক্ দিয়া, তাহা পরিচালিত করিতে হয়, তাহা তাহার অভ্যাস না থাকিলে, সে কেমন করিয়া, কেবলমাত্র শুনিয়া শুনিয়া, অন্যভাবে কথা; বলিতে শিখা করে? যে সত্যের কাটিতে জানে, সে মনে নাহিলেই, কেমন করিয়া, কোন্ প্রণালীতে, সত্যের কাটিতে হয়, সব তাহার মনে আসে, কিন্তু অস্ত্র সমগ্র, সমস্তক-পট্ট সকল ব্যক্তি, অশরৎক বুঝাইবার সময় ইহা বুঝাইয়া বলিতে পারে না, কারণ তখন, সে, সব

দুনিয়া দিয়াছে। আমাদের অভ্যাস বলিয়া বিনিময় স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

হিন্দুগণ সকলেই জন্মাতরে বিশ্বাসী। সকলেই কর্মফলপাত্রে সুখ দুঃখ ভোগ মানিয়া থাকে; আমাদের অমরণ্য সকলেই বিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের ধর্মগণ লক্ষ্যে বৈত অশেষবাহীদিগের মধ্যে - বিশেষ মত-পার্থক্য আছে।

অশেষবাহী ভীষাচার পাত্রমাধিক্য দীকার করেন না, তাহার কাছে জীবন একটা কণিক বিগাশ মাত্র। অশেষবাহী জীবনের বস্তুগত বা পরিমাণগত সত্তা নাই। অশেষবাহীদিগের সত্য জ্ঞানামাত্র এক জীবনের মতের প্রাধান্য অটনক্য এই বস্তুতঃ।

শত্রুগোষ্ঠের আত্মা বিশ্বাসী, কিন্তু রানামাত্র এবং মঙ্গল মতে আত্মা অশ্রুপরিমাণ। ব্রহ্মস্বরের কতকগুলি হইয়া জীবদেহ অশ্রুপরিমাণের সত্তা করা হইয়াছে। এ লক্ষ্যে জীবনের ভাষা এই যে, ইহা পূর্ন পূর্ন মত। তাহা স্বতন্ত্র পরিবার উদ্ভেদে, ইহা স্থাপিত হইয়াছে। অস্ত্রাঙ্গ ভাগ্যভারতা ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলেন। তাহার বলেন, বাহ-রায়ণ, তাহার নিজের সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন - ভীষাচার যে অশ্রুপরিমাণ, ইহা স্বয়ং বাহরায়ণেরই সিদ্ধান্ত। উক্ত বিধি বোধাত্মের উপকরণদিকায় এ লক্ষ্যে তাহার দৃষ্টবস্তু প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে উক্ত দৃষ্টবস্তুটির অর্থ লক্ষ্য বাহা করিয়াছেন তাহা অতি কষ্টে কল্পনা করিয়া হইয়াছে, কারণ দৃষ্ট-গুলির পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে লক্ষ-রের ব্যাখ্যা কষ্টে কল্পনা করিয়া হইয়াছে বলিয়া প্রতি-পন্ন হয়।

আত্মাসকল যদি ধর্মার্থ সত্তাবিশিষ্ট এবং অশ্রু-পরিমাণ হয়, তাহা হইলে, কার্যে কাহেই তাহারা যে অন্যথা তাহাও দীকার করিতে হয়। জীবন বলিলে, এই কিম্বদন্তি এমন কোন স্থান নাই বা পদার্থ নাই, যাহাতে জীব নাই। এই অন্যথা চৈতন্যময় জীব পরম্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট,

এবং জগতের জড়োপাদানের প্রকৃতি হইতে ইহা-
দের প্রকাণ্ড সম্পূর্ণ বিস্তার। আত্মাণকন শুধু যে
কম তর জড়োপাদান হইতে পৃথক্ ও বিস্তৃত,
তাহা নহে, ইহারা পরস্পর হইতেও পৃথক্ ও বিস্তৃত।
কি বসিগড়, কি উত্তি-স্রাকাতা, কি জীবজায়া,
জীবের অনন্তর কোন স্থানেই নাই। কলে কলে
অন্তরীক সঙ্কটই জীব। সকল স্থান, সকল পদার্থই
জীবই।

দম্ভাচার্যের মতে পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষে যে
কোন পদার্থই আছে, সে সমস্তই জীব-শরীর ছাড়া
আর কিছুই নহে। দম্ভাচার্য তাঁহার তর্ক-নির্ণয়ে
বলিয়াছেন, ‘পরমাণু-প্রদেশেবনস্তাঃ প্রাণিমাশয়াঃ’;
“এক অণুপ্রতিমাণ স্থানে অনন্ত সংখ্যক জীব বাস
করে।” তাঁহার ‘অমৃত্যুখ্যান’ নামক পুস্তকে
তিনি লিখিয়াছেন :

ঈদানংপুলকলাবাপ্তিঃ স্পর্শাৎ কার্ণাৎ রসাত্ বিতিঃ ।

অপি বুকসঃ বৃশ্যন্তে ইতি নানাব্যগ্রা শুবেৎ ॥

“রুল সকল এবং কল সকল শরীরের সাদা
নাইবা বিকসিত হয়; এমন অনেক গাছ আছে
স্পর্শের দ্বারা সমুচিত হয়, কতক শুণি বা স্পর্শ
করিলে সাদা দেয়। ছত্রাৎ এমন কোন জিনিষ
নাই যাহার আত্মা নাই।”

বৈজ্ঞানিক প্রবর ফ্রান্সিস্ ডারউইন,
বুকলতার যে মস্তিষ্ক আছে, তাহার অনেক গ্রামাণ
সংগ্রহ করিয়াছেন। ক্যপেন বাসগ্রেভ (Masgrave)
একটা মাংসাদী গাছ খেবিয়াছিলেন; তিনি বলেন,
গাছটার মস্তিষ্ক ছিল, রাসু (nerve system) এবং
পাকশর (digestive organs) ছিল। অটোথী বঙ্কর
“Response in the living and non-living”
নামক পুস্তক প্রস্তুত করিলে, ঐমধের উক্তির সমর্থন
পাওয়া যায়। অটোথী বঙ্কর মত প্রকাশ করিয়াছেন,
জড় পদার্থ, বৃৎশিঙ, বহু বা কঠোর টুকরা প্রকৃতি
যেওগিকে পূর্বে অচেতন বলিয়া ধরা হইত, তাহাদের
কিছুই অচেতন নহে, সবই চৈতন্যময়, জীবনময়।

জীব-সংকিহের সাদা সকল পদার্থ হইতেই পাওয়া
যায়। তিনি অতি দূর দূর স্বর্গকারে অস্মাণ
করিয়াছেন যে একটা দৌহঃত একটা জীব-
শরীরের সমস্ত জীবন-কার্যের পরিচর পাওয়া যায়।
দৌহঃতেরও নিগ্রা আছে, জাগরণ আছে, কার্ণা
আছে এবং বিশ্রাম আছে; ইহা গ্রিক যেন একটা
জীব। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাকে আত্মা
করিয়া মূচ্ছিত, বিবদ্যাতা অতিচুৎ, এমন কি মৃত
করাও ঘাইতে পারে। তিনি লতনের বৈজ্ঞানিক
সভা, ইহার বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং
লর্ড কেলভিন-গ্রাহু বৈজ্ঞানিকদিগের সমক্ষে প্রমাণ
করিয়াছেন।

আত্মার সম্বন্ধে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মতের মধ্যে
এতদে এই যে, প্রাচ্যের আত্মার অতিব প্রতি-
পাদনের আবশ্যকতাই বিবেচনা করেন না। পাশ্চা-
ত্যেরা কিন্তু আত্মার অতিব প্রতিপাদনের চেষ্টা
তাঁহাদের ধর্মের মূল বিষয় বলিয়া মনে করেন।
আত্মা না থাকিলে নীতি, ধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্য
প্রকৃতির কিছুই বুঝা যাকেন না। সুতরাং এই
আত্মার অতিব সম্বন্ধে অবিশ্বাস অত্যন্ত ভীষণ
ফলপ্রসংগ হওয়াই সম্ভব। ইহাে বিশ্বাস না করিয়াও
নাস্তিক নামের কল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়,
কিন্তু আত্মাে বিশ্বাস না করিলে, কিছুতেই নিরাশ
নাই। যে আত্মার অতিবে বিশ্বাস না করে, সে
প্রকারান্তরে কিছুই মানে না।

মাহুৎবায়েই আত্মার অতিবে বিশ্বাসী, মাহুৎবের
আত্মার অতিবে বিশ্বাস কিছু নূতন ব্যাপার
নহে। মাহুৎবের যে দিন মানব-প্রাণী, খটিয়াছে,
সেই দিন হইতেই মাহুৎব আত্মার অতিবে বিশ্বাসী।
যাহার সত্তা আছে তাহা কখনই বিনাশ প্রাপ্ত
হইতে পারে না; আর যাহার সত্তা নাই, তাহার
আবিসর্গ হইতে পারে না। একেবারে কিছুই যে
সত্তা নাই, ইহা ধারণার আনিত পাড়া যায় না।
কিন্তু আছে এই ধারণার অপরিহার্যতা। ৩১/৩/১৩

অতিব্র প্রতিপাদনের সহায়তা করে। হিন্দুধর্মের পক্ষে ইহা বৃষ্টিয়া উঠা স্থিতিশ কঠিন নহে। কিন্তু পান্ডাসত্যের জড় নইয়া এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন যে অড়ের আকারে আত্মাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহাদের তৃপ্তি হইতে পারে না। পান্ডাসত্যকে যদি আত্মার অতিব্র মানিতে হয়, তাহা হইলে, আত্মা কোথায় থাকে, এবং কতটুকু স্থান অধিকার করে, ইহা তাঁহাকে বুঝিতে হয়। আত্মা যে বেশ-এক কালের অতীত, ইহা বোধগম্য না হইলে আত্মার সম্বন্ধে সকল ধারণা জড়াকারিত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ, অজ্ঞান। কিন্তু জড়বস্তুর বলিলে কি বুঝি? প্রকৃত দার্শনিক ভাবে দেখিতে গেলে ইহা মনের অসুস্থতি উচ্ছেদের কারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুর জড় বলিতে বাহ্য ভাব্য বাহ্য, এমন কিছুই অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। আদম্য সত্ত্বাচর জড় পদার্থ এবং মানস পদার্থের মধ্যে যে অনতিজ্ঞা ব্যবধান বৃষ্টিয়া থাকি তাহা আমাদের একান্ত লাত্ত ধারণা।

যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে জড়জন্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার জ্ঞান অসম্ভব হইত। জড়জন্য যে আমাদের জ্ঞানগম্য হয়, ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, পরম্পর অনতিজ্ঞা ব্যবধানের একদিকে চৈতন্য এবং আর একদিকে জড়পদার্থের গুণই পূর্বক জাতীয় পদার্থ থাকিতে পারে না। স্তম্ভ্যঃ এতদন্তরের মধ্যে হয় আত্মা, না হয় জড়, একটাই বিজ্ঞান আছে। যদি আত্মার অতিব্র বীকার করা যায় তাহা হইলে জড়ের অতিব্র বীকার করা যায় না। পদ্যান্তরে যদি জড়ের অতিব্র বীকার করা যায়, তাহা হইলে, আত্মার অতিব্র বীকার করা যায় না। পান্ডাসত্য বিজ্ঞান, অসুস্থতি, জ্ঞান এবং স্থিতির কেন্দ্র-বস্তুর যে আত্মা, তাহা যে জড়পদার্থ-সম্মত, তাহা সমপ্রমাণ করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান এবং স্থিতি ত দুয়ের কথা, সাধারণ অসুস্থতিও যে জড়সম্মত হইতে পারে না, পান্ডাসত্য দার্শনিকেরা তাহা বীকার করিয়া থাকেন। অসুস্থতি ও জ্ঞান

যে জড়সম্মত তাহা আত্ম পদার্থ কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিতেও পারেন নাই। বিবর্তনবাদীরা বল হইতে সর্ব-প্রথম প্রাণের উৎপত্তি বীকার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণ মারই যদি অসুস্থতিসম্পন্ন বসিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে বল হইতে প্রাণের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আজকাল বৈজ্ঞানিক অগ্রেত শক্তিসত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেই উপলক্ষে স্যার অলিভার লড্জ (Sir Oliver Lodge) প্রকৃতি মনোবিদ্যা আশা করিতেছেন যে বৈজ্ঞানিক রাডো ও জড়বস্তুর প্রতিপত্তি আর বেশি দিন থাকিতেছে না; জড়শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তিকে অনেক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক এত পদ্যাদম্মত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক রাডো পদ্যান্তর উপস্থিত হইবে।

জড়বস্তুর প্রত্যয় হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে, আত্মজড়বস্তুর ঠিক মীমাংসা হইতে পারে না।

এখন দেখা যাক, আধুনিক মনস্তত্ত্ব কি প্রকারে কষ্টটা জড়বস্তুর প্রত্যয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপক্রম করিয়াছে।

আমরা পদার্থ সকলকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া থাকি। এক শ্রেণীর পদার্থ ভীষণ, আর এক শ্রেণীর পদার্থ জড়। জড়পদার্থের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, তাহা গতিশীল বা ক্রিয়াশীল নহে। যে পদার্থ গতিশীল, তাহাকে সহজেই আমরা ভীষণ মনে করি। বাহ্য চালাইয়া দিলে চলে, বায়ুহাওয়া দিলে বায়ু, তাহাই জড়। কিন্তু জড়জন্যের প্রত্যেক পরম্পর চাকল্য আছে। আদম্য জড়ের চাকল্যের কারণ যখন চ্যাম্বিতে পারি না, তখন জড়কেও আমাদের চেতন বলিয়া মনে হয়। মানববস্তুর শৈশবাবস্থায় মানব মদীর চাকল্য দেখিয়া নদীকে ভীষণ বলিয়া মনে করিত, বায়ুর চাকল্য দেখিয়া বায়ুকেও চেতন বলিয়া মনে করিত। তখন মাহুদের কাছে প্রকৃতি

চৈতন্যময়ী ছিল। জ্ঞানবান মানুষের মনে হইল, নবীকে কেহ চালাইতেছে, বাবুকে কেহ বগাইতেছে, তখন নবীর সেবতা, বাবুর সেবতার সম্বন্ধে মানুষেরই ধারণা হইল। আবার যখন মানুষের মনে চইল, একজনকেই, সমগ্র জড়জগতের মনে ঐ তত্ত্বময় আছেন বলিয়া জড়জগতের ক্রিয়া ও চাকলা সম্পাদিত হইতেছে, তখন এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা মানব মনে উদ্ভূত হইল। বেটের উপর কথা এই যে, আমরা জড়ের গতি ও চাকলা বাহ্যিক আনিতে পারি না। এখনও যে আনিতে পারি তাহা নয়। বিজ্ঞানও শক্তির কল্পনা করিতে বাধ্য হয়। অগতে শক্তিরই কাণ্ড চণ্ডিতেছে। জড়ের কোন কাণ্ড ব্যক্তিতে পারে না। জন ইয়াই মিল তাঁহার 'Three Essays on Religion' নামক পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের আপনায় যথেষ্ট শক্তি আছে বলিয়াই, তাহার শক্তি সম্বন্ধে ধারণা হইয়াছে। মানুষের যদি আপনার মধ্যে শক্তি না থাকিত তাহা হইলে মানুষের শক্তির সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারিত না। প্রটোর (Plato) মতে, আপনা আপনি গতি ও ক্রিয়াময় বাহ্য তাহাই আত্মা (a self-moving activity)। প্রটোর ত্রিবিধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (১) মানুষের ভিতর এক প্রকার আত্মা আছে বাহ্যিক প্রকৃতি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। প্রটোর ইহাকে appetitive soul নামে অভিহিত করিয়াছেন; (২) আর এক প্রকার আত্মা আছে, তাহা জ্ঞানবান আত্মা, মানুষ তাহার প্রভাবে বুদ্ধ-প্রসূত হয়; (৩) মানুষের কৃতীর্ষপ্রবৃত্তি আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা; জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনাই তাহার কার্য। প্রটোর মতে, শেষোক্ত এই শ্রেষ্ঠ আত্মাই অমর। ইহর জড়বিশেষের তত্ত্বের, এই কৃতীর্ষ প্রকারের আত্মার অস্তিত্ব নাই, একমাত্র মানুষই ইহার অধিকারী।

পান্ডাভাষিণের ধারণা এই যে, একমাত্র মানুষই

আত্মবান। হিন্দু মতে যে আত্মা মানুষের আছে, সেই আত্মাই সর্বভূতে বিদ্যমান; পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, কেহই আত্মার অধিকার হইতে বঞ্চিত নয়। জড়জগতের মূলেও আত্মা আছে বলিয়াই অজগৎ প্রাণময়।

আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুর বাহ্য বামাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ হিন্দুর বিশ্বাস আত্মা অনাদ্য এবং আত্মাই বিশ্বের সূচীভূত কারণ। পান্ডাভাষিণী কিছু আত্মার উৎপত্তিরই আলোচনা করিয়া থাকেন। জড়জগতের আলোচনাই পান্ডাভাষিণীর প্রধান আলোচনা এবং জড়বিশেষের ধারণা পান্ডাভাষিণী কিছুতেই এড়াইতে পারে না।

মানুষের শরীরবস্তুর সমুদয় কার্যই মানুষের অজ্ঞাতমাত্রের হইতেছে। মানুষ ইচ্ছা করিয়া, মতলব করিয়া তাহার কিছুই করে না। স্তম্ভা, অনেকের মত এই যে, শরীরবস্তুর কার্যের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা কোন এক organic principle এর ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। যদি এ organic principle এক জিনিস হয়, আর চিন্তা মন ও বুদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু আত্মা আর এক জিনিস হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত নিরপেক্ষের জীববিশেষ একেবারেই আত্মা না থাকা সম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত নিরপেক্ষের জীববিশেষের ভিতরের অসুস্থত্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলন্ডেরও যে অসুস্থত্ব আছে, তাহারও পরিচয়, পাওয়া যায়। Organic principle ইহর প্রাণিশরীরের মত, মানব-শরীরেরও কার্যকর। আবার অসুস্থত্ব যেমন মানুষেরও আছে, ইহর প্রাণিবিশেষেরও তেমনি আছে। অসুস্থত্ব, মূলে, আমি অসুস্থ করিতেছি, এই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বা self-consciousness বলে। আত্মজ্ঞান বা self-consciousness-বিরহিত জ্ঞানটা যে কি, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যদি সেতপ কোন জ্ঞান থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত জ্ঞানের নিরসুস্থিত অবস্থিত

বসিতে হইবে। বাস্তবিকতঃসম্পন্ন হইবার পূর্বে যেমন জীবজগতে মানবের মানবত্ব সূচ্যে উঠিতে পারে নাই, তেমনই আত্মজ্ঞান বিকসিত হইবার পূর্বে অসুস্থতি বা জ্ঞানের যে অবস্থা ছিল, তাহাকে প্রকৃত অসুস্থতি বা জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু মানব যেমন মানবত্বের নিরুদ্ভূতি হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞান বা অসুস্থতির নিরুদ্ভূতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, অনেক বার্মানিক এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন।

জ্ঞানের নিরুদ্ভূতি হইতে যদি জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে জ্ঞান যে অজ্ঞানজাত ইহা স্বীকার করিতে হয়। হরত Organic principle-এর কার্য জ্ঞানের নিরুদ্ভূতিবিত্ত কোন principle এর কার্য। হরত এক সময়ের সমগ্র জীব জগতে এই Organic principle-এরই কার্য ছিল। Organic principle এর ক্ষুত্রির(development) কোনক্রমে অসুস্থতির হরণ্যাত হয়, এবং অসুস্থতির ক্ষুত্রির চরম অবস্থা মানবমন। প্রাচীন জড়বাদীরা জড়পদার্থসম্বৃত আত্মা স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে যে জড়পদার্থগুণ সমবায়ে আত্মা গঠিত হইত তাহা সাধারণ জড়পদার্থগুণ হইতে পৃথক। তাঁহাদের মতে যে সকল জড়পদার্থগুণ দ্বারা আত্মা গঠিত হইত, তাহারা সাধারণ জড়পদার্থ হইতে বৃহত্তর। এই বৃহত্তর জড়পদার্থগুণের বৃত্তির মধ্যে অবস্থিত থাকিত। শরীরের ভিতর দিয়া বহির্জগতের যে সকল বাত প্রতিক্রিয়া (impressions) মস্তক মধ্যে সঞ্চারিত হইত, সেই সকল বাতপ্রতিক্রিয়া, ক্রম শাসন দ্বারা শাফা দিত। জড়বাদীরা এখন আর সে মত পোষণ করেন না। এখনকার জড়বাদীরা আত্মাকে জড়পদার্থদ্বারা গঠিত বলিয়া মনে করেন না। এখনকার মত এই যে, মনঃমিলিসটা, মস্তক এবং সমগ্র দেহবস্তুর সমস্ত কার্যের পারসামসম্বৃত।

একটা organic principle: নিশ্চয়ই আছে। এই organic principle: জড় শক্তিরই একটা আকার বিশেষ। সাধারণ জড়শক্তি কেমন করিয়া এই বিশেষ আকারে পরিণত হয় তাহা বলা যায় না। এই organic principle এর কার্য সমগ্র জীব জগতের উপর। জীব-শরীরের anic principle দ্বারা গঠিত হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়, এবং ইহা দ্বারা সমগ্র দেহবস্তুর যে কার্য হয়, সেই কার্যের পরিমাণের কোনও ক্রমে অসুস্থতি সঞ্চারিত হয়।

Conservation of energyর নিয়ম অনুসারে, এক প্রকার জড়শক্তি, প্রকারান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে। মস্তক মধ্যে যে জড়শক্তির কার্য হয়, সেই জড়শক্তি কি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অসুস্থতিতে পরিণত হয়? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ শক্তির রূপান্তর গতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কোন মনস্তত্ত্ববিৎ অসুস্থতিক গতিক্রিয়া দ্বারা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, আমাদের মনেরই অসুস্থতি বনোভূত হইয়া বাহ্য-জগতে পরিণত হয়। বাহ্য জগতের যে মন হইতে বৃহত্তর অস্তির আছে, তাহাও কোনও প্রকার প্রোক্ষণ পাওয়া যায় না। জড়বাদীরা তাহাদের মনেরই অসুস্থতিসম্বৃত বাহ্যজগৎকে, তাঁহাদের মন হইতে যে বৃহত্তর কিছু বলিয়া মনে করেন, তাহাও তাঁহাদের মনের কার্য। মস্তক হস্তক আর সমগ্র শরীরই হউক, সবলই মনের অসুস্থতিজাত। মন হইতে কিছুতেই ইচ্ছামিগকে পৃথক করা যায় না। আমাদের মনেরই অসুস্থতি দ্বারা বাহ্য-বস্তু, তাহা দ্বারা আমাদের মনের গঠন বিবেচনা করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যদি আমাদের মন না থাকিত, তাহা হইলে বাহ্যজগতের অতিথ অসুস্থত হইতে পারিত না। বাহ্যজগৎ অসুস্থত না হইলে, তাহা আছে কি না তাহা কে জানিত? আমাদের

মানব যাত্রা বাহুল্যগত প্রতিক্রিষ্ট, বাহুল্যগতের যাত্রা আমাশয়ের মন প্রতিক্রিষ্ট নহে।

বাহুল্যগত আছে, ইহা আমরা যেমন করিয়া জানি? আমাশয়ের অসুস্থত্ব হয় বলিয়াই জানি। তবে এই কথা বলা দ্বিবিতে পারে যে, আমাশয়ের অসুস্থত্বের কারণ বাহ্য, তাহাই বাহুল্যগত। বাহুল্যগত যে আছে, এই ধারণা, আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি, আমাশয়ের হয়। যদি আমরা ইচ্ছা করিয়া বাহুল্যগতের ধারণায় উপনীত হইতাম, তাহা হইলে বাহুল্যগতের যে আশংকা হঃপ্রব, তাহা কখনই আমাশয়ের ধারণায় আনিতাম না। বাহুল্যগত সত্ত্বের ধারণায় আমরা ইচ্ছাপূরক উপনীত হই না, বরং বাধ্য হইয়াই উপনীত হই। সুতরাং মানিতে চাই যে আমাশয়ের মন ছাড়া আরও কিছু আছে। আমাশয়ের মনের অতীত নিষ্ঠুরই এমন কিছু আছে, বাহ্য আমাশয়কে বাহুল্যগত সত্ত্বীয় ধারণায় উপনীত হইতে বাধ্য করে। সে বাহ্যই চটক, বাহুল্যগত। আমাশয়ের মনের অসুস্থত্ব-সম্প্রদায়, তবে বাহুল্যগত সত্ত্বীয় আমাশয়ের মনের অসুস্থত্ব-সম্প্রদায় হইবার কোন কারণ আছে। আমাশয়ের হুঁকিতে বাধ্য হইতে হয় যে, আমাশয়ের মনের বাহিরে এমন কোন শক্তি আছে, বাহ্য আমাশয়কে কোন না কোন প্রকার অসুস্থত্ব করিতে বাধ্য করে। কিন্তু যে শক্তির দ্বারা আমাশয়ের অসুস্থত্বসম্প্রদায় হয়, তাহা যে ভ্রুশক্তি, এরূপ কল্পনা করিবার কারণ কি? এমন আমি বুঝিতেছি যে, এমন কোন শক্তি আছে বাহ্য আমাশয়কে অসুস্থত্ব করিতে বাধ্য করিতেছে, তখন সেই শক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে, আনিও আছে, সে বিষয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে— আনি আছে বলিয়াই, আনি অসুস্থত্ব করিতেছে, ঐক্য আনি আছে বলিয়াই আমাশয়ের অসুস্থত্বসম্প্রদায় করিবার শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করিতেছি। আমাশয় বাহিরে যে কোন শক্তি আছে, ইহা আমরা মনেই যাত্রা প্রতিক্রিষ্ট হইতেছে। আমাশয় একথা বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, আনি নাই, অতঃ সেই শক্তি আছে। আনি না থাকিলে, অতঃ কোন কিছুই অস্তিত্ব আমাশয়ের নিকট

সম্প্রদায়িত হইতে পারে না। যদি বলা যায়, আমাশয় হইতে অস্তিত্ব যে শক্তি আমাশয় মনের অসুস্থত্বের কারণ তখন বিজ্ঞান বলিয়াছে বলিয়া আমাশয় বিশ্বাস, সেই শক্তি আমাশয়ও উপস্থিত করণ। তাহা হইলে তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে, তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাহা হুঁকিবার বা তাহা আমাশয় নিকট সম্প্রদায়িত হইবার কোন উপায় নাই। বাহ্য আমাশয় হুঁকিবার বা আমাশয় নিকট সম্প্রদায়িত হইবার কোন উপায় নাই, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া ধরা যায় না। অবিকল্প তাহা কল্পনামাত্র, কোন হুঁকি নহে। আমরা কোন সত্য হুঁকিবার ক্ষমতা যে সকল হুঁকির অবতারণা করি, সে সকল হুঁকি আমাশয়ের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার সহায় ছাড়া আর কিছুই নহে। সত্যের সহিত আমাশয় মনের বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে হুঁকি মানব মনে কোন সত্য সত্ত্বকে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে না, তাহা হুঁকি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং যোগ্য হইতেছে— যে সত্যের সহিত মনের বিশ্বাসের সম্বন্ধ আছে। যেখানে বিশ্বাস সম্ভব হয়, তাহাই আশা।

অজ্ঞানসৌন্দর্যের বিশ্বাস যে অজ্ঞানসৌন্দর্য আছে। তাহাশয়ের মনে অজ্ঞানসৌন্দর্য সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপন্ন না হইলে, তাহাশয় কখনই অজ্ঞানসৌন্দর্য প্রতিপাদন করিতে পারিতেন না। অজ্ঞানসৌন্দর্য সম্বন্ধে তাহাশয়ের যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস উৎপাদনের সহায়ত্ব, বিশেষ প্রকার হুঁকির সহায়ত্ব, তাহাশয় সেই বিশ্বাসে উপনীত হন, অতঃ তাহাশয়ের সেই বিশ্বাসের আশ্রয়-বরণ তাহাশয়ের যে মন, সেই মনের পারমাণবিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাশয় বিশ্বাস। তাহাশয় বাহ্যের দ্বারা এতঃ বাহ্যের ভিত্তির উপর অজ্ঞানসৌন্দর্য অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহাশয় অস্তিত্ব তাহাশয় বোঝার করিতেছেন না। সুতরাং তাহাশয় যে হুঁকির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, সেই হুঁকির কোনও মূল্য নাই।

আধুনিক পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপক্রম করিতেছে, আমাশয়ের উপনিষদের দ্বিতীয় বহুশব্দ পূর্বে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। উপনিষদের দ্বিতীয় অঙ্গনে যে আমাশয় দ্বারা ইহা প্রতিক্রিষ্ট হয়, আশা অতঃ কোন কিছু দ্বারা প্রতিক্রিষ্ট নহে। আশাই যে, সকলের মূল, আশার মূল যে আর কিছুই নাই, ইহাই মনস্তত্ত্বের চরম পথেবার কল।

পাহাড়ের কথা

(পূর্বানুভূতি)

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুস্বামী]

পাহাড়ী দেশের কথা - পূর্বেরই কথা
হইয়াছে যে পাহাড়ীদের মধ্যে পুরুষ, ছেলে বড়
সকলেই উপার্কনের জন্য প্রমদাধা কাঁচা করে,
সুতরাং কেবল অঙ্গল আদ্যের আলোদের জন্য
কোনরূপ খেলা হুলায় কালকৈশ কঠোর অবকাশ
তাহাদের নাই। তবে যদি কখন অবকাশ পায়, তাহা
হইলে ছোট ছেলেরা দুই এক বকম জোড়া কৌতুক
করে। শারীরিক ব্যায়ামের জন্য নোনাকোট, স্ক্রুটি,
জিননাটিক প্রকৃতির দ্বারা কোনরূপ খেলা তাহাদের
নাই। স্ক্রুটির জন্য ভাল নিকড়র মাটি এবং খালি
গা এই দুইটা জিনিস অকল্প প্রয়োজনীয়। কিন্তু
এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটা তাহাদের বেশে হুত্যা
এবং দ্বিতীয় দ্বিতের উপস্থাপে দ্বিতীয়টা অসম্ভব,
সুতরাং সে সকল খেলার স্ক্রুটিও তাহাদের বেশে হয়
নাই এবং এ সকল খেলা তাহারা খেলেও না। তাহারা
কলে যে ব্যায়াম হিসাবে তাহাদের নতুন খেলার
প্রয়োজন নাই, 'চোলা'ই তাহাদের ব্যায়াম। সে বেশে
পাখরের নাম 'চোলা'। চোলা ভাঙিতে, চোলা বহিতে
সবক দিন যে হাড়ভাঙা পরিভ্রম হয়, ব্যায়ামের জন্য
তাহাই যথেষ্ট এবং সেই পরিভ্রমের পর আর ব্যায়াম
করিতে ভাল লাগে না। যে বেশে নদী বা
পুষ্করী নাই সে বেশের লোকের গায়ে সস্তর
কলনার সাদা, সুতরাং পাহাড়ীদের জন্য জোড়া
নাই। কোন কোন স্থানে লাঠি খেলা আছে বটে,
কিন্তু সে খেলা ছেলেদের মত। তাহার নাম 'ভাঙি
বিও'। লাঠি খেলার আখড়া নাই, ওয়ার নিক্ষেপ
নাই, অগত্যা নিয়মের হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালীদের

মত লাঠিখেল বা খেলোয়াড় পাহাড়ীদের মধ্যে নাই।
পড়া ও রাজপুতানার অধিবাসীদের যেমন তরবারি
নিয়া সহচর, পাহাড়ীদের তেমনই নিয়া সহচর পুষ্করি,
কিন্তু পাঞ্জাবী ও রাজপুতগণ তরবারির নানারূপ খেলা
ও সকলম ফৌজল শিক্ষা করে। সে শিক্ষা ও
অভ্যাস তাহাদের একটা খেলার মধ্যে গণ্য।
পাহাড়ীদের মধ্যে সে খেলাও নাই। এটা অকল্প যে
তাহাদের লম্বা ও কলচের কথা সে বিস্ময়ে সম্বোধ,
নাই। কপাটি খেলা কোন কোন স্থানে আছে
তাহার নাম "হাই গুড় গুট"।

কারসিমে পৃষ্ঠান মিশনারিদের দ্বারা পরি-
চালিত একটা আইনারি স্কুল আছে, ঐ স্কুলের সমুখ
রেল রাস্তার পাশেই একজোড়া পাথরাল বার
পোতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দ্বারা
দাখিলিগি গিরাছেন তাহাদের মধ্যে কেহ সে বার
লক্ষ্য করিয়াছেন কি না জানি না। বর্তমান শিক্ষা
বিভাগের আইন কাছন্ন অহুসারে সরকারি সাহায্য
প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ওটা একটা অঙ্গ কিনে। সেই
আইনের মর্মেদা রক্ষা করিবার জন্য বার জোড়টিকে
নামে মাত্র সাক্ষীগোপাল স্বরূপ খাড়া করিয়া রাখা
হইয়াছে কি না তাহাও ঠিক বলা যায় না, কারণ
আমার স্থানীয় প্রবাস কালের মধ্যে আমি স্ক্রুটি
কত সময় সেই স্থান দিচ্ছি। হাতোয়াত করিয়াছি, কিন্তু
কোনদিন কাহাকেও সেই বারের সম্ভাবনার করিতে
দেখি নাই। সম্ভবতঃ সময় বিশেষে ছাত্রদিগকে
বারের বেগা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু সে খেলা
তাহাদের জাতীয় খেলার মধ্যে গণ্য হইতে পারে

না। ভক্তির পাঁচড় ভক্তের অন্ত কোন দ্বাদে
জিমনাতিকের সরস্রাম দেখি নাই অথবা জিমনাতিকের
নাম্তী পদ্যত কাহারও মূখে শুনি নাই।

নব্য সম্প্রদায়ের পাহাড়ীরা অনেকই অজবান
ছুটবে এক হকি খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে।
খেলিতে কৌশল বড় না শিখুক লাগির বহুটা ছুটবল
খেলীর সময় পূর্ব ক্রমকাল বক্তব্যের দেখিতে পাওয়া
যায়। সেইজন্য বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা শ্রুতি-
বোধিত্যের তাগানের সহক সাধারণকে খেলিতে সম্মত
হয় না। পাহাড়ীদের এই ছুটবল এবং হকি খেলা,
বাঙ্গালীদের মত সাহেবদের অস্বতঃপূর্ণ ফল। ইহা
তাহাদের জাতীয় খেলা নহে।

মার্শেল লইয়া পাহাড়ী বালকজগৎকে গুলি
খেলিতে দেখা যায়। সে খেলাটা তাহাদের মধ্যে
কতদিন প্রবেশ করিয়াছে তিক করিয়া বলা যায় না।

গুলি খেলাতেই মত আর একটা খেলা আছে;
সে খেলার নিয়ম মার্শেল খেলারই মত, তবে মার্শেল
তাহার জটিলক নহে। ছোট ছোট লোহার চাকি
লইয়া সে খেলা চইয়া থাকে। চুই বা অত্যধিক
বালক একত্র হইয়া এক সঙ্গে সে খেলা খেলিতে
পারে। মার্শেল খেলার মত এ খেলাতেও একটা
গাবু কাটিতে হয়। গাবু লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেকেই
এক একখানি চাকি নিক্ষেপ করে। বাহার চাকি
গাবুর গুব নিকটে পড়ে সে ভাগে বাড়িবে। একখানি
অসম্প্রাকৃত বড় চাকি লইয়া অপর পক্ষ যে চাকিখানি
ঝেবাঁইয়া দিবে গাবুর কিঞ্চিৎ দূরে একটা চিহ্নিত বাদে
গাড়াইয়া সেইখানিক খেলোয়াড়কে মারিতে হইবে।
মারিতে পারিলে সমুদায় চাকিগুলি সে জিতিয়া
লইবে—কলিকাতা সহরের পথে বাটেও এ খেলা
দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার ইহার নাম, কি
জানিনা; পাহাড়ীরা ইহাকে ‘জুয়া’ খেলা বলে। অর্ধ-
বর্তিত লাভ লোকসান প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও
হারা লইয়া রেলা করে, তাহার লাভ লোকসান
অর্থে এই ‘জু’ এ খেলার নাম ‘জুয়া’ এক এই

হিসাবে কখনও কখন তাহার পদ্য, কতি এক
মার্শেল লইয়া ও জুয়া খেলে। সিলে লইয়া কিছু
খেলাও পাহাড়ীদের মধ্যে আছে; তাহার নাম
‘জাঙ্গল খুট।’

এ সকল খেলা অন্ত খেলে ও আছে; স্তরায়
পাহাড়ী খেলা বদিয়া তাহাদের বিশেষ কিছু নাই।
তবে একটা খেলা তাহার খেলে, যাঁহা অন্ত আর
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না এক তাহাকে
খাটি পাচাড়ী খেলা বলা খাইতে পারে। একটা বৃহৎ
কারের গালা ছল উপর দিকে ছুড়িয়া দেয়। পড়িবার
সময় মারিতে পড়িবার পুরোঁই পায়ের চাটুর তলদেশ
দিয়া এমন জোরে আঘাত করে যে, সেই ছল আবার
উপরে উঠিয়া যায়। লক্ষ্য ব্রশে হইয়া সেই ছল
বতকণ মারিতে না পড়ে, ততকণ পদাঘাতে ছেলের
উদান ও পদম অবিচল গতিতে শূত্র মার্গেই চলিতে
থাকে। ছল মারিতে পড়িয়া গেলে অপর এক
জন সেই ছলটাকে লইয়া সেই ভাবে একটা করে।
কতকণ খেলা হইবে তাহার কিছু বাঁধা বাঁধি
নিয়ম নাই, খেলা জালিবার সময় পর্যন্ত ঐ নিয়মে
হলে যে গণনার অধিকবার পদাঘাত করিয়াছে
তাহার জয়, অস্তর পরাধার ঘাটা হয়। পাহাড়ী
জাভা ঐ খেলার নাম ‘খাটি।’

ঝেরেঘের খেলা স্বতন্ত্র। কলানী ঝেরেঘের মত
পাহাড়ীরা খুঁট খেলে। সে খেলার নাম ‘পজা।’

পাহাড়ী ঝেরেঘা বাঙ্গালী ঝেরেঘের মত ‘বোঁ
বাট্ট’ খেলা করে। পার্থক্য এই যে বাঙ্গালীর ঝেরেঘ
কেহ বর, কেহ বোঁ, কেহ খাটুকা, কেহ বঁজুনি
কেহ বা ত্রি শাখিয়া কোন এক গুণের অস্ত্রপুস্তক
দৈনন্দিন গৃহস্থানি ব্যাপারের অভিনয় করে। পাহা-
ড়ীরা বশতি বৃগল মালিয়া সাহেবদের বিখ্যাত-বাসির
‘বনিমুনের’ মত বৃগল বৃগলে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বুরিতে
কিরিত বায়। একজন পাতিলা শাখিয়া ধরেই
থাকে। সে বাস, পাতা, কাঁকর, কামা, খুলা মাটী
ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া খেলা ধরের উপদেশ

বিবিধ প্রকারের চন্দা, চুনা, লেহু, পের সুখাত প্রস্তুত করিয়া রাখে। সম্ভ্রান্তী যুগের প্রতাবর্তনান্তে শরিতোষ সহকারে সেই সকল আয়োজনের যথোচিত সম্ভাবনার করিয়া খেলা সাজ করে। এই খেলার নাম 'সিয়া খেলা'।

পাহাড়ী মেয়েদের আর একটা খেলার নাম "বেষে রানী"। বাল্যকালে পরাগ্রামে আমরাও সে খেলা খেলিয়াছি। আমাদের খেলার নাম ছিল 'চোরবন্দী'। এই খেলার অনেকগুলি বাগ্যক বালিকা একত্রে পরস্পর হাত পরা ধরি করিয়া বৃত্তাকারে গাঁড়িয়া দাঁড়কে। একজনকে সেই বৃত্তাকার বেঁটনীর মধ্যে রাখা হয়। সে যেন চোর তাহাকে বন্দী-লার সম্বন্ধ রাখা হইয়াছে। প্রহরীরা যত্নে বেঁটনে ডাছাকে আটক করিয়াছে। বন্দী সেই কারাগারের দ্রব্যা জানালা ভাঙ্গিয়া বলপূর্বক বৃত্ত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। পাশা পাশি হইবনের ছই হস্তের কঙ্কলির পতাপর বৃত্ত সংবদ্ধ সন্ধিহীন যেন কারাগারের এক একটা দরজা বা জানালা। বন্দী ভিতর দিক হইতে প্রত্যেক সন্ধিতে কড়াঘাত করিয়া যুগে কলে "এই দরজাটা কাটব," প্রহরীরা একযোগে সনযরে চীৎকার করিয়া বলে, "কাটা কেলে মাঝব"। দ্বিতীয় দরজার গিয়া পুনরায় বলে "এই দরজাটা কাটব," প্রহরীরা সূর্যক বলে, "কাটা কেলে মাঝব," ইত্যাদি করে বন্দী একে একে সকল দরজার তাহার কলের শব্দী করিয়া যদি কোনটা ভাঙিতে না পারে, তখন হলে কোশলে খেলেন হউক পলায়ন করে। বন্দী পলায়ন করিলেই খেলার সে পালা সাজ হয়। পাহাড়ীদের খেলার রকম এই একই; তবে তাহাটা জড়। তাহাদের বন্দী পলায়নের চেষ্টার বলপ্রয়োগ থাকে; না বন্দীরা মিনতি সহকারে প্রহরীদের নিরস্ত সূক্তি প্রার্থনা করে। তাহাদের বন্দীর বুলি "একটো পানি" প্রহরীদের বুলি "সে যে রানী"।

দরজার নিকট গিয়া বন্দী বলে, "দৈবনা কছো," প্রহরী বলে "রাখা কো"। বন্দী, "রাখা কাঁহা",

প্রহরী "মাটো ভাখা"। বন্দী,— "মাটো কাঁহা"; প্রহরী,— "আস্‌মান্ ভাখো"। বন্দী,— "আস্‌মান্ কাঁহা"; প্রহরী,— "ছে ই-ই-না"। দ্বিতীয় দরজার গিয়া পুনরায় বলে, "দৈবনা কছো" "বিরাস্‌কো"; "বিরাস্‌ কাঁহা"; "মাটো ভাখা"। "মাটো কাঁহা"; "আস্‌মান্ ভাখো"। "আস্‌মান্ কাঁহা"; "ছে ই-ই-না"। ইত্যাদি করে সকল দরজা গিয়া বন্দী প্রার্থনা নিফল হয়, তখন হলে কোশলে পলায়ন করিলে পালা সাজ হয়।

আর এক খেলার নাম 'চোর চোর' খেলা। এ খেলার একজন বড়ি হয়, একজন চোর হয়। অবশিষ্ট বালক বালিকারা কেহ বা লুকাইয়া থাকে, কেহ বা খেলা দিয়া বেড়ায়। বড়ীকে ছুঁইবার পূর্বে চোর ঘাহার গায়ে স্পর্শ করিবে তাহাকে পুনরায় চোর হইতে হইবে। এ খেলায় খেলার প্রারম্ভে এক জনকে চোর বলিয়া নির্ধাচিত করা হয়। তাহার পর চোর ঘাহাকে ছুঁইবে সেই চোর। বালগণীদের "আমূল মটকা খিলেব মূল" খেলার মত এই খেলা।

দ্বিতীয় প্রকার 'চোর চোর' খেলার চোর নির্ধা-
চিত হয় না। খেলপ্রাতিদ্বিগণকে সারি বাঁধিয়া পাঁড় করা ইয়া সেওয়া হয় এবং তাহাদের সংখ্যা বাসনের অধিক হইলে চলিবে না; ন্যূন হইলে কতি নাই। তাহাদের মধ্যে একজন বলে,— অঘল, ডবল, বৈতে, পা, মল, শাল, হুট, মহার্দেগ, কুতুর, কাতি, মামা, ডুম। ইহার এক একট কথা পর পর বলে এবং পর পর এক এক জনের কৃক হাত দিয়া যায়। ছুঁ এই শেষ কথাটা উচ্চারণের সময় ঘাহার কৃক হাত পড়িবে সেই হইবে চোর এবং যে গণনা করিল সে হইবে বড়ি। এই চোর খেলার নাম 'অঘল ডবল'।

ইহাদের আর এক রকম খেলা আছে তাহার নাম 'চুরি' খেলা। হুটী বালক বা বালিকা গবে আগলা-
ইয়া পাঁড়িয়া থাকে। আর কতগুলি বালক বালিকা সমুখস্থিত খেলুড়ির পিছন দিখে কোমরের কাশড় ধরিয়া পর পর সারি দিয়া পাঁড়ায়। যেন এক

খানি রেল গাড়ি ধাঁড়াইয়া আছে। বাহার রেল
গাড়ী হইয়াছে তাহার মুখে বসে—

এক মানমুঠেনেকো হই মানা তেল।

হই মানা তেলেকো লয়ে খেল।

বগব পাতি ছুরি খেল।

শিলশুক্কে নেহি রেল—হাট্টো।

এই বলিয়া যে ছাইজন পথ আগুনিয়া ধাঁড়াইয়া
থাকে তাহাদিগকে বাকা মারিয়া পথ খোলসা করিয়া
চলিয়া যায়।

আর একটি খেলার নাম 'বলুঝারি বৈরি' খেলা।
অনেকগুলি বালক বালিকা মারি মারিয়া ধাঁড়াইয়া
থাকে। একজন তাহাদের প্রত্যেককে একে একে
কাঁধে হাত দিয়া ক্লাইয়া দেয়। বদাইবার বুলি
এই :—

মসো মসো বে বলুঝারি বৈরি

খিউ খানে ডাক ডাক খানে

পকারাশি পাশি খেল

খেলো বসি জংলা

সকলে বলিলে পর আবার তাহাদিগকে একে একে
উঠাইয়া ধাঁড় করা হইবে। ধাঁড় করার বুলি এই :—

উঠে যে উঠে যে উঠকারি বৈরি

খিউ খানে ডাক ডাক খানে

পকারাশি পাশি খেল

খেলো উঠ জংলা

উঠবার পর যে খেলা আরম্ভ হয়, সে খেলা 'বে
যে রাশির' রূপান্তর নাম।

সাহেবদের মেয়েরা যেমন এক গাড়ি বড়ি লইয়া
মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া একটু লাকাইয়া পায়ের
তলা দিয়া লইয়া যায় 'এক' যে খেলাকে তাহার
Rope dancing বা Skipping বলে, পাহাড়ী
মেয়েরা সে খেলাও খেলে। এ খেলার নাম 'তিবে
নিবে'। সত্তবতঃ এটা সাহেবদেরই অঙ্গুরণ।

তাম লুড়ো প্রকৃতি আধুনিক খেলা এক
হারমনিয়ম প্রকৃতি বাজনা বাজান পাহাড়ীরা শিবি-
কাছে।

শ্রীমন্ত প্রাণ :—পাহাড়ী মেয়েরা নাচ গানের
বড় প্রিয়। তিন চারটা মেয়ে একত্র হইলেই পথে
ঘাটে যেখানে সুবিধা পায়, সেই খানেই
নাচ গান আরম্ভ করিয়া দেয়। মোট
বহিতে বহিতে পথের মাঝে মোট নামাইয়া
হাঁপ দিমানর মত কিছুকাল নাচ গান করিয়া লয়।
পাহাড়ী ভাষা যে খানে না, সে গানের অর্থ বোধ
করিতে পারে না বটে, কিন্তু গানের সুখে তাহাকে
মোহিত হইতে হয়। একা একা গাহিলে সে গানের
ততটা মাধুর্য থাকে না। কিন্তু সকলে সমকরে
গাহিলে বড়ই মধুর লাগে।

শ্রীমন্ত প্রাণ :—মান করার দিক
দিয়া দেখিতে গেলে পাহাড়ীদিগকে জগন্নাথ
দেবের এক একটা অবতার বলিলেও চলে। অবশ্য
সে জন্ত তাহাদিগকে যৌব বেওয়া চলে না; কারণ
দুর্দান্ত শিতের বেলে পাহাড়ীরা যে বাদালা দেশের
লোকের মত মান করিবে না তাহাতে আশ্চর্য্য
হইবার কিছুই নাই। মানের অস্ত্রতার
কারণ একমাত্র জগন্নাথ নয়। কতকটা
কারণ শিতের প্রকোপ, কতকটা কারণ সমাজ্যাব
এক মানান্তে ভিন্না কাপড় শুকাইবার রোজাভাব।
দর্য্যবৎক সে দেশে এক প্রকার অদ্ব্যর্থান্যরূপ
বলিলেও বলা চলে। পাহাড়ী রমণীরা অস্ত্রঃপুষ্কারিনী
নয়, কিন্তু তাহাদের দেশের তপন দেব গ্রাহ্যই
অস্ত্রঃপুত্র থাকেন।

বাসাশির বত পাহাড়ীরা তেল মাখে না, সাবান
ব্যবহার করে। গায়ের কাপড় না ধুইয়া যে যে
অঙ্গের মান হওয়া সম্ভব, সেই সেই অঙ্গের মান হয়।
মেয়েরা বরং মান করে, পুরুষেরা মান পূর্ব কয়ই
করে।

অধিকাংশ পাহাড়ী এক সপ্তাহ অন্তর বস্ত্র পরি-
কর্তন করে। সেই এক সপ্তাহ তাহার এক পরিচ্ছদেই
থাকে। প্রতি রবিবার সাবান দিয়া কাপড় কাচে,
সেইদিন পরিচ্ছদ বদলায়। রজকের সঙ্গে তাহার

কোন সম্বন্ধ প্রায় রাখে না। কাপড় সাবান মাখাইয়া গে কাপড় তুলিয়া আছাড় মারে না। ছাদ পোটান পিটুনার মত কাঠের ছোট ছোট পিটুনা খায় সেই কাপড়ে আবৃত করে।

হুগল ভাণ্ড—হুগল পাহাড়ীরা 'কৈড়ে' বা কলসী ব্যবহার করে না। বড় বড় বাঁশের বা টানের চোকাই রাখিয়া হুগ বহন করে। বাঁশের চোকা এক একটা এত লম্বা এবং এত মোটা হয় যে, একটা চোকার আধমণ পর্যন্ত হুগ ধরিতে পারে। দূর পথে হুগ লইয়া বাইতে হইলে সেই

হুগ দুইটা চোকা দড়ি বাঁধিয়া কাঁপের উপর দিয়া দুই দিকে খুলাইয়া লইয়া যায়। অধিক দূরে অধিক পরিমাণ হুগ লইয়া দাঁইতে হইলে ঘোড়ার পিঠে ছালার মত চাপাইয়া লইয়া যায়। ঐ চোকায় নাম 'বোলা'। কোন কোন স্থানে 'বোলা' লল পাত্রেয় কাটাও করে। একজন এ দেশীয় ভাষি এক ভায়ে দুই কলসীতে যে পরিমাণ লল বহন করে, পাহাড়ীরা একটা বোলায় সেই পরিমাণ লল লইয়া পাহাড়ের উপর উঠে। (ক্রমঃ)

ভূমি ও আমি

(গান)

[ঈগলিতমোহন কন্যাপাখ্যায় বি. এল.]

ভূমি আসন হ'বে, কেন কবুহে ঘোরে পর ?

ওহে ক্ষম রাজ, প্রভু প্রেমিক বর !

তব যেহে পুত্রিত,

মম ক্ষম শোণিত ;

তব অনিল সঙ্গিল, মম জীবন পালন-পর।

তব আলোক বীণ,

মম নয়ন হুগ,

দূর করে দাও অঁখির ক্ষততা যে হান্নানোবধর।

ভুলের মূল্য

(পদ্য)

(ঈকান্তোপ সান্তাল)

সে দিন রবিবার। আমাদের সাহিত্য সভার দৈনিক অধিবেশনে আমার ছিল প্রবন্ধ পড়বার পালা। ছুটির দিন, বাড়ীতে বিশেষ কাজ কর্তব্য না থাকায়, সকালে উঠেই বন্ধুর কণী রাতের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেম। বন্ধুদের চায়ের মজলিস ওখন শুরু। বেলা বাতটা পর্যন্ত সেখানে বেশ-

বিশেষের আবহাওয়া, অনাবহাওয়া। বন্ধুর আলাপচলা এবং বাটী কয়েক চায়ের সন্ধ্যাবহার করে, বাড়ী ফিরে যাওয়া যাওয়া সাহুতে দুটো বেজে গেল।

সন্ধ্যা ৭টার সভা। প্রপূরে ঘুমাব না স্থির করে, দাঁটার ছেলোটাকে, আর খবরের কাগজখানা নিয়ে

বৈষ্ণবানার কল্যানে গুণের কাত হলাম। খোকা তার দার্শনিক নানা প্রস্তাবে মানিকজন আমাকে ব্যস্ত রাখল কটে, কিন্তু নীতাই কাপুৰুষের মত হয়ে উঠল। সে মিত্রাদেবীর আশ্রয় নিল। খোকাকে পরাজিত করে সংবাদপত্র নিয়ে পড়লাম। কিন্তু ছাপার হস্তগতশে আমার চোখে ক্ষুদ্রতর হয়ে এসে, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা ঠিক করতে পারি না—তখন যে বেলায় পড়লাম হটাৎ বাজে। সৰ্জনামা! সাতটার মিটিং। তৎক্ষণাতঃ হাত মুখ দিয়ে কাশড় ছেড়ে রেয়ারে পড়লাম। কড় সাতটার বোড়ে এশ দেখলাম বড়ীতে সাদে হটা। হামের মত উৎসুক হয়ে হুটপাথে ঝড়িয়ে আছি, পাশ থেকে একটা লোক, আমার গায়ের গুণের পড়বার মত উপক্রম বেখে বললাম “কি হে, বাড়ির গুণের পড়বে না কি? বেধেতে পাছনা মাস্বে ঝড়িয়ে আছি।” লোকটা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, অর্ন্ত করণেরে বলল—“বেধেতে যদি পাশ দাখ, তবে আর মাস্বে ঝড়িয়ে বা পড়বে কেন! ভগবান বেধেছেন কি কত। মাপ কর দাখ।” অর্ন্ত লোকটাকে ত্রুত কথা বললাম ভেবে, ভোমস হয়ে বললাম, “না না, তোমার কোন খোব নেই—আমি বুঝতে পারিনি মাপ কর। কিন্তু—বেধেতে পাওনা, একলা এখন সময় সাতটার খেয়রেছ কেন?”

“গুণের জোপান আছে দাখ—মিতে গিয়ে ছিলাম! কিন্তু দেখী হয়ে গেল, বর্ষার দিন কড় নীগুনীর অঁগার হয়ে পড়েছে।”

“মিনে কি বেধেতে পাও।”

—হঁদা—আ, পাই। সন্তোর পর একবারে বৃষ্টি থাকে না—কিছুই বেধেতে পাই না। আখোল কতক কতক আসছি।”

লোকটা গোয়াল হাতে একটা খালি গুণের বর্ষা ছিল। সন্ধ্যেনার মনটা কড়ই ব্যথিত হয়ে উঠল। মিত্রাদেবী বললাম, “কতুর দাখে?”

“আর এগে পড়েছি, এটা ত’ গোয়াল ঘোড়, ঐ ঘোড়টার দাখ। মানিকজনের মনিত আমাধের বাকী। যদি—যদি করে মানিকজনার ঘোড়টার পৌছে সেন বড়—উপকার করেন।”

ঘড়ির দিকে চেয়ে বেধলাম, সাতটা দাখতে মিনিট দশবার সেরী। কিন্তু অমুরোথ একত্রে পান্দা না, হাত ধরে তাকে মানিকজনার ঘোড় পার্শ্ব এনে বললাম, “এখন কেতে পারবে?”

ঘোড়ের বাকীটার পায়ে হাত দিয়ে সে বলল “হঁদা—আর তর নেই,—এ পথে গাড়ী ঘোড়া বড় একটা আসে না—ঠিক যেতে পারবে। আর দশ পা পেলেই—আমাধের গনি, এই বললাম মের ট্রিটটা পেলেই—বাকী গেলাম। বড় উপকার কল্ল দাখ, দাখ—ভগবান তোমার ভাল করবেন।

বিনা বরচে একটা লোকের উপকার করতে গেলে আমাধ গমনী যে প্রমুদ না হয়েছিল তা নয়। তবে মিটিংয়ের সময় হয়ে গিয়েছে, প্রথম হামখানার বেতে পার্শ্ব তর হয় ত পৌছতে পারব। কাহ্নেই আর কিংব কতক পান্দা না। মুণের কথা একবার বললাম, “মখে, যেতে পারবে ত’—নইলে জোয়ার বাকী পর্শ্ব না হয় পৌছে দিয়ে আসি।”

“না-না বাবু। আর কত কততে হবে না। এ পথে আমি হয়ে অবধি চলছি। ঠিক যেতে পারব।”

বেশী অমুরোথ বা উপকার কতুর তখন সময় ছিল না—দূরে হাম আসছিল। লোকটার হাত ছেড়ে দিয়ে, সাতার অপর দিকে অগ্রসর হলাম। সাতার দাখানি এসেছি। হঠাৎ পেছনে; “ভেঁ—ভেঁ—হুট্—হুট্—বেল, বেল—দাখ দাখ” একজনের একটা মনিত কলরব শুনে পেছন দিকে প্রেলাম, একটা লোক ঘোড় চাণা পড়েছে, তারই চারিদিকে লোক জমে গিয়েছে, এবং তারা ঘোড় চালাক এক সঙ্গে কলরবের ধনী—কড় মাল্লের মনিকবের পাল দিচ্ছে। আমাধ কখন আর কিংবে বেধবার সময় ছিল না,

কিঞ্চিৎ ঘোঁটার চাপা আঁককাণ কলকাতার বৈদ্যবিন
কালিয়। ঈশ আশুত্থ বেধে ভাঙাভাঙি ধূপা যেতেই
আবার মনে হ'ল,—সেই রাতকাণা লোকটা চাপা
পড়ল না ত?—আহা! আর একত্রে পাখান্য না।
ক্রত পদে ঘটনাম্বলে এসে যা বেখান্য ততে আবার
বাধা ঘুমে গেল। সেই হতভাগ্যই ঘোঁটারে ধাক্কা
অন্ততঃ হরে রক্তাক্ত বেধে রাতার গুপ্ত পড়ে
রয়েছে। আর চারিদিকের লোকেরা 'আহা! 'আহা'
করছে। ভাঙাভাঙি তাকে ঘোঁটারে তুলে মেডিকেল
কলেজে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার পরীক্ষা করে কল-
কেন—'বাঁধাও ক্ষেপেছে। বেশ খারাপ!' কথাটা
শুনে আবার ঐশাণী অবাক বেদনায় টুন্ টুন্
করে উঠল। মনে হল, আবারই অকহলার বেচারী
—ঐশাণ হারাতে বসেছে। জেনে শুনে পাঁচ মিনি-
টের ক্ষত লোকটাকে আমি অসহায় অবহায় ছেড়ে
দিয়ে কি ভুলই করেছি। যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে,
অনুশোচনার জীর বেদনা কুক করে ঘিটংয়ে দিয়ে
বেখান্য, সত্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আবার
কিঞ্চিৎ বেধে, সম্পাদক মহাশয় আবার আশা ভাগ
করে ছুঁক করে দিয়েছেন। আমাকে একটু অতিমানের
স্বরে ভাঙাভাঙি করে তিনি বলতে ছাড়লেন না, যে—
সত্য সর্মিতির কাজে সর্বদা ঠিক রেখে চলতি শিক্ষা
কর্তা আবশ্যক।

কোন কথাই উত্তর দিতে পার্হান্য না।
মনের অবস্থা তখন দেবদ ছিল না। অপরাধীর
হাত এক পাশে চূপ করে বসে রহিলাম।

সভাক্ষে কলরামের ঠীটে লোকটার বাড়ী খোঁজ
করে সংবাদ দিয়ে বাড়ী গেলাম।

সবুজ রাত্রি অমৃতপের শাহাড হুক করে কাটিয়ে
দিলাম। সারারাত কেবলই সেই হতভাগ্যের রক্তাক্ত
বেধ আবার চোখে স্বপ্নে ভেদে উঠে লাগল—
একটুও ঘুম হল না।

সকালে শয্যাভাগ্য করেই, আমা কাশড় চেঁচে
মোড়কল কলমে গেলাম। ওয়ার্ডে ঢুকে এক-
জন নার্সকে দ্বিজ্ঞাসা কর্তে, সে বলল, "ওঃ!
রাতের সেই ঘোঁটার কেদুট।" আতা—মেজারী এই
সকালে মারা গিয়েছে। ব্রেইনে পেগেছিল—
সারারাতের ভেতর জ্ঞান হ'ল না। বিকারের
কৌকে কেবলই বলেছিল—"কড় উপকার করছে
মামা, শুগবান তোমার ভাল করুন। আহা!"

নার্স চলে গেল। আমি পাবান মূর্তির মত
গাড়িয়ে রইলাম। একবার ইচ্ছা হ'ল, মৃতদেহের
কাছে—মার্জনা ভিক্ষা করে আসি, কি উপকার
তার কংগেছি, একবার বলে আসি—কিন্তু সাহস
করে তার মৃতদেহের কাছেও যেতে পার্হান্য না।
বে চূপ করেছি, তার মৃদা জীবনের শেষ দিন
পর্যন্ত অমৃতপের বেদনায় শোধ করতে পারব
না!

পাবানে বোঁধা অক্ষরের মত—হতভাগ্যের বেধ
কথা বটা জ্বদয়ে অঙ্কিত করে ভিলে চোখে বাড়ী
কিয়ে গেলাম।

সদাশিবের দণ্ড

স্বপ্ন কোথায়?

[শ্রীবোমেশচন্দ্র বোম এম বি, এ সি (লণ্ডন)]

এ সংসারে হুন্সর নামকী কি? রতনী, কুতুম,
পকী, সর্প, নদী ইয়ার মতো কে সর্বাঙ্গেকা হুন্সর?
একদিন এই বিষয় লইয়া ভাবিত ভাবিত আপ-

নাকে শ্রীবৎস রাজা করুনা করিলাম, কিন্তু কহাকেই
স্বপ্ন সিংহাসনে বসাইয়া শ্রেষ্ঠক নাম করিতে পারি-
লাম না। একবার মনে করিলাম রতনীই পরীক্ষী

আবার তাবিলান তাহার নিজের সৌন্দর্য কোথায় ?
 কণকাদিত্য ও অনন্তরই তাহার সর্ব্বাধন ।
 তাহাওয়ের সৌন্দর্যে কখনই বা দৃঢ় হয়, আর
 কখন পুরুষেরই বা তাহা উপলব্ধি করিবার
 অক্ষমতা আছে । প্রাণেই মনুষ্য পতঙ্গ ভ্রমণের
 অনন্তর দিকে ছুটিয়া থাকে । তবে কুহুম শ্রেষ্ঠ ।
 না তাহা নর—দক নাই বলিয়াই ত পলাশের আশ্রয়
 নাই । ধূতুরার ফুলের মতন পবিত্র ছন্দা যোগিনী
 আর কে আছে ? কিন্তু কৈ কে তাহাকে ঘর
 করে । বাহাতে মধু নাই তাহাকে কেচ ঘর করে
 না । মধু আছে বলিয়াই বহুসের ঘর ; গোলাপ
 ছন্দার ফুলের রানী । কুহুম আবার বার মাস
 সন্মান জাবে ফুটে না । কেহ বা বলে, কেহ বা
 ফলে, কেহ বা কাটার ভোপে ফুটিয়া থাকে ।
 অতএব কুহুম সিংহাসন প্রাপ্তির উপবৃত্ত পার বলিয়া
 বিবর্তিত হইল না । পক্ষীর পক্ষ ছেদন করিলে
 তাহার আর কি থাকে । তাহারোগ অস্ত্রের ভণে
 গুণমণ্ডা—কপলাবাবতী । রমণীর ভ্রাতৃ পক্ষীও
 হলাল গান করিয়া মন ভুলাইতে পটু । আবার
 উহারা সময় পাইলেই শৃঙ্গল কাটিতে কেহই কট
 করে না । রমণী বাঘায় শৃঙ্গল কাটিয়া সোণার
 হলাল ছাড়িয়া—মেহের পুতলী হলাল হলালীও পটু—
 গত প্রাণ স্বামীকে ছাড়িয়া আশ্রয় স্বজনকে ছুলিয়া
 কোন অনির্দিষ্ট গাধে চলিয়া যায় তার পর আর
 কিরিতা আসে না । পানীকে আবার ঘরিতে
 পারিলেও, পোষ মানান কলঙ্ক, সমাই উড়ু উড়ু করে,
 কেবলই পিচ্ছরের ভরদান ব হর্ষল ঘায়পার অস্থ-
 সন্ধান করে, অবসর পাইলেই, তাহার সমাবহার
 করিতে ছাড়ে না । কিন্তু পক্ষমলিতা রমণীকে
 ঘরিবার উপায়ই থাকে না । আশ্রয়ের সম্মান
 তাহাকে লয় না । সর্প ক্ষুধার ঘটে ; কিন্তু বিয়ে
 ভরা ; হুগ দাও কলা ধাও হুগালি ধঃশন করিতে
 ছাড়িলে না ; তৈল ধাও শিক্তর ধাও “ভরী”
 ছুলিবার নয় । ক্ষুধার বলিয়া তাহাকে আশ্রয়
 করিতে বাও সে অবনি ধঃশন করিবে ।

মহুবা চিরদিনই ভ্রমণের কালাল । বাহা ক্ষুধার
 মনুষ্য তাহারই ভিক্ত । ইংরাজ কবি Keats পাহিরা-
 ছেন “A thing of beauty is a Tyfor ever”
 আমাদের দেশের বৈকুণ্ঠ কবিও পাহিরাছেন,
 “জনম অবধি হাম ভ্রম মোহাতিহ
 নয়ন না ভিরণিত ভেল”—

শিশু দর্পণে নিজ প্রতি মূর্তি দেখিয়া রোমন
 মধরণ করে ; সে সর্বের সহিত বেলা করিতে যায়,
 কুহুমের সহিত তার কড়ই সৌহার্দ । ভাল কাপড়
 খানি ভাল ছুঃ কোকটি, ভাল গহনা খানি কে
 না ভালবাসে । ক্ষুধার দেখিয়া লোকে বিবাহ করে,
 ক্ষুধার সেবাইবার মন্ত্র লোকের বেশত্ব । কিন্তু
 এ গোড়া চেহারাতে কেহ ত কোমল মিন ক্ষুধার
 বলিয়া দেখিল না । একবার চর্চিতের নত বিদ্যায়
 বেশিতে দেখিয়াছিলাম—একটি ক্ষুধার সামগ্রী দেখিয়া-
 ছিলাম ; মধু দেখি নাই বলিয়াওছিলাম কিন্তু
 দেখিলাম ত আর দেখিবার অবসর পাইলাম না,
 কেন ? বাহাকে ক্ষুধার বলিয়া দেখিলাম সে
 আমাকে ক্ষুধার বলিয়া দেখিল না কেন ? যদি
 দেখিয়া থাকে ত অন্তর্ধারী কেহ থাকেন ত তিনিই
 জানেন—তবে সেও ত আমাকে চাহিল না কেন ?
 যদি চাহিয়া থাকে ত পাইল না কেন । “আমিই
 ল পাইলাম না কেন ? লোকে বলে যে বাহাকে
 চায় সে তাহাকে পায় । এ কথাটা আমো সত্য
 নয় । সত্য হইলে আমি পাইতাম । প্রাণের
 ঐকান্তিক আক্কেহের এরূপ নির্ঘণ শেবণ কেহ
 কি দেখিয়াছেন ?

নদীকে কতদিন ক্ষুধার মনে করিয়াছি,
 বোঝ হয় নদীও আমাকে মনে করিয়াছে । ধ্বন
 ভট্টনীর তটে গিয়াছি ক্ষুধার বায়ু বীরে বীরে
 বহিয়াছে, বৃক্ষ পত্রাদি মতক সফালন করিয়া
 আমান করিয়াছে, পক্ষী মধুর স্বরে গাহিয়াছে,
 কুহুম মৃগক বিতরণ করিয়াছে, আর শ্রোতবতী
 তরঙ্গমালায় মৃশোভিত হইয়া হানিতে হানিতে

মনের উজ্জ্বল সলিল লাস্যো পমন করিয়াছে, তখন স্রোতের বেগ বেশ অকুলী নির্দেশ করিয়া আমাকে পত্তবা স্থান দেখাইয়া দিয়াছে। কতবার তাহার কক্ষ সজ্জন করিয়া তাহার কথা শুনিয়াছি। পূর্ণিমার রাত্রে নির্জনে বসিয়া কথা শুনিব বলিয়া কতদিন গিয়াছি, আর সেই পালতয়া হাসি দেখিয়াছি; কিন্তু মনের কথা কই একদিনও ত সে বলে নাই। মৌনে সম্মতি? হইতে পারে। তবে এতদিন তাহাকে পাইলাম না কেন? যে তাহাকে চায়, সে তাহাকে পায় কৈ? সে তাহাকে পায় না। যার স্তম্ভ মন পুড়ে তাহাকে পায় না যদি, তবে এমন চাহিতে, এমন পুড়িতে কে দেখাইয়াছিল। যে শেষ ত্রাণিতে পারে না, সে আরম্ভে হাত দেয় কেন? ব্যর্থতার নিরাশ হইলে মানুষের মন তিক্ত হইয়া যায়। তখন অপ্রাপ্ত প্রাণা কলকে অন্ন বলিয়াই মানুষের ধারণা হয়।

নবীকে পাইলে স্থবী হই কি না জানি না, পর-
ঃস্বপ্নীকিতা পরমতত্ত্বাত্মীর সহবাসে মুখ আছে কি না জানি না, কিন্তু শান্তি আছে তাহা জানি। আমি
মুখের অঙ্গুল্যানে। কিরিতেরি—শান্তির স্তম্ভ কি
বারে বারে কিরিতে হয়? নবী সহবাসে
মুখ নাই,—মুখ নাই, কিন্তু আশা কি ত্যাগ
করা যায়? আশা ত্যাগ করিয়া কি লইয়া
থাকিব? আশা যে ত্যাগ করিবার মিনিসই নয়।
এ যে “প্যাতোয়ার কোটা” হইতে আসিয়াছে; ভগবান-
স্বত সামগ্রী। এতদিন গিয়াছে তবু কি তাহার
আশা ত্যাগ করিতে পারিয়াছি? কালক্রান্তে রূপ
যৌবন ঝেঁ হইয়া গিয়াছে, সাবেক বড় মানুষের
কেবল ঠাঠখানা বজায় আছে তবু কেন এ পাপল মন
তাহাকে চায়? মানুষকে ভিখারী করিয়া কে
স্বপ্নন করিল? মানুষ রূপের ভিখারী, সুখের
ভিখারী, সৌন্দর্যের ভিখারী। “আর আর চাঁদ
আর” বলিলে অজান শিশুও তাহার দিকে চাহিয়া
বেখে, ছোট ছোট অকুলী দলদল করিয়া চাঁদকে

ডাকে, চাঁদ না আসিলে অস্ত্রের দ্বারা ডাকিতে বলে
আঃ শেষে কাঁদিয়া ফেলে। ছোট শিশুও পরম
ভিখারী—কি ভিখারীর দলই জমিয়াছে। বহু দাঁও
না কেন তথাপি ভিখারী, কারণ যে বহু পায় সে তত
চায়। ধনী ধন চায়, দানী আরও মান চায়। চাওনার
শেষ নাই, চাওনাতেও কৃষ্টি নাই। কপিতে সুখেরও
শেষ নাই। কিন্তু শান্তি কেহ চায় না। শিশু
তাহা চায় না, সে “আর আর চাঁদ আর” শান্তির
স্তম্ভ বলে না। এমন কি সংসারাবদ্ধ বৃদ্ধকে যদি কেহ
যোকেত—শান্তির—পথের সন্ধান দিতে চায়, তাহা
হইলে সে কথায় সে কর্ণপাত করে না। পদ পত্রের
জলের স্বত তাহার জীবনটা যে টপকল করিতেছে
তাহা সে ভুলিয়া যায়। এ সংসার যে একদিন
ছাড়িতেই হইবে তাহা সে সীমার করিতে চায় না।
শান্তির কথায় সে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে।

নিজের মুখে ত সকলেই স্থবী; কিন্তু অস্ত্রের মুখে
যে স্থবী সেই প্রকৃত স্থবী। আমি হাসিতেছি
আমি স্থবী, কিন্তু তুমি হাসিলে এখন আমি হাসি
তখনই আমার মুখ প্রকৃত মুখ। চন্দ্র লক্ষ যোজন পূরে
থাকিয়া হাঙ্গে, আমি গৃহের স্তম্ভ জানালাটি পুগিয়া
বেধি, আর হাসি। তাহার নিকটে কিছু পাইবার
আশা রাধি, তাহা নহ, তবু হাসি। সে নিম্নে
হাঙ্গে তাই তার হাসি দেখে হাসি। চাঁদের হাসি
বড় নিষ্টে হাসি, আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু সে
প্রত্যহ সন্ধান ভাবে হাঙ্গে না, আবার কখনও বা
মোটেই হাঙ্গে না, একস্র বা একটু রাগ করি, বা
একটু অভিমান করি, নহিলে আমি তাকে বড়
ভালবাসি। চন্দ্রোদয় হইলে, আর গৃহের ভিতর
থাকিতে ভাল লাগে না, উষর হবার সঙ্গে সঙ্গেই কত
দিন ছাদের উপর মানুষ বালিশ লইয়া বসিয়া থাকি।
এমন সময় তাহা কেহ হাসিতে পারে না। চাঁদের
হাসি একবারে মনপ্রাণকে অভিভূত করিয়া ফেলে।
সে মুখে, সে আননে আমি আপনাকে ভুলিয়া যাই।
সে অবস্থার কথা ভাবায় প্রকাশ করিতে পারি না।

যাহারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা কবি। কিন্তু আমার মনে হয় সে হাসির পূর্ন তাৎপর্য ছবিরে ধারণ করিলেও করিতে পারা যায়; কিন্তু ভাষার প্রকাশ করা অসাধ্য। কবিতা আপনাদের মনোভাব কতকটা ভাষার প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন মাত্র। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে সান্নাধ্য হুং বা আনন্দ হইলেই বুঝ হুটে, কিন্তু গভীর দুঃখে বা আনন্দে বুঝ হুটে না—হৃদয় কেবল গুরুগুরু করে; হৃদয় তাহাতে সন্তোষিত হয়, সে বেগ শীতল না হইলে বুঝে তাহা হুটে না। নবম্পত্তীর প্রথম দিলনে প্রেমিকার মুখে কথা হুটে না, কেবল বুকের ভিতর গুরু গুরু করে, গলা শুক হইয়া আঁসে বুকের কথা বাহির চক্ষে হুটে। সে আনন্দ, সে বুঝ কি ভাষার বর্ণনা করা যায়? তবে কেমন করিয়া সে আনন্দ, সে হাসির অর্থ বুঝাই? হইল না, পারিলাম না। সে হাসি যেখানে হুং হুটাই কবিতা থাকে, নাচিতে ইচ্ছা করে, পাচজনকে সে হাসি দেখাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তার যে কি অর্থ তাহা জানি না। কেহ জানে কি না তাহাও বলিতে পারি না।

এমন হৃদয় হাসি অগতঃসারে নাই; বোধ হয় এই হাসিটুকুর মতই আমার কনকাকান্ত দাদা ইংরাজী মতে চল্লেক বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ কালকব্ধি, ঐ সর্বস্বান্তকারী হাসির সহিত যে না হাসিল তাহাও নয় বুঝা। কিন্তু হুংখের বিষয় ও হাসির অর্থ কেহ ভাল করিয়া বুঝে না। শশি! তুমি যে আনন্দে হাসিতেছ, মজ্জার সে আনন্দ কোথায়? তুমি এই আছ, এই নাই। এই পলে এখানে জনমনহারা রূপের ছটায় লোকের মন সজাইতেছ, পর পলেই অস্ত পড়ার। মজ্জাও আজি আছে তাঁল নাই, আজি এখানে কাল পৌকিন্দপুরে; কিন্তু আজিকে যদি তোমার এক কলার ফল হয়, কলী তাহার বুদ্ধি হইবে; আজকে যদি অঙ্গে ছাইমাখ কলা আবার তোমার সোণার বরণ হইবে। তুমি না হাসিলে যে হাসিলে। তোমার ছই স্বামী,

ছই জনেরই তুমি মনোমহোদী। তোমার পালার কম বেশী নাই। বৎসরের মধ্যে উভয়ের করছই স্বামণ পক্ষ ধরিয়া তুমি সমান ভাবে হাঙ্গির থাক। তুমি কিন্তু জান না যে, তোমার অনুপস্থিত কালে প্রমত্ত কি লইয়া প্রাণ ধারণ করে। জানিলে হাঙ্গির না, থাকিয়া থাকিতে পারিতে না। তবে তোমার উভয় প্রাণবলতই সমান, উভয়েরই মন রাখা আবশ্যক।

যাত্রা হু মৌকার পা ঘের তাহাঙ্গিকে বিকৃতোমাকেও বিকৃত। তোমার উভয় প্রমত্তই স্বামী-ধরকেও বিকৃত। তুমি একা অংশা; তোমারও বিষয় দায়, তা'দেরও মহাকষ্ট। আর তা'তে তোমারই বা ঘোষ কি? পোড়া মালুকের চিরকালই মন কপাল। পৃথিবীটা বোধহয় ঈশ্বরের হুংরানীর ছেলে, তাই সকল হুং সজোপেই বিদ্যুৎ। বৃহস্পতির অন্তরঃ পাচটি চন্দ্র, উরেনাসের ছয়টি চন্দ্র, শনির আটটি চন্দ্র, মঙ্গলের ও দুইটি চন্দ্র; এ পোড়া পৃথিবীর কিন্তু ঘোটে একটি মাত্র চন্দ্র। কিন্তু আমরা এতেই সন্তুষ্ট হয়ে বলে থাকি, 'এক চন্দ্রেই প্রমত্ত আলো।' তুমি বাহাকে বিদল-রশ্মি প্রদান কর, সে আর না হাসিয়া থাকিতে পারে না। সে আনন্দে গলিয়া যায়। ইহাই তোমার ব্রত, পরচিত্তবিনোদনই তোমার বর্ণা। আমি পরের হাসি দেখিয়া হাসিতে কড় ভালবাসি; এই প্রজাই সমানবর্ণী তোমার সঙ্গে আমার কড় ভাব—তাই তোমাকে প্রাণ তরিয়া ভালবাসি। কিন্তু শশি! তোমাতে না কি কলঙ্ক আছে, লোকে তোমার কলঙ্কী বলে? তুমি এত হৃদয় হইয়া পরের প্রজ হাসিতে শিখিয়াও কি পাণে কলঙ্ক দারণ কর? তোমার ও সোণার ছবিরেও হারান কত আছে। জানিতাম পরের মুখে যে স্বামী, তার কিছুমাত্র হুং সন্তবে না, কিন্তু আজ দেখিতেছি এটা বিষম ভ্রম। এ মিছার সংসারে এখন কোনও পদার্থ নাই বাহা হুংও দেখিলে হুটি লসে—একদা

তুমি ছিলে, কিন্তু তোমার জ্বরেও 'যরণ' নদী,
 শুভ রেণিত চাঘরে এক কলস মনী ঢালা রহি-
 যাছে। কমলের দলে সর্পের বাস, গোলাপে
 কণ্টক, মধুসূক্ত আহরণ করিতে গেলে মক্ষিকার
 দংশন, চক্ষে পলক, রমণী জ্বরেও লজ্জার কণাট
 —এসব কোন্ নির্দয়র সৃষ্টি। সে কি কোনও
 সামগ্রীই সর্গাঙ্গম্বর করিয়া সৃষ্টি করিবে না
 বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; কিংবা ঐক্লপ কল্পা ঠার
 শক্তির বাহিরে। যে বিধাতা কিংতকে মধু ঘেব
 নাই, ইক্ষুতে কল ঘেব নাই, প্রবরের আকৃতি ঘেব
 নাই, সেই সকলের স্রষ্টা! জানি না কমলে কণ্টক,
 রমণীতে ব্যভিচার, আর তোমাতে কলঙ্ক কিয়া
 সে কি ইষ্টলাভ করিয়াছে। কিন্তু এততেও মানুষ
 সহজে নিরুত হয় না। রমণী ব্যভিচার করিলেও তার

সেই স্নেহোন্মল বৃথ দেখিয়া মানুষ গলে পড়ে; আর
 যদি না পড়িত, তাহা হইলে মগ্নতঃ রূপমৌলিনীর দল
 থাকিত না। তোমার কলঙ্ক সবেও যখন সেই
 হৃদয় গগনবার্ণ হইতে তুমি যেত স্রবণ পূর্ববর্ষের
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেতের আড়ালে গাড়াইয়া অশ্রু দূরিত্তে যেন,
 তখন কোন্ পাবও না বলিয়া গিয়া তোমার স্নেহ-
 মল রশ্মি প্রাপ্তির কল্প অপেক্ষা করে? এটি
 অবশ্য মনুষ্যের মহত্ব বলিতে হইবে। তুমি যোষ
 করিলে আমি ক্ষমা করিলাম; আর আপনা ভুলিয়া
 তোমায় আলিঙ্গন করিলাম। কিন্তু এ পোড়া
 অদৃষ্টে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও বাহ প্রসারণ
 করিয়া আলিঙ্গন করা হইল না। তাই বলি তোমা
 ছাড়া স্নেহের সন্ধান ত কোথাও মিলিল না।
 তোমাকে যার যার নমস্কার করি।

বরণ

(শোকের পুরীতে)

[শ্রীকালিদাস রায় বি এ, কবিত্তগাফর]

হলো তোমার বরণ প্রিয়ে মরণ নদীর ধারে,
 বোঝন হলো রোমন রোলে আকুল হাংকারে।
 কোথায় প্রেমের কোথায় হাসি ?
 বাহুল্য নাক সানাই বাদী,
 হোঁ হোঁ ধ্বনি উঠল শুধু শোকের পারাবারে।

আলমিক পূর্ণিমাতে পুষ্পশোভন রথে;
 তোমার সাধে প্রথম দেখা অক্ষ পিছল পথে,
 অশ্রুদান ঘাড়েই জীবন সাথী,
 অলস চিত্তাধ বাগর ব্যাতি,
 বাসন্ত রাত্তি শুকল অকাল আমার অধিবাসারে।

আসনি সেই হতে আমার স্নেহের সহচরী,
 শোকের রাতেই দিলদহী আনুগে দয়া করি,
 সেই হ'তে ঐ অঁচল টি যে
 অক্ষতে মোর রইল ভিত্তে,
 সেই হ'তে সেই বসলে আমার সকল বেধনারে।

বশ্ণী বছর বনোভূত হইল দিবের পুটে,
 হইদিনে প্রেম বশ্ণী বছর আধিঘে গেল চুটে,
 স্নেহের দিনের প্রথম মিলন,
 স্নেহের রাতে শিখি বীধন,
 অক্ষমলের মিলন অঁচুট এপারে ওপারে।

রাজা মা

(গল্প)

[ঐকিরীটের শোণ]

১

গজা ধান করিয়া নীহার ঘন বাড়ী কিরিবার
যোগাড় করিতেছিল, তখন দূরে একটা হুট্‌হুটে বহর
সাত্তকের ছেলেকে দেখিতে পাইল। তাহাকে
বেশিয়া আর একটা ছোট নুখ তাহার ঘনে পড়িল।
সেও এতদিনে ঠিক এমনটা হইত।

বীরে বীরে বাগকের কাছে আসিয়া নীহার
জাবিল—খোকা!

বালক তাহার দিকে তাকাইল।

তোমার নাম কি খোকা!

হুশু!

হাঁ তাই ত! সেই চোখ, সেই চেহারা!

কোথায় থাক তুমি!

বালক অথাক হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া
বহিল,—কেন আমার বাড়ীতে।

কোথায় তোমাদের বাড়ী?

ভুলু হাসিয়া কহিল—জানতাম নুহি। ঐ যে একটা
লাল রঙের বাড়ী দেখা যাচ্ছে ওটা আমাদের বাড়ী।

ভুলুর কথার নীহার একবার সেদিকে তাকাইল।
দূরে একটা লাল রঙের সোতলা বাড়ী তাহার চোখে
পড়িল। বাড়ীটা বেশিয়া অনেক দিনের একটা
পুরাণ নৃতি তাহার ঘনে পড়িল! হাঁ ঠিক ত! ওটা
সেই বাড়ী!—ওটা সেই বাড়ী।

ভুলু এতক্ষণ নীহারকে বেশিতেছিল। নীহারের
তাতলা ছিল, ছিপে বেহটা, হরিণের মত চোখ দুটা
কাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। তারপর হঠাৎ
সে বলিল—‘তোমার নাম কি কলে না ত!’

‘রঘনী’ হাসিয়া বলিল—নীহার। আমাকে
তোমার ঘনে থাক্কে?

বা রে! ভুলবো কি করে, বেশ ঘনে থাক্বে।

আচ্ছা তোমার বাড়ী কোথায় কলে না যে!

আমার বাড়ী অনেক দূরে।

কত দূরে?

অনেক দূরে—তুমি একদিন যাবে?

হাঁ যাবো! কিন্তু মা যদি যেতে না দেয়!

তাহ’লে আর যাবে কি করে?

না তা হবে না। একদিন সুকিয়ে আমি তোমা-

দের ওখানে যাবো!

তোমার মা জানতে পারলে মাঝে না?

জানতে পারলে ত? আমি যাবো আর আসবো!

ঐ যে মা আসছে যাই!

কাল আসবে ত?

‘হাঁ’ বলিয়া বালক চলিয়া গেল।

নীহার সেইখানে থাড়াইয়া বসি তাকিতে
লাগিল!

২

এমনই করিয়া তাহারে দেখা হইত। ভুলু
ইতি মধ্যে নীহারের সঙ্গে একটা সখ্য পাতিয়েছে।
এখন তাহাকে রাত্না-মা বলিয়া ডাকে; কেন না
নীহার দেখিতে বড় ছন্দর।

হাস দুই পরে একদিন যানের ঘাটে নীহারকে
বেশিতে না পাইয়া, স্থাধিত অন্তঃকরণে
গৃহে কিরিয়া আসিল। সাত্তানিনটা সে বিবর্ষ হইয়া
বহিল। সন্ত্যার ভুলুর পিতা সম্বৎ অকণ্ঠ্যার,
তাহাকে বিবর্ষ বেশিয়া অল্প করিয়াছে কি না
মিআলা করিলেন। উত্তরে ভুলু স্তম্ভ নুখে শুধু ‘না’
বলিয়া চুপ করিয়া বহিল।

অরুণকুমার কিছু বুঝিতে না পারিয়া, আত্রে
আত্রে তুলুয় গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে, বলিলেন,
‘—বোকা! কি হয়েছে বল না’

তুলু কোন উত্তর দিল না।

অরুণকুমার বুঝিলেন কিছু হইয়াছে, কিন্তু কি
হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া চূপ করিয়া বসিয়া
হইলেন।

৩

বাবা, বাবা, ছবিটা কার? কোথায় গেলে?
ও যে রাঙা-মার ছবি!

দিন বশেক পরে অরুণকুমার ঐষ্ঠকখানায়
বসিয়া একটা ছবি লইয়া নিষ্কিননে দেখিতেছিলেন।
পূত্রের কথাই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘রাঙা-
মাকে?’

তুলু মুকল্লির মত বলিল—‘সে অনেক কথা,
তুমি চিন্বে না।’

‘তোমার রাঙা-মাকে দেখাতে পারিলি?’

‘পারি কিন্তু আজকাল ত মার দেখা পাই না।
বোঝ হব অল্প করেছি। বাবা আমার রাঙা-মার
কাছে নিয়ে চল না।’

‘কোথায় তাহের বাড়ী জানিলি?’

‘হাঁ। তুমি বাবে?’

‘হ্যাঁ চল।’

অরুণকুমারের মনে একটা পুত্রাণ স্মৃতি
জাগিয়া ক’ বৎসর ধিতছিল। সে আজ অনেক
দিনের কথা, অরুণকুমার তখন যুবক—সেই সময়
ক্লেশের ঘোরে পড়িয়া পিতার অজ্ঞাতসারে নীহারকে
বিবাহ করিয়াছিলেন। তারপর ঘটনাক্রমে পড়িয়া
পিতার মনোনীত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া সংসারী
হইয়াছেন। পিতার বৃহৎ পর নীহারের অনেক
বোঝ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন সংবাদই পান
নাই।

৪

তুলু যখন পিতাকে সঙ্গে লইয়া নীহারের বাড়ী

পৌছাইল, তখন সন্ধ্যা চইয়াছে। জানালার দ—
দিয়া চাঁদের কিরণ ঘরের মধ্যে আদিত্য পড়িয়াছে।

ঘরের কাছে থিয়া তুলু একলাক থিয়া ঘরের
ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—‘রাঙা-মা!’

ঘরের ভিতর হইতে ক্ষণকণ্ঠে উত্তর আসিল—
‘কে তুলু? এসেছিস—আর বাবা আর!’

তুলু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল—
‘একি শুনেছি যে! অল্প করেছি না কি?
ইন্ বজ্জো রোগা হয়ে গেছে যে!’

নীহার মুহ হাসিয়া কহিল—‘এক এলি কি
করে?’

তুলু হাসিয়া কহিল—‘এক! আসতে বাব কেন?
—বাবা এসেছে।’

নীহার কণ্ঠিতবরে জিজ্ঞাসা করিল,—‘কে?’

তুলু পুনরায় কহিল—‘বাবা! বাবাকে কেন না
বুঝি? কিন্তু বাবা তোমাকে কেনে। বাবার হাতে
আজ তোমার একখানা ছবি দেখলান।’

তুলুয় কথা নীহার একাগ্রচিত্তে শুনিতছিল।
কথা শেষ হইলে তুলুয় দিকে তাকাইতেই, অরুণ-
কুমারকে ঘর ঢুকিতে দেখিতে পাইল।

তুলু পিতাকে আদিত্যে দেখি। চীৎকার করিয়া
কহিল—‘এই যে বাবা আসছে।’

অরুণ ঢুকিয়া কহিল—‘নীহার কমা কর।—
অনেক অপরাধ করেছে।’

নীহারের হই চকু দিয়া অরুণ পড়িতছিল।
উত্তরে কহিল,—‘এতদিন পরে মনে পড়েছে। বোল।
তোমাকে আর বেনী দিন জালাতন কর না।’

অরুণকুমার নীহারের নীর্ণ হাত হুটী কোলের
উপর লইয়া কহিল—‘তোমাকে ভুলে ছিলাম তা মনে
করো না—তোমাকে অনেক পুঁজিছি কিন্তু পাই
নাই। তুলুয় কাছে আজ তোমার সন্ধান পেলাম
মাত্র।’

নীহার তুলুকে ক্রুর মধ্যে টানিয়া লম্বে
চুষন করিল। তুলু কহিল—‘রাঙা-মা এবার আমারে
বাড়ী চল।’

মহারণো

(ঐ প্রবোধনাট্যরূপ বন্দোপাখ্যায় এম এ, বি, এল)

হেথা যে বিদ্বান আছে যাদের অঁচল,
তাই এই মহারণো শাস্তি নিরমল
ভূমানন্দে রাখে নিত্য; চিত্তের বিক্ষোভ
নাহি হেথা, নাহি হিংসা কাম-ক্রোধ-লোভ;
বার্ধে বার্ধে নাহি থাকে ষাট প্রতিঘাত
অহংকার করে বাহু প্রদীপ্ত প্রভাত;
ঈর্ষা, বৃণা জিহ্বাসার কলক অঁধারে,

স্থখিত গ্রন্থের মত, জ্ঞান-সমিতিতে
প্রসিদ্ধে উন্নত দ্বাধা, কবি তিলে তিলে
মানবেরে বর্জ-সুত্র, এ বিক-নিখিলে
মানবের স্পর্ধা গরু দন্ত অধিকার
বিধাতার প্রেম রাত্তো করে গো বিস্তার;
নাই হেথা সেই স্বার্থ অনর্থ-নিধান
আত্ম-বলিদানে তাহা লভেছে নির্মাণ।

প্রপর্ণা

(উপস্থাপন)

[ঐমতী আঘোদিনী ঘোষ]

(৪)

নৌকার উঠিয়া সকল বেলা বিগত হানে অভিনীত সুদূর ধিয়েটারের একরে অভিনয় ও বিশ্রহের দীর্ঘ নিত্রান্তে বিকাশ বেলা নশীশেখরের নৃত্য কলার উপর সন্নিবেশ অসুভাগ বৃত্তি পাইয়া গেল, ও ছত্রিশ রাগ ও চৌষষ্ঠি রাগিনীর উদ্বোধন আরম্ভ হইয়া গেল। যাকি আসিয়া সোমেন্দ্রের কাছে অভিযোগ করিল যে, অস্তঃপর নৌকা জলতলগামী হইলে তাহার কোন ও "সোহ" নাই। নশীশেখর তখন ক্ষুদ্রমুনে কলানন্দীকে বিদায় দিয়া তাস লইয়া হাঁসের উপর বসিল। কিন্তু তাহাতেও বিয় বটল, বেলায় নাম লইতেই সোমেন্দ্র তাহাকে জীব বিশেষের নামে অভিহিত করিয়া কহিল যে, এই কবিন্দ্র

[[কীর্তিত নৃত্য সুবর্ণানিধাং দিনান্তের সময় যে তাস খেলিতে চায় অহংকার বহুদা জগৎ দারুণীকরা কৃপা।

উত্তরে নশীশেখর তাহাকে কবীরের কাবরায় ইত্যাদি বহু সম্মান যত্নক উপাধি প্রদান করিল। সোমেন্দ্র তাহাতে কোনও আপত্তি করিল না।

হারিয়া গিয়া নশীশেখর নীচে পথের মনোযোগ সহকারে সমবেদ ভঞ্জে প্রবৃত্ত হইল, সোমেন্দ্র ত্রেনপক্ষ্যবৎ এক ব্রহ্মৎ ধাৰা হারিয়া বধাসম্ভব কবলিত করিয়া কহিল, "এটা কি রকম ভক্ততা হচ্ছে?"

নশীশেখর কহিল, "কবি যাহুব তুমি এ হেন পথের সমীপে নিদ্রা-সায়াকে স্বর্গচল্যাকলা ভট্টনীহ—"

সোমেন্দ্র তাহার বর্ণনা শেষ করিতে না দিয়া বলপূর্বক সন্দেশের হাঁড়ি কাড়িয়া লইয়া প্রতিশর করিয়া দিল, "জোর ধার মলুক তার।"

নৌকা এখন তীরের কোল ঘেঁষিয়া চলিতেছিল, অল্পক্ষণে কাছিত তটে ধাবনশীল শিতদলের মত তরল প্রৌদী বাইয়া আশিয়া আবার পরক্ষণেই নাখিয়া যাইতেছিল।

সোমেন্দ্র কহিল, “ওহে বেথুতে পাছো কিছু ?”
শশীশেখর এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, “কি ?”

“একটা মড়া”

“কোথায় ?”

“ঐ যে খেলুর গাছটা গড়ে আছে, তার কাছে কাশনের ধারে”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, সেবেছি এখন”

“একটি মেরের মড়া”

চাহিয়া চাহিয়া শশীশেখর বলিল, “মড়া ভাঙ্গিয়া যেওয়া ভাতী খায়।”

নৌকা তখন কবিত শবের আরও নিকটবর্তী হইল, সোমেন্দ্র অতিনিবেশ সহকারে লক্ষ্যেই নিরীকণ করিয়া কহিল, “দেখ শশী, আমার মনে হচ্ছে বেন শবে লোকের লক্ষণ আছে। মড়া মানুষের বর্ণ এ রকম হয় না।”

শশীশেখর বলিল “হ’তে পারে তা, পরীক্ষা করে দেখ’ব না কি ?”

সোমেন্দ্র মার্কিকে ডাকিয়া নৌকা খেলুর গাছের নীচে জিড়াইতে বলিল। চালু তটের উপর সকল জন তরঙ্গাভিঘাতে উছলিয়া উঠিতে লাগিল, চারিদিক হইতে তটান্ত্রিত জনের কলোন্নয়ন মুহূর্ত্তনোচ্ছ্বাসের মত শোনা যাইতে লাগিল।

লাকাইয়া তীরে উঠিয়া সোমেন্দ্র বৃত্তবেধের নিকট গেল।

সুসুমারী তরঙ্গী বাগ, শৈবালজ্যোতিত পুষ্পের মত তরঙ্গাংশিগুণ কর্ণমে অবলিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বালিকা উদ্ভান ভাবে শাখিত, তরঙ্গ-তাজিত কল তাহার অর্ধাঙ্গে বেশ দান রাখিয়া যাইতেছে, তাহার মুক্ত কেশরাশি তরঙ্গে একবার ভাসিতেছে, একবার তট-মুক্তিকা-লীন হইয়া যাইতেছে। সোমেন্দ্র তাহার দিকে নির্বিষেব নয়নে চাহিয়া রহিল।

শশীশেখর তীরে উঠিয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, “বিষয়টা জটিল বোধ হচ্ছে”

“কি রকম ?”

“হয়ত এ আশ্ব হত্যা করেছে, নয় ত কেউ ছুঁবির মেরেছে”

“বল কি !”

দেখ’ছ না গায়ে কানড়ে পাঁচ দাঁধা।”

“হ’তে পারে। আশ্বহত্যা’ই হ’ত করেছে”

“প’ব সম্ভব। এই অসংখ্য প্রাণীগুলির মৃত্তির এই একটা সোজা দাঁড়া কি না, তাই দাঁড়ীর অসম্ভাব এখানে কখনও ঘটে না”—

“দেখ’ না বেঁচে আছে কি না।”

সোমেন্দ্র বালিকার মৃত্তিকাবলিগুণ হাতখানি উঠাইয়া নাকী পরীক্ষা করিতে লাগিল।

খানিক পরে শশীশেখর দিচ্ছালা করিল, “কি দেখ’লে ?”

“ঠিক মেরেছে বলতে পারি না। একবার ভাল করে দেখ’তে হচ্ছে।”

সোমেন্দ্র গায়ে সাট গুলিয়া শশীশেখরের হাতে দিয়া মাগকোচা আঁচিয়া কানড় পরিয়া বালিকার মৃতবৎ নিশ্চয় দেখ পাখালি করিয়া উঠাইল। তাহার পশ্চাতে আর্য তটস্থ মৃত্তিকা বসিয়া যাইতে লাগিল।

কতকগুলি দলিত পাছেহ পাতা, বাসের চাপড়া খড় ফুটা বালিকার ঐবার মূণে লয় হইয়াছিল। সোমেন্দ্র অর্ধেক মনে নাখিয়া টেউ দিয়া অপসারিত করিল। মুক্ত আকাশ হইতে লহর ধারে দলিত সাহস হৃদীর স্বর্ণদ্বারা শৈবালসলমুকু লগ্নিবৎ তরঙ্গ-বিধৌত বালিকার ঐতি অঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া দিল।

সোমেন্দ্র ডাকিল, “শশী !”

নৌকার পল্লীএ দাঁড়াইয়া শশীশেখর কহিল, “কি কুর্ভে হবে ?”

“তোরাণে দিয়ে গায়ে কাষা মাট, বালি তুলে দিতে হবে, টেউএ গেল না।

শশীশেখর লাভাইয়া মনে নাখিল ও যথাবিধি কার্য সমাধা করিল।

সোমেন্দ্র কহিল, “এখন নৌকাধ তুমি আগে ওঠ, চুলবার সময় ধরতে হবে।”

শশীশেখর নৌকাধ উঠিয়া পাড়াইল, সোমেন্দ্র সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপে নৌকাধ উঠিতে লাগিল। বালিকার শিথিল মস্তক তাহার স্বকের উপর লুটাইয়া পড়িল, তাহার কেন্দ্রগতি তাহার অংশ ও পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

সোমেন্দ্রের মনে হইল যেন, তাহার বক্ষায় জীবন-সম্বন্ধ-বর্জিত শব্দগোষ্ঠে চেতনাত্যাগ লক্ষন সে অনুভব করিল। একটা অননুভূত পুলক সহসা তাহার বক্ষের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া ওরফারিত সপ্ত-কল্লোলেরমত বহিরা গেল।

দলুইএর উপর পাড়াইয়া শশীশেখর কহিল, “সোম, তোমাকে সতীবেহ স্বক্রে দ্রুত পিষের বত দেখাচ্ছে।”

সোমেন্দ্র কহিল, “কিছু রাব্ এখন, ধরতে পারবে কি না ঠিক করে দেখ।”

“কল রাও কি রকম করে ধরতে হবে।”

“কল্লোর নীচে ধর, আমি তুলে ধরছি। দেখো, ঠিক করে ধোরো ছেড়ো না, আস্তে এখন পাটাতনের উপর শুইয়ে দাও।”

নৌকার ধারে বসিয়া বলে পাহের কাষা ধুইয়া সোমেন্দ্র কহিল, “কই, কাশড় চোপড় রাব নি।”

“নাঃ। তা কি বলেছিলে।”

“তা ও আবার কল দিতে হবে? কি বুদ্ধি তোমার!”

“ঐটিষ্টুত তোমার বেহাকাপানা! আমার স্ত্রীতি-মত নাটকিকেট পুণ্ডা বুদ্ধি, তার উপর তোমার সম্বোধ প্রকাশ করা ঘোরতর অজ্ঞান! কি চাই বল, এনে দিচ্ছি এখন।”

“হরোহে! তোমার আর দিতে হবে না!”

বলিয়া সোমেন্দ্র কাপড়ের কল নিস্কাইয়া তিতর হাতে আশ্রয়ীয়া হস্তাধি দিয়া আসিল।

শশীশেখর কহিল, “বে বিদন চুল, এর কল মুছাতে ত এক বর্টা যাবে।”

“আচ্ছা, তা তোমার জাবতে হবে না, তুমি একটা বিছানা তৈরী কর ত গিয়ে।”

শশীশেখর বিছানা করিতে দিয়া, বিছানা কিস্তি কিস্তিবে তৎসমক্রে সোমেন্দ্রকে শতাবিক প্রের দিক্কায়া করিল, অকস্মেৎ সোমেন্দ্র তাহাকে বিছাতীয়া তাহার ঠিকিড্ এবং অজ্ঞাত বিশেষণে অভিহিত করিয়া তদুপে তাহাকে উপরে বালিকাকে আনিয়া মোড়াইল, শশীশেখর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, চানরটা যে শব্দ করিবার আগে পাকিতে হয় তাহা তাহার খোঁজ ছিল না।

(৫)

সোমেন্দ্র ডাকিল “শশী।”

শশী শির কাহে পাড়াইল।

“নাড়ী ত পাওয়া যাচ্ছে এখন।”

“বৈচে আছে তা হ'লে?”

“তাই ত বোধ হচ্ছে।”

নাকের কাছে আঁহুল ধরিয়া সোমেন্দ্র কহিল, “নিঃশ্বাস বহিতে আরম্ভ করেছে যেন।”

শশীশেখরও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কতকণ পর্যন্ত উভয়ে ছুপ করিয়া রহিল।

ব্রহ্মবরে শশীশেখর কহিল, “সোম, তার পর?”

“তাই ত অবস্থি। বাড়ীতে নিজে দেখে হবে।”

“বাড়ী?”

একথা ভাবিয়া সোমেন্দ্র কহিল, “বাড়ী আপাততঃ থাক্। এখনও ত আমাদের মেনের তেতালার বরটা বাণি পড়ে আছে, সেখানে নেওয়া যাবে। দেখা দাচ্ কি পাড়ায়।”

সোমেন্দ্র উঠিয়া বালিকার মুখে চামুচে করিয়া ঠকথ চাঙ্গিয়া দিল।

স্বাতি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিঃশেষোদ্ধ বীণ এক কোণে টিপ্-টিপ্ করিয়া স্নান-ভাবে অন্তিমিতছিল। তাহার চকল ছায়া এক একবার ব্রহ্মাকার হইয়া আবার ঘুরে গিয়া যাইতেছিল।

নবীর বাতাসে নিশাবাদনের, শীতলতা বহিরা আসিতেছে। সোমেন্দ্র তখনও অকাত্ত বেহে আগিয়া পরিচর্যা করিতেছে। শব্দশেখর তাহার পার্শ্বে বাহু উপাধান করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সহসা বালিকা চাটিল, তিমিরবল্লভ আকাশ হইতে ক্ষুদ্রাকোটি নক্ষত্রের দীপ্ত আলোকপাতের মত সে চাহিল, সোমেন্দ্রের হৃৎ অস্ত্রাঘাতক স্পর্শ করিল, সোমেন্দ্রের মনে হইল যেন সমস্ত জগতের সৌন্দর্য সেই দুইর প্রকাবে প্রাণপাত করিল।

বালিকা কিছু যেন বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার বাকুশূন্য হইল না। সোমেন্দ্র তাড়াতাড়ি করিল “খাঙ্কু আপনি এখন কথা কইবার চেষ্টা করিবেন না, আপনার এখানে কোনও ভয় নেই। আপনি অস্ত্র; আমরা সাধারত আপনার তত্ত্বা করিব। আপনি একটু নিশা বাইবার চেষ্টা করুন।”

বালিকা চাটিলবিকে চাহিয়া চক্ষু বুলিল। দীর্ঘ নিদ্রার পর বালিকা আবার যখন জাগিল, তখন বাহিরে সৌর দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, লোমাদিত তরঙ্গের উপর দৃষ্টিকিরণ প্রতিফলিত হইতেছে। হৃৎস্পন্দনে ধাক্কা পড়িতেছে, তাঁরই তরুণির পাতার বর্ষার জল জল কল্লোলের সহিত মিশিতেছে।

সোমেন্দ্রের হাতের পাখা শিথিল অস্থির ভিতর হইতে পতনের অপেক্ষা করিতেছিল; তাহার চক্ষু আর যুগিত হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় কৌণকটে আর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, “আমি এখন কোথায়?”

সোমেন্দ্র করিল, “আমরা কলকাতায় বাছি।”

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বালিকা “জানালটা” বলিয়া চুপ করিল।

সোমেন্দ্র উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল। অর্ধাঙ্ককার নৌকার কক্ষ প্রভাতের নব দৃষ্টালোক জীকনের আনন্দময় বার্তা লইয়া প্রবেশ করিল।

বালিকা বলিল,—“আপনার আমাকে বাঁচিয়েছেন।”

“ভগবান বাঁচিয়েছেন, আমরা নিশ্চিন্ত-মান। আপনার পরিচয় পেলে আমরা আপনাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আনতে পারি।” কানিতে কানিতে বালিকা করিল “আমার বাড়ী নাই।”

সোমেন্দ্র ও শব্দশেখর পরস্পরের দিকে চাহিল, কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। বালিকা বলিল, “আমাকে যেখান থেকে এনেছেন সেইখানে রেখে আনুন।”

নৌকার ভিতরে অনেকক্ষণ কেহ কোনও কথা করিল না। বালিক পত্র বালিকা ঘীরে ঘীরে বলিতে আরম্ভ করিল, “কুম্বেন আমার কাহিনী? আমার নাম রানারুই। ষৈশবে আমার ফেলে যা চলে যান, তদবধি বাবাই আমাকে পালন করে ছিলেন। আমি তাঁর অস্ত্রের আঘতের মেরে ছিলাম। পৃথিবীতে স্মারক হই প্রাণী ছিলাম, আমাদের আর কেউ ছিল না। এর ভিতর হঠাৎ বাপ ও চলে গেলেন, বহিরা এক শোকাপুর রেখে গিয়েছিলেন; আশ্রয় অভাবে আমি তাঁহার ঘরে পড়লাম। মামা মামী ছই আমার উপর বড়ারুণ চরে উঠলেন, অথবা যে আমি তাঁদের অগ্রগণ্য কর্তে উপবিত হলাম, এটা তাঁদের নেহাৎ অসহ্য যোগ হতে লাগল। মামী বলেন, “এত বড় দিকী বেয়ে ঘরে পুত্র আর বরকারুটাই থাকি, কোনও মতে পার করে দিয়ে আপন চূড়িয়ে বেওয়া যাক। বটক এলেন, রক্তা গোল ই হাজার টাক। মামা মামী কি বন্দোবস্ত করেছিলেন জানি না, পরনার তামা পিতল ধরা পড়ল, ঝাড়া এসেছিলেন, তাঁরা সভা থেকে উঠে চলে গেলেন। মামী আমাকে দড়ি কদমী নিয়ে গলায় বেঁচে বলেন।”

অবগত হইয়া মেয়েটী চুপ করিল। তাহার দেখে লক্ষ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল, সোমেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার বুকে একটা ওষুধ ঢালিয়া দিয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য বলিবারায় কিরিয়া গিয়া সোমেন্দ্র

ঠাকুরদার হাতের তৈরি সেই বিশেষ রকম পিষ্টক
পরম পরিভোজনমূলক ভোজন করিল, এবং সেই সঙ্গে
লম্বা চোঁড়া এক প্রতিকটাপত্র এক অস্বাভাবিক লম্বা
চোঁড়া আশীর্বাদ লাভ করিল।

বেশের তেতালায় উপর একখানা ঘুর ছিল ;
সোমেন্দ্রে আশাভরতঃ সেই ঘরে বাধারানীর থাকিবার
বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সঙ্গে থাকিবার জন্য একজন
কী রাখিল।

বাধারানীর পথেই আর হইয়াছিল, জন্মদঃ তাহ।
না করিয়া বুদ্ধিই পাইতে লাগিল। সোমেন্দ্রে পড়া
ছাড়িয়া তাহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিল,
শশীশেখর গৃহ ছাড়িয়া তাহার বন্ধুর সাহায্য করিতে
লাগিল। আর্থিক ভার সেই গ্রহণ করিল। এ
সময়ে সোমেন্দ্রের কিছু করিবার শক্তি ছিল না,
কারণ তাহার উপরে কল্যাণ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল
না, তাহার নিজের পড়ার ব্যয়ই সে অন্তত টানা-
টানি করিয়া নির্বাহ করিত। প্রতিপক্ষেই তাহাকে
ব্যয়স্ফোট করিয়া চলিতে হইত ; তাহার নৈশুণ্য ও
কিন্ধকতা তাহার একবার সফল ছিল।

(৬)

একদিন সোমেন্দ্রে কহিল, “গা হ’ক আসল
হোসটা এখন সেখানে কি—”

শশীশেখর বাধা দিয়া কহিল, “তবে আর কি
কিসের জন্যে ?”

সোমেন্দ্রে কহিল, “এখানে একলাটি হুপ করে
পড়ে থাকে—তথা কইবার ত লোক নেই, এখন
কি করা যায় ?”

“তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাও না কেন !”

“বাড়ীতে ? এখনি ?”

“কতি কি ?”

“তোমাকে উঠেছে, চেহারাটা একটু শোষণাক্ত !”

“ই! নইলে বাবুর চোখে যখন না না কি ?”

“আবার নয় স্যারেল ঠাকুরদার। তাঁর যদি
অপছন্দ হয়, তবে কাজ হাশিল হবে না। তবে

তোমার ভাব করে নেওয়া প্রকার, সেখানেই সঙ্গে
পরিচয় করে কাঁহাতক দিন কাটে !”

“স্বামিত অভিব্যক্তি মত আমি, তুমি ত এ
বাড়ীতে আছে তোমার এতদিন ভাবটা করে কোলা
উচিত ছিল।”

“তাঁত ছিল, কিন্তু তথাপি কি জান, উত্তমবাদের
সঙ্গে আলাপটা অন্ততঃ ব্যাপার। দত্তর উত্তর মোটেই
জানা নেই, বোকা বনে ঘাই আর কি শেষে !”

শশীশেখর হাসিয়া কহিল, “ঐ ত পোশ ! চল
না এখন একবার কুশল জিজ্ঞাসা করে আসা যাক।”
অতি উত্তম বলিয়া সোমেন্দ্রে সার্ট পাং দিল।

বাধারানী বিছানায় শুইয়া ছিল, বিবাহস্নিহ পাত্তর
সুখস্বাধি। তিন চারিদিনের বাধা খোঁপা বিস্তর ও
নিখিল হইয়া প্রীতির উপর স্তুতি হইতেছে ; বেদার্ণ
চূর্ণ কুশল নিঃসরণ কল্যাণে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

সংলা পায়ের লক্ষ পাইয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া
বসিল। সোমেন্দ্রে কহিল, “কেননা আছেন আজ ?”

“তালই।”

“আর আর হয়নি ত ?”

“না।”

“শরীর বেশ সুস্থ লাগছে ?”

বাধারানী মাথা হেলাইল।

তাহার কক্ষ অদরদখল কবরীর দিকে চাহিয়া
সোমেন্দ্রে কহিল “হান কর্তে ইচ্ছে হয় ?”

বাধারানী সম্মতি প্রকাশ করিল।

সোমেন্দ্রে কহিল, “তবে কাল একবার নাইতে
পারেন। পরম্বলে নাইবেন কিন্তু।”

পরে কীর দিকে করিয়া চাহিয়া কহিল,
“দরদা আনাগা বন্ধ করে, বেশ সাবধানে কাল
দানটা করিয়ে দিয়ে। সেখা বেষ্ট্রকণ ভল পাবে
থাকে না বেন, পারেন ত ?”

কী তাহাদের অন্তর দিয়া বলিল, “যে সে সৌন্দর্য
জন্মদা কিশলবরণে অবগত আছে এবং এ সব বিষয়ে
তাহাকে কোন ও উপদেশ দিবার আবশ্যকতা নাই।

বে বাঁকী ছাড়িয়া সে এখানে কাছে লাগিয়াছে, তাহাদের এতোক ছেলেটিই তাহার হস্তে প্রতি-পালিত হইয়াছে।”

সোমেন্দ্র রাধারাসীর দিকে চাহিয়া কহিল, “একলা আশনার খুব ব্যাথা লাগে বোধ হয়। বইটাই পড়তে ইচ্ছে হলে এনে দেওয়া যেতে পারে।”

রাধারাসী কিছু উত্তর দিল না, কেবলমাত্র মাথা হেঁট করিয়া অঙ্গুলির নখাণ্ডে পুঁটিতে লাগিল। সোমেন্দ্র কীকে তাহার পুনঃপুনঃ প্রতিবাধ সবেও প্রতিজ্ঞা স্বপক্ষে আরও কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া নীচে নামিয়া গেল। রাধারাসী নীরবে খোলা দরজার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল ইহার কাণ্ড! তাহার কীকন ইহাদের কি কার্য। কেন তাহারা তাহার মন্ত এত ক্রেশ বীকার ও এত অর্থ ব্যয় বীকার করিতেছে! লক্ষ্য এক অজানা কিসের ভাবী, তেজ মানসগটে উদ্ভিত হইয়া রাধারাসী নিহরিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সোমেন্দ্রের সোম্য শ্রী ককণা-ব্যব্রক নৃণি তাহার নয়ন পথে ভাসিয়া উঠিল, তাহার দেহ-কোমল নৃষ্টিপাতে তাহার হৃদয় আশার সকার হইল, ভয়না মুজারিত হইয়া উঠিল।

(৭)

শশীশেখর বলিল “না হত, চল বেলা থাক্—”

“কি বলেন?” বলিয়া সোমেন্দ্র কানটা শশীশেখরের মুখের কাছে আনি।

—সহানুভূতির বজাটা ত তোমার প্রাণেই ডেকেছে। আমি না হয় তার উপর বলেছি যে তবে জবে একটু বেলাই থাক্।”

“হারিলে ঐ হার নিব, জিতিলে দুইটা নিব,” প্রতিজ্ঞাটাও করে নেও সঙ্গে সঙ্গে।”

“মম্ব কি, ধর প্রতিজ্ঞা না হয় কল্যায়। হাঙ্গলও জিৎ কি না!

“নিচাই! তবে কি না বাসর ঘরের পালাটা

আপন তাপে লাগ করে আনন্ডা বর্ণকেন্দ্র কাকতালে পড়ব শেষে।”

“আচ্ছা কতক ত!”

“হাঃ, ও কি কথা হোল! উল্লর পক্ষে বাতা অথবা ভাব বিনিময় না হলে পূর্ণরূপ কি কখনও এক তরকারি নিক্কি হয়!

শশীশেখর তখন তাহার কণিকর্ষণপূর্ণক ‘তাহার কবিত্বের পুরস্কার প্রদান করিল। সোমেন্দ্র কানে হাত ক্লাইতে ক্লাইতে কহিল, “এতটা অহংকার ভাল নয়, আচ্ছা চল কোথায় যাবে চল।”

“খেলার কথা, কিন্তু আমি পাড়তে পাহব না, সেটা তোমার পাড়তে হবে।

“অর্থাৎ কি না সুখশর হয়ে আমায় লুনা করে দিতে হবে। বাবুর বন্ধু সন্তানপ্রেমও সাহস ক্লাঞ্জে না। কিয়ের সময় মালাটা পলায় দিতে, না হয় আনায় ডেকে, তাতে বরক এক আধটুকু লাভের সন্তানবনা থাকবে।”

“লাত চাও না কি, তা হ’লে পুরোই ছেড়ে দিতে পারি।”

“দাও যদি সর।”

“ভারে না, ঠাট্টা রাখ, দিয়ে কি বলা যাবে বল দেখি।”

“তার মন্ত আবার ভাবনা? বল—

“রিম্ কিম্ব ঘনবে ঘন বক্রিবে—

পগনে ঘনঘটা নিধরে উঠে তর লগা—”

“মধুর কটাবে দিন পালা কিবা তালে—”

শশীশেখর হাস করিয়া কহিল, “কেহ?”

স্বাত্তার দিকে জানাল পুঁটি। রাধারাসী ঝড়াইয়া বনঘটালমাছের আকাশের বাবিরবর্ণ ত্র্যবিত্তেছিল। করে গারের মন্ত পাইয়া সে ভিরিয়া ঝড়াইল, কা কীট দিতে দিতে তাহার চুতপূর্ণ মনিবের বাঁকীর গর কারতেছিল, কাঁটা রাখিয়া সে তাহাদের বসিতে দিল।

সোমেন্দ্র বলিল, “কেমন আছেন এখন?”

রাধারাসী কহিল “ভাল আছি।”

“একলা আপনার নিষ্ঠাই পূর্ব বারান নাথায়।”

দ্বিতমুখে রাধাশ্যামী তাহা অকোকার করিল।

সোমেন্দ্র কহিল, “আঃ কুটিল! হুইয়েছে!

কি ঠাণ্ডা হাওয়াটা আসছে! আপনি ঠাণ্ডা লাগাবেন না কিন্তু! শরীর এখনও চুর্কল, আবার বারান পড়বে!”

রাধাশ্যামী জাননার নিষ্ঠট হইতে সরিয়ে ধাঁড়াইল।

এমিক্ ওমিক্ চাহিয়া সোমেন্দ্র কহিল, “কুটিল মধ্যে আজ আর কিছু ভাল লাগছে না! আহুন না একটু ভাল খেলা বাদ্।”

রাধাশ্যামী হাঁ কি না কিছুই বলিল না। সোমেন্দ্র ‘মৌনঃ সন্ততি লক্ষণঃ’ ধরিয়া নিত্য শশীশেখরকে কহিল, “শশীশেখর দেখ না এত ছোড়া খেল পাও কি না।”

বলাবাহুল্য তাস শশীশেখরের পকেটেই হিটমান ছিল, কিন্তু সে বিধা ভাল মানুষ নাহিয়া নীচে গিয়া, পাইচারী করিয়া আসিয়া তাস বাহির করিল।

বেলিতে বসিয়া রাধাশ্যামীর প্রথম বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। জীবনের যে অষ্টপুর্ক অধায়ে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার দিকে সে কেবলি বিশ্বরোপহস্তনের চাহিতেছিল, বেংগো যে ইহার সমাপ্তি, কোণার যে ইহার সন্ততি, তাহা সে কিছুতেই বুঝিয়া পাইতেছিল না।

বেলায় যে রাধাশ্যামী বিশেষ পরিশ্রম ছিল, তাহা নয়, সোমেন্দ্র ও শশীশেখর বেঞ্চাপূর্বক চাহিয়া ও কাঁচা বেশিয়া অহমর্গ তাহাকে প্রেমান করিল। সোমেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “আপনি মনে কচ্ছেন এ দুষ্টো কি নাহা!”

এতিবাধ করিয়া রাধাশ্যামী বলিল, “নাঃ, আমি তুঝি নিজেই জিতৈছি। মৈবে জিত চয়ে গেছে- আমি খেলা জানি না।”

সোমেন্দ্র কহিল, “ওটা ত নিষ্টাচারের কথা।”

রাধাশ্যামী মোর করিয়া বলিল, “কথখনো না।”

আর একবার খেললেই বুঝতে পারিবেন বিজ্ঞা কত।”

সদ্ধা হইয়া আসিতেছিল, বেঞ্চাকার দিকসের মিনমুস্তি নভঃপট হইতে ক্রমশঃ কিলীন হইয়া বাইতেছিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া সোমেন্দ্র কহিল “আজ্ঞে আর নয়, তাসকের লজ নেটা মূলত্বী হইল।”

দিক্‌টা দিয়া নামিতে নামিতে শশীশেখর সোমেন্দ্রকে কহিল, “বাংলায় ছেলে তুমি।”

সোমেন্দ্র কহিল, “তাই না কি? জানিতুম না সেটা, লজবান যে জানিয়ে দিলে!”

“তোমার পুত্র্য পরিচয়ের চালটোতে বাতবিকই আমায় আবাক্ করে দিয়েছিল। এমনভাবে কথা কইছিলে যেন তুমি ঐশ্বর্য সোমেন্দ্র ক্রমশঃ লজ ন্য হয়ে উঠেই থাকে ঐশ্বর্য বর্ণিত। অথবা চন্দ্রকলতা।”

“তুমি ত তা বল্‌গেই, তার লজ চুরি করি সেই বলে চোর। কোরাকে কথন করে রেখেছ,— সেই অস্বাভাবিকতাটা চাক। দিতে পারে, তার অস্বাভাবিকতা বর্ণন কহ্‌তে তোমার আয়োজন যে বৃহৎ হওয়া চাই। সেটা কি একবারও ভেবেছ, নইলে তোমার যত অস্বাভাবিক হইয়াবে, তোমার সেবা পীড়নের রূপ দারণ কর্ণে। অপরিচিতের কাছে মানুষের যে কুষ্ঠা বিধা সংলগ্ন—তার ভিতর মানুষ ভাল বুদ্ধিতে পারে না, তার চেয়ে কয়েকটা ঘর ভাল। সফটো কাঁটার মত বড়ম্‌ করে বেঁধে।”

“হয়েছে বাবা! তবু কত, আর নয়! এমন মূল্যবান মহাপ্রতীতিটা অস্বাভাবিক প্রকাশ কহ্‌ সে যে মাঠে যাত্রা গেল। তা তুমি ওখানে কিছু বলে ত পার্ণতে! আমাকে দিয়ে ত এ সব হবে টবে না। আমার কথা কইতেই বাধে।

“তোমার মত আমার মনে ও আর রাজা টোপরের স্থতি থাকে না।”

শশীশেখর মনে মনে সোমেন্দ্রের সত্যাত্মক শক্তির ভূমি প্রশংসা করিল।

(ক্রমশঃ)

পতিভাঙ্গ

(ত্রিভুজবিহার নামে চৌধুরী)।

প্রজাপতি নারীকে পিতৃকুল হইতে বৃদ্ধ করিয়া যে স্বামীকুলে অধিষ্ঠিত করেন; তৎ অর্ঘ্যমা এবং সবিভা গৃহকর্ম সম্পাদন-করে নারীকে যে পুরুষের সহিত পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন; জনক-জননী মেহময়ী হৃদিতাকে বাহার হস্তে সমর্পন করেন; কুশভিকাকালে নারীগণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া নারী বাহার সহধর্মচারিণী হন; বাহার সহিত রমণীয় জীবনে বরণে, আশ্রয় আশ্রয় সধক; সেই পাতঙ্গনী ভগবানে ভক্তি, পতিব্রততার পূর্ণ নিদর্শন।

কৃষ্টি প্রারম্ভকাল হইতে আজ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে, যে রমণী পুরুষ অপেক্ষা ব্রতাবতঃই কোমল-ব্রতাবা ও ভক্তিশরায়ণী। ব্রতাবতের পৌণ্ড্রগণের কৃষ্ণপ্রোথ, সেই কোমলসৌন্দর্যের ব্রতাবজাত ভক্তির পরিচায়ক। ভক্তি ত্যাগেই পরিস্ফুট। ত্যাগ ব্যতীত ভক্তি হয় না—আবার ভক্তি ব্যতীত ত্যাগও সম্ভবপর নয়।

ভক্তি প্রেমের নামান্তর। প্রেম-ভগবানে, পতি পত্নীতেও যাক্ষে পূর্ণ প্রকাশিত। প্রেম পাশব শাখার মনুষ্য, সত্যতাও সমাজ কলরূপে লক্ষ্যগ্রহণ করিয়াছে। প্রেম আকাশ হইতে কৃষ্টি অথবা কুবীরের জায় পৃথিবী-কক্ষে নামিয়া আসে নাই—পৃথিবীতেই ইহার জন্ম।

জগতের যতগুলি জীব বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার শত সহস্র গুণ লক্ষ্যগ্রহণ করে এবং এক প্রাণ প্রাণের মধ্যে শতাধিক দাবীকারী উপস্থিত হয় বলিয়া,

জীবের পক্ষে জীবন একটা বিস্ময়কর সংগ্রামের হাত-হাম। এই অসম্পূর্ণ সহ্যকে অবলম্বন করিয়াই কবি বোধ হয়, প্রকৃতিতে ব্রহ্মবশনভূষিত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতির সমস্তটা যদি স্বার্থের সংগ্রাম বলিয়া বর্ণনা করা চলে, তাহা হইলে অবিচার করা হইবে। পরিণামে একটা স্বার্থপরতা আছে—উহা প্রেমের বিবরণ। প্রত্যেক জীবের জীবনে এই স্বার্থের সংগ্রাম ও পরস্পর জীবনোৎসর্গ করিবার ইচ্ছা লক্ষিত হয়। একটা স্বার্থভিত্তিক, সধীর্ঘ, অপরটি পরার্থ প্রয়াসী, বিদগ্ধ; একটা মর্ত্য, ভীতিপূর্ণ, অপরটি স্বর্গীয় প্রীতিপূর্ণ; একটা ব্যক্তিগত, ফণদ্বারী, অপরটি বিশ্বগত, চিরস্থায়ী। একটা ক্লমণ অপরটি বন্য; একটা আত্মসম্পূর্ণ সংগ্রহ-প্রায়, অপরটি ত্যাগী; একটা মনোমলিন, অপরটি হৃদয়োৎসাহি বিমুক্ত। এই উভয় প্রকার তত্ত্বে জীবনের বহন সাধিত হয়। তন্মধ্যে যিহীত প্রথমটির অপেক্ষা উচ্চতর। প্রেম পর-জীবনার্থে জীবনের সর্জবহান করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ে।

সিদ্ধময়ী দেবী নিজে প্রকৃত ব্যক্তি-বর্ণণে সমস্ত নদীর উপর আশনার আধিপত্য বিস্তার করে, সেই-রূপ আশাবেশ সাক্ষী ভূষিতী লগজাননীগণ যন্ত্র-কুল-সমাজ শিক্ষয়িত্রী জননীরূপে, স্বামীশক্তি বিধা-য়িত্রী সহধর্মিণীরূপে, শোভাগাছায়ায়িত্রী মঙ্গলস্বাক্ষর, আনন্দময়ী সাহিত্যিকরূপে, অন্নদায়িত্রী অন্নপূর্ণারূপে এবং সংসারোচ্ছল শান্তিময়ী দেবী রূপে আশাপ্রদায়িত্ব বিস্তার পূর্বক জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

জনম গ্রন্থিনী স্তোত্র পতি কর্তৃক বিসর্জিত। চইয়াও একদিনের জন্ত ও স্বামীর পাছকা পুষাৎ বিরত হন নাই। সতী সাক্ষী সাক্ষী সতীর বলে কঠোর তপস্যা ফলে, স্বামী সত্যবানের জীবন লাভও পিতৃ-মাতৃ কুল উদ্ধার করিয়া সতীস্বের পৌরব বর্ধিত করিয়া গিয়াছেন। দক্ষহতা দাক্ষিণী দক্ষালয়ে পতিনিকা প্রবণে আপন অসুখা জীবন বিসর্জন দিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বেহুলা পতির পুতিপঙ্কজের স্তবসেই লইয়া ক্রোড় ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চির-ভাবের অন্তঃকরণে আভাস দেখা পায়। পতিভক্তি বলে সতীলক্ষী চূড়ামা দেবী মোক্ষক তরঙ্গস্রগত করিয়া অজ্ঞানাস্ত্র শিখি-স্বজ্ঞকে মোক্ষমার্গে আনিতে পারিম্মতিগেন। কৃষ্ণ রোগগ্রস্ত পতিত পত্নী পতির মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে সতীসাক্ষী স্বামীকে বেড়া লক্ষ-হীনার ভবনে লইয়া গিয়া পতিব্রতা ধর্মের জয়ধ্বজা তুলিয়া গিয়াছেন। সতী শিরোমণি শৈব্যা মহর্ষি ঋষিমিত্রের দক্ষিণাদার হইতে পতি হস্তিকলকে উদ্ধার করিয়া পতি-প্রেমের অসুখী স্ত্রীজ্ঞ জগৎ সমক্ষে দেখাইয়া গিয়াছেন। পদ্মাবতী মেঘের হাসান কুব-কেতুর স্বাস্ত্র গ্রাধন বেশী ভগবানকে খাওয়াইয়া, পতির দাত্যকর্ণ নামে কলহ লেপন করিতে যেন নাই। পতিব্রতা পতিব্রতা গ্রাধন হুহিতার কুটরোগা-ক্রান্ত স্বামী কোষিকের শর্শে দ্রাওয়া হুনি দাখাচিত চইয়া, কোষিকের স্বর্ষ্যস্রের পূর্বে মৃত্যু হইবে বলিয়া শাপ দিলে, সতীসাক্ষী শাতিব্রতাবলে স্বর্ষ্যকে অন্তর্মিত হইতে যেন নাই। পূরে ব্রহ্মার স্বরে প্রাণ পাইলে, সতীসাক্ষী আবার স্বর্ষ্যস্রের একাশিত হইয়া, সতী মর্জিবাক্ষ্য করিয়া বিকীরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ পতনত উদাহরণে পতিভক্তি পরাকাষ্ঠার পুণ্যপ্রসাদের নির্দেশ করা বাইতে পারে।

হিন্দু সংসারে, পতি, পত্নীর রক্ষণ ও প্রতিপালক, পত্নী, পতির সহধর্মিণীও জীবন বহুরণের সাধনী; পত্নীর বাস কল ব্রতাব্রতানের সন্ধারী, স্বধর্মের পাত্রাবারের

একমাত্র তরলীও ইহশরকালের দেবতা, পত্নী পতির বশীভূতা প্রিয়ারাশিনী, গৃহকার্যে নিপুণা, সর্বাচার-যুক্তা লক্ষ্যব্রতণা ও সংসারাত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পতি শুভ, পত্নী শিখা, পতি হাস, পত্নী হাসী; পতি লক্ষা, পত্নী লক্ষী; পতি কাশা, পত্নী ছায়া। পতির দাপর সূক্ষ্ম জ্ঞান, পত্নীর জ্ঞান বীজার—উভয়ের একাশে সৃষ্টির প্রবাহ রক্ষা করে। জ্ঞানিনা; জগতের আর কোথাও পতিপত্নী এই ভাবে সংসাৎ হুশোভিত করিয়া থাকেন কি না ?

পতিভক্তি শুধু যে, স্বামীর জীকল্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নয়। পতির স্তুতিতেও পত্নীর স্বরবে ইগা সমভাবে জ্ঞাপক থাকে। আহারে, বিহারে, পরনে স্বপনে, বিপদে সম্পদে, আনন্দে বিষাদে, দুখে গুখে ঐহার মনুষ্য স্তুতি ঋজুভিত; ঐহার তির-স্বার আশীর্বাদ বরপ, বাক্যমধু বরপ, উপদেশ অদ্বত স্বরপ, আত্মা বেষণাক্তা; ঐহার মনোরহনের জন্ত ব্রতাব্রতায়ের সৃষ্টি, আয়োজ আয়োজন, বেশভূষার পরিপাঠা; ঐহার সহিত ইহ পরকালের সম্বন্ধ, হিন্দু বিধবা পতির সেই মনুষ্য স্তুতি কল করিয়া সেই প্রত্যেক দেবতার প্রতিচ্ছবি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া আত্মবন বিলাস বাসনা বিসর্জন, কঠোর ব্রতাব্রতাকল্যানে, বৈধবা ব্রতাব্রত পতিকে নাস্ত্রাণ জ্ঞানে পুষা করিয়া থাকেন। পতির সেবার, পতির থানে সতীর যে দুখ, যে আনন্দ, যে তৃষ্ণা, তাহা ও আর তুলনা আছে কি ? স্ত্রীজ্ঞার স্বাক্ষর ও বোধ হয়, তাহার তুলনার তুল্য।

অনন্তভগিনী প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে নারী মহিমা নানাভাবে বিকসিত। কিন্তু ভারত পতিভক্তির মহিমাই অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে বীর নারীর অভাব নাই, বিদ্রোহী ও নিতান্ত বিরল নয়; কিন্তু পতিব্রতা বর্ধই ভারত হ্রদীর অনন্তদাধারণ ধর্ম—অসাধারণ নিধন। বঙ্গের অপেক্ষাও ভীষণ রক্ষাপ্রীতে, অপেক্ষা কান-তলে সতীর পতিপদ সাধনার ক্ষেত্র। কীর্ত্তা-

সাগরে সহস্রকণ অনন্তদেব কণা-সমান, নাস্তায়গের সপরি বহুল যোগে অকৃত্য দেবী চির দীপ্তিময়ী
পাদদুলে কমলা, তৈলগাসে যোগেশ্বরের অঙ্কিত তপে পতিভক্তির জলন্ত ছবি। বর্ণে মর্ত্যে চির-ভাবর
সতী। আর উড়ে অনন্ত আকাশপটে বিড়োচ্ছল জগতে পবিত্র নারী বহিষ্যত অবিনশ্বর আদর্শ।

— — —

আবেদন

(শ্রীহরেন্দ্রকুমার রায়)

হৃদয়ে আজ একলা হুসুম! বনের ঘোলায় সমূল খোলে,
একটা-দুটো গানের পাখী আকাশ-বাতাস, কাঁপিয়ে তোলে!

চুটকী-পত্রা পাথরের তলায়,

হুঁসুমদের ঘুম ভেঙে যায়, —

থাকলে তোমার গোপন কথা আমার কাণে আজ এক খোলে,
তার আগে ভাই এক মিনতি—যোমুটা খোলে, যোমুটা খোলে!

•

নদীর কুক আম বগেচে জগপত্রীদের গানের সত্য,
তাই ভীয়ে তার কুলের আলয়—জুঁই, চামেলী, গাফল, জবা।

তোমার কুকের অকলসে,

বাতাস যে চায় মুহূর্তে যেতে,

নই আমিও ভালো মাহুদ—এই টুকু সই সমুদ্রে চোলে।

আর তো আমার সইতে না তবু—যোমুটা খোলে, যোমুটা খোলে।

•

জ্যোৎস্না-রঙে ডুবিছে কুপি চন্দ্র কি আজ নক্ষত্র করে,

পূর্ণিমা শোন্ বাজায় বীণা যনের ভেতর বস-বসে!

হোয়োনো ভাই বাস্তব পাখান,

অন্ধরলে প্রেমের তামান্

আজ দিওনা। আজ এক বালি গোবের ভাষায় মাতিয়ে তোলে।

ওগো আমার ভালোবাসা!—যোমুটা খোলে, যোমুটা খোলে!

— — —

হতভাগ্য

(চিত্র)

[শ্রীবটবুদ্ধ বোম্ব এম. এ]

আমার নামটা তোমাঘের বলব না, আর কেনেই বা তার কি লাভ হবে? হুঃখের সবটা শুনাও—না অনিচ্ছা আর থাকতে পারছি না। এত দিনে তা'কে বলি নি—কম্বু'র গম্বু'র পাগল, হবার জোগাড় হয়েছি। তাই আজ বলব। আমার বাপ মা আমার একলা কেনে এখন নতুন দেশে সংসার পাঠতে চলে গেছেলেন, তখন আমার বয়স তিন বছর ছাত্র। আমার মাসুখ কম্বু'র বাবার পুরাতন চাকর,—তা'কে আমি 'নিবু' কাকা' বলতুম। শিবু'কাকা আমার খুবই ভাল বাসতেন। কিন্তু তার ভালবাসা আমাকে বেশী দিন ভোগ করতে ছাড় নি। হঠাৎ একদিন হতভাগ্য বদলত এসে তা'কে কুণ্ডিরে জালিয়ে আমার কাছে কোঁক মিতে পেল। আমি তখন সবে বার বৎসরে পড়েছি,—

সংসারে আমি একা—আমাদের এতটা কুঁড়ে ঘরে পড়ে' থাকতাম। কুঁড়ে চ'লেও সেটা পৈতৃক ভিটে, বড়ই আদরের, বড়ই গর্বের। কুঁড়ের চারধারে মনসা-কীটায় বেড়া, পিছনে একটা ছোট বাগান;—আর ছিল বাবার বড় আদরের গরু লক্ষী। লক্ষী—সত্যিই লক্ষী,—আমার খুবই ভাবসামুদ্র, আর আমার দিকে চেয়ে তা'রও চোখ বেয়ে জল পড়ত! কাকা যখন ঘাবার সময় লক্ষীটিকে দিয়ে গেলেন, আমি তা'কে পেয়ে খুব আশোদ ফালাধি কম্বু'র,—কখনও তা'র লাফ ধরে টানতুম, কখনও বা শিং ধরে' আশোদ করতুম। লক্ষী কিন্তু তা'তে আমোদ ভাপ করত না। আর ঝাটে হাত না দিতেই জীরথারের মত চুপে চুপে দিত। তাই বেয়েই আমি এক রকম কাটিয়ে দিতেন।

* কিন্তু হায়! লক্ষীকেও আমি রাখতে পারলুম

না। পাড়ার লোকেরা আমার দুঃখে সহানুভূতি করা ঘুরে থাকত,—আমার লক্ষীটিকে নিয়ে গেল। আমি তা'কে রাখবার জন্যে কত তা'দের কাছে কাঙ্ক্ষিত মিছিত করতুম,—কম্বু'র গো, আমার আর কেউ নেই;—আমার লক্ষীটিকে নিজে না। একে দাও,—ছেড়ে দাও। তোমরা ঘর বাড়ী নাও, জিনিষ পত্র নাও, সব নাও, কিন্তু আমার লক্ষীটিকে নিয়ে না।" অবু'লোকেরা কেউই আমার কথা কণ দিলে না। হু' একজন বরং আমাকে বমক দিয়ে বলে "চুপ, কম্বু'র হোঁড়া, তোরা কাকা আমাদের কাছে বেনা করেছিল, তা'র শোধ করব কে?" আমি অনেক চেষ্টা করতুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। লক্ষীকে তা'রা কেড়ে নিয়ে গেল। আমার বড় আদরের লক্ষী ও—এ বাড়ী ছেড়ে এক পা'ও যাবে না স্থির করে চেয়ে বঁধী দিয়েছিল; কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। তা'রা ছোর করে নিয়ে গেল। আমি সে' বিদার দুঃখ দেখতে পারলুম না। ঘরের ভিতরে শুয়ে কুণ্ডিরে কুণ্ডিরে কীদতে লাগলাম।

এই রকম করে কতকণ যে আমার সময় গেছেল আমি বুঝতে পারি নি। তখন করে ঘরে শ'ধের জলিতে গ্রামবান্না মুখরিত হচ্ছিল, এমন সময় কা'র বেন গলার ঘর শুনতে পেলুম। বাবা ভুলে দেখলুম—একটি ছোট্ট মেয়ে; তা'র কালো কালো চোখ আমার দিকে পড়ে রয়েছে। চোখের পাতা ওলা তিনে দাওয়ার তা'কে আমি' ভাল রকম দেখতে পেলুম না। সে আমার দিকে খানিকটা তাকিয়ে বলে, "দাদা ওঠ।" বরটা বেন চেনা—হেনা, তবু ভাল করে ধরতে পারলুম না। মেয়েটি আমার

বল্লে "ওঠ, দাড়া, সন্ধ্যা হ'ল। একটু দিষ্ট নু ক'র।"

হ্যা, এইবার আমি তা'কে চিনতে পেরেছি। সে যে আমার পাড়াই যেবে—বিশুবা'র ধোন। আহা বেচারির মা নাই;—তাই ও নিরুদ্দেশ। বাতুয়ারা বালিকার আছে, "ওভাকাজিলী" সং মা; বাপ তার কথায় উঠেন বলেন। করণা কেমন করে' এখানে এল ?

আমার একটু রাগ হয়েছিল, বল্ল, "তোমার বাবা আমার লক্ষ্যকে কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন, আমি উঠবও না, দিষ্ট খাবও না। করণার বাবা ট্রাট হু'খানি অভিযানে গুরে কৈপে উঠল। আমার দিকে, সমস্ত চোখ চেয়ে বসন সে বল্লে, "খাও দাড়া, ওঠ,—আমিই যে তোমার লক্ষ্য, তখন আমার মনে যে কি এক মধুর ভাবের উদয় হয়েছিল তা' আমি ভাবায় বলতে পারব না। আমি উঠে বসলাম। চোখে মুখে জগ দিয়ে বল্ল, "ভাঙ, থেকে তুমি আমার কাছে করণা লুও,—লক্ষ্য—বাও তোমার দিষ্টখানি। করণা যে খুবই খুশী হয়েছিল, তা, তার লাল মুখ খান্না ঘেঁষে বেশ বুঝা গেল। করণা বল্লে "দাড়া, শুধু হুটো দিষ্ট খেলে ত পেট ভরবে না। আমি বাড়ী থেকে খাবার এনে দিই।" আমি বল্ল "তুমি কোথা হ'তে খাবার দেবে, করণা? থাক, আজ আর কিছু খাব না।" করণা ফিক করে হেসে কল্লে, "হ্যা, হুটো মুড়কী বাতাসা খেলে খুবই পেট ভরে! তুমি একটু বস, আমি এই এলুম ব'লে।" আমি তা'কে বাধা দিইবো বল্ল, "না না, আমার পেট ভরে' গেছে;—তোমাকে আর গম্বীপণা কর্তৃত হব না। যখন দরকার হবে, করো।" কথাটা বোধ হয় তা'র কানে ভাল রকম পৌঁছেনি, সে কল্লে, "তোমাকে যেতেই হবে, দাড়া। যদি না খাও তা' আমার..." বাধা দিইবো আমি জন্ম, "আজ্ঞা, আজ্ঞা, বাব। আজ থেকে তোমার কিন্তু লক্ষ্যী বন্দ, করণা বন্দ না।" কথাটা শুনে তা'র

মুখে হাসির রেখা হুটে উঠল। ছোট হাতের আঙ্গুলগুলি নেন্দে বল্লে, "বেশ, তুমি বা' খুশী তা' বলো, কিন্তু একটা কথা,—আমার তুমি কখনও 'তুমি' বলতে পারবে না;—'তুই' কলো।" আমি হেসে বল্ল, "বেশ, বেশ, তাই কল্। তুমি—না, না, তুই—কাল তা' হ'লে এস—যা, আমার কুলে বল্ল—আসি কখন?" হুইমীর হাসি হেসে বল্লে, "এসব বৈকি দাড়া, কিন্তু আজকের মত যা' বল্ল তা' মানবে কি'না বস ?" আমি গভীর ভাবে বল্ল, "কারণে কাজেই;—কি আর করি বল ? তার সঙ্গে পেরে ওঠা আমার মত লোকের কর্তব্য।"

"আজ্ঞা চল্ল এখন" বলে' সে হঠাৎ সোফায় যে চলে গেল, আমি আর বেষ্টেতে পেলুম না।

লক্ষ্যী এমন দাড়া রেজু আসে, আর আমার খাওয়া দাওয়ায় খুবই সাহায্য করে। সে তা'র বাপ মার অজ্ঞাতে যে আসল এটা আমি বেশ বুঝতে পারতাম। আট বছরের মেয়ে কেমন করে সে ভাতের হাঁড়ী নিয়ে নাড়াচাড়া করে, এটা আমি ভেবেও ঠিক করতে পারি নি, বাপান থেকে আপু, বেণ্ড, শাকসব্জী রোজই সে আমার জন্য আনত। কিন্তু এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে চলাও আর বেশদিন চলল না। একদিন তা'র সংসার নরয়ে পড়ে' গেল। তার'পর যে তা'র কি হ'ল সে'কথা আমি এখানে বলব না। আমি বল্ল, "লক্ষ্যী! তুমি কেন তোমার সংসার'র কাছে থাকবে? আমার কাছে থাক, তা' হ'লে তোমার কোনও কষ্ট হবে না।" বোধ হয় তখন তা'র মনে মাতৃহৃতি রূপে উঠেছিল। কাল চোখ দুটিতে কোথেকে জ্বল জ্বল এসে তা'র চাহনি ঝাপসা করে দিয়ে গেল। চোখ দুটি কালভের আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে লক্ষ্যী কল্লে, "জা' হ'লে খাবার কি হবে, দাড়া?" হায় রে সরদা মেয়ে! এমন তোর পিতৃগতি! আমার কষ্ট রোধ হবে এসেছিল; কেনি কথা কহিতে পার্লুম না!

যা'র হ'লগা'ই কেমন করে' কেটে গেল বৃত্তে
পারলুম না। লক্ষী আর আমা'র বাড়ীতে আসে
না। হ'ত' তা'র বাপমা তা'কে আসতে বাধ
করেছে, না হয় তা'র অস্থির করেছে। মনটা বড়ই
অস্থির হয়ে উঠল। কিছুই ভাল লাগত না;—
যেহে মেয়ে চুপ করে হয় শুয়ে থাকতুম; না হয় আম-
পাছটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতুম। সেদিন
ভোর বেলা হা'র দরজা খুলে সব বাহিরে পা দেব,
এমন সময় সে'র লক্ষী হাঁড়িয়ে। আমি অ'বাক হয়ে
গেলুম; জ্বু,—"কেমন করে এখানে এ'লি, লক্ষী?
তো'র কি হয়েছিল যে আসি' নি?" লক্ষী আবার
আগেকার মত ঠঠমীর হাসি হেসে বলে, "কান্দতে
নিবেধ;—তাই আসি' নি। আজ একটা মিছে ছল
করে' তবে তোমার ঘো'রে পা বাড়াতে পেরেছি,
মা'।" আমি একটু পরীর অ'ধ: তাগত ভাবে
জ্বু, "কান্দটা কি ভাল হ'ল, লক্ষী? সকাল বেলা
উঠেই একটা মিছে কথা।" লক্ষী তা'র বাড়ি'র
অস্থির ভাবে' বলে, "তা' হ'লে তুমি আমা'র ভাল-
বাস না, কেননা? আমি যে তোমার না দেখে
থাকতে পারি না, মা'।" আবার সেই মধুর হিহ
চোখ দুটি আমা'র দিকে পড়ল। জানেন আমা'র
পরীর কাঁ'ছিল হঠাৎ ভাবের আবেগে তা'কে
বুকের ভিতর হাঁড়িয়ে নিয়ে জ্বু, "বেশ করেছিলি যিদি
আমার, তুই একবার কেন, একশ'বার আসবি।
এ বাড়ীও যে তো'র।" কথাটা শুনে কিন্তু তার
রাঙা মুখখানি লক্ষা'র আরও রাঙা হয়ে উঠল।
লাক-মাখান দুখের আঁত'র ভোরের আলো পড়ে'
একটা দিবা ছবি কে'তে হয়েছিল। আমি তাই
বেশতে লাগলুম—অন্যকণের মধ্যে সে, লক্ষা'রুণী,
—আমার কল থেকে ছুটে পা'লিয়ে গেল।

তা'র পর অনেক বছর কেটে গেছে। আমিও
এ'ম ফ্লেডে ঘুরে চলে গেছি। বাবার সময় লক্ষীকে
সেখ'বার কোনও ছবি'র পাই নি। যেনে তখন

হুজি'র তাওবলীলা লুক হয়েছে। নোকে'র
কট্টের সীমে নেই। আমিও অস্তিত্ব কে'লানবৎকণের
একজন হয়ে পড়লুম। কান্দ'র অস্ত নেই;—সবাই
প্রাণ দিয়ে যা'টছে। একদিন কান্দে বাত আছি,
এমন সময় আমা'র দলের বেতা আমাকে ডেকে
করেন। "তোমার নামে একটা লক্ষী তার এসেছে,
তোমার বেশে ফি'তে হবে।" আমা'র তখন
টেগিগ্রাম পড়বার সময় ছিল না; বরম, "কি কথা
লেখা আছে?" তিনি করেন, "তোমার কে বীহুবা'
বেশে ফিরেছেন,—তিনি নিখ'ছেন 'বাড়ীতে অস্থির,
শুই এসে।" মনটা আবার ঘর পানে ছুটে গেল;—
অস্থিরের কথাটা শুনে প্রাণও কেঁপে উঠল। কা'র
অস্থির? লক্ষীর কি? তাহ'তে তাহ'তে ঠেপনে
এসে গাড়ালুম। কান্দ ছাড়তে আবার ইচ্ছে হ'ল
না, কিন্তু কান্দে যে মন ক'বে না, এ'ও খুবই জানি'তুম।
গাড়ী এসে পড়ল।

সমস্ত পথ কি রকম ভাবে চলে গেল তা' অস্ত-
র্যামীই জানেন! ছোট গ্রামের ছোট ঠেপনে গাড়ী
ধামতে চট' করে নেমে দৌড়তে লাগলুম। পথের
সোকে বোধ হয় আমাকে পাগল, কলেই ধরে নিয়ে
ছিল। আমা'র হ'লশে, আমা'র প্রিয় অস্তত্বমিতে
আসিয়া সেই গ্রাম বা'নিতে পৌঁছিতে বেশীকণ লাগল
না। তবে কা'র অস্থির?—ও। লক্ষীর বোধ হয়!
আবার তা'দের বাড়ীর দিকে ছুটলুম! কিন্তু একি!
বীহুবা মা'র হাত দিয়ে বলে কেন? হাঁপাতে
হাঁপাতে গিয়ে জ্বু, "বীহুবা—বীহুবা—এই যে
আমি,—আমি এসেছি। কি হয়েছে বস?" বীহুবা
মুখ তুলে' আমা'র দিকে চাহিলেন, কোনও কথা না
ক'লে' ব'রং ভিতর খেতে ইঙ্গিত করেন। আমি
ছুটে ভিতর গেলুম, ব'রং গিয়ে দেখি,—আমার লেই
লক্ষী যিদি নতুন বেশে নতুন রাঙা চলে গেছে।
তখনও তা'র দুখের সেই হাসি, সেই রক্তিমাত,
অবিকৃতভাবে ছুটে রয়েছে। চোখের জল কে'তে
পড়ে রইল তার বীহুবা, আর এই হস্তাগাণ।

ক্ষুদ্র

(ঐগিরিলাক্‌স্মার বন্ধ)

বাক্য হবে চিরদিনই লক্ষ্য কি এই বাঙ্গালীর
উপোদ ক'রে ক্ষুদ্র-বন্ধু রইবে প্রগড়-কাঙালীর ;
নরাজ প্রাণের মাহুয় কখন ? বরাজ হেথায় ক'হবে কে
প্রেমের তরে ছাড়বে সব, হেলায় কল ম'হবে কে ?

যন্ত্রের তার চ'লেবে জীবন ? অন্তরে যার তৃপ্তি নেই ;
শুকিয়ে গেছে বুকের সুখ ঢেকে বাহার দীপ্তি নেই ;
দশদী বাহার বেড়ী-পরা, ধর্ম বাহার মর্মহীন ;
কর্ত্ত বাহার দস্ত-স্তরা, নিত্য বাহার কর্ত্ত জীবন ।

তুচ্ছ তা'দের উচ্চ আসন প্রেমটা তা'দের লক্ষ্য নয়
চা'রনা কো কেউ হোক পে তা'দের দিনে দিনেই পক্ষ কর' ;
আমি তা'দের ক্ষুদ্র বলি, রাজা কিবা বাদুলা হন
পড়ুন তাঁরা গীতা কিবা পড়ুন তাঁরা বাৎসাগ্যন ।

চিত্ত বাহার রসে কোমল, বিস্তে যেমন লুভ নয়,
আত্মজনের অপমানে, আত্মা বাহার ক্ষুদ্র হয়
তেমন মাহুয় ঐতরী কর', দশটা যদি হয় তো বাসু
শুচি-বা'য়ের পাথর ঠেলে, বা'স গো তোরা ভালোবাসু ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

(উপন্যাসের আর্ট)

[ঐশ্বরিপ্রসাদ রায়, বি এল]

বাঙ্গালীর সাহিত্যগণে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ । এই দুইটি 'সাহিত্য-
স্বর্গকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অনেক গ্রন্থ উপ-
গ্রহেরা আপন আপন কক্ষে পরিত্রমণ করিতেছেন ।
তাঁহাদের অনেকেরই নিম্নব বোনও উজ্জ্বলা নাই ;
এই দুইটি সাহিত্য-স্বর্গের আলোকের তাহার। দীপ্তি-
মান । এই দুইজন সাহিত্যসম্রাট বঙ্গসাহিত্যে দুইটি

বিভিন্ন যুগেরও প্রবর্তন করিয়াছেন । হুতরাং
তাঁহাদের সাহিত্যিক আদর্শও প্রণালীর মধ্যেও
যে একটি স্বাতন্ত্র্য বর্তমান আছে, সে কথা বলাই
বাহুল্য । ইহাদের উপন্যাসের আর্টের বিশেষত্ব এবং
কি উপারে তাঁহারা তাঁহাদের 'আর্ট'কে স্ব স্ব কাব্যে
প্রকটিত করিয়াছেন তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের
আলোচ্য বিষয় ।

এখন দেখা যাউক এই 'আর্ট' কি? সাধারণতঃ 'আর্ট' বলিতে কৌশল,—শিল্পকলা কৌশল বুঝায়। এতোক শিল্পেরই উচ্চতর কেবল প্রকৃতি কে হবহ নকল করা নয়। এরূপ করার অর্থ যে প্রয়োজন আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করেন না; ইহা ছাড়া শিল্পী তাহার শিল্পে একটা নিজস্বের ছাপ যেন, বাহ্য। ঐটার ব্যক্তিব্যব উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জিনিষটাই হচ্ছে 'আর্ট'। ইহা ছাড়া শিল্পীর শিল্পবই কল্পনা করিবার উপায় নাই। উপন্যাস শিল্পের অঙ্গীভূত; স্তম্ভঃ ইহাকেও সম্পূর্ণ আর্টের উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। বনীবীরা এই আর্টকে বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায় অভিহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুশ্রুতিত W. B. Worsheld সাহেব বলেন, "Art is the presentation of the real in its mental aspect."

অর্থাৎ প্রকৃতক কল্পনার তুলিকায অভিত করিবার যে উপায় তাহাকেই 'আর্ট' বলা যায়। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত রুশ সাহিত্যিক Count Tolstoy তাহার "What is Art নামক গ্রন্থে 'আর্টের' নিম্ন লিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন,—

Art is a human activity consisting in this that one man consciously or unconsciously by means of certain external signs, hands on to others feelings he has lived through and other people are infected by those feelings and also experiences them." অর্থাৎ পাঠকের মনে ঐটার অসুস্থতির সন্ধানের যে উপায় তাহাকেই 'আর্ট' বলা যাইতে পারে। প্রকৃতির হবহ নকল লইলে এইরূপ অসুস্থতির সন্ধান নহে; তাই তাহার মধ্যে কোনও 'আর্ট' থাকে না। ইহা সবেও জানিয়া যে, 'আর্টের বাস্তবিকতা' ও 'আর্টের' অস্বাভাবিকতার কথা বলি, তাহার অর্থ এই যে যে চিত্র-কলা সহজে এবং সরল ভাবে আমাদের

মর্ম স্পর্শ করে তাহাকেই আমরা আর্টের বাস্তবিকতা বলি এবং তাহা সহজে আমাদের মর্ম স্পর্শ করিতে চাহে না, তাহাই আর্টের অস্বাভাবিকতা।

প্রতিদিন আমরা যে সহস্র সহস্র প্রাকৃতিক দৃশ্যও সাংসারিক ঘটনা দেখি এবং প্রতি নিমিত্ত আমরা যে সকল কথা বার্তা প্রবণ করি, তাহাও আমাদের মনের যে একটা স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি হয় তাহা বলিতে পারি না। তাহার কারণ আমরা বাহ্যকে প্রকৃত আর্ট বলি ইহার মধ্যে তাহার অস্তাব দৃষ্ট হয়। একজন ব্যক্তি বা পরিবারের জীবনে প্রতিদিন বাহ্য দৃষ্ট তাহার হবহ বর্ণনায় একটা উপভাস 'বা একখানি কাব্য টৈচারী' হইতে পারে না। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যেহেতু ভাবে কথাবর্তা করি, তাহার অবিবাক্য অনুকরণ ও কাব্য বা উপভাসে স্থান পাইতে পারেনা। কতকটা ছাট্টা কাট্টা, কতকটা কল্পনার রসে রম্য-ইহা চিত্রিত করিতে পারিলে, তবেই তাহা কাব্যের উপযোগী হয়।

সুতরাং কবি বা আর্টিষ্টের কাজ শুধু প্রকৃতির অনুকরণ করা নয়;—কিছু নূতন জিনিষ সৃষ্টি করা। এক কথায় বলিতে গেলে সৌন্দর্য্য ও রস সৃষ্টি করা ইহাদের কাজ। কবি বাহ্যকে Artistic interpretation of life দিয়া আপনার কাব্যে ঐতিকমির করিতে পারেন, তাহাই সহজে আমাদের মর্মকে আকর্ষিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই, যে রস ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার যে কৌশল—বাহ্যকে আমরা 'আর্ট' বলি, তাহার মূলে আছে কবির সেই কল্পনা চিত্র বা ছাড়া কবিও শিল্পের শিল্পবই কল্পনা করা যায় না।

এখন দেখা যাক কি করিয়া উপভাসে এই রসও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা যায়। উপভাসকে জীবনের অভিব্যক্তি বলা চলে; সুতরাং উপভাসের মধ্য দিয়া জীবনকে স্তম্ভাক্রমে, সমস্তও সর্বস্বাদীন বা আনন্দিক ভাবে হুটাইয়া তুলিবার যে কৌশল তাহাকেই উপভাসের 'আর্ট' বলা যাইতে পারে। কিন্তু জীবনটাত একটা সরল কিছু নয়—ইহাকে আমরা দৃষ্ট

ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে নানা বিচিত্রতা ও নানা জটিলতা রহিয়াছে। আবার এ জগির মধ্যে বেশ একটা শূন্যতা ও ছন্দ ঘেঁষিতে পাওয়া যায়। এই-রূপ একটা জটিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতে হইলে, সকলেই যে এক রকম পথ অবলম্বন করিবেন, তাহাও মনে হয় না; কারণ সকলেই যে এই জটিল জীবন-সংগ্রামের সম্বন্ধে ঠিক একরকম ভাবে ঘেঁষিবেন, এরূপ আশা করিতে পারা যায় না; অধিকন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকাশের প্রণালীও লিখন-শৈলীর গুণে পার্থক্য দৃষ্ট হইবেই হইবে। বিভিন্ন আর্টিস্টের আর্টের মধ্যে তাই তারতম্য দৃষ্ট হয়।

চিত্রকর বেদন রেখা ও রঙ্গের সাহায্যে চিত্রের মধ্যে জীবনকে ফুটিয়ে তুলে, তাদের বেদন পাথর কুঁড়িয়ে একথাও নির্দ্বিধ প্রত্যয়ে জীবন দান করে, ঔপন্যাসিকও তেমনই কথার ইন্দ্রজাল বুনিয়াদ প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ায় জীবনের অমূল্যত্ব বিবেচন ও রাখার করিনা ইংরেজী করিনা বাহ্যকে artistic interpretation of life বলেন তাহা সিদ্ধা বিচার রস ও দৌৰ্ভাগ্যের সৃষ্টি করেন। সুতরাং চিত্রকারের আর্ট, রেখা ও রঙ্গের উপযুক্ত সমাবেশে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টিতে, তাদের আর্ট পদকুহির ও কুঁড়িয়ে বিভিন্ন ভাবী বাহির করাতে, আর ঔপন্যাসিকের আর্ট কথা সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টিতে দেখা যায়। উপন্যাসে গল্পাংশ (plot) আর চরিত্র সৃষ্টিতে জীবনকে ফুটিয়ে তুলার বাধ্য।

বিভিন্ন চিত্রকরের মধ্যে যেমন রেখা ও রঙের
 প্রয়োগ প্রাণালীর অনেকটা পার্থক্য লক্ষিত হয়, বিভিন্ন
 ঔপন্যাসিক বিপ্লবের মধ্যেও তেমনই চরিত্রবল্লি ও ঘটনা-
 বিন্যাস প্রাণালীর দৃষ্টে পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই
 পার্থক্যের কারণ কতকটা দুঃস্বপ্ন ও কতকটা ঔপন্যা-
 সিকবিপ্লবের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব। জীবনের অভিজ্ঞতা ও
 উচ্চাভিলাষে দারুণ, ভাবপ্রকাশ করিবার নিখনডনী,
 দ্বাত্তাধিক কল্পনার উপরই এরূপ বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গসাহিত্যের এই দুইজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের
শিক্ষাভ্যুত্থার হিসাব নিবান কীর্তিতে হইলে,
আত্মদিককে এমন ত্যাগদানের উপায়ন ও
প্রকৃতির প্রত্যেক পুঁটিনটির বিচার করিতে হইবে।
বিবাহ-নির্ভাচন ও ঘটনা-বিবাসের ত্যাগদানের কিসকম
প্রণালী, চরিত্রকে কুটাইয়া তুলিবার ত্যাগদানের কি
রকম কৌশল, রস সজ্জার ত্যাগদানের কি কি
উপায়, জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ত্যাগদানের কি রকম
ধারণা এবং কোন বিশেষ দিক হইতে ত্যাগদান
জীবনকে পর্যালোচনা করিতেছেন তাহা আত্মদিককে
ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

উপজ্ঞানের উপাদান সংকেত আনোচনা করিতে গেলে, সর্বপ্রথমে আবায়িকার বর্ণনিকা বিষয়ের কথাই আমাদের মনে পড়ে। উপজ্ঞানের গল্পাংশকে (plot) একটা নবনরম শির-হর্ষোৎপত্তি পরিপত করিবার কৃতিত্ব অনেকটা বিবদ নির্ভাচনের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। 'শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টরা অসঙ্গ উপজ্ঞানের এই বিবদ একবারে জীবন হইতে সংগ্রহ করেন, আর বহিমস্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যদেই তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু তাঁরাও এতদূর যে জীবনের কত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন ষাভিপ্র শ্রেণীর ঘটনার উপরে যে তাঁহাদের ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের 'হর্ষেণ-নম্বিনী' 'কপালকুণ্ডলা' 'রাহস্যিঃ' 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরানী' 'কৃষ্ণকান্তের উইন' 'বনবৃক' 'এবং 'চোখের বাগি' 'নৌকাডুবি' 'গোরা' ও 'বীর বাইরে' পাঠ করিলে আমরা অতি সহজেই জবদেয় করিতে পারি। 'হর্ষেণ-নম্বিনী' হইতে 'নৌকাডুবি' 'আনন্দ-মঠ' হইতে 'গোরা' এবং 'বনবৃক' হইতে 'বীরবাহিরে'র পূর্বকা যে কেবল তাহাদের গল্পাংশের পার্থক্যই ভক্ত তাহা নয়। এই বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকের বর্ণিতব্য বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই এই বীর পুস্তকের একখানা ছাড়াই আর একখানা পাঠ করিবার সময় আমাদের বেশ মনে হয় আমরা যে শুধু একরকম

গম' ছাড়িয়া, আর একরকম গল্প পড়িতেছি তাহা নয়, আমরা একটা মনঃ' ছাড়িয়া আর একটা মনঃ প্রবেশ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের কল্পনার রাজ্য ও শিল্পকলা প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য থাকা বস্তুতঃ, একটা বিষয়ে তাঁহাদের খুবই ঐক্য আছে। সেটা হইতেছে চিত্রনের গল্পে যুগে কোন একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা—একটা মানবীয় সার্থকতা, যেটা শুধু বাহিরের তুচ্ছ এবং নিত্যপরিবর্তনশীল অবস্থার দ্বিতীয়ে আবদ্ধ নয়। তাহাদের চারখার হইতেছে মানবজীবনের স্থল ও জটিল সমতা ও কল্যাণভিত্তিক শক্তিকে লইয়া। এইখানেই আটের সার্থকতা এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বিশেষত্বও এইখানে। তাহারাই বাইরের যুগ আকারটাকে লইয়া আপনাদের 'আর্ট' স্থান না, অন্তরের দৃশ্য ভাববাহির মধ্য দিয়াই তাঁহারা আপনাদের শিল্পকলার বিকাশ দেখান। আর বাহ্যিক এই চিত্রের সামগ্র্যতা রাখিয়া আপনায় শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহাদের হাতেই আটের চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাহ্যিক' নিখুঁত শিল্পী তাঁহারা জানেন যে, এক-বারের উপভাস বা নাটকের দ্বন্দ্ব নিছক জীবন থেকে হয়। সুতরাং ভাল একখানা উপভাসের আর্ট ঠিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়। এ তবুও রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই কৃষিগ্রাহিনী ; তাই বঙ্কিমচন্দ্র যে সব পুস্তকের প্রধান অবলম্বনই বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের বৈচিত্র্য। সেখানেও তিনি নিখুঁততম মনোভূতি ও মানবীয় সমস্যার আলোচনা করিতে বিস্তৃত হন নাই। অতএব বেণী হাটেরই যে জীবন আলোচনাই উপভাসের মূল্য অবলম্বন—ঘটনার স্তর নয়। ঘটনার গুরুত্ব বৈচিত্র্য যে উপন্যাসকে সৌন্দর্য ও রমণীয়তা দান করে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু উপভাসকে সার্থক করিয়া তুলে জীবনের আলোচনা। এই নিমিত্ত সেখানে জীবনের পশ্চন

অনুভূত হয়, সেইখানেই উপন্যাসকের উপাধান পাওয়া যায়। রামসিংহ ঐকমত্যে, কতকটা, ও হেমচন্দ্রের জীবন যে পরিমাণে উপন্যাসের উপাধান ও আটের প্রণয় আছে, গোরা বিনোদিনী ও কাবুলিওয়ানার জীবন তাহা অগণ্য যে একটুও কম নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শুধু যে রাজারাজ্যকার কাণ্ডকারখানা লইয়াই উপন্যাস গড়িতে পারা যায়, আর সাধারণ ও অতি সামান্য লোকের জীবন সংগ্রামের অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও artistic interpretation দিয়া উপন্যাসের অত্যন্তকীর উপাধান করিয়া লওয়া যায় না এরূপ ধারণা ভুল। বঙ্কিমচন্দ্রও ইহা জানিতেন; তাই তিনি শুধু 'রামসিংহ' 'জর্জেশ্বরবিনী' ও 'দীপ্তারাম' লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি 'ব্রহ্ম', 'কৃষ্ণ' ও 'রজনী'র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও উচ্চ ধরোয়ানা ঘরের কথা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। 'বৌঠাফুড়ানীর হাট' ও 'রামসিংহ' বা একটু আটু আছে, সেখানেও সেগুলি এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, ভাবের বিশ্বজনীনতার সেগুলি শুধু রাজারাজ্যকার ঘরেই আবদ্ধ নয়। গোবিন্দনাথের প্রতি নক্ষত্রাচারের স্রষ্টা এবং তাহার প্রতিমানে অল্প বেহায়া প্রাপ্তি, শুধু গোবিন্দনাথের নক্ষত্রাচারেরই পর্যাবসিত নয়, বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে এরূপ ঘটনা অল্প ঘটনা থাকে। বৌঠাফুড়ানীর হাট কেবল বৌঠাফুড়ানীর নয়, বঙ্গসতী মাঝেই তাহার অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু শগুণতির ধ্বংস, দীপ্তারামের পতন, চন্দ্রনাথের বিপর, মোবারকের দ্বন্দ্ব ও হৃদয় ও ওয়ান আরেখার কার্যতার কথা গঠি করিয়া আমরা হতই আনন্দ লাভ করি না কেন আমাদের প্রাণের প্রতিধ্বনি ঠিক তেমনই তাহা সেখানে পাওয়া যায় না, যেমনটাই পাই গোবিন্দনাথের অংশগ্রহণে, ব্রহ্মের অভিমান, শশীভূষণের জীবন সংগ্রামে (যে ও সৌত্র), বিনোদিনীর প্রয়াসের সংগ্রামে, গোরা বিনোদিনীর

স্বধর্মীপুত্রত্বিত এবং সন্ধ্যার লালসা ও আভাসের পাওয়া যায়। অথচ জীবনের এই দৃষ্টান্তিকই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের উন্মাদনের উপাদান হইবার যোগ্য।

অগস্ত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক দিগের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি কিয়ৎ করিলে প্রায়ই যেখানে পাওয়া যায় যে, জীবনের বিচ্যোপাত্ত করণ দিক (tragic phase) অবলম্বন করিয়াই সেগুলি রচিত। যেমন মেজদীয়ারের Macbeth, Hamlet, Othello, Lear, Gaius এর Faust, Victor Hugo এর Les misérables, এবং Scott এর Kenilworth প্রকৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রও এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়; কারণ তাঁহার ‘দুর্গেশ নন্দিনী’, ‘সেবী চৌধুরানী’ প্রকৃতি পুত্রক কতকটা মিলনান্ত হইলেও তাঁহার অন্ত্যস্ত উপন্যাসে যেখানে তাঁহার ‘আর্ট’ চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ ‘কপাল কুণ্ডলা’ ‘চন্দ্র-সেখর’ ‘সীতারাম’ প্রকৃতি পুত্রকে বলা বিবাদের চিত্রই দৃষ্টিগোচ্য উঠিয়াছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর্ট যেখানে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই ‘চোখের আলি’ ও ‘গোরা’ প্রকৃতি পুত্রকে বলাবর একটা করণ শ্রমের অভ্যাস থাকিলেও উদাহরণকে আমরা ঠিক বিচ্যোপাত্তের (tragedy) পর্য্যায়ে কল্পিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের এই দিকটাই দেখিয়াছেন বেশী, তাই তাঁহার বেশীর ভাগ পুত্রকই বিচ্যোপাত্ত। রবিবাবু কিন্তু যে সব স্থানে করণ রসের অবতারণা করিয়াছেন, সে সব স্থানে বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্রকেও পক্ষান্তে কলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের ছন্দে ছন্দে করণরস লগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, ‘দুর্গেশ নন্দিনী’, ‘বিশ্ব কৃষ্ণ’ ও ‘কপালকুণ্ডলা’তেও ঐ রসের দ্বর্ধে পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ‘বোঠাকুরানীর হাট’ ও ‘ভাঙ্গাঘিঁটে’ যে করণ রস শুধরিয়া শুধরিয়া উঠিতেছে তাহার বৃদ্ধি কোথাও তুলনা নাই। করণ রসের ক্ষুদ্রণে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অধিকার বলিলেও বোধ হয় অত্যাতি হয় না আশ কাল পরৗন্তে এ

বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পদাধি অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু বোঠাকুরানীর হাটে ও ভাঙ্গাঘিঁটে যে একটা কোমল মাধুর্য মণ্ডিত বিবাহ আছে, ত্রিকান্তে তাহার কতকটা থাকিলেও সেবাসে তাহা পরিমলিত হয় না। সেবাসের pathos অতি মর্দন, নীরস ও ক্লম। তা ছাড়া বঙ্কিমবাবুর pathos প্রায় বিচ্যোপাত্ত দ্বর্ধেই যেখানে পাওয়া যায়, কিন্তু মিলনের মধ্যেও দ্বর্ধে pathos থাকিতে পারে, এবং বাহ্য বৈকল্য কবিতা খুব সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও অনেক স্থানে মিলনের মধ্যে অতি মর্দনশী করণ রসের অবতারণা করিয়াছেন; ‘কাদুলীওয়াল’ ‘দেব ও রোহি’ প্রকৃতি ছোট গল্প তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরৗন্তের ‘গ্রামের স্মৃতি’ প্রকৃতি গল্পগুলির মধ্যে এইরূপ মিলনের মধ্য দিয়া একটা pathos স্পষ্ট হইয়াছে। আবার রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক ছোট গল্প আছে যাহার ভিতর করণ রসের বেশ মাত্রও নাই, অথচ আটের সার্থকতা হিসাবে উহার এক এক টুকরা হীরা মত। সুতরাং আটকে পরিণতি দিবার ক্ষমতা যে কেবল জীবনের অক্ষমতা অনুভবই সার্থকতা আছে, আর হস্তান্তর সম্প্রদায় আনন্দময় দিকটাই কোনই সার্থকতা নাই, এমন কথা বলা যায় না। আটকে ছুটাইয়া তুলিবার উপলব্ধি ও প্রণালী ভেদেই এরূপ প্রচ্যোপাত্তের পার্থক্য হয়। মূল মানবের জীবন-সংগ্রাম—তাহার সুখ ও দুঃখ এই দুইটাকে উপলব্ধি করিয়াই উপন্যাসের আর্ট বিকশিত হইতে পারে।

ঔপন্যাসিক আশনার কাব্যে জীবনের যে অংশটা কলাকৌশলে ছুটাইয়া তুলিতে চান, সেটার সঙ্গে তাঁহার পুণ্ডল রচন পরিচয় থাকে। দ্ব্যবস্তক, তিনি তাঁহার অনন্তসাধারণ কল্পনার বাগাই হউক, আর বাঁকিগত অতিশ্রুতা বাগাই হউক, তাহাকে ছুটাইয়া তুলুন তাহাতে আসিয়া যায় না। উপন্যাস, উপ-ন্যাসই, ইহার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্বন্ধ নাই একথা মনে করিয়া বাহারা কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর

করিয়া উপভোগ গিৰিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাখিদের উপন্যাস তখনই প্রেতাই লাভ করিতে পারে না। বিভিন্নরূপ ও রসিকতার উচ্চতাই এই সত্যের অঙ্গাঙ্গী কোথাও করেন নাই। অসংখ্য ঘোঁষানে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা করিতে হইতে, সেখানে ইতিহাসের সত্য ও চলিত আখ্যানের উপর নির্ভর করা চাড়া আর কোনও গতি নাই। বিভিন্নরূপে অভিজ্ঞতা এত বেশী যে তাহা ভাবিলে বিমিত্র ও চমকিত হইতে হয়। 'স্নাতকসিংহ', 'হর্ষণ নন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' 'সুগানিনী', প্রভৃতি গ্রন্থে বাদশাহ নবাব ও রাজপুত রাজারাজড়ার ঘরের অতি পুঁটিনাটি কথা হইতে 'কুকুমার' 'রত্নিনী' 'বিহবল' ও 'কপালকুণ্ডলা'র বাদশাহী ঘরের নরনারীর চিত্র ও অকলুষগুণীর ও নবাক-বিচ্ছিন্ন বনপানিতা যুবতীর জন্মের অঙ্গি-পলির খবর তিনি আনাদিগকে প্রবন করিয়াছেন। জীবনের বিভিন্ন ভরের বিভিন্ন নরনারীর, বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন অবস্থার প্রথম অভিজ্ঞতার সমাবেশ বাদশাহী দেশে অপর কাব্যে প্রায় দেখাই যায় না। ইংরাজী সাহিত্যেও পূর্ব বিরল। কিন্তু সর্বোপেক্ষা বিম্বহর বিদে এই যে, সে সমস্ত চিত্র বা চরিত্র এমন কি বাহ্যাসের অসুত্রপ চিত্রেও তিনি কখন চোখে দেখেন না, যে সকল চরিত্র তিনি কেবল পুস্তকেই পাঠ করিয়াছেন। এবং যে সকল ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হইবার তাহার কোনরূপ সম্ভাবনাই ছিল না, যে সকল চরিত্র অতঃপর ঘটনাসম্মিলনে তিনি তাঁহার অসাধারণ কল্পনা শক্তির প্রভাবে—ইংরাজীতে বাহ্যকে realistic imagination বলে—কল্পনায় করিয়া সজ্জিত করিয়াছেন। এই সমস্ত রাজারাজড়ার কথা পাঠ করিতে করিতে আশ্বাসের একবারও মনে হয় না যে, তাহারা সত্য সত্যই রাজা মহেন বা আদম সচকে গুঁড়াদের কাব্য-কল্পণ ঘেঁষিতেছি না। ইহা কবির পাঁচ কয় নিয়মকতা ও কবিতার পরিচায়ক নহ। কিন্তু

বল্লে নিপুণতা সবেও প্রথম বয়সের উপর নির্ভর করার দ্বারা দোষ, ভুলের ভাবে বহিঃকল্পের লেশনীতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই লজ্জাই তাঁহার কাব্যের দু এক জায়গায় অসামঞ্জস্য ও অস্বাভাবিকতা দোষ আনিয়া পড়িয়াছে। একটা উপাধারণ দিই, তিলোত্তমা ও বিদ্যা সাহসকালে বৈশেষকের পূজা করিতে দিয়াছিলেন; কিন্তু লজ্জা সময়ে শিব পূজা করিতে যাওয়া আশ্বাসের দেশে রীতি নাই; আর থাকিলেও বাহ্যকরা যে বড় ভুলের লজ্জা হইলী সমস্ত ঘরের স্রোতাককে কেলিয়া পদাইল, অর্থাৎ পর্য্যন্ত ফিরিল না, ইহাও বেশ সম্ভব হয় নাই। সুগানিনীতে আছে "কটকে গড়িল বিধি সুগল অধমে"; কিন্তু সুগলে কটক থাকে না। রবিশ্যনাথের অভিজ্ঞতার দীর্ঘা অনেক কম সত্য, কিন্তু তাহার ফলে তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন সেগুলি সুশীল ও সঠিক হইয়াছে। সুতরাং পূর্বেক্ত অসামঞ্জস্যের দ্বার হইতে তিনি অনেকটা রক্ষা পাইয়াছেন। তিনি অধিকাংশ ঘনাই আপনাত কাব্যের উপাধার সাংগ্রহ করিয়াছেন। বাস্তব হইতে,—আপনাত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হইতে। বিভিন্নরূপে যেমন আনন্দমঠখানিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, একটা আদর্শের ভিত্তির উপর। তিনি একটা Utopian scheme বর্ণনা করিয়া বইখানি গিৰিয়াছিলেন। রসিকনাথ কিছু 'গোরা' বইখানি রচনা করিবার সময় ঠিক তাহার বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। গোরা কেবলমাত্র একটা Utopian scheme এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় যে সমাজটা, শুধু কবির মনে নয়, সমস্ত দেশবাসীর মনে ছাপিয়া উঠিয়াছিল, বশেষ সমাজ ও বর্ষব্যক্কে একটা পরিপূর্ণ তাবের দ্বারা আবৃত্তব করিয়া, তাহাদের বিপরীত দিকগুণা না দেখিয়া আপনাত অণ্ড তাবের দ্বারা ঐ গুণাকে সহ ও বিরাট করিয়া দেখিবার যে প্রয়াস—তাঁহাখিগকে প্রাণপণ অঁকড়াইয়া বহিয়া

খানকার যে একটা প্রথম ইচ্ছা—সমস্ত দেশবাসীর
মনজুড়িয়া আকর্ষিত হইতে ছিল তাহার Artisti
interpretation শিবার জন্যই গোয়ার উৎপত্তি।
গোয়াতে রবীন্দ্রনাথ তখনকার একটা অস্বাভাবিক
জীব দেখিতে পাই। আশ্চর্য্য ভিত্তির উপর
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ‘আনন্দমঠের’ বাপারট। গোয়ার
চেহেরা, আরও অধিক বিরাট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে
কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু গোয়াতে জীবের সঙ্গে
বাঙালির যে বিভিন্ন সম্মিলন ঘটিতে পাওয়া যায়,
সেইইকুর কারিকার্য্যে। রবীন্দ্রনাথ যে বহু শিল্প-
কৃতির পরিচয় দিরাছেন তাহাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

এইবার সমাজের রচনা কৌশল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। বহুমন্ডল যেমন তাঁহার উপজাতির বিষয় নির্ধারণে খণ্ডে কৃত্রিমের পরিচয় দিরাছেন, তেমনি তাঁহার প্রত্যেক গড়িয়া তুলিতেও নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইরাছেন। যোগ্য প্রকারে উপর বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে নানাধর্ম নাটকীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সম্বন্ধে মনে সংঘ-উৎপাদন এবং আশ্রয় ভাগের পরিণামাধি করিতে গিয়া ধীরে ধীরে আবার নাটকের মত পট-প্রবর্তন করা হ'লে লিখনশৈলীর বিশেষত্ব ছিল। বহুমন্ডলও সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ আনন্দবঠের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার উপজন্মদায়ক ঘটনা প্রায়তেই এক রক্তা-ভালের সহিত করিবার পাঠকের কৌতুহল উত্তেজিত করিয়াছেন। তাহার পর কল্যাণীর দ্বারা বর্জ্য আক্রমণ ও তাহার পলায়ন সময়ে অন্তরীক্ষে গান, স্তম্ভকেশ স্তম্ভবেশ, ঝড়ি স্তম্ভের আবির্ভাব, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দের বন্ধন ও তাঁহাদের আশ্চর্যভাবে মুক্তি, কল্যাণীর মৃত্যু, শান্তির পুরুষের ছদ্মবেশে সত্যানন্দের সহিত কথোপকথন ও কল্যাণীর জীবন প্রাপ্তি প্রকৃতি ব্যাধির জীবন বিষয়ক, রহস্যময় ও সুন্দর; অথচ এগুলি অস্বাভাবিকও নহে। রবীন্দ্রনাথ কিছু তাঁহার উপজাতি হ'লেই চরিত্রের প্রয়োজনীয়তার উপর আর্দ্র লক্ষ্য

রাখেন নাই। প্রত্যেক ঘোরান করিয়া তুলিবার তিনি আপোঁ চেঁটা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের উপ-
 জ্ঞাপে বিরোধ বা মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যাই প্রতিপাত্ত।
 বরিনচন্দ্র চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ঘটনার জালে পর-
 টাকে গুগাইয়া গুগাইয়া বেশ করিয়া ভটাইয়া তুলিবার
 চক্ক এং সেং ধনা তাঁহার সৃষ্টি চরিত্রগুলি 'ও
 তৈগারী' করিয়াছেন তাহার উপস্থানী করিয়া। কিছু
 রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে সাধারণ স্টেট টুকু আছে,
 সেটা কেবল তাহার সৃষ্টি চরিত্রগুলিকে কুটাইয়া
 তুলিবার জন্য, তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে লব্ধ বৃত্তা-
 ইবার জন্য। এখানে চরিত্রগুলিই হচ্ছে মুখ্য—প্রটো
 গোন। উপাহরণ স্বরূপ 'গোরা' ও 'বারে বাইরে'
 বই দুইখানার উদেখ করা বাইতে পারে। 'গোরাতে'
 গোরায়ে লইয়াই ঘটনা সমুৎ বিকাশ লাভ করিয়াছে,
 আর বারে বাইরেতে লক্ষ্মীণ ও বিদ্যাতে আশ্রয়
 করিয়াই সমস্ত বইখানা স্টুতর হইয়া উঠিয়াছে।
 'গোরা' ও 'বারে বাইরে'র পরাংশ অতি সামান্য,
 যেহিঁ আছে তাহারও বিশেষ কোন একা
 দেখা যায় না—বাইরের ঘটনার ব্যত-প্রতিপাত্ত
 নাই বলিলেও চলে। তথাপি এই পুস্তক দুইখানি
 পাঠ করিতে 'রাগসিংহ' 'দ্বৈর্গম্যনন্দিনী' অথবা
 'মোঁ দৌপুয়াণি' অপেক্ষা কোনও অংশে কম উৎস্রুকা
 পাঠ্যকর বনন জাগে না। মানব জন্মের বেদবান
 ব্যত-প্রতিপাত্ত, কিংবা কল্পনাও অসুহৃতিত ক্রমবিকাশ
 ও ঘটন মনস্তত্ত্বের স্বাভাব্যোদ্যাতন পাঠ্যকর স্বরূপে
 প্রতি বৃহত্তর সংসার ও বিদ্যা (Moments of suspens.)
 উৎপন্ন করে; বাহিরের ঘটনাগুলির বিচিত্র
 ও অভিনব সমাবেশে তাহা তত্তী করিতে পারে না।
 অবশ্য ঐকমত্যে 'কুকব্যারের উইল' ও 'লম্বীয়ে'
 'Psychological element' বা মনোবিশ্লেষণ
 সমস্ত চরিত্র বিরোধ যথৌই আছে; তথাপি এই সকল
 স্থানে স্টেটর উৎকর্ষ (In crest), আছে; human
 Interestকে, চরিত্রের ভাববিরোধের উৎকর্ষকে.
 অতিক্রম করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপজ্ঞাপে

কিন্তু সকল ক্ষুদ্রই মানবের অস্থূতিক (Human interestকে) কেন্দ্র করিয়া গুট প্যগড়ির মত বিকশিত হইয়াছে। বাস্তবতার সাহিত্যক্ষেত্রে মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসিতে তিনিই প্রথম পিছাইয়াছেন। সমাজের অতি নিরন্তরে তাহাদের স্থান, বাধাসমূহ লোক চক্ষুতে ও সমাজ চক্ষুতে রেখ, গণিত, ও অবজ্ঞাত ছিল সাহিত্যে স্থানলাভ করিবার অধিকার তাঁহার কাছ হইতেই তাঁহারা প্রথম পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে তাঁহার ছোট গল্পে তাহাদিগকে নাকচ নাহিকা করিয়া বসায় পাঠকদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায়, ‘খোকাবাব’ গল্পে স্ত্রী রাইচরণ, ‘কাবুলিওয়ালার’ গল্পে কাবুলিওয়ালার এক ‘অতিথি’ গল্পে বাজার দলের ছোকরা। এরূপ আরও শত শত উদাহরণ দেওয়া হইতে পারে। আর আমাদের বোধ হয় এই মন্তব্যই তাঁহার কাব্যে plot interest, human interest কে চাপা দিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার আর একটা কারণও থাকিতে পারে; বিভিন্নস্তরের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের গল্প বলিবার ক্ষমতা কিছু কম ছিল বোধ হয়।

Scot সাহিত্যে Dumas ভায় বেশ রসান করিয়া গিয়া বসিতে বিভিন্নস্তর বিশেষ পটু। রবীন্দ্রনাথের বড় উপভাসে কিন্তু এই ক্ষমতার তত পরিচয় পাওয়া যায় না। Georg. Elot, Balzac অথবা Tolstoy এর মত যদিও তাঁহার উপভাসে চানাবুনীর ভাব তত দেখা যায় না বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে যে তাঁহার গতি প্রতিহত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ‘রাব্বি’ উপভাসখানি তিনি যেমন সুকীর্ত্তভাবে আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক তেমনিভাবে শেষ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু তাহার ছোট গল্পগুলিতে এরূপ ত্রুটি আরো ঘোঁরেতে পাওয়া যায় না। ‘দেব ও রোহ’, ‘সুখিত

পাখান’ ‘মধ্যবর্তিনী’ প্রকৃতি গল্পগুলি ছোট হইলেও স্বচ্ছ বাস্তবিক, তত্ত্বসে। বর্ণনাত্মক গুণেও সন্মোহিত তাহাদের human interest এর ক্ষেত্রে গল্পগুলির ছোট ছোট রস জমিয়া উঠিয়াছে। এইখানে গল্পের সঞ্চকে আর একটা কথাও বলা দরকার। বিভিন্নস্তরের অধিকাংশ গল্পই জটিল ইংরাজীতে তাহাকে compound plot বলা যায়। অর্থাৎ একাধিক গল্প এমনভাবে গাঞ্জিত যে তাহাদের সমগ্র একটা জটিল গল্পরূপে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্নস্তর অথবা plot এর interest কে গল্প ও রচনাময় করিয়া তুলিবার ক্ষমতা এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যেমন আনন্দ মন্ডের প্রধান গল্পের অন্তর্গত আরও দুইটা। গল্প আছে; একটা ‘মহেন্দ্র কল্যাণীর’ গল্প, আর একটা ‘দীপক শাস্ত্রীর’ গল্প ‘সুপারিশনী’ দুইটা প্রধান গল্প আছে; একটা ‘হেমচন্দ্র’ ‘সুপারিশনী’ গল্প আর একটা ‘পত-পতি’ ‘মানবদায়’ গল্প; ‘রজনীতে দুইটা গল্প আছে, একটা ‘রজনী শতাব্দীর’ আর, একটা ‘অমর, লবন-লতার গল্প, ‘লেন্সেনের’ দুইটা গল্প আছে, একটা ‘প্রাণ’ ‘শৈবিনী’, গল্প আর একটা ‘হলদী বেগমের’ গল্প, ‘রাঙ্গলিং’ দুইটা গল্প আছে; একটা চকলকুমারী রাসলিংয়ের গল্প, আর একটা ‘মোবরক দরিয়া’ বিবিগ গল্প। রবীন্দ্রনাথের উপভাসে কিন্তু এরূপ গল্পের double interest খুব কমই আছে, তাহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে plot interest এর দিকে রবীন্দ্রনাথ খোঁচেই খোঁচা খেন নাই। ‘গোরা উপভাসে অল্প এই রকমের একটা double interest সূত্র করিবার প্রয়াস দেখা যায়; কিন্তু বিভিন্নস্তরের যে সকল গল্পের কথা উল্লেখ করা গেল, সেগুলিকে যেমন বেশ বিবরণ করিয়া দেখা যায় ‘গোরা সূত্রিকার’ ‘বিনয়-লগিতার’ গল্পকে ঠিক তেমনিভাবে দেখা অসম্ভব। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

সমালোচনা

শ্রীমতঃ চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐক্যবন্ধন
নৃণোপাধায় প্রবৃত্ত। পত্রসংখ্যা ২৮২। কাশড়ে
বাঁধা, মূল্য ১৫০

আলোচ্য উপজ্ঞানপাঠ্য পাঠ করিয়া আমরা
অতিশয় আশ্চর্য লাভ করিয়াছি। প্রবীণ সাহিত্য-
কের উপজ্ঞান রচনাও ইহা প্রথম চেষ্টা হইলেও,
ইহাতে তিনি যে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা
অসম্বোধে বলিতে পারা যায়। ইহা প্রাণ দেহতত
বৎসর পূর্বে বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের অবসান
কালের একটী চিত্র—চরিত্র চিত্র। সূত্রিকঃলেখক
লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা সাহিত্যিক ঐক্যবন্ধনকুমার রায় মণি-
শয়ের কথায় বলি,—‘প্রবন্ধকার মহাশয় সেই সময়ের
একজন নিষ্ঠাবান্ ভগবত্বক, পথোপকর্তা, নিঃস্বার্থ-
পর, তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরিত্র এই প্রঃ
অঙ্কিত করিয়াছেন। স্ত্রায়রের চরিত্র আদর্শ
চরিত্র।’ • • ‘ভীহার ভাগ্য, ভীহার ধর্মনিষ্ঠা
ভগবত্বক, সত্যাত্মক, ভীহার মনঃ ও অশুর
ভেদবিভার পক্ষি কাহিনী আশাধিক বৃদ্ধ করি-
রাছে, ভীহার শোচনীয় নিহতির কথা ভবিষ্য

পুস্তকপাঠ্য পাঠ্য করিতে করিতে আশাধিক ৫
পুনঃপুনঃ অস্ত্রভারাক্রান্ত হইরাছে; এক কতবার
মনে হইরাছে,—এই যোগকর্তার, জীর্ণবেশ, দুর্জল,
দারিত্র্য ব্রাহ্মণের দ্বয়ে যে শক্তি, যে তেজ, যে
বিরাট বহুবাহু ভীহার জীর্ণবস্ত্র সেব বিন পর্যন্ত
অশুর সহিয়ার বিরাজিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র
বাহু আশাধিক এই বিশাল সমান-বেহে আজ বর্তমান
ধাক্তিত, তাহা হইলে শিকা ও সজাতার প্রচণ্ড
প্রভাবের আশাধিক সমাজের যেকোনও এত শিখিল
হইত না।’ এই বিবরণের জায় উন্নতমতক
সহনশীল ভগবানের কাব্য-কারণ পরম্পরায়
একান্ত বিবাসী, কমান্বিল ব্রাহ্মণ-চরিত্র অরনে তিনি
দৃষ্টে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। কলাকুশলী
লেখক মহাশয় অস্ত্রভার চরিত্রগুলিও বেশ সুন্দর

ভাবে অল্পপরিমিতের মধ্যে অঙ্কিত করিয়াছেন।
ককণ রসাম্বক এই উপজ্ঞানপাঠ্য পাঠ্য করিয়া
এতদধিকই অস্ত্র সংবরণ করা যায় না। বীণে
বান্দুর কথায় সত্যই বলিতে পারা যায় লেখক
মহাশয়, ‘নবাত্মকের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা কলাবিৎ উপজ্ঞান-
লেখকগণের প্রবর্তিত কলার অঙ্গুলরণে মনঃস্বয়
মনোরম বিবরণ দ্বারা ‘আর্ট’র নামে উচ্চুৎসবতা
ও ব্যক্তিগতের হুর্রিত চিত্র, অঙ্কিত করেন
নাই’। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

সংস্কৃত—ডাক্তার এন. সি. ব্যানার্জী প্রবৃত্ত
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পুস্তক, ৩র্থ সংস্করণ। পত্র
সংখ্যা ২২৮। মূল্য ১০ টাকা। সংস্কৃত গোকে-
সের পক্ষে রোগ, পণ্ডা ও ঔষধ সবকিছু দ্বারা
কিছু জানিবার দরকার, তাহা পুস্তকখানিতে সংক্ষেপে
নিদিষ্ট আছে। বেশ বিবেচনাতার সহিত এই
পুস্তকপাঠ্য রচিত হইরাছে। প্রথমিক আদর্শ
বাঙ্গালীর দ্বয়ে দ্বয়ে গুণ-পত্রিকার জায় বেধিতে
চাই, কারণ যোটাটুট রোগ ও তাহার প্রতিবিবেশ
উপায়গুলি বেশ সোজা কথায় ইহাতে লেখা আছে।
পত্রাধ্যমে বিবেচন ডাক্তার কবিরায় পাণ্ডা বড়
সোজা মত, অস্ত্রভার: অনেকখানেই বহুব্র হইতে
তাহাবিবেশ আনিতে হয়। এই পুস্তক-বর্ণিত
ঔষধ ব্যবহার করিয়া চিকিৎসক অনিবার সমষ্টুৎসব
সম্ভাবনার করিতে পারা যাইবেই, এতদধ কলা আমরা
নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

অশিষ্টোক্তনঃ—কল্যাণী—যোগিসুন্দর-বর্ণনা
মণিযোগন নাথের জীবন-কতিনী। ভীহার পুর
গ্রামকুবা, নাথ কতকটা পিতার জীবন-চরিত্র
সফল করিয়াছেন, আর কতকটা তিনি স্বয়ং
নিখিরা দিয়াছেন। মূল্য ১০ টাকা।

যোগিসুন্দরের উন্নতিবরণে মণিযোগন দ্বারা
করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত হইরাছে। জাতি-

তব সৎকে ঐহাঙ্গী আলোচনা করিয়া পাকেন, তাঁহারা এই পুস্তকের সমালোচনার প্রকৃত অধিকারী ; আমরা এ সৎকে কোনরূপ দখলত প্রকাশ করিতে পারি না। ২৫০০ বৎসর পূর্বে যোগীশ্বরের ভিতর কেহ কেহ উপনয়ন গ্রহণ করায় সন্দেশে যে চাকলা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার কলে ততাদিগের উপর বৈষ্ণব আত্মত্বিক অভিযোগের অস্বীকৃতি হইয়াছিল, আমাদের বোধে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যথিত হইয়াছিল। সন্দেশের কলাপ কামনার ঐহাঙ্গী আত্মপ্রকাশ নিয়োজিত করেন তাঁহাদের চর্চনা সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। উপনয়ন গ্রহণের ঐহাঙ্গী অধিকারী কি না তাহাও আমরা বিচার করিতে চাহি না—বঙ্গলা সন্দেশের সকল মানবই যাহাতে আত্মস্থান লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যপদব্যাচ হয় আমরা তাহাই দেখিতে চাই।

‘জীবনী’ শব্দ জীবনচরিত অর্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। ‘জীবনী’ শব্দের অর্থ সেই নৃত্যকে বুঝায় যাহা প্রাণীকে জীবিত রাখে (Vitality)।

প্রজ্ঞাপ্রতিভার সৌন্দর্য্য ইমান্ অল্প কুমার সেন প্রদীপ্ত। শুভদাস চট্টোপাধ্যায় এক সন্ম প্রকাশিত আট মানা সংস্করণ গ্রন্থমালায় অন্ততন গ্রন্থ।

এখানি ছোট গল্পের পুস্তক। প্রথম গল্পের নাবাল্লসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। গল্পটি ছোট নয়—বেশ বড়। অত্র ১২টী গল্পের প্রত্যেক গল্পটি ছোট এক গল্পও বটে। জীবনের লেখায় সহিত যমুনার পাঠক পাঠিকারা সম্পূর্ণ পরিচিত। ১০টী গল্পের ভিতর ৯টী আমাদের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। বাকীগুলি অন্তর্য্যাময়িক পথে বাহির হইয়াছে। গল্পগুলি পাঠ করিয়া আমরা কৃত্তিমাত্বে করিয়াছি। জীবদ্দেহ সাহিত্যসংগ্রহিক আমাদের প্রদেয় অলঙ্কার বাহার পুত্র। পিতার নিকট হইতে তিনি যে অলঙ্কার উত্তরাধিকার-রূপে পাইয়াছেন তাহা যেখানি আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ভগবান্ জীবনের সাহিত্য-সাধন সংস্কৃত করেন।

ভাষ্যোক্ত পুস্তক—শুভদাস চট্টোপাধ্যায় এক সন্ম প্রকাশিত, দ্বারা দুই টাকা। পত্র সংখ্যা ২২২

চাপা, কাগজ, বঁদাই সবই সুন্দর। পুস্তকখানি বাহ্য-বাহ্যিক ভাবে আমাদের পরিচয়প্রাপ্তিই প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচনা করা শোভন নয় বলিয়া আমরা এ কার্য হইতে বিরত রহিলাম। পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য এই যে একজন পুথারিণী ও একজন পুথারী এই সাহিত্যিক ভাবের পুথারিণী পর্যায়েই যোগদান করিয়াছেন। অল্প বলিয়া না দিলে পরিবার উপায় নাই যে ইহা ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক সাধক ও সাধিকার লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে। তাঁহাদের নাম—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষাচার্য্য, শ্রীমতী বিজয়রত্ন বসুদাস, শ্রীমতী সত্যবালা বসু, শ্রীমতী বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীমতী চাকলা বসু, শ্রীমতী অমলকুমার সেন, শ্রীমতী সীতা দেবী, শ্রীমতীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, শ্রীমতীশৈলবালা চৌধুরী, শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, শ্রীমতী অমল সেন, শ্রীমতী মেহেন্দিলা বসু চৌধুরী, শ্রীমতী সৌভাগ্যেশ্বর ঘোষ, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সত্যবতী, তাঁহার শ্রীমতী নন্দেশ্বর সেন গুপ্ত। কথাসাহিত্যের পাঠকদিগের নিকট ইহারা সকলেই পরিচিত। উপন্যাসখানি সামাজিক। আলোচ্য উপন্যাসে পল্লীসমাজের যে ভাববলনক বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহার সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পল্লীবাসীদিগকে অতীত হুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে এ চিত্র বিন্দুবার অতিরিক্ত নয়।

নূতন পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহলবৃত্তি নিবারণ করিবার অত্র সংক্ষেপে উপন্যাসের সারাংশ বিবৃত করিতেছি :—

প্রাণেশ্বর বা, প্রসাদ ও তাহার স্বাকুল নির্মল গ্রামের একটি গৃহস্থ পরিবার। অসংখ্যোগ নীতি অনুসারে প্রসাদ ও নির্মল বসেন ছাড়াইয়া থিয়াছে। কলিকাতার বেজালেশ্বরক দলবৃত্ত হইয়া পিকটিং করে, মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামের বাড়ীতে আসে। পল্লীবাসীদিগের কল্যাণসাধন তাহাদের ব্রত

হইয়াছে। কমল বুধাশুক্র, পিতৃবাড়ীতে, অর্ধদানী
কমীনারের পুত্র, সেই গ্রামেরই কমীনার, সেই
গ্রামেই নিবাস। বুড়ো মহাশয় কমলের বোবন,
ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্বের হ্রাস পাইয়া নিজের নীচ
বার্ষ উদ্দেশ্যে কমলকে উদ্ধৃৎ ও বিপৎগামী
করিল এবং তাহার কাঁঠাল তাহারই বাড়ি ভাঙিয়া
নিজে তাহারই রসাধাদনের সুখ উপভোগ করিতে
লাগিল। গয়লা বৌ বুড়ী বিধবা। তাহাকে এবং
গ্রামের অনেক বুড়ী গৃহস্থ কতক কৌশলপূর্বক
কমলের নিকট তাহাদের বৈধ বিক্রয় করাইবার নিমিত্ত
সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা এই বুড়ো মহাশয় চেষ্টা করিত। গয়লা
বৌ প্রাসাদের মার অসুগৃহীতা ও অসুগত। তাহার
বুড়ো মহাশয়ের চেষ্টা বিফল করিবার প্রচেষ্টা উপলক্ষে
প্রসাধ-পরিবারের সহিত বুড়ো মহাশয়ের বিবাদ
হয়। সেই বিবাদের সময় কমল উপস্থিত ছিল।
প্রসাধের ধর্ম্মপ্রচেষ্টা, ভৈরবিনী মার চ একটি কথার
হঠাৎ বেন বাহুম্র-বলে কমলের প্রকৃতির অসুখ
পরিবর্তন ঘটিল। বুড়ো মহাশয় প্রথম উদ্দেশ্যে
বিফলপ্রবৃত্ত হইলেও তাহার পর একদিন গয়লা
বৌকে অপহরণ করিয়া কমলের এক বাগান
বাড়ীতে কয়েকদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।
নিজের মৃত্যুর এবং প্রসাধের সঙ্গমতায় সে
অকলঙ্কিত বেহে দূর হইয়া আসিল বটে, কিন্তু সে
কলঙ্কিনী হইয়াছে এই অপবাদের অঙ্কুরাতে নিজের
গৃহে আর স্থান পাইল না। প্রসাধের মা, গয়লা
বৌকে অকলঙ্কী এবং বিনা অপরাধে তাহার আত্মা-
গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত। জানিয়া গ্রামের লোকের
বিবিধ অসহনীয় বিক্রম বাক্য এবং ভীতিপ্রদর্শন সহ
করিয়াও তাহাকে তাহার নিজের গৃহে প্রতিপাল্য-
রূপে স্থান দিয়াছিলেন। কালক্রমে অসুগ্রাহক
প্রসাধ ও অসুগৃহীতা গয়লা বৌ পত্রস্বরের অসুগ্রাহী
ও অসুগ্রাহিনী হইয়া পড়িল। অসংখ্য হইলেও
প্রসাধ মালতীকে বিবাহ করিবে এতদূর ইচ্ছা মার
নিকট প্রকাশ করিয়াছিল এবং কমল ও নিখল

তাঁহার সমস্ত বিবাহ চক্র তাহাকে অসুগ্রাহ্য
পর্বাণ্ড করিয়াছিল। প্রসাধের মা কিন্তু কোনক্রমে
সম্মত হন নাই;

খটনাক্রমে প্রসাধের অস্ত্র বিবাহ হইল।
প্রথমে প্রসাধ সে বিবাহে অসিদ্ধ। প্রসাধ করিয়া-
ছিল। তাহাকে ভানশশি না অথবা ভানবাসিনী কি
না তাহার হিংসা নাই, তাহাতে বিবাহ করিলে সে
বিবাহ সুখকর হয় না ইহাই তাহার আপত্তির কারণ।
প্রসাধের ভাবী স্বতন্ত্র মহাশয় এই মুক্তি প্রদর্শন
করেন যে, বাবাভী আগে তলে নামতে হয় তারপর
মাতার শিখতে হয়। মাতার শিখতে হবে তলে
নাম্ব একগা পায়েলের কথা। আগে দুই কোটে,
পরে কল ধবে, উচাই প্রকৃতির মিল। বিবাহ কল,
ভানবাসী তাহার কল। তাহাকে বিবাহ করিবে
স্বতন্ত্রের গুণে তাহাকে ভানবাসিনীতেই হইবে। সে
ভানবাসীর চাপ করিতে হয় না, তাহাও কল। তমির
করিতে হয় না—সে সহজ। আগে ভানবাসিনী পরে
বিবাহ ইলা পাচ্ছাড়া রীতি। হুতনিন রূপের মোহ
ততদিন ভানবাসী, তাহার পরই সর্ব্ব-বিফল।
অধিকাংশ পাচ্ছাড়া বিবাহের উচাই পরিণাম।
পাচ্ছাড়া রীতি অসুগ্রাহ্য বিবাহিতা স্বী ভোগবিলাসের
ঘরী রমণী চাইতে পারে, কিন্তু ভীতনসম্মিতী চহ না,
মোহিনী চাইতে পারে, কিন্তু সহধর্ম্মিনী চহ না,
কাহিনী হইতে পারে, কিন্তু অর্ধাঙ্গিনী চহ না। এই
মর্ষণে মুক্তিতে পরাজিত হইয়া অথবা যে কারণে
হউক মার অসুখিত ও অসুখোপলব্ধে সেই স্বতন্ত্রের
কমার সহিত প্রসাধের বিবাহ হইল। ভয়ঙ্কর
মালতী হত্যা হইয়া মনের মধ্যে জলে ভুবিয়া
আত্মহত্যা করিল।

আলোচ্য উপন্যাসে প্রসাধের মাতা, ও তাহার
সমবয়স্ক বাবুল নির্মলচন্দ্রের চেষ্টার দমন কলিবার চেষ্টা
ও প্রসাধের কথ্য-মাগনের অসম্মত চেষ্টার ভূমী
প্রশংসা না করিলে প্রসাধের আত্মজা বাহ্য বলিভা
তথ্যটা বলিভাম।

সুস্থ শব্দ—সুখি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বি-এ প্রাপ্ত। মূল ভেদ টাক।। পত্র সংখ্যা ১৫৭।

ঐমান্ব ধীরেন্দ্রনাথের উপন্যাস কেহে এই প্রথম
রচনা। উপজ্ঞানে রোমান্স আনিয়া তিনি পাঠক-
দিগের কৌতুহল তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এ বিষয়ে যে সমস্ত কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা
নিঃসন্দেহে বলিতে হইবে। প্রায়ের শেষ পৰ্য্যন্ত
কৌতুহল সমান ভাবে উত্তেজিত করিয়া রাখিতে
পারিয়াছেন। আত্ম কাল কিছু বিশ্ব-সাহিত্য এ
প্রকার অনুসরণ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।
অবশ্য কোনও কোন ইংরাজী কথা-সাহিত্যিক এ প্রথা
এখনও চালাইতেছেন—কিন্তুতঃ যে গুলিতে ডিক্-
টনের কাহিনী বর্ণিত হয়, সে গুলিতে রোমান্সের
ভাব অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। চরিত্র-
কল্পন ও মানবের অসুভূতির বিকাশ সেখানেই
আধুনিক কথা-সাহিত্যের লক্ষ্য। এ বিষয়ে
তিনি অবহিত হন নাই। ঘটনার সমাবেশের
দিকে তিনি অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন। যে শিল্পিত
সমাজের চিত্র প্রকাশ্যে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও
ব্যতীক হইয়াছে। যেহেতু পুস্তকখানি কোন
ইংরাজী উপজ্ঞানের ভাষাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।
বহুতর বিষয় ও ঘটনা তাহাদের সমাজের পক্ষে
অধিকতর শোভন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।
অনেক স্থলে তাহার লেখা ইংরাজী অনুবাদ বলি-
য়াই আমাদের মনে হইয়াছে, দুইতর স্বরূপ ধরুন;
'মনের পর দিন তাহারে কিবিধ জীবন (?)
দাপন করিতে চাইতেছে'; (১৫৪) 'তার বদান্ততার
উপর দোষারোপ করাটো, (?) তাঁহার মুখে বোধ হয়
ভাল শুনার না'। (১২৪ পৃঃ) 'অমরের মনে
আগাগেঁড়া সমস্ত ঘটনা চিত্র ছাড়াচিত্রের মত
ভাসিয়া দেখে'—জুহু বেদনায় (?) নীহারের দিকে
চাহিতেই সেই অসুতপ্ত করণ বৃষ্টি (?) বেবিয়া
তাহার কণ্ঠের দ্বার গলিয়া পেল; তাহার মর্দাহত
ভ্রাসোবাসা (?) কল অপরাধ তুলিয়া গিয়া

প্রেমাল্পদের কপালে বেহে চুখন (?) দিতে ব্যাকুল
হইয়া উঠিল।" (১৫৭ পৃঃ)

শরতীন্দ্র দেবেজের চরিত্র লুপ্ত বাস্তব চিত্র।
নাটিকা নীহারের চরিত্র পাকাত্য স্ত্রীত অনুসারে
অঙ্কিত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের নামে যেরূপ আত্ম
কাল চরিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে, ইহা ঠিক সেইরূপ
না হইলেও কতকটা সেই শ্রেণীর। কোন রকমে
প্রকাশ্যে তাহার দৈনিক সত্য বলায় রাখিয়াছেন,
কিন্তু সে দেবেজের নিকট হইতে চুখন বস্তুর উপহার
পাইয়া মদ্যলস হইয়া পড়িয়াছিল। মন যে তাহার
কল্পিত হইয়াছিল, তাহা ষোড়শ সহিত বলিতে
পারা যায়, তথাপি ঐমান্ব আধুনিক সাহিত্যরসকের
পদাঙ্গুসরণ করিয়া নাটিকার দৃষ্টি দিয়া বাস্তবিক বলা-
ইয়াছেন,—'তোমার মনের মর্দালা আমি কখনও
দৃষ্টি করি নাই, আমার নারীকেই সমান আমি কখনও
হাস্যই নাই, নারী জীবনের চরম কলহ আমি কখনও
পায়ে মাখি নাই।'

তাঃ অমরনাথের চরিত্র রক্ত মাংস বিশিষ্ট
মানুষের চরিত্র হয় নাই, কতকটা আদর্শ চরিত্র
হইয়াছে।

পরিশেষে আমরা প্রকাশ্যে অনুপ্রাণিত করি,
এরূপ উপন্যাস না লিখিয়া আমাদের সাহায্যিক
বিষয় লইয়া উপজ্ঞান লিখিতে তিনি চেষ্টা করুন।
তাঁহার মত শক্তিশালী লোক যে সাধনা করিলে কৃত-
কার্য হইবেন, তাহা অসন্দেহে বলিতে পারি।
আলোচ্য উপন্যাসখানি, উপন্যাসপাঠক দিগের
ভাল লাগিবে। কিন্তু তাৎক্ষণিক আমরা যে লক্ষ্য
কথা বলিলাম, তাহা তাহার শক্তির অপব্যয় হইয়াছে
বেশিয়াই বলিলাম—এরূপ অনুবাদ বা ভাব লইয়া
উপন্যাস লিখিবার আবশ্যিকতা কি?

পুস্তক খানির ভাষা ভাল, কিন্তু কতকগুলি
শব্দের অপ প্রয়োগ ও নূতন বিশেষণ রচনা করিবার
চেষ্টা সন্দেহ বলিয়া মনে করি না। ই একটা উপ-
দ্রষ্ট দিতেছি :—আরক্ত লাগিয়া, অপেক্ষা মন (১৪

পূঃ), লাগনা অলস (২০ পূঃ), কলিকাতায়
কিরিয়া হাইয়া আবেদার জীবন ভাষিতেই
তাহার কবিত্তেছিল;— সখ চেয়ে বেনী ভর
হইতেছিল বেবেনকে। (৫০ পূঃ) 'কম্বাহীন
কোথ' ৫০ পূঃ) সেবেনের কামনা চতুর (?)
তর্ক ভণি (৬৫ পূঃ) অষ্টোদ্যাক (৭) বর
(৮০ পূঃ); সেই নিরাক (৭) ভালবাসা
(২০ পূঃ) সমস্ত ঘটনা তাহার কাছে ধূসর কমা-
চ্ছর (?) (১১০ পূঃ) প্রতিটি (?) সম
মিলিতে লাগিল। (১০৪ পূঃ) তাহার চেয়ে এমন
"সীমাহীন কোথ (?) বলিয়া উঠিল (১০২ পূঃ)

হেমচন্দ্র—ভূতীয়ত (১৮৮২—১৯০৩)

ঐক্যবোধ যোব এম এ, এফ এম এল, এক আত, ই,
এম প্রবৃত্ত। স্মৃতা হই টাকা। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক
ঐক্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সঞ্চিত।
পত্র সংখ্যা ৪১০। ইহাতে ৬২ খানি চিত্র আছে—
চিত্রগুলি কবিরের আত্মীয়, স্বজন বন্ধু ও চরিত্রের
প্রতিকৃতি।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে কবিরের জীবনের
সেব অধ্যায় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পূর্ণ
হই বণ্ডের অর্জিত বণ: যে ইহাতে অঙ্গুর আছে তাহা
সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সুবিখ্যাত
মানসী ও মর্মবাহী দায়িক পত্রিকায়া দ্বারা সাহিত্য-
ভাবে স্বজন কবিরের জীবনী আলোচিত হইয়াছিল,
তখনই আনন্দা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া ভূষি,
আনন্দ ও শিক্ষণীয় করিয়াছি—অনেক নূতন
তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। এখন পুস্তকাকারে আবার
পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। মনীষীদের চরিত্র-কথা
বহু অধিক আলোচিত হয়, ততই বেশের পক্ষে বহুল,
কারণ তাহারা ই ত তাবের অগ্রন্থত। নূতন তাবের
পরিচয় করাইয়া গিয়া অথবা নূতন আলোক
সম্পাতে পুরাতন তাব গুলিকে উজ্জ্বল করাইয়া
তাহারা জাতির নিকট বাহ্য, সখ, বাহ্য অঙ্গুর ও বাহ্য
কম্পনের আকর তাহাই ধরিয়া থাকেন। আদর্শ

স্থাপিত করিয়া জাতিক লোকের পক্ষে প্রবেশ পথে
অগ্রগণ্য হইবার জন্য তাহারা আত্মদান করিয়া
থাকেন। আমাদের জাতীয় কবি হেমচন্দ্র এইরূপ
বিশেষ হিতৈষণার এইরূপ উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত
করিয়া জাতির সন্মুখাটী বিহ করিয়া দিয়াছেন।
বাঙ্গালী স্বজন জীবনকে বহুধা বর্ণনা ধরিয়া
লইয়াছিল, তখন রঙ্গালের পক্ষ অঙ্গুরণ করিয়া
হেমচন্দ্র বহু নির্ণোবে জাতীয়-চেতনাকে উজ্জ্বল
করিবার লক্ষ্য ওকবিনী কবিতার বেশক উজ্জ্বল
করিয়াছিলেন। মনীষীদের জীবন-কথা বহুই প্রণ
ও কীর্তন করা যায়, ততই তাহাদের আদর্শকে
করাব করবার চেষ্টা গ্রহণ জাগিয়া উঠে। অঙ্গুরের
সহিত চেষ্টা করিলে সন্মুখ হইতে পারা যায়।
তাই বলিতেছিলাম এরূপ চরিত্র-কথার আলোচনা
করিলে জাতীয় সন্মুখ বৃদ্ধি হইবে।

পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার মহাশয়ের অঙ্গুরণ
ও স্বয়ং বহুল নিবর্শন বিস্তারন আছে। এরূপ
জীবন চরিত্র লিখিয়া তিনি স্বয়ং ধর্ম হইয়াছেন,
আনন্দগকেও বহু করিয়াছেন।

রঙ্গরচনাঃ হেমচন্দ্রের কবিতা 'বাকীমাত' '
'নেতার নেতার' প্রবৃত্তি কবিতার লেখিত পাণ্ডা
দিয়াছিল; কিন্তু অধুনা প্রকাশিত 'হস্তোম পাণ্ডার
গানে', 'নাকোথ' গ্রন্থগনে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া
যেবা দিয়াছে। আলোচ্য বণ্ডে প্রত্যেক কবিতা
কখন, কি অবস্থায় লিখিত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত
বিবরণ আছে।

পুস্তকের ভাষা সুন্দর। বর্ণন-স্তম্ভে চমৎকার।
লেখক মহাশয়ের নিকট আমাদের একটা অঙ্গুরণ
এই যে যেন তিনি ভবিষ্যৎ সংস্করণে লোপিত সমা-
লোচকবিশেষ দত্ত অত বেশী করিয়া উক্ত না করিয়া
যেন, কারণ অনেক স্থলেই যে সকল কথা তিনি
স্বয়ংই বলিয়াছেন, তাহারাও সেই সকল কথাই
বলিয়াছেন। পুস্তকটি সোখটা একটু বেশী হইয়াছে
বলিয়া আমাদের বিশাল। ই এক স্থলে ব্যাকরণের

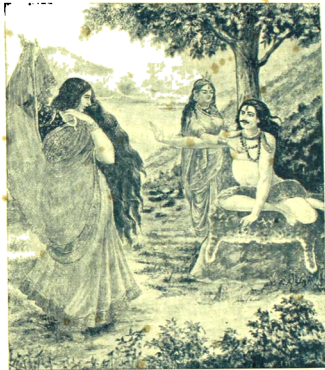
মিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন নাই।* অতঃপর এতদপি
অসামান্যতার জন্য ইচ্ছাকৃত যে নয়, তাহা
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। দ্বৈতত্ব ধারণা :—
'যদিও উহার-কল্পে রিণ্য ইচ্ছাস্বত্ব শাসনসংস্কারাদি
সাহিত্য (৭ = সাংখ্য) করিত্ব সর্ব্বই নাই।' * * *
অনেকে মনে করেন যে ইগবর্তী বিশেষ সময়ে যে
জাতি বিবেচনায় প্রস্তুত হইয়াছিল, রিণ্যের
প্রতি বেশবাসীর এইরূপ গভীর ও আত্মবিশ্বাস প্রভা
ও তত্ব না থাকিলে সেই অনন্যবাসী স্বতন্ত্র বিবৃত
হইয়া অস্তিত্বের কণ উৎপাদিত (৭) (= উৎপন্ন)
করিত।' (১১ পৃঃ) 'যে প্রোক্ষণ প্রতিভা কি পীতি-
কাব্য বসনাৎ, কি মহাকাব্য প্রণয়নে, কি রহস্য
কবিতার স্থানে, কি আধ্যাত্মিক কাব্য লেখিতে,
কাব্যরসের সমস্ত মিকেই অপূর্ণ আলোক
বিকীরিত (৭) (= বিকীরণ) করিয়াছিল' (৮৭ পৃঃ);
'এই প্রসঙ্গে স্বামী আনন্দনাথ দ্বার মহাপ্রভু কব্জিক
(৭) বদিত' (১০৩ পৃঃ) কব্জিকের আবহুত্বা বিচুই
নাই। 'নাইকেল ধন মিতাও স্বর্ণবর্ণের ন্যায়
আপনার স্বর্ণের তম্য মান্য প্রকার বিলাসিতায়
অজ্ঞান অর্প বাদিত (৭) (= ব্যা) করিতেন' (২৭৩ পৃঃ)

আর এশটা কথা বসিয়া এই আলোচনার শেষ
করিব। কথটা যে একটু অগ্রিম হইবে তাহা প্রথমই
বলিয়া রাখি। বঙ্গ-সাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান নির্ণয়
করিতে পিয়া স্থপতিত্ব প্রকার মণ্যবর্ণেণ বিচক্ষণ-
তার সহিত তুলনার সলালোচনা করিতে পারেন নাই।
রবীন্দ্রনাথের সহিত হেমচন্দ্রের তুলনা করিতে পিয়া
তিনি লিখিয়াছেন,—'বঙ্গা বাঙলা রবীন্দ্রনাথ বহু
জটিল ও জঘন্যতবে লইয়া নীতি কাব্যায়রচনা করিয়াছেন
হেমচন্দ্র ততকর্তার নাই। হেমচন্দ্র যে সঙ্কল ভাব
তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অতি সরল,
অতি সঙ্কলম। কিন্তু তিনি যে নীতিকবিতা
রচনা করিয়াছেন তাহা সংখ্যায় অল্প হইলেও,

তাঁহার দ্বারা এমন একটু বিশেষত্ব আছে যাহা
রবীন্দ্রনাথের নাই। কোন কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ
ও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।' এরূপ
কীকা কথা আবার প্রকারের নিম্নট হইতে
আলা করি না। * নীতিকবিতার বিশেষত্ব কি তাহা
তাঁহার বিশেষভাবে বর্ণনা করা উচিত ছিল।
অধ্যাপক ক্ষুদ্রনাথ সরকার মহাপ্রভুর প্রবন্ধের
উদ্ধৃতিংন হইতে তাঁহার কোনরূপ সাহায্য হয় নাই।
এই দুইজন কবির ভিতর তুলনা হইতে পারে নীতি-
কবিতা নইয়া। আর প্রকার মহাপ্রভু তাহা না করিয়া
ভাল কাব্য করেন নাই। এই প্রসঙ্গে লেখকমহাপ্রভু
আর একস্থানে একটা কীকা কথা লিখিয়াছেন,
'হেমচন্দ্র প্রধানেতঃ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রধানেতঃ সঙ্গীত-
কার ৪০১ পৃঃ। কথটা কোনরূপ বুদ্ধি বিহীন তিনি
বলেন নাই। তিনি কবির কি সংজ্ঞা মেনে তাহা
আনিষ্ঠে না পাইলেন কণাচার্য্যকল্পে বুঝিতে পারা
যায় না। কথটা নূতনও বটে; বিশ্ববরণ্য কবি
রবীন্দ্রনাথ কি কবির শাসন পাইবার উপযুক্ত
নন? পর পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের
আধুনিক দলীতে হ্রস্ব বহু বেনী আধিপত্য
বিতার করিতেছে। কেহ কেহ এইরূপ অহুযোগ
করিয়া থাকেন।' তাহারও কাহারও এই অহু-
যোগের স্মরণ নাই আছে কি না তাহা আলোচনা
করিতে চাহি না, আদ্য এই কথা বলিতে চাই, 'হানু
উন্যে শিবের সীতের' প্রোক্ষণ কি? হেমচন্দ্রের
সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিতে ইহার কোনরূপ
আবহুত্ব নাই।

এই অগ্রিম কথা কথটা বলিবার কারণ, লেখক
মহাপ্রভুকে আসন্ন অত্যন্ত প্রভা করি, তাঁহার লেখনী
হইতে কীকা কথা আদ্য প্রথিত চাহি না, তাই
তাঁহাকে অহুযোগ করিতেছি এ বিবরণে, একটু চিন্তা
করিয়া ভবিষ্যৎ সংকল্পে তাঁহার বক্তব্য বুদ্ধিসহ
যেন, কিংবা এই অংশ টুকু নূতন করিয়া দেখেন।

অম্বুশা



মোহিনী ।

Mohala Press, Cal.



১৩শ বর্ষ,

ফাল্গুন, ১৩৩০

১১শ সংখ্যা

মধু-শতাব্দী

(ঐনুল্লাহ খান)

উদিয়া আদিতা হথা উদয় অচলে
বিতারি কনক-রশ্মি নাসে অবহেলে
নিশীথের পূর্ণীভূত ঘন অন্ধকার
আলোক প্রপাত-পাতে,—অথবা যেনতি
চন্দ্রচূড় ভটাম্বাল বিচ্যুতা লাক্ষ্মী
সংস্র তরঙ্গ ভরে বঙ্গের অঙ্গনে
বিতারি অমৃত ধারা মধু কলসেরে
ধামে' হৃদা ফলে দূলে নীরে স্বীয়স্বাধ,
জ্ঞান বিদ্ধ শস্যানীর্বে হৃৎকণ্ঠে ক্রীড়াট !
তেনতি হে তুমি কবি শ্রীমধুসূদন
দীর্ঘপত বর্ষপূর্ণে কোন্ শুভক্ষণে
লভি ভগ্ন এই শ্রামা ভগ্নদের ক্রোড়ে
নবীন আলোকে তারে করেছ' আরতি
বহায়েছ' নব ধারা ভাবরস স্রোতে ।

প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে হৃদ্যা গ্রাদে যবে রাস্ত
যাক্তিও মধুসূদ্যতি হারায় অশেষ,
অথবা স্বপন জালে বেড়িলে চন্দ্রমা
মলিন নিমেষনাভ রহে যথা বিধু,
হৃদ্র সাগর পায়ে প্রবাসে তেমতি
জ্ঞানরহস্যকর সোভে—প্রতিভা ভোমার
পথপ্রায়া গুরেছিল যতীতিক। মাঝে
কেলিতে শৈবলে ভুলি কমল কানন !
তারপরে একদিন লভিয়া সন্ধান
মাতৃভাষা রূপে যদি, পূর্ণমণিমাণে !
উদ্ভাবি নূতন ছন্দ, স্বল্পি নব ভাব
গড়িলে নবীন মূর্তি ভাষা ভবনীর !
• বিদ্বক্ত নীরদ পুত্র চন্দ্রনাথ বেগতি
হাসে পুনঃ নিলাকাশে নবীন পৌরবে !

তোমার যৌবন যম জিন্যন্তব্য আজ
 শত চিন্ত মস্ত করে মর্ত্যলোকে মরি !
 তবি শুভ স্বামীকির বীণা তব করে
 সাহিল নৃতন হুরে নানিল কেমনে
 লক্ষণ হুমিরা-পুর অস্তায় সন্দের
 রক্ষঃকুল বন্দননি লেখন আশ্বতে !
 কল্পনা দুইদী তব কাব্য কুণ্ডলনে
 শুনায়েছে ব্রহ্মাঙ্গন বিরহ ক্লেশন ;
 প্রেমনিষ্ঠ লক্ষিতার অঙ্গুষ্ঠাসী কবি
 বোঝাবে' বৈতাগুর ছবিতার গানি ।
 তোমার ভাবার ভেরী তৈরব নির্ধোনে
 বোঝিবাছে বীরাঙ্গণা চরিত্র মহিমা !
 কুককুমারীর কীর্তি অবর কাহিনী
 পদ্মাবতী পদ্মগঙ্গা চিত্র অতুলন !

শতবর্ষ শত আজ—কশোভাকী তীরে
 আবির্ভূত হ'য়েছিলে তুমি মহাকবি ।
 সম্ভাবিয়া লক্ষ্যধারে কাঁচরে একদা
 অমরতা মহাবির চেয়েছিলে মান ।
 শতবর্ষ পরে আজ মুক্ত আশা তব
 দর্পহ'তে লবিলে যেথিবে কি চাষি
 সফল হয়েছে সেই প্রার্থনা তোমার,
 অর্জিরাছ অমরতা অক্ষর মনাম !
 তুমি বস্তু নয়কুলে ভোলে নাই কেহ
 যারে আজ, নিতাপুণে মনের মন্দিরে ।
 ছুটে আছ স্মৃতি জলে মানসে হে বণা
 যমুদ্র তামরল কলে চিরদিন !
 রচিরাছ নবুচ্চর গৌড়জন যাচে,
 জানন্দে করিছে পান সুখ নিরবধি !

যমুসুদন ।

(জীবিবিজাকুমার বহু)

কবির যমুসুদনের আশ্রয় পর একশ বছর কেটে
 সেল । বাঙালী সভ্যসমিতি ক'রে তার লেখ্যে উৎসব
 ক'রে ।

যমুসুদন কিন্তু বাঙলায় কি ক'রে গেছেন, তা হয়
 ত ঠিক আমরা উপলব্ধি করি নি । তিনি প্রথম
 অমিত্রাকর ছদ্ম লিখে ছিলেন, চতুর্দশদশী রচনা
 ক'রেছিলেন এ খুব বড় কথা । সব চেয়ে বড় কথা
 কিন্তু তা নয় ।

যমুসুদনের স্রেষ্ঠর তাঁর স্বপ্নন কর্তার পত্নিতে,
 তাঁর তাঁর প্রতিভায়, তাঁর শতাহুগতির অনুসরণ
 না কর্তার প্রতিজ্ঞাতে । যেনের কবিতাও স্বপ্নন
 মাদুলী, জাইনের বিকল প'রে পল্ল হ'বে উঠেছিল,
 যমুদ্রা কলন সংস্কৃত ভাষার কোটরে ব'সে নিশ্চীর্ণ,

দীন, অসহায় হ'য়েছিল, তখন এসেছিলেন যমুসুদন ।
 তিনি প্রথম ব'রেন, না, কেউ-পড়া পায়ে বাঁধনা
 ভাষা আর চলেবে না, সংস্কৃতের পাখীয়ে সে জুবে
 মরবে না, সে নিজের পায়ে তার ক'রে ধাঁড়াবে, তার
 লক্তি সে প্রচার ক'রে । তাঁর নিজের কথা
 "It is my intention to throw off the
 fettes forged for us by a servile
 admiration of everything Sanskrit."
 তা ছাড়া তিনি সমস্ত আখ্যান-কল্প ও পরিবর্তন
 করেছেন । কবি ত কল নয়, যে এক ভাবেই
 চলেবে । এই যে বিদ্রোহ, এই যে আশনার কলনাকে
 প্রদগিত ধারার নিম্নে চালিত কর্তার সাহস, এর
 গোড়া যমুসুদন । আমি স্বপ্নন করি সব চেয়ে বড়

স্ত্যাপ্য এই। তাঁর রচনা, তাঁর ভাষা, তাঁর চরিত্র
স্বর্গে এক মন্দির যে পাঠক একবারও মনে করে না যে
সে গল্প পড়ছে—না সে প্রোত্তা ভাবে গল্প শুনে।
সকলেই যেন বর্ণিত কুলে উপস্থিত হও, বর্ণিত ঘটনার
ভেতর নিজেরা কাল ক'ছে বলে মনে করে।

যেমন ছিল তাঁর অগাধ ভাব্য-সমূহের জ্ঞান,
তেমনই ছিল তাঁর অসাধারণ স্রষ্টাশক্তি। তাঁর
বাহ্য স্পর্শে যেখানেই প্রকাশিত হয়েছে, সেখানেই
কাব্য, সৌন্দর্য্য, কল্পনা অভিনব রূপে মনকে আকুল
ক'রেছে। ডাক্তার রামেন্দ্র লাল দ্বিৱ কথারই বলে-
ছিলেন, *Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape.*

জানি না কখন বাঙালী কখন আশ ও মধুসূদনের
কাব্য আলোচনা করেন। এখানে কবিতার খাতির
কত কম তা বাঙালীর মানিক পত্র পত্রিকা গুলেই
বোকা বার। অথচ চিরদিন এই কাব্যেই বাঙালী
দেশের বিশেষত্ব, প্রেতত্ত্ব। বহিঃচরিত্র মধুসূদনের
উদ্দেশ্য বলেছিলেন, “যে দেশের প্রেত কবি বশবী
হইয়া স্বীকৃত সমাপন করেন সে দেশ প্রকৃত উন্নতির
পথে ঠাকুইয়াছে।”

দেশের প্রেত কবিত্বের কিছু আমরা আশ গ্রোশা
বশ দিই না—অস্বাভাব ক'রে নয়, অজ্ঞানত, অনসু-
রাস, অনবদ্যন বশতঃ। বাঙালী কি উন্নতির পথ
খোঁজে অগণে বাচ্ছে ?

আর একজন বাঙালী ভাষায়, ভাবের, কল্পনার
সনাতন কালের প্রতি বিরোধে চরম পরিণতি লাভ
ক'রেছে, মধুসূদনের পর যিনি সমগ্র জগতে
বাঙালীর দেশকে ও ভাষাকে ধ্বং ক'রেছেন, তিনি
বলেছেন, ‘মধুসূদনের ছন্দে শুধু পরিবর্তন প্রচারিত
হয় নি, কাব্যের অজ্ঞাতরও তার প্রকাশ।’
স্বীকৃতনাথের কথা কুলে দিবার সোত সংবরণ করুন
না—করা উচিত নয়। মধুসূদনের সন্ধকে কল্পার
প্রেতত্ত্ব অধিকারী আর কে ?

“যেমনামবধ কাব্যে ছন্দোবদ্ধ ও রচনা
প্রণালীতে নব, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের
মধ্যে একটা অসুখ পরিবর্তন ঘেঁষিতে পাই। এ
পরিবর্তন আশ্চর্য্যবৃত্ত নহে। ইহার মধ্যে একটা
বিরোধ আছে। কবি পরায়ের বৈকী ভাবিয়াছেন
এক: রাম-রাবণের সন্ধকে অনেক দিন হইতে
আমাদের মনের মধ্যে যে একটা বাঁধাবিধি ভাব
চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্ণক তাহারও শাসন
ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষণের চেয়ে রাবণ-
ইন্দ্রজিত বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে বর্ণনাত্মক সর্ব্ববাই
কোন্টা কতটুকু ভাস ও কতটুকু মন, তাহা কেবলই
অতি প্ৰস্তুতাবে ওজন করিয়া চল, তাহার ভাগ,
বৈদ্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির দ্বন্দ্বকে আকর্ষণ
করিতে পারে নাই। তিনি বৃত্ত:কর্তৃ পল্লির
প্রচণ্ড নীলার মধ্যে আনন্দ বোধ করিয়াছেন।”

মধুসূদন মাহুত ছিলেন বিরাট। তাঁর প্রকৃতি
ছিল কোমল, কিন্তু আনন্দ-রসে প্রগাঢ়। স্বীকৃতের
সৌন্দর্য্যকে পুগ্গমাত্রায় ভোগ কর্তার উপযোগী
মানদ তিনি লাভ ক'রেছিলেন। সূত্র, তুচ্ছ কিছু
তাঁর কাছে ছিল না, সবই মানব মনের রসবস্তুর
তিনি পরিণত কতেন। যে রসিক নয়, সে স্বীকৃতের
দ্বন্দ্ব জটিল মধ্যেও পরমানন্দ স্পর্শে মগ্ন হইবে
হায় না সে কবিই হইতে পারে না। বিশ্বের দ্বন্দ্বের
স্পন্দন বার প্রাণকে চকল করে নি, সে মাহুত নয়।
সে স্পন্দন মধুসূদনকে কত জোরে নাড়া দিবেছিল
তা তাঁর স্বীকৃতের প্রতি কারোই দৃষ্টি উঠেছে।

কৃষ্ণকুমারী, শর্ষ্ভট্যার কথাই ধরি, “কৃষ্ণ-
শালিকের বাড়ে রৌ” প্রকৃতির কথাই ধরি, বা
তাঁর কাব্যসমূহের কথাই ধরি, তিনি যে প্রত্যেক
বিদ্যার্গেই নৃতন স্বপ্নন ক'রতে চেয়েছেন, তিনি যে
বাঁধকে বার বার অভিক্রম কর্তার ক্রমে তাঁর
প্রতিভার প্রচণ্ড শক্তিতে নিয়োজিত ক'রেছেন,
নাটকে, প্রহসনে কবিতায় তার হাস পতীর জাবে
মুগ্ধিত হয়েছে। আমরা মধুসূদনের পরে এসিছি,

যদিবাত্মের পরে এসেছি, রবীন্দ্রনাথের পরে এসেছি কথ্য প্রতিফল প্রদান ক'রতে হবে। তবেই উপলভি
ব'লে অনেক মিনিস আশ্রমের সুরম্য ব'লে মনে ক'রতে পারব তাঁদের প্রতিভার দীপ্ত কিরণে যে
হ'বে, অনেক মিনিস আমরা বিনা আশ্রমেই লাভ ভিন্নিগুণ অসম্বত হয়েছে তা কি বন, কি নিরব-
ক'রছি, অনেক মিনিস আমরা তৈরী পেয়ে উপভোগ ক্ষয় ছিল।
ক'রছি। কিন্তু যাদের প্রাথমিক কীটো বনে হুল নিজের শক্তিতে বিশ্বাস ছিল মধুসূদনের।



কস্টার মাইকেল মধুসূদনামত

কোটাতে হ'বেছিল, যাদের বড় বড় পাখর লুপ্তি
চলার পর তৈরী ক'রতে হ'বেছিল, দেশের সঙ্গে
মনের, মনের সঙ্গে মনের, বিশ্বের সঙ্গে আশ্রমের
নয়বাবের বক্ত তাহদের বাধাবিহীন, তাহদের প্রতি
ক্ষমতা, তাহদের বিরুদ্ধে স্মৃতিতর্ক কি প্রবল ছিল, এ)

শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন এই আত্মশক্তিকার। জুপি
বাঙালার অমিত্রাকর ছিল গড়তে পারবে? হাঁ,
নিশ্চয়ই পারবে। শুধু যে পারবে তা নয়।

বিরচিত মধুসূদন, সৌভাগ্য হায়ে
আনন্দে করিবে পান প্রাণ নিরবধি।

কত বড় স্পর্ধার কথা! আর নিজের প্রতি কতটা বিশ্বাস থাকিলে মানুষ এ কথা বলতে পারে। আর কত বড় সেবক সে বাবির, যার এ গর্বোক্তি সফল হয়।

অপূর্ণ ইতিহাস তাঁর জীবনের, গল্পের চেয়ে মনোরম, উপভাসের চেয়ে বিস্ময়কর। প্রতীচ্যভাবে অসুপ্রাপিত, প্রতীচ্য ভাবাসমূহে বিষত, এই কাব্যাহ-রাগী রসলোভু মানুষ বাঙালার কাব্য বা ভাবানুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন না। কোন সম্পন্নপির সংযোগে তাঁর "সোণা হ'য়ে গেল সকল ভাবনা," যে বাঙালীর হিত, পার্শ্ব, ভেলেক মগজে পল্লপল্ল কর্ত, সে যাক্‌জ্যাকে ঐক্যময়ী, শক্তিময়ী, মধুময়ী, আগের পূর্বেক চাকল্যময়ী কেমন ক'রে করলে তা হারা জানে তাদের স্বরসি, যারা না জানে তারা দুর্ভাগ।

মহামানবদের মধ্যেই মধুসূদনের প্রীতি বিনিময় ছিল—তাঁর মত মহামানবের যোগ্য মণ্ডলীর মধ্যেই তাঁর শিক্ষাগাত হয়েছিল। হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সতীর্থ ছিলেন, প্যারীচরণ সরকার, প্রমথকুমার সর্দারিকারী, কিশোরীচাঁদ বিন্ন, রাজনারায়ণ বন্দ্য, ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বদমাতার এই ব্রতধনিত মধুসূদন প্রোচ্ছল ছিলেন। মধুসূদনের সন্ধকে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "তাঁর বর্ণ কাল হইলেও তিনি সেথিতে বেশ সুকী। শরীর সতেজ, লম্বাট প্রোশত, চক্ষু চুইট বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল।"

কবি হস্তরকমে ভাষাকে জীবন্তী কর্তে পারেন, মধুসূদন তার সবগুলিই অবলম্বন ক'রেছিলেন। দুপপ্রকর্তক সকল কবিদের দ্বারাই মধুসূদন মৃত কথাকে প্রাণ দিয়ে, নৃতন কথা তৈরী করে, কথার রূপান্তর করে, কথার অর্থ পরিবর্তন করে, অপ্রচলিত কথাকে প্রচলিত করে বরষাণীকে সন্নিধানিনী ক'রেছেন। তাঁর ছবদের প্রেদের সঙ্গে তাঁর বাণী—অসুযোগ এক হ'য়ে যে মুখাসাগর স্থলন

করেছিল তার পার নেই, পরিমাণ নেই। তার আভ্যন্তরীণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, "মধুসূদন বীণা-পাদির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন", এ কথা যার পর নাই সত্য। যে প্রেমিক নয় সে কবি নয়।

আজ আমরা ভক্তিপূত চিত্রে মধুসূদনের মধুময়ী স্বতির পূজা করি। মধুসূদনের উদ্ভাবনী শক্তি, মনের শক্তি, কল্পনার শক্তি, রচনাই সেই প্রকাণ্ড শক্তির প্রকাশের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বা বলেছেন তারই উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই শক্তির চারিদিকে প্রকৃত ঐক্য; ইহার হর্ষাচ্ছাদ্যে যেরে পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রূপ-রসিক-অঙ্গে পক্ষে পুণিবী কল্পনান; ইহার স্পর্ধায়াত্রা বেবতাসিগকে অভিকৃত করিয়া বাসু-অরি-ইন্দ্রকে আপনায় দাসকে নিযুক্ত করিয়াছে; বাহা চার তাহার লনা এই শক্তি শত্রের বা অস্ত্রের বা কোন কিছু বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের শক্তি অস্ত্রভেদী ঐক্য। চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া মূল্যসং হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাখবের সহিত যুদ্ধে তাহার আগের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র আত্মীয় স্বজনরা এক একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে; তাহাদের জননীরা বিচারি দিবা কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ঙ্কর সর্বদানের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,—কবি সেই বর্ধ-বিত্রোহী মহামন্ডের পদ্মভবে স্নুপ্রতীরের দশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস তেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শাক্ত অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাক্রমে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলম্বী নিজের অঙ্গসিক্ত মালাধারি তাহারই পল্লার পরাইয়া দিল।"

ଅହାଞ୍ଜଳି ।

(ଐହେୟତ୍ତ ଯୋଗ)

* ପୂର୍ବ ମତବର୍ଷ ଆଦି, ବ୍ୟାସମୂର୍ତ୍ତିରେ,
 ବର୍ତ୍ତକ କାରବହନ କରିତେ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ—
 ଯଥାପରି ନାମସଂକୀର୍ତ୍ତ କବଚକ-ତୀରେ
 କରବାସି ଉଦ୍ଧାସିବ ବହି ପିରୋମର
 ଲଜିଲା ଜନମ କରବି-ମୁହୂର୍ତ୍ତ
 ଐହେୟତ୍ତ । ଯଦିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
 ଶ୍ରୋତାଓ ଶ୍ରୋତା ଛୁଇଁ ଶାବନବସେ,
 ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରୋତା ହିରୋମେ
 ସମସ୍ତେ ସାନିଲ ତୀରେ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୋତ ।
 ମତୀର୍ଷ ଜୁରେବ ମହ ଉଦ୍ଧତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
 ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞାନେ ଶେଷ ବୈଳା ନୟାସାନ ।
 କୁଳିଙ୍ଗ ବିଜାତି-ସେବ, ବର୍ଣ୍ଣର ଆକ୍ରୋଶ,
 ଛୁଇଁ ମହା ବିରାଟେବ କରିଲା ସିଲନ ।
 ନବସୁ ନବସାରା କରିଲା ଶ୍ରୋତା,
 ଶ୍ରୋତାମାନ ନବସାଧି ତାହାର ଶ୍ରୋତେ !
 ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୋତାମାନ ବାସିର ସନ୍ଧ୍ୟା,
 ମନ୍ଦିର ନବସାଧି ନବ ଶ୍ରୋତାମାନ ।
 ସମସ୍ତେ ନବସାଧି ନବ କୁଳିଙ୍ଗ
 କରିଲା ଶ୍ରୋତାମାନ—ନୋକ-ନୋକାଚର ।
 ବୋହାଁନା ବ୍ୟବସାୟ ଶ୍ରୋତାମାନ ନବସାଧି,

ନବସାଧିନୀ ନବୀ ଶ୍ରୋତାମାନ ତମିନୀ,
 ସହାକଳୀ ସେବନାସ, ବ୍ୟାସ ନିକୃଷ୍ଟିଲା,
 ନୋକିରି-କେଶରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନବସାଧି ।
 ମୁଖିଲା ଅନୁରୂପିତ ସାଧିନୀ ମନ୍ଦିରୀ,
 ଆସନ ଶ୍ରୋତାମାନ କରେ ଶ୍ରୋତାମାନୀ ।
 ଶ୍ରୋତାମାନ ବ୍ୟାସନା ସହୃଦ୍ୟ ଶ୍ରୋତା,
 ଶ୍ରୋତାମାନୀ ବ୍ୟାସନା ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ନିକୃଷ୍ଟି ।
 ନାଟକେବ ପରିବାରୀ କରିଲା ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ
 ଶ୍ରୋତାମାନେ ପୂର୍ବସାଧି ଅନୁରୂପ ବିଜ୍ଞାନ ।
 ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କଳାକାର ନିଜ ଆସନାର ଶ୍ରୋତା
 ଆସନୀ ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ତାହାର ।
 ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ରୋତାମାନ, କରି ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ
 ଆସନାର ଶ୍ରୋତାମାନେ କରେ ମୋକିଲା ।
 ଅତୀତ ମତାବ୍ୟ ; ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ କରେ ଆସନୀ
 ଶ୍ରୋତାମାନେ ନାମ । ଶ୍ରୋତାମାନ ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ
 ଶ୍ରୋତାମାନେ ନାମ । ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ-ଶ୍ରୋତାମାନେ,
 ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ କରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ।
 ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ନାମ କରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ।
 ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ନାମ କରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ।
 ମାଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ନାମ କରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ।

স্বপ্ন

(গল্প)

(পঙ্কজবীণা)

কৃতপঙ্কের গভীর স্বপ্নানী !

ধরষী স্বপ্না—তুমু আমার চোখে নিভা নাই।

বহিরের অন্ধকারের দ্বার আমার স্বপ্ন-গগনও অন্ধ-
কারে আচ্ছন্ন। প্রকৃতির নিস্তব্ধ স্তম্ভির দিকে চাহিয়া
অভীভূতের কত কথাই জাগিতছিল। স্বপ্নের গৃহ,
বেহমার জননী, বাণেশ্বর স্বপ্ন একে একে সব মনে
পড়িতেছিল। অকস্মাৎ হুতগত সঙ্গীত-ধ্বনি কর্ণে
প্রবেশ করায় আমার চিত্তাধরে ছিন্ন হইয়া গেল।
ক্রমে সেই মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি নিকট হইতে নিকটতর
হইতে লাগিল।—

“বাসনা ধ্বন বিপুল ভূলায়
অন্ধ করিয়া আবোধ ভূলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিষ্ট,
কল্প আলোকে এসো ॥”

* * * * *

আমি ধীরে ধীরে বাহু আন হারাইয়া ফেলিলাম।
চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম, আমার মস্তক
ক্রোড়ে লুইয়া বসিয়া আছেন—এক তরুণ—সৌম্য-
মুষ্টি ত্রুচচারী। আমি কোন কথা ম্রগ করিতে
পারিলাম না। ত্রুচচারীর পদধ্বনি প্রহরের নিমিত্ত
হস্ত প্রসারণ করিলাম; কিন্তু পারিলাম না। কলশাল
বহিয়া দুই কিছু অল্প গড়াইয়া পড়িল।

তিনি সজ্জ্ব কর্তে কহিলেন, “বৎস ! এ লগ্নার
কেবল মাত্র পটীকা কেন্দ্র—এত অল্পে বিচলিত হইও
না, ঐহিকের পাশপক্ষে আত্ম-সমর্পণের চেষ্টা কর।
তিনি প্রাণে শান্তি দিবেন।”

“প্রভো ! তবে কি আগনি সব জ্বলেন ?”

“হাঁ বৎস ! মানবের স্তম্ভ-শক্তিতে বহুদূর জানা
সম্ভবপর হইতে পারে, আমি তাহাই জানি। ইহার
অধিক নহে।”

“আমি বড় অসহায়, বড় একা—এ ঘোর অন্ধ-
কারে আমাকে পথ দেখাইয়া দিনু।”

“আমি পথ দেখাইবার কে ? পথ দেখাইবার
যিনি, তাহাকে ডাক।”

“তাহাকে ত কত ডাকিছাছি—তিনি ত কখনও
আমার ডাকে সাড়া দেন নাই।”

“ভাবিয়া দেখ—কারমনোবাক্যে কখনও কি
ডাকিতে পারিয়াছ ?”

“সেদিন বৃষ্টির দূত আমার ঘরের পুরানি, নয়-
নের আনন্দ, জনক জননীর শেফালি ভাইটিকে
অকালে কৃতচ্যুত করিয়া লইয়া গেল, সেদিন তাহার
চরণে কত কাতর মিনতি জানাইয়াছিলাম; কিন্তু
কই, আমার কাতর প্রার্থনার তাহার আগমন ত
একবারও টলে নাই।”

“বিশ্বাস হারাইও না—একদিন জ্ঞাতার সন্ধান
মিলিবে।”

* * * * *

চাহিয়া দেখিলাম বেহ কোথাও নাই। জ্যোতি-
পূর্ণ মূর্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর আরও কত বৎসর কাটরা গিয়াছে।
আমি ভেড়াফুলে কাজ লইয়া আসিয়াছি। এখনও
স্বপ্নের দ্বার “সেদিনটার” কথা মনে পড়ে। একবার
মনে হয়, স্তব্ধ কি ত্রুচচারী আমাকে প্রসারণ করি-
য়াছেন ? না—তাঁহা কখনই হইতে পারে না।
আবার আমার দৃষ্টিতে নূতন আশায় জ্যোতি হুটয়া
উঠে।

সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে ভীষণ জ্বরগণ আক্রান্ত
হইয়াছে। প্রকৃতির ক্রম লীলা পায়ণের বুক বিভী-
ষিকার উদ্ভাবন পিহরণ আগাইয়া দিতেছে—যেঘের
কোলে বিব্রলীর খেলা—ঘরের বাহির হয় কাহার

সাধ। আমি 'স্নাইঃ কমে' চিকিৎসা সংক্রান্ত একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভৃত্য অনিরা সংবোধ দিল, বাহিরে একজন আমার সাফাংপ্রার্থী। আঁকবা! এই প্রমোদেও বাহুবের কাল থাকিতে পারে! তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবার আদেশ দিয়া পুনর্বার পুস্তকে মনঃসংযোগ করিলাম।

কয়েক মিনিট পরে কৃত্তার আহ্বানে চাহিয়া দেখিলাম, দ্বারদেশে দণ্ডাচান্না অবগুষ্ঠনবতী এক বাকালী রমণীকে দেখিতে পাইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম।

ঔষ্যার নিকট অগ্রসর হইলে, তিনি অবগুষ্ঠন মোচন করিয়া বাস-কন্ডে কঠে কহিলেন, "আমি আঁমি কই বিপত্তা; আমার একমাত্র সন্তান মৃত্যু শয্যায়—আমার অর্ববল, লোকবল কিছুই নাই। আপনায় সাহায্য বাতীত তাঁতার জীবন রক্ষা করিতে পারি সে তরলা নাই।"

রমণীর ব্যথা-ভরা পক্ষুবর্ণ শ্রবণে দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলাম, "না, আপনায় পুঞ্জের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত যাহা করা কর্তব্য তাহা করিতে কুষ্ঠিত হইব না। আপনি বিদ্যুরাজও বৃত্ত হইবেন না।"

কৃতজ্ঞতায় ঔষ্যার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি অল্পকাল ধোই প্রেষিত হইয়া রমণীর গৃহে গমন করিলাম। গৃহমধ্যে একটি সপ্তম কি ঋতন বর্ষীয় বালক আর ঐচ্ছের অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার শিরে একটি প্রমৌল কৌলভাবে জ্বলিতেছে। আমার মনে হইল যেন মৃত্যুর দূত গোপন চরনে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। বহুদিনের একটা বিশ্বস্ত অধার মনে পড়িয়া গেল।

বালকের নাকী পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, যদি ঔষ্যার প্রতি দুঃ, শুবাণি উপযুক্ত চিকিৎসা এবং বহু কষ্টের প্রার্থা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে।

আজ আমার মনটা কিছু প্রমুদ—তৃতীয় দিকল বালকের সংজ্ঞা কিরিয়া আদিল। জীবনের সকল আশঙ্কা কাটিয়া গেল। ছাংবিনী জননীর শ্রমে হাদির রেখা মূটরা উঠিল।

এবার দিনের অক্রান্ত পরিপ্রবেশ পর বিপ্রায় লাভ করিয়া আজ কেমন একটা অবসাদ আসিয়াছিল। শ্রান্ত দিনমণি পশ্চিম গগন হইতে বিদায় গ্রহণের সঙ্গে আমিও শয্যায় এসাইয়া পড়িলাম। কখন যে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম, কিছুই জানি না।

শেষ রাতে স্বপ্ন দেখিলাম, সেই জ্যোতির্গর্ভ ব্রহ্মচারী আমার মস্তকে হস্ত-প্রদান-পূর্বক কহিতেছেন, "বৎস! একবার চাহিয়া দেখ, আমি মিথ্যা বলি নাই—প্রার্থনাও করি নাই। এতদিনে তোমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। তুমি প্রাণান্ত হয়ে একটা দরিদ্র বালকের জীবন রক্ষা করিয়াছ। তোমার কার্যে বেবত্তা স্রীত হইয়াছেন।"

চক্ষুকে বিবাল করিতে পারিলাম না। এককাল বাহার দর্শনের আশায় কাটাইতেছি, তিনি আজ নিকটে ঝাঁড়াইয়া মধুর হাত কহিতেছে। আমি আশ্চ-সংবরণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলাম।

আবার ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তুমি বাতুল—অসরীরা জীবকে কি কেহ স্পর্শ করিতে পারে? আজ হইতে এতি দরিদ্র বালকের অধা তোমার জ্ঞাতকে বেধিতে পাইবে। দরিদ্র, নারাক্ষণের অংশ—তাহাদিগের সেবার তাঁর গ্রহণ করিবে।"

ব্রহ্মচারীর বাক্য শেষ হইতে না হইতে আমার দিগ্ভা ভাবিয়া গেল। কোথাও কিছু নাই; শুধু নব্যোদিত দর্শনের অকণা কিরণ শয্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বীধন

(প্রিন্সিপাল বসুদেব বি এ)

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল

কল ভাবে,

প্রিয়া বাধিয়াছে বাহুপাশে ;

দীপ মিটি মিটি, শেগ হয় রাত,

পানী আর শিশু আনিছে প্রেতাত,

কড় হাতবানি কঠে জড়ায়,

ছোট হাত মোর

কুক আসে—

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল

কল ভাবে ।

নিশাঃশবে আত্ম একি ভ্রমধূত

আগরণ !

—একি আঁধি-হুথ আহরণ !

কচি অথরের হাসির কাকলি

কোন্ প্রাণ মোর তুলিছে আকুলি !

রমণীর সূখে নৃতন বহিমা

নিমেষে টুটিল

আবরণ !

নিশা পশে শব্দ একি ভ্রমধূত

আগরণ !

ভ্রম-ভাঙা আঁধি হেরিছে স্বপন

অনিমেঘে !

—স্বপন-স্থান রসাবেশ !

প্রিয়া চেয়ে আছে শিশু বয়ানে,

—নিখিল যেবীট লুটায় শিখানে,

বসন্ত করে চারখানি তার

পদোদর মূগে

সবের এসে !—

মোর আঁধি আত্ম হেরিছে স্বপন

অনিমেঘে !

কু ও জননী পিপাসা মিটার

দিধাহারা—

জাণ ও ম্যাডনা একা কাঁসী !

অথরে মহিরা, নয়নে নয়নী,—

একি অপক্লপ রূপের লাবণি !

হুসর ! তবে একি ভোগবতী

সরস-পত্নী

রসধারা !

—কু ও জননী পিপাসা মিটার

দিধাহারা !

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল

কল ভাবে,

প্রিয়া বাধিয়াছে বাহুপাশে ;

জনমে জনমে ওই বাহুপাশ,

শিশু কঠোর ওই কলভাষ

বাধিয়াছে, আনি, পাটছড়াখানি

বিঞ্চন করিয়া

কুক আসে !

—তাই ধরা পড়ি এই ধরণীর

বাহুপাশে

পাহাড়ের কথা

(পূর্বানুভূতি)

[শ্রীনেত্রনাথ মল্লভার]

সংখ্যা ১—সংখ্যা গণনা সম্বন্ধে পাহাড়ীদের বিশেষ কিছু নাই, তাহারা আবারে মত সত্য সংখ্যাই গণনা করিতে পারে। তবে কেহ আত্মলের পর গণনা করিয়া কুড়ি পর্যন্ত সংখ্যা রাখে। সেই গণনা তাহারা একটু ছড়া বলে, সে ছড়াটি এই :—

একান্ন ঘোঁকান তিনে চার
তোশি পরশি মল্লো বার
কাঠকো ঘোড়া রপা সে
জেরো বাবু চুপা সে
ঠাকু হুঁকু উটেন বিল।

প্রবন্ধ—বাগদার এক উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যেখন নানাজন প্রবচনের ব্যবহার আছে, পাহাড়ী-বের মধ্যেও সেই সেই অর্থবোধক বিবিধ প্রবচনের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহারই কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :—

- (১) এক যোগি কি পোই
তাতা সমান হৈ।
হুই যোগি কি পোই
কুণা পশি রই।
তিন যোগি কি পোই
কুকুর সমান হৈ।

পশ্চিমবঙ্গের এম্মী প্রচলন আছে,—
পহিলা কুতা কুতা বোসে
দোসরা কুতা কুতা সাধ চলে
তিনরা কুতা বহিন্ বর তাই
চৌঠা কুতা বর জামাই।

ইহাতে ভগিনীপতির গৃহে থাকিয়া তাহার অঙ্গপালিত, ভ্রাতৃক এক বস্তুরের গৃহে থাকিয়া

বস্তুরের অঙ্গে পালিত জামাই এই উক্তের জীবন বৃত্তি ও নিম্নলিখ এই অভিজ্ঞাষ ব্যক্ত করা হইয়াছে। পাহাড়ীদের প্রবচনের ভাষার্থ এই যে, এক পত্নীয় স্বামী এইসে তাহার স্ত্রীর দীর্ঘা থাকে না। যে হুই পত্নীয় স্বামী তাহার জীবন শোচনীয়। পরন্তু যে তিন পত্নীয় স্বামী সে কুকুরের স্তায় বৃত্তি জীবন-ভার বহন করে।

- (২) আরকোলে ভড়াই ভনন্ ন ভনন্
আঠে মড়াই হনে।

পাঠান্তর
আরকোলে ভড়াই ভনন্ ন ভনন্
আঠে মড়াই ভাকো।
সংক্ষেপে
আঠে মড়াই ভাকো।

ইহার অর্থ আবারের “গারে মান ন আপনি যোড়স”।

- (৩) বাঙ্গলার “শাখেল কাঠাল বার না পেসে কুতুড়ি পায়না” এখানে, বিধান বানে রাত্তি উঠি কোল চাটুনে, পাড়াইয়াছে।

- (৪) গাওকো বুধিা ন বাটকো বাটোয়ারে।
ঠিক এ অর্থবোধক “খোবিক। কুতা না বরকা না বাটকা” প্রচলন আবারের দেশে প্রচলিত।

- (৫) আরু জনে ছার মা খুটা ভনে ভার মা।
আবারের দেশে প্রচলিত ইহার অনুরূপ প্রবচন এই :—

“বরে ভাত নাই লবা কোঁচা”।
“উন্ খেতে কুন্ খেলে না মাখার কুলেন তেল”।
“বাঁধা পুতের নাম পল্লোচন”।

“বুটে কুড়ুরি বাটা পোটা চন্দন”।

“দাদু ঘোষের বাটা শিতশাল” ইত্যাদি।

(৯) সিং উদাই বৈশা ভত্নু।

আমাদের “রাই কুড়িয়ে বেল”।

(১) হরি পনি সখিহা বাট পনি ঘেবিও।

আমাদের ঘেলে এচলিত ইহার অল্পরূপ প্রবচন
এই :—

“চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ি”।

(৮) মহি মাগু হুংরা লুকাউহু।

আমাদের ঘেশের

“পেটে আধখানা বুধে আধখানা”।

“চাক্ চাক্ শুড় শুড়” ইত্যাদির মত।

(৯) হুধ শুগো বুদ্ধি হাড় শুগো বল।

ইহার তাৎপর্য এই যে ছেলের বুদ্ধি এবং বল ও
পরমাণু বর্ষাক্রমে মায়ের হুধ এবং বাপের বল অল্পমাত্রা
হইয়া থাকে।

অন্য শাভান ছদ্ম—আমাদের ঘেশের
যেহেতা তাহাদের ছোট ছোট ছেলে ঘেয়েকে ঘুম
পাড়াইবার জন্য কতকগুলি ছড়া ব্যবহার করে। সে
ছড়ার কোন অর্থ নাই, পুর্কের সহিত পরবর্তী চরণের
কোন সূত্রব বা সামঞ্জস্য নাই। এগুলি কেবল কতক-
গুলি শব্দের বোঝনা মাত্র। সে সকল শব্দের এমন
কোন শক্তি নাই যে, শিক্ত করণ প্রকৃতি হইয়াযাত্র
নিজা কোথা হইতে অসংকিতভাবে আসিয়া নিঃশেষে
তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিবে। কিন্তু যে স্থরে সেই
ছড়াগুলি পাওয়া যায়, সে স্থর এবং তাহার সঙ্গে ভাল
তালে পা চাপড়ান এই উভয়ে মিলিত হইয়া ছেলেকে
ঘুম পাড়াইয়া দেয়। পাহাড়ীদেরও সেইরূপ ঘুম
পাড়ানি ছড়া আছে। আমি পাহাড়ীদের নিকট
এই ছড়া সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা
করিয়াও প্রথমে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারি নাই।
সকলেই বলিয়াছিল যে তাহাদের ছড়া নাই; কিন্তু
যে ঘেলে যা আছে সে ঘেলে ঘুম পাড়ানি ছড়া নাই
এ কথা অবিস্বাস ও অসম্ভব এই কথা বলিয়া

নাছোড়বান্দা হওয়াতে অবশেষে একটা পাহাড়ী
কৌলোক আমাকে নির নিষিদ্ধ কয়েকটা ছড়া বলিয়া
দিয়াছিল :—

(১) উড়ি বাউ জুন, য পজি হৈনা,

যলু লাই মন ছেই না।

উত্তো লাই হেক, ইয়ো কালি দেখা,

উত্তো লাই বন ছেই না।

অর্থঃ :—

ধাক্তে যেনাচ, মন সরে না,

কেমন ক’রে বাই।

পাখী হ’তাম, উড়ে যেতাম,

পারি বা কই তাই।

বন জঙ্গল, নাইক নীচে,

লাগে না তাই ভাল।

উপর দিকে দেখছি কেমন

পাহাড় কাল কাল।

যদিও আমাদের স্থরের সঙ্গে পাহাড়ীদের স্থরের
মিল নাই, তথাপি আমাদের “ও পারতে ভক্তি
গাছটা ভক্তি কুঁ কুঁ করে” এই স্থরে পাহাড়ীদের
উপরোক্ত ছড়াটা অপ্রতি করা যায়।

(২) শিল গুড়ি বাট, মাল গাড়ি আরো’

চোর পাখা বিঘিরি।

মুতাকো হারি কিল পাটকো শাড়ী

কুথকে শাল কিরিরি।

অনুবাদ

শিলগুড়ি হ’তে ঐ এল মালের গাড়ি।

গড় গড় ক’রে চোর চোরার দিয়ে পাড়ি ॥

মুখের শাড়ী পরা গলায় সোপার-দান্য।

মাথার ক্যাল কুঁকুরিয়ে উড়ুতেছে দেখ না ॥

(৩) হিমালয় চুপি তিরোপরি বাট

উড়ি আরো জুয়েনি।

বারি মা লাগ ছ কণ্ঠ মান লাগছ

ন বাজাউ মুরগি।

তাঁহার কিকিমাঝ ও ভ্রাস হয় নাই। তাহি লো
তোমার সেই মায়া আশাকে আমার এখানে ঘুরা-
ইতে বুড়াইতে আনিয়াছে।

বে মায়ায় বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া আছি সে বন্ধন
অচ্ছেদ্য। এগুন ব্যক্তি হইতে বদিয়াছে তথাপি
মায়ায় টান ঘুটিতেছে না। সেই টান আমাকে তোমার
কাছে টানিয়া আনিয়াছে। বেশ সঙ্গল কথা, কোন
রূপ ঠটিলতা নাই। কিন্তু ইহার সন্নিহিত, কলনীতে
কল ভরেনা, এই কথার সঙ্গল নির্ধন করিতে কবির
কলনাকে ও পরাভব স্বীকার করিতে হয় না কি ?

মুখতী, রাসকা পাহাড়ী কস্তায়া গুই চারি জন
একত্র হইলেই, সকলে সমকরে গান গাহিবার ইচ্ছাটা
বেন স্বতঃই তাহাদের প্রাণের মধ্যে। আন্তরে চড়ান
হুধের প্রথম কলকের মত উৎসিয়া উঠে। ঐক্যপ
ঐক্যভান শীত পথে বাটে প্রারম্ভে স্তনিত পাওয়া যায়।
পানের বহর এক চরণ, বড় জোর দুই চরণ। গান
এক নিশ্বাসে শেষ হইয়া যায়, অথচ গাহিবার শিপালা
মেটে না। তখন তাহারা এক গানের পর আর এক
গান এইরূপে ক্রমাগত তিন চারি বা আরও বেশী
গান এক টানে গাহিয়া যায়। অধিকাংশ শীতই
প্রমদু-সঙ্গীত। বে শীতটা তাহাদের সর্ব্বের বাখা,
প্রাণের কথা সেইটী হয় তাহাদের ধন্যতা, তাহার ভাব
হয়ত পূর্ব্বরাগ। তাহার পর সঙ্গে সঙ্গে সেই গানের
অন্তরা করিয়া আর একটা গান ধরে, তাহার ভাব
হয়ত বিরহ। ধন্যতার পুনরাবৃত্তি করিয়া আবার
তৃতীয় গান ধরে; সেটা হয়ত বেহেতব বিষয়ে এইরূপে
বহুবিধ ভাবের জগা বিচুড়ী পাখিহারা তাহারা গান
গায়। ভাবের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের দিকে তাহাদের
লক্ষ্য থাকেনা, লক্ষ্য থাকে কেবল সুরের দিকে।
কথা,—

ধন্যতা

হে বিলুপ্তা শিখরি কন্ডাই না ভুলু য় জিত্তো হনেন্দু।

পত্র অনুবাদ

হে প্রাণে প্রিয়তম জন কলীকার মম

তোমারি হইব আমি অস্ত্র কাতো হবনা।

সংলাপনে রেখ কথা কারো কাছে বঁধনা।

এই ধন্যতার অন্তরা যদি বিরহ-সঙ্গীত হয় এবং

পর পর কলি যদি শিপাতীত ভাবাপন্ন হয় তাহা হইলে
সুরের শীত গাহিয়া ভাবের আভ্র প্রাচ্য কল্পা হয় না
কি ?

চতুর্থ দৃষ্টান্ত—

গীতের আভ্র অংশ

গালা ছ মেয়ো লাসে বর্ণে

আঁখা ছ মেয়ো মরুকোণে

কপাল ছ মেয়ো চঞ্জনা মায়িনো

কুরকুড়া গুটিকিনে।

মধ্য অংশ

মুম পাহাড় যান্কে পানিকো হিট

তিয়ো মাখি টাইগার খিল

কি সেই ঘাউ মলাই শিয়ারিকো মাগেমা

কি কি'হু মেও প্রেমকো খিল।

অন্ত অংশ

শেতো লাই কমাল রাতো লাই কমাল

কুরকমাল গাসি মেও

কি সেই ঘাউ শিয়ারি আতুকো আশেনা

কি গলেমা গাসি মেও।

এ গীতের প্রথম অংশ রূপ বর্ণনা।

দ্বিতীয় অংশে নাগরীর নাগরের প্রতি নিবেদন
এই যে, হয় তাহাকে সছট্টা করিয়া তাহার মনো-
নীত স্থানে লইয়া যাওয়া হউক, না হয় তাহাদের
প্রেমে চির-বিচ্ছেদ ঘটুক। তৃতীয় অংশের
বক্তব্য—হয় আমাকে সঙ্গিনী কর, নহুবা আমার
প্রাণ বধ কর।

পাহাড়ীদের গান বলিলেই বুঝিতে হইবে প্রণয়-
সঙ্গীত বা টঙ্কা। টঙ্কা ব্যতীত অস্ত্র গান ও তাহাদের
কাছে, সে গানের নাম গান নহে, ভজন। গ্রীষ্ম
নবমী, দোল বাজা, রাসলীলা, সত্যনাথায়ণের পূজা
ও যেউনি পর উপলক্ষে তাহার গাহনা হয়।

ভাবের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের দিক দিয়া কিচির
করিলে দেখা যায় যে, নাহাড়ীসের অপেক্ষা ভুটরাঘের
গান অনেক পরিমাণে ভাল। কারণঃ প্রবাসী
জনৈক শিক্তি ওপ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া একটা
কুটীয়ে গুলন অনুবাস সহ আমাকে দয়াছিলেন সে
গানটী,এই :-

লেপে লেপে ওহই

ওহই লেপে ওহই চা

ওহই আ।

লেপে চোলে ওহই হুবে

য়েই পে.....

অনুবাস

সবই ভাল আজ, সবই ভাল,

চারি ধারে শুধু পুলক তাই।

মঙ্গলের দিকে চলছি মোরা,

বা' কিছু স্তত তাই শুধু চাই। (ক্রমশঃ)

মুক্তি

(শ্রী সালিদাস দাস কবিশেখর বি এ)

প্রিয়ার বাহুলতার পাশেই আমার পরামুক্তি,
আমার ক্ষয় মুক্তা হেথায়, প্রিয়ার ক্ষয়, মুক্তি।

এইখানে নেই কোন শিকল,

হেথায় শাস্ত্র বর বিকল,

হেথায় লভে সার্থকতা প্রেমদীতার উক্তি,

প্রেমের অদাধ হৃদে হেথায় অদাধ আমার মুক্তি।

নিম্নম নীতির বাইরে হেথায় আমার পরম বোদ্ধ

সত্যার চাটে তীর্থে মুঠে বাধা নিষেধ লক্ষ।

আইন কাগুন গভী বাধন

প্রধারীতির চণ্ড শাসন

সব ন ঠাইয়েই, ঠিক রাখা চাই আপন আপন কক্ষ।

এইখানে নেই কল্যাণ কলা, এই খানে পাই বোদ্ধ।

সকল বিধা বন্দ বিহীন এইখানে কৈবলা,

নাইক হেথায় হিসাব খতেন, নেইক অস্ত কলা।

হিতাহিতের লাজলাভের

কোন বিচার পাইনাক টের।

কথায় কথায় বেঁধে নাক ভাবতা-বিবশলা।

কেবল আমার এইখানেতেই বাহিত কৈবলা।

সমগ্রতার এই খানেতেই পাই যে অপবর্গ,

সকল ঠায়েই ঘর্ষ নরক, হেথায় নিলে বর্গ।

চারটি কলই পূর্ণ গড়ি,

সকল ঠায়েই অঙ্গ সনি,

খণ্ডপতে ভাগ করছে সমান বিধির খড়ল,

এইখানে পাই চারটি কলই পূর্ণ অপবর্গ।

সৃষ্টি ও প্রনয়

(শ্রীঅভূতের দোষ বি এল)

ত্যাগে সৃষ্টির উৎপত্তি। যখন ব্রহ্ম বহু'রন নাই,
তখন সৃষ্টি ছিল না; যখন ভাষার ইচ্ছা ছিল তিনি
বহু হইবেন, তখন চাইতে সৃষ্টি আরম্ভ, এবং সেই

ইচ্ছা অনুত্ত প্রবাহ রূপে নিরন্তর চলিতেছে; তিনি
বহু হইয়াছেন, আবার সেই বহুতও সিন্ধবার বিরাট
নাই। এই বহু হইবার ইচ্ছা যখন সমীচুত হইতে

থাকে, তখন প্রাণের আরম্ভ হয় এবং উহা যখন সম্পূর্ণ অভ্যাহিত হয় তখন প্রাণের ঘটনা থাকে। জীব-গণ ব্রহ্মস্বরূপে বহুতর। প্রকৃত সৃষ্টিকার হইতে, বৃক্ষ, লতা, অশ্ব, কীট, পক্ষ, খেচর, পশু পক্ষী মানবে সেই এক ব্রহ্ম সত্তা বিস্তারিত; সুতরাং হুল ও সকলই জীব অর্থাৎ সত্তা বিশিষ্ট; সেই সত্তার দ্বারা সিন্ধু বা নিজকে বুদ্ধি করিবার চেষ্টা (tendency towards projection), উচ্চ প্রেরণা জীব, পশু পক্ষী মানবের মধ্যে এই সিন্ধু বা হুল বেহ ধারণ ইচ্ছার নাম বৈশ্বানর বা জননেন্দ্রিয়া; উহাদের হুল বেহ ধারণের বস্তু বৈশ্বানর প্রকৃতি স্বাভাবিক। যেমন হুলসেহ পৃথি ও বস্তুার বস্তু আহার ও নিদ্রা স্বাভাবিক, সেইরূপ বস্তু হইবার ইচ্ছা হইতে বৈশ্বানর বুদ্ধি (Sexual appetite) স্বাভাবিক। তবে অপর্যায়বাহারে স্বাভাবিক বুদ্ধিরও ক্রম হইয়া থাকে। সংযত থাকিয়া জননেন্দ্রিয়া পূর্ণ করিলে স্ক্রল ঘটনা থাকে। মানবের ভাষ্যকবিত মৃত্যুর পর, তাহার আত্মা বিদেশী, অর্থাৎ হুল বেহ মুক্ত; কিন্তু হুল সেহ ধারী জীবাত্মা যে, প্রোত লোক বা নরক, দেবলোক বা স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক বা বৈবর্ত্যমিত্তে গমনের কথা শুনা যায়, প্রকৃতপক্ষে ঐ সব লোকের কোনও স্থান বা দেশ (Locality) নাই, উহা হুল বেহ বা মনেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। যেমন পক্ষত্ব দ্বারা হুল (বা অন্নময় ও প্রাণময় কোষ) বেহ নির্মিত, সেই রূপ বাসনা দ্বারা হুল (বা মনোময় কোষ) বেহ নির্মিত। হুলসেহ পরিত্যাগের পর হুল বা বাসনা-ময় বেহ বর্তমান থাকে; যদি বাসনাময় বেহের লয় হয়, তবেই আত্মা, ব্রহ্মলোক বা বৈবর্ত্যে গমন করে অর্থাৎ সে সৃষ্টির পূর্বে যোগ ছিল, সেই অবস্থায় অবস্থিত করে, তাহার উপর মায়া নির্মিত হুল ও ব্রহ্মসেহের অন্তর্ধান হয় এবং ব্রহ্মসেহ আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে নাম কৈবল্য মুক্তি; বেহধারী আত্মা ও জীবরূপ সৃষ্টি আত্মা (Individual Soul) তখন সার্বিক আত্মা (universal) লীন হয়। যখন

সমস্ত জীবের এইরূপ পরমাশ্রয় লয় হয়, তখন মহাপ্রাণের উপস্থিত হয়।

মানব হুলসেহের সাধারণ কাব্যনাম বা হুল বেহের বৃত্তির ভোগ করে; হুল বেহের প্রতি কর্তৃ দ্বারা আত্মা, ব্রহ্মসেহের বা মনের বাসনা ভোগ করি। এই ভোগ আহার কৈবল্য মন দ্বারাও সংঘটিত হইতে পারে। চিন্তা দ্বারা মনের জীবাশীলতা বুদ্ধি হয়; আহার বেহন শরীর পোষণ করে, চিন্তাও সেইরূপ মনের পোষণ আহার। সজ্জিত মনের সাধিক আহার; অসজ্জিতা তাদিক আহার। হুল শরীরেও এইরূপ সাধিক ও তাদিক আহার আছে। আহারের অভাবে হুল হুল উভয় শরীরের ক্ষয় হইতে পারে। মনের লয় না হইলে, ব্রহ্ম বর্শন হয় না অর্থাৎ আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

আমাদের চরিত্র, চিন্তা, বাসনা ও কর্মের দ্বারা গঠিত হয়। মৃত্যুর সময় আত্মা সেই সত্তার-কল্পী (cluster of impressions) বা চরিত্র লইয়া বেহ ভাগ করি। দয়া, দাম্পত্য, কবিতা, উচ্চ চিন্তা দ্বারা গঠিত মন, স্বর্ঘ বা দেবলোকে গমন করে ও সুখভোগ করে। এবল রিপু— কান, ক্রোধ, হিংসা, ক্রোধ, বিষয়াসক্তি দ্বারা গঠিত চরিত্র প্রকৃতলোক বা নরকে গমন করে এবং হুল বা ভোগসেহরূপ বস্তু (instrument) না থাকিলে হুল কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু এই সকল বস্তু ও হুল ভোগেরও সীমা আছে। তাহার অন্তে মন বা হুল বেহ পুনরায় ভোগসেহ ধারণ করিবার বস্তু সৃষ্টি হয় ব্রহ্ম হুল, সেই অবস্থায় তাহার পিতৃলোকে স্থিতি করা হইতে পারে। সে সমস্ত ক্রোধ পিতৃবাসনার অধঃপথে ব্রহ্ম করে। পিতৃবাসনার পূত্রোৎপাদন সময়ে মনের ইচ্ছার সহিত, বিদেশীজীবের ইচ্ছার সহিত মিল থাকিলে, পিতার ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া, তাহার সত্তার (sparmatiz) সাধারণ মাতৃ-শোণিতে প্রবিষ্ট হইয়া, হুলসেহ ধারণ করে। বৈশ্বানর জীবোৎপত্তির ইচ্ছা বিস্তারিত থাকে;

কিছু প্রত্যেক মৈথুনে অল্প নৈসর্গিক কালে
সত্যানুৎপত্তি না হইতেও পারে। তবে এই
মৈথুনেছার আধিত (পুকেই বলা হইয়াছে)
জীবোৎপত্তির ইচ্ছা বা “অহং বক্তব্যঃ” তাহা
আছে।

অন্যত্রা বৈক ত্রিভা দ্বারা মৈথুনে জীবোৎপত্তির
যেহ বর্তমান সত্যলম্বাতে প্রচলিত থাকিলেও, উহা
যে ভগবানের নিম্ন বিকল্প ভাষাতে সন্বেদ নাই।
জীবের (individual soul) বিদেহ হওয়া বা বৃল ও
নন্দ ভেদ হইতে মুক্তি লাভ তাহার পক্ষে প্রায় বা

মুক্তি অর্থাৎ তাহার তখন ব্রহ্ম প্রকটকালে নীন
(merged) হইয়া ক-বক্তব্যে স্থিত হয়। সে তখন
স্বস্তির পূর্বে বহা ছিল তাহাই হইয়া যায়। ফিরেও
এইরূপ নীন হওয়া তাহার পক্ষে বহা প্রায়। তখন
ভগবানের স্বস্তিরূপ নীলার শেষ হয়, কিন্তু সেই আদি
সিদ্ধকা ব্রহ্ম বীরজনে নীন থাকে, তাহা নির্বল
হইয়া অপ্রতি হইলে, পুনর্বার স্বস্তির সত্যবনা থাকিত
না। এই নীল, নীলার অনন্তকাল ঘরিতা করিয়া
আসিতেছেন এবং তথ্যিতে তাহার যে কখন শেষ
হইবে তাহা তিনিই জানেন।

প্রপর্ণা

(উপস্থাপন)

(শ্রীমতি আবোদিনি বোম)

(৮)

সেদিনও সন্ধ্যার অন্ধকারে বারানার কোণে
য়েমিংএর উপর বসিয়া সোমেন্সের সঙ্গে শশীশেখর
তাঁহার পরিচরিত্র জটিল সমস্যার সমাধান করিতে
ছিল। শশীশেখর করিল, “তোমার কিছু কষ্টাকর্ষী
হ’তে হবে।”

সোমেন্সের পকেট হইতে ক’ ক’ করিয়া কি
মাটিতে পড়িয়া গেল। সোমেন্স তাহা কুড়াইতে
কুড়াইতে করিল, “সে বেশ ভাল। ঠাকুরবাবুকে বলা
হয়তো সব?”

“কি জানেই ত মুন্সি? তোকেই ভাবি ক’ব, কিন্তু
হয়ে উঠছে না সেটা।”

“সরমে না পরে ঘানী—এইরূপ অবস্থা!”

“হা কলছে।”

“আবার বখন কষ্টাকর্ষী ক’ব, তখন আবার
আর ঘটকালী ক’বাব পথ নাই। ঠাকুরনা অনেক
কর্তব্য এই হস্তাক্ষর। ছোঁড়া ছবি। পেয়ে আবার

সোণার চাঁদ নাতিটাকে এই বাপ দ্বা পথে কুড়ান
যেহেটা পড়িয়ে দিতে এসেছ। নাতি আবার
বস্তুর বাড়ী যাবে, শালা আসবে, বস্তুর আসবে, পাড়ী
যোড়া লোক নব্বই আসবে, লগপানে লগপানে বাড়ী
ভরে যাবে, পাড়ী পড়নী সব চেয়ে থাকবে—তা না
কোথেকে একটা তিন কুলে আপন কলতে কেউ নেই
যর বাড়ী টিকানা নেই, খোন্টিগোত্রের খবর নেই,
এমন একটা পক্ষীছাড়া হস্তাক্ষর ছেয়ে অনেক আবার
সব মাথে জলাভূমি দিতে এল।”

“তা ঘটকালীটা ক’বি ক’বতে পার না হ’তে।”

“একটা কাজ কর না, কাল সকালে একখানা
বিদ্যাপতি কিনে আন।”

“তাতে কি হবে?”

“তাতে বহু হবে। বিবাহের লক্ষণগুলো তার
থেকে দিলিবে নিঃ—বহুতাৎপন্ন বিনামূল্যে
তোমার তার কিকিং আন বিতরণ ক’ব্বি। বধা—
আবারে অকতি (ভা) নেই তাতে তোমার কিছু

আমি সেখানে তোমার আহ্বানের বন্দোবস্ত রাখব), সর্বদা উদযত আবে, নির্ভর্যে বাস, বিপন্নস্থ, নিশ্চেষ্টে পাণ্ডারগণ, প্রমোদে বিরতি ইত্যাদি—বাণ, কিত্তি-মাং। তোমার তখন আর কিছু কইতেও হ'বে না, কহতেও হ'বে না,—সে যদি ত্রিখারীর বেয়েও হয়, কোনও পক্ষ কোনও উচ্চতা কহ'বে না, ঠাকুরমা আপনি যেচে তোমার এক কল্পা দান করাবেন।”

শশীশেখর হাসিয়া বলিল,—“তা এটা একটা উঠিকেই বটে।”

“মানটা কাজে লাগিলে দেখ না, শেষে হস্তবাস দিতে কথা খুঁজে পাবে না। দেহেরদের কাছে জিতবার ইচ্ছা অতি চন্দ্রকার পদিসি।”

দীর্ঘ সময়ের পরে শশীশেখর বাড়ী ফিরিয়া গেল। সোমেন্দ্র অনেকক্ষণ রেণি-এর উপর বসিয়া রহিল; কৌণার চন্দ্র তখন ককটুকার মাথার উপর হইতে উকি মারিয়া নামিয়া গেল, সঙ্গবিনয়গণ ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া ধাঁড়াইল। চাহিয়া চাহিয়া সোমেন্দ্রের শুষ্ক মনে হইতেছিল, এই অসমিত চন্দ্র নিকল্লাস তিমিরময়ী শরীরের তিতর তাহার সমস্ত চেতনা বেন নিশিয়া বাইতেছে; এই শব্দহীন, চাকল্যহীন, প্রকল্পণেশ গুহতা মহাসাধনের অল-প্রোভের মত স্থূর্ণ নভঃপ্রান্ত হইতে নিঃশব্দ ধারায় বেন তাহারই অন্তরে প্রবেশ করিতেছে! তাহার স্বপ্নের ভলে শত হলনার লুপ্তাধিত একটা পতীর গুঢ় কথা, অলহল আকাশ ভরিয়া রাত্রির এই অন্ধকারের মত কায়া ধারণ করিয়া চরচর চাকিয়া কেপিতে উদ্ভত হইয়াছে।

সোমেন্দ্র উঠিয়া ধাঁড়িয়া বেগি-এর উপর স্থাঁকিয়া নত হইল, এই অন্ধকার, এই নীরবতা, এই স্থূর্ণতার তিতর সে বেন এক অদ্ভুত শব্দের সহিত অসিত বনে ঘুরিতেছিল, তাহার ললাটের শিরা স্নীত হইয়া উঠিতে লাগিল, নিঃশব্দ পাচঠর হইয়া উঠিতে লাগিল, দুপপৎ একটা অদম অসীমতা ও অগচ্ছা

বিস্তারের আকর্ষণের কেন তাহার বিস্মৃত অন্তরাখা * আকর্ষণ করিয়া উঠিতে লাগিল।

(১)

বেলা ৮টা বাজিয়াছে, তখনও সোমেন্দ্র উঠে নাই।

এখনটী কখনও হয় না। সোমেন্দ্র অতি প্রত্যাঘে শয্যাভাগ্য করিত, শশীশেখর কর্তৃক ৮টার আগে উঠিত; এবং সোমেন্দ্রই তাহার নিম্নাত্তর বাপারের পুরা চাক্ষু মইয়াছিল। শীতকালে শীতল অলসঃবেগে, অথবা দুখবলে মতাবার পুত্র করিয়া, অকস্মাৎ হস্তপদাদি ধারণ করিয়া কৃষ্ণাকারে শয্যা হইতে ভূমিতে পাতিত করিয়া, নতকে নানারূপ কৌরকর্ম সম্পাদন করিয়া ও এই রকমের বহু উপায়ে তাহাকে জাগরিত করিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া বাহিরে লইয়া আসিত। ইহার কদাপি অস্তথা হইত না।

শশীশেখর আদিয়া দেসের বহু কপাটে বুট্যাখাত প্রদান করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। তাহার আশ না ডাকিতে উঠিবার বিশেষ কারণ ছিল। গত রাত্রিতে ঠাকুরমা সহসা তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার আহ্বারে অকতি, প্রমোদে বিরতি ও সর্বদা বিঘ্নতার হেতু গোপনে বাহির করিয়া লইয়াছেন এবং সশিবেশ তুমিয়া আখিনের নিকটতম লয়েই বিয়ের দিন ধাৰ্গা করিয়াছেন।

সোমেন্দ্রকে এই শুভসংবাদ দিবার অল্প শশীশেখর ভোর (৭টার সময়) উঠিয়া আসিয়াছে।

“বলি কি গো এখনও যে বড় নিম্নাত্তর হয় নি” বলিয়া শশীশেখর নিম্নিত সোমেন্দ্রের কেশাকর্ষ করিয়া উঠাইল।

উঠিয়া বলিয়া চোখ কলোইতে কলোইতে সোমেন্দ্র কহিল, “কাল রাত্রে ঘুম হ'ক নি ঘোষাব?”

“আপনার ব্যাপার কি? এক আধ ডোজ পুস্ত্রালব পেতে পড়েছে বোধ হচ্ছে।”

বিয়ের নেমন্তর কর্তে এসেছি তোমাকে। সামনের এই ৭ই বিয়ে। মহাশয় অদুঃস্বপ্নক

জগতে মাথা রাখবার আবার ঠাই নাট। সজ্জার
চেয়ে মরণ প্রেয়ঃ, সেই মরণ হতে অধিক লজ্জা
আমার চারিদিকে,—”

কহ ক্রমেন রাগরাগীন্দ্র কীতকর্ষণী গানিমা গেল ;
একটু গানিমা সে করিল, “কোথায় আবার স্থান
আছে—কোথায় আনি আজ ঠাঁইব। কেন আপনারা
আমাকে এরূপ জীবন দান করেন।”

রাগরাগীন্দ্র অঙ্গুষ্ঠে অর্ধ কণ্ঠ নিঃশব্দে ধরের
ভিতর ধ্বনিত হইয়া বেগমালের গায়ে মিশিয়া গেল।

কতকবেগাশ্রুত অর্গলের মত সোমেন্দ্রের
গোপন অন্তরে মনঃকহ একখানি কপাট সে
ক্রমেন ধরে সহসা বিচ্যুত হইয়া গেল, এবং
একটা অবকহ অকথিত বাণী তাহার ঘোন ওষ্ঠপুটের
পশ্চাতে মুক্তিলাভের ভঙ্গ চোঁট করিতে লাগিল।
আকিকনের চরিত্র ধনকে ধরয়ে ধারণ কামনায়
তাহার বাহুবুগ স্পন্দিত ও ছন্দ কপিত হইতে
লাগিল, সোমেন্দ্র কিরিতা ঠাড়াইল, তাহার দৃষ্টি
অঙ্গুষ্ঠের কাপ্তা হইয়া পড়িল।

একটু পরে গম্ভীর পরিষ্কার ধরে, সংবত চিত্তে
সোমেন্দ্র করিল, আপনার এটা বৃত্তবার ভুল হচ্ছে।
আপনার কাছে আমাদের একটা নিবেদন ছিল,
সেইটে কল্যাণ মন্ত্র আমি আজ আপনার কাছে
এসেছি। তরফা করি আপনি মনে করবেন না যে,
হুবিধা পেয়ে আমরা আপনার স্বাধীনতার উপর
হস্তক্ষেপ করছি। আপনার ইচ্ছা, আশা-কচি—
সে আপনারই। এ দুমাস আগেও যেমন ছিল
এখন ও তেমন আছে জাব্বেন। এ সংসারে
হুর্ভাগ্যই যে কেবল ভাগ্যবন্তের অজুগ্ধ প্রার্থনা
করে তা নয়, অনেক সময় ভাগ্যবন্ত ও হুর্ভাগ্যের
অজুগ্ধ প্রার্থনা করে। শব্দ আপনার পাণ্ডিত্যবানী,
আপনার যদি এ প্রত্যাবে কিছু অমত না থাকে, তবে
শ্রীযুগল উত্তরকর্ণ সম্পন্ন হবে।”

সোমেন্দ্র আর সেখানে ঠাড়াইল না, অবশেষে

তার বহন করিয়া নৌরথে বস হইতে বাহির হইয়া
গেল।

পরদিন সকালেই সোমেন্দ্র গিয়া শব্দীশ্বরকে
কহিল, “নাও যে তোমার প্রিয়তা চাচ্ছি বুকে, নাও,
আসি বাড়ী চম্ব।”

“অনুগ্রহের ধরে শব্দীশ্বর কহিল, “বিনা কেহ
বজ্রাঘাত কোর না।”

“আমার যেতেই হবে যে! বাবার চিঠি
এসেছে।”

“তাত কোন দিনই আসে না কি না।”

“না ঠাকুর হুচারে মাথা ফুটছেন।”

“নাকি বৃত্তিরে একখানি চিঠি দিবে নাও—এই
একটি সপ্তাহ তার পরে যেও।”

“হুজাবিনীর কল্ম।”

“অনুগ্রহ ত হবে থেকেই।”

“এখন আবার না গেলেই হবে না।”

“কিছুতেই এখন যেতে পাচ্ছি না।”

“আমি—ওর কাছে বিকিরে গেছি কি না,
উনি যেতে দিলে যেতে পারব, নইলে পারব না।”

“আমার কাছে বিকিরে গেছে তুমি একবারে।
মর দিবে কেন। যাহুবের সঙ্গে হাজার রকমের সেন-
সেনের তিলাব রাখতে হয়, কিন্তু এই যে বিনি
পদ্যার বিকান লোক—এঁদের সঙ্গে সবকটা হচ্ছে
—এই থাকে তুমি বল কি না অনাসক্ত—”

হাসিয়া সোমেন্দ্র বলিল, “বলি বাশায়টা কি যে,
ভাবের মুখে যে আজ প্রোত চুটেছে?”

দালিয়া শব্দীশ্বর কহিল, “চুটেছে—নাকি?”

“নিভাকই। ঐরা-১৭ তারিখে নেবার মত প্রবেশ
বেগ।”

“তাই না কি? তুমি মাতল অব পালাচ্ছ কেমন
করে?”

“না রে, তুমি বৃত্তিতে পারছ না।” পত চুটেতে

বাড়ী ঘাই নাই, এবারও যদি না ঘাই, তবে বাধা চটে যাবেন ! তা ছাড়া স্ত্রীত্যাগীর অম্ম—”

“গণেশই ত বাড়ীতে আছে !” স্ত্রীত্যাগীর অম্ম ত করতলি থেকে ! তোমার সেখানে এখন বিশেষ-ঠেকাটা কি ! কিন্তু ভেবে দেখ যেহি এমিক-কার অবস্থাটা !”

“আমার ভক্ত কি ঠেকবে !”

“আর কার কিছু না ঠেকলেও তোমার আত্মীয়ের ত বিশেষ ঠেকবে ! “নাহা” ছাড়া তিন ত আর কার সঙ্গে কথা কইবেন না ! অপরিচিত জাংগাং অপরিচিত লোকের নাকশানে একমাত্র চেনা মানুষ তোমাকেও যদি সে বেধতে না পার তবে—”

একটা এচও বিদ্রোহ সোমেন্দ্রের অন্তরের ভিতর ক্ষীত হইয়া উঠিতে লাগিল, চৌক্যের করিয়া তাহার বলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল, এ হুণ কার্যের ভিতর ঘাতিয়া সে আর মাথা দিবে না ? সে পলাইবে এখানে হইতে ধরতীর পূর্বতম এক প্রান্তে, যেখানে সে কর্তব্যের তাহার কাছে আর পহুঁছিবে না ; নব বর্ষার ঘন ঝটার সবত ক্রকরাগ স্তূর্ণ করিয়া নিবিড় পক্ষ-ছায় ছুঁত কাল চোখের সম্মল চাহনি, যেখানে তাহার চিত্ত-ক্লেশের পক্ষাঘাতন করিবে না ! যে হৃৎশাপেরের জল তাঁহার স্পর্শমাত্রে হলাহল হইয়া বাইবে, তাহার জল-কণার দিকে চাহিয়া নিমেষ পণিয়া অচল জীবন-রাগি গোহাইবার আশায় সে আর যুঝিবে না !

শশীশেখর তাহার দুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “তোমাকে ভারী দুঃখই ঘেঁষেছে ? স্ত্রীত্যাগীর অম্ম কি খুব বেশী না কি ?”

সোমেন্দ্র, “হাঁ” বলিতে গিয়াও “না” বলিয়া ফেলিল।

শশীশেখর কহিল, “তবে থেকে বাও ।”

“নিভাড়াই আবার নইলে চলবে না ?”

রাগ করিয়া শশীশেখর কহিল, “না, তোমার

থাকতে হবে না । যে বাড়ীতে সোমেন্দ্রবাবু নেই সে বাড়ীতে ত আর কার কোনও কাজ হয় না !”

হাসিয়া তখন সোমেন্দ্র কহিল, “না, না, বাব না ।”

“উহু”, তোমার থাকতে হবে না, তুমি এখন যাও, চল আমি আনিবে দিবে আনছি ।”

শশীশেখর সোমেন্দ্রকে ধাক্কা দিতে, ধাক্কা দিতে ধারান্য আনিয়া ফেলিল।

সোমেন্দ্র টোকাইয়া কহিল, “ঠাকুর-মা দেখে যান এমিকে ।”

ঠাকুর-মা আসিয়া যুগমান দুইজনকে দেখিয়া কহিলেন, “এ কি হচ্ছে ?”

সোমেন্দ্র বলিল, “বেশু ন শশী আমায় ডাকিবে দিচ্ছে ।”

সোমেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া শশীশেখর ঠাকুর-মা কহিল, “না ঠাকুর মা দোষ আমাকে ডাকিবে দিচ্ছিল !”

ঠাকুর-মা তাহাশিগকে বৃদ্ধ-শাখা-বিহারী জীব বিশেষের নামে অভিহিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

সোমেন্দ্র বলিল, “বেশ, তোমার একটুও হলবোধ নেই, আমি হচ্ছি তোমার মেঘদূত, তোমার প্রিয়োর ব্যস্ততা বহন করে এনেছি, পাত্র অর্ঘ্য দিয়ে আমাকে বরণ করে যাবে নেবে না—”

“কহা বস্তুতে হয় সে কথাটা আগে ! পরিপাটী করে অভ্যর্থনা কর্তব্য তা হ’লে । আরে এস এস, ঘরের ভিতর এস, কি খবর শুনি ।”

সোমেন্দ্র গত রাগির বিবরণ সর্ব্বমুখ কহিল।

শশীশেখর আকস্মিক তাহার শিঠ চাপড়হিয়া তাহাকে অনেক বাধা দিল।

সোমেন্দ্র বলিল, “নাও, তোমার ত কেকা কতে, এখন আমাষের বকশিলাটা দিবে কেন ।”

“কেলা ত কতে রটে । কিন্তু এতে যদি কোনও ‘কিন্তু’ থাকে—”

“কি কিন্তু ?”

“ধর না, যদি মনে মনে সে তোমাকে—”

“তুমি একটা আড় পাখা! বানিকা সে, তার নারীত্ব তার ভিতর এখনও চোখ মেলে নি। তার হাতখানি দার হাতে তুলে দিবে, সেইখানেই সে আত্মসমর্পণ করবে। আজকে তোমার কথায় তার হৃদ লাল হয়ে উঠেছিল। শুভ লক্ষণ এটা, তোমার আশা-দ্বিধার উবালোক!”

()

সকাল বেলা রাধারানী উঠিতেই সোমেন্দ্র গিয়া কহিল, “আজ আপনাকে এক আদ্যপার যেতে হবে।”

রাধারানী কহিল, “আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকেন না কেন! আবার ‘আপনি’ কখন! এবার থেকে আমাকে ‘তুমি’ কল্বেন ও ‘রাধা’ বলে ডাকবেন।”

সোমেন্দ্র হাসিল, কিন্তু সে বেশনামাখা হাসি। পুষ্পাসবর্ণানমর মধুপের কল শব্দের মত তাহার হৃদয়ের ভিতর একটা প্রমত্ত স্তম্ভন ধ্বনিত হইতে লাগিল, তাহার নিঃশ্বাস প্রস্রাট হইয়া আসিতে লাগিল, অস্তিত্বকে চাহিয়া সে কহিল, “এ কি বিপ্লব আজ!”

“তবু আপনি আমার দাদার মত হয়ে আমাকে ‘আপনি’ কল্বেন, এ কি রকম।”

চাহিয়া সোমেন্দ্র বলিল, “বেশ কল্বেন, সেবে আবার কল্লন-মল্লক তাবের না যে এ সোফটা কি আনন্দি সত্যতা-জ্ঞান-প্রীক্লিত, মেয়েদের মান রাখতে জানে না—‘তুমি’ বলে।”

রাধারানী হাসিয়া বলিল, “বাঃ!”

টেকিলের উপর হইতে টাইমপিস্টো উঠাইয়া দেখিয়া সোমেন্দ্র বলিল, “৭টা বেজেছে, ৮টার সময় সাক্ষী আসবে, আপনি তৈরি হন এর মধ্যে।”

“আবার আপনি!”

“আপনিটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে!”

“বড় ভাই”র কাছে সোফে ঘেঁষে পায়, সম্মান নয়।”

রাধারানীর কথা সোমেন্দ্রের কাণে একটা দাক্ষণ যন্ত্রের মত ধ্বনিত হইল। সোমেন্দ্র বলিল, “এক-বারে যাওয়ার মত সব শুদ্ধাংতে হবে, আর এখানে আত্মবার পরকায় হবে না।”

“কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?”

“যে বাড়ীতে তুমি কাজী হয়ে সেই বাড়ীতে।”

রাধারানী হৃদ মত করিল।

সোমেন্দ্র পুনশ্চ তাৎকালিক জিনিষপত্র সব গুছাইতে অনুশ্রোধ করিয়া এবং নীত্রেই সে কিরিয়া আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল।

সোমেন্দ্র কিন্তু কিরিয়া আসিয়া এখন তেতালার গেল, তখন দেখিল, রাধারানী চুপ করিয়া জানালায় ধারে বলিয়া আছে। প্রত্যন্তে অঙ্গপোষয়ের মত নিগূঢ় আনন্দের আভা তাহার মুখে হুটগা উঠিয়াছে।

ইহার কয়েক দিন আগে রাধারানী যে দিন সোমেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিরাছিল, তাহার সেদিন-কার অশ্রুদ্রিত মূখখানি তাহার মনে পড়িল। সোমেন্দ্রের হৃদয় বেদনা তাহার লম্বুখের এই আনন্দের-বুজ চক্ষের জ্যোতিতে নিমজ্জিত হইয়া গেল। রাধারানীর মুখের উপর চোখ রাখিয়া সোমেন্দ্র বলিল, “এর নাম বুদ্ধি গুছান।”

রাধারানী উঠিয়া পাড়াইয়া কুণ্ঠিত ভাবে করিল, “কি গুছাব আমি জানি না।”

এই যে সব জিনিস পত্র হুছান রয়েছে, এগুলো বাজে ভরে স্কেতে হবে।”

রাধারানী তবু মুখ নীচু করিয়া পাড়াইয়া রহিল। সোমেন্দ্র বুদ্ধির রাধারানী কুণ্ঠিত হইতেছে, বলিল, “এ সব জিনিস ত’ তোমার, তোমার সঙ্গে এ সব যাবে।”

“আমি গোছাতে পারি না” বলিয়া রাধারানী সঙ্কুচিত হইয়া পাড়াইল।

“এই সব সাক্ষী জ্যাকেট সেমিক ইত্যাদি; শুধু

অজ্ঞ-বিশিষ্ট প্রাণীদের যে ব্যবস্থা নয়, তা বোধ
কৃত্তে পার।”

রাধারানী অস্ত্র হিকে চাহিয়া রহিল কিছু বলিল
না। সোমেন্দ্র বলিল, “তবে শশী এসে শুছিয়ে
নেবে।”

রাধারানীর মূখ দিয়া ছোট্ট একটা “না” বাহির
হইয়া গেল। লজ্জায় গালটা টকটকে লাল হইল।
সে কিরিয়া ধাক্কাইল।

সোমেন্দ্র তখন সমস্ত জিনিষ পত্র একত্র করিয়া
গোছাইয়া টাকে তরিয়া মিল।

আগের দিন বিকাল বেলা সোমেন্দ্র অনুবধানতা
কলতঃ চাৰি কেলিরা গিয়াছিল, রাধারানী তাহা
তুলিয়া রাখিয়াছিল। বালিসের তল হইতে চাৰি
আনিয়া সে বলিল, “আপনি কাল চাৰি কেনে দিখে-
ছিলেন ?”

“ওঃ! দেখিনি তা” বলিয়া সোমেন্দ্র হস্ত প্রসা-
রণ করিল, রাধা তাহার হাতে চাৰি মিল ? দুহস্তের
অস্ত্র তাহার চম্পক কোরকবৎ অস্থি সোমেন্দ্রের
করতল স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ সোমেন্দ্রের হৃৎকর
তিতর রক্তধারা উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহার সর্কে-
ন্দ্রিয় প্রাণিত করিয়া অপূর্ণ পূনঃ-স্রোত কলার মত
উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। দুহস্তের অস্ত্র সোমেন্দ্রের
মনে হইল, -ঐ দ্বন্দ্ব মনোস্তাণক -শ কোরক শুনি
তাহার হাতের দিতর চাণিয়া ধরে,—

সোমেন্দ্রের বিকল-দৃষ্টি রাধার দৃষ্টির সঙ্গে সন্নি-
গিত হইল। বিশিষ্ট চইয়া রাধা বলিল, “বাধা পেলেন
না কি ? কি করে লাগল ?”

“না, না কিছু নয়, আমি ঘাই” বলিয়া সোমেন্দ্র
অলিত পথে দ্রুত নীচে নামিয়া গেল।

যমুনা

(গান)

[শ্রীঅন্ততৌব মুখোপাধ্যায় কবিত্বশাক্ত, বি এ]

যমুনা,

তোমার তীরে আব না কিরে

প্রভের দত্ত গোপ-নারী—

আর না রাধা—নায়ে সাধা

বাল্যের কানী কানীধারী !

কুঞ্জ কোকিল পাখনা তেমন—

প্রভ বসু বান্ধিয়ে কীকন,

আর না চণে “ভরা” কাঁখে—

ছল-ছলিয়ে ওঠে বারি !

আর ত রাধা বার না ছুটে—

• —রক্ত কমল নাহি ছুটে—

আর নাহি সে রসিক নাসর,

ডাকে—প্রিয়ে প্রাণ শিয়ারি !

আর নাহি সে কুলন বেলা—

মাসের হাটে রতনের মেলা—

আর নাহি সে মধুংসবে

ছোটে হাজার শিচ্কারি !

শুক সারী ঐ বক্তে প্রোলাপ—

আর করে না প্রেমর আলাপ—

শ্রুতি শুধু কৈসে বলে—

একি নিষ্ঠুর—চতুরালি !

সদাশিবের দণ্ডুর ।

নাস্তিকতা না আস্তিকতা ?

(ঐক্যোগেশচন্দ্র ঘোষ এন বি, এ, দি, লওন)

ভাই ধুতুরা! তুল তোমার কোন বিধাতা গড়ি-
যাচ্ছে ? তুমি বড় সুন্দর—অতি পবিত্র । বিদেশীয়
কবিতা তোমার সহিত কুমারীপণের নিরর্থকতার
তুলনা দেন । আমাদের দেশের বিশিষ্টর মধুসূদন
তোমাকে “যোগিনী” বসিয়া গিচ্ছাছেন । কিন্তু
তোমার উৎপত্তি অতি সামান্য পদার্থে হইতে ।
চৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, স্তম্ভিকা বিকৃত হইয়া
তোমার জন্ম । স্তম্ভিকা বিকৃত হইয়া তুমি জন্মিচ্ছ
কি না তাহা আমি বলিতে চাহি না, তবে এই পর্য্যন্ত
বলিতে পারি যে, তুমি পরমাণু-সমষ্টি, জগতের কতক-
গুলি ভৌতিক পদার্থের সংযোজন তোমার কারণ ।
তোমার ধ্বংসে জ্ঞান বাইবে যে, তোমার সত্তার
অদ্বার, অরূপান, উদ্বাহন এক স্বকারণান প্রকৃতি
পদার্থ বিস্তার । কোন পদার্থ কত পরিমাণে আছে
তাঁহাও মনুষ্যবুদ্ধি স্থির করিতে সমর্থ, কিন্তু আশ্চর্যের
বিষয় এই যে, সেই সেই পরিমাণে ঐ সকল পদার্থ
লইয়া মনুষ্য তোমার মত একটা ফল প্রস্তুত করিতে
অসমর্থ । এমত ভাই জড়বাদী, আমাকে একটি ধুতুরা
ফল প্রস্তুত করিয়া দাও দেখি ? তুমি যে যে ভৌতিক
পদার্থ বহু পরিমাণে চাহিবে তাহা আমি দিব, তথাপি
তুমি ফলত্যাগী হইতে পারিবে না । তবে কেন জগ-
তের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে নিঃসন্দেহ কর না । অকৃত
একজন চৈতন্যবস্তুর জ্ঞানবধ ঈশ্বর আছেন, যিনি
স্তম্ভ আর কেহ ইহার সৃজন করিতে পারেন না ।
ধুতুরাও তাহার সৃষ্টি, আর নম নদী ব্রহ্ম সাগর মত এম
উপগ্রহ—এক কথা বলিতে গেলে—সমগ্র জড় জগৎ,
চৈতন্য জগৎ তাহারই সৃষ্টি । অকৃত পরমাণু সৃষ্টির
উপদক । কুন্তের নির্ভাতা কুন্তকার ; কিন্তু যে
ঐশ্বরিক সাহায্যে ঐ ব্রহ্ম নির্মিত—সেই উপাদানের

স্রষ্টা সে নয় । সেইরূপ পরমাণু উপদক হইতে পারে,
কিন্তু সেই পরমাণুর অব্যক্ত একজন স্রষ্টা আছেন । তুমি
বলিবে যে পরমাণুই কুন্তের স্রষ্টা, কিন্তু পূর্বেই বলি-
য়াছি যে, পরমাণু দিতেছি একটা কুন্ত বা কুন্ত
প্রস্তুত করিয়া দাও । তুমি তাহা স্বজন পার না,
তখন চৈতন্যময় ঈশ্বর মানিবে বা কেন ? তুমি
বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে এই চরাতর
জগৎসংসার উৎপত্তি । জড়বাদী তাহা মানেন না,
সে বলে যে একমাত্র প্রকৃতি হইতেই সকলের
উৎপত্তি । কিন্তু প্রকৃতি কোথা হইতে আসিল,
জিজ্ঞাসা করিলে বলে, যে তাহার আদি নাই অস্ত
নাই । সূতরাং বলিতে হয় বাহার আদি ও নাই,
অস্তও নাই তাহা স্বতঃ ব্যাপ্ত, তাহার স্রষ্টাও নাই ।
জগৎ নিঃস্বের বাহ্য ; প্রকৃতির কতকগুলি নিয়ম
আছে এবং সেই নিয়ম সঙ্গত কার্যকর । প্রকৃতি
নিয়ম করিয়াছে যে, বৃক্ষ হইতে ফল হইবে । তাহা
বণন করিবার কাহারও সাধ্য নাই । সূতরাং ফল
নির্মাণ মাছুষের সাধ্যাতীত । তাহারা কি বলিয়া
তর্ক করে তাহা আমি না । অব্যক্ত বিধের কারণ
একটি নহে, আর জড়বাদী দ্বীকৃত পরমাণু যে সৃষ্টির
উপাদান তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, —কিন্তু
ইহার নিমিত্ত কারণ কি নাই ? অব্যক্ত আছে ।
আমরা এই নিমিত্ত কারণকে চৈতন্যময় বলি । আম-
দের দেশের দার্শনিকেরা জগতের দুইটা কারণ
নির্দেশ করিয়া থাকেন । কাহারও কাহারও মতে
প্রকৃতি উপাদান কারণ, পুরুষ নিমিত্ত কারণ । আবার
কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, নিত্য পরমাণুর সম-
বাহে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে । আবার কাহারও কাহারও
মতে চৈতন্যময় জগদানই জগতে একমাত্র নিমিত্ত

কারণ। আবার কেহ কেহ তাহাকেই অগতির উত্তরাধিকার বলায় বীকার করেন। তত্ববাদী যে নিয়মের বোহাইই বেন, উহাই অগতির নিদিত্ত কারণ। ইহা যদি না বীকার করা যায়, তাহা হইলে অন্ধ বলিতে হইবে যে, নিয়মের একজন নিয়ন্তা আছে। সেই নিয়ন্তা কে? আদম্য বলি না যে সকল কার্য তিনি বিনা নিয়মে ব্যক্তভাবে সম্পাদন করিতেছেন। বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, তারা, জীব জন্তু যাবতীয়ে স্বাধর রহন, নিয়মের অধীনে চলিতেছে। কোনও কোনও শাস্ত্রাভি দার্শনিক অধমীশ্বরকে স্রষ্টা বিনাই খাটাইতে চান। অগতঃ perpetual creation অনবরত সৃষ্টি চলিতেছে। এই সকল মহাবৈজ্ঞানিকেরা তাহাকে একটু তত্ত্বও হাইতে বিতে চান না— নিত ত দূরেত কথা। নিয়ম মানিলে অলৌকিক অদ্বুত ক্রিয়া (miracle) বীকার করা চলে না। পুথ্যধর্ম তাহা কতে, কিন্তু খাটনামা পুস্তান পার্কার সাহেব বলেন যে, নিয়ম তিন্ন অলৌকিক বৈব ঘটনা কিছুই নাই এবং তাহাতে তিনি বিশ্বাসও করেন না ("I do not believe that there ever was a miracle, or that there ever can be one, for wherever I look, I only see law"). ডারউইন সাহেব না কি স্রষ্টার কল্পিতাছেন যে, অগমীশ্বর থাকিবার প্রয়োজন নাই। সৃষ্টি আপনা আপনি হইয়াছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বজার রাখিবার প্রমাণ নাই। বাহার প্রমাণ নাই তাহা বিশ্বাস করিবারও প্রয়োজন নাই। প্রমাণগতাব বলিয়া তিনি কি থাকিতে পারেন না? হুত তিনি আছেন এবং মনুষ্যকে এমন জ্ঞান বেন নাই বাস্তব বাস্তব মনুষ্য তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে। তুনি বলিবে যে তিনি মনুষ্যকে এরূপ জ্ঞান না দিয়া অগমীশ্বর হইয়াছেন। যদি তাহা হইয়া থাকেন, তাহাকে 'পিনাল কোর্ডে' শোষণক করিতে পার।

সৃষ্টির আদি নাই, কারণ ইহাতে যে কত কি পরিবর্তন হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এক

আতীত ইতিম হইতে অত আতীত ইতিম উৎপন্ন হওয়া কিছুই বিভিন্ন নয়। এক শ্রেণীর (Natural order) বৃক্ষ হইতে অত শ্রেণীর বৃক্ষ উৎপন্ন না হউক, কিন্তু সেই শ্রেণীরই কোনও প্রকার বিকৃত বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। এক বৃক্ষের একটি ভাল হইতে দুইটি খাঁটি বাহির হইল, তাহা হইতে দুইটি বৃক্ষ জন্মিল, একটির স্রষ্টামত কল হইতে লালিস, কিন্তু অস্ত্রটিতে জটা বাহিল। ডারউইনের মতে, বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল কথা লতা হইলে দেখা যায় যে, নিয়ম সর্বত্র কার্য করিতে পারে নাই। নিয়মের অতিরিক্ত অনেক কার্য হইতেছে। হুতরাং সংসার আপনি হইয়াছে, প্রথমে কেবল পরমাণু ছিল; ক্রমে সকলের ক্রমবিকাশ হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিয়া ডারউইন সাহেবকে শুক বলিয়া মানিতে অনেকের প্রেরিত। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণগতাব বলিয়া অগতঃ অনেকে নাস্তিক। আধার এমন নাস্তিক আছে বাহার বলেন যে, ঈশ্বর কোন মানিব। অনেক সময়ই ত তিনি স্পষ্টিত বস্ত আশ্বাসের বেন না। কিন্তু যখন মনীতে বৌদ্ধাশানি স্বড়ে ও ভুতানে বানচাল হইবার উপক্রম হয়, তখন দুর্বল মানুষ আপনার বা অপর মানুষের শক্তিতে আশ্বা না রাখিয়া, কোনও শক্তির পুরুষকে ডাকিয়া থাকে—

স্তা তিনি দুর্গাই হউন, কালীই হউন—আর যোব। ভোলানাথই হউন। তখন মানুষ কত চরিত্র লুট যানে, কত দিল্লি বিতে চায়; কিন্তু ঠাড়া কাটিয়া গেলে মানুষ সে অসীকার সর্বত্র রক্ষা করে কি না তাহার সঠিক খবর বলিতে পারি না। দুর্বলতা ভাবিয়া—কেহ কেহ যে ঈশ্বর অসীকার রক্ষা হইতে বিরত হন তাহা ভোর করিয়া বলিতে পারা যায়। এরূপ চুক্তি আইন লমত নয়—without consideration বলিয়াও অনেক রক্ষা করেন না।

মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কি না তাহা কলা

বড় কর্তন। তবে যখন এবং বিবাসে নাত্তিক
 এমন লোক বড়ই কম। অনেক নাত্তিক বিপদে
 পড়িয়া ঈশ্বরের শক্তির সহিয়া দ্বয়স্বয় করিয়া
 আত্মিক হন, আবার ঈশ্বর বিধানীকে বিপদে
 পড়িয়া ঘোড়ের মনে ঠাহাকে অবিশ্বাস করিতেও
 দেখা যায়। অবিশ্বাস না করিলেও অনেক
 মূলে ঠাহার ঐতি কতকগুলি দোষারোপ
 করিতে বাধ্য কৃত্তি হয় না। এ সকল
 লোক অত্যন্ত দুর্বলমন। কিন্তু তাহাদের বশকে
 একটা কথা বলিতে পারা যায় যে, শৌর্য্যক ব্যবহারে
 আনন্দা দেখিতে পাই যে, তাহার সহিত অধিক
 আত্মীয়তা থাকে তাহার উপর অধিক দাবী আনন্দা
 করিয়া থাকি। আনন্দের আবদারটাও তাহার
 উপর অধিক পরিমাণে থাকে। ভগবানে তাহাদের
 বিশ্বাস অধিক—শ্রম ও ভক্তি বেনী—তাহারা
 ঠাহার উপর একটু আস্থা, করিলে যে সত্যাক্ষত
 ব্যাপার হইয়া পড়ে তাহা নয়—অশোভন যে এক-
 বায়েই হয় তাহাও বলিতে পারি না। ভালবাসার
 অত্যাচার সহ করে না কে ?

ঈশ্বর দ্বারা করেন তাহা জীবের মঙ্গলের জন্য ভিন্ন
 অবস্থানের জন্য নয় ; হুতরাং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য যদি
 সামান্য কষ্ট সহ করিতে না পারিলাম তবে আমি
 দুর্বল নহি ত কি ? তাহারা ভক্ত সময়ে ঈশ্বর নাই
 বলিয়া থাকে, কিন্তু বিপদের সময় বিশ্বাস ও ভক্তি করে
 তাহাদিগের ও পূর্ণ ইতিহাস অবশ্য করিলে, বোধ
 হয় পাওয়া যায় যে, তাহারা অধিকাংশ মূলে প্রথমে
 বিশেষ পড়িয়াই অবিশ্বাস করিয়া আরম্ভ করিয়াছে।
 আবার দেখা যায় যে, কাহারও কাহারও বিশেষের
 জন্য নাই, একের পর অন্য একট, পর্য্যায় ক্রমে
 উপস্থিত হইতেছে, কাহারও সফল জীবন কষ্টে ও
 বিশেষ অভিকারিত হইতেছে। ইহাতে তাহাদের মস্ত
 ঈশ্বর ভাব্যতের কি বর্ণনা:হাসন পড়িয়া রাখিতে
 ছেন তাহা জানি না। কিন্তু যতদূর এখন দুর্বল
 যে ঠাহাকে পালিপাল্প না করিয়া থাকিতে পারে

না। কিন্তু কি জন্য যে কি হয়, তাহা কি আনন্দের
 জানিবার কোনও উপায় আছে, না জানিবার
 দাখা আছে। হুতরাং বীকার কর কবি গোপ
 মতাই বলিয়াছেন যে—

“—Presume not God to scan,
 The proper study of mankind is man.”

এখন দেখা যাউক ঈশ্বর এ মণ্ডল সংসার কেন
 করিলেন। তিনি মূল পুরুষ মন—বহুপুরুষ বলিলে,
 চারিদিক হইতে হুত দার্শনিকেরা মিল হইয়া
 ‘প্রহরোপ ধনস্বরের’ ব্যবস্থা করিবেন, কাশ শার শষ্ট
 করিয়া নির্দেশ করিয়া বিগাছেন ‘মুখ্য শাঠ্যোষবি’
 তাই দ্বারে পড়িয়া এই মুখ্য ঠাহাকে মূল পুরুষ
 বলিতেছে ; কিন্তু একটা ‘কিন্তু’ থাকিয়া বাইতেছে—
 সত্য কথাটা, আদ্যার ধারণাটা মন পুদিয়া বলি যা
 থাকে বরাতে। তিনি যে ইচ্ছার অধীন, ইচ্ছার
 বশীভূত। ইচ্ছা করিয়াই না নিখিল ভুবন সৃষ্টি
 করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কবি গায়িতাছেন,
 “ইচ্ছা হইল তব, তাহু বিজ্ঞান, যোর দিগন্ত
 বিকাশি।” তিনি প্রবৃত্তির অধীন, হুতরাং কেন
 করিয়া বলি তিনি মূল ! সকল পণ্ডিতেই বলেন
 যে, তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিয়াই এ মণ্ডল সংসার
 সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশেষীয় পণ্ডিতেরাও ঠাহাকে
 ইচ্ছার অধীন বলিয়া বীকার করেন ; কিন্তু সত্য
 যে কি তাহা মোর করিয়া বলিতে পারি না—তিনি
 বহু হউন আর মূল হউন তিনি পুরুষ। আবার
 কেহ কেহ বলেন যে, তিনি আনাতীত পুরুষ ; কেন
 সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আনন্দা জানি না।
 এ কথাই ঐতিবাব করা অতি সহজ। অবশ্যই
 ঠাহার কোন অভিপ্রায় আছে। প্রত্যেক কার্যেরই
 কারণ আছে, ইহা সকল দেশের জ্ঞান শাস্ত্রেই এক-
 বাজ বীকার করে বেরূপ ‘অহি না বেবিধাও কেবল
 মাত্র দুই দেখিয়াই অগ্নির সত্য বীকার করি, সেই-
 রূপ এ মণ্ডল দেখিয়াই বলা যায় যে ইহার কর্তা
 আছে। যখন অভিপ্রায় আছে তখন অবশ্য সেই

অভিপ্রায়েব উপযোগী ইচ্ছা করিয়াছেন, নতুবা অগতঃ
পুত্রের পক্ষে যে পুত্র (eldest) ছিল তাহাই চিত্র-
কাল প্রাপ্ত। তুমি আমি তেহই আসিতাম না,
আর আলিকেও কালী-কলমের লাভ করিয়া আপনা-
দিগকে এই অকিঞ্চিৎকর প্রবল তনাইঠাম না।

যাহাই হউক সেই ইচ্ছাই আমার মতে পুত্র-
এবং পরমার্থই প্রকৃতি। যাহারা পরমাশ্রমে নিযুক্ত
ও উপাধান কারণ বলেন, তাহাদের মত ঠিক। নাস্তি-
কতা ও আশ্রিততা কি সবই ঈশ্বরের দীনা নয় ? *

* অমণেরপুর সাহিত্যপত্রার মতম অধিবপরে পঠিত।

ভুল

(ঐশ্বর্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ)

ভুল বুঝা না প্রিয়া—

চক্ষে যদি পলক পড়ে' তোমার নিরবিধা।
বিনের শেষে বারেক তরে যদিই নাহি হয় —
তুফানভরা দিগন্ত নীরব মধুর পরিচয়;
যদিই শত বোহন রূপের সুককটিকার —
বন্দী আমার ব্যাকুল নহন পথ পুঞ্জ না পায়,
অশ্রু করি কপলা করে দৃষ্টি খানি যদি—
ওই নবনের আভার উজ্জ্বল হইবে নিরবধি।

তুমিই অভিমান—

কেমন ক'রে জানাই বল কেমন যে মোর প্রাণ !
দৃষ্টি মাগে মাগুতে তোনা জ্বর নাহি চায়—
তোমার পূজা বর্তে বহি নিজেত ক্ষুদ্রতায় !
হুঃ এ নয়—অকার্যের অশ্রু করে কেঁপে —
এই বেদনা, আর শ্মশি না পরাপটাকে চেপে !
মরম যাহা মর্মে জানে তাও বোঝাতে হবে ? —
মিলন যদি নাই—বিষয় কেমন ধারা তবে ?

নারীর মন

(গল্প)

[ঐশ্বর্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

এক

ষোড়শী অল্পদিন বিবাহ-অন্তঃকরণে নববধূর
দিকে ফ্যাল ফ্যাল তুরিমা হাকাইতে তাকাইতে
প্রিয়েনন্দনাটের কাহারো গিয়া উঠিল, একথা অগ্রেও
তাহার মনে হয় নাই যে, শনিবারের আরবেদ্য
যাত্রা করার দরুন তাহাকে একটা দত্ত বড় আঘাত
মহু করিতে হইবে। ভাল ছেলে বদিয়া চন্দ্রবিকের
তাহার একটা প্রণয়িতা ছিল এবং সেই 'ভাল'
হৃদয়ার কারণই যে নির্বনের দত্ত তাহাকে একদিন

আশ্বী-পরিজন বিশেষতঃ নববধূ মুহাসের কাছ
হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যাইবে, একথা সে ভিজি
ও অপসানী পাইবার সময়ে কোন মতেই আশঙ্কিত
পারে নাই। কাটকোলে থাও হইয়া এম এ পাশ
করিবার পরই ১৯১৭ একদিন পিতা বদিয়া বগিনেন,
যে ক্রীতদাস বদিয়া না আসিলে এক বিত্তা এক অর্থ
কোনটারই লক্ষ্য লাভ হইবে না, অকণও কি জানি
নেপার কোঁকে সে সময়ে বদিয়া ফেলিয়াছিল যে
তাহাতে তাহার কিছুমান আপত্তি নাই-ই বরং

আগ্রহ-ই যথেষ্ট আছে। এ ‘আজ’ তাহার ‘আশুপ্তি’তে পরিণত হইল সেইদিন—বেদিন নীরব রাতে পত্নীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অকণ পাড়বরে প্রের করিল—

আমাকে এতদিন ছেড়ে থাকতে পারবে? বল
স্বপ্নাস, লক্ষীটী.....

তরুণী এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন প্রাণপণে
জলধাতার মত অক্লান্তকর্ম করিয়া। অক্লান্ত মন
টলিয়া গেল, অক্লান্ত কণোলের উপর পাড়প্রতি
চিহ্ন আঁতরিয়া করিয়া অকণ বলিল,—‘সুখ দুটি কল্প
নু, তারপরই আমার তোমার এমনি করে’—বলিয়া
অকণ তরুণীর গণ্ডে একটী চুম্বন প্রদান
করিল। অকণ বলিতেছিল,—‘জান ত বাহার মন,
স্বপ্নাস!—আর সংসারে তিনি ছাড়া আর কেউই
বে আমার নেই। তাঁর ওই একটী বাসনা, সেটা
পুরণ করা প্রত্যেক সন্তানেরই কি কর্তব্য নয়?
.....ওকি কীকছ? হিঃ, শুধু দুটি বছর আমার
ছেড়ে থাকতে পারবে না? শুধু দুটি—’

মানসভরনের পান। শেষ হইতে-না-হইতেই
কখন যে সকাল হইয়া গিয়াছিল কেহই টের পাইল
না, নির্দোষ কাতের দল বুঝা টেচামেচি করিয়া
মরিতেছিল।

সে আজ পাঁচ ছয় দিন আগের কথা, তাহার
পরেই একদিন প্রাতঃকালে, নিভাত অনিচ্ছার
সহিত অকণকে সুদূর বিলাত-পানী আহায়ে গিয়া
উঠিতে হইল। বাইবার সময়ে স্বপ্নাসের পিতা
বলিলেন—‘দেখো বাবা, চিঠি পত্র দিতে ভুলোনা
বেন, বুকেসে।’

যত্নের পার্শ্ব দণ্ডায়মান অকল্পনীয় সুহাসের
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনীত কণ্ঠে অকণ বলিল—
‘আজ্ঞে, হাঁ।’

হই

সে আজ দুইমাসের কথা, এই দীর্ঘ দুইমাস
অকণের নিকট ছয়টি বৎসরের মতই অদূত

হইয়াছে। রাতে—সমস্ত লগ্নে মনোমগ্নী বসন
বহুতার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিত,—বীরে
বীরে দূর—কোন সে এক দূর আশ্রয়-পরিজন
বৈষ্ণব গৃহের কথা তাহার স্মৃতিপটে আঁসিয়া উঠিত,
তাছাড়া পিতার আজ্ঞা থাকিত, নিজের বিবেক
থাকিত, আর,—আর থাকিত সামান্যকুটিত স্বপ্নাসের
সহজ আনন্দবানি! আবৃত্তি জাকিত অকণ নিদ্রা
ঘাইত।

বিলাতে পৌঁছিয়া প্রথমে অকণের দিনগুলো
কাটিতেছিল মন নয়, প্রাতঃকালে ঘুমা ওঠার
সময়টা হাইড-পার্কের তাহার কাটিত এবং সন্ধ্যা-
বেলা কয়েকখানি ইংরাজী বইয়ের মধ্যে সে
আপনাকে ডুবাইয়া রাখিত, সুখ ওঃখের ভিতর দিয়া
আলো ও অন্ধকারের মধ্যে দিয়া তাহার জীবনবানি
একরূপ চলিয়াই বাইতেছিল। সেদিন রাতেও সে
বাঘোঝোণ দেখিয়া একাকী ফিরিতেছিল, এমন
সময়ে একটী সুন্দরী ভিখারিনী আসিয়া তাহার
পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে তাহার গোটা দুই
তিনটা বাচ্চা শিশু! নির্জন রাতে—সঙ্গী বিহীন
অবস্থায় কে এ সুবতী নারী? অকণের বুকখানি
কাঁপিয়া উঠিল, বলিল, ‘কি চাও তুমি?’

হাতের কাপড়টা সরাইয়া রমণী বাহা দেখাইল,
তাছাড়া সে যে কপার পাঞ্জী, তাহা অকণ এক
নিমেষেই বুঝিয়া গেল, সেবিল তাহার একখানি
হাত-ও নাই। অস্ত্রাভ কথাবার্তার পর অকণ
আনিল যে সংসারে—শুধু সংসারে কেন পৃথিবীতে
হতভাগিনী নারীর আর কেহই নাই। তিনটা
অপদগত রাখিয়া তাহারদের শিতাটির সরিয়া
পড়িয়াছেন। হৃৎকণার বিকলাগ হইয়াছে বিন্দা আর
তাহাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না, তাহার
অবস্থা দেখিয়া অকণের মনে অত্যন্ত ধরা আসিয়া
আঁসিল, হইবে না-ই বা কেন? বিপদা নারী, সঙ্গে
সন্তানশততি! নারীর প্রতি তাহার দয়া। হউক-না-
হউক, যেনগুলির কাতর স্বার্থ মুক দেখিয়া সেও

কাতর হইয়া উঠিল—বলিল, কত হলে তোমাদের একমাস চলে যাবে ?

রানবুধ রমণী বলিল,—‘তার নিশি হ’লে চালাতে পারি বাবু!’

সমস্ত পকেট খুঁজিয়া অরুণের বাহির হইল মোটে, বশ পাউণ্ড। বামা কানড় ক্রয় করিবার অল্প সেরুলা গ্রহণ করিয়া তাহার ঠিকানা লিখিয়া লইল এবং আশাস দিল যে প্রতিমাসে তাহার কুটীরে সে পাঁচ পাউণ্ড যে কোন প্রকারেই হউক, পাঠাইয়া দিবেই। অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে ও এই উপকারের প্রতিশ্রুতি দিতে চেষ্টা করিতে, বলিয়া নারী চলিয়া গেল।

যেথ ফিরিতে এখনও ছয়মাস। হঠাৎ একদিন চারের টেকলে বলিয়া সে একখানি টেলিগ্রাম পাইল, বড় বড় অক্ষরে দেখা—Subas expired. Come Soon—

“Father”

চারের কান পড়িয়া গেল, অরুণ চাতিবিকে অন্ধকার দেখিল, তাহার ব্রহ্মণ আর নাই? এ পৃথিবীতে আর সে তাহাকে পাইবে না, ওগো এ তাহার কি হইল? কেন সে তাহাকে ছাড়িয়া আসিল ?

অরুণের মনে পড়িল আগেকার ডাকে লুহাস লিখিয়াছিল যে মাঝে মাঝে তাহার কুক বড় বাধা হয় এবং কথার তাড়নায় হস্তাঙ্গিনী একদিন সংজ্ঞা ও হুয়াট্টাইয়াছিল, অরুণের বুকখানি কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু ছাপাইয়া বল আসিল, তাহার মৃত্যু-বাণী আজ তাহার কুক যে শেরাখাত করিয়াছে, সে আখাতের কত আত্মবোধহয় তাহার এ স্নোবনে শুকাইবে না, টেলিগ্রাম ছাড়িয়া অরুণ বিছানার তইয়া পড়িল।

দিন

লুহাণের মৃত্যুর ঠিক একমাস পরেই একদিন বৈকালে অরুণ জিনিসপত্র লইয়া ভারত-পানী বাহাজে চড়িয়া বসিল, সঙ্গে সঙ্গে কতপ্রকারের কল্পনা

আসিয়া তাহার অন্তরকে ছাইয়া কেনিল, আত্ম করে বিধা দেখিবে পর তার পুত্র; পুত্রবেশী নাই, এ বাধা সে সঙ্কল্পিত কি করিয়া!

পিতার আদেশ মত মত্তরবাড়ী পৌছিতেই দেখিল বাড়ীটা ঠাকা ঠাকা দেখাইতেছে। লুহাণের ছাড়া সরিয়া যাইলে তাহাতে যেমন একটা কাল মজীর ভাব হু হু করিতে থাকে, চির উৎসবময় এই বাড়ীটাও আজ ঠিক তেমন—বিহবার মত, লাল নাই সন্ধ্যা নাই, অনাদৃত পরিভ্রাতার মতই দেখাইতেছিল। উঠানের রোবাকের উপর বসিয়া তাহার কোঠা তালিকা কুটনা কুটতেছিলেন, অরুণকে দেখিয়াই জননবিমুদিতহুয়ে চোঁকাইয়া উঠিলেন—‘লুহাস যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে অরুণবাবু? আর সে—’ অরুণকে দেখিয়া আরও হুই ভরী চোঁকাইয়া উঠিল, অরুণকল্প পরে অরুণ বলিল—‘বা কোথায় ? বাবা?’

কোঠা তালিকা শোভা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহা বলিল, তাহার সারমর্ম এই, কতটা মৃত্যুর পর হইতেই তাহার প্রায় একরূপ বিধবা। যেসের বাড়ীতে দিন কাটাতেছেন!

দ্বিবিমা বলিলেন,—‘আর বাবা! দুদিনের জেরেই হু যে আমার অনন করে কাঁকি’বেবে, তা কে মান্ত বস?’

শোভা বলিল,—‘হরবার কটা হুই আগের অরুণবাবুর ছবিখানি আঁকড়ে পড়েছিলো।—’

শোভা কোঁপাইতে মূক করিল।

সেদিন সন্ধ্যায় মরেই সে ঘাইতে চাহিল কটে, কিন্তু দ্বিবিমা কিছুতেই ছাড়িলেন না। রাজিটা সেখানে থাকিতেই হইল!

তমু দিবস না, শালীকাতাও তরুণ আবেশ করিল, একটা রাজি বৈত নয়?

আহারে বসিলে দ্বিবিমা বলিলেন,—‘বাসনা লুহাটা দিবে বাও তো দ্বিবি!’

অরুণ জিজ্ঞাসিল, ‘বাসনা কে দ্বিবিমা?’

‘ওমা বাসনাকে আশ্বাসের বেগ নি—না তা আর সেথবে কি করে বল? ও হচ্ছে আশ্বাসের পাশের বাড়ীর মেয়ে! হুহাসের দৃষ্টি বন্ধ ছিল!’

আবার হুহাসের কথা? অরুণ যে ওইটে ভুলিবার লজ্জাই এত চেঁচা করিতেছে!

বাসনা দুধ দিয়া গেল, তাহার স্তন পা চুষিখানি অরুণের দৃষ্টি এড়াইল না!

আহার সমাপ্ত হইলে, অরুণ নির্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিল। মনে মনে আকাশ পাভাল কতই ভাবিত লাগিল, এই বয় হুহাসের, আল সে এ লগৎ হইতে কত দূরে কে, জানে! ওই যে আলনাটি, ওই যে সম্মিত বইগুলি না জানি একদিন কত ক্ষতেরই সহিত হুহাস ওগুলিকে ঠিক ওই স্থানে রাখিয়া রাখিবে, ওই যে ঘেরাঘের উপর শুক ফুলের মালা, উহার কুকেও তাহার প্রিয়তম হুহাসের স্মৃতি এখনও লাগিয়া আছে! এই বয় হুহাসের—ইহার প্রতি ভিক্র প্রতি নিদর্শন, তাহার স্মৃতির সহিত জড়িয়া আছে, কে জানে—

সহসা ঘুট করিয়া একটা শব্দ হইল, বীয়ে বীয়ে বাসনা ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

অরুণও লাকাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—
‘কে?.....’

অপরূপার মত অক্ষুটবরে বাসনা বলিল,—
‘আমি, বাসনা!.....’

‘—বাসনা? আপনি—এত রাতে—’

অরুণ আর বলিতে পারিল না, বিশ্বমনেজে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, তার পর বীয়ে বীয়ে তাহার হাতখানি ধরিয়া কোদলঘরে বলিল—
‘কি, লজ্জা কল্পে? তবে এসেছিলে কেন?—
এস—’বসিয়া প্রবল উত্তেজনার সহিত তাহাকে এরূপ টানিয়া লইতে বাসনাও তাহার হৃদয়ের দুখখানি অরুণের হৃদয়ে বেলোইয়া দিল, হঠাৎ ঘরের বৈদ্যুতিক আলোটা বন্ধ করিয়া জালিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে

একটা ঢাণা হাদির হুহা আনিয়া তাহার কাপে বাজিল।

‘একি তুমি?’—অরুণ দেখিল, এ বাসনা নয়, তাহারই হুহাস! দুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইতেছিল না, অক্ষুটবরে বলিল—‘তুমি না—’

‘—বরে গিয়েছিলুম, কেন?’

‘—সত্যি, এসব কি বল ও?’—বসিয়া অরুণ অবাধ্যনেজে শব্দীয় দুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

নারীর কুকের উপর মাথা রাখিয়া অতিমানকঙ্ক-
ঘরে হুহাস বলিল,—‘তোমার আভেলগণনা ত বেশ,
—পরের মেয়েকে দয়া দেখাবার কি দরকার ছিল,
তা আবার যে সে মেয়ে নয় হুহাসী, বিবাহিত।’

‘বিবাহিত, হুহাসী? এসব কথা তুমি কি বলছো, হুহাস?’

—মাথা হেলাইয়া হুহাস বলিল,—‘আহা, যশাই যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না গো।’ সেই যে ফিলেতে,—‘বাবা সেই লজ্জাই ত বললেন—’

‘বুকের কথা কাকিয়া লইয়া অরুণ বলিল,—‘কি বললেন, মাথা?’

‘—কল্লেন, ছোঁকরা বয়েস,—সেখানে ওরকম ভাবে থাকা মোটেই ভাল নয়!’

অরুণ সত্যসত্যই কিছু বকিতে পারে নাই, কোন বিবাহিত যুগ্মীর প্রতি কৃপা দেখাইয়াছিল কিছুই মনে করিতে পারিল না।

ঘেরাঘের উপর হইতে একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া একটা অংশ দেখাইয়া হাসি হাসি মুখে সহসা বলিল—‘শুভ ত এটা!’

অরুণ পড়িল—‘An Indian student’s charity to a married young lady—’

‘তাহার নীচেই অরুণের নাম।’

হুহাস বুঝাভুঁত দেখাইয়া দ্বিতমুখে বলিল,—
‘কেন? “হার্ডে, ইংলেন্ডের উপর আর দয়া দেখাবে? হুণ করে রইলে যে!’.....

বিন্দিতকণ্ঠে অরুণ বলিল,—‘সেই লজ্জাই বুঝি,—

‘হাঁ, গো, হাঁ, সেই লজ্জাই তোমার কিরিয়ে আনা
হয়েছে।—এ রকম না করলে—’

লুহাসকে তুচ্ছ জড়াইয়া ধরিয়া অরণ বলিল—
‘হাঁ লুহাস ঠিকই করছে, কিন্তু ওটা তো ‘ম্যারেড্’
নয়—ওটা যে ম্যারড্ (বিকলাঙ্গ) ।’

পরদিন সকালেবলা ঘুম ভাঙিলে অরণ দেখিল—
লুহাস বহু পুরোনো উত্তরা গিরাছে ।

গত রাত্রেই সংবাদপত্রটীর দিকে দৃষ্টিপাত
হওয়াতে অরণ আপনাত মনেই একটু হাসিয়া
লইল ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

(পূর্বানুহুতি)

[ত্রিবিপ্রসাদ রায় বি এল]

ঔপন্যাসিকের আট সর্গাপেকা হৃদয় তাই
ক্ষুণ্ণীভূত করে ঔপন্যাসিকের চরিত্র রচনা কৌশলের
ভিত্তর দিয়া,—গুটের ভিত্তর দিয়া নয়। গুটের কথনও
George Eliot, Dickens, Thackeray প্রভৃতি
অপেক্ষা অনেক বিষয়েই বেশী। অতিশয়তার
বিস্তৃতি ও বর্ণনার মাধুর্য্য ও চিত্তাকর্ষক গর বলি-
বার ক্ষমতায় পুরোক্ত তিনজন ঔপন্যাসিকের কেহই
গুটের সমকক্ষ নয়; কিন্তু চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার
কমটা এই তিন জনের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম ছিল
বলিয়া, তাঁহার বান সাহিত্যের, আসরে এই তিন
জনের অনেকটা নীচে। সুতরাং ঔপন্যাস-
সাহিত্যে প্রভিলাসিত করিতে হইলে যে চরিত্রাঙ্কন
কৌশলেই অধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন
একথা কহাই বাহুলা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
উভয়েই এই বিস্ময় দক্ষ-শিল্পী। তবে এবিষয়ে উভ-
য়ের কঙ্গা কৌশলের পার্থক্য বসন্তে বর্ষমান।
চরিত্রের স্বাভাবিকতা ও পূর্ণতা বলায় রাখিয়া
তাঁহার ক্রমোন্নতি বা বিকাশ দেখাইতে পারিলে
চরিত্রপত সৌন্দর্য্যের সঙ্গি করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের
অধিকাংশ চরিত্রেই পূর্ণতা রক্ষিত হইয়াছে। ইহার
স্বাভাবিক চিত্র নয়—একটু অস্বাভাব্য বটে, বঙ্কিমচন্দ্র
সাধারণ বোদ্ধ-জনবিক্ষিপ্ত চরিত্র অপেক্ষা আদর্শ

চরিত্রেই বেশী আঁকিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা
রবীন্দ্রনাথের উপরে বোধহয় প্রাচীরের প্রভাবটা
একটু বেশী মাত্রায় পড়িয়াছে; কিন্তু, এবিষয়ে
বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বেশী পদ্ধতি অধিকমাত্রায়
অনুলমণ করিয়াছেন। সুযোগের সমস্ত
শ্রেষ্ঠ কাব্য, মহাকাব্য ও উপন্যাস অনুসন্ধান করি-
লেও নিশ্চুত আদর্শ চরিত্র খুব কমই দেখা যায়;
কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের কবিতা আদর্শচরিত্র ব্যতীত
অপর কোনও চরিত্রকে নাহক নাহিকা হইবার
উপদ্রুতই মনে করিতেন না। এবিষয়ে তিনি সংস্কৃত
কবিতাগুলোরই শিষ্য। তাঁহার আদর্শ মানবীর
আদর্শ, যোহিনী ও মতিবিবি আদর্শ পানী,
তাঁহার প্রভাণ, তাঁহার সুব্রহ্মনাথ আদর্শ স্বাধীন্যগী-
প্রোদক, তাঁহার গোবিন্দরাম, তৌকীবা আদর্শ কৃত্তর
এবং তাঁহার শান্তি ও শেখী চৌধুরানী আদর্শ সহ-
ধর্ম্মশ্রী। রবীন্দ্রনাথের নায়ক নায়িকার মধ্যে এরূপ
আদর্শচরিত্র খুব কম দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের
সমস্ত চরিত্রের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র নিবিলেশকেই
আদর্শ চরিত্র বলা হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার চরি-
ত্রের অনেকগুলি দুর্বলতায়ই নামান্তর হইয়া গাড়াই-
য়াছে। আদর্শের বেশের আদর্শের ধারণা অভ্রান্ত—
নিবিলেশের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র দিল নাই।

ঐরাণমন্ডল নীতাবেবীকে বনবাস দিয়াছিলেন লোকপাশবাক্যে তুচ্ছ করিতে পারেন নাই বলিয়া, আর বাহাতে সেই লোকপাশবাক্য তাহার সহধর্মিনীকে লক্ষ্য করিতে পারে সমস্ত আনিয়া শুনিয়া নিবিশেষের দৈহি বিষয়ে শত্রুবেগের উচিত হয় নাই। ‘বেদান্ত’ চরিত্রও আদর্শ বটে, কিন্তু তাহাও ভ্রম ও দুর্লভতা পূর্ণ নহে। পোয়ার বিলাস মরল শরীরের মধ্যে শিল্পী অতি সুকৌশলে অনেকখানি দুর্লভতা ছুটাইয়া তুলিয়াছেন। রমণের স্বার্থভাগ অতি উচ্চ; সে যে কমলাচর ভালবাসিয়াও ধর্মের জন্ত, কমলার প্রেমের জন্ত, আপনার প্রেমকে বলি দিয়াছিল; ইহাতে মহত্ব প্রকাশ পায় বটে, তথাপি জয়নাথ ও প্রতাপের স্বার্থভাগের মত ইহাকে আদর্শ বলা যায় না। আবার অপর পক্ষে সম্মানের চরিত্র দেবদাস লালসা অহংকার ও আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বি, তেমনি তাহার চরিত্রে প্রকৃত বীর্য ও স্বদেশ প্রেমিকতার চিহ্ন ও দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দরাম বাতোকী বীর মত তাহাকে স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয় না। তাহার মধ্যে যে পশুত্ব আছে, তাহার পাশে একটা বেবস না হইত, বিরাট নরত্ব বর্তমান রহিয়াছে। আমাদের অনেক সময়ে ঘাঁথা লাগে বুরি সন্ন্যাস দ্বারা বলিতেছে তাহাই নৃত্য, কারণ সে তাঁহার বাক্যের দৃঢ়তায় আত্মনিয়মকে আকর্ষণ করে। মতিবিধি ও রোহিণীর চিত্রে যে লালসার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, বিমলা ও বিনোদিনীর চিত্রেও যে সেই লালসার কতকটা অভাস দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তথাপি এই দুইটা চরিত্রে সে একটা দৃঢ় স্বাভাবিক বোধ, ধর্ম ও সৌন্দর্য্যভূত দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ণোক্ত চরিত্র দুইটাতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিমলা ও বিনোদিনী যে অপরাধী তাহা সত্য; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাবিধাটিক করিতে পারা যায় না, তাহাদের এই পাপের জন্ত দায়ী কে? তাহারা না আর কেহ? রোহিণী পাপ পক্ষে নিমর

হইয়া ছিল, কেবল লালসার ঘোরে ঘুর হইয়া। তাহার চরিত্রে ইহা অংশকো উচ্চ প্রকৃতি আর কিছু দেখা যায় না, আর মতিবিধি আপনার স্বামী নীতিত আকর্ষিতও যে পরপুরুষের স্বভাবান্বিত হইয়া বিলাস প্রোত পা তাহাইয়া দিয়াছেন, সে কেবল আপনার দুর্দমনীয় স্বাভাবিক চরিত্রার্থ করিবার জন্ত। বিমলা কিছু যে পাপের পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে কেবল কতকটা ভ্রম ও স্বামীর প্রতি অভিমানের বশীভূত হইয়া। ধর্ম্মভূত তাহার মন থেকে একেবারে লোপ পায় নাই। সম্মানের অসাধারণ আকর্ষণী শক্তিতে দৃঢ় হইয়া সে তাহাকে কতকটা বেবস বলিয়া ভ্রম করিয়া সে আপনার সর্বনাশের পথ প্রসন্ন করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। তখন তাহার মনে যে একটা বিপুল স্বদেশ-প্রেমের বজ্র প্রবাহিত হইতেছিল, আপনার নারীধর্ম্ম তুলিয়া সেটাকেই সে প্রকৃত ধর্ম বলিয়া ভুল করিতেছিল। এখানে এই নারীধর্ম্ম ও স্বদেশ প্রেমিকতার মধ্যে উপর বিমলা চরিত্রের সমস্ত সমস্তা টুহু নির্ভর করিতেছে। বিনোদিনীর স্বভাবেরও এইরূপ একটা ভাল স্বভাব সংগ্রাম অহরহ চলিতেছিল। লালসা চরিত্রার্থ কহাই তাহার একমাত্র উদ্বেগ ছিল না, মহত্ত্ব তাহার নিকট অনেক আগেই আত্মদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে নাই;—সে আরও একটা উচ্চতর কিছু আশা করিয়াছিল যেটা সে মহত্ত্বের কাছে পায় নাই। বেহাতীর প্রতি তাহার প্রেম শুধু প্রকৃতির তাড়না হইতে উদ্ভূত নয়, বরং কতকটা সৌন্দর্য্য ও শুভাভূত-সঙ্গাত বসিতে পারা যায়। বিনোদিনী দৃঢ় হইয়াছিল বেহাতীর স্তব্ধ, তাহার মহত্ত্বের স্তব্ধতা; তাহার ভালবাসাকে স্তব্ধ বলিতে পারা যায়—ইহা স্বপ্ন বা কামজ নয়। বিনোদিনী চরিত্রের উপলব্ধি করিতে গিয়া কবি অতি নিশ্চয় শিল্পকলার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার আঁট এইখানে সার্থক হইয়াছে। বেহাতী এখন বলিল—

“বহুশ্রু, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে তুমি সংব্রত হইয়া কণা কণা।” বিনোদিনী তাহা শুনিয়া বলিল—“ছি ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিমিত্তা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি ক্রোধোৎসাহ লালিত করিব এ কখন হইতে পারে না। ছি ছি, একথা তুমি সুখে আনিও না।” বেহাতী বলিল, “বিনোদিনী আমি তোমাকে ভালবাসি।” “সেই ভালবাসার অধিকারে আমি একটা একটা মাত্র সর্বাঙ্গ প্রকাশ করিব।” বলিয়া বিনোদিনী ভুক্তি হইয়া বেহাতীর পদাঙ্গুলি চুষন করিল। পায়ের কাছে বসিয়া কহিল, “পঞ্চম্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ লগ্নে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাণ্য নাই। আমি অনেক হুঃ বিদ্যাছি, অনেক হুঃ পাইয়াছি, আমার অনেক শিকা হইয়াছে। সে শিকা যদি ভুলিতাম তবে তোমাকে হীন করিয়া আরও হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আর আমি আবার মাথা ভুলিতে পারিয়াছি—এই ইচ্ছা। আমি ভূমিমাংস করিব না।” বিনোদিনীর এই উক্তি অতি উচ্চ। ইহা আশা-বের মর্ম স্পর্শ করে। বোহিনী বা মতিবিবির দ্বারা সামান্য ইন্দ্রিয়-পরাধনা, আত্মহুঃ নিরতা, চটুল ক্রীলোকের দ্বং দিগা এরূপ কথা বাস্তব হইতে পারে না। ইহা তাহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। তাহার চরিত্রের একদিকের এই উজ্জ্বলতা, আর একদিকের গাঢ় মলিনতা যোটেই অশোভন হয় নাই; শিল্পী-হৃদয়ে তাহার সৌন্দর্য বজায় রাখিয়াছেন। এরূপকালে তাহার সৌন্দর্য বজায় রাখিয়াছেন। এরূপকালে তাহার সৌন্দর্য বজায় রাখিয়াছেন। এরূপকালে তাহার সৌন্দর্য বজায় রাখিয়াছেন।

পূর্বের সমান ও সামাজিক জীবনের ধারা হইতে এখনকার সমাজ ও সমাজ-জীবনের ধারা অনেকটা পৃথক হইয়া গড়িয়াছে। আধুনিক সমাজ ও সামাজিক সমতার ষটপন্থার সঙ্গে সঙ্গে ও মনুষ্য চরিত্রের ষটপন্থাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং কাব্যে নাটো এখন আর আগেকার মত সরল simple type-এর চরিত্র লইয়া নাড়াগোড়া করিলে চলিবে না। এখনকার মনুষ্য চরিত্রে দাসনা ও ভোগভুতির পাশাপাশি এতটা দৃষ্টি সৌন্দর্য্যাসুভূতি, মর্ম্ম বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পূর্বে বড় একটা দেখিতে পাওয়া হইত না। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসই বর্তমান সমাজ লইয়া। তিনি বর্তমান সামাজিক জীবনের এই পরিবর্তনই লক্ষ্য করিয়া সাহিত্যে তাহা হুটাইয়া তুলিয়াছেন। আগেকার সাহিত্যিকেরা তখনকার সামাজিক জীবনে যাহা পাঠ করিতে পারিয়াছেন তাহারই আগোচনা আপন আপন কাব্যে করিয়াছেন। তাই তখনকার শ্রেষ্ঠকাব্যে ‘ম্যাক্বেথ’, ‘হামলেট’ ‘শীর’, ‘ওথেলো’ প্রভৃতি একরোখা চরিত্রগুলি দেখিতে পাই, কিন্তু এখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা আর তাহা নইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। লর্ডে মেরিডথের Egoist উল্লেখ্য ‘Crime and Punishment’ বাহার্য পড়িয়াছেন তাঁহারই এ কথা মর্ম্ম বৃত্তিতে পারিবেন। Egoist-এর মায়ক মতাই egoist কি না, ‘Crime and Punishment’ এর মায়ক খুনি কি দেবতা প্রশংসে শেষ পর্যন্ত আমাদের একটা দিয়া থাকিয়া যায়। আধুনিক সামাজিক জীবনের মনুষ্য চরিত্রের এই যে ষটপন্থা এইই লক্ষ্য আমাদের মনে রবীন্দ্রনাথই এখন সাহিত্যে হুটাইয়া তুলিয়াছেন। সন্দীপ, বিমলা ও বিনোদিনী চরিত্রের উৎপত্তি হইতেই কথাটা বেশ বুঝা যায়। বর্তমানের অধিকাংশ পুস্তকই অতীতের সমাজ, অতীতের ঘটনা লইয়া লিখিত; তাঁহার উপর তাই আগেকার সমাজের চরিত্রই বেশি দেখা যায়। আধুনিক সমাজ

সইয়াও তাহার যে সব পুস্তক লিখিত, তাছাড়াও যে সকল চরিত্র আছে সেগুলি অঙ্কিত করিবার সময়ও তিনি কতকটা আবেগের রীতির অনুগত করিয়াছেন। অল্পে আরও আবেগের কবিসিগের স্তই চরিত্রের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার চরিত্রগুলিও অপেক্ষাকৃত মটল বলিয়া মনে হয়। এই হিসাবে উভয়ের অঙ্কিত চরিত্রগুলিই স্বাভাবিক বলিতে হইবে।

বক্তৃতাগুলির স্তই চরিত্রগুলি সঙ্গী এই হিসাবে যে, তাহাদের মধ্যে একটা সত্যতার জীকনের অভিব্যক্তি আছে; কিন্তু জীকনের যে একটা গণিবেগ আছে, সেটা এই সকল চরিত্রের মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায়; কোন কোনও চরিত্রে নাই বলিলেও চলে। ভাষ্কর বা চিত্রকর যেমন এক সময়ে কোনও একটা মিনিমের কেবলমাত্র একটা বিশেষ দিক্কে আপনাতঃ কোমিত হইতে বা চিত্রে প্রতিফলিত করিতে পারেন, বক্তৃতাগুলিতেও একটা fixed type-এর চরিত্র গড়িয়া আপনাতঃ কাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। একজন চরিত্রকে আমরা fixed বা স্থিতিশীল বলিতে পারি। আরেক, ফিলোজেন, জনর, স্বাধীনতা, ওল্ডমান প্রভৃতি প্রকৃতি কতকটা এই প্রকারের চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব ভাগ চরিত্রের মধ্যেই কিন্তু একটা গণিবেগ আছে, যেটা তাঁহার স্তই সময় চরিত্রেই অত্যন্ত চকল ও তাৎপর্য্যকে 'পতিশীল' করিয়া রাখিয়াছে। এই সময় উপভোগের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়া বনজবের আলোচনাই বোধ হয় মুখ্য কারণ। মানসিক বুদ্ধিনিচয়ের বেগবান ব্যক্তি-প্রতিভা ইত্যাদিগকে এত চকল ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। বক্তৃতাগুলির উপভোগেও সেইরূপ বেগবান মনোভুক্তি সহুইয়া নীলাদিত্য ওরফাভিষ্যত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল মনে তাঁহার স্তই অনেক চরিত্রও বেশ গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। গোরা ও হুচরিত্র চরিত্রের চকলতা ও গতিবেগ বক্তৃতাগুলির কোনও চরিত্রে না থাকিলেও গোবিন্দলাল

ও বৈষ্ণবিনী চরিত্রের আনন্দ অনেক মনি গতিশীলতা দেখিতে পাই। পটের চিত্র ও কাব্যচোপের ছবিতে বেগের পার্থক্য, এই দুই প্রকার চরিত্রের মধ্যেও কতকটা সেই রকমের ব্যবধান বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের কলকৌতব আর একটা বৈষ্ণবিক এই যে, তিনি সময়ে সময়ে কোনও একটা দৃষ্টব ঘটনার উপর-অতিরিক্ত আলোক সম্পাতে আসেন। এবং অন্ধকারের বিচিত্র সামগ্র্য রক্ষা করিয়া আর সময় ঘটনা বা চরিত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করেন। এই রীতিকে ইংরেজীতে impressionism বলে। ইহার উৎপত্তি ফ্রান্সে। ইহা খুব আধুনিক রীতি হুতরাং বক্তৃতাগুলির কাব্যে এরূপ রীতির ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। ফ্রান্সের এবং ইতালির অস্তিত্ব সেনের অনেক বড় বড় সাহিত্যিকেরা আসি কাল অনেক পরেই এই রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। টুর্নেলি, জ্যাকোব, বর্ণন, ভল্টেরি আনাতোলে ফ্রান্স, গুল প্রভৃতি লেখকগণের কাব্যে এই রীতির বিশেষ করিয়া প্রচলন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনেক ছোট গল্পের নানাভাবে এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার বড় উপভোগের মধ্যে 'গোরা' ও 'মঃ'র বাইরেও অনেক স্থানে এই রকমের নানাভাবে আলোক সম্পাতের ফলে অন্ধকার অংশগুলি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গোরা ও মঃ'দের উপর বিভিন্নভাবে আলোক ফেলিয়া রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য চরিত্রকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বক্তৃতাগুলির উপভোগেও এই রকম ভাষার রীতির প্রয়োগ কোথাও না থাকিলেও চরিত্রকে পরিষ্কৃত করিয়া তুলিবার তাঁহার নিম্নের একটা বিশেষ রীতিছিল, তাহার প্রচলন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের অতি তুচ্ছ ঘটনা ও কাব্যের উপর হোম দিয়া অন্তরের কোনও একটা নিগূঢ় ভাবকে প্রকাশ করাই এই রীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। 'আনন্দ মঃ' ও 'দুর্গেশ নন্দিনী' হইতে হুইটা উদাহরণ দিই। জীবনময় জিজ্ঞাসা করি, "তুই যেয়ে দিয়ে কি

কল্পি।" তখন নিবাইয়দি বলিল, "আমি যেহেতুকে
হুখ খাওয়া, ক'লে করে মানুষ করিব—কলতে কলতে
ছাই-শোকার চক্কর জল আবার আসে, আবার
নিমি হাত দিচ্ছি হুছে, আবার হাসে।" (আনন্দমঠ)
আবার তিলোত্তমার বধন বৈশেষ্যর দম্বিত্তে অধঃসিংহকে
কেন্দ্রিয়া মুক্ত হইয়া বাটী আসিলেন, "কখন গড়েন,
কখন ভাবেন, আরবার পড়েন, আরবার মনে ভাবেন;
বাসবদত্তাও ভাল লাগিল না।...পরে নিরুদ্ভা হইয়া
মথ্যার উপর বসিয়া রহিলেন। নিমটে একটা
লেখনী ও মসৌপত্র ছিল; অল্পমনে তাহা লইয়া
পালকের কাছে গিয়া "ক" "ন" "ম" ঘর, ঘর পাছ
নাহুৎ ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে কাটের
একবচ্ কালীর চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল; বধন আর
স্থান নাই, তখন সে বিধবে চেতনা হইল। নিজ কাঁধ
যেখিয়া হঠাৎ হাস্য করিলেন; আবার কি লিখিয়া-
ছেন তাহা হাসিতে হাসিতে পড়িতে লাগিলেন।
কি লিখিয়াছেন? "বাসবদত্তা" "মহাশেতা" "ক"
"ক্ল" "হু" "লু" একটা কুব্ধ স্ফুটের শব্দ, "স্বীত-
গোবিন্দ" "বিমল" লতা পাতা হিজি বিজি, গড়—
সর্বনাশ আর কি লিখিয়াছেন?

"সুখার গৎ সংগে"।

লক্ষ্যায় ডিগেঠমার মুখ রক্তবর্ণ হইল। (দেবপ-
দম্বিত্ত)। এই হুই স্ববে বাহ্য ভাকতলী ও সায়ায়
সায়ায় কাঁধ কলাপের বর্ণনা করিয়া শিল্পী নিবাইয়দি
ও ভিলোত্তমার অস্তরের যে দলীত ভাব হুই হুটাইয়া
ভুলিয়াছেন তাহা অতি স্নেহময়। বহিঃস্থ প্রত্যেক
পুঙ্খকেই মত মতবার এ রীতির আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছেন; এবং এই রীতির সাহায্যে তিনি খীর
স্বীত চরিত্র ভুলিতে অতি সহজেই স্মরণশক্তি করিয়া
ভুলিতে পারিয়াছেন। স্বীকৃত্যাপের কাব্যে যে
এ রীতির প্রয়োগ প্রত্যেকবারেই দেখা যায় নু, তাহা
নহে—অবশ্য বরং হয়। স্বীকৃত্যাপের একটা ছবি
এই যে, তিনি বহিঃস্থের পরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অব-
তরণ করিয়াছেন। চরিত্রক পরিচ্ছিন্ন করিয়া ভুলি-

বার আর একটা কৌশল বহিঃস্থ প্রায়ই তাঁহার
কাব্যে অবলম্বন করিয়াছেন,—সেটা হচ্ছে আর একটা
বিপরীত চরিত্রের সাহায্য লইয়া চরিত্রের বিশেষ
প্রদর্শন। ইংরাজীতে ইহাকে Contrast বলে। একটা
চরিত্রের পার্থক্য, আর একটা বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট চ-
রিত্রকে স্থাপন করিয়া প্রথম চরিত্রটাকে আরও উজ্জ্বল
বা তুচ্ছবর্ণ করিয়া যেখানেই ইহার কাঁধ। এরূপ
কৌশল বহিঃস্থের পূর্বেও প্রচলিত এবং প্রতীচা
উভয় দেশের কবিরাই বহু কাব্যে বহুবার অবলম্বন
করিয়াছেন। 'আনন্দ মঠে' শান্তি চরিত্র কতকটা
কন্যাসীতার বিপরীত জ্ঞান সম্পন্ন; 'সুখারিনীতে' 'সুখা-
সিনী' ও স্নেহময়ী চরিত্র বিপরীত; 'বিষয়ক' সুখ ও
স্বীকৃত্যাপ; 'কপালকুণ্ডলা' মতি বিধি ও কপালকুণ্ডলা
এবং চন্দ্র শেখরে প্রতাপ ও চন্দ্র শেখরের চরিত্র প-
স্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। রবীন্দ্রনাথ ও স্থানে স্থানে
এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, যেমন 'চৌধুর
বালি'তে স্নেহাদিনীর চরিত্র কতকটা আশার বিপরীত,
'গোরা'র বিনয়ের চরিত্র কতকটা গোরা'র উদ্ভা
এবং 'স্বপ্নে বাইরে'তে নিখিলেশের চরিত্র একেবারে
স্বপ্নোপের বিপরীত।

উপজ্ঞানের চরিত্রগুলিকে কিছু বাস্তবিক, পরি-
পূর্ণ ও স্নেহময় করিয়া পড়িতে পারিলেই যে 'স্বপ্নে
চরম পার্থক্য সম্পন্ন করা হয়, এরূপ মনে করা উচিত
নয়। আটের পার্থক্যতার জন্ত উপজ্ঞানের উপযোগী
জ্যেষ্ঠ চরিত্রগুলি এমন হওয়া চাই যাতে মানব
জীবনের হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমস্তগুলি—বাহ্য অস্বাভাবিক
খাদিকা কর্তব্য সম্পাদনে বিয় সন্ধানই থাকে, তাহা
বিস্তৃত, বিস্তারিত ও স্বাভাবিক হইতে পারে।"—
(শ্রীমদ্রামায়ণের ১১শ সর্গ)। সুতরাং দেখা
বাইতেছে যে, উক্ত প্রকার উপজ্ঞানে একটা তরু বা
সমস্তার আলোচনা থাকা চাই। কিন্তু সকল সময়েই
যে ইহা প্রত্যেকের জ্যেষ্ঠ ও ইচ্ছা প্রাপ্য হইবে
তাহা নয়। উপজ্ঞান জীবনেরই অতিবাচ্য। জীবন
কতকগুলি সমস্তাই সমস্ত; সুতরাং জীবনকে

সাহিত্যের মধ্যে বিরাট প্রকাশ করিতে হইলে এই সমস্তগুলি অনেক সময় কবির অজ্ঞাতদ্বারেই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। আবার কোন কোন ও সময় কবি কোন ও একটা বিশেষ ভাবে প্রচার করিবার জন্য, কিংবা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যার আলোচনা করিবার জন্যই একখানা উপজ্ঞান লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবরূপ' 'আনন্দমঠ' 'পীতাম্বরাম', 'দেবী চৌরঙ্গী', রবীন্দ্রনাথের 'পোরা' প্রভৃতি এই শ্রেণীর পুস্তক। এরূপ উদ্দেশ্য বৃদ্ধ উপজ্ঞানের একটা বোঝ হইতে এই যে, উদ্দেশ্যটাই যদি প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠকের কাছে ধরা পড়িয়া থাকে, তবে উপজ্ঞানের সৌন্দর্য্য হানির দৃষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য প্রকৌশলে, চরিত্রগত সৌন্দর্য্য প্রভৃতি রাখিয়াই, চরিত্রের যথা বিরাট আলোচনা সমস্যার অবগতির বা ভাবের প্রচার করিতেই আটকটাই প্রকৃত বিরাট প্রকাশ পায় এবং উপজ্ঞানেরও সৌন্দর্য্য বজায় থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয় এইরূপ অনুসন্ধান। 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌরঙ্গী'র 'পীতাম্বরাম' প্রভৃতি পুস্তকে তিনি গীতা ও দর্শনের অতি প্রশস্ত দৃষ্ট তথ্য লইয়া আলোচনা করিলেও উপজ্ঞানের সৌন্দর্য্য কোথাও একটু বাহত হয় নাই, চরিত্রের স্বাভাবিকতাও সমীকতা কোথাও একটু বিকৃত হয় নাই, গল্পের বহুদূর গতি কোথাও ভাঙ্গাফাঙ্গা বা প্রতিহত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতাও যে এইরূপে নিত্য ক্রম নব তাহা তাঁহার 'পোরা' উপজ্ঞান খানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে যে সকল সমস্যার অবগতির বা প্রকাশ করেন তাহাদের একটা দীর্ঘাংশে কথিত্য বিরাট। 'বিবরূপ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রেম-সমস্যা ও 'পীতাম্বরাম', 'দেবী চৌরঙ্গী', 'আনন্দমঠ' ধর্ম ও কর্ম সমস্যার একটা দীর্ঘাংশ আছে—অর্থাৎ এ দীর্ঘাংশেও গীতার অনুসরণ। রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও পুস্তকে কিন্তু সমস্যার আলোচনা আছে, অর্থাৎ তাহার কোনও দীর্ঘাংশ নাই। তিনি পাঠককেই

তাহার সমাধান করিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। 'যে বাইরে' ও 'চতুর্দশ' এই শ্রেণীর উপজ্ঞান। অনেক ছোট গল্পেও তিনি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই স্থানে আর একটা কথা একটু খানি আলোচনা করা যোগ্য হয় অগ্রাঙ্গিক হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই পেন্থেক পুস্তক তিন খানি লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি যিশু খ্রীষ্টের আলোচনার উদ্দেশ্য ছিলেন, গীতার ভাবে তিনি মনোবৃত্ত। তাঁহার 'বর্ষভর' ও এই পুস্তক তিন খানি একই ক্ষেত্রের। উদাহরণ স্বরূপ গীতার প্রচার চরিত্রের আলোচনা করা হইতে পারে। এই চরিত্রের যথা বিরাট প্রকাশ গীতার এই মহাদ্ভাবিত প্রচার করিয়াছেন; *

"ধার্ম্যতা বিষয়ান পুংসঃ সন্তোষে পরাপতে।

সন্তোষ সংগ্রাহতে কামঃ কামাৎ ক্রোধঃ তিজ্যতে ॥

ক্রোধাৎ ভবতি সন্তোষঃ সন্তোষাৎ স্মৃতিব্রহ্মণঃ।

স্মৃতিব্রহ্মণা চুচিনাশে বুদ্ধিমাশাৎ প্রপত্ততি

ব্রাহ্মণে বিদ্বতঃ সন্তোষাৎ স্মৃতিব্রহ্মণঃ।

আত্মব্রহ্মণি যথাশাস্ত্রাৎ সন্তোষবিদ্বতঃ।"

গীতা, ২ অ; ১২-১৬ স্লোক

'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌরঙ্গী' প্রভৃতি সমস্যার ও পার্থক্য-বর্ষ সমস্যা অনেক বিভিন্ন ভাবে আলোচনা আছে। কর্মের কর্ম নিত্যম্ ভাবে করাই যে ধর্ম, ইহাই বোধ হয় দেবীচৌরঙ্গীর মূলতথ্য। এরূপে প্রচার প্রেরণকে সমাধান করিয়া বলিতেছেন—

"এখন এস, প্রভু! একবার সোফাসের দাঁড়াও—আমরা তোমার দেখি। একবার এই সমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বস দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাবা বাজ। কতবার আদিমিহি, তোমরা আমায় ভুলিলাদিহি, তাই আমার আদিম্য—

* পরিজ্ঞানায় সাধনাঃ বিনাশাৎ চ গুহ্যতঃ।

বর্ষলংঘনান্যায় সমস্যায় যুগে যুগে ॥"

বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় এই তথ্যই উপজ্ঞানের

আর্টের কথা বিদ্যা প্রকাশ করিবার চেষ্টাই দেখাচোঁব—
বাকী নির্বিঘ্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও যে হিন্দু ধর্ম ও
সমাজতত্ত্বের সমস্ত ও ভূটল সমস্ত ভূমি লইয়া তাহার
উপজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে কোনও
সন্দেহ নাই। 'নৌকা ভুলিতে' তিনি বৈষ্ণব ধর্মের
একটা জিহ্ব তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দু
ধর্মী জীবন মধ্যে যে মধুর রহস্যময় সমস্ত বর্তমান এটা
তাহারই ব্যাখ্যা। কদম্বা, রমেশকে আপনার স্বামী
বলিয়া ভালবাসিতে আরম্ভ করিল কিন্তু যে মুহূর্তে সে
জানিতে পারিল রমেশ তাহার স্বামী নন, সেই মুহূর্তে
সে তাহার ভালবাসা ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়া-
ছিল, কারণ সে ত রমেশকে, ভাল বাসিয়াও তাহার
স্বামীকে ভালবাসিয়াছিল; তিনি ত আর কোনও
শক্তি নন। "স্বয়ং বাইরে"তে তিনি যে সন্দীপণ
নিবেশে চলিতে আরম্ভ হইয়া রূপ দেখাইয়াছেন—
একটা বাইরের আশ্রয়িতা আর একটা ভিতরের
নোহাঙ্কণ—এটাও হিন্দুধর্মের তত্ত্ব। গোরাতেও
তিনি যে সমাজধর্ম ও বর্ণশ্রম ধর্মের বিচার করিয়া
ছেন তাহাও সুগভীর হিন্দুধর্মের ভাবেরই অঙ্গ প্রাণিত
হইয়াই করিয়াছেন তবে তিনি এখানে হিন্দুধর্মটাকে
সদীর্ণ বিধি নিবেশ প্রযুক্তিত হীনতা ও দুর্জলতার
দিক থেকে না দেখিয়া উদারতা ও বিশালতার দিকে
দেখিয়াছেন এই বার প্রত্যেক। তাহার ধর্মসুভূতির
ভিত্তি শীতা বা উপনিষদের উপর স্থাপিত নয়।
এ সম্বন্ধে তাহার নিজের কথা তুলিয়া দিতেছি :

"আমরা বাইরের শার থেকে যে ধর্ম পাই সে
কখনোই আমার ধর্ম হইতে উঠে না। তার সঙ্গে
কেবল মাত্র একটা অভ্যাসের বোধ্য আছে। ধর্মকে
নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই চিরকালের সাধনা
বা যুগে কালি, যা লোকের যুগে শুনে প্রোতাহ আকৃতি
কলি তা আমার পক্ষে কতই বিধা। তা আমার যুগেও
পারিলে। এমিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে
নিজের সত্যের বন্ধির প্রতিদিন একট একট হুট নিয়ে
গড়ে তুলতে" "সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে যুগ

একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সমীচ সন্দর্ভ আছে
.....সেই প্রীতি, সেই আত্মীয়মাতৃকেই.....আমি
স্বার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্মবলে জান এবং অনুভব করি।
এ ছাড়া অন্যত্র বা কিছু dogma আছে যা আমি
কিছু জানিনে এবং বুঝিনে এবং বোঝবার সত্যাবনা
হেতিনে তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হইনে।"
এই তবু তাহার শিল্পের মধ্য দিয়া—তাঁহার কাব্যে,
তাঁহার নাট্যে ও তাঁহার উপজ্ঞানে প্রকাশ করিবার
প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি dogmas ও গোড়ামির
সমর্থক নন সত্য; কিন্তু তিনি কেবল মাত্র
আর্টের স্বাধীনতা, কোন উদারতার দোহাই দিয়া
কোথাও সমাজ ও ধর্মের বিধি নিবেশকে উল্লেখ
করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ কেবল মানিতেন না, স্বাধা
আছে তাহাই বেশ আছে এবং স্বাধীনতা—পরিষ্কর্তন
অনাবশ্যক। কিন্তু তিনি জানিতেন যে সমাজে
এইরূপ একটা পরিবর্তনের প্রচার করিলেই সমাজের
উন্নতিসাধন করা হয় না। তিনি বুঝিতেন যে
সমাজকে সুশাসিত রাখিবার জন্য কতকগুলো বিধি
নিষেধেরও প্রয়োজন আছে, এবং সমাজকে সুস্থ
রাখিতে গেলে, সকল সময়ে অসুস্থতার নীতির প্রচার
সাহিত্যে করা চলে না। তিনি ইহাও জানিতেন
সমাজের এইরূপ বৈজ্ঞানিকত্বের প্রচারে সাহিত্যের
আর্টের সার্থকতা হয় না; তাই তিনি
বিনোদিনী-বেলাতীর বিলম্ব ঘটান নাই, তাই তিনি
গোরাতে তাহার আশ্রয় হইতে ব্রতী হইতে যেন নাই,
তাই তিনি বিন্দার আশ্রয়-অনুধাবন ও অনুভূতপের
এক সন্দীপের বিকলতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

আর একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার
করিব। এই দুই জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আর্টের
প্রকৃতিগত আর একটা পার্থক্য আছে। বহিঃকল্পের
আর্টকে আমরা romantic বা আদর্শমূলক আর্ট ও
রবীন্দ্রনাথের আর্টকে realistic বা বাস্তব আর্ট বলিতে
পারি। বহিঃকল্পে যখন উপজ্ঞান নির্দিষ্টতার জন্য আশ-
বের বেশের সাহিত্য কেবল অবতীর্ণ হন, তখন সেটা

অল্প কোনও বেশে না হউক বরং বেশে রোমান্সের
 মূগ ছিল। আর এখনকার মূগটা একবারে বাস্তবের
 মূগ। উপভাস-সাহিত্যের তখন আমাধের বেশে শিশু-
 মূগ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আর তিনি
 ইহা পাইয়াছেন প্রতীচা সাহিত্য হইতে। অতঃপর
 তাঁহার উপর যে Scott, Dickens ও Shakespeare
 প্রভৃতির প্রভাব একটু বেশী ছিল, প্রত্যেক ভাবেই
 হউক আর পরেকভাবে হউক, সে কথা বলাই বাহুল্য।
 যাহাও তিনি আপনি হিন্দুর বাস্তবতা ও বর্ণন-বোধে
 আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং এই
 বৈদেশিক প্রভাবটাকে আপনাতঃ ব্যক্তির অর্থে
 গলাইয়া বাস্তবীর জাতীয়তায় রঙে রঙিন করিয়া
 লইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তখনও
 বাস্তবীর বাস্তবতাবোধ ততটা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে
 নাই; অতঃপর তাঁহার উপভাসে বাস্তবীর ধরার
 কথা ততটা সহজ অভিযুক্তি লাভ করিতে পারে
 নাই, ততটা পারিগ্রাহ্যে এই বাস্তব মূগে রবীন্দ্রনাথের
 উপভাস পড়ে। এখনকার দিনে যে মৌল্য,
 ইন্সেন, মেটারলিচ প্রভৃতি বিদেশী লেখকদের
 প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়ে নাই একথা বলা
 যায় না, কিন্তু যাহা পড়িয়াছে তাহা ব্যক্তিগত ও
 জাতীয়তাকে অতিক্রম করিয়া বাইতে পারে নাই।
 বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-প্রণালীর মূলে সেইজন্য এই রোমান্সের
 প্রভাবটা বুঝি বেশী। তাঁহার পুস্তকের যে সব ঘটনা
 একটু অসাধারণ, সেগুলার মধ্যেও রোমান্স আছেই,
 তা ছাড়া যে সকল কাব্যের ব্যাপারই হইতেছে অতি-
 প্রাকৃত বিবরণ সেগুলার মধ্যেও যথেষ্ট রোমান্স আছে।
 তাই তাঁহার উপভাসে ‘আমহত্যা’, ‘পুনঃপুনী’
 ‘পুনঃজীবন প্রাপ্তি’, ‘বনবর্শন’, ‘প্রণবের প্রতিশোধ’ ও
 এত ছাড়াছাড়ি। যেমন ‘কুককাস্তের উইল’ রোহি-
 নীর উইল চুতি, রোহিনীর বাক্যের মূলে আমহত্যা
 চেষ্টা, গোবিন্দলালের রোহিনীকে হত্যাকরণ,
 ‘রজনী’তে রজনীর দূরীভাৱ; ‘বিবৃদ্ধক’ কুম্বের বন

দর্শন প্রভৃতি চুতি চুতি ব্যাপার আছে, যেখানে
 বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের মাথা ভাগ করিতে পারেন
 নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রণালী কিন্তু ঠিক ইহার
 বিপরীত। তাঁহার ‘চোখের বাগি’, ‘নৌকাডুবি’
 ‘গোরা’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘চক্ৰবর্তী’ ও ছোট গল্পগুলি
 পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, সেগুলি আধুনিক
 প্রতীতিগত জীবনের অতি পরিচিত ঘটনাই চিত্র।
 সত্যকটে তাঁহার ‘বোঁ ঠাকুরাণীর হাট’, ‘রাজবি’ ও
 ‘নৌকাডুবি’র ই এক গায়েগায় একটু আধটু রোমা-
 ন্টিকের ছাপ (touch) আছে; কিন্তু বাস্তবের উপর
 প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগত মূল অবলম্বনটির ভূগনাঃ নিত্য
 সত্য। ‘গোরা’, ‘বিনয়’ ও মহাশয়ের চরিত্র আধুনিক
 বাস্তবীর গৃহে বিদ্যমান নহে, ‘চোখের বাগি’র ঘটনা
 আমাধের কাছে পূর্ব বাস্তব বলিয়া মনে হয়, হিন্দু-
 ধর্মীয় চিত্র আমরা চোখের উপর সত্য সত্য দেখিতে
 পাই। কিন্তু রোহিনী-গোবিন্দলালের ব্যাপারে ও
 কুম্ব-সুর্ভাবীর চিত্রে যে একটা ঘোরান রোমান্সের
 ভাব আছে, যাহার জন্য উহাধিককে আমরা
 ঠিক আমাধেরই একজন মনে করিতে পারি
 না। কিন্তু ‘চোখের বাগি’ অথবা ‘ঘরে বাইরে’র
 বাস্তব আট আমাধের ভূগাইয়া দেয় না যে, আমরা
 সত্য ঘটনার মধ্যে নাই—উপভাসে পড়িতেছি মাত্র।
 আমরা মনে করি যে, আমরা এই সব ঘটনার মধ্যেই
 বিচরণ করিতেছি এবং এই সকল উপভাসের নায়ক
 নায়িকারা আমাদেরই আত্মীয় স্বজন। এই জন্য
 এই সকল উপভাসের খেঁচু কুম্ব তাহার প্রভাবে
 আমরা শিরই অর্জিত হইয়া পড়ি। আমরা
 মনে হয় এই জন্যই ‘চোখের বাগি’ অথবা ‘ঘরে
 বাইরে’র অপকীর্তি ‘কুককাস্তের উইল’ অথবা
 ‘বিবৃদ্ধক’র অপেক্ষা বেশী; নতুবা মূলে বোধ হয়
 পুরোক্ত পুস্তকখয়ের পাপচিত্রের নরতা শোথোক্ত
 পুস্তকখয়ের অপেক্ষা কিছু বেশী নহে।

ফাগুন আগুনে

(জিনীলা বেবী)

ডাক্ছে কোকিল ডাক্ছে না !

মাথবীর ওই মধুর ক্লক

হাজার অলি খাক্ছে না !

কুল কোটা ওই কামিনী,

জাগ্ছে সারা যামিনী ;

চাঁদের কিরণ পাতাঘরে

মক্ছে ডুবে মক্ছে না !

মালেকর ওই মহারী

স্বর্ণ মেঘের রঙ ভরী

বসন্তের এই উদ্ভাবনায়

মাতৃক্ ডুবন মাতৃক্ না !

সাঁকের আকাশ নয়নে

খাক্ছে চেয়ে লয়ে

জাগ্ছে লবি আকুল বাঘা

কাঁচক্ পরাগ কাঁচক্ না !

ডাক্ছে কোকিল ডাক্ছে না !

তরুর ক্কে লসিত লতা

সোহাগ ভরে ফুলক্ না !

খক্লে বনের সুবাসে

লগ্ছে ভূগল উষাসে

মধুপ ও সে মলিকারে

হাজার চুম্বত্ চুম্বক্ না !

পাপন করা কাণ্ডনে,

আনন্দের এই আগুনে

মোহই জ্বল পুড়বে না ধর

কতি কি তার পুড়ক্ না !

যুষ্কল আসান

(গল্প)

[জিঅলয়কুমার সেন]

আমার বয়স এখন ষাট, তখন পিতা আমাকে অকালে শিক্ছীন করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন ; - আর রাধিকা গেলেন আমার কাছে ও তাঁর —একমাত্র বিধবা, অনাথা ও আমার শোকবীর্ণা মাকে ।

মার আশ্রয়ে লালিত পালিত হইয়া আমি এতটা বড় হইয়া উঠিয়াছি । বাবার মৃত্যুর পর, যা অনভ্যাস্য হইয়া তাঁহার ভাইএর বাড়ীতে আনিয়া উঠিলেন । মাঝা ও বাবী আমাদিগকে সাগরেই গ্রহণ করিলেন । আমি মাঝা ও বাবির অপরিচীত

মেহে ও স্বর্গে বাবার অশ্রাব এক বিশ্ব ও ব্রহ্মতে পারিলাম না ।

আমার অন্তঃকরণের মধ্যে ঘেঁহু মেহের অমির-ভাস্তার ছিল, তাহা আমাকে নিঃশেষ করিয়া দিয়া ছিলেন ; কারণ তাঁহার কোন ও সম্ভান ছিল না । মায়ীবার ও আমি একমাত্র মেহের শূত্র সিংহাসন দখল করিয়া বলিলাম—তিনি ও আমাকে মেহের অংশ দিতে কোন দিনই কার্ণাণ করেন নাই ।

বাগাই হটক, তাঁহাদিগের স্বর্গ ও আশ্রয়ে আমি নাথাকি হইতে সাবানকে আনিয়া পৌছলাম ।

দেখিতে দেখিতে আমি ফুল ও কলমের পড়া শেষ করিয়া এম এ ডিগ্রী লইয়া বাজীতে আসিয়া বসিলাম। মার মুখ আনন্দে ও গর্জে মন হাত ফুলিয়া উঠিল।

দিনকতক বাজীতে বসিয়া থাকিয়া, আমার মন শিঞ্জরাবদ্ধ পানীর ভাষা ঢেগ হইয়া উঠিল। আমি স্থির করিলাম যে, একটা সুবিধা হইলেই বাহির হইয়া পড়িব। কিন্তু যখনই বাহির হইবার উপক্রম করি, তখনই মার মুখ চোখের সামনে জন্ম করে ফুটে উঠে, আমার সকল সঙ্কল্পকে অতল অন্তে ডুবাইয়া দিত।

হঠাৎ একদিন অনিলাম আমার বিবাহের কথা। এতদিন পাঠে পড়ার ভাবে মন ছিগান বলিয়া বাহিরের কোন ও নিবন্ধ-বন্ধন অনুভব করিতে পারি নাই। তবে সহসা একদিন “নির্বন্ধের মন তখন” হইল—তখন আমার মনের অবস্থা হইল—

“আমি ঢালিব কল্যাণ-ধারা,
আমি ঢালিব পাখা-কাটা,
আমি অগ্ন্যবাসিরা ডোব সাহিয়া
আত্মন পাগল পায়া।

কেশ এলাইয়া ফুল ফুড়াইয়া,
সামুদ্র আঁবা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিশের পরাণ ঢালি।”

শিবর হইতে শিবের স্তুতিব,
কৃষ্ণর হইতে ভূধরের স্তুতিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,

ডালে ডালে দিব ডালি।”

যখন মনের ঊপর দিয়া মনস্তত্ত্ব হাওয়া বহিতেছিল, তখন নতনবের মাদকভাষা সোমাস্থের উপলব্ধি হইয়া পড়িলাম।

একদিন আমি আমার গড়িবার ক্ষেত্রে একটি কইএ এরপভাবে মন ছিগান যে, মা যে কখন আমার পাশে আসিয়া গাড়াইয়া আছেন—সে খেয়াল ও

আমার এতবারেই ছিল না! হঠাৎ মাকে আমার পাশে গাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি চকিতে বলিলাম, “কি যবন যা?”

একটি বর্ধ-নিঃশব্দ ছাড়িয়া মা বলিলেন, “কি আর যবন বাছা—তোরা মামোমা খেলছিল যে তোরা একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা যাক।”

আমার তখনকার মানসিক অবস্থায় আত্মকোন উত্তর দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়াই রহিলাম।

আমাকে নিকন্তর থাকিতে দেখিয়া, মা চলিয়া গেলেন—বুঝিলেন আমার সম্পূর্ণ লুপ্তি আছে।

দিন দুই পরে সহসা মা আসিয়া বলিলেন, “ওরে, তোরা একটা বিয়ের সঙ্কল্প স্থির হয়েছে—যেঁর ঘামা ত বেতে পাড়ছে না আকিলের কণ্ঠের বরফ—তবে মা হয় তুইই বা’ মেখে শুনে আয়।”

কথাটা বলিয়া তিনি আমার উত্তরের আশায় রহিলেন। আমি কিছু উত্তর না দিয়া নীরব রহিলাম দেখিয়া, মা পুনরায় কহিলেন, “ভাল কোরে সব দেখে শুনে আসবি—সুখি ত?”

হাসিয়া বলিলাম, “মা, তুমিই না হয় আমার এমলে বাও না—দেখে শুনে আদবে?”

“সে কি হয় তৈ, তা যদি হোত, তবে কি আর তেকে বলি?” এই বলিয়া তিনি বিম্বিত-মুখে চলিয়া গেলেন।

তারপর অসত্য আশাকেই হাইতে হইল। ভাল দিন স্নপ দেখিয়া মাতার আশীর্বাদ মাথায় লইয়া আমি আবার তীব্র পড়ার উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠাভাতি-মুখে যাত্রা করিলাম। আমার একটা মনে মনে সন্দেহ ছিল যে, বিবাহটাকে একটা রোমান্স করিয়া তুলিব। কি করিয়া যে, এইরূপ করিব—তাহার সঙ্গ আমাকে কি ক্রম বাড়িতে হইয়াছে? পড়া-বইয়ের কোন পাতার একটা বিভিন্ন রকমের বিবাহের ঘটনা লেখা নাই; বাহ্যিক আ-অনুভব, কল্পিত পারি? বাহ্যিক হইক, আমি নিজেই একটা মতলব

বাহির করিয়া লইব কির করিলাম। এই সব তা'বরা টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম।

গাড়ী আট বশটা ষ্টেশন পার হইয়া, হঠাৎ একটু ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। আমি বেঁকেতে লম্বা হইয়া পড়িয়াছিলাম। লম্বা বেন আমি শুনিতে পাইলাম, “এই গাড়ীতে যাত্রা আছে কিন্তু সকলেই এক একটা বেঁক লম্বা করে গুয়ে আছে—কি যে করি?”

এই সব সময় লোকের নৈরাশ্রের বর শুনিয়া আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। তথাপি আমি চুপটি করিয়া পড়িয়া, রহিলাম। কেন বাবা, বেশী লোক ডেকে নিজের ঘুমটাকে নাট করি? কিন্তু এখন ঘোঁষে যে কোঁড়া কোঁড়ি করিয়া ও কোন স্থান পাইতেছেন না, তখন না হয় ঘোঁষা ধাবে? এই সব শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় পুনরায় তরুণ-কণ্ঠে উত্তর হইল, “এই গাড়ীতে না হয় উঠুন—ধাড়িয়েই যাব?”

আমি আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। তড়াক করিয়া বেঁকি হইতে উঠিয়া পড়িয়া একলাকে গাড়ীর লম্বায় নিকটে আসিয়া ধাক্কা-কণ্ঠে কহিলাম, “কেন অন্ত কষ্ট কোরছেন মশায়—এই গাড়ীতেও কখনো স্থান আছে—উঠুন না?” কথাটা বলিয়া আমি গাড়ীর লম্বাট অতিক্রম করিয়া গিয়া বসিলাম।

হঠাৎ আমার মতন অপরিচিতের মুখ হইতে এই প্রকারের আশা-বাণী শুনিয়া, ভ্রমলোকটি লম্বায় আমার লম্বার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

আমি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, “যদি এই গাড়ীতেই যেতে চান ত উঠে পড়ুন—নচেৎ মহা-দুর্ভিক্ষে পোড়বেন?”

আমার কথা শুনিয়া সেই তরুণ-কণ্ঠ আবার বলিয়া উঠিল, “এই গাড়ীতেই না হয় উঠুন না কেন?”

ভ্রমলোকটি কোন প্রকারের উত্তর না করিয়া,

আমাকে কখনো লম্বা দিয়া বলিলেন, “আজ্ঞা মশায়, আপনাদের গাড়ীতেই না হয় উঠি?”

ঐহৎ হাসিয়া বলিলাম, “বেশ ত?”

সকলকে গাড়ীর ভিতর উঠাইয়া দিয়া, আমি আমার বিছানাটিকে শুটাইয়া লইয়া বসিলাম, “মশায়, তাঁদের প্রথমে বোসতে বলুন।”

আমার দিকে বিশ্রাম-পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া, ভ্রমলোকটি অন্তর বিনয়ের সহিত বলিলেন, “সেহকালে আপনাদের স্থানটা পর্যন্ত লম্বা কোরে বোসতে হবে—এটা যেন কি লক্ষ্য……”

ভ্রমলোকটির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আমি বলিলাম, “তা’ হোক—আপনি আগে ঐদের বোসতে বলুন! তারপর আমাদের বাহর হবে?”

ভ্রমলোকটির সহিত ধারা ধারা ছিলেন, আমার স্থানটিতে আসিয়া বসিল; আমি অল্প একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিলাম, “আমুন, আমরা ও এইখানে বসি।”

হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, “আপনি দেখছি নেহাৎই কামাখ্যের লক্ষ্য কষ্ট কোরবেন?”

প্রহ্লাদের বলিলাম, “এ আর কি এমন কষ্ট হোল?”

বিনীত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “না’ মশায়, এমন কষ্ট কেউ নিজে খাঁটার কছতে চায় না—যেমনটি আপনি……”

কথাটা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইলাম। কোন-রূপ উত্তর না দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?”

ভ্রমলোকটি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আর যখন বলেন কেন—আমার ঐ যে মেয়েটিকে দেখছেন—ওর একটা লম্বা দিই যাচ্ছে—তা’ই লম্বা তা’হাছি।”

পিতার কথাই শোনার মতন গল তক্তিম হইয়া উঠিল। সে লজ্জিত হইয়া মুখটা অপর পাশে ফিরাইয়া লইল।

ভ্রমলোকটির বিকে চাষিয়া বলিলাম, “যা বোলেছেন মশায়, আত্মকাল ফেরেদের বিবাহ সেওরা একটা সমতার বিষয় হোরে ঠাঙ্কিরেছে।”

সংক্ষেপে উত্তর দিয়া তিনি বলিলেন, “যা বোলেছেন মশায়! সামাজিক উৎসাহিতেন বেশ ছাত্রেবারে যাকর মশায় এসেছে!”

আর কোন প্রকারের প্রশ্ন না করিয়া চুপটি করিয়া আপন মনে বসিয়া বসিয়া জাবিতে লাগিলাম—যদি ঐ মেয়েটির সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয় তা’ হোলে কিন্তু ক’ মজা হবে বেখুঁতে পাছি? কারন আমি যাছি যেহে বেখুঁতে—যদিই এই মেয়েটিই হয়! আর ভাবিতে পারিলাম না। আনন্দে বুড়টা হুলিয়া উঠিল।

সহসা ভ্রমলোকটি বলিলেন, “আপনি কি কলকাতায় বাচ্ছেন?”

বলিলাম, “হ্যাঁ।”

“কলকাতায় কি আপনারাের বাড়ী—না অস্ত কোন কালে বাচ্ছেন?”

“না, নিজেই কাখে।”

আমাদের কথোপকথনের মধ্য হইতে আমি এক একবার সেই মেয়েটির বিকে চকম-বুড়িতে চাষিয়া দেখিচ্ছেলাম যে, মেয়েটি আমাদের কথা মনে-বোদনবকারে শুনিতেছিল।

বেশিতে বেশিতে অন্ধকারের মধ্যেই ভ্রমলোক-টির সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা বোধিয়া গেল। আমার বিকে ভাকাইয়া নিঃশব্দে তিনি বলিলেন, “একটা কথা কি আপনারকে বোলেতে পারি?”

কাল নিশব্দ না করিয়াই যাত্র হইয়াই বলিলাম, “কি কথা বলুন?”

“বেখুন আমি কায়েদের সন্তান—মেয়েদের বিবাহ নেওদা কি যে কঠিন ব্যাপার তাও বুঝতেই পাচ্ছেন?”

এই প্রকারের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে হির করিলাম যে, হয়ত আমাকেই বলিবেন—একটা পায়

হির করিয়া দিতে। কিন্তু পরক্ষণেই আমি তাহাকে সহায়ত্বভূতি-শূণ-কণ্ঠে বলিলাম, “আপনি অস্ত ভাবছেন কেন—যখন হবার হবে, তখন কোথা থেকে যে কি রকমে হোবে যাবে—তা আপনি আকৃতও পারবেন না।”

এই কথা শুনিয়া ভ্রমলোকটি আমার মুখের বিকে ফাল ফাল করিয়া চাষিয়া রহিলেন। আমি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়াই বলিলাম, “ছেলেটি কি করে?”

“তা ত ঠিক জানি না—তবে আমার এক আত্মীয় কলকাতায় আছেন—তাই যাছি; এখন ভালর ভালর যা হোক একটা কিছু হোবে গেলে হয়?” কথাটা বলিয়া তিনি নীরব হইয়া রহিলেন।

কি অস্ত জানি না একটু হতাশ হইয়াই বলিলাম, “সে অস্ত কি—হোবে যাবে।”

এই কথা কহুট বলিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, মেয়েটিও বেশিতে অনন্তস্বপ্নী। এত ক’ রঙ্গসায় বিবাহ হয় না? বালিকাকে বেশিয়াই ত আমি হুঁ হইয়া পড়িয়াছি। অতি বিশ্ববশূর্ণ প্রস্তাবটা কি করে তুলি। তরসার মধ্যে আমরা উদ্ভূতই কায়ে। তবে কথাটা পাড়ি কি করে?

উপায় হির করিবার মস্ত সাত পাচ ভাবিতেছি; এমন সময় একটা বড় ঠেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। আমিও এই কাকে একটা হির নিঃশব্দ ছাড়িয়া নিজেই একটু হাফা করিয়া লইলাম।

ভ্রমলোকটি আমার বিকে চাষিয়া মুখ হাসিয়া বলিলেন, “আপনার নামটা কি তা………?”

তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম, “আমার নাম ঐকবির কুমার সেন নিবাস হীরাপুর—ঢাকা জেলা।”

আমার পরিচয় পাইয়া তিনি উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, “আপনি কি মনের মায়েকে চেনেন?”

“নিশ্চয়ই চিনি—তিনি যে আমার ভগিনীপতি।”

“ওঃ—তাই নাকি—তা বেশ—বেশ—বেশ।”

এই বলিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

এইটা এখন জানাশুনা হইয়া গেল; তখন আমার যেন কেমন একটু বাধ বাধ প্রকৃতিতে লাগিল। একবার মনে হইল—পুর ছাই—বাক্সে—দেখতে হাচ্ছি; তাতেই ভালর ভালব দেখে আসি।

এই রকমের এলোমেলো চিন্তা করিতেছি, এমন ভ্রমর সেই ভ্রমরকেই আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, “পবিত্রবার, এখানে গাড়ী বোধ হয় কিছুকণ থাকে—না?”

“বোধ হয় থাকে, কারণ এটা যে ভাসন ট্রেন।”

আমার পিঠেতে মুহূর্ণ করিয়া নির-কণ্ঠে বলিলেন, “একবার বাইরে আসতে পারবেন কি?”

এইরূপ কথাতে আমার বুটাটা হঠাৎ যেন ছাঁৎ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমি থমতন হইয়া বলিলাম, “বিশেষ কিছু বলবার আছে—তা বলুন।”

এই বলিয়া তিনি আমাকে স্ট্রাটফোর্ডের উপর একটা গাছের তলায় লইয়া গিয়া নিম্ন-ভিত্ত-কণ্ঠে বলিলেন, “পবিত্রবার, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কোর—তাতে আপনি কি.....”

হাসিয়া বলিলাম, “আপনি বলুন না কি কথা?”

“কথাটা কি জানেন?”—বলিয়া তিনি আমাকে উদ্দেশ্য-পূর্ণ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, “পবিত্রবার, আপনি কি অবিবাহিত—না.....”

কথার উত্তর দিয়া বলিলাম, “আমি এখনও পরিত্যক্ত অবিবাহিত, তবে.....”

উদ্ভিষ্ট-চিত্তে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “তবে কি?”

অগত্যা আমাকে বলিতে হইল, “আমিও পাত্রী দেখতে হাচ্ছি।”

“কির মত?”

হাসিয়া বলিলাম, “এ আর কব্জিতে পারছেন না?” কথাটা বলিয়া হাচ্ছি হেঁট-করিস্যাম।

“ও,—কোথায়; কার বাড়ী?” এই বলিয়া তিনি আমার দিকে ব্যাকুল-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, “কনোবার বাসায়।”

কিরংকাল কি ভাবিয়া তিনি বলিলেন, “কনো

বার; পটলভাঙ্গার কনো সন্ধ্যার কি?”

“হ্যাঁ।”

আমার কথা শুনিয়া তিনি আমার হাত দুইটি সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, “তবে আমারি ক্ষেত্রে দেখতে হাচ্ছেন।”

এই কথাতে আমার অন্তঃকরণ হইতে শুক পাখ-গের জার এক নিমেষে কোথায় অস্তিত্ব হইয়া গেল। আমি একটা স্বপ্নের নিশাশ ছাড়িয়া, আত্মা আত্মতা করিয়া বলিলাম, “আপনার কথা!”

আমাকে কুতূহল মধ্যে প্রভু হইয়া ধরিয়া আনন্দ-বিগলিত-হৃদয়ে বলিলেন, “হ্যাঁ, আমারই কথা!”

“আমাদের আর্থিক অবস্থার সুবিধা কি আপনি কোনরূপ শুনিবাছেন। আমাদের অবস্থা খুব ভাল নয়—মাতৃশালয়ে আমি মাহুব।”

“না বাবা আর বলিতে হইবে না আমি সব জানি; তোমার বাপ আমার সর্ভার্থ ছিলেন।”

কিছুকাল নীরব থাকিয়া আমি বলিলাম, “দেখুন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। এখন সবই জানা শুনা—এমন কি দেখাশুনা পর্য্যন্ত হইয়া গেল, তখন আর বেঁচে কিছু থাকি রহিল না। তবে আমার ইচ্ছা যে, কলিকাতার পৌছিয়া কোন একটা নিকট-বর্তী দিনে বিবাহ ব্যাপার শেষ করিয়া আমি একে বারে আপনার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া হাইতে চাই।

আমার এই প্রকারের অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া, তিনি যেন একটু বিম্বিত হইয়া পড়িলেন; এবং বলিলেন, “বহি ইহাতে আপনার সন্তা বা মাতুল গ্রাণ করেন?”

অরমোৎসাহে আমি বলিলাম “সে দাবিদ্ব্য আমার—সেজন্য আপনি ভাববেন না; বরং নিশ্চিন্ত থাকুন।”

মুহূর্ত্ত হাসিয়া তিনি বলিলেন, “তবে তাই হোক।”

অপর কোন প্রকারের আলোচনা না করিয়া আমরা গাড়ীতে আসিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আমি নাপন্ন মোলায় চলিতে চলিতে এক এক
বার আবার তাবী পল্লীকে ঘেঁষিতে লাগিলাম। যখন
আমার উৎসুক চক্ষুর তাহার উপর নিপতিত হইতে
লাগিল, তখন সে চকিতে তাহার সরস মাথা মুখ
খানিকে অপসারিত করিয়া অন্তর্ভুক্ত চাহিতে
লাগিল। তখন আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম।
‘আমি জানি সে চিনি তোমার বিবেচিনী।’

এতটা লম্বা আনন্দের আবেশে কোথা দিগ্ধা যে
কেমন করিয়া হুয়াইয়া গেল—তাহা আমি একবিন্দুও

বুঝিতে পারিলাম না। মনে চাইতে লাগিল—আমরও
একটু পাকী চলিলে যেন ভাল হইত।

কলিকাতা পৌছিয়া তিন দিন পরে আমারকে
টেনিশ্রাম করিয়া দিগ্ধা—আমরা সব ঘাইতেছি।
পাকীর যেন সব মনোবৃত্ত থাকে।

আমার এই অল্পত ‘ভাত্র’ পাইয়া যাওঁ আমার
নিচুইই আশ্চর্য্য হোয়ে যাবেন। কি করি—যার
বার কি আর আসা যাওয়া চলে; একবারেই সব
কাম শেষ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

বাঙ্গলার চাকুরীজীবী

(শ্রীযোজ্ঞ নাথ বহু এম, এ)

একথা ঠাট্টা সভা যে, বহু দিন ধরিয়া বাঙ্গালী
কোন ব্যক্তি বাগ্গিয়া করিয়া এসিছি লাভ করে
নাই। বাঙ্গালী বেশ অশক্তের মধ্যে একটা অতি
উর্ধ্ব বেশ বলিয়া ব্যাত। বাঙ্গালার অধিকাংশ
লোকই অমির উৎপন্নের উপর নির্ভর করে। বাকী
যাহারা অল্পলোক বলিয়া ব্যাত, তাহারা প্রকৃত পক্ষে
সেই উৎপন্ন কসলের ভাগ লইয়া জীবনধারণ করে।
বর্তমানে ইহাদের অনেক চাকুরীজীবী হইয়া পড়ি-
রাছে। যাহারা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে চাকুরীজীবী
নন, তাহাদেরও চাকুরীর প্রতি একটা বেশ আকর্ষণ
সেবা যায়। যাহারা বাঙ্গালার অমিরের ও কাসারীর
তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

বাঙ্গালী এখন চাকুরীর স্বস্ত্র এত লাগানিত
হইয়াছে কেন তাহার কারণ অল্পলক্ষ্যন করা উচিত।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈজ্ঞ, চিত্রহিন্দই চাকুরী-
জীবী। তবে ইহাদের চাকুরীর স্বকন্দের এখন
হইয়াছে। বঙ্গ অমিরদের নায়েব গোদত্তার
মাহিয়ানা পূর্বে সাধারণতঃ তিন টাকার উপরে

ছিল না। যেনে তখন বঙ্গ শতাব্দির মূল্য বহু নতাই
থাকুক না কেন, অল্পই তিন টাকায় একটা
পরিবারের কিছুতেই চলিত না। তখনকার দিনে
নায়েব গোদত্তা অমিরদের নিকট হইতে মাসিক
প্রত্যক্ষ ভাবে মাত্র তিন টাকা পাইলেও, অল্পভাবে
অনেক সোমগার করিত। তাহারা প্রভাসিন্দকে
অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া অনেক টাকা আদায়
করিত। সে সময়কার নায়েব গোদত্তাদের প্রকল
প্রতাপ, বর্তমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা অধিক
ছিল। তাহাদের ক্ষমতার কথা বাঙ্গালার পল্লীতে
পল্লীতে প্রথাবাদের মত চলিয়া গিয়াছে। আজও একজন
গোদত্তার সামনে পাড়াইয়া একজন সাধারণ কৃষি
প্রজা মুখ তুলিয়া ঝুঁগা বলিতে সাহস পায় না। সে-
দিনকার নয়েব মহাশয়রা বর্তমানের অনেক অমিরের
বাড়ির অপেক্ষাও বেশী পরিমাণে বিলাস বিস্তার
উপভোগ করিত। তাহাদের ভূকো মানের কোণে
সাধারণ আখ্যাত লাগিলে দ্রুত প্রবেশের পর গ্রাম
পড়িয়া ছাত্রবার হইয়া বাইত। অতএব সে কালের

নাথের গোমস্তাদের বর্তমান কালের চাকুরীজীবীদের বলে কে লা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালার তত্ত্ব পরিবর্তনের সহিত ইংলণ্ডের প্রাচীন কালের কিউডাল লর্ডের অধীন বাতকায় প্রভাসের কতকটা তুলনা হয়। তত্ত্ব পরিবর্তনের সকলেরই কিছু কিছু মোত বধ্য ছিল। বর্তমান কালের অনেক ছোট ছোট তালুকদার এই শ্রেণীর। পূর্বে বড় বড় রাজারা বা জমিদারেরা কাহারও কোন কার্যে সম্মত হইয়া জমি দান করিতেন। বাহালা বেতন দান পাইত, তাহাদের প্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা পূর্বাবস্থায় আর বড় থাকিত না। অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার, পুরোহিত, কিংবা পণ্ডিত হিসাবে নিজের কমা ভোগ করিতেন। তাহাদের অন্তরে জন্ত চাকুরীর চেষ্টা থাকিত হইতে হইত না। চিকিৎসক কবিরাবেরও সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এমন কি এ জমি দানের ব্যবহার বোশা, নাপিত, সাধারণ বৃত্তা, পাইক, বরকন্দা প্রভৃতি চাকরাণ জমি ভোগ করিত। যাহাকে চাকরাণ জমি একবার বেওয়া হইত তাহার মুক্তার পর তাহার সম্মাননিগূহক তাহা হইতে বঞ্চিত করা হইত না। অতএব বর্তমানকালের যত চাকুরী কাহারও করিতে হইত না; জমীর উপভুক্তভোগীরা সাধারণ দাতা ও দাতার কন্যারদের কার্য করিতেন।

আশ-প্রদত্ত-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তঃকরণে সর্বদা প্রবল। সংসারের ঘটনা চক্রের মধ্যে যখন যে ভাবের সুবিধা ছুটিতেছে, মানুষ তাহার দ্বারাই আশ-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াসি। এদেশে বংশগত জাতি বিভাগের চিরন্তন ব্যবহার ফলে, নিম্নশ্রেণীর পক্ষে উচ্চতর জাতির পরিধারিক সন্তান লাভ করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বর্তমান আকারের সাক্ষরজনিক দ্বন্দ্বা বাণিজ্যের অভাবে এক এই কৃষির উপর নির্ভরশীল হেলে অর্থের প্রচলনও কম ছিল। এরূপ হলে সহসা অর্থদান হইয়া কাহারও প্রচুর

প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল না। বিবর্তিত হইয়া পাণ্ডিত্যের গর্ভে সমাজের পূজা দাবী করিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। শিক্ষার ব্যবস্থাও জাতিবিভাগের নিয়মের উপর নির্ভর করিত। শিক্ষা সামান্যই ছিল; বাহা ছিল তাহাও জাতির গভী অতিক্রম করিয়া উঠিত না। বাহা ছিল তাহা দ্বারা মানসিকবৃত্তি নিচের উল্লেখ সাধনই প্রকৃত প্রত্যবে হইত না,—আশগরিমা প্রতিষ্ঠা শুধুরের কথা। আর একদিকে বংশগত জাতির শুচিতা রক্ষার চিন্তা এমন করিয়া সমাজের বৈমম্বিন সর্বপ্রকার কার্যকলাপের তিতর ঢুকিয়াছিল যে, মানুষের তাহা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করিবার অবসরই ছিল না। বর্ণশুচি রক্ষার প্রবান মাগকাটা ছিল বিবাহ। সহস্র বরুনার ভিতর বাস করিয়া সমাজে নতন কাহারও মাথা তুলিবার সম্ভাভবন খুব কমই ছিল। কিন্তু অবস্থা বিশেষ সর্গভার গভী তাহিয়া হইত। বরুণ কত্তা বিবাহের জন্ত সর্বদাই দূরে পাত্ৰ অন্বেষণ করিতে হইত। তবনকার দিনে সর্বত্র দাতার্যত বা সংবাহ আদান প্রদান বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। ছই এক মেলা পার হইয়া কেহ আদিয়া গরির ভাঁড়াইলে, তাহা বরা বড় সহজ ছিল না। এ ভাবে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক কোন দূর গ্রামে যাইয়া কোন উচ্চশ্রেণীর লত্তা বিবাহ করিয়া বসিত; এক বরুণমাই থাকিয়া নিজের কন্যমাঝার প্রতিষ্ঠা করিয়া হইত। ইলা এক প্রকার বিপজ্জনক উপারে আশপ্রতিষ্ঠা করা; কারণ বরা পারিলে এ সবল ক্ষেত্রে জীবন পর্যন্ত যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

প্রাচীনকালে আর এক প্রকারের প্রতিষ্ঠানাতবে উপায় ছিল—গাথের জোরে গরের জমী আশ্চল্য করিয়া, এক তাহা রক্ষা করিয়া, তবনকার জমিদারগণ জমীদারী রক্ষা করিতেন পাঠির দ্বারা। সকল জমিদারেরই এক এক পদটন পাঠিহাল থাকিত। পাঠির সাহায্যে তাহারা অনেক সময় গরের জমি

আশ্বাস্য করিয়া বলিতেন। এ কার্যে কোন হোম আছে বলিয়া কেহই বিবেচনা করিতেন না। বহিঃক্ষেত্র বলিষ্ঠাছেন, 'বাংলার বর্তমান জমিদারগণের পূর্বপুরুষগণ ডাকাইত ছিলেন।' অতএব যিনি, যুঁহিমান, বলিষ্ঠ লাঠীজীবী কতকগুলি লাঠি-চালককে কোনগতিকে কবিত্ব করিতে পারিলে, তখনকার দিনে সহজেই জমিদার হইয়া বলিতে পারিত। অনেক ছোট বড় তাসুকদারের উপস্থিতি এই ভাবে হইয়াছিল। লাঠি বেলা দিখা করাও লাঠিগাল কবিত্বত রাশিবার দিকে তখনকার দিনে অনেকের নজর থাকিত। ভাল ভাল লাঠি-রাশিরা বড় বড় জমিদারগণের নিকটেও বিশেষ সম্মান পাইত। জমিদারেরা তাহাদিগকে হাতে রাশিবার লজ তাহাদিগকেও জমিদান করিতেন। এরূপ ভাবেও অনেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। ইহা ছাড়া জমিদারের বড় বড় কর্মচারী, নারোব মোহমতারা অনেক সময় ঐকি বিদ্যা অনেক সম্পত্তি আশ্বাস্য করিয়া নিম্নোরাই এক একজন সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়া বলিত।

ভারত ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সহিত আশ্ব-প্রতিষ্ঠার তৎকাল প্রচলিত উপায়গুলিতেই ক্রমে বাধা পড়িতে লাগিল। চতুর্দিকে রাজ্য ঘাট রেল, লাইন, ট্রামার লাইন, প্রকৃতির ফলে অনেকটা স্থানের দূরত্ব কমিয়া গেল। সুদূরত্বের অভাব দূর প্রদেশ হইতেও সংবাদ আসিতে লাগিল। পরিচর ভাড়াইয়া বিবাহ আশ্বকাল একত্রণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের আভিভেদ প্রথা আল কাবাতে সংক্রান্তে দৃঢ়তর বন্ধনীয় মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। এমন আর সেতর বিখ্যা পরিচর সমাজ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ বা উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ, আর কেহ করিতে পারে না।

একদম আর লাঠিগালী করা আইন-সঙ্গত নয়; কিংবা বেঙ্গাইনী করিয়া লাঠির সাহায্যে গরের সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেও, আইন আশ্বকালের বিধান

পাহারার সমুদে তাহা ভোগ করা সহজ নয়। অকস্মাইন আশ্বকালের ঠিক বাহির করিয়া কেহ কেহ সন্দেহান হইয়া সত্য, কিন্তু তাহাতে পরিপ্রসারিত লাভ সব সময় হয় না। তার পর আইনের নানারূপ ব্যবহার ভিতর জমিদারগণের দে স্বাধীনতা, সে প্রত্ন, সে রাজ-পরিচা আর নাই। এখন সাধারণ রাজ্য ছাড়া জমিদারদিগের অস্বাভাবিকতার আরের পঞ্চগুলিও একেবারে বহু হইয়াছে। ফলে জমিদান আর মোদ পাইয়াছে, এবং নারোব মোদতাদেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের জায় অক্ষুর প্রাণে রাজত্ব করিবার দিন দূর হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার জমিদারদের ভিতর দূরত্বের জায় শুধু কোষ্ঠ পুরের উত্তরাধিকার কোন দিন স্বীকৃত হয় নাই। অতএব অধিকাংশ জমিদারী ক্রমে বহু অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের আশ্ব-প্রত্ন, আশ্ব মর্যাদা বজায় রাখা ক্রমে কঠিন হইয়া পড়িতেছে। আর সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিবার সহজ পদ্ধতিগুলি গুণ হইয়াছে। এখন উপায়। হাঙ্গুদ নিজের চরবরা বীকার করিয়া লইয়া নীরবে তল্লাহ বহন করিতে পারে না। বহুক্ষণ জীবন থাকিবে ততক্ষণ আশা আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে হাঙ্গুদকে নানারূপে নানা কার্যের দিকে টানিয়া লইয়া থাকিবে। বর্তমানে বাঙ্গালী কেবলমাত্র একটা অবস্থার সন্ধান পাইয়া তাহাই ধরিয়া বলিয়াছে। তাহাই ব্যাখ্যা করিবার লজ আমরা এতগুলি কথা অবতারণা করিলাম।

গবর্ণমেন্ট বলিতে যাহা দৃষ্টির তাহা দূরত্বের একটা বিষয় হইবে। ঠিক এরূপ ধরণের শাসন পদ্ধতি এখন সর্ব বাপারের অশুখচিত ব্যবহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পড়িচালনা, পূর্বে এখানে ছিল না। ইহার অর্থ প্রাচীন যোগে, এবং বর্তমান দূরত্ব বহু আলোড়নের পর আর ইহাকে গণিত শাস্ত্রের মত আর তুল লাভি দূর করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেন্টের স্বাধীনতা প্রাচীন কালের ধর্মের জায়, আর হাঙ্গুদের

জীবনের প্রত্যেক বাণ্যপথে হস্তক্ষেপ করিযাচ্ছে।
কিন্তু হঠাৎ দূরত্ব পর্যন্ত মনুষ্য জীবন আত্ম একত্ব
প্রতি দৃষ্টির ভিত্তি গণ্যমেন্টের সহিত সম্পর্কিত।
এক্স ভাবে কাজ করা আত্মমের দেশে হঠাৎ
আসিয়া, উপস্থিত হইযাছে। আত্মতা বাহা পাইযাছি,
তাহা আত্মমের দেশের অতীত অবস্থায় ক্রম বিকা-
শের ফল নয়। দূরত্ব মনুষ্য এরূপে এক নতুন ধরণের
ব্যবস্থা সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। অতীত
আত্মমের প্রথম দাক্ষা কাটাঁয়া গেলে সকলেই বুঝিল
কর্তমান হুণে দর্শনমেন্টের সম্পর্ক ব্যক্তিরকে আর
তোমরা কার্য্য হইবে না। জীবন ধারণই অসম্ভব
হইবে। সাধারণ ব্যবসায় বাণিজ্য হইতে আরম্ভ
করিয়া সাধারণ জীবন বাপন, সমাজে পদমর্যাদা,
প্রভৃৎ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, সমস্তই মূল হুণে গণ্যমেন্টের
হাতে। গণ্যমেন্ট এই সর্বসম্পদবাসী সমাজের কেন্দ্র
বিন্দু হইয়া সমস্ত বাণ্যপন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

সমাজ আত্ম-মন্ত্র-প্রতিষ্ঠার প্রাচীন সহজ পন্থা-
গুলি ক্রম হইবার সহিত লোকের নজর পড়িলে গণ্য-
মেন্টের দিকে। গণ্যমেন্টেরও এই বিঘাট রাষ্ট্র পদ্ধতি-
চালন হুণীর ভিত্তি লোকের দরকার। লোকে দেখিল
গণ্যমেন্টের সহিত নিজেকে দিলাইয়া লইতে পারিলে
সমাজে প্রভু প্রতিষ্ঠার এক নতুন উপায় সহজ লভ্য
হইয়া আসে। মনে মনে লোক তখন গণ্যমেন্টের
আসরে আসিয়া মাতিতে লাগিল। দেশের জীবনের
ব্যাপ্য পরিবর্তিত হইতে চলিল। যে দেশের সর্ব
আকাঙ্ক্ষার সর্বকাঁয়া ছিল, সমাজের ব্যবস্থার অসুস্থ
সে দেশে লোক ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার মনোযোগী
হইয়া সমাজকে দূর করিয়া আশ্রয় বাধের দিকে
অবহিত হইতে লাগিল। কোম্পানীর চাকুরীর সমস্ত
সকলে লাগিয়াই হইল। যে ভাবে চলিতেছিল
তাঁহাতে সমাজের পরিণতি কোথায় গিয়া পড়াইত
তাঁহা কে বলিতে পারে!

চাকুরীর দত্ত অসুবিধাই বাহুক না কেন, একথা
যে চাকুরীতে অ্যাক্সিডায়া লাভের এক নতুন পন্থা

আবিষ্কার করিয়া দিযাছে। চাকুরী দাসের হইলেও,
যে দাসের বাহার কাছে করিতে হই, তাঁহার সহিত
আত্মার নিত্য সমাজের কোন সম্পর্ক নাই। মাতৃ
তাঁহার জীবনমর্যাদা বাণ্যপনের সহিত সম্পর্কিত
নিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা চায়। চাকুরীর ক্রম প্রভু,
চাকুরী লব্ধ কর্তব্য, সেই চাকুরী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে
সমাজের যে উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে
তাঁহাতে একটা তৃপ্তি আছে। তাঁহার আত্মতা,
তাঁহার মৌহ কাটান সহজ নয়। প্রথম প্রথম যখন
সকলে চাকুরীতে হাইতে লাগিল, তখন সকলেই যে
কতকুর্ষের ভিত্তি হাইত, তাঁহা নহে; বরং অধিকাংশ
লোকই তখন হাইত যান লব্ধ লাভের আকাঙ্ক্ষা,
এক প্রথম প্রথম সে আকাঙ্ক্ষা দ্বাংষ্ট পরিণামে
তৃপ্ত হইবার সুবিধাও ছিল।

ইংরাজ গণ্যমেন্টের চাকুরী দাসের সহিত আর
একটা বড় ভিন্নতা আত্মমের দেশে আসিয়াছে।
সেটা ইংরাজী-শিক্ষা। গণ্যমেন্টের কার্য্য কর্তব্য রক্ষা
মুখ্য দায়িত্ব চলিতে পারে না। চাকুরী বাধ্যমিগকে
মিতে হইবে তাঁহা মিগকে উপস্থিত করিয়া হইতে
হইবে; এই উদ্দেশ্যেই এ দেশে প্রথমে ইংরাজী
শিক্ষার আবদানী হয়। সে সময় বাঁহারা সংস্কৃত
শিক্ষার বিরোধী ছিলেন তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাপ্য লোকে
যে জ্ঞানার্জনে অক্ষম হইত তাঁহা বলিয়া ক্রিয়াশীল
নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজী
শিক্ষা না পাইলে দেশের লোক শাসন পরিচালন
হইতে দূরে পড়িয়া থাকিবে। তাঁহাদের ধারণা
এক উদ্দেশ্য মন ছিল বলা যায় না। ইংরাজী
শিক্ষার ব্যাপ্যই যে জ্ঞানবাসীর প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষের
পথ পরিষ্কৃত হইবে; এই কথাটি ঠিক এই ভাবে সে
সময় এক রাজা রামমোহন রায় ভিন্ন আর কেহই
বোধহয় বুঝিতে পারেন নাই। শিক্ষা ভিন্নিত
পতিবিত্ত প্রাচীন ভাবও ধারণার ভিত্তি উপর
প্রতিষ্ঠিত হইলে যে মাতৃমের অন্তঃকরণকেও গতি-
বিহীন, ও কর্মপ্রতিষ্ঠান করিয়া ত্রোণে।

একথা এখনও বোধের সকলে স্বীকার করিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ—নূতন জ্ঞানলাভ করিলে যে মানুষের মনে একটা আশ-স্বপ্ন জ্ঞান জাগিয়া উঠে—আশ-পরিবারে প্রাণমন পুরিয়া উঠে—শ্রেষ্ঠ-বোধের ভূঁই পায়ের দ্বারা, একথা এখনও অনেক বোধ হয় যুব মানিয়া লইতে চাহিবেন না। কিন্তু কথার সত্যতা আছেই অল্প বেশের অধিকাংশ লোকেই অল্পের অন্তরে অনুভব করিতে পারিতেন। আমরা চাহিয়াছিলাম চাকুরী। শিক্ষার অতিরিক্ত অল্পের দানের দত্ত আদিত্য, আমাদিগের জ্ঞানের পথ পুনিয়া দিয়াছে। আমাদিগের মানসিক বৃত্তিচিহ্নের অবাধ পতিতে বৃত্তিমান করিয়াছে, আমাদিগকে কল্যাণ দাতার পুত্র করিয়াছে। চাকুরীতে যুগুৎ ইয়াছিলাম মানুষের অল্পকরণের প্রভু প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য। ইংরাজী শিক্ষার প্রবল আকর্ষণ সেই আশ-প্রতিষ্ঠার মহামহিমময় বৃত্তির সর্বাঙ্গক যোগ।

আমি চাকুরীতে প্রভু-প্রতিষ্ঠা সত্ত্ব হইলেও সকলের ভাণ্ডে চাকুরী পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজের দ্বারা শিক্ষিত জনগণ লইয়া একটা নূতন শ্রেষ্ঠ বর্গের একটা জ্ঞানপুত্র আভিমানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন জাতি-পুত্র বিভাগ সেইসঙ্গে হস্তগত বহু অবস্থায় এখনও সমাজের অশিক্ষিত সকল কে রাখিয়াছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অশিক্ষিতদের ও জনসাধারণের ভিতর পার্থক্য পড়িয়া গিয়াছে। তাহারাও শিক্ষিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলি ইংরাজী শিক্ষা যে পথে যে ভাবেই আসিয়া বাসুক না কেন, মানসিক শ্রেষ্ঠ লাভের যে সহজ উপায় দেখাইয়া দিয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসী ইহার রস গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। ইহার যে ভাবে বর্তমান বর্তমান এখন ইহাকে ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল-প্রাপ্ত করিতে ও বর্তমানের সাহিত্যই হউক না কেন।

ভারতবাসী তাহা করিত কৃত সংস্কার, কিন্তু ইহা ইহা এখনও ভাগ্য করিতে পারিবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবর্তন ও পরিবর্তন যে করিতে হইবে না তাহা বলি না।

একটা কথা এই যে বাঙ্গালী গোড়া হইতে চাকুরী না করিয়া ব্যবসায়ের দিকে ঘাটাই কেন? অথবা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ সময়ে অনেকগুলি কথা বলিতে হয়। বাল্মীকীর বর্তমান দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য করিত, তাহারা কোনদিনই সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থানের আসন পায় নাই। অতএব মানুষের মূল আকাঙ্ক্ষা যখন প্রতিষ্ঠালাভ, তখন যে কার্যে তাহা হইবে না সে কার্য করিয়া সে পণ্ডিতের জালী হইতে ঘাইবে কেন? বণিক সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিণত দেখিয়া সন্তুষ্ট বাঙ্গালী বাণিজ্যের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। দ্বিতীয়তঃ—ব্যবসায়ের বলাফল কতটা নিশ্চিত ব্যবসায় করিতে যাওয়া কতটা ভাগ্য পরীক্ষার দত্ত। ব্যবসা কতটা জুয়াখেলার দত্ত,—ব্যবসায়ে জুয়াখেলা আকর্ষণ আছে,—আবার এই কারণেই ব্যবসায়ের প্রতি জুয়াখেলার ভাণ্ড কিছুটা আশা সম্পূর্ণ সত্ত্ব। বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার কার্য-কারণ সব বিবেচন করিতে গেলে বর্তমানে হয়, বাঙ্গালীর অল্পকরণে জুয়ার তীব্রতা বিস্তারিত নাই। বাঙ্গালী পণ্ডিতদের শাস্তিপূর্ণ নীতি অথবা দুঃখ ব্যবসায় দুঃখব্যাঘাত রচনা করাইয়া সাময়িক ভূমিকার বলিয়া বিবেচনা করে। বাঙ্গালীর এ প্রকৃতি এখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। ইহার ফল ভবিষ্যতে কি হইবে, বাঙ্গালী কোথায় গিয়া পড়িয়াইবে, সে কথা জোর করিয়া বলা কঠিন। তবে একথা অবশ্যকার কথা বলা যে বার্ষিক আকাঙ্ক্ষার অল্পের আবেগে বাঙ্গালী অল্পকরণ চাকুরীতে অস্তিত্ব পায় না। পাণ্ডিত্য শিক্ষা ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী সর্বাঙ্গের অধিক পরিমাণে আশ্রয় করিয়াছে। পাণ্ডিত্য শিক্ষার বাঙ্গালীর দ্বৈত নষ্ট হয় নাই। তাহার আকাঙ্ক্ষা

এখনও সেই পারিবারিক বিদ্বেষতার সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিলম্বিত হইয়া আছে। বাঙ্গালী তাহার মধ্যস্থির স্থির বীর শাস্ত্র প্রভৃতির আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পাস্তাতা শিক্ষার তাহার পূর্বের

অনেক মদিনতা দূর হইয়া গাইতেছে। হস্ত এইভাবে একদিন তাহার একটা নিম্নতম সত্তা বিরাট, সূত্রিত মাথা তুলিয়া ধাঁড়াইবে।

শোক-সংবাদ ।

আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে একাশ করিতেছি যে কমলাহিতের একনিষ্ঠ সেবক রাখালরাজ রায় মহাশয় ৫০ বৎসর বয়সে বিপ্লব ২রা পৌষ তারিখে নারা সিদ্ধান্তে। তিনি মুর্শিদাবাদের কলীপুর মহকুমাবাসী ছিলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বি এ পাশ করিয়া শিক্ষকতা কার্যে প্রবৃত্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী ভাষার এম এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হইলে কলিকাতার আসিয়া রাখালরাজ পরীক্ষা দিতে স্কটসম্বর হন। সে সময় তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব ও তত্ত্বাবধায়ী তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করেন—বাদকবিদের সহিত প্রতিযোগিতায় ধাঁড়াইবার ও বান্ধব পরীক্ষকবিদের নিকট পরীক্ষা দিবার আশঙ্কতা যে নাই তাহা কেহ তাঁহাকে বুঝাইতে

পারেন নাই। সে সময় বন্ধুবর অমূল্য বিদ্যাক্ষরণের সহিত ভাষাতত্ত্ব লইয়া তাঁহাকে ধারণ পরিচয় করিতে বেশিরাহি তাহা বাস্তবিকই প্রাপ্যসার্থ। বক্তব্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অহুসারের স্রষ্টাই তিনি পরীক্ষা দিয়াছিলেন, এবং ৫০ বৎসর বয়সে এম, এ উপাধি লাভ করেন। তারপর এই তিন বৎসরকাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রায়তনু লাহিড়ী রিসার্চ কলারসিপ পাইয়া, তিনি বক্তব্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। বহু সাময়িক পত্র প্রকাশিত ইত্যতঃ-বিশিষ্ট প্রবন্ধ সকল পাঠ করিলে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা বেশ বুঝা যায়। জ্ঞান করি তাঁহার বন্ধ-বান্ধবেরা সেগুলি মুদ্রিত করিয়া ভাষা-জননীর বাতুল চরণে উপহার দিবেন।



Muhila Press, Cal.



১৩শ বর্ষ,

চৈত্র, ১৩৩০

১২শ সংখ্যা

আমার গান

(শ্রীমদেন্দ্রকুমার বসু)

দৌবনেরি তান ধরিগো,
ধরার মরুতে,
কুটিরে তুলি পলাশ-কলি
গুঞ্জনো তরুতে !
সকলি দুপুর সাঁঝের বেলা,
সন্ধান চলে সুরের বেলা,
জল্লা নিয়ে যন বে বাউল,
চাঘনা জিহ্বতে—
গাইচি আমি ধরার মরুতে ।

গানের ঘোলা গুল্চে কেবল
বিপুল পুলকে,
জন্মে তোলে হিঙ্গোলিয়া
অন্ধ ভুলোকে !

নয় বেতগাণের কাঁড়র সাধন,
নেইকো কুচে শোকেব সীমান,
জাবিয়ে তানে দখিন বাতাস
উড়েগাই ধুলোকে—
আকুল-করা বিপুল পুলকে !

হরের আগুন ঝল্চে আমার
চিত্ত-মশালে,
হুমহুনাটে কোন্ ক্যাপা এ
নৃত্য বললে !

বন্ধ-শিরা তরী ক'রে,
তল্লাহারা যরী গতে,
অন্ধ-বীণের গিটিকিরিতে
বধ বললে,
দোস্তি-দ্বীতে চিত্ত-মশালে !

রক্ত-প্রোত রক্তাভার

মস্ত কাশ্মিনী,

ধানশী ঘোর হুংসিতে

কুচ্ছ নারিনী !

বিশেষ দ্বারা নিঃশেষ হয়ে,

কীপছে ভয়ের শিখা হয়ে,

স্বাক্ষত ভয়ের মধ্যে কোন

হুংস রাশি-নি—

হিংস এ মোর কুচ্ছ রাশিণী !

ওখো আমার গানের ঠাকুর,

তোমার লীলাতে,

জ্যোন্ত প্রাণের বহু কাণে

ওক শিলাতে,

আলমনিয় হুংসের মধ্যে,

এগিয়ে চলি অসীম গলে,

মৌরনের এই দীপক-মাখা

ঘরায় বিলাতে—

কর তাগের দৃষ্ট লীলাতে ।

সদাশিবের দপ্তর

অভাব ও দুঃখ

(প্রিয়োৎপলেন্দ্র ঘোষ এমবি, এ, সি লণ্ডন)

রামচন্দ্রের অভাবে অস্বাভাবিক অধঃপতন চাই-
তেছে ; বালকের অভাবে প্রাণের সর্গস্বত্বের দুচ্ছ
বিভাদ বঃ পড়িতেছে ; একতার অভাবে ভারতবাসীর
স্বাধীনতা-স্বর্বা অস্ত দিয়াছে, পরহিত-ব্রতের অভাবে
বোধ দরিদ্রাচ্ছে, ধর্মের অভাবে ট্রা ধ্বংস হইয়াছে,
আর ভাবের উন্নতির অভাবে আমার সুদূরী কাঠের
তক্তাশোষণনি চারিপোকাতল প্রেতাধিকার কুচ্ছ
হইয়াছে । ষষ্ঠ বড় সামগ্রীই হউক না কেন, তাহার
দরকারী কোন কিছুই একটু অভাব হইলেই বিপর্যয়
হটে—কল বিপদাইয়া যায় । এমন কৌশল বিশিষ্ট
বহুত্ব সেই একটু াহুর অভাবে অটল হইয়া যায় । ৬০
খোকার দলভাটুক সীম এছিন সেও একটু জলের
অভাবে প্রেতরথেরে স্তায় পড়াগড়ি যায় । জগতে
সর্গস্বত্বের করিয়া পৌঁছে কোন সামগ্রী গড়িতে
পারে না ; স্পৃহতা সংসারের ধর্ম নহ । জিন্দগন-
পতিও বোধ হয় সর্বল ব্রহ্ম সঙ্গস্বত্বের করিতে
পারেন না । প্রত্যেক পদার্থেই অভাব আছে ।
ভূমি ধনের কাশাল, ভক্তের হুংসের কাশাল, হরিদাস
উচ্ছ্রণের কাশাল, রাণাবাহব পখানের কাশাল,

রমণীরজন দৌলখোর কাশাল, হরিদর ভাল কথার
কাশাল, লক্ষ টাঙ্গা থাকিলেও বাবুন কাশাল, আর
আমি একটু হাসির কাশাল । কল ত তাই কোন
কাশালকে কখনও হুণী দেখিয়াছে ? দেখিতে পার
না, কারণ বাহার অভাব রহিল তাহার হুং কোণায় ?
কাম্যবস্তুর অভাব মোচনের নামই হুং । সর্গস্বত্বমান
জগতের সর্গ জীব ও পদার্থকেই সৃষ্টি করিয়াছেন ?
কিছু নিখুঁত করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন নাই ।
পারিলে তাহাকে সর্গস্বত্বমান বলিতে আগন্তি ছিল
না । তিনি আমার অভাব মোচন করিতে কেন
অসমর্থ ? প্রথমতঃ তিনি অভাব বিশেষ কেন ? ভাল,
দিলেন যদি, তবে তাহা মোচন করিলেন না কেন ?
তিনি সর্গস্বত্বমান হইলে অবশ্যই কাম্যবস্ত্র আমার
হাতে দিতেন, কিন্তু তাহা ত তিনি করেন নাই ;
সুতরাং হুং তিনি সর্গস্বত্বমান নন, না হয় ইচ্ছা
করিয়া আমাকে অভাবশূন্য করেন নাই । তিনি
ইচ্ছাময় ! তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাকে হুণী করেন
নাই, আমার অভাব মোচন করেন নাই, এ কথাটার
আমি স্থাপন করিতে পারি না ? জানি না কেন

ঐহাকে লোকে 'ইচ্ছাম্ব' বলিয়া থাকে। যদি 'নম্র' হস্তের সামগ্রী, বাগাতে নিঃশেষ শুণপনা প্রকাশ করিবার সুবিধা অধিক, তাহাই সন্দেহ হইবার কারণে পারেন না, তখন গঠন বাধে। ইচ্ছাম্ব কহাই কি তার বাস্তবতা নয়? আর, না হয় বলিতে হয়, তিনি স্বকণ্ঠ সাধনে সম্পূর্ণ অসুশ্রাব্য।

আমার নিপাতসাধন তাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং আমি যাহা চাচি তাহা আমাকে দিবেন কেন? বাহার বিনিময়ে গ্রাণ দিতে পারি তাহাকে আমি পাই না কেন? বার্ষিক কুশি বৈজ্ঞানিক হাঙ্গি হাঙ্গিয়া বলিতেছে, বাচ্য হইবে না তাহার জন্ত সস্ত্র চেষ্টা করিলেও নিষ্ফল হইবে। তিনিই শর্তা আমরা উপলব্ধি হইল, তিনি আমাদিগকে বাগাতে নিবৃত্ত করেন তাহাই আমার কথিত্য পাঠ্য,—“বহা নিবৃত্ত হ'ল তথা কহোনি।” বৈশ্ব কথ্য! আমি বলি তোমার ইচ্ছাম্ব মনে করিলেই ত, আমি বাহাকে টানি—গ্রাণ দিয়া ভালবাসি—বাহার সন্তি মিলনের রক্ত বস্ত্র হই—তাঁহার সন্তি মিলন ঘটাইয়া দিতে পারিতেন। সেও আমাকে টানে, উভয়ের মধ্যে এক আকর্ষণী শক্তি আছে এবং সেই হেতু উভয়ে উৎসাহে ডাবিতেছি; জাকিতেছি অথচ মিলিতেছি না। কেন মিলি না! যদি মিলিত হইব না উভয় পূর্ণ হইতে পারিতেন, তবে এমন আকর্ষণী শক্তি ঐহাকে কে দিতে বলিয়াছিল? এটা অজুই আমার নিপাতের জন্ত! এই প্রেক্ষণ অভাবে আমার সব স্তম্ভ করিবার জন্ত, তাঁর দেখছি প্রাণপাত চেষ্টা। তাহা হইলে—আমার প্রাণপ্রিয়কে পাইলে—আমার সব দিক বহু বজায় থাকিত।

সংসারে কেহ হুণী, কেহ সুখী। এরূপ কতি-
বার বিবাহভার উদ্ভেদ কি? সংসারে পাচ রংয়ের
হুতার প্রেক্ষণের আবশ্যকতা যে, কি তাহাও আমি
বুঝি না। সকলকে সুখী করিলে কি তিনি অসুখী
হইতেন? একজনকে সুখ দিয়া, অপরকে দুঃখ দিয়া

যদি উভয়ের আচরণ শরীকা করাই তাঁহা উদ্ভেদ হয়,
তাহা হইলে তাঁহার কতিব প্রাণপাত করিতে পারিব
না। বাচ্য হইল তিনি স্বকণ্ঠ বহা পড়িয়াছেন। বাহু-
বাক্য কুশাধিক বহাইত দিয়া তিনি নিজেই তাগাতে
বলিয়া পড়িয়াছেন। যদি তিনি সত্যই করিতে
পারিতেন, তাহা হইলে বহুদূর আশনার সত্য
শক্তি প্রদান করাই তাঁহার উচিত ছিল। আবার
বোধ হয় এরূপ করা তাঁহার ক্ষমতায় নয়। ভালক
আশনার মত করিয়া পুস্তকিতা পড়িতে পারে সত্য,
কিন্তু বাহাণ অভাবে পুস্তকিতা পুস্তকিতা থাকিয়া
যার বাহুস্ব হইতে পারে না—তাহা দিতে পারে
না। তিনিও তাই করেন নাই।

তিনি যদি সর্বত্র মান করিতে পারিতেন, তাহা
হইলে তাঁহার স্তম্ভ জগতে ও বাহুস্বের স্তম্ভ জগতে
সংঘর্ষ ঘটতে পারিত। আর জগতে কে এমন
মগপ্রভু আছেন, যিনি আপনায় শক্তি বিলাইয়া
নিষ্ফল হইয়া পড়েন। বাহুস্ব প্রাণ থাকিতে
শক্তির বর্ণনাত্ত ও পরকে দিতে পারে না। তাই
উদ্ভেদ বৈশ্ব, “তিনি বাহুস্বের তাঁর প্রতিক্রিয়া (im-
-প্রুত) করিয়া স্তম্ভ করিয়াছেন,” কথ্য তা দেখিতেছি
ষ্টিক নয়। তিনি অসুখী তাই তাঁহার স্তম্ভ জগতে
অসুখী। কিন্তু লোকে ঐহাকে “শত্রুপূর্ণ আনন্দ”
বলিয়া থাকে। একখাটা সম্পূর্ণ ব্রহ্মদেহ। যে পরি-
পূর্ণ, সে কখনও অসুখী করিয়া কোনও সামগ্রী রচনা
করে না বা করিতে পারে না। আপন কাণে
আপনার শক্তির ও কোকলের পরিচয় দিতে কি
কখন কেহ ক্রপণতা করে? উভয়ও যে তাহা
করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। তাঁহার রচিত
সামগ্রী অভাবে পূর্ণ, সুতরাং অসুখান করা অসম্ভব
নয় যে তিনিও বহা অজাব্যক্ত। এমনও হইতে
দায় যে তিনি ইচ্ছা করিয়া এই অভাব রাখিয়াছেন।
অবশ্যতঃ জানেন যে, অভাব আশাধিপের ঈর্ষিত
নয় এবং এই হেতুই জগতের সমুদয় হুণ। তবে
আনিয়া শুনিয়া তিনি এরূপ অভাবমুক্ত এবং হুণবয়

জগৎ স্বপ্ন করিয়াছেন। তাপাটা যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে বহান্নয় বলিবে কেন?

বাহিত সামগ্রীর অভাবে যে গুণ হয়, তাহা হ্রাস। আরও নানা প্রকারের গুণ আত্মদ্বিগকে আক্রমণ করে—বিধ্বস্ত করে; কিন্তু বিশেষ করিয়া যেখিন্তে জানা যায় যে, অভাবই গুণের জনক। মানসিক ও বৈদিক গুণে অভাব-মাত্র। যে কণ্টকি জন্ত বহুখাত করিয়ায় তাহা ছইল না। স্বাধাকে পাইবার জন্ত প্রাণপণ করিয়ায় তাহাকে পাইলাম না। এত করিয়াও ইহা পাইলাম না—উঃ পাইলাম না, ইত্যাদি “পাইলাম না”, যে অসুখ-হিকারী জালা, তাহাই গুণ। আর অস্ত্র জ্বরে ও কলা কাল রোগে কষ্ট পাইতেছি, উত্তর ফোটকটা বড় গুণ দিতেছে ইত্যাদি বৈদিক গুণের দ্বীপ। পত্নীতবাবিধ্বন বলিয়া থাকেন শরীরের কোনও সামগ্রীর অভাবে এই সকল বৈদিকগুণ ঘটে। পাণ্ডুলীতে, বৃন্দে বা কুস্তারে যদি “ফ্রোনিং” বাপের অভাব হয় (অর্থাৎ লবণ ভক্ষণ না করিলে যে অভাব হয়) তাহা হইলে পেটে কুসি রোগের উৎপত্তি হয়। কুসি রোগে বৎসরোন্নতি কষ্ট পাইতে হয় সন্দেহ নাই—অভাবই সেই কষ্টের স্রষ্টা। মন কিন্তু তাহাতে সুস্থির থাকে কি? থাকে না, কারণ শরীরের সহিত মনের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং এই উত্তর প্রকার গুণে মানসিক গুণের অংশ অধিক, শারীরিকেরও অংশ নিতান্ত যে অল্প তাহাও বলিতে পারি না। যে দিন মন সন্মত টাকার কোম্পানির কাগজগুলি বিপণন হয় ইহা ফেল, সে দিন বা তাহার পরেও সে যে অভাব আচীর গ্রহণ করুক করে নাই একথা বলিতে পারি না, তথাপি তাহাকে শূন্য দেখাইতে। এই ঘটনার পর হইতে প্রত্যেক জনগণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতে চলিত, বলিলে উন্নীত পারিত না, সকল। মাথা আর ঘূরিত। ইহার কারণ মানসিক দুর্লভ্যই তাহার শরীরকে দুর্লভ করিয়াছিল। উত্তরের তিতর এমনি নিকট সম্বন্ধ থাকিতেও লোকে আত্মকে

পৃথক সামগ্রী বলে, আত্মকে শরীর-মাত্র বলিলে শাপল বলে। এক বহির তাহার জীবে ভাসিল, পৃথিবী তখন কার্য্যকরে দিয়াছিল কাজেই উত্তর দিতে পারে নাই। বহির আকার ভাসিল, পৃথিবী উত্তর দিলেন; কিন্তু সে তনিত পাইল না, অতএবে সে বলিল “নিগ্রি নিতান্ত বহির, জটাই গুণ বড় বোঝ নহিলে দুর্লভী কটে।” এইরূপে অনেক সময় লোকে নিজের বোঝ বুঝিতে পারে না। শরীর ও আত্মা সম্বন্ধ নির্ণয় করা বড় শোভা কথা নয়।

শারীরিক গুণ ও মানসিক গুণ উভয়েই বস্তুতঃ অভাবের চাইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহাদ্বয়কে “আধ্যাত্মিক” বলা হয়। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্ম-মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত গুণ ভিত্তি, আর এক প্রকার গুণ আছে—বাহ্য বাহ্য হেতুজাত। ইহাকে আত্মা “বন্যাধ্যাত্মিক” বলিয়া অভিহিত করিয়ায়। জগতের দাবর জন্ম দ্বারা যে সকল গুণে জড়িত পাত্র উৎপাদি এই প্রকার অসম্ভব। পত্রিতরা ইহাকে ছই তাগে বিভক্ত করেন, বাহ্য—আবিস্বেদিক ও আধিভৌতিক। সর্প ধ্বংসন জনিৎ কষ্ট বা গুণ আধিভৌতিক; এ প্রকার গুণেরও কারণ সেই অভাব। সর্প ধ্বংসন শরীরের পোষিতের অন্নভান ছই এং নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অভাব আদিল। অন্নভানের অভাবে শরীরের কষ্ট অসম্ভবী; এমন কি সম্পূর্ণ অভাবে মৃত্যুও হইতে পারে। সর্প ধ্বংসনজনিত কষ্টেও মনের যে রোষণ হয় না তাহা নয়। শরীরের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ হেতু মনে উৎকর্ষ আশ্রয় প্রকৃতি উপজাত হয়। তথাপি লোকে বলে আত্মা ও শরীর দুইটি পৃথক সামগ্রী।

যক - রক - গুর্ল - গ্রহ - উপগ্রহ প্রকৃতির অদ্ভুত গুণকে পত্রিতরা আবিস্বেদিক গুণে করেন, এবং এ বৎসর জুনি শবির কোপে পত্রিতরা সুতরাং যে জল ধরিলে তাহাই জাদিয়া পড়িলে। কুসি শারীরিক ও মানসিক নানা কষ্ট পাইবে। এ প্রকার গুণ হইতেও অসম্ভব বিষয় লোক কষ্ট পায়। যক রক

প্রেক্ষায় যে কি চান তালা জানা যায় না বলিয়া অনেক সময় লাহুনা ভোগ করিতে হয়। তাহাদের অভাবটা যে কি তাহাও বুঝিয়া ওঠা অনেক সময় যায় না। বক রক গছরককে ছাড়িয়া দিলেও প্রাণবির যে আশ্বাসের উপর প্রোত্তাৰ আছে—মুদ্রী বা মুদ্রী আছে—একথা প্রাচীন মূল হইতে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল পর্যন্ত পত্তিতেয়া যায়। আলিতেছেন। বকন তিথি বিশেষেই আশ্বাসের পরীক রস হয়—পরীকের একটা অভাব হয়। উগাই হুঃ। আর এক উপপ্রেক্ষায় কি তাহা আশ্বাসের উপর প্রোত্তাৰ

বিতার করেন, তাহার লটিক, বিবল জানা না থাকিলেও একথা বোঝ হয় বলা অসম্ভব হইবে না যে, উগাই একটা চাকলা—একটা অভাবের পটী করে। অতএব দেখা গেল, যে অভাবই লকল একতর হুঃপর যেহুঃ; হুতরাঃ তখিলরীত যে হুঃ তাহা কামা-বহর অভাব হোচনে যে উপপর হয়, তাহাতে লম্বের নাই। অভাব না থাকিলে যে হুঃ হয় তাহার অপেক্ষা আরও একটী হুঃের চরন অব্য। আছে কিং এমন লে কথা থাক্।

প্রজ্ঞা-অৰ্ঘ্য

(শ্রীমদিনীকান্ত যে)

আমি কাকুরের সুকুল সাধে
উঠুক বোধের চিত্ত তরি,
কল্যাণের বেটল মাঝে
হোয়ায় আমি বরণ করি।
প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠার পুণ্যমণি
অন্তনি আমি বিলাস তোমাং,
দিক্ত করি চরণ তোমাং,
অন্যেবার অস্তধারায়।

প্রানির তিমির আত্মক নাশ'
ধিমল হাঙ্গির উকল সাধে,
লব ক'টা মূল মুঠির তোলা'
কলুনো বিহার তোলাস-মাধে
বরণ করি কলী তোমাং
বরণ করি জোড় ব'লে,
লকল কটির মার্কনা জাই
বহু তোমাং চরণ তলে। ০

পরিচয়

(ঈশাকান্ত বিদ্য)

শ্রীমান্ বদিনীকান্ত,
আমি তোমাং লবধনার আশি যে কলুর আনন্দ
লাভ করিয়াছি—তা হুই হাঃ। অনেক বুঝিতেই
পাছিব না। তাহাও ইঙ্গিতে একটু বলি। সে
অন্য বিন বহুরের আশের—১০১১ সাধেচ—বহু,

যে বিন প্রথম তোমাং লভিত্ত পরিচিতি হই। তখন
আমি পরীক প্রোক্তির অধার-অধাশনা নিরত
পিতৃক। হাত্তাখার সেক্ষেত্রেই তখন আমি

০ একজন লম্বিক মেঘবিন্দু লাহিমা-লম্বিকা উকলক
কলুর বদিনীকান্ত-লবধনা-লকল লেবন কলুর পটীক।

দীঘনের ব্রত করিচাছি। ঘোবনের সীমারেবা বচ-
বিন অতিশয় করিয়া প্রোচল সীমারেবা প্রবিশি;
আর তুমি কৈশোর-ঘোবনে সজ্জিতনে। ঘোবনের
উদ্ধাঘ বেনায় তরপুর—ঘোবনের দারতহাং প্রোবান

কাগজ বাহির করা হাতের বাঘনা ছিল না। প্রথম
দর্শনে বুঝিতে পারি নাই এটা তোমার খেদাল কি
না—কিন্তু তুমি নামের কাড়াল। তাই তখন
তোমার বুকে করিয়া টানিয়া লইতে পারি নাই;



প্রথমটি স্মৃতিচিহ্ন ও স্মৃতিচিহ্নের স্মৃতিচিহ্নের স্মৃতি

প্রাণটা মৃদু। আমদের স্মৃতিতে তোমার আনন্দ
উদ্ভব। তখন তোমাদের মাঝে বাবদান ছিল পূর্ব
কৈশ; কিন্তু তুমি আসিলে হাং নিবে তোমার
স্মৃতি 'আলো'। যথেষ্ট তখন তাবি নাই, অধিক
অতীতবাক্যে অকণ্ট প্রাণে একজন নিঃসঙ্গ
দুঃখ একন তাকানিতে পারে। তখনকার দিনে

কিন্তু তোমার প্রথম আলোনের লহজ, সরল ভাবিতে
আমি মৃত হইতে পারি।

স্মৃতির দ্বন্দ্ব আমাদের স্মৃতিতে মৃত 'আলো'
তরবীমানি পূর্ণবর্তে পড়িয়া আনন্দ হইবার উপক্রম
হইল, তখন তুমি প্রত্যেক হইয়া নিঃসঙ্গভাবে
আমাদের সাহায্য করিবার লজ আমাদের পাশে

আশিরা পাড়ায়সে—আমাদের সহায়ক হইলে—
আমাদের যুব জাতিসে, তখন বৃত্তিগান তোমার অঙ্গ-
পট সাহিত্য দেখার পড়ীত।

তারপর যখন যেখানায় হারিত্যকে বরণ করিয়া,
লক্ষ্য মান-ভাষ্যকে উপেনা করিয়া, জীবনপথে সঞ্চারে
চলিতেছ—বিদ্যাপথের জায় উচ্চ, জ্ঞানপথেরে কৃষি
অর্থ-ও অভিজাত্যের পথে নত হইতে দিতেছে না—
আমাদের, আলোজন-আলোচ্যর শিখা তোমাকে
আধিপত্য হইতে বিপথে লাই। হাইতে পারিতোছে
না, তখন-অল্পমে তোমার হিকে নত্ব নত হইয়া
পড়িল।

তারপর ১৩১৫ সালে যখন যেখানায় কৃষি-আন্তরিক
বন্ধু—আপনার গ্রাম তুলু করিয়া কথ বন্ধুর দেখা
করিতেছে—যখন যেখানায় বন্ধু-মণ্ডল জাতি নির্দি-
শেবে সেবারবর্ধকে কৃষি প্রাণালেকা গির করিয়া
সইয়াছ, যে কথী, যে বন্ধু-দে-বহিত, সেই দিন
তোমার-আমার ভিতর কথব লাক্ষ্যে নিদনর বে যাক-
বানটা ছিল সেটা পূর হইল। তোমার দান হইল
আমার যুগে। সেইদিন হইতে কৃষি আমার সখ্য।

তোমার প্রাণটা সে কথ উচ্চ তা তোমার যিনি
ভাল করিয়া যেখানায় হুবিয়া পাইয়াছেন তিনিই
জানেন—তোমার জগত নিহিত অস্তঃসলিলা প্রেম-
কল্পর যিনি সন্ধান পাইয়াছেন তিনি ধন্ত হইয়াছেন—
আর যিনি সেই কল্পর উল্লসের বাহিন্যে সেরিয়া,
তোমার স্পষ্ট কথার কাক পাইয়া চলিয়া আসিয়া-
ছেন, তিনি সে সন্ধান পান নাই। পরার্থে তোমার
দায়ন উৎসর্গ।

তোমার বাস্তবতা, তোমার জগতের প্রতিভা,
তোমার ভাষা জননী প্রাতি অর্জুয় অজুয়,
তোমার সত্যনিষ্ঠা, তোমার সূক্ষণতা, তোমার পাত্র-
পকর করিবার বাসনা, ও সূত্র হতে বান, বহুপ্রব
সমুদ্রানন্তগির প্রাতি তোমার সমতা, সঙ্কোচবি
তোমার উদারতা, সর্বদা সর্বদনের আদর্শ হইবার
উপদ্রু।

কথা উঠিতে পারে কৃষি সাহিত্যের কি করিয়াছ?
হাস্যেতে সন্দর্ভের অধিকারী হইতে পারে? বেদিনী
পূর সাহিত্য-পরিষাৎ কেন তোমাকে লক্ষ্যনিত করি-
তেছেন? উত্তর কেবল মাত্র 'বহুপ্রতি' বলিতে
বলিতে পারিতাম—বলিতে-পারিতাম বেদিনীপূর-
সাহিত্য পরিষদের সন্ধানী 'কর্ম-কামবীর' জগ
তোমার প্রাণপাত চোয় পুন্ডর 'তোমারি-
সাহিত্যিক কল্পবর্ধ' তোমার বিতেছেন। তা নত-
বন্ধু তা নয়। ১০সিখংটা আমার 'বর্ধ-
বনে ১৪ প্রাণ পুন্ডর বলি। এই নত-
আপত্তের যিনে তোমাকে সন্দর্ভ করিয়াছ
জগৎ বালাগা যেনের প্রাণে একটা চেতনা আসি-
য়াছে। সেই চেতনা—সেই ভাবটা—মুষ্টি গ্রহণ করি-
য়াছে বেদিনীপূরের সাহিত্যপরিষদের অধিষ্ঠিত এই
আয়োজনে। যাননী পুন্ডর আচাধ্য হুপ্রাণ-
শারী প্রবু সাহিত্যকর্মের জগৎসংস্কার যে তর্কবর্ধ
নহর উদ্ভিৎছিল, তাহা বেদিনীপূর সাহিত্য-পরিষ-
ত্রেণে আসিয়া পৌছিয়া মাত্র, এখানকার জগৎসংস্কার
ভাবকে সূত্রি দিয়া প্রাণবন্ত করিয়াছেন। জগতে
মনোবীর পূজাই সমস্ত মণ। কথীর পূজা কে করে?
মনোবীর ভাবের সন্ধান পেন। ভাবকে কল্পের বায়া
যে সত্যতা পান করে সে কি বরণীয় নয়? যে
সাহিত্যসেবার অস্ত্রসেবক, যে অমান্যকে মান মান
করিতে থাকে, যে অধিকন সাহিত্যের সাধকে
পুন্ডিয়া বাতির করিয়া সাহিত্যসাধনার উৎসূহ করে
সে কি বরণীয় নয়? আর একটা কথা, সাহিত্যের
অকৃত্রিম সেবার হিকে হইতে বেদিলেও আদ্যবন বন্ধ
কৃষি ও জগতের জায় ভাল-চলনকে দেখা করিয়াছ,
তারার কি পুরস্কার নাই? কৃষি মাক্তাধাকে কি
বিশাছ তাহা সেবিয়া কৃষি সন্তর্ভা পরিবার উপদ্রু
কিনা তাহার বিচার করা চলে না—বহিও কৃষি
যাহা-বিচারে তাহা অকিঞ্চন নয়। তোমার প্রভা
এখন বহুভারতীর হাতুল চরণে চিত্ত-উদ্ভব থাকিবে,
ইহা আমার বিশ্বাস। তোমার 'কাত' কি

রক্ষণীকর্তা' পণ্ডিতা রক্ষণীকর্তাকে বাচালী চিনিবে, বুঝিবে, সম্বোধন করিবে। তাঁহার 'বাঁধের বেড়া' মোটা কাপড় মাথায়' তুলিয়া লইয়া বাচালী হইয়া হইবে—আশনার জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে কল্পনা করিতে চুটিবে। সে শুভদিন আগত আর। আর একটা কুণ্ডলী এখানে বলা গেল হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ইংরাজী কবি 'গ্রে' একটা কবিতা Elegy লিখিয়া অমর; বাচালীর স্বসীম গোবিন্দজ্ঞান, 'কতকাল পরে, বস ভারতের হৃৎকণ্ঠে সঁতারি পাঠ হবে' ও 'নিঃশব্দ সলিলে বহিছে সদা তটপলিনী জলধর হৃদয়ে' ও 'তাইট সীত স্তন্য করিয়া অমর; কে বলিতে পারে তবিস্তারে নগিনীজ্ঞান দেখিবার হইবে না। অমর ইচ্ছাও মনে রাখিতে হইবে এখনও নগিনীজ্ঞানের শক্তি উৎস শুভ হয় নাই। এই লক্ষ্যনা তাঁহাকে সাহিত্য-সংসার প্রতি অবিকলত আকর্ষিত যে করিবে—সাহিত্য-সংসার উদ্ধৃত যে করিবে—তাহা আমি দৃষ্ট করে বলিতে পারি।

এল তাই, আজ যে মন তুমি, অর্জুন করিলে তাহাতে তুমি পণ্ডিত হইবে না জানি—বস্তুবাদবাদের গুণাঙ্গীত তুমি মত-সম্মতকে গ্রহণ করিবে জানি; কারণ তুমি ও আমি যে একই গুরু শিষ্য। সেই বর্ণগত আত্ম-জ্ঞান, হিতবী বোম্বকেশবীর আদর্শ হইতে তুমি কখনও বিচ্যুত হইবে না। জ্ঞান-ত-জাই গ্রিমে শোকও কোন দিন বিলুপ্ত হইবে না, আনন্দও কোন দিন আত্মহারা হইবে না। গ্রন্থ হৃৎকণ্ঠে শুভবাদের অধাচিত্ত দান বসিয়া তিনি গ্রন্থ করিতেন। তুমিও ঠিক সেইভাবে এই লক্ষ্যনাকে গ্রহণ করিবে। তাঁহার আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়া যেমন চণ্ডিচোরে তেমনই চণ্ডিবে। তোমার পথ মঙ্গলমুখ হউক। স্বর্গ হইতে তোমার মস্তকে তিনি গুণাঙ্গীত দান করিতেছেন। তোমার সাহিত্য-সাধনা জয়মুখ হউক। *

* একজন ব্যক্তি বেদবীণ-সাহিত্য-সাহিত্য উৎসর্গে অগ্রসর বসিয়াছেন লক্ষ্যনা দ্বারা সেব্য কর্তৃক পঠিত।

মানস পূজা

(গান)

[শ্রীললিতমোহন স্বরূপাচার্য্য বি, এল]

নাথ, আর যে আমি
জা'কব না তাহার ;
তোমার যে পাইনা সাক্ষা
হৃদে হুঁরে গীতার ।
এব আমি নীরব হ'ব
মনের তলে তলি'য়ে বাব ;
বেশি যদি কথা দাখ ।

প্রতিমা মন অধঃখানি
বিশাল বিরাট সৃষ্টিমানি
মহা মন, নীরবতা,
পূজা মানসময় ।
(মন) অ'বিশ্বাসে, রবি শশী,
জয় যাবে উলস বিধি,
আরও অ্যোতির্ঘর

পাহাড়ের কথা। (পূর্বানুহৃত) (নগেন্দ্রনাথ বসুস্বয়ং)

পাহাড়ীদেশের ভাষা। পাহাড়ের
ভাষা কিম্বদন্তি ভাষা। তাহাদের শব্দমালা কতক
নোশা, কতক চকি, কতক বাহলা, কতক
বা উড়িয়া। অনেক শব্দ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ।
পাহাড়ীদের যে শব্দগুলির অর্থ কোন দেশীয় কোন
শব্দের সাহিত্য সাহিত্য নাই সেইগুলি খাঁটি পাহাড়ী
শব্দ। নিম্নে এদের শব্দ তালিকা চাইতে পাহাড়ী
ভাষার উপরি বর্ণিত প্রকৃতির কতকটা আভাস
পাওয়া যাইতে পারে। বাংলার পাহাড় অঞ্চলে
কেহাইতে বান অথচ পাহাড়ী ভাষা বোঝেন না,
এখন এখন তাঁহাদিগকে যে অহুবিধা ভোগ করিতে
হয়, এই তালিকাত্তর শব্দগুলি জানা থাকিলে
সে অহুবিধা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইতে
পারে।

শব্দ তালিকা

শ্রীশ্রীশ্রী। শব্দ

অন্যপ্রত্যয় বাচক

মাথার চুল—কেশ, কপাল

মাথা—টাইকো

মাথার খুলি—খপর

মাথার খি—গিডি

কপাল—নিধার

রস—কালগট

কাপ—কাপ

চকু—আঁখি

চকের পাতা—পলক

চকের পাতার চুল—পরেলা

ক্র—আঁখি দুই

৭৩

নাক—নাক

গাল—গালা

কাঁধ—কুম্, কাঁধ

দলা—ধিলকো

কড়া—খকালি হাড়

মুখ—মুখর—মুখ

মুখ—মোহোড়া

গোক—জুলা

চিবুক—চিউঁকা

মাড়ি—মারি

গলায় নলি—বোকে

ঝিঝা—ঝিঝো

ধাত—ধাত (এক বচন) ধাত হক (বহু বচন)

ধাতের মাড়ি—গোলা

চোখাল—বংগা

বুক—ছাতি

শিঠ—আং, শিঠ

পেট—বুড়ি

তল পেট—সামু হুঁড়ি

নাড়িহুঁড়ি—আঁতাইক

কোঁক—পানি পেট

পাঁজর—করক

নাড়ি—নাইটো

বগল—কাঁধ

বাহু—পাকুরা

হাত—হাত

কছুই—কছুই

হাতের কজা—নারি

নাড়ী, বিরা—নদা

(হাতের কজাৎক নাড়ি বলে, পাখের খসকে
কনি নাড়া বলে, হাঁটকে বঁড়া বলে। কিন্তু খিল বা
কজার নাখাওন নাম নদা।)

করতল—হংকলা

করপুট—হংকিহানা

আতুল—উলো

নখ—নক

সোম—সু

কোমর—কমর

পাহা—চাক

উক—তিথিয়া, কাং

হাঁটু—বুঁড়া

জন্মা—নলি হাক, নলি বুঁড়া

পাখের ডিম—ছেপারি

পাখের খিল—কনিনাড়া

পা—বুঁড়া

সোড়ালি—হুয়ুতা

পদপুট—সোড়, লামবুঁড়া

পদন্তল—পাঁরভালু

শরীর—জিষ্ট

পাখের চামড়া—হাল, বালো

নব্ব্ব বাটক

বাখা—বাবু, বা

খা—আখা

বুঁড়া—কাছাবাবু

ঝোটা—ঝোটাবাবু

(বুঁড়া এ বঃ ঝোটা উত্তরকেই বাবু বলা হয়,
কিন্তু সেই বাবুর পূর্বে একটি হিসেব থাকে।
অর্থাৎ বুঁড়া বাটের কেহ তাই, সেজ তাই বা ছোট
তাই হইলে কথাক্রমে মাইলা বাবু, মাইলা বাবু,
কাছা বাবু ইত্যাদি। ঝোটা নব্ব্বভেও ঐ নিয়ম,
মাইলা ঝোটা বাবু, মাইলা ঝোটা বাবু, মাইলা ঝোটা
বাবু, ঝোটা বাবু ইত্যাদি)

বুঁড়ি—কাছা আখা, মাইলি আখা ইত্যাদি।

ঝোটা—ঝোটা আখা, মাইলি ঝোটা আখা
ইত্যাদি

(এলা বাহলা যে এই আখা নব্ব্ব নব্ব্বত আখা

নব্ব্বের ভগ্নাঙ্কর)

মাখা—মাখা

মাই—মাইলু

মোসো—চোখু, কাছা বাবু

মাই—মোয়া

মিলে—পাছ

মিলি—হুপু, মিলি

মামা—মামু

মিহি—মিহি

মামী—মোয়ে

ম্রী—সোধানি

তাই—তাই

ভগিনী—বহিনি

বত্তর—বত্তর

বাওড়ী—বাও

মামা—মামা

মালি—মালি, ঝোটা মাত

তরীপতি—তোলা, মৌয়াই

যে তরী বসলে ক লে তরীর পঠিকে বলে
তোলা। যে তরী বসলে ছোট লে তরীর মামীকে
বলে মৌয়াই।

মামাই—মৌয়াই

(তরীপতি এবং মামাই এই উত্তরকেই মৌয়াই
বলে। তবে যেখানে একেই বুঝাইয়া দিতে হইবে
সেখানে তরীপতিকে ক লে বহিনি মৌয়াই,
মামীকে ক লে ছোমি মৌয়াই)

ছেলে—ছোয়া

মেয়ে—ছোয়ি

ভাওয়া তাই, জালিপতি তাই—পাকু তাই

পিতামহ—বালো

শিতামহী—বহু
 এশিতামহ বহাঙ্ক
 এশিতামহী—বহাঙ্ক বহু
 বৃদ্ধ এশিতামহ—বহু
 বৃদ্ধ এশিতামহী—বহু বহু
 অতি বৃদ্ধ এশিতামহ—চাপ্ বহু
 অতি বৃদ্ধ এশিতামহী—চাপ্ বহুবহু
 (সাত্বহ এক সাতামহী ইত্যাদি শিতামহ
 শিতামহী ইত্যাদির অবিকল অন্তরূপ)
 শৌত্র—নাতি
 শৌত্রী—নাতিনী
 এশৌত্র—পনাতি
 এশৌত্রী—পনাতিনী
 কনিষ্ঠ এশৌত্র—বনাতি
 কনিষ্ঠ এশৌত্রী—বনাতিনী
 অতি কনিষ্ঠ এশৌত্র—বনাতি
 অতি কনিষ্ঠ এশৌত্রী—বনাতিনী
 হুইব—হুল হুইব
 ভাইলো—ভমাই
 ভাই বি—ভমাইনী
 ভায়ে—ভায়া
 ভায়ী—ভায়ী
 পূত্রব—বহু
 প্রাতৃব—বহু
 প্রাতৃব্য, ভাইল—ভট্টী
 বহু বচক
 গায়কায়—পুত্রাল
 কাশক—লুগা
 (এই লুগা শব্দটী উড়িয়া দেশের ব্যবহৃত লুগা
 শব্দের অপভ্রংশ)
 বিহানা—উছান
 কালিন—বিরাদি
 (বালিনের বোল বালি কোন ক্রম দখ
 গাহাড়ী ভাষায় নাই) ।

পাথরের খোঁয়া—চোড়।

বৃক্ষলতাধি বাচক

গাছের কন্ড—আলু

গাছের মূল—জড়া

গাছের অস্থুর—টুনা

গাছের চাতা—বাছা

গাছ—কন্ড

গাছের শুড়ি—মুগা, ডাঁটু

গাছের শাখা—হাঁগা

প্রশাখা—শালু হাঁগা

গলব—পাউসো

মুকুল—কশিলা

ফুল—ফুল

ফল—ফল

বীজ—গোড়, বিউ, বীজন

গাছের ছাল—বোপ্তা

গাছের আঠা—চেল

গাছের রস—কোস

গাছের শাভা—পাতি

লতা—লং, বোদ্

ধান—ধান

আলানি কাঠ—খাওরা

নক নক আলানি কাঠ—কিঁধা নাওরা

জীব জন্ত ও কীট পতঙ্গাদি বাচক

ছাগল—বাঁশুরা, চেংরো

(নাগারণ ছাগলকে বাঁশুরা এবং বাঁহাঘের গায়ে
লম্বা লোম আছে তাহাদিগকে চেংরো বলে) ।

ভেড়া—ভেড়া, ভেংসো

(যে আঠার ভেড়ার বড় বড় সিং আছে সেই
জাতিকে ভেংরো বলে) ।

পেয়াল—মুইলো

বেঁক শিয়ালি—শিয়াল

কাঠ কড়ালী—সোখারকে

শিপাড়ে—কঁদিল

মাছি—কিসা

মশা—মাম খুঁটে

ছারপোকা—খাটমল

(গাছাড়াঘের বেশে ছারপোকা নাই । কিসেস
হইতে কখন কখন আমদানী হয় । তাহারাও
কিদেশী নাম খাটমল ব্যবহার করে) ।

উফুন—ফুফা

কড়িং—সলাহা

কিঁকি পোকা—কঁউকিড়ি

হোনাকি পোকা—ফুনকিড়ি

পোকা—কিড়া, কিড়ি

পাখী—চড়া

পাখীর পাখ—ভুংলা

পাখীর ঠোঁট—চুচো

পাখীর ডিম—ফুল

মৌমাছি—মাউরি

প্রজাপতি—পুতলি

পাখীর বাসা—শুড়

কাক—কাগ

চিল—চিল

চড়ুই পাখী—ভংসো

শাদিক পাখী—ময়না

শহুনি শিখ

প্রাকৃতিক-বস্ত্র বাচক

আকাশ—আকাশ

মেঘ—বাদল

কুষ্টি—পানি, হারি

রাবন্ত—ইন্দ্রনী

স্বৰ্ণা—স্বর্ণ, ধাম

চৌত্র—ধাম

চন্দ্র—চুন

মোংখা—চুন

নক্ষত্র—তার

সুদাসা—সুইরো

ভূখর—ভূখর

বরফ—হিট

শিখর—শিখ

বিদ্যুৎ—বিদ্যুনি

শিলা—বজ্র

নদী—নদী

প্রাণী—খোলা, খোলা

করণী—কোরা

(করণী বহুতর পর্যন্ত পাহাড়ের মাথায় ও পাহাড়
পারে থাকে ততদূর পর্যন্ত তাহার নাম কোরা; যখন
পাহাড়ের উপত্যকায় আসে এক ক্ষুদ্র নদীর আকার
ধারণ করে তখন তাহার নাম খোলা; ঐরাপ সমতল
ভূমিতে যখন আসে তখন তাহার নাম নদী। করণী
ও খোলা বর্ষাকালে বৃষ্টি প্রবল থাকে। অল্পকালে
কোনটা বা একেবারে শুকাইয়া যায়, কোনটা বা
কোনকায় ও কোনকোন্ডা হইয়া প্রবাহিত হয়। নদী
কোন হইতে পারে কিন্তু একেবারে শুকাইয়া না, খোলা
শুকাইয়া লগ প্রবাহ হীন হইতে পারে। নদীর সঙ্গে
খোলার প্রভেদ এইটুকু)।

বিশাল পর্বত—পর্বত

ক্ষুদ্র পর্বত—পাহাড়

পর্বত শিখর—চুনি

পর্বতস্থ উচ্চ ভূমি—ডাঁড়া

পর্বতস্থ ক্ষুদ্র উচ্চ ভূমি—ডাক, ডিল

খাড়া উচ্চ বা খাড়া নিম্ন (precipice)—জীর

অপর কয়েকটা বিশেষ শব্দ

বনেশ—বনেশ

কিম্বদ - কিম্বদ

সমতল নিম্ন ভূমি (, plain) —মদেশ

বড় রাস্তা—সড়ক

ছোট রাস্তা—বাট, চোরবাট

বজ্র - কলেশ

দুধ—দুধ

দধি—দধি

খোল—মহি

মখন ভাঙ—ঠেঙ

মখন লগ - পাবন

দুধ বা দধি ভাঙ - ভুংগো

দুগ্ধল—কোন্সো

ক্রোধ—বিষ

শ্রুণা—খিপ

দুধায়—দৈনা

লক্ষা—লক্ষ

সচেত—কুরিকুরি

জাতি—খকাই

চুন্সকা, পাঁচড়া—সুতো

সন্দেশ—সন্দেশ

মিনতি—বিনতি

দিবা—কিষ্টিয়া

কলস—মোম

চরিত—অনিবানি

কোড়া—কোকা

ব্যবহার—গরাই

সুত—সিয়ো

ছাতি—ছিউ

হোচট—ঠেস্

কৌতুহল—আচমক

কৌতুক, ভাংসা—ফট

বানান (spelling)—চিছি

কাল-পরিমাণ বাচক

দিন—দিন

রাস্তা—রাস্তা

সেতেঙ—পোলা, পল

মিনিট,—মিনিট, মিনিট

কটী—কট, বরি

লক্ষ্য—লক্ষ্য

মাস—মহীনা

বৎসর—বর্ষ

অত—অত্
 গতকাল—গিচ্
 গতপরা—পরশি
 তৎপূর্বে যে কোনদিন—আতি
 আগামী কাল—ভোলি
 আগামী পরশ—পরশি
 তৎপরে যে কোনদিন—আতি
 প্রাতঃকাল—বিহান
 মধ্যাহ্নকাল—মোশহতি, মধ্যাহ্ন দিন
 অপরাহ্ন—বেগুকা
 শক্য—বিনিয়িল, স্যাম্
 মধ্যরাত্রি—আধারাত্রি
 পরে—ভরে
 দিনের মধ্যে—দিউসো
 রবিবার—আইতবার
 সোমবার—সৌবার
 মঙ্গলবার—মঙ্গলবার
 বুধবার—বুধবার
 বৃহস্পতিবার—বিহিবার
 শুক্রবার—শুকবার
 শনিবার—শনিবার

রক্তপীতাদি রঙ্গ বাচক

শেত—শেতা
 রক্ত—রক্তো
 কৃক—কাল
 হরিৎ—হরিরো
 পীত—পাহেলো, পলো
 বেগুনি—কুম্বে,
 কটুভিজাদি রঙ্গ বাচক
 তাল (কটু)—পিরো
 তিক্ত—তিক্তো
 কষায়—টরয়ো
 অম্ল—অম্বিলো
 দবল—কুনিলো

মধুর—মিঠো

সর্বনাম লক্ষ

আমি—ম
 আশ্রয়—আশ্রিক
 (পাহাড়ী ভাষার বহুবচনের স্বতন্ত্র রূপ নাই।
 এক বচন শব্দের পর "হক" শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন
 হয়)।

তুই—উ
 তুমি—তিমি
 তোমরা—তিমিহক
 (উ শব্দের বহুবচনে উহক না হইয়া তিমিহক
 হয়)।

আপনি—তকাই, আত্
 আপনারা—তকাইহক, আত্ হক
 তিনি, সে—উ
 তাঁহারা, তাহারা—তিনি হক
 (উ শব্দের বহুবচনে উ হক হয় না তিনি হক
 হয়)।

ইহা, তাহা—ভিরো, ইরো
 যাহা—জুন, জো
 কে—কো
 কোন্টা—জুন
 প্রত্যেক—গোটা গোটা, সটো
 ঐটা, এইটা, সেইটা এইরূপ "টা" কিংবা "টো"
 কুতাইবার অন্ত পাহাড়ী ভাষার টাই ব্যবহার হয়।
 যথা,—

ইরো টাই—এইটা,
 উরো টাই—ঐটা,
 তিরো টাই—সেইটা

বিশেষণ লক্ষ

অনেক—খেরো, খুয়ো
 (সংখ্যা বুঝাইলে খেরো এবং পরিমাণ বুঝাইলে
 খুয়ো ব্যবহার হয়)।

অন্ন—অনি

অন্ন অন্ন—অনিকতা, অনি অনি

অন্ন অন্ন

আব্দু—নাতি

অন্ন—আব্দে

ইতর—ন রাত্রো

উক, পন্ন—ভাত্রো

কণ্ট কণ্ট

খল নভাতি

কটিন—সারো

চালাক—চন্দ

ছোট—সাহু

টাকুকা—আলো

পুটে ন রাত্রো

পত্রিমা—দ্বিহীনতে

পাচ—সুহু

পিচ্ছল—চিপ্পো

বড়—চুপো

বিদ্বৎ—চুপি

দ্বাদশ—মাইল

কোষ—কম্বো

মিহি—মসিনা

কোষ, ঠাণ্ডা, ষ্টল—চিলো

সুন্দর—জাতি, রাত্রো

অন্নপিত্ত—গবেল

কিন্দ—অবেল

লগা—সারো

সোলা—সোবো

বাক—বাকো

সুহু—সক

ভুলনার মত বাঙ্গলা ভাষায় যেখানে অপেক্ষা এক ইংরাজীতে Than ব্যবহৃত হয় পাহাড়ীরা সেইখানে ভাষা ব্যবহার করে। যথা—

ভাষা অপেক্ষা ঢাক সুন্দর—ভাষা ভাষা ঢাকলে রাত্রো মো।

রাত্রো এবং জাতি দুইটা শব্দের অর্থ, সুন্দর।

প্রভেদ এই যে বাঙালি ভাষায় সুন্দর তাহা রাত্রো এবং বাঙালি ভাষায় সুন্দর তাহা জাতি।

ক্রিঃ পদ

পাহাড়ী ভাষায় ক্রিয়ার ভাষা “হু” ক্রিয়া হইয়া থাকে। যথা,—

করা গল্প

বলা—ভুল

বেথা—হেরত, বেথু

বাগচা—বাহু

আলা—আউত

বাগচা—বাগ, হিঁড়ত, পালত

(যান্ত্রিক গুণজন সম্বন্ধে “পালত” ব্যবহার হয়। সাধারণ ব্যক্তিকে কোথা বাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে কাঁহা বাহু বা কতা বাহু বলা বাইতে পারে। কিন্তু মাননীয় ব্যক্তিকে বলিতে হইবে কতা পালত সহ)।

কেচান—ভুল

কিরগা আলা—করকাউত

চাঁকচাঁক করা—কড়াউত

লাফলাফি করা—উক্কে

হানা—হানত

ভালা—ভাঁচত

মারা—হুত, হানত

আছাড়া—হিঁড়কাউত

বলা—বসত, রামপত

(কাড়ীতে কেহ আদিতে হাহ হোস হুত হোস—আসতে আলা হুত, বসতে আলা হুত বলা হয়। কিন্তু কোন উচ্চ স্থানের মাননী ব্যক্তি আছিলে বলা হোস এর পরিবর্তে রামপত হোস বলা যায়। রাম পদ বিরাট শব্দের রূপান্তর মাত্র।)

বড় করা—খুল

বেলা—উভারত

ভালবাসা—শিষ্টাচার প্রদর্শন
 হওয়া—ভুল
 শেষ হওয়া—সম্পূর্ণ, ত্বরান্বিত
 সৌহার্দ্য—পুণ্ডিত, পুঙ্খ
 ক্রমান্বয়ে—পুঙ্খ
 -ত্যাগ—নাশাঙ্কিত, বাবাউন।

- টোল (Pull) - বঁটাড়ন
- টোল (Pull)—তান্ন
- বাহির হওয়া—নিষ্কৃত
- প্রবেশ করা—গমন
- চাকা বেওয়া—ছপন
- সরাইয়া বেওয়া—সারান্ন, সারিভি
- উৎসে ওঠা—উৎসাহ
- ধরিয়া বাওয়া, অঁকিয়া বাওয়া—ভরন
- চুলকান—চিলান
- বসি করা—ছাওয়, কাড়ন
- হাতবুলান—সারান্ন
- হাঁচা—ছিউ তড়ান
- হাইতোলা—হাইগরন
- সাড়িকামান—খোঁচন
- পড়িয়া বাওয়া—পড়ন
- ধরা, ধারণ করা—সানান
- মোড়ান—হুকন
- ভুলিয়া বেওয়া—উছান
- আড়তবে চাওয়া—বসন
- উত্তেজিত করা—উচ্চাটন
- ভর করা—ভরাটন
- অস্থান—অস্থান
- সরা—সরন, সরন
- পাটোপা—ট্রিট, মিটন
- ক্রিয়ার বিশেষণ
- অক্ষত—চিলে
- অবশেষে—অবিরতন, অত্যা
- বীরেন্দ্রবীরে—বিত্তরে বিত্তরে

বীর বীর—ছিটো
 বলাসহে—বেলাস
 অসহে—বেলা
 এককালে (at a time)—এক বার
 ঠিক ততনে—ঠা/মাই
 হস্ত, সস্তা—বেলা

অর্থ

এবং—ও, ও, মনি, তর
 বা, অথবা—নতবে
 কিংবা, না হয়—কতা।
 কিংবা, তবে—অথ
 যদি—তান
 এখন—অইলে
 যখন—ইলে
 এখনই—এইমাত্র—ততনরে
 এখন পর্যন্ত—অইলে মদা
 একবার—এক দিন
 এখনই, অর্থাৎ অবিলম্বে, এই অর্থেও এক দিন
 ব্যবহার হয়
 নিকটে; ছোট মা
 আশে আশে—ছোট ছোট
 যখন—যব
 তখন—তব
 অস্তিত্ব ভাবের ভাব পাহাড়ী ভাবেরও কর্তা,
 কর, করণি ভেবে সাটী ভিত্তি আছে যথা,—
 ১ম—ন, মৈলে
 ২য়—মলাই, হামিহকলাই
 ৩য়—ন বাট, হামিহকলাই
 ৪র্থ—মলাই, হামিহকলাই
 ৫ম—ম মৈথি, মমৈথি, মবাট
 ৬ম—মেরো, হামিহকলাই
 ৭ম—মদা, হামিহকলাই
 ৮ম—মিত্তির মপলে

২য় বিতকির রূপ "শাই"	
৩য় " " "বাট"	
৪র্থ "শাই"	
৫ম "মেথি," "মেথিন," "বাট"	
৬য় "রে," "কো" "কো"	
৭ম "মা"	

সূচী

আমাকে বলিচ্ছিল—মলাইউতনকে। ধিগে।

উহা ধারা হইবে না—তিয়া বাট ব'ইবে।

বাধাকে বিয়াছি—বাছলশাই দিবেতোছ।

বলল হইতে আসিয়াছে—অবল দেখিআবেকোছ।

তোমার ভারী কোথা—তিয়া ভাজি কত্রা হো।

কলসীতে অনেক জল আছে—গাংরায়া হুএ।

পানি হ।

কোন ভাষার কথা কহিবার অভ্যাস করিতে হইলে পরচনা শিক্ষা করা প্রয়োজন। পরচনার ক্ষর অন্তর হইতে ত্রিনিবের প্রয়োজন, একটা বিশেষ্য পদ এক একটা ক্রিয়াপদ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও তাহারের বিতকির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রিয়া বাচক বাতুর তালিকাও দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল বাতু ও তাহারের অর্থবোধক পদ প্রয়োগ করিতে শিক্ষা না করিলে কেবল বাতুজান থাকিলে চলে না; সেই জন্য বাতু হইতে পদ প্রস্তুত প্রণালীর কিছু কিছু লক্ষ্য দেওয়া দেল।

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কাল, এক বাতু যাত্রাই "হু"-কারাত। বর্তমান কাল তিন ভাগে বিভক্ত। সামান্য বর্তমান, তাৎকালিক বর্তমান, সন্দিগ্ধ বর্তমান। সামান্য বর্তমানকালে বাতুর অন্তে স্থিত "হু" কারের "ল" লোপ হয় এবং উ শোপের পর হস্ত 'ন' কারের সহিত উভয়, যথায় ও প্রথম পুরুষের এক কন ও বহুকন ক্রমে "হু, হৌ"; ছল, হৌ; ছ, ছন" প্রত্যয় বোণ হয়। যথা,—

আমি বাই - ম বাছ,

আমরা বাই—হামি হক বাবুহৌ
তুমি চিঠি লেখ—তু চিঠি লেখহু
তোমরা চিঠি লেখ—তিমি হক চিঠি লেখহৌ
শে করে—উ পরহ
তাহার করে—তিনি হক গবহু

যাহ, বসহু, লেখহু, পরহ, আউহু, বাউহু, হাসহু ইত্যাদি কার্যাত্মক পদের অন্তর্ভুক্ত "হু"কে ক্রিয়া সংজ্ঞা বলে। বাতু হইতে পদ প্রস্তুত করিবার সময় কোন কোন ক্রিয়া সংজ্ঞার একাংশ, অর্থাৎ "হু"কারের "ল"কার মাত্র লোপ হইয়া হস্ত 'ন' ব্রহ্মার থাকে আবার কোন কোন সংজ্ঞার পূর্ণ অবয়ব "হু"এ লোপ হয় এবং "হু" লোপের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার পর প্রত্যয়ের বোণ হয়। উপরি লিখিত বাছ, লেখহু এবং পরহ তাহার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা বাইতে পারে।

যাহা ধারা ক্রিয়ার আরম্ভ হইতে হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাণ্ড অসমাপ্ত রহিয়াছে ব্রহ্মার তাহারে তাৎকালিক বর্তমান বলে। তাৎকালিক বর্তমানকালে ক্রিয়া সংজ্ঞা "হু" লোপ হইয়া তাহার স্থানে "ই" আবেশ হয় এবং তাহার পর প্রত্যয় বোণ হয়। যথা,—

আমি বাইতেছি—ম বাই রহেছ

আমরা বাইতেছি—হামি হক বাই রহেছে

তুমি হাসিতেছ—তু হাসি রহেছ

তোমরা হাসিতেছ—তিমি হক হাসি রহেছে

বুঝান হাসিতেছে—বুঝানলে হাসি রহেছ

বুঝানেন হাসিতেছে—বুঝান হকল হাসি রহেছ

সামান্য এবং তাৎকালিক উভয়বিধ বর্তমান

কালেরই ক্রিয়া আরম্ভ বা নিশার হওয়া সত্ত্বে যেখানে সম্ভব জ্ঞাপন করিতে হয়, সেখানে সেই বর্তমান কালকে সন্দিগ্ধ বর্তমানকাল বলে। এই সন্দিগ্ধ বর্তমানে ক্রিয়া সংজ্ঞা "হু" লোপ হইয়া তাহার স্থানে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের এক কন ও বহু কনে যথাক্রমে "দো" এবং "বা" আবেশ

৮ হু। ক্রীড়কের উভয় বচনেই “দী” আদেশ হয়। তাহার পর লিঙ্গ ও বচন ভেদে বিভিন্ন রূপের “হোলা” শব্দ যোগ হয়। হোলা শব্দের অর্থ “হয়ত,” “বোধ হয়,” “সন্দেহ,” ইত্যাদি। যথা,—

আমি খাই বোধ হয়—ম খাঁকো হ’ল।
আমরা খাই বোধ হয়—হামিংক খাঁকো হোউ’ল।
তুমি খাও বোধ হয়—তু খাঁকো হোলান্দ।
তোমরা খাও বোধ হয়—তিমি হক খাঁকো হোউলা।
সে খায় বোধ হয়—তিয়ে খাঁকো হোল।
তাহারা খায় বোধ হয়—তিনি হক খাঁকো হোলান্দ।
ক্রীড়কে হয় হ’ল। হ’ল। হ’ল।
হোউলা “ হোউলি
হোলান্দ হোলিন্দ
হোল। হোলি
হোলান্দ হোলিন।

এরূপ ভাষার কিছু হোলার বিভিন্ন রূপ ব্যবহার হয় না। সকল দিগ্ এবং সকল বচন নির্দিষ্টবে হোলা ব্যবহৃত হয়।

করিয়া, বেবিয়া, বলিয়া একুতি অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাইতে হইলে ক্রিয়ার পর “র” অথবা “কিনা” যোগ করিতে হয়। যথা,—করিয়া পরের, পরি কিনা; বেবিয়া—বেবির, হেতি কিনা; বলিয়া—অনের, ভনি কিনা।

যে অর্থ বুঝাইতে হইলে ক্রিয়ার পূর্বে ইংরাজী “ই” ব্যবহার করিতে হয় পাঠ্যক্রী ভাষায় সেই অর্থ বুঝাইবার জন্য ক্রিয়ার পর “না” অথবা “হু” যোগ করিতে হয়। যথা,—একুতি করিতে—বনাউবা, বনাউহু; চীৎকার করিতে—কড়াউবা; কড়াউহু; ক্রিড়িত—কড়াউবা, কড়াউহু ইত্যাদি।

ক্রিয়ার অকরণ বুঝাইতে হইলে ক্রিয়ার পূর্বে “ন” অথবা ক্রিয়ার পরে “হৈন” যোগ করিতে হয়। যথা,—আমি খাইতেছি না—ম ন খাই রহেছ, অথবা ন খাই রহেবো হৈন।

নেপাণী ব্যাকরণ অনুসারে অতীত কাল হয়

একর। যথা,—সাম্যক, আমর, পূর্ন, অপূর্ন, শবিক, হেতু-হেতু-মহুত। উল্লেখ্য প্রথম তিনটির জ্ঞান হইলেই যেটাদুটি পাঠ্যক্রী ভাষায় কথা কহিতে পারা যায়। যে ক্রিয়া সমাপ্ত হইবাছে কিছু কালের নির্দেশ নাই তাহার নাম সাম্যক ভূত, যে ক্রিয়া অগত্যা পূর্বে সমাপ্ত হইবাছে তাহার নাম আপর ভূত এবং যে ক্রিয়া বহুপূর্বে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার নাম পূর্ণ ভূত কাল।

সাম্যক ভূতকালে ক্রিয়ার্থক সংজ্ঞার “হু” যোগ হইয়া পূর্ণ ও বচন ভেদে “হে,” “হৌ,” “ইন,” “হৌ,” “হো,” “হে” একুতি প্রত্যয় যোগ হয়। যথা,—

আমি বলিয়াছিলাম—ম বনে
আমরা বলিয়াছিলাম—হামিংক বলো
তুমি বলিয়াছিলে—তু বলিন্দ, তৈলে বলিন্দ
তোমরা বলিয়াছিলে—তিমি চক বলো
সে বলিয়াছিল—তিয়ে বলো

তাহারা বলিয়াছিল—তিনি হক বলো

আমর ভূতকালে “হু” দ্বানে “একো” আদেশ হয়, তাহার পর সাম্যক বর্তমান কালের নিয়মানুসারে “হু, ছ, হু, ছে” একুতি প্রত্যয় যোগ হয় যথা—

আমি বলিয়াছি—ম অনেকোছ
আমরা বলিয়াছি—হামিংক অনেকোছৌ
তুমি করিয়াছ—তু গরেকোছু
তোমরা করিয়াছ—তিমিহক গরেকোছৌ
সে গিয়াছে—তিয়ে গরেকো ছ
তাহারা গিয়াছে—তিনি হক গরেকোছু

পূর্ণ ভূতকালে আমর ভূতকালের ভাব “একো” আদেশ হইয়া তাহার পর “বিয়ে” “বিয়েৌ” বিইন, বিয়েৌ, “বিয়েৌ” পরে একুতি প্রত্যয় যোগ হয়। যথা,—

আমি বলিয়াছিলাম—ম বনেকো বিয়েৌ
আমরা বলিয়াছিলাম—হামিংক বনেকো বিয়েৌ
তুমি বোকাইয়াছিলে—তু বেকো বনেকো বিইন

তোমরা যৌদ্ধিয়ারিহে ত্রিমিহক হুহুকেকো

বিমো

সে অপেক্ষা করিয়াছিল—উ পরবেকো বিমো

তাহারা অপেক্ষা করিয়াছিল—তিনি হরু পর-

বেকো বিমো

সাধারণ গ্রামা গ্রামে সকল পুরুষ এবং সকল

বচনেই "হু" এবং "বিমো" ব্যবহৃত হয়।

হওয়ার বাহু বা ক্রিয়া সংজ্ঞা হুহু এবং বাওয়ার

বাহু বাহু। নম্ব প্রস্তুত করিবার সময় বিগরে

হু হানে হু এবং বা হানে হু হয়। যথা

হাইয়াছে—ভয়েকোহু। পিরাছে—পরেকোহু

ভবিষ্যৎকাল হুই একার, লামাত এবং সন্ধ্যা।

সামান্য ভবিষ্যতে সংজ্ঞার হু হানে নে আদেশ হয়।

যথা,—

আমি যদিও ন বস্তুনে হু। সে বাইবে—

তিয়ো হানেহু

তুমি যদিও বাইবে—ও লড়নেহু, ইত্যাদি—

সন্ধ্যা ভবিষ্যৎকালে হু হানে পুরুষও বচন

ভেবে "উ"ল, উ"ল, লাস, উলা; ল, লান" প্রত্যয়

হয়। যথা, আমি বাইব বোধ হয়—ম হাউল, সে

বোধ হয় বসিবে না তিয়ো ন বস্তুনা

অকল্পে বাইব না, করিব না, দেখিব না ইত্যাদি

হলে ক্রিয়ের পর বৈন বোপ হয়। যথা,—

আমি হাইব না—ম জী বৈন। আমি জানি

না—ম জান বৈন। আমি করিব না—ম পরবৈন

আমি দেখিব না, দেখি না—ন হের বৈন।

হেরহু এবং দেখহু এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ

এই :—ম হেরহু—আমি দেখি; কিন্তু তিয়ো রাজ্যে

দেখহু—ওটা দেখাব তাহা।

ভয়ো, ভয়েকোহু; পরো, পরেকোহু; বায়ো,

বায়েকোহু প্রকৃতির উত্তর রূপেরই অর্থ এক।

তবে এইমাত্র প্রভেদ যে প্রথম রূপটি প্রভেদ এবং

দ্বিতীয় রূপটি তাহার উত্তর বানে ব্যবহার হয়।

যথা;

প্রঃ। উ পরো—শে পিরাছে কি ?

উত্তর। ম পরেকোহু—হী পিরাছে

ক্রিয়ায় ভিন্ন রূপ

পরহু—করা। পরাউহু—করান

নাচহু—নাচ। নাচাউহু—নাচান

ভাচহু—ভাঙ্গ। ভাচাউহু—ভাঙ্গান

জনহু—বলা। জনাউহু—বলান

পাচহু—পান করা। পিচাউহু—পান করান

সেউহু—সেলাই করা

সিরাউহু—সেলাই করান

হাচহু—হাঙ্গা

হাচাউহু—হাঙ্গান

মিচহু—মা টোপা

মিচাউহু—মা টোপান

কাচহু—কাটা

কাচাউহু—কাটান

চম্‌কহু—চমকান

চম্‌কাউহু—চমকাইয়া দেওয়া

(ক্রমণঃ)

পাখ

(ঐকোহিতলাল মনুষ্যের বি, এ)

জানি শুধু বাব বহুহু,

আনিয়াছি বহুহু হুইত,

আনিতে চাহিনা, কবে

এ ভ্রমণ কোথা পের হবে,—

আঁবি হবে তজ্জাতাভ্যাকুর

জান করি বৈতরুণী প্রোভে !

যত চলি তত ফিরে ফিরে,

ছেবে ঘেঁষি দূর বন-বৈতরু,—

ফেলিয়া এসেছি যারে

স্মৃতিশেষে আঁবিয়াতে,

তারে 'মরি' ভানি আঁবিনীয়ে,

—আবার যে-একা সেই একা !

পড়ে' আছে সবুজ পানে
দূর-দেগ, কোথা নাই কেহ !—
তারি মাঝে তরু-ছায়া
হঠিবে নুতন মাথ !
পুনঃ কোন অচেনার গানে
কুণে' ধাব কাদিকার বেহ !
তবু চলা !—গিছনে সমুখে
পথবাণি আদি-অন্তরীম !
সমুখেরে করি গিছে,

(কাল ছিল, আঁধা মিছে !)
মেতে উঠি কণিকের হুখে,
জালবাগি,—তবু উদাসীন !
তবু এই জীবন-জালাল
চাহি না যে শেষ করিবারে !
জানিতে চাহিনে, কবে
এ জ্বল শেষ হবে,—
অঁধি হবে ভ্রান্তারাত্তর
বান করি' বৈতরণী-প্রান্তে !

প্রপর্ণা

(উপস্থাপন)

[ঐকানোদিনি বোম]

কহ নৌকাপাড়ি ও সাধা সাধনা করিয়া ঠাকুরমা
বখন শশীশেখরের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে,
সোমেন্দ্র তাহার এক জ্ঞাতি ভগিনীকে চাকিবাসার্থ
আনিয়া হানাজুরে ঘেসের উপরকার ঘরে রাখিয়াছে,
এক তাহাকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সে
সম্মত, তখন ঠাকুরমা রাখাকে নিজের কাছে
লইয়া গেলেন। বিন কয়েকর মধ্যে রাখা ঠাকুরমা
ও ঠাকুরমার নিকট হইতে ভাল লাটিকিকট গ্রাপ্ত
হইল। মাতাপিতাহীন পত্নীত্বের মেঘে বলিয়া
ঠাকুরমা তাহাকে কু করিতে কোনও আপত্তি
করিলেন না, এক বার তার কাছেই বলিতেন,
যেহেতু বতাবই মেহেটির বৌতুক, তাহার আর অন্য
বৌতুক না হইলেও চলিবে। ঠাকুরমা সেকন্ডা ডাকিয়া
রাখার গহনা গড়াইতে দিলেন এবং কি কর্তর স্তোম্
সাকীতে কোন জ্যাকেটে তাহাকে ভাল মুনাইবে
তকিরে বহু গবেষণায় নিরুত্ব হইয়া গেলেন।

রাখাকে ঠাকুরমা লইয়া গেলে পর, সোমেন্দ্র বহু

দিনের অনাবৃত বইগুলি লইয়া বলিল। অনেক দিন
বুখায় কাটিয়াছে, এখন হইতে পত্নীকার জন্ত প্রেরিত
না হইলে আর চলে না। সোমেন্দ্র কৃতসম্বল হইয়া
পাঠে মনোনিবেশ করিল।

মাদ্রাস চিরকালই রাখা প্রের তাহা শালন করিতে
বাঞ্ছন, কিন্তু সে পথে বহু বাধা বিয় আসিয়া
গাঁড়ায়। সোমেন্দ্রের অধ্যয়নরূপ তপস্করণে অসিদ্ধি-
সংঘটক বিয়রণী বহু বৃক্ষকত আসিয়া উদ্ভিত হইতে
লাগিল। ঠাকুরমার নিকট হইতে আহারের
নিমন্ত্রণ লইয়া ঘরোয়ানবীর হৃদয় আকর্ষণ
ঘটিতে লাগিল, শশীশেখর নিজে আসিয়া বহুবার
সম্মত করিয়া গেল, অতঃপরে রাখা তাহাকে বাওঘট
জন্ত অস্থান করিয়া এক চিঠি পাঠাইল; কিন্তু
সোমেন্দ্র কিছুতেই চলিল না, একটা না একটা
অস্থিলা করিয়া সে সব কাটাইয়া দিল। রাখাকে
দিখিয়া দিল তাহার পা মচকাইয়া দিয়াছে, সে
আপাততঃ চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, নহিলে

সে কখনই তাহার অসুযোগ রক্ষা করিতে ক্রটি করিত না।

নির্জন ঘরে কণাট আঁটিয়া সোমেজ্ঞ বসাই পাঠাত্যাদ করিতে লাগিল, ততই অধীত বিস্তার অর্ধ তাহার কাছে দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়িতে লাগিল। এক একবার চমক ভাঙিয়া সে দেখিত বতগুলা শব্দহীন সে উচ্চারণ করিয়া বাইতেছে, কি—**সে-তাহার অর্ধ**,—তাহার এক বর্গও তাহার মনের ভিতর প্রবেশ করে নাই! রাগ করিয়া সোমেজ্ঞ তখন আরও বেশী করিয়া পড়িতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠের ইচ্ছা আরও বাড়িয়া বাইতে লাগিল; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না—তাহার মনে অধীত পুস্তকের কিছুই ছাপ রাখিতে পারিল না। অবশেষে সোমেজ্ঞ হার মানিয়া রুদ্ধ অর্ণগ ধুলিয়া দিল, পুস্তক সজ্জ ও যোগ্য বানাইয়া সতীর্থগণের রসনা ও চিত্তবিনোদনে প্রেরিত হইল, এবং ঘরে ও বাহিরে গদের পরিত্যক্ত আসবাবগুলি অঁকাইয়া তুলিয়া অনিয়া ও উদ্মনা ভাবকে যুগপৎ বিদায় দিয়া দিল। কিন্তু তাহার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার অন্তরের শূন্যতা সে পূরণ করিতে পারিল না। তাহার আনন্দ ও উজ্জাস তাহার নিকট হইতে যেন চির-কালের জন্য বিদায় লইল। সহস্র কোলাহলের মাঝখানে ঠাকুইয়াও তাহার মনে হইত যেন পৃথিবীর সকল রব নীরব হইয়া গিয়াছে, সমস্ত সৌন্দর্যের মাঝখানে তাহার মনে হইত, যেন সকল বায়ু অবলুণ্ণ হইয়াছে, এ নিখিল বহুভর্য কিছুতেই যেন বর্ণ নাই, আলোক নাই, উজ্জলতা নাই সব যেন দূত!

সোমেজ্ঞ তত্ত্বিত হইয়া ভাবিত, চারিত্রিক এটি নিতম্বতা! সহসা এক প্রত্যাহে বস-শাপের অতল তল হইতে বক্ষণ হাওয়ায় দেহের হিঙ্গোলে যে শুষ্কন, যে সীলীত, যে বীণাধ্বনি তাহার নীরব ক্ষয়ক্ষয় শূন্য করিয়া ভাঙিয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল! উবার আকাশে যে হিঙ্গল রাগ

যেখের যৌক্তিকভাৱে মিসিয়া দিবার লগাটে নবানু-রজন রচনা করে,— তাহার চিত্তপগন হইতে সে প্রকৃতি রাগ কে অপহরণ করিয়া লইল! সহসা এক মায়া রজনীতে তাহার আনন্দ, তাহার উজ্জাস কৃৎক ঘরে যে পরবে পুষ্প শাখার শাখার সুসুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বিকচোদ্রুধ কোবল দল্ল রাশির উপর কে এ অমল্ল লাকা ভাব ঢালিয়া দিল!

অন্ধকারে বাসিষে যুগ-জিয়া সোমেজ্ঞ কেবল ভাবিত, তাহার মানসতরনী হর্ষার চিন্তাশ্রোতাভবর্তে পতিত হইয়া অন্ধকার অনির্দেয়ের অক্লম অসৌম্য প্রবাহে ভাঙিয়া যাব; থাকে শুধু তাহার ক্ষমণে একটা ধেনু—একটা জালা!

একদিন শশীশেখর আসিয়া কহিল, “রাধার আবার মর হইয়াছে। মর যুগ বেশী, ১০৫ এর উপরেও গঠে। সে তাহার ‘দাবা’কে দেখিতে চাহে।”

সোমেজ্ঞ কিছু বলিল না, চাঁদরখানা পাড়িয়া কামের উপর কেলিয়া তখনই রাধার কাছে চলিল। রাধার শশীশেখর বলিল, “কি যে তুমি যে একেবারে নীরব!”

সোমেজ্ঞ বলিল, “বেলান্টের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।”

“কি শুনলে?”

“বক্তাৎনে শক্তির অপব্যব হয়। প্রয়োজন-তিরিক্ত কথা বলা অসুচিত।”

“সুতরাং—?”

“আমি শক্তি সাধনা কিংবা শক্তি প্রিজার্ভ করছি।”

“এক মুহুর্তে নাক উড়িয়ে দেব—সত্যি কথা বল।”

“বাইবেলে উক্ত আছে যে অবিশ্বাসীরা সহিত বাক্যালাপ করিবে না।”

কথটা বলিয়া সোমেজ্ঞ শশীশেখরকে পিছে কেলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শশীশেখর হাসিতে হাসিতে ঝোঁড়াইতে গিয়া
চিঠি হারাইয়া বুঁচিতে লাগিল।

সোমেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরমা কহিলেন, “এমন
কি কক্কত হয় বাচ্চা, এখানে আন্দাম আর ভূমি
একবার দেখতেও এসে না! আমাদের কাছে লক্ষা
পায় তন্দ্রা-এমন! কিছু বলে না, মুখ খুলে থাকে,
আপন “মন ভুদি, এমন সময় কি তোমার ঘরে থাকে।
উচিত।”

“আমার অম্বুচ চরেছিল ঠাকুরমা, ভাঙ্গ থাকলে
কি আর আসি না!” বলিয়া সোমেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া
উঠিতে লাগিল, ঠাকুরমা পিছন হইতে ডাকিয়া
কহিলেন “দেখ, আবার চলে যেয়ো না কেন;
রাখারানী ভাল না হওয়া পর্যন্ত তোমার এখানে
থাকতে হবে।

সোমেন্দ্র কিরিয়া সিজালা করিল, “রাখা কোন
ঘরে?”

“নকশি দিক্কার ঘরে। শশী বদি এসেছে,
সে আছে উপরে, তার সঙ্গে দেখা করো।”

“তিনি কবে এলেন?”

“পরশু। শশী বলে নি তোমাথেকে?”

“না, বলে নি ত!”

“ওর ঐ রকম, তিচ্ছর খেয়াল নেই।”

ঠাকুরমা অপনার কাজে চলিয়া গেলেন।

রাখা যে ঘরে ছিল সে ঘরের বাহিরে কপাটের
কাছে সোমেন্দ্র ঝাঁকটাই রহিল।

শশীশেখর উপরে উঠিয়া তাহাকে তৎক্ষণে দেখিয়া
বলিল, “নকশি-সাধক ধামে নিম্নর হলে না কি
ওখানে? জিতের বাও নল।”

কম্পিত পদে সোমেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিল।

রাখারানী বসন্তে আক্রান্ত হইল। বিবাহের
আয়োজন ও উত্তোষ বাড়িয়া গেল। বাড়ীও
সকলে ভর-সজ্জা হইয়া উঠিল।

সর্বাশেখা তিলিত হইলেন শশীশেখরের বিদি।

শাছে তাঁহার পুত্র কক্কর মাথা কেহ রোগাক্রান্ত
হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি অধির হইয়া। পড়িলেন
এবং পথে কুড়ান একটা বসন্ত রোগীকে ঘরে
আনিয়া কেন যে গোড়ীপোত্র সহিত তাঁহার ঘরবেন
তাহা বুঝিতে না পারিয়া রাগিয়া বকিয়া বকিয়া
অবশেষে অসন্তোষ করিলেন। সন্তর্পণেই কপাট
ঘেঁষে ও কোন ভক্তাব হুঃখ নাই, হাঁসপাতাল ও
একটা রহিয়াছে-ই; এমন কি বড় লোকের ঘরগা
ঘর হতেই আনা হইয়াছে, যা যে তাহাকে লেখানে
ছিলে মান সজ্জা সব নই হইবে। এ ছাড়া শশী-
শেখরের বিদি চাপা গলায় আরও কিছু কহিলেন,
তাহা শুধু শব্দ্যর শব্দে রাখা শুনি, এবং ঠাকুরমা
না শোনার ভাণ করিয়া শুনিয়া ও শুনিলেন না।

শশীশেখরের এই জোড়া তপিনীটিকে সকলেই
বিশেষরূপে ভয় করিত, নিবাস-ভর-ভীত পক্ষিনীর
যত ঠাকুর মা তাহার ভীত বাস্যাবশে সর্বাধা বিদ
ও ভয় প্রকল্পিত হইতেন। বিবাহের সজ্জা দ্বির
হইতেই ঠাকুরমা তাহাকে আসিয়ায় অস্ত্র চিঠি
দিয়াছিলেন; স্ত্রতঃ মায়ে পড়িয়া (নছিলে
তাঁহার সংসার ফেলিয়া তিনি নড়েন এমন সাধ্য
কি!) তিনি এখানে আসিয়া শুনিলেন যে “এক
চাল চুলা হীর ঘরিরের বাপ যা কেঁচো এক সর্ক-
প্রাণিনী কক্কর সঙ্গে শশীর সজ্জা দ্বির হইয়াছে।
নিঃশাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, “সতীরের ঘরে
থাকলে যাহুব তাকে আগে মাফতে ও মায়া করে না।
শশীর বত ছেলে—রাখার ঘরের সঙ্গে বিয়ে হতে
পারত—তার এল পথে-কুড়ান বট। অদ্ভুত বার
যেমন!”

তিনি ঠাকুরমা শুধু চক্কর ছল ফেলিলেন।

সেদিন সোমেন্দ্র যখন রাখারানীকে উত্তম
বাড়াইতে গেল, তখন রাখারানী বলিল, “আনি
উত্তম বাইব না।”

সোমেন্দ্র বলিল, “ইচ্ছা মরা পাণ।

তা ছাড়াও শুধু খেলেই যে শোক বাঁচে আর নইলে
যে মরে, এমন কিছু ঠিক সেই ।”

“আমাকে নিয়ে চলুন এখান থেকে ।”

“এখান থেকে নিয়ে যাব ?”

“দাঁপনার পাথ পড়ি, নিরে চলুন আমাকে”

“কোথায় ?”

“হাঁসপাতালে ।”

“হাঁসপাতালে !”

“সেখানে বাতুল বায় না ?”

“যায় ।”

“তবে ?”

সোমেন্দ্র অধোমুখে বসিয়া রহিল ।

রাধারানী বলিল, “আমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে
আছেন । আঙই নিয়ে চলুন ।”

ধানিকম্পন চুপ করিয়া থাকিয়া সোমেন্দ্র উঠিয়া
হাঁড়াইল । রাধা বলিল, “কোথায় যান ?”

“শবীর কাছে । সে যা বলে তাই হবে ।”

না, না, কারও কথা শুধবেন না, আপনি নিয়ে
চলুন ।”

“আবার সে অধিকার নাই । শবীর মত ছাড়া
আমি নিয়ে যেতে পারি না ।”

সোমেন্দ্র চলিয়া গেল, বিছানায় লুটাইয়া রাধা-
রানী কাঁদিতে লাগিল ।

ধানিক পরে সে কিরিয়া আসিয়া বলিল, “শবী
মত বিবাহে । ছোর করে সে তোমাকে এখানে
রাখতে চায় না ।”

(১৪)

অনেক ভূগিয়া রাধারানী সারিয়া উঠিল ; কিন্তু
প্রাপণা বজ্রের মত স্তব্ধ শোভা করিয়া গেল ।
নিরাক্ষণ ব্যাধি তাহার সর্বদেহে আক্রমণের কবচ
ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল । নবী প্রবাহ
শুকাইয়া গেল পবিত্র স্মৃতিকা যেমন আপিয়া ওঠে,
তেমনি সেই অতুল সৌন্দর্য রাবির অবশানে শুধু মনী

অঙ্কিত, ক্ষতচিহ্নময়, বিবর্ণ, একটা শোভনীর বিকৃতি
রাখিয়া গেল ।

ক্ষতের জ্বর তাহার মাথার চুল চাঁড়িয়া ফেলা
হইয়াছিল । শাশির কাছে হাঁড়াইয়া রাধারানী
আপনার দেহে ব্যাধিবিকৃত সূত্রের বিকে চাহিয়া
হাঁড়াইয়াছিল । সে বিবাল করিতে পারিতেছিল
না যে, এ তাহারই প্রতিজ্ঞা । কীটকে চাহিয়া
সে শুাবিতেছিল, এ কাহার নয়নাঙ্কের বাস প্রেত-
সূত্রি ! অকণালোক-বিভাসিত বহুদূরার মত যৌবন-
ঐশ্বর্যম্বল তাহার সেই দিবা কান্তি কোথায় গেল !
বিচ্ছাদিত মলম পুরের জার চকুর সেই উজ্জ্বল
দীপ্তি, অশ্রের সেই সুভোল নিটোল পটন, কাকন-
সন্নিভ সেই চম্পককান্ত বর্ণ, সেই তরঙ্গাকৃতি
কোমলকান্ত কোমলাঘ—সেবতার অভিলাষের মত
কে লব পলকে হরণ করিয়া লইল ! শাশির উপর
মাথা রাখিয়া রাধারানী নীরবে অঙ্গপাত করিল ।
আজ প্রথম তাহার মনে হইল যে সে সুন্দরী ছিল ।
রাধারানীর অঙ্গপাতের উল্লিখা উঠিতে লাগিল ।

পিছন হইতে সোমেন্দ্র ডাকিল, “রাধারানী !”
দ্বিধ, পরিভার সে কণ্ঠস্বর ; তাহাতে আবেগের
কম্বার নাই, জ্বরহোম্মথনকর কম্বার কম্পন নাই,
ছিল শুধু এক নিবিড় মেহের কোমল লালিতা ।
এই একমলে সোমেন্দ্র মাতার মত অক্লান্তভাবে
তাহার সেবা করিয়াছে, বিনিমি চক্ষে অহর্নিশি
তাহার কাছে আগিয়া বসিয়া রহিয়াছে, ক্ষতপূর্ণ
অঙ্গে ঔষধ সেপন করিয়াছে, পঞ্চাঙ্গমান করিয়াছে,
ঔষধ সেবন করাইয়াছে—বিশ্বের রক্তপিথরে তাহার
মোহনর আকিঞ্চন পুড়িয়া পুত নিষ্ঠুর রূপ ধারণ
করিয়াছিল ।

রাধার উত্তর না পাইয়া সোমেন্দ্র কহিল, “রাধা,
জান ত আজ যেতে হবে ।”

রাধারানী বলিল, “কোথায় ?”

“শবীরের বাড়ীতে ।”

চিত্তায় 'যা'র জ্বর মর্জয় হয়েছে। চোখে আমি
জিজ্ঞাসি পরিষ্কার হ'য়েছি না, সব যেন ঝাপসা হয়ে
গেছে 'আর, শুনেছ ত' "

"কি ত' "

"তুমি আমাকে পাখি মনে করবে, কিন্তু কি
কর্ম ভাগ্যচক্রে পতিত হয়ে আমি কি বে হয়েছি,
কি করছি তা নিজেই কিছু বুঝতে পারছি নে।
যিহি আর এক মেয়ে ঠিক করেছেন, - "

"ইতিমধ্যেই ত' "

"ইতিমধ্যেই! আর আমি তাতে কোন ও
আশংকা করি নাই। সামুনের তালিখেই
কিছু। "

"ঠিক হয়ে গেছে ত' "

"হ্যাঁ। "

অনেকক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিল : অবশেষে
সোমেন্সে কহিল, "তারপর ত' "

নিঃশব্দ কেলিয়া শশীশেখর কহিল, "সেটা সময়ে
কেটে যাবে সোম! অস্ত্রঃ একটা বিবরণ রেখা,
সময়ে ঢাকা পড়ে যাবেই! এতগুলো গোকের সুখ
পাতি দলিত করে' নিজের অভিশাপ পূর্ণ করা
অতি হীনতা! "

"সব ঠিক তব ত' "

"সব ঠিক! "

হরের তিতর একটা পতীর নিঃশব্দতা বিরাগ
করিতে লাগিল।

সহসা সোমেন্সে ডাকিল, "শশী! "

মাথা তুলিয়া শশীশেখর বলিল, "কি ত' "

"আমার একটা ভিক্ষা আছে তোমার
কাছে। "

"কি ভিক্ষা ত' "

সোমেন্সে নিকন্তরে চাহিয়া রহিল।

বিস্তৃত হইয়া শশীশেখর বলিল, "আমার কি ত'
হয় করে মনোতাপ ব্যতীত দরি করে', তবে
পুলে বল না! "

সোমেন্সে শশীশেখরের মুখের দিকে চাহিল।

সেই দ্বির প্রশস্ত কুটীর তিতর দিগা মহাব্যুধির গভীর
ভাষা পিয়া উঠিল।

শশীশেখর উঠিয়া আসিয়া সোমেন্সের হৃদে
হতঃপূর্ণ করিয়া কহিল, "কি তোমার ভিক্ষা
সোম ত' "

প্রশান্ত, অবকণ্ঠ হয়ে সোমেন্সে বলিল, "হাত-
রাশিকে আমায় দাও! "

দুরন্ত আশা

(ঈশীলা দেবী)

মরুপেতে যদি পাই চাহিনা রাখিতে

দুঃখ এ ধীবন,

হঃখ যেদনার পোলে হবো না যে কত

সুখে নিদ্রণ।

নিদ্রকণ কঁটা অনে রেখা যদি মেলে

যাবো না যে আর—

—কুম্ব কাননে, বেগল বকুলের কনে,

মালকর দার।

বজ্রাঘাতে হে প্রাণেশ পাইলে তোমার—

সে ত মহা সুখ।

হাখিনী হানিলে মতে হুঁহাত বাঁকায়ে

পেতে দিই বুক।

অনুভূতি

(গল্প)

[ঐকিরচল চট্টোপাধ্যায়]

(১)

সেই মাত্র ডাক্তার বেথিয়া চলিয়া গিয়াছেন।
লিভারের ব্যর্থতা ও কলিকের বেধনার নরেন্দ্রনাথ
লগ্নায় পড়িয়া এশাশ এপাশ করিতেছেন। পরীক্ষা
একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুগিয়া সুগিয়া বেচারী
উৎসাহহীন অবসর জীবনটা বেন আর অকারণ
টানিয়া লইয়া বাইতে পারিতেছেন না। পথে পথে
লগ্নায় হাইয়া উপায়াহীন প্রতিকারের কল্পনা
যাতে যাতে তাঁর অধরগ্রাণ্ডে চক্কলের কৌণ ধলির
লগ্নায়ী রেখাটুকু অতি কষ্টে একবার ফুটিয়া অদৃশ্য
হইয়া বাইতেছে। অনেক কঠোর ছিল, কিন্তু,
কিন্তুই করা গেল না, এখনই একটা নিঃশব্দতার
বেধনা-কল্পনা দীর্ঘকাল সময় সময় তাঁহার নিবৃত্ত
স্বপ্নের অন্ততল বিদীর্ণ করিয়া নির্জন কক্ষের
কম্বাঙ্কনের তিতর আশ্রয় হইয়া ক্রিষ্ট।

ছায়ায় কার্ণিশের উপর একটা কাক অনেক-
কণ বেথিয়া নির্ভীকমনে তাহার বাসা নির্মাণ করিতে
ছিল। সন্ধ্যা নরেন্দ্রনাথের শূন্যবৃত্তি এই বাধলুপ-
জিন্সের কর্ণপট্টতার উপর আঁকুই হইল। নরেন্দ্র-
নাথ বেথিলের কাকটী গ্রোপশ লভিতে তাহার ঘর
বাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাকে যাকে সে
এক একবার কোথায় উড়িয়া বাইতেছে, অলক্ষ্য পথে
ঠোঁটে করিয়া কতকগুলি বাসা প্রস্তুত করিবার
সময় খণ্ড ফুটি লইয়া কিরিয়া আসিয়া পুনরায়
আরম্ভকার্যে মনোনিবেশ করিতেছে। কাকের
কাণ্ডকলাপ তাঁহার নিবৃত্ত বেশ একটা অভিনব
অনুষ্ঠান বলিয়া মনে হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথের

পুত্রের সমুদ্রের কার্ণিশের উপরই কাক খুঁজিয়া
খুঁজিয়া তাহার বাসা নির্মাণের নিয়োগ দান
করিয়া লইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের নিঃশব্দ জীবনের
যোগাঙ্গিষ্ট, কর্ণহীন দিবসগুলি, অকস্মাৎ সজ্জিত,
জ্ঞত, ব্যর্থের বৈমল্লিক কার্ণাঙ্গনিকে বেশ করিয়া
বেথিয়ার সুযোগ ঘটাইয়া দিল। তিনি বেথিলের,
এই বাসার একটা নবজাত বাসন শিশু তার দিতা-
মাতার অপূর্ণ রোগ ও ভালবাসায় প্রতিপালিত
হইতেছে। কিন্তু এটা নিশ্চয় ওর মা হইবে? ঠোঁটে-
করিয়া আগের আনিয়া কেমন স্ত্রীতি ও মেজাজ
সন্তানের সুখে ভরিয়া বিতেছে।

সেদিন, কলিকের বাসা অত্যন্ত ব্যস্তিহাছে।
ডাক্তার বেথিয়া গিয়াছেন, “আপনি কবিগালী কখন।
আমি ত আপনাদের কোন উপকার করিতে পারিলাম
না।” নরেন্দ্রনাথ সে বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছেন।
মনটা ও বড় ভাল নাই। নিজের ভর দায়িত্বটাই
বেন, দিন দিন তাঁহাকে বেশী কঠোর তাঁহার
অপহার অবস্থাটা বুঝাইয়া দিয়া চিন্তার কারণকে
পজীর হইতে পজীরতর করিতেছিল। নরেন্দ্র-
নাথ, জমিদার সন্তান হইলেও শিক্ষিত,
মিতব্যয়ী ও কর্তৃত্বশীল। তাহার বন্দী পিতা
কখনও অর্থ ও জমিদারী • কাঁচিয়া গেলেন তিনি
সাধারণ জমিদারের স্তায় অসঙ্গ প্রমত্তবুধ বিলাস-
পন্নায়ন জীবন অতিবাহিত করিতে পছন্দ করিতেন
না। তিনি বাবদা বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপা-
র্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার একাধা সাম্রাজ্য স্বজন
বহুবাছব কেবলই সমর্থন করিতেন না; বরং সকলেই
সমুখে পক্ষান্তে তাঁহাকে কৃপণ অর্থপিণ্ডাচ ইত্যাদি

মানুষিৰ অশ্বাভাৱ গাৰি দিতে অনুভৱ লক্ষিত
বা কুটিল হৈত না।

নৱজন্মনাথৰ বেশ খুন্দা ফেলায়। তিনি কিছু
অবিক সময় কলিকাতাৰ অৰ্থান কৰিতেন। বেশ
খাৰা বন্ধ ভাল ধাতিত না। অত্যধিক পৰিশ্ৰমে তাঁহাৰ
পতীৰ জৰিয়া আদিয়াছিল। ইয়াৰ উপৰ কিছু দিন
হইল, তাঁহাৰ এতমাত্ৰ পুত্ৰ ইংৰাজ পৰিত্যাগ কৰিলে
তাঁহাৰ হী শোকভিত্ত হইয়া বংশৰ হুই মাত্ৰ
কোন বতে ঘৰিগা বাঁচিয়া ছিলেন। তিনিও
হাবীকে শোক লাগেৰ ভালাইয়া সকল হুংৰ আলা
হুণায় কঠিন শেখৰ হইতে নিতুলিতাৰ তৰিয়াছেন।
এই অশ্ৰুত্যাগিত কটনাৰ নৱজন্মনাথ সাধাৰণেৰ মত
বাহিৰে হৰিও হ-কতাপ কৰিলেন না; কিন্তু
কিহাটা তাঁহাৰ সময় অধি পত্ৰ, আশ-স্তৰণা, হুং-
হুং, হুৰ্ণ কৰিয়া তাঁহাকে জীবনমুত্ৰ কৰিয়া
রাখিলেন। মানবেৰ অপূৰ্ণ সঙ্গৰ স্বাশা—
ভালাৰ নিকট হইতে চিৰিহিনেৰ তত্ত্ব বিহাৰ
হইল। এত বন্ধ স্বাশাতেৰ পৰ ঐশ্বৰ চিকিৎসাৰি
কোন দিন তাহা কিয়াইয়া আনিয়া বিতে পাৰে?
কজা কটীকে অবলম্বন কৰিয়াই নৱজন্মনাথৰ
সংসাৰ। তাহাৰেৰ দুখ চাৰিয়া তিনি তাঁহাৰ
অশান্ত চিত্তকে লাভ কৰিতে গৈয়া কৰিতেন।
কিহাটাৰ বিচিহ্ন বিহান! বৰ্ণাৰ অন্ধকাৰ ৰাজিতে
কিহাৰেৰ অশ্বাভাৱ আলোক-লম্পাত প্ৰাপ্ত পৰিকৰ
নিকট বেদন আশাসেৰ পৰম পৰিহাৰ বাৰ্ভা বহিয়া
আনে, নৱজন্মনাথৰ শোকভাৱশীড়িত অবলম্বন
নিকট এই মেৰেকটীৰ সহানুভূতি সেইৰূপ
আশাৰেৰ বাণী বহিয়া আনিত।

(২)

“বাৰা ভাৰ্ভাৰ কি বহিয়া গেলেন?” বহিয়া
কোটা কজা কল্যাণৰ পিতাৰ পতায় পাৰ্বে আদিয়া
হীকাইল। নৱজন্মনাথ বেদন শুইয়াছিলেন, তেখনই
নিজকভাবে পড়িয়া ৰাখিলেন, কোন উত্তৰ দিলেন
না। তাঁহাৰ মনে হইতেছিল, এখন প্ৰাণহীন

মেৰুপুত্ৰ প্ৰেৰণৰ অশ্বাৰ বিহা অস্তিনৰ কৰিতে আৰ
বে পাৰা হাৰ না? বচা মাথা লেশনীৰ এখনই কতক-
স্তমি একবেৰে পক্ষ বিহাৰাজি পৰেৰ পৰ শুনিয়া
তিনি একপ্ৰকাৰ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন।
ভাৰ্ভাৰ কি বহিয়া গিয়াছেন, জানিয়া যে কজাৰ
ছিদৰ কোন লাভ নাই, এক তাহা জানিবাৰও
প্ৰকৃত উদ্বেগ হইয়া বে সে একথা জিজ্ঞাসা কৰে
নাই, তাহা নৱজন্মনাথ বিলম্বন অবগত ছিলেন।
কোণীৰ বৰে আদিগে সকলকেই এখনই একটা
সহানুভূতিহক প্ৰেৰ কৰাই বে নিটাচাৰ-সকল—
তাঁহা নৱজন্মনাথ জানিতেন; কিন্তু, বহুদিন বহিয়া
আশীৰ্বহন, পৰিচিত বহুবাৰেৰ নিকট হইতে এই
একই প্ৰকাৰ ব্যাকুলতাপুত্ৰ যৌবক কুশলবাৰ্ভা
জিজ্ঞাসাৰ, অসীম অত্যাচাৰ নিরন্তৰে নছ কৰিয়া
আদিয়াছেন। তিনি কোণ হুণায় বখন অসীৰ
হইয়া পড়িতেছেন, প্ৰাণপণ সংহমে বখন তাঁহাৰ
কোন চিহ্ন বাহিৰে প্ৰকাশ হইতে বিত্তেন না,
তিতৰেৰ পিতা উপনিয়া মাংসলেশীগুলি হুণায় কঠিন
নিশ্চেষণে বখন ছিৰ তিৰ হইয়াৰ উপজন্ম হইত,
তখন শোকাৰ্ত্ত নৱজন্মনাথ দুখ কুটীয়া শোকাৰ
অন্ত সহানুভূতিৰ অন্ত কাহাৰও প্ৰতি তাঁহাৰ বেদন-
কাৰত কৰণ নখনহুই কুনিয়া চাৰিতেন না। কাৰণ
তিনি মনে কৰিতেন হৰ ত কোনও নিকটত
প্ৰিয়জনেৰ পৰিহাৰ—উৎকৃষ্ট নৰেৰ যথো পুণাতৰা
অন্তৰখানিৰ লম্বত নৱজন্ম তাঁহাৰ সমকে উজাসিত
হইয়া উঠিব। সে বৃত্ত কোণ হুণা অশেখা বে
সংলগ্নেৰ অসহ! আৰুকাৰ নৱজন্মনাথৰ নিকট
এইৰূপ একটা আশা অহৰহ শীড়া বিহা থাকে।
তাঁহাকে বাহাৰা দেখিতে আলিতেন, তাঁহাৰেৰ যথো
ও তাঁহাৰেৰ প্ৰেৰ সকলেৰ তিতৰ আশ্চৰ্যকৰাৰ
অভাৱ বে বহিয়াছে তাহ। তিনি বেশ বুঝিতে
পাৰিতেন—তাঁহাৰ মনে হইত এই সকল
লোক বেন বিহা আশনয় কৰিয়া বাইতেছে।
আৰ এৰূপ বিলাস কৰিবাৰ তাঁহাৰ বে অশেষ দুখ

ও কারণ ছিল না তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ বহুবাক্যব আন্দোলনজন্য বাহ্যিকই তিনি ঐতিহ্যের আপন করিয়া টানিয়া লইতে প্রাণপণ হয়ে অসফোটে শোকভার লীড়িত শীর্ণ বাহ্যিক কড় আশার প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, সেখান হইতে পাইয়াছেন—অকারণ বিবেচ, পূত্রীভূত প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন। আর সংস্কৃতির দূষিত অভিনয়। বেচারীর নিকট বস্ত্র-নিষেধা একাকার হইয়া গিয়াছিল। ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন যে থাকিতে পারে, এমন সত্যটাও তিনি উপেক্ষা করিতে ঘোটেই স্তম্ভিত বা গুণ্ধিত হইতেন না, বরং কোনখান হইতে সত্য লভাই যদি কোন প্রকার সেবা বা সমবেদনা আনিত, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইত এগুলি অধিকতর মার্জিত এবং শিক্ষিত চৌধুরী অপূর্ণ অভিনয়। সেগুলিকে তিনি অধিকতর সন্দেহ ও সন্দেহ বৃদ্ধিতে বেশিতেন। আবার পাইয়া পাইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাঁহার এমন অবস্থা হইয়া গিয়াছিল যে, অনেক সময় তাঁহার উপেক্ষাতাব অনেককে দূর করিত।

কমলমণি দিতাকে নিকটর দেখিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—“বাবা ডাক্তার কি বলিয়া গেলেন? অগেফার চেয়ে ভাল করেন ত?”

ডাক্তার কথার এবার নরেন্দ্রনাথ একটু স্নানহানি হাসিয়া বলিলেন,—“কবিরাজ দেখাইতে বলিয়াছেন।”

কথাটা শুনিয়া কমলমণির মুখ সাধা হইয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণের অন্ত কস্তার মুখের প্রতি সন্মতন বৃত্তিতে চাহিয়া রহিলেন; পরে পার্শ্বে পতিত সংবোধনজন্যনি কষ্টে টানিয়া লইয়া তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

কমল আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা আমা কি খাবেন? রোগ বা স্নান হয় তাই হবে, না, মাগুর মাছের কোল, আর একটা নিম কোল, ছত—”

নরেন্দ্রনাথ বাগা দিয়া বলিলেন—“অত সব কিছুই প্রয়োজন নেই, যেতে ঘোটেই ইচ্ছা হচ্ছে না, বা হোক কর গে। তবে কিছু তাতে দিতে যোগো।”

“আজ্ঞা” বলিয়া কমলমণি পিতৃ সান্ত্বনা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে নরেন্দ্রনাথ হুঁকিলেন, “কমল?”

“কেন বাবা।”

“একবার এমিকে আয়, একটা কথা মনে পড়ে গেল।”

“কি কথা বাবা?”

“ডাক্তার স্বপ্ন একবারে ভাল ছেড়ে দিলেন, তখন একটা বা হোক ব্যবস্থা করা উচিত। চূপ করে পড়ে থাকলে ত আর কোন উপায় হবে না। আর রবিবার গুণি?”

“হ্যাঁ বাবা, আজ রবিবার। কেন? আজ কি মাছ খাবেন না?”

নরেন্দ্রনাথের আজ রবিবার মনে ছিল না। বলিলেন,—“তাই ত আজ আর মাছ করিস নি। কাল সতীশ এসেছিল কি? পুত্র সন্তোষে তার আসবার কথা ছিল। কেন যে আসতে পারেন না, তার কোন সংবাদ কি তোমার দিয়েছিল? কি যে, মাথা-মুণ্ড কল্লু, কিছুই বুঝতে পারি না।”

সতীশ কমলমণির স্বামী। কস্তা মৃতক অবনত করিয়া ফরের ফেরার উপর পা ধমিতে বসিতে বলিল,—“কাল রাত্রিতে এসেছেন যে।”

“হটে, ভবু ভাল। কেন আসতে পারেন নি কিছু বলে? আমার সন্তু ত কৈ একবার বেধা করে নি। অনেক রাত্রিতে গুণি এসেছিল?” কথাটা বলিয়া নরেন্দ্রনাথ পুনরায় সংবোধনজন্যনি টানিয়া চক্কর লম্বা ধরিলেন। কিছু একটা অক্ষত যে। তনি পড়েন নাট, তাঁহার সলা নির্বত দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহা বুঝাইয়া দিতে কিছুমান বাকি রাখিল না।

কখন বলিল, “কোথায় নাকি নেমেতর ছিল, সেধস্ত—”

কর্তার কথায় বাধা দিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আজকাল ছেলেদের তিতর নিয়মটা কিছু অতিরিক্ত দাবীর দ্বারা পড়িতে বেড়ে চলেছে। যোগ্য যোগ্য নিয়ম খুঁজেটা ত সঙ্গত নয় বলে আমার মনে হয়, বাঁধা কতকগুলো খাওয়া বড় ভাল নয়—হঠাৎ একটা কঠিন অল্পখণ্ড হ’তে পারে? সতীশের বাড়ীর খবর সব ভাল ত?”

“হ্যাঁ। আমার শব্দের নাকি বাড়ীকে নিয়ে বুঝবার দিন পড়িমে হাওয়া খেঁতে থাকেন বির হ’য়ে গেছে।”

“তার পরে, তা’দের শরীর ভাল আছে, মনে বল আছে। কথটা বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ পুনরায় একটা সুশরীরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ক্রিয়ৎকণ নীরব থাকিয়া দীর্ঘ ধীরে বলিলেন, “আমার অল্পখ না হ’লে তোমাকে হয় ত তা’রা এই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সকলই জুট না! একবার রাইচরণকে ভেঁকে দিও ত।”

এই সময় সতীশ আসিয়া শব্দরূপে প্রণাম করিল। এ কথা সে কথার পর জানাইল, “বাবার ইচ্ছা এঁকে নিয়ে যাওয়া। বুঝবার দিন আমার পড়িমে যাছি, আপনার মত কি?”

“আমার আর মত কি? কল্পের ত শরীরটা ভাল নয়—একবার ঘুরে আসতে পারলে শরীরটা সেয়ে যাবে। তা, বেশ, কবে নিয়ে যেতে চাও?”

সতীশ, কদম বলির নিকট শব্দরূপের বর্তমান অবস্থার অবস্থার কথা, ডাক্তারের কথা সবই অবগত হইয়াছিল এবং মনে মনে তাবিয়াছিল, কেমন করিয়া কথটা পাড়া যায়। হঠাৎ, তিনি কি মনে করিবেন, হয়ত তিনি তাগ করিবেন ও পাঠাইতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু, সতীশ যেখান, শব্দের কিছুত মনে করিলেন না; বরং এ প্রস্তাব, তিনি যেন, আনন্দের সহিত অনুমোদন করিলেন। তখন সে মনে

মনে আত্মবিশ্বাসিত হইল। তিনি অল্পখের সময়, তাঁহাকে দেখিবার মত বাড়ীতে ত কেহ নাই যে একটু সেবা করে, তাহাপি শব্দের মহাপ্রাণ একটা ব্যর্থও কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। তবে কি, তাঁহার অল্পখের কথা ঘটটা শুনা যায় ততটা কিছু নয়? তবে কি ব্যাঘ্রায় একটা ভাগ যাত্রা। না, বড়গোলের অল্পখ হইয়া শুইয়া থাকে এটা ভাল। সতীশকে অগ্রমনত হইয়া ভাস্কিতে দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আমার শরীর ছহিন পরেই খুব হ’য়ে যাবে কোন চিন্তা নাই, “বাড়ীতে কেহ নাই ভাব।” তারপর বৃহৎ হালিয়া বলিলেন, “সেধস্ত যিহেব কিছু আসে যায় না। রাইচরণ আছে কি চাকর আছে, বাবুন আছে। নীলার আসবার কথা আছে। তা হ’লে কবে দিন স্থির করছে।”

“আজ বৈকালে মনে করছিলাম! তা বলেন।”

“ওর আর বসি বল কি? যিনিটা ভাল থাকলেই হ,ল। এখন সব জুড়িয়ে গাছিয়ে নাও। কোথায় যাবে বির হ’য়েছে?”

“জীজ্ঞে হাঁ। কাঁকার বাড়ী নেওয়া হয়েছে। সেখানকার অলপাখ এখন নাকি পুঁজ ভাগ।”

তখন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, কাঁকার পুঁজ নাম বোঝা দিও। তিনি একবার সেখানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। জায়গাটা বেশ, তবে রেলের লাইনখের একটা আচ্ছা সেধস্ত টেনের দিকটা খেরেছেখের বেড়ানর পক্ষে বড় অসুবিধা। নদীর উপারটা খুব সুন্দর, এইরূপ নানা কথাবার্তা শব্দের জামাই এ অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। ইতিমধ্যে রাইচরণ আসিয়া বাড়াইল। রাইচরণ বাড়ীর সরকার। অনেকদিন এ বাড়ীতে আছে। কর্তার আমলের গোক। বসে হইয়াছে। লোকটা এ সংসারের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজে, কাজে-অকারে, অনেকখানি বেশী করিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের মত সে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল। কিন্তু সুখ দুঃখটা বেশী কিছু না বলিলেও,

তাহার মুখের ও আচরণের ভিত্তির দিখা তাহার অন্তরের অনেক কথাই জানা যাইতেছিল। রাইচরণকে বেশিরা নরেন্দ্রনাথ দত্তীশকে বলিলেন, “তাহ’লে বাবাশি সব ঠিকঠাক করে না’ও’ল, বেলা ত হ’ল।

(৩)

সতীশ চলিয়া গেলে, রাইচরণ দ্বিজান্না করলেন “বাবার ভেতরেনে।”

—“ভালো কি কল পেছেন তা’ত তুমি শুনেছ ? এখন কি করা হার বল দেখি।”

“কবিরাজ দেখাচেই হবে, হুয়েন কবি রাজকেই রিক করে এসেছি। ১১টার সময় তিনি আসবেন। আনাশের ঐদের নদীয়ায়, কাছেই বাড়ী ভাড়া করে আছেন। তিনি আমকাল মজ হ’য়েছেন কি না, ছুটী নিয়ে চিকিৎসা করতে কলকাতায় এসেছেন। তিনি বলেন, হুয়েন কবিরাজই কলকাতার ভিতর খুব বড় কবিরাজ। তাঁর বাড়ীতে ঐ কবিরাজ চিকিৎসা করতেন।”

“হুয়েন কবিরাজ মশাই খুব ভাল কবিরাজ তা আমি জানি। বেশ তাই হোক। আর একটা কথা কলকাতার সতীশ আম বৈকালে নিয়ে যাবে তার একটা ব্যবস্থা করে দিও।”

বুড় রাইচরণ নির্ভর্য্য হইয়া কেবল বক্তৃতিতে একবার নরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

“আমি মত দিবেছি, রাইচরণ। কলকাতার পরী-রতী বড় খারাপ হ’বে গেছে, এর স্বভাব, পশ্চিম যাজ্জেন, সেই সঙ্গে বাবে—তা এখবার যাক।”

বিজয় রাইচরণের খুব বর্ষার মেঘের মত নিবিড় কাল দেখাইতে লাগিল। চিত্তচাক্ষুণ্যকে বৃদ্ধ মন-বের করার উত্তর না দিয়াই সে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ পুরাতন কর্ণওয়ালী রাইচরণের অন্তর যে তাহার লজ্জা বতবুর ব্যাকুল, কত গুণিত কত চিন্তিত তাহা সম্পূর্ণ অনুভব না করিতে পারিলেও কতকটা পারিতেন। রাইচরণের মুখের ভাবে তিনি

বলিলেন, এখন কলকাতাকে পাঠাইতে সে রাজী নয়। কিন্তু উপায় কি ? এ ভগতে কে কাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিগাছে ? কলকাতার বিবাহ দিগাহেন, তাহাকে আনিবার সাধ্যই বা তাহার কি আছে ?” যাহা হউক এখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন তখন নরেন্দ্রনাথের আত্মীয় অমরেন্দ্র কাসিয়া উপস্থিত হইলেন। “তিনি ভাড়াভাড়া শস্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বসিলেন, “কেনক দিন পরে। সব ভাল ত ? এ রাজ্য যে একবারে ভুগেই ছিলে ? কেমন আই ভাল ত ?”

অমরেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে চেয়ারবানি নরেন্দ্রনাথের শস্যার নিকট টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, “গুনাম তোমার বড় অগ্রহ, বাহিরে পর্য্যন্ত বেহুতে পার না। তুমি যাই কৈকিৎ গাওনা কেন, শুয়ে শুয়ে পরী-রতীকে যে একবারে মাটি করে ফেলেন সে বিষয়ে লক্ষ্য করিবার কিছুই নাই ?”

“ভবিষ্যৎ দেখন, মাতা টাটী ওসব বাজে কথা। পরীর বতবিন ধাক্কাবার রিক ধাক্কাবে। তবে হুয় আর অনুভব, যে কোন অবস্থান হোক। এখানে তোমার হাত নাই, আমারও হাত নাই—নির্দিষ্ট হাত কে এড়াইবে তাই ?”

“গুনাম ভাড়াবেরা নাতি কবিরাজী কলকাতা কথা বলে গেছেন ?”

এক ঘরে রোগী দেখতে যোব হয় তাহেরও ভাগ লাগে না, তাই এই পরামর্শ দিয়ে গেছেন—যুক্তিটা বড় মন নয়। ঘরে বসে বসে নৃতন নৃতন লোকের সঙ্গে পরিচয়—আমি ত আর কার সঙ্গে বড় দেখা সাধ্য বক্তৃতে পুটি না,—পরীর কুণায় না, জানই ত। আত্মীয়তা রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ’বে ইচ্ছাযেছে।—তুমি কত দিন পরে এসে, তাই তোমার সঙ্গে তবু দেখা হ’ল। কবিরাজী কথা যা’ বলত ওসব আর কিছুতেই কিছু হ’বে না; তবে মন ধোবে না বলেই যা বল। বাড়ীর ভিত বসে গেছে যে, চারিদিকে এমন কাঁট

ধরেছে, ওপর বেগমত বড় একটা কিছু তার সুবিধা হবে না—গোড়া থেকে আবার নতুন করে শ্রম দিতে পারবে তবে যদি কিছু হয়।” কথাটা বলিছাই নরেন্দ্রনাথ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের খোলা দরবার দাঁক দিয়া দূক নীল আকাশের দিকে মৃত্ত পৃষ্ঠিতে চাহিয়া রহিলেন।

তারপর অজস্রবার তাঁর নিঃশব্দ চোখের কাহিনী আরম্ভ করিয়া গেলেন। নানা কথার পর কেবলই তাহার ছেলেদের কটের কথা, সংসার একরূপ চলে না, একটা উপায় বা হোক ঈর্ষ করা যে বিশেষ প্রয়োজন, এবং সে উপায়েই নরেন্দ্রের মত ধনী আত্মীয়দেরই করা কর্তব্য তাহা জানাইলেন, এতদিন যে তিনি এ কাজ করেন নাই, সেজন্য বেশ একটুখানি অভিমান ও ছঃ' তার প্রতি কথার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতেছিল। আত্মীয়-স্বজনের উপকারে যদি তার অর্থ না লাগিল তবে আর উহা কি কাজে আসিবে? তাহার পুত্র নাই, স্ত্রী নাই, এবং তার বিশেষ কোন বরও নাই। এমন অকল্প কঠিন কথাগুলি খুব বোলায়েন করিয়া বলিতে চেষ্টা করিলেও, সেগুলি তীক্ষ্ণদায় অন্ন লেখার মতই নরেন্দ্রনাথের ব্যথিত বক্ষ কপৌঁ করিয়া যে শোণিতধারার উৎস প্রাণহিত করিতেছিল, তাহা অজস্ররূপে অনুভব করিতেও পারিল না। নরেন্দ্র নাথ বিনা প্রতিবাদে সব কথাই শুনিয়া দাঁতেরেছিলেন। আর মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আশায় করা ব্যাপারটা যদি সর্বত্রই এক রকম নদীর নিচেই হাঙ্গির হয়? ধাননা আশায় করার ভিতর, যে ভাব, পাওনা আশায় করার মধ্যেও সেই একই ভাব, আশায় অহুগ্রহ আশায় করার মধ্যেও বেশি, রিক সেই কঠিন নিশেপণ। নির্দোষ অহুগ্রহী-ভিক্ষা চিরদিন সম্মতইন হইলে ও তাহার মধ্যে একটা তির্য্যকীয় দাবী কেমন করিয়া আঘাত দিবার ক্ষমতা রাখা জুলিতে পারে—সে চিন্তাটাই নরেন্দ্রনাথকে

সর্বদিক হইতে বেদনা দিতে লাগিল। চারিদিক হইতে এই প্রকার আচরণ মানুষের উপর তাঁহাকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ইহাণীং সকলকেই উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতে দ্রুত করিয়া-ছিলেন। এজন্য প্রকৃত হিঁচকীময় তাহার নিকট আসা একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মনে করিতেন, ইহারা মত না আসে, ততই তার মঙ্গল; কারণ তাঁহাদের স্বার্থ তাঁহার নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ করা। এমনই একটা মিথ্যা ধারণা তাঁহাকে, তাহার বহুবারের নিকট হইতে অনেক দূরে রাখিয়াছিল। তিনিই ও প্রাণ খুলিয়া সরল ভাবে তাহাদের সহিত মিশিতে পারিতেন না। সকলেই যে তাহার সহিত মিথ্যা অভিনয় করিয়া থাকে এ ধারণা তাঁহার মনে বহুদূর হইয়াছিল। তাহার অর্থ ও ঐর্ষ্যকেই তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মতই প্রগাঢ় ভাবে বন্ধ আত্মল প্রাণে চাপিয়া ধরিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, ততই বিশ্বাসভার পবিত্র স্ত্রীত্বেরে ভালবাসা, করুণা, হইতে নির্দয় ভাবে নিষেক বঞ্চিত করিয়া দ্রুতরূপে স্পন্দনহীন কঠিন পাথরের মত, বারিভূত শুভ বহুকৃতির মত অকল্প করিয়া অতিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছিলেন।

(৪)

একদিন বৈশাখের নবীন প্রাতে, মেঘলেনহীন আকাশের প্রায়ে তরুণ অরুণের কনক রশ্মিচ্ছটা বধন বিধে, লগ্নে স্থলে, কলে স্থলে, যথু হাজগাত্তে লাগিয়া উঠিতেছিল, তখন রাচৈর প্রত্নসিদ্ধ নরেন্দ্র সকলকে জানাইয়া দিল নায়েবের উপর দানিয়ারী মঙ্গল তার দিয়াও কলিকাতার বাড়ীর তথ্যাবধান তার তাঁহার উপর রাখিয়া, হঠাৎ মত রাজিতে নরেন্দ্রনাথ কোন কথা কাহাকেও না বলিয়া কোথায় চগিয়া গিয়াছেন। বহু আত্মীয়স্বজনের, ডাক্তার কবিরাজের পরামর্শ ও অনুরোধে বাধ্য এতদিন কোন মতে বাড়িয়া উঠা

সকলের হয় নাই, তাহা অকস্মাৎ যে কেমন করিয়া এক দৃষ্টান্তে ঘটিয়া গেল, তাহা অনেকেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথ সঙ্গে কাহাকেও লইয়া যান নাই,—রাখিয়া গিয়াছেন কেবল একখানি ছইছই পত্র :—“কৃথা অতুলভান করিবার প্রয়োজন নাই। আমাকে তোমরা একটু নিশ্চিত হইতে দাও।” ইতি নরেন্দ্রনাথ দ্বার চৌধুরী।

—কৃৎ রাইচরণ মাধব হাত দিয়া সেদিন বসিয়া অতীতের অনেক কথাই ভাবিল। সেই যেদিন আনন্দের তিলক-বরণ নবমাত নরেন্দ্রনাথ অননী-কোল আসিয়া করিয়া পিতার হৃদে আনন্দের উল্লাসের প্রবল উদ্ভাস প্রবাহিত করিয়া জমিদার গৃহে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। আর একদিন যে দিন নবীন যৌবনের উদ্যোগে একটা প্রচুর কলকলিকতা, শব্দিত-সরস-অঙ্কিত চরণে, সন্ন্যস্তীতিপূর্ণ নয়নে পদম কল্যাণভরা বাহু কোঁচন নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ পরিপূর্ণ নির্ভরে জকাইয়া ধরিয়াছিলেন। সে দৃশ্য স্মরণ করিতে কৃৎ রাইচরণের নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। কৃৎ জমিদার শনিভাত্যাব্দ নরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু-কালে নরেন্দ্রনাথকে একরূপ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। হায় কৃৎ! তুমি কি তখন জানিতে নরেন্দ্রনাথের ভাগ্যনিয়তি তোমার মেহের ভুলারের মত কি কঠিন দর্শনাত্মক অষ্টটীপিশি লিখিয়া রাখিয়াছেন। তোমার বিশৃঙ্খল জমিদারী, প্রচুর ধনসম্পত্তি, যে নরেন্দ্রনাথের অষ্টে বিপর্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহা তুমি কোন দিন কি ঝুঁকিতে পারিয়াছিলি!

(৫)

যে দিন, নরেন্দ্রনাথ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার ছই তিন দিন পূর্বে হইতে তিনি একটা বিচিত্র ঘটনা দর্শনে আত্মহারা হইয়া পড়েন। আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে পূর্বে হইতেই বিরক্তিতে তার মন একরূপ তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর ব্যাধির অসহ্য স্রাবও তাঁহাকে সন্ধ্যাক

হইতে অস্তিত্ব করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময় তাহার গৃহের সম্মুখে কাশ্মীরের উপর যাত্রা সম্প্রাপ্তি যে বাগা বাঁধিয়াছিল, নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাহার উহা সহসা স্থানান্তরিত করিতেছে,—ভাবিলেন, ইহার কারণ কি ও কেন ইহার্য্য এত কষ্টে নির্মিত বাগা অকস্মাৎ ভাঙিয়া চলিয়া গাইতেছে?—কেহ ও ইহারে—হৃদয়বাসে কোনরূপ বাগা বিশ্ব বটাক নাই? তবে ইহার্য্য কাহার উপর অস্তিত্বান বা রাগ করিয়া তা'দের দ্বন্দ্ব-নীড় জালিয়া ফেলিতেছে। এ দৃষ্টে নরেন্দ্রনাথের মনে বহুদিনের স্রষ্ট্র একটা বৈশিষ্ট্য-করণ রাগিণী বাজিয়া উঠিল। স্রষ্ট্রের তালে তালে, গানের ছন্দে ছন্দে তাহার মনস্ত্র হৃদয় মথিত করিয়া অস্ত্রাভাষা বসন্তে বসন্তে করিয়া পড়িতেছিল। তাহারই একটা যৌহিত্য গোখা হইতে একটা বৈখারি আনিয়া কাকের বাসায় বোঁটা খিজেছে, ও যাকে যাকে চান ছুঁচিয়া তাহারিগকে অতিষ্ঠন করিয়া তুলিতেছে। নরেন্দ্রনাথের বুঝিতে যাকি রহিল না, কেন তাহাদের দ্বন্দ্ব-নীড় ভাঙিয়া তাহার্য্য চলিয়া গাইতেছে। ইহার পরদিন রাজিভেই নরেন্দ্রনাথ বোখাই দাড়া করেন।

রেগে আসিতে আসিতে তাহার পুরাতন অনেক স্মৃতিই মনে পড়িয়াছিল। ভিত্তোরিয়া টারিনাসে, যখন পাড়ী দাঙ্গিয়া পৌছিল, ঐশ্বরের দৃষ্ট তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। দাজীরা নানাবিধে, নানা ধানে আত্মোৎসাহ করিয়া গল্পনা হানে চলিয়া গেল। কত আত্মোৎসাহে, তাহাদের আত্মীয়, স্বজন, স্ত্রী, কস্তা, পুত্র আদিয়া ব্যাকুল আগ্রহে আগিলন করিল। একটা জীকট উদ্ভাস, একটা অনাবিল—আনন্দ-স্রোত সমস্ত ষ্টেশনটীকে মুগ্ধরিত করিতেছিল। “সকলের মত সকলেই অপেক্ষা করিতেছে, আশা পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, সকলেরই এক একটা বিশ্রাম স্থান আছে, স্নান আছে, আনন্দ আছে, নাহ শুধু আশা” ধারণা, নরেন্দ্রনাথ একটা দস্তীপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অঙ্গচরণে

ইদরার বাড়ির আসিয়া অত্যন্ত তাই পাড়াইয়া
বাড়ীতে এসেই প্রথম শোভা সম্পন্ন দেখিতে
লাগিলেন, এমন সময়ে, একবারি ভিক্টোরিয়া গাড়ী
তাঁহার সম্মুখে অবাচিত তাই আসিয়া দাঁড়াইল।
পাড়োয়ান বলিল, বাবু গাড়িতে উঠুন আপনাকে
পৌছে দিবে আসি। তখনই বোটেনই এখানকার
খুব বড় ও ভাল হোটেল, শীঘ্র চলুন। অত্যন্ত
পরিচিত আশীরের মতই নরেন্দ্রনাথের কণে এই
শকট-চালকের দর মধুর শুনাইল।

নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, শকট-চালক ইতি মধ্যেই
কুণ্ডের মাথা হাতে জিনিসপত্র গাড়িতে উঠাইতেছে,
সে যেন দয়াকর, যে নরেন্দ্রনাথ কোন হোটলে
উঠিবে। যেন কতবার তাঁহাকে লইয়া নানাব্যানে
ঘুরিয়াছে। তিনি বিম্বিত মনে শকট চালকের প্রতি
চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখিতর অপেক্ষা না রাখিয়া
সে বলিল, “উঠুন আর বেরী করুন না; অনেক
বেরী চাহে গেছে, রান আহার করতে হবে। ক’দিন
গাড়িতে গাড়িতে না আসি, কত ভাই হ’য়েছে।”
নরেন্দ্রনাথ যে বাস্তবের নির্ঘন ব্যবহারে তাহার প্রতি
কেন্দ্রমতর যুগাৎ উপেক্ষা লইয়াই কলিকাতা ছাড়িয়া
গলাইয়া আসিয়াছেন, কি আশ্চর্য! আবার কি না,
একটা অশিক্ষিত পাড়োয়ান সম্পূর্ণ অপরিচিত,
কোন দিন বাহ্যকে যত্নেও তিনি জানেন না, সেই,
আজ তাহার প্রতি কখন যেরূপ ব্যক্তি আস্তানে
বিলম্বের জন্য অসুযোগ করিয়া অধীর হইয়া উঠি-
তেছে! নরেন্দ্রনাথ ভিত্তিকর্তব্যবস্থার দর
গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। শকটচালক দুইজনের
বিলম্ব না করিয়া অধিনীকৃত্যবশত বিপুল বেগে
ছুটাইয়া দিল। তিনিও অদ্বার শিত্তর দর
চালকের ইচ্ছার উপর নির্ভর্যে আত্মসমর্পণ করিয়া
যেন অবলম্বনহীন পুত্র জীবন কতকটা নিশ্চিন্ততা
অনুভব করিয়া অপরিচিতের আশীরতাকে, দীর্ঘক-
শীড়িত ভিত্তিকর্তর দর সকল আঁকড়িয়া ধরিলেন।
একটা অনির্ভর্যর আনন্দ প্রোত তাঁহার আশীরত-

বিশ্ব উত্তর অস্ত্রকে কোমল ও মধুর হৃদয়িত
করিয়া তুলিল। নরেন্দ্রনাথ বিম্বিত হেলান দিয়া
বুঝিত মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। মহলা
তিনি বলিয়া উঠিলেন, গাড়ী “যুগাৎ! কলীকে গলা।
যেওচা হয় নি।” চালক গাড়ী চালাইতে চালাইতে
এসমুখে বৃহৎ হাঙ্গিরা বলিল, “আপনার ভুল
হ’তে পারে আমার হয় নি, যাত্র হবার আবশ্যক
নাই।”

বিশ্ববিদ্যুৎ নরেন্দ্রনাথ আত্মক কণে বলিলেন,
“তুমি বিঃস্বহ?” আর কোন কথা মিজালা করি-
বার দর বুঝি কোন প্রেত তিনি বুঝিয়া পাইলেন
না। কেবল মাত্র বাতুল মনে চালকের মুখখানি
দেখিবার কৃপা প্রার্থ্য পাইলেন। সেও বিত অকস্মৎ
সংস্কার বন্ধন মানিয়া চলিতে উপদেশ দিবার ছলে
সেই দিকে মুখ করিয়া চলিয়াছিল। অকস্মৎ মধ্যে
গাড়ী ভাঙাফল হোটেলের দ্বারদেশে আসিয়া
ধামিল। চালক ক্রতপথে কোচবাস হইতে অবতরণ
করিয়া হোটেলের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান একজন
ইয়ার্ডকে ডাকিয়া কাপে কাপে কি বলিল। সে
বাড়ি বাড়িয়া লম্বিত জ্ঞাপন করিল এবং গাড়ীর নিকট
আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে, তাহার সহিত হোটেলের
ভিতর বাইবার যত্ন লম্বান-হৃৎক ভয়তা প্রকাশ
করিয়া আদান করিল। নরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে
অবতরণ করিয়া দেখিলেন, ইত্যবসরে চালক তাঁহার
বোটটাই লইয়া হোটেলের ভিতর চলিয়া গিয়াছে।
তিনি বৃহৎের লজ একবার হোটেলটিকে দেখিয়া
লইলেন। সত্যতাই কি স্থলর মনোমুগ্ধকর স্মৃতি
অটালিকা। বহীরাগী মহিয়ার মনের সহিত ইহার যেন
অপূর্ণ মাধবত। এমন স্মৃতি ও একক লজ্জাভাতির
লম্ব-অধিকার বিশিষ্ট হোটেল তিনি ইতিপূর্বে আর
কোথাও দেখেন নাই। ইয়ার্ড তাঁহাকে নির্দিষ্ট
দর দেখাইয়া দিলেন। স্মৃতিস্তিত কক্ষের মধ্যে
তাঁহার প্রত্যনি লক্ষ্যে কাহানে লম্বকভাবে রাখা
হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ দুর জনালাব নিকট

ধাড়াইবা মার দেখিলেন, অল্পের অনন্ত নীলাধ; নীল তরঙ্গরাশীর উপর মতমত অর্ধচাপাত তরঙ্গাশ্মানিত হইয়া অশূর্য্য বৃত্যভরী বোঝাইভেছে। মাঝে মাঝে ভবন তরুলতাসনাঙ্কুর কূট কূট বৌণপুত্র,—বিকশিতার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রাণবিশোধন বনোচ্চম চিহ্ন। বৃহত্তর তিতর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অস্তিত্ব বেন চুপিসা গেলেন। তাঁহার বিষয়বিবৃদ্ধি “ভাঙ্কুল দূরী প্রাণভরিতা দেখে কৃত বেন আকর্ষণ পান করিতেছিল।

পক্ষান্ত হইতে সম্মানস্বক বৃহত্তর ঠুংডা বলিল, “বহাশর এ কামরা আপনার পছন্দ হইয়াছে? না, অন্য ঘরের ব্যবস্থা করুন?”

ব্যস্তাধিত শিশুর মত লক্ষ্যপূত কল দূরিতে, নরেন্দ্রনাথ ঠুংডারের প্রতি স্বপকাল চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, “না, এ ঘর আমার বেশ পছন্দ হইবেছে। ঠুংডারের ইয়ারাথ একজন খানসামা নিকটে আসিয়া ধাড়াইল। নরেন্দ্রনাথকে সে তখন বলিল, “ইহার নাম, বৃহত্তর ইহারে আপনার কৃত্য নিবৃত্ত করা হইয়াছে। আপনার দাবতীয় প্রয়োজন ইহারে জানাইবা মাত্র সমস্ত ঠিক হইয়া বাইবে। কোনো প্রকার কলবিধা হইবে না।” রত্নাক সেগাম করিয়া প্রকৃত আবেশের লজ্জা অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঠুংডার নন্দ্যার করিয়া বিষয় প্রহণ করিল। নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাঁহার নিজের ঘরের লজ্জা লক্ষিত হইয়া বলিলেন, “কত অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, যে গাড়ী আমাকে নিয়ে এসেছিল, তাহার তাড়া এক কুলীর পদলা। কিছুই যেওনা হয় নাই। অল্পপ্রহণ করে, একবার তাড়াকে ছেঁকে দিন।” মনে মনে, ভাবিলেন, ট্রেনের কুলীর তাড়াও ত, সে, দিচ্ছে। এতজন অনর্থক তাকে অপেক্ষা করান কত অজ্ঞান হইবেছে, আং! বেচারী আমার ব্যবহারে না, মানি কত ক্ষম হইবেছে।

“তাঁকে কি তাড়া বেন নাই? তবে কি সে

তাড়া না নিয়েই চলে গেছে? সে ত গাড়ী নিয়ে চলে গেছে।”

অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “তাঁ হলে তাড়াকে তাড়া দিবার কি উপায় হইবে? আপনি কি তাঁকে চেনেন?” লোকটির চরিত্র প্রথম হইতে, তাঁহার মনে এক অজিহ্বা ভাবের দৃষ্টি করিয়াছিল।

“আমি তাকে চিনি না। মনে করেছিলাম, আপনার কোন লোক। কেন না, এখানকার কুলীর পদলা সেই বিদ্য। গিয়াছে।”

“না, না, আমি এর পূর্বে আর কোন দিন তাঁকে দেখি নি। অতুত লোক ত? নরেন্দ্রনাথের বিষয় রাখিবার স্থান রহিল না। এ অতুত রহস্তের কোন নীমাংসাই তাহার মনে আসিল না। এতদিন তিনি দেখিয়া আসিতেছেন, সকলেই পদমার লজ্জাই পাগল! পদমার লজ্জাই আত্মহতা, ব্যস্তগতা, এ আবার কি? ঠুংডা চিন্তা দাইবার সময় বলিয়া গেল, “যদি দেখা পাইত ডেকে দিব। এখন আসিতে পারি।”

“আনুন, আমার আপনার সঙ্গে কখন দেখা হইবে?”

“আমি বৎসময়ে নিজেই আপনার সম্মান দেব। এইটাই আমার চাকুরী মহাশয়।” তখন পুনরায় সমস্তম্বে অভিনন্দন করিয়া কুতোর প্রতি বৎস কঠোরো আদেশ দিয়া সে চলিয়া গেল।

বৈকালবেলা, ঠোর সময় একখানি ভিক্টোরিয়া গাড়ী তাড়ম্বল হোটেলের ঘারে অজ্ঞাত গাড়ীর ভিক্টর মধ্যে বীরে বীক্রে আসিয়া অনেকজন বহিয়া আরোহীর প্রতীকার অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় সকল গাড়ী এক একে নির্ভা নির্ভা আরোহী গিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু, ঐ ভিক্টোরিয়া গাড়ী-খামির আরোহী যখন কেহ আসিল না, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে ও ব্যাকুল হৃদিতে শবট-চালক কাহার নিখিল বন যন হোটেলবহিতে সাক্ষাৎ

সেই-নির্ণাত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। এই সময়, হইলেন ভ্রমণের ভাড়া দাইবার লজ প্রায় করিলে, চালক, অল্পমনস্কভাবে উত্তর করিল, “গাড়ী হাজির আছে।”

বাহার লজ গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি ইহার বিমূর্ছিত অংগত না—থাকিলেও, চালকের অশেষার্থে অবস্থি ছিল না। সে ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিল। সহিসের উপর গাড়ির ভার দিয়া চালক উৎকণ্ঠিত অঙ্গুরে ফোটেলের নির্দিষ্ট কামরায় দিয়া উপস্থিত হইল। সেখান তাহার প্রত্যাহার আত্মীয় নীরবে শব্দ্য শুইয়া শুইয়া নিশ্চিন্তে কি ভাবিতছেন।

সহ্য গৃহের নিম্নতম ভাগ করিয়া সে বলিল, “কখন গাড়ী নিয়ে এসেছি, আশুন যেহিঁরে আসবেন। এখানে কি এমন করে শুবে থাকিতে এসেছেন? একটা অপেক্ষা করে মনে হ’ল দেখি, অস্থির করে নি ত? রেল এসে কি পরীক্ষা বড় ব্যাপার হইবে? সমুদ্রের ধারে একটু বেড়িয়ে এসে মনটা প্রকৃত হ’বে এখন?” তারপর “বেহারী” বলিয়া ভাবিয়া মাত্র রপ্তা আসিয়া সেলাম করিয়া গাড়ী হইল। “বাবুর সুখ ঘোবার মল দাও, বেহারার কাপড় শুড়িয়ে দাও।”

নরেন্দ্রনাথের মনে হইল একি বস! অনেক দিন ত এমন মধুর অভিব্যাপ সে কাহারও নিকট হইতে পোনে নাই। মনে মনে ভাবিল, এমন মধুর প্রকৃতির লোক কেমন করিয়া গাড়ীচালকের জুট লাভ করিল? তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া ইহার কুল কিনারা খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রতিবাস করিবার দত কোন করনাই তাঁহার মনে আসিল না। এই লোকটার অপূর্ণ হেতের অভিব্যাপ নরেন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তরটিকে এক অননুভূত আনন্দধারায় পরিপূত করিয়া দিলে ছিল। এমন কি, তাহাকে যে ভাড়া বেওয়া হয় নাই, একখাটা পর্বত তখন তাহার মোটেই স্বল

হইল না। অনেকদিন পরে তিনি যেন একটা ভক্তি পাইলেন।

নরেন্দ্রনাথ বিনা প্রতিবাসে মূখ হাত দুইয়া কাপড়পরিতে লুক করিলেন। কাপড় পরিতে পরিতে বলিলেন “আমি তোমার কি বলে ভাবব?”

এ প্রসঙ্গ চালক যেন একটু চকম ও উত্তেজিত হইয়া পড়িল। তাহার মুখখানি সহ্য আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে তাঁহার দিক হইতে মূখ অঙ্গ দিকে ফিরাইয়া বরা গলায় উত্তর করিল, “আমাকে মাধব বলিয়া ভাবিবেন।”

সিঁড়ি দিবে নামিতে নামিতে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “মাধব, তুমি কতদিন গাড়ি চালাও? গাড়ি চালাতে ত তোমার তোমার কষ্ট হয়? কষ্ট ও হৃদয় মাধব ক’রে গাড়ি হাকান বড় কষ্টকর।” কথাগুলো বলিয়া নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এ প্রসঙ্গ মাধব কোন উত্তর দিল না। তাহার বকু বিপরীত করিয়া একটা পুরাতন হুণ্ড-বৃতি অবশ্যই জাতিয়া তাহার মনে মলভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

আপোমনো মনে আসিয়া গাড়ি গাড়াইল। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। নরেন্দ্রনাথ হৃদ্যাতের অপূর্ণ সৌন্দর্য দর্শনে বিশ্বয়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্বদা বিবাহ ভারাক্রান্ত মনে কোথা হইতে কাহার ঘোমের ধাক্কাপর্শ্বে এক নবীন আনন্দের কনকবন্যা ছুটিল—নতন আশার মধুর বাণী তাঁহার মনে উকুত হইল। আপোমনো বন্ধরের চরণ চূষন করি পিগত বিবৃত নীলমল রাশি। নীলাম্বিনী পদনা প্রোত্তে প্রোবোদ্ধা কি মধুর দিসনেই ছিল হইয়া পরস্পর পাঠ আসিলেনে আবদ্ধ রহিয়াছে। সমুদ্রতীরের পাখান নির্ধিত মন্দর ঘাট। সিঁড়িগুলি প্রোক্ত প্রোক্ত প্রোক্ত বৎ বীধান। দলে দলে মরনারী হাতোচ্ছল আননে বেড়াইতেছে। কৈষ্ক-তিক আলোক মালার সমস্ত বন্ধরটা আলোকিত হইয়া উঠিল। ব্যাণ্ডের মধুর বাজনা বাজিতে লুক

হইল। নরেন্দ্রনাথ বুড় হইয়া একখানি বেকের উপর বসিয়া তাহার কলিকাতার নিঃশব্দ ঘূর্ণিত বকী-স্ববনের কত কপাই আলোচনা করিতে করিতে একরূপ বাহ্যজ্ঞান পূর্ণ হইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রায় চটা বাজিয়া গিয়াছে। অনেক চিন্তা গিয়াছে, ছই এক স্থানে মাঝে মাঝে মাঝে দূরক-দূরতীরা বসিয়া বসিয়া গল্প গল্প করিতেছে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথানে নরেন্দ্রনাথ বসিয়া ছিলেন, দেখানে আসিয়া মাধব বলিল “স্বাস্ত হ’য়েছে, বাসায় যেতে হবে না, আমি আর কতকণ থাকৃ। বলুন।” নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ দৃষ্টিতে চমকিয়া উঠিলেন। কি বলিবেন কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন, “তুমি কি এখনও আমার ভক্ত অপেক্ষা করছ? তা ত আমি জানি না।”

“সে অপমান্য জানার বিশেষ প্রয়োজন নেই, এখন বাসায় যেতে হবে না, এই সমুদ্রের ধারে সারা রাত্রি ধরে ভাববেন? আজ্ঞা, চুপ করে একটা ভাবতে পারেন ত? আপনায় কৃপা তৃপ্ত না থাকতে পারে। আমি ত আর সেটা একবারে ত্যাগ কর্তে পারি নি?”

নরেন্দ্রনাথ কই অপ্রস্তুত হইয়া রূনি হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, “মাধব আমার উপর রাগ করলে? চল বাজি।”

নরেন্দ্রনাথ জানিতে পারেন নাই, কেমন করিয়া তাহার নিজের অজান্তারে, ওই লোকটার নিকট যেন ধীরে ধীরে কতখানি ধরা দিয়া বসিয়াছেন। এই অপরিচিত লোকটার মধুর আচরণ তাহাকে পর বা প্রাকৃতিক কথার পূর্ণাঙ্গ স্বপ্ন করিবার অবসর দেয় নাই। তাই চাকচিক্যে মগ্ন ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মাধব আমার উপর রাগ করিলে?” কত আশ্চর্য স্বপ্নের অভিমানে বা রাগ বিরাগ নরেন্দ্রনাথের মনে কোন দিন ত এখন ব্যাকুল প্রশ্ন আসিয়া তোলে নাই!

মাধব বেশিল, নরেন্দ্রনাথের কাতর নয়ন দৃষ্টি

বড় অনলয় করণ আবেশন নইয়া একদৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

“রাগ করব কেন? রাগ করা ত আমাদের অভ্যাস নাই; তবে হবে আর প্রেমচেন। বৈদিক সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস লেগে পাছে কোন অল্প কয়ে সেই কপাই কলিঙ্গান।”

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে আশ্বিন, আমার ভক্ত-এত চিন্তা। কথার ভিতর কি আত্মরিকতা বর কি মিঃ!

গাড়ী হোটেলের দরজার আসিমাধার, ট্যাক্সি উৎকণ্ঠিত আগ্রহে গাড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, “এই যে এসেছেন। নটা বেজে গেছে। বাবার ঘটা হ’বে গেছে। কিছু লিখে রেখে যান নাই। বড় ভাবছিলাম। চলুন।”

নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি অপমান্য কাছার চিন্তা গেলেন। আহা! করিতে বসিয়া তাহার মনে পড়িল। আজও ত মাধবকে গাড়ী, ভাড়া, খেওয়া হইল না, কইই লক্ষ্যের কথা। হি! হি! লোকটা নিশ্চয় কাল আর আসিবে না। তাহাকে দেখিলেই আমি লব যেন ভুলিয়া যাই। পরীবলোক, বাটীয়া খাব, ভাড়া না পাওয়ার নিশ্চয় তার খুবই অনুবিধা হুছে; কাল আসিবা নাত তার ভাড়া চুকাইয়া দিব।

(৬)

খারীতি সেদিন সকালে মাধব গাড়ী গিয়া হোটেলের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথ তাহার ভক্তই, অত্যন্ত ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। জানাল্য দিয়া তাহাকে দেখিয়া কাপড় ছাড়িতে লুক করিয়াছিলেন। মাধব সেদিন তাহার একটা কক্ষে লগে করিয়া আনিয়াছিল। কক্ষটির বয়স প্রায় ১৪১৫ বৎসর। অত্যন্ত সুন্দর। সে একটা সম প্রকৃতির গোলাপ ফুলের তোড়া নইয়া আসিয়াছিল। মাধব নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া কক্ষার-কাপে কাপে কি বলিল। কক্ষা অত্যন্ত লজ্জা ও মরল ভাবে অতিবাহন করিয়া পুষ্পবকী তাহার

হস্তে গ্রহণ করিল। নরেন্দ্রনাথ এই প্রকার অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অত্যন্ত বিস্ময়বিশিষ্ট হইল। মাঝবের প্রতি চাহিয়া বলিলেন তোমার সঙ্গে “মেয়েটি কে ?”

এতক্ষণ মেয়েটি এককূট্রিতে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহ মন্তকলম্বা করিতেছিল। বেন তাহার চেহারা সন্নিহিত মনে মনে কাহার চেহারার মিল করিতে ছিল।

“মেয়েটি আমার! আগনার সঙ্গে আগল কল্পে এসেছে।”

নরেন্দ্রনাথ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। একটা দৃষ্টান্ত কল্পকে একজন অপরিচিত বিদেশীর সন্নিহিত বস্তুর পিতা যে কোন দিন পরিচয় করাইয়া দিতে পারে এ ধারণা তাঁহার ছিল না। এমন একটা সম্পূর্ণ অসম্ভব আচরণ তাঁহার নিকটে কেমন কেমন ঠেকিল। কি বলিয়া এই লুপ্ত কল্পটিকে যে তিনি অন্তর্ধান করিবেন তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না।

মেয়েটি বৃদ্ধ হাদিয়া বলিল, “এই তোড়াটি আমি বিবাহিছি। ছলগুলি সব আমারই বাগানের। ছলগুলি যেমন লুপ্ত, তোড়াটি কিন্তু তেমন লুপ্ত হয় নি।”

নরেন্দ্রনাথ উপহার লইয়া ধন্তবাদ দিলেন; কিন্তু কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া তিনি যে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, মনে হইতেই তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, “আগনার ছলগুলি যেহেতু লুপ্ত তোড়া প্রকৃতের কারুকার্য ও তরঙ্গ; আর বিল চাকুর্যের মাহুর্য স্থিতি প্রসঙ্গী।”

একসাক্ষরকবাক্য শুনিয়া মেয়েটি দৃষ্টি অবনত করিল।

নরেন্দ্রনাথ সে দিন, প্রাতঃরাশ সমাপন করিয়া মাঝবের কল্পকে সঙ্গে লইয়া কোঠাতে বাসিষ্ট হইলেন। সে দিন প্রতিজ্ঞার কথা মত, নানাস্থান ঘুরিয়া ক্রমশঃ বাজার হাওয়া হইল। ‘মেয়েটির নাম

প্রতিভা। নরেন্দ্রনাথ ডাকিলেন, মেয়েটির নামকল্প খুব সঙ্গত হইয়াছে। তাহার মুখে চোখে প্রতিভা বেন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। বৃদ্ধ চকম তরঙ্গের মত একটা অনাবিল মধুর হাস্য লক্ষ্যই তাহার মুখে লাগিয়াছে। সামান্যতমের ভিতর নরেন্দ্রনাথের সন্নিহিত সে বেশ পরিচয় করিয়া লইয়াছে। তাহার এখন কোন বাধা বা সংঘাত নাই। মহোদয় ভগ্ননীর মত তাহার সন্নিহিত আগল করিতে করিতে বেশ বহুক্ষণ মনে পৈ বাজারের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোঠাতেছে। নরেন্দ্রনাথকে সে অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিতেছিল। একটা চেপন ব্যবহারীর দোকানের নিকট আসিয়া নরেন্দ্রনাথ দৃষ্টি দেখিতে লাগিলেন এবং প্রতিভাকে বলিলেন, “তোমার আগনার পছন্দ হয় বলুন দেখি। সেও একখানি লুপ্ত আগনার বৃদ্ধের খানের উপর হাত দিয়া বলিল, “এ হুটী আমার খুব পছন্দ হয়। এটা নিন। দরদস্তর করিতে প্রতিভাই অগ্রবন্ধী হইল। নরেন্দ্রনাথ সেই খানটী কিনিয়া গাড়ীতে আনিয়া উঠিলেন। তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, গাড়ী হোটেলের ঘরে আসিলে, নরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার সময় সেই খানটী প্রতিভার হাতে দিয়া বলিলেন, “এখন এটা নিন, আগনাকে বেশ ঝেঁক লুপ্ত ঢাকাই কাপড় এনে বিব।” উভয়ের অংগনা না করিয়া “নন্দার” বলিয়া নরেন্দ্রনাথ হোটেলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শুধু তাহার কাপে বেশ, “সামান্য লুপ্ত মূল্য এতটুক। লুপ্তের কাপড় নয়।”

[১]

তারপর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। মেয়েটি সে দিনের পর আর আসে নাই। তাঁহাকে বোঝাই সহরের নানাস্থান ঘুরাইয়া দেখান বেন মাঝবের বৈশিষ্ট্য কার্যে পরিণত হইয়াছে। বেশ একটা আগনের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের কল্পনায় দীর্ঘ জীবনের অলপ দিন গুলি কাটিয়া যাইতেছিল। সহরের নতুন নতুন পুস্তকালয় দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান বাহ্য অনেকটা

পারিয়া আসিগাছে। এখন বেড়াইবার বেশা তাঁহার মনকে উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিয়াছে। নিত্য নূতন স্থানের আবিষ্কার তেঁরাই তাহার এই অভিনব জীবনের প্রধান চিন্তা। এই চিন্তার লগ্ন্য ও পরামর্শধাতা একমাত্র মাধব। মাধব হুতই দেখিতে পাইল, যে নরেন্দ্রনাথ পূর্বের মত কি এক স্বাক্ষর চিত্রাভার নত অবলম্বন অক্সরে, উৎসাহে পুষ্ট অঙ্গল পুষ্টিতে, কেবলই অস্বাভাবিকতা থাকেন না, ততই তাহার আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া বাইতে লাগিল। মাধবের সহিত নরেন্দ্রনাথের বেশ একটা বন্ধিত আত্মীয়তাব উভয়ের অজ্ঞাতে ঘেরে ঘেরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই ভাবেই নরেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেইজন্য, সে মাধবকে একজন সাধারণ পাণ্ডীটালক বলিয়া ভাবিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিত। আজ কাল ভাড়ার কথা উঠিলে নরেন্দ্রনাথ সে চিন্তাকে কোন দিক দিয়া সমর্থন করিতে সাহস পাইতেন না। কেমন করিয়া ভাড়ার কথা, তিনি ভুলিতে পারেন। এমন অকপট বন্ধু মাধবের কাছে ভাড়ার কথা ভুলিলেও তাহাকে যে কতখানি ছোট করিয়া দেওয়া হইবে, নরেন্দ্রনাথ তাহা অস্তরের অসুস্থিত দিগ্ধই বুঝিতেন। হয় ত নরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে মাধব এইরূপ অকল্প আঘাত পাইলে তাহার অভিমান ও অপমান প্রাণিব্যার মত স্থান বুঝি লাগে বিবেচনাও সে পাইবে না। হুতই দিন বাইতে লাগিল ততই ভাড়া দেওয়ার কথাটা আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রনাথ এ বিষয় অধিক করিয়া ভাবিতে পারিতেন না।

বেলা ২ টার সময় মাধব গাড়ী লইয়া আসিল। নরেন্দ্রনাথ একটাই ছিলেন। গিঁদারে করিয়া তিনি আঁল কেঁচাইতে বাইবেন এক সন্ধ্যার ৭ টার সময় কিরিয়া আসিবে। নূতন স্থান দেখিবার আনন্দ ও উৎসাহে তাহাকে অধীর করিয়া রাখিয়াছে। মাধব আসিয়া মাত্র নরেন্দ্রনাথ নামিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, “জিয়ার পাওয়া বাইবে ত !”

“এখন আশ নষ্টা কিলম আছে।”

দশা সময়ে জিয়ার ছাড়িয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ জাভাজের রেলিগে বসিয়া গাড়ীয়া বোখাই সহরের নরন-বোহকর পুষ্ট অঙ্গলোকন করিতে লাগিলেন। জাহাজঘরে ঘেরে অঙ্গল হইতে লাগিল। অনেক ক্রমাস উড়াইয়া বন্ধ বাড়ব আত্মীয় স্বজনকে আনন্দ উল্লাস প্রদান করিতে লাগিলেন। সহসা নরেন্দ্রনাথের কুটী পড়িল, সেই ভিত্তোয়িয়া গাড়ীখানির প্রতি—তিনি দেখিলেন মাধব তখনও পাক্কোর কোচবায়ে বসিয়া, জাহাজের দিকে অনিবেশ নরেন্দ্র চাহিয়া আছে। নরেন্দ্রনাথ মাধবের বেহ ও ভালবাসার কথা ভাবিয়া আত্মগোষ্ঠা হইয়া পড়িলেন। জাহাজের ডেকার উপর চেয়ারে বসিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; জাহাজ মাধব আমার কে? যে কেন আমার স্ত্রী এত করে? আমি আসিয়া পর্যন্ত সে ত আর কাহাকেও গাড়িতে তোলে না? কোন দিন জাহাজ পর্যন্ত চাই না? আমার সহিত ত তাহার কোন পরিচয় কোন দিন ছিল না? তবে কেন সে, আমার স্ত্রী এতটা উদ্বিগ্ন? এতটা অনাবিশ বেহ কোথা হইতে আমার মত তাহার অন্তর ভরিয়া উদ্ভূত হইয়া পড়িতেছে। অনেক সময় সে মনে ভাবত হইয়া আমার ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। কেন আমার ঘরের ভিতর সে কোন কিছুই লক্ষ্যে রাখ! আমি সে দৃষ্টির দিকে ত বোটেই তাকাইতে পারি না, মনে হয় তাহার অন্তরের নির্জন প্রবেশে কি মনে কি একটা প্রেরণ হালাকার, সর্বদা তাহাকে অতদনন্দ করিয়া রাখিয়াছে। কতদিন মনে করিয়াছি কারণ কি বিজ্ঞানো করিব, কিন্তু তখনই আশ্রয় প্রাপ্ত শিবিয়া উঠিয়াছে। মনে হইয়াছে, যদি মাধব আমার মুতই হততাপা হয়। যদি তার একমাত্র—নরেন্দ্রনাথের নরন অঙ্গতে ভরিয়া আসিল—সে আর ভাবিতে পারিল না। ঘেরে ঘেরে জাহাজ বন্ধের চানিয়া পেল—সেই দৃষ্টির অঙ্গারের হুইয়া আসিল।

তখন যাবব আছে আছে গাড়ী লইয়া গৃহে ভিঙ্গিল।
পথে তাহার অনেক দিনের পুরাতন কথা স্মরণ হইতে
লাগিল - সে আশাহের এত দ্বন্দ্ব বিদ্যা চলিয়া গিয়া
না জানি, কত কষ্ট পাইয়াছে। সে যদি, থাকিত
তবে কত সুখ হইত। সে, সেল কিন্তু, আর ত কিরিন
না! তাহার অন্তর ত এত কষ্টের কোন দিন ছিল
না—শ্রুতিমাতার ঘের জালবাসা সে একেবারে
অকৃতজ্ঞতার নির্ণয় হতে নিঃশেষে মুছিয়া
কেনিয়াছে? না, না, তাকি সে পারে?
আজ বোল বঙ্গের হৃদে গেল, তার লজ্ঞ প্রতিদিন ত
গাড়ী নিয়ে যেনে অপেক্ষা করে থাকি। তার
অন্তর কি আশাহের অন্তরের ব্যথা জানতে পারে না!
তবে বৃষ্টি তার কোন গুণটিনা ঘটে থাকবে। নইলে
সে, নিষ্ঠুর করে আসত। সে ত জানে, সে ছাড়া
আশাহের আর দ্বিতীয় পুত্র নাই। না এতদিন পরে
সেই বৃষ্টি তালমবল হোটেলের এসে উঠেছে! ঠিক
তার মত, বঙ্গের লজ্ঞ বা কিছু একটু আঁধাও পরিবর্তন
ঘটেছে, সেই মুখ, সেই কান, সেই বিনয় নর নর
ভাব, তাই বৃষ্টি সে, আশাহকে দেখে লজ্ঞার চোখ
তুলে দেখতে সাহস পায় না। তাই বৃষ্টি আমার
সমস্ত পরামর্শ নির্জীব্যে নানিয়া চলে?
প্রতিভাও সে দিন, দেখে করে ঠিক দাখার মত।
বাহালা বেশে খেতে খেতে, অনেকটা বাঙ্গালীর মত
হলেও, সেই নিষ্ঠ বর্জিত, সেই ছোট বোনটী বলে,
কত আশ্রয় করে আসমানী রং কাপড় কিনে দিল।
অন্ত কাহারও দান হ'লে কি আমি কাপড় নিতে
দিতাম। মনে হ'ল অনেক দিন পরে দাখার বেওয়া
বড় আশ্রয়ের জিনিষ বে—“দাখর” আর তাবিতে
পারিল না। একটা অসহায় উত্তেজনার তাহার
সবত শরীর কাপিতে লাগিল। এই—সে না হইয়া
যায় না। বাড়ী কিরিনা আসিতে গৃহীণী জিজ্ঞাসা
করিল, “দুতন কিছু খবর জোগাড় করতে পারলে
কি?”

“না, সেই একু ভাব—সন্ধান করে কেনেছি, এই

কব দাশের ভিতর তার কোন গজাঘি হোটেলের
আগে নাই—সম্ভবতঃ সেখান আরও বেড়ে চলেছে?
তোমার কল্যায় ওকে একদিন বাড়ীতে দেখন্তায়
কর—আমার চতুর্কে সে ঠাকি দিতে পারবে
না।”

“যদি সে না হয়, তাহ'লে কি আশাহের নিমন্ত্রণ
তিনি নেবেন—যদি তাই হয় তবে ত দ্বন্দ্ব রাধ'বার
স্থান থাকবে না। তার চিন্তা নিয়ে—তার কথা
নিবে এক রকম সব তুলে আছি—এই বয়স জাত্তে
আমার বে ইচ্ছা হয় না।”

“এতখানি উবেগ ও উৎকর্ষা নিয়ে বে আর
থাক্য যায় না, কালই তা'কে নেমন্তন্ন কর, আজ যখন
তিনি ফিরে আসবেন, সন্ধ্যার সময় বলে রাখতে
তুল না।

“আজ্ঞা কলুষ, ভগবানের মনে যা আছে তাই
হবে!”

[৮]

সে দিন বৈকাল হইতে আকাশে মেঘ জমিতে
লুক করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সমস্ত আকাশ ঘন
মসীবর্ণ ধারণ করিল। একটা আগর বড়ের রক্ত সূর্য
সকলের চক্সার মধ্যে আগিয়া উঠিল। পোট অন্ডিসের
মাখার উপর কথাতীতি বড়ের আগর জনকু চিহ্ন
টানাইয়া বেওয়া হইল।

দাখবের বৃকের মধ্যে একটা ভীষণ আগরার কাল
মেঘ বেধা দিল। সে গাড়ী লইয়া ক্রত স্মিয়ার বাটে
দিয়া উপস্থিত হইল। দলে দলে দোক আগিয়া
জোটের উপর বাহুল্যদ্বীপ্তে জাহাঙ্গীর আগমন
প্রতীক্ষা করিতেছে। কেহ কেহ দূরবীণের সাহায্যে
জাহাঙ্গীর কত্থরে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা-
দের বিরুদ্ধা অনেকই গাড়ীয়া আছে, যদি তাহাদের
মুখ হইতে একটা আশাহবাহী শুনিতে পাওয়া যায়।
নিকিৎ ঘন অন্ধকারে আকাশ ও গৃহের বেন এক হইয়া
গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রবলবেগে বড় লজ্ঞার
বিদ্যা দ্বীপ্তে আরম্ভ করিল, সমস্ত তাহার সহিত যোগ

দিয়া মহোজ্ঞাসে তত্ত্বমুদ্রা করিতে শুরু করিয়া
বিল। পরন্তু প্রদীপ উত্তাল তরঙ্গ বাক্সের মত
ছুটয়া আসিয়া তোছে, কোতে, ধুংধুং, পাশাপাশি বহু
তটুনির উপর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মর্শকের অন্তরে
জীর্ণ আত্মার স্রষ্ট করিতে লাগিল। আস্ত-
বাসি বর্ষা যেহেতু ঘন ঘন বিচ্যৎকরণে
অচিরে তাহার আগমন বার্তার জাল উৎপাদন
করিতে করিতে, মূলধারায় বৃষ্টি নামিয়া পড়িল।
চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।
যে যেদিকে পাইল ছুটয়া পলাইল। বাতাসের
ফেরার গাড়ি ছিল তাহার গাড়ীর মধ্যে
দিয়া আশ্রয় করিল। ভাড়া পাইবার আশার
বাহার গাড়ী নইয়া আসিয়াছিল, তাহার এ চর্যাপে
কেই অপেক্ষা করিল না। জাহাজ হাসিবার
নিধির সময় প্রায় একঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে,
তথাপি জাহাজ আসিল না, অনুদ্বন্দ্বনে জাহাজের
কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। মাধব তখন এক-
রত্ন শাখার মত হইয়া পড়িল। বহুদিনের ক্ল-
বেদন, সংস্কারগত আত্ম-প্রবল বেগ তাহাকে
দুতন করিয়া আঘাত দিয়া তাহার আশার
কোন আশোঁটুই পর্বাণ্ড কি সোপ করিতে
চলিল? এত ধুংধুং কঠোর মধ্যে সে যে আত্ম চার
হাস কড় আশার আনন্দ-স্রোতের পদ্মভেদে মাত-
মততার কোমল মেঘ শৃঙ্খলটি হাতে করিয়া তাহার
মৃত জীহবের স্রীতি বন্ধনটিকে কড় আশার বীজিয়ার
প্রদান পাইতেছিল, সে চেষ্টাও কি অজুইর বিন্দু
হইবে।

মাধব আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিতে পারিল
না। নরেন্দ্রনাথের অমূল্য আশঙ্কায় সে বিহ্বল
হইয়া পড়িল এবং তরু-অগ্নিসে দিয়া জাহাজের
সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, জাহাজের কোন
সংবাদ এখনও পর্বাণ্ড পাওয়া যায় নাই। কড়
উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

মাধব মুর্ছিতের মত তার-অগ্নিসের দেওয়াল

ঐশ দিয়া ততক্ষণ ঝাঁড়াই দিল তাহা সে কিছুই
জানিতে পারে নাই। তাহার মনে ছিল না, তা-
পাড়ী ঘোড়ার কথা, তাই সন্নিহিত কথা। মাধব
হঠাৎ সন্নিহিত বসিয়া পড়িল বিস্তারিত, আসল সে
একজন ধর্ম কেতবান। আর এ গাড়ী ঘোড়া
মাধবের কড় স্রোত।

রাতি প্রায় ১টার সময় চারিদিকে একটা বিবল
আনন্দোজ্ঞাস দেখা গেল। লবঙ্গের মুখে
মুখে প্রচারিত হইল, জাহাজ দেখা গিয়াছে,
আর আসিতে বিনয় নাই। মাধবের মনে
হইল সে বৃষ্টি বস্ত্র সেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। এ
স্রোতের চৌক্যতা? তবে কি সত্য সত্যই কড়
জাহাজ মাস গিয়াছে, তবে কি একটা ও আত্ম-
রক্ষা পায় নাই। সে চৌক্যতা করিয়া আ-
নন্দ-অগ্নি বসিয়া উঠিল, "ঐ যে নরেন্দ্রনাথ, সত্যতার দিগা দীর্ঘের
দিকে আসিতেছে! অ্যা! তৎপান রক্ষা করিয়াছেন।"
কথাটা বলিয়া যেমন সে চুপ্ চুপ, কেবল তাহা-
অগ্নিসের স্রোত সে ঝাঁড়াইয়া আছে চারিদিকে
জাহাজ আসিয়াছে বসিয়া শোকে ছুটুছুটি
করিতেছে। মাধবের বিম্ব ও শব্দক রাহিয়ার
হাস বহিল না। বাহিরে আসিতে দেখিল কড় কুটি
খামিয়া গিয়াছে, আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া নক্ষ-
রাগ্নি স্পন্দিত হইয়াছে। স্রোতের সে জীর্ণ
আশ্রয় আর কিছু নাই।

মাধব তৎক্ষণাৎ গাড়ী কেবল ধারে নইয়া দিয়া
অপেক্ষা করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ জাহাজ হইতে
অবতরণ করিয়া তাহাতেছিল, এমন কি গাড়ী পাওয়া
হইবে? এত তাড়াতাড়ি জানি হোটেল খোলা
আছে কি না? ১টার সময় স্রোতের তাহা সে, ত,
কিছু নিখিয়া রাহিয়া অসল মোটেই প্রয়োজন মনে
করে নাই।

* বাহিরে আসিয়া দেখিল, কয়েকখানি মাস ধরে
গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। এই ধুংধুং, কেবল কি
ফেরার বাহির হইতে পারে? প্রাণের মততা

সকলেরই আছে ? এমন সময়ে, মাথার নিকটে আসিয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক পূর্ণ স্বরে বলিল, “বিশেষে এতটা স্বাধীনতা পড়া কোন রকমেই ভাল হয় নাই। এই সব দ্বন্দ্বসাময়িক কাজ করতে যে আপনার কোন অধিকার নাই—সেটা ভুলে যান কেন ? ভ্রমস্থান তখন কেমন, তাই নইলে আজ কি হুঁতো বলুন দেখি ? সেই গটা থেকে, কি উত্তীর্ণ হবার যে সময় কেটেছে। তার-আগলে থেকে যখন জান্নাতের মাহাজের কোন খবর পাওয়া যায় নাই, তখন—থাক, গাড়িতে উঠে পড়ুন। বাড়ী থেকে দু’বার লোক এসে সংবাদ নিয়ে গেছে। তারা আমার মতই উত্তীর্ণ হবার জন্যে এখনও তোপ ক’ছে ?” তারপর “চলুন,” বলিয়া মাথার বাড়ীর কোচবাড়ের উপর গিয়া বসিল।

সেদিন নরেন্দ্রনাথের মুখ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না। সে, নীরবে গাড়িতে গিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সমস্ত অন্তর মাথার অপূর্ণ যেক-কল আয়তনে বিশ্বের আনন্দে, উত্তিতে বিশ্ব-নিষ্কার চরণ প্রান্তে নিশ্চেষ্টে বিলুপ্ত হইয়া ফেলার আশ্রিত হইয়া বসিতেছিল, “আমার কমা কর প্রভু, আমায় কমা কর।”

গাড়ী হোটেলের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাথার গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলের দ্বার খুলিল।

নরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে নামিয়াই প্রবল আকস্মিক, মাথার হই হাত নিজ হই হাতের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বাপকন্ডকর্মে বসিলেন, “আমি যে তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি, যা, কোনকি ত, বাড়ীতে কি উৎকর্ষের রাশিমাছি, তুমি এখন যাও। তোমার স্বপ্নের হাঁকা আর এক পা’ও কোথায় যাব না। আমাকে কমা কর মাথার। তা’দের কাছে গিয়ে কমা তিকা করে আসুন। যাও আর কিসের কথা না।”

মাথার সে কথা কোন উত্তর দিল না। কেহ

সেখিল না যে মাথার নরেন্দ্রনাথ আনন্দাশ্রমে সমাধির হইয়া বিচাছে। সে বাপকন্ডকর্মে কেমন বলিল, “কাল আমায়ের বাড়ী নিয়ন্ত্রণ হইল।”

(২)

তোমার সময় হুঁতো’ আদির একখানি টেলিগ্রাম টেলিগ্রামের উপর রাখিয়া দিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি নিজের নাম দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন। তাহার হোটেলের বর্তমান ঠিকানা ত কেহ অবগত নয়। তাহার নামে এই চারি মাসের ভিতর কোন পত্রাধি বা টেলিগ্রাম ত আসে নাই। নিশ্চয় ভুল হইয়াছে। এই নামের অপর কেহ বোধ হয় এখানে আসিয়াছেন। হুঁতো ভুল করিয়া তাহাকে দিয়া দিয়াছে। তখনই হুঁতোকে ডাকিয়া বলিলেন, “এ তার তাহার নয়, তাহার নামের অপর কোন লোকের, তাগকে ধাও গে।”

হুঁতো কখনোই অভিযান করিয়া বলিল, “উপস্থিত হোটেলের তিনি ছাড়া অন্য কোন বাসিন্দা নাই—সুতরাং এ তার সম্ভবতঃ তাহারাই। খুলিয়া দেখিলেই অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। রাইচরণ যে ব্যক্তি হইতে নরেন্দ্রনাথের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা নরেন্দ্রনাথ কোন দিক দিয়াই জানে করিতে পারেন নাই।

নরেন্দ্রনাথ তার খুলিয়া দিয়া দেখিলেন, তাহাতে তাহার মুখ দুহুর্ন্তের ভিতর বিবর্ণ হইয়া গেল। টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া নির্ভীক হইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। হুঁতো বলাবাহ অস্থান করিয়া নিজের ঠিকাইয়া আবেশের অপেক্ষা করিতে ছিল। নরেন্দ্রনাথ নিজে নিজে বলিয়া উঠিলেন, “আর এক দুহুর্ন্ত বিষয় করিলে, যদি কন্ডার সম্বন্ধে কথা না হয়।” কথাটা বলিয়া ঠিকাইয়া উঠিয়া যাত্রা দেখিলেন, সম্মুখে হুঁতো তাহার আবেশের অপেক্ষা ঠিকাইয়া রাখিয়াছে।

“তুমি ঠিক বলিয়াছ। এ টেলিগ্রাম আমায়াই।

কক হঃসংবাদ! আমার কক! বৃদ্ধসংবাদ শাবিত
আমাকে আজ এখন যেতে হবে। তোমাদের
বিলের টাকা অল্পগ্রহ করে এখন চুকিয়ে নাও।
কলিকাতা দ্বারার গাড়ী এখন ছাড়ে?"

"কেনা? টার সময়। আজই যাবেন?"

"হাঁ, এখনি। আমি আর এক দুইটি বিল
ককতে পারব না। তুমি যাও। বিল করে নিরে
কেনা।"

কিছুক্ষণ পরে ট্রান্সিট বিল লইয়া কিরিয়া
আসিল।

তাকাতাকি নরেন্দ্রনাথ সমস্ত শুদ্ধাইয়া লইয়া
গাড়ীর ভক্ত প্রস্থত হইলেন।

ট্রান্সিটকে বিদ্যা কলিকাতার একখানি সেকেন্ড ক্লাস
টিকিট হিচ মধ্যে কিনাইয়া আনাইলেন। আটটার
ভিতর মানাহার কোনমতে একতরপ সারিয়া লইলেন।

ট্রান্সিটকে বিদ্যা এক হাজার নগর টাকা ভাড়াইয়া
আনিয়া একটা ধনির ভিতর আবদ্ধ করিয়া নিজের
সুট কেসের উপর রাখিলেন।

কেনা ৮০ সাত্বে আটার সময় মাধব গাড়ী লইয়া
আসিল। সেদিন, মাধবের আনিতে হতই বিল
হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ ততই উত্তর ও বাসুল হইয়া
উঠিতেছিলেন। মাধব যে নিম্ভয় আসিবে, সে বিষয়
তাঁহার সম্বন্ধ না থাকিলেও, গত রাত্রির ভীষণ
কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আশঙ্কা হইতে-
ছিল। তবে কি মাধবের কোন অসুখ করিয়াছে?
নিম্ভয় করিয়াছে! সে ত কোন দিন আসিতে এত
দেরী করে না। অসুখ না করাই আশ্চর্য। আধা।
ফেরারি আবার ভক্ত বাহা করে, তা বুঝি কোন
পিতাও পুত্রের ভক্ত করিতে পারে না। মাধবের
অসুখটা বহু নির্ভল পক্ষি বোতলবীর মত মে-
ধারায় প্রোবাহিত। আজ তাহার নিকট কি বলিয়া
বিরাম লইব? একথা ভাবিতে ভাবিতে নরেন্দ্রনাথের
নয়ন পন্নব আর্দ্র হইয়া আসিল। বড় আনন্দ করিয়া সে
আমাকে নিম্ভয় করিয়াছে। কিন্তু এখন সে আনিতে

পারিবে আমি হাতে পারিব না—হাওয়া আমার
পকে লাধাওব নয়, তখন তাহাওব মনে না জানি,
কি ভীষণ হঃব হইবে?

এই সময়ে মাধব গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত
হইল। সমস্ত বিছানা পত্র বাধা দেখিয়া সে অস্বস্তি
হইয়া গেল। বিষম-বিচলিত ন্যানে, মাধব কেবল
নরেন্দ্রনাথের সুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। একটা
কথাও ভিজাসা করা প্রয়োজন মনে করিল না।
নরেন্দ্রনাথ ব্যাধিত অন্তরে মাধবের হাত ধরিয়া বলিল,
এই যে, কি টেলিগ্রাম বাজী বেংক এসেছে।
বলিয়া তাহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিয়া তাহার
সুখের দিকে অপরাধীর মত কমা প্রার্থনা করিয়া
কাতরসুষ্ঠিতে চাহিয়া রহিলেন।

মাধব নিমিষের মধ্যে টেলিগ্রামটা পড়িয়া লইয়া
যেন কি তাহাটা অসম্মত সাক্ষ্যইয়া লইয়া
বলিল, "আর বিল ককলে গাড়ী পাওয়া যাবে না।"
তারপর চাকরের দিকে ইঙ্গিত করি জানাইল যেন
"সে সমস্ত জিনিষ গাড়ীতে উঠাইয়া দেয়।

গাড়ী ছাড়িবার ষ মিনিট থাকিতে নরেন্দ্রনাথ
ঠেগনে আসিয়া পৌঁছিলেন। সমস্ত জিনিষপত্র
মাধব নিজ হাতে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। তাহার
সুখ হাসি নাই। অকস্মাৎ যেন মাধবের সমস্ত
জন্মটো তোলাপাড় করিয়া কি একটা ভীষণ কড়
বাইতেছিল। কে যেন, তাহার অসুখ মূহ-মুহ
ভাবিতা যের অসুখের মত-ভূমির দিকে পূজ বলে
তাহাকে টানিয়া লইয়া বাইতেছিল। তাহার যেন
নিবেদ করিবার মত শক্তি বা সাধন ছিল না।
অন্নক্ষণ পরেই সে প্রকৃতির হইয়া তাবিল
আজ যে, তাহাওবের সন্ততি পরিবারট আনাইল যেহ
দ্বারা নরেন্দ্রনাথকে বরণ করিয়া স্নানত আনন্দো-
দ্ভাসে সুখের তরঙ্গী বাঁধা চলিবে মনে করিয়া-
ছিল—এত দিনের হঃবেক পরামর্শে বিল
যাশো, বিল্লপের নিম্নর হাতে, পূর করিবার
কল্পনায় যে আগ্রহে অশ্রুত করিতেছে, সে পুরিবার

নরেন্দ্রনাথকে চিত্রবিনের মত বিবাহ দিয়া কেমন করিয়া বাঁচবে ?

সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গার্ড হইলিল দিয়া গাড়ী ছাড়িবার জন্য প্রায়ট করমে বাঁড়াইয়া বাড়ির দিকে লক্ষ করিতেছিল।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ সেই টাকার বনিটা মাথবের হাতে ধিয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত বলিলেন, “আমি, তোমার ত কিছু করিতে পারিলাম না। এ অতি সামান্য—কিন্তু মনে করো না,—এইটা আবার জন্ম তোমাকে নিতেই হবে।”

মাথব অত্যন্ত অস্তমন্ত হইয়া কি একটা ভাবিতে ছিল। নরেন্দ্রনাথের কথাই সে যেন চমকিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ, যে তার মেয়ের প্রতিদান—এইরূপে সামান্য অর্থ দিয়া, কোনদিন করিতে পারেন, এ ধারণা তাঁহার ছিল না। মেয়ের বিনিময় যে, এতখানি অসম্মান বহন করিয়া আনিতো পারে সে কথা, যে মাথব স্বপ্নেও কোনদিন ভুলিয়াও যেন করিতে সাধন পায় নাই। কত বড় দুঃখ, কত বড় মিষ্টর আঘাত যে, এই টাকার বনিটির অভ্যন্তরে নিহিত ছিল, নরেন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি সে সম্মান পাইলে হয় ত এমন কান করিতে যেটেই দুঃসাহস প্রকাশ করিত না।

“টাকা!” বলিয়া নির্ঝাঁকুয় হৌপ শিবার মত মাথব একবার হাসিয়া পর দুহুর্ন্তে শিহরিয়া উঠিল। পলকের অন্ত নরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত অবজ্ঞাতরে বনিটি প্রাচীরের উপর ছুটিয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া সে টেননের বাহির হইয়া গেল।

সেদিন, সে আর গাড়ীর কোচ বাজে বসিল না। আত্মহীন আগনের উপর অবসরভাবে চলিয়া পড়িল। মাতাঙ্গের মত উচ্চ কর্তে কেবল বসিল, “জোরে চলো।” সমস্ত বিষণ্ণতার তাহার ঢকে এক দুহুর্ন্তে নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল। মাথব তখনও পক্ষাৎ করিয়া দেখিতেছিল।

নরেন্দ্রনাথ নির্ঝাঁকু ও তন্তিত হইয়া রহিল। পর দুহুর্ন্তে অত্যন্ত কল কাতর কর্তে জাকিলেন, “মাথব, মাথব, একটি কথা বলে যাও।” মাথব সে কথা শুনিতে পাইল কি না, বলিতে পারি না।

গার্ড হইলিল দিল—গাড়ী ছুটিয়া—নরেন্দ্রনাথ গাড়ীর আনালার ভিতর হইতে গঙ্গা পর্যন্ত কৃত্রিম মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন, মাথব তখনও তাহার গাড়ীর দিকে, কি সঙ্কল্প দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

নিমাইর নিক্রামণ ।

(জীবামিনী রজন সেনগুপ্ত ।)

কৃষ্ণচূর্ণের তিথি, অন্ধকারে জ্বলছে কুণ্ডল,
জিবামিনী শেখ, সজ্জিত তারায় নরন
সেবে আছে অনিবেশ, আশ্বহারা প্রকৃতি মূলকী
কর্তে শুধু উঠে তার তিরীকব নীরবতা তরি’।
শিরঃশ্রোণ অলঙ্কার, সজ্জিত অবেল লক্ষণ
হুত আগ দ্বাপাশব ছেড়ে বাঁবে সর্বপ্রিয়জন
নবদীপক্রে গোরা। জীবৈ যুগ পুরায় নবিয়ে
বিগ্ৰহের ক্ষয় নৃতি তনি মহাসিদ্ধ তীরে
বিশাল সে কৃষ্ণ বপু, দ্বাগোক মুলোক গেছে জরে ;

ধরা যেন ক্রিয়াকর্মে ভাঙে তাঁর বানরীর ধরে।
 অসীম অনন্ত বন্ধে ধোঁবিতের উর্দ্ধে চাহি তার
 আদিত্যে তাঁহার রাসি সংখ্যাতীত কৌতুকের হার;
 আদিত্যে চাহে ঘোরে কেমনে এ ক্ষুদ্র গৃহমাঝে
 আপনারে রাখি বাঁধি বিশ্বের ধূলি খেলা কালে;
 অনন্ত ভাঙিছে ঘরে—ছিঁড়ে তার সীমার বন্ধন
 কিংবা বেদনাযুগে সে কি শুনে ধরের হোঁচল?
 ও ধরে আছেন সাতা নিম্নাতরা আমার স্বপনে;
 গেছে দ্বাধা আমি শুধু মোহিত: তাঁর অন্ধের নয়নে
 তাঁরেও ছাড়িতে হবে, কেটী কেটী ধতার জননী
 ভাঙিছে আকুল কণ্ঠে আমি দিগে নীলকান্ত মণি।
 প্রিয় সহচরী পাশে যৌবনের সোচ্ছন্দা হৃদয়ী,
 কি আগ্রহে কি স্বপনে রাখে ঘোরে চোখে চোখে ধরি
 এ মিলনে ভূতি কোথা! শুনি বিশ্ব তাঁর শিশাসার
 উঠে সতর্ক হুঁ, লাঞ্ছনার মহাপাতাধার
 যখন ধরনীযুগে, কি আনন্দে অগ্নি বিক্সিগ্নে।
 বিরহে যাবিত অঁধি দেখি লবে এ বিশ্ব ভরিয়া
 উঠিয়াছি আমি তব; আমি আমি আগিবে যখন
 নিম্নিতা জননী ঘোর বরষিবে ধরার সোমন
 দেহ ভরা অঁধি ছুটি, তিলু আন পক্ষান্তে তাহার
 মুহুর্তে ভাঙিছে ঘোরে রমণীর শত অঙ্গধার।
 অন্তর বাহির উরি প্রিয় হতে প্রিয়তম যেই,
 হৃদয়ের অধিক হৃদয় ভাঙিতেছে ঘোরে সেই।
 ছেড়ে দাও দাই আমি নববীপ প্রিয় ভাগীরথী,
 বরষ আশীষ পুষ আশীরের অস্তির পথি।

সমালোচনা

(ঐচ্ছিকতঃ দ্রষ্টব্য)

অসীম পতাবী পর্বাৎ যুগোপায়ণ কর্তৃক
 "জাতকোত্তর শিখর-অস্ত্রা" - এ পুস্তকখানি
 মুদ্রিত ডাকার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা
 মহোদয়ের ইংরাজী পুস্তকের। বাহাংবাব। অম্বাবক
 শ্রীযুক্ত অম্বাবক সরকার দ্বারা ১৮ টাকা। পত্র-

সংখ্যা ১১৫ + অম্বাবকের বিবেচ ১/০ + মূল ইংরাজী
 পুস্তকের উপক্রমণিকা ১০ + স্থানা ৮ + স্থাপর
 ৪ + নির্ধারিত ২৪।

অম্বাবক বেশ প্রীত হইয়াছে। যুগোপায়ণের
 এ বেশ আগমনের সময় হইতে অসীম পতাবী

শিক্ষার বিস্তারকরে তাহার যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রচলন করিয়া লোকশিক্ষা বিস্তারের দ্বাৰা কৰ্ম্মাচ্ছিন্ন, তাহার দ্বাৰাবাহিক বিবৃতি আলোচ্য পুস্তকে আছে। যদিও ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস বেঙ্গল ভাষায় লিখিত হইয়াছে, উক্তর ভাষ্যেও প্রাধান্য কলিকাতা ও তাহার সম্বন্ধিত স্থানগুলির প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সেরূপ বিশদভাবে আলোচনা দেখিতে না পাইয়া আমরা একটু দুঃখিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে ডাক্তার লাহা মহাশয়ের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফল আমরা তাহার নিকট চাহিতে পারি। কলিকাতার প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকারী যে কে তাহার আলোচনা কালে, তিনি বহুবিধের উত্তর করিয়া লিখিয়াছেন, —‘এইরূপ নানাধি দাবীর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোন বালিক সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্মান পাইবেন,—তাহার সিদ্ধান্ত করা কঠিন। এই সিদ্ধান্তের ক্ষর দোষের হতে মুক্ত করিয়া ইত্যাদি। কঠিন বলিয়া আমরা তাহার নিকট একটা সীমাংসা চাই। প্রায়শঃই বিবরণী ও একটু বিশদ হইলে ভাল হইত।’ আলোচ্য পুস্তক হইতে ঐতিহাসিক অনেক নতুন তথ্য জানিতে পারা যায়। পরিমিষ্টে বিষয় নাম ও কাল বাটী নির্ধারিত থাকার পুস্তকখানির উপায়েরা সমধিক বর্ধিত হইয়াছে।

প্রস্তাব—এখানি সামাজিক উপদ্রাশ। লুকাই ঈদীলা দেবী ইচ্ছার চরিত্রী। সেবিকার কবিত্বের পরিচয় বসুনার পাঠক পাঠিকারা প্রায়ই পাইয়া থাকেন। উপদ্রাশ ক্ষেত্রে ইহা তাহার প্রথম পুস্তক। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আদুরী ঐতিহাসিক করিয়াছি। সে সেবা ধর্মের মহিমা কীর্তন করিবার জন্য কবিত্বের পরিমিত প্রায় তাহার ‘হারাণিধি’, ‘স্বপ্নলীলা’ প্রকৃতি নাটক রচনা করিয়াছেন; কবিত্বের নবীনচর ‘কুক্কের’ কাব্যে কৃত্যের স্বর্ণে আর্গ আভের সেবার নারীধর্মের যে অপূর্ণ ব্যাখ্যান দিয়াছেন ও, বৈদ্য চিত্রে যে সেবারধর্মের

মহিমাংশ চিত্রিত হইয়া তুলিয়াছেন মহাপ্রবন্ধের পদ্যসুন্দর্য করিয়া উপদ্রাশের ভিত্তি দিয়া তৎকাল চিত্র আলোচ্য উপদ্রাশ-সেবিকা হুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর সে চেষ্টা যে সকল হইয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। গত বৎসর চৈত্র মাসের বসুনা পত্রিকা, ‘কবিত্বের পরিমিত প্রায় ও তাহার নাট্য প্রতিভা নামক দ্বাৰাবাহিক প্রবন্ধের একপ্লে আমরা লিখিয়াছিলাম,—“সেবাক্ষেত্রে রমণী—”

স্বয়ং অচল দ্বয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই হুটমুহুরে নাস’ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীর দৃশ্যহৃত পরঃপ্র বোচনে সর্বদাই ব্যগ্র। তাহারিগকে এ কার্যের ভার অনাধানে বেওয়া থাকিতে পারে। তাই মহাকবি পরিমিত প্রায় তাহারিগকে সেবাক্ষেত্রে অধিকার দিবার জন্য বহু পরিচয় হইয়াছিলেন। বৃদ্ধবৎ একদিন রমণীকে সংঘের ভিতর প্রবেশাধিকার দেন নাই; কিন্তু পরে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যিনি এই কার্যে ব্যগ্রপর হইলেন—পরমহংসের পরমদত্ত পরিমিত প্রায় ইচ্ছিত মত তাহারি কার্য করুন।”

স্বয়ং বিষয় অঙ্গদানের মধ্যেই মনবিনী লীলা দেবী এই উচ্চ আদর্শকে তাঁর হৃদয় তুলিকা অধিত কুরিয়া আমাদের সম্মুখে দিয়াছেন। জানি না কবে কোন গুণ-সুগুণে কোন রমণীর দৃশ্যহৃত গঠিত প্রায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁর মনঃকল্পিত প্রায়কে কার্যে পরিণত করিবে।

স্বরাঙ্গন বৎসে প্রায় দ্বয়। সে অঙ্গ বৎসে পরিণীত হইয়া দ্বায়ী কর্তৃক পরিণীত হয়। দ্বায়ী দ্বায়ী হইয়া চলিয়া গেলে, অঙ্গবৎসেই প্রায় নরনারীর সেবার জন্য আত্মপ্রাণ নিয়োজিত করিল। একাঙ্গ অধ্যবসায় সহিত সে শিক্ষার্থীকে মনোনিবেশ করিয়া উচ্চ শিক্ষিত হইয়া ডাক্তারি পাশ করিল। তারপর কার্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় প্রায় তাবিল, ডাক্তারি কার্যে মন দিলে করলন

তাপের সে উপকার করিতে পারিবে। তাই সে কার্য হাড়িমাখিয়া সে 'নারিঃ' কার্যে প্রবৃত্ত হইল। তাঁর ভগ্নদ্বারী ঘৃণি সেবিধা যোগী আশাস পাইত—স্বয়ং হইত। এই কার্য করিয়া যে অর্থপন্ন হইতে লাগিল, তাহা সে অনাথ-অপ্রিয়, অন্ধপ্রিয়, দাতব্য-ভিক্ষুসালয় প্রকৃতি সন্তুষ্ঠানে ব্যয় করিতে লাগিল। একদিন রমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভাত্যারি না করিয়া তিনি 'নারিঃ' করেন কেন? উত্তরে এথা বলিয়াছিল,—“আবার স্নেহ হয় যে, আশাযের যেনে স্বার্থ-সেবায়ের অসুষ্ঠান এক রকম লোপ পেতে কসছে। সে তারটা ক্রীলোকেরই নেওয়া উচিত—বানের সলোয়ের বন্ধন ঈশ্বর নিজ হাতে কেটে দিয়েছেন তাদের। ভাত্যার ত অনেক আছেন; আর তাতে পুরুষের পারদর্শিতা বহু, ক্রীলোকের তা হ'তেই পারে না। তবে ব্যবসার হিসাবে না ক'রে ভাত্যারি শিক্ষা দেয়দের পক্ষে ও ভাল। কিন্তু এই একটা কাজ—সেবার কাজটা আবার বোধ হয় আমরাই বেশী ভাল পারি।” কথাটা খুব সত্য। তারপর সে বুড়াইয়া দিল বৈরাগ্য ও ত্যাগের উপর এই সেবাব্রত প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আর এই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই এথা একটা আশ্রমের-প্রতিষ্ঠা করিল। এথা বাল-বিশ্বাস। স্বামীর গৃহত্যাগের পর তাঁহার দত্তা সংবোধ পাইয়া ছিল ঐশ্বরীর কিছুমান শ্রুতি তাঁর মনে পড়িত না, সে ভগবানকে আপনাতর স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়া গিয়াছিল। স্বপ্নতের নকল নক-নারীই যে এবার ও এবার স্বামী ঈশ্বরবানের সন্তান। তাই যাক্ষ-রহে পরিপূর্ণ জ্বর্য এথা সকলকে কোল নিতে পারিয়াছিল—স্বীয় প্রবীর প্রাণ যোজন করিতে পারিয়াছিল। একদিন স্বপ্ননিরত ব্রাহ্মণ রামচরণ পণ্ডিত যশশ্বর যিনি এবার শিক্ষার সমুদায় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি এথাকে বিবাহ করিতে অসুযোগ করেন। কথাটা শুনিয়া—এথা চমকিত হইয়া

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার কত্না মণিতাকে ত একথা ত বলেন না? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—“সে যে তাঁর স্বামীর শ্রুতিতে চুপে কাছের।” উত্তরেও পূণ্যকর্মে এথা বলিল,—“মনিয়া তাঁর স্বামীর শ্রুতি নিয়ে আছে—আর আমি যে আশাঃ প্রত্যাশীত্ব স্বামীরে নিয়ে আছি। এটা কি করে বেনী নিরাপদ নয়।” এবার এই অসম্ভব-কথায় রামচরণ বাবুর ‘বাহুকা-দীপন রক্ত-প্রোত ও চকল হইয়া উঠিল।’ তিনি রাসিধা বলিলেন,—“এক, এ কি কথা?”

উত্তরে সে বলিল,—“ঠিক কথা! স্বপ্নতের যিনি স্বামী—তিনি আমার ও স্বামী। একথা না মেনে আথাকে আপনি বার বার বিবাহের অসুযোগ করিছেন না।” বুদ্ধ কথাটী বুঝিয়া হাসিলেন। কারণ, বাৎসল্যভাবে বাল-গোশালের প্রতি আগ্রহ বৈরাগ্য স্বাভাবিক, ও সহজ গোণীভাবে তাঁহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা ততটা সহজ নহে। কিন্তু এই সেবাব্রতধারী হইতে গেলে, সংসারী ও ব্রহ্মচারিনী হওয়া আবশ্যক। তাই এবার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে এই সকল শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

এবার আশ্রম চরিত্রের ভিতর দুর্ভাগতা একবার মাত্র লক্ষিত হয়। এক সময় অরিন্দম বহুভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তারপর অরিন্দম যখন, একটু ভালবাসার প্রত্যাশায় আবেগ-ভরে তাঁহার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তখন পূণ্য সিংহিনীর জ্বাং এথা বলিয়াছিল,—“যেহূন এ রকম কহলে আশ্রমের সত্যই আবার নষ্ট হয়ে যাবে। এ ছদ্মবেশে ঈশ্বর ভিন্ন আর কারও স্থান নেই। সমুদ্রের ঢেউ-বে বুক পেতে নিতে পেরেছে সামান্য নদীর ঢেউ-ও সে পড়ে যায় না, ঈশ্বরের প্রেম যে একবার জ্বর করে নিতে পেরেছে, বাহুবীর প্রেমে সে বিচলিত হয় না। আবার ভাল-বেলে আপনাতর লাভ কি?” তার পর সন্ত-পতী

বিদ্যোৎসাহিণী অস্বাভাবিক বসন সঞ্চারে বিতে একা
আসিবেছিল, তখন 'সুখী' বন্ধুত্বের মত ব্রহ্মজ্ঞানে
দরদারি মতিদো' মহিয়ার একবার মাত্র চিত্তচাক্ষুণ্য
হইয়াছিল। এবার সুখোজ্ঞানিত "বন্ধু" শব্দে 'ও'
তাহার মনুষ্য শব্দে অস্বাভাবিক বিচলিত হইয়াছিল,
কিন্তু তখন সে জানিয়াছিল এবং—তার বন্ধু শিখা-
শালোক বিবাহিত পত্নী। বন্ধুর প্রতি অবিবাহী সে
হইতে পারে না। কণিকের মোহ কাটিয়া গেলে
এবং আবার নির্বেশ আকাশের ছায়া দিগ অচকল
হইল। তখনবাসে অর্পিত-চিত্ত সন্ন্যাসিনী এবার শান্ত
বৃত্তি আবার উদ্ভাসিত হইল।

উপভাসের অস্তিত্ব চরিত্রও বেশ স্বাভাবিক ভাবে
অভিত হইয়াছে।

আলোচ্য উপভাসে 'এ' এক যুগে বর্ণনার আভি-
শব্দ আছে। লেখিকা যে সকল স্থানে সংস্কৃত বসন
উদ্ধৃত করিয়াছেন প্রাচীনে সেইখানে অর্থ লিখিয়া
ছেন নাই। অনেকের ইচ্ছাতে রসগোধ করিবার
অনুবিধা হইবে। এবার ভাণ্ডার কর্তৃক—লিখার
অপরূপ ব্যাপার ও তাহারক—অনিয়া অনিয়া গৃহে
রাখার আশঙ্কতা কিছুই ছিল না। ভিটকুটি
উপভাসে একজন ঘটনার স্থান থাকিলে 'ও' এরপ
উপভাস যে নাই তাহা সকলকেই বোঝার সম্ভব
হইবে।

পুস্তকের ছাপা কাগজ ভাল। বর্ণিত ছি ও ছাপা-
খানার ভুতর-মৌরাসের নমুনা প্রতি পৃষ্ঠার অগ্রস্ত
বেধিতে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৪৪। মূল্য ২/-
টাকা। বাঁধাই ভাল নয়।

অস্বাভাবিক—অস্বাভাবিক—আচার্য্য অস্বাভাবিক
সরকার প্রণীত। দ্বীকেশ পত্রিকা প্রকাশনার
অভিভূক্ত। মূল্য ২/- টাকা। পত্র সংখ্যা ২১৭-২১।

পুস্তকপদ আচার্য্য সরকার মহাপ্রভুর তৃতীয়
অস্বাভাবিক সরকার মহাপ্রভুর তাহার পিতার লিখিত রস-
রচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া উপহার দিয়া আবার
বস্ত্রবাস তাজন হইয়াছেন। পুস্তকের প্রারম্ভে তিনি
'এই পরিচয়' ও বিবরণে। অল্প লেখক মহাপ্রভুর
কোনর কাহিনী ছাড়া প্রবন্ধ গুলি কোন সময়
কেন উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল, তাহার অনেক

পুস্তক কাহিনী ও বলিয়া বিবরণে। পুস্তকখানির
সমাগোচনা পরিবার হইতে আনোভ্যে নাই। তবে
একথা বলিতে কিছুমাত্র সন্দেহ হইবে না যে, বাহুল্য
বহি এই রস রচনা পড়িয়া আলোচনা করেন,—তাহা
হইলে বাহুল্য রসের প্রকৃতি কি তাহা বুঝিতে
পারিবেন—রসের যে উদ্দেশ্য মনুষ্য আনন্দ ও শিক্ষা
হান তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিবেন—তার প্রতি-
বেদন রসত বাকাবাণ নয়। অপরকে কখনও
কখনও রসের মর্মে নাই। ব্যক্তিগত বিবরণ-
মধ্যে জান পাও নাই। আচার্য্যসেব বর্ষ পুস্তকের এক-
কালে লিখিয়াছেন—

"ইতি বিবিন্দু যতি, রসত রসিবে।"

ভিত্তি-বিবরণ করি প্রাণী দী-কল্পিত।

বাতবিকই রচনাগুলির ভিত্তি বিবরণের চিত্র
মাত্র নাই। এ রস রচনার সীলতার অস্তিত্ব নাই—
সরল প্রাণের অভিব্যক্তি, সহজ বসল প্রাণের তাহার
বর্ণিত হইয়াছে। সমাজের মধ্যে দুর্ভাগ্য সোঁচিয়া যত্ন-
তব আচার্য্যসেবের প্রাণ কাঁপিয়াছিল, তাই সেগুলিকে
বুঝ করিবার জন্য সরল ভাষায় কতকগুলি রসত
লিখিয়াছেন। সমাজের উন্নতি বাহারা কাহিনী
অন্যেই উদ্ভাসিত। তাহার বস্ত্রবাস বর্ষ সুবিধা কার্য-
ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন আশা করি।

মহাপ্রভুর লিখিত রচনা পড়িত ভাণ্ডার, গত পৌষ-
মাসের পত্রিকার আচার্য্যসেবের রস রচনা সম্বন্ধে বাহা
লিখিয়াছেন, তাহার উপর আমরা আর নতুন কিছু
বলিতে পারিব না। তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ
একমত।

আমরা প্রত্যেক বাঙালীকে এই পুস্তক পাঠ
করিতে প্ররোচিত করি।

পুস্তকখানির ছাপা কাগজ ভাল। বর্ণিত ছি ও ছাপা-
খানার ভুতর-মৌরাসের নমুনা প্রতি পৃষ্ঠার অগ্রস্ত
বেধিতে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৪৪। মূল্য ২/-
টাকা। বাঁধাই ভাল নয়।

অস্বাভাবিক—অস্বাভাবিক—আচার্য্য অস্বাভাবিক

পুস্তকখানির ছাপা কাগজ ভাল। বর্ণিত ছি ও ছাপা-
খানার ভুতর-মৌরাসের নমুনা প্রতি পৃষ্ঠার অগ্রস্ত
বেধিতে পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা ৪৪। মূল্য ২/-
টাকা। বাঁধাই ভাল নয়।